Hitesrânjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 3	Place of Publication: Calcutta.
Collection: Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Anilkumar Dey.
Title: *Udayan* (Bengali monthly)	Year of Publication: Year 1, Part II, No.7 - 12, 1340B.S (1933) – Year 2, Part I, No. 1 - 6, 1341 B.S. (1934).
	Size (l. x b.): 24 c.m. x 18 c.m.
Editor: Anilkumar Dey.	Condition: Good.
	Remarks: Bound volumes; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

আসা-যাওয়া

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হরিমোহনের জননী ভুবনেশ্বরী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অনেক দুঃখে-কষ্টে শিশু হরিমোহনকে আজ একজন ধনী ও কৃতী করিয়া তুলিয়াছেন। হরিমোহনের বিবাহ দিয়া একটি সুন্দরী পুত্রবধূর মুখে অকৃত্রিম 'মা' সম্বোধন শুনিয়া এবং ক্রমশঃ নাতি-নাতিনী-পরিবৃত হইয়া তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে পরিতৃপ্তির সঙ্গেই দিন-যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার সে-সুখে বিধাতা বড় নিষ্ঠুর ভাবেই বাদ সাধিলেন। হঠাৎ একদিন সামান্য কয়েক ঘণ্টার জ্বরে, শাশুড়ীর হাতে ছেলে-মেয়ে কয়টিকে কাঁদিতে কাঁদিতে তুলিয়া দিয়া, স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া সুরবালা বোধকরি-বা সুরলোকেই যাত্রা করিল। স্বামী হরিমোহনের চোখের দিকে আর চাওয়া গেল না—ভুবনেশ্বরী ছেলে-মেয়ে ক'টিকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া সারা হইলেন। এই কাহিনীর এইটুকুই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সেদিন হরিমোহন একটু সকাল করিয়া আফিস হইতে ফিরিয়াই ডাকিল, মা!

ভুবনেশ্বরী তখন খড় নাতি সুরেশকে সুর করিয়া অনেক আবদার রক্ষার প্রস্তাব করিতেছিলেন, আর অবসর মত তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন। সাত বছরের ছেলেটা এমনি ছেলেমানুষ যে, এখনও ঠাকুরমার কোলে চড়িয়াই গল্প শুনিবে কিন্তু এক ফোঁটা দুধ তাহাকে খাওয়ায় কা'র সাধ্য! বাটি ছুঁড়িয়া-ফেলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া সারা হইবে।

ভুবনেশ্বরী দূরের বারান্দা হইতেই কহিলেন, কেন রে হরি—এদিকে আয়!

হরিমোহন কাছে আসিয়া কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সহসা কোনো কথা কহিতে পারিল না।

ভুবনেশ্বরী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কি? কোনো দরকার আছে না কি? এত সকাল-সকাল যে, শরীর ভালো ত'?

হরিমোহন কহিল, এমনি আপিস থেকে এলাম একটা কাজে। কাল যে একশ' টাকার নোটখানা দিয়েছিলাম, সেটা চাই।

ভুবনেশ্বরী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিলেন, তারপর কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা দাঁড়া, নিয়ে আসি।

ভুবনেশ্বরী তাঁহার নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

মেজ-মেয়ে টেঁপি ইতিমধ্যে জোর করিয়া পিতার কোল দখল করিয়াছে। চমৎকার একটি কচিমুখ—দক্ষিণের স্নিগ্ধ বাতাসে তাহার সোনালি চুলগুলি উড়িতেছিল। সেই অনিন্দ্য-সুন্দর শ্যামল লাবণ্যে উদ্ভাসিত সুকুমার মুখখানির দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণের জন্য হরিমোহনের চোখে আর পলক পড়িল না। সুরবালার বিদায়-পাণ্ডুর করুণ মুখচ্ছবি তাহার চোখের সুমুখে যেন চকিতে জাগিয়া উঠিল। ফুটন্ত গোলাপের মত সেই আরক্তিম গালে ধীরে ধীরে একটি সস্নেহ চুম্বন দিয়া হরিমোহন কহিল, আজ তোমার জন্যে সেই লাল বেলুন আর এরোপ্লেনটা নিয়ে আসব, কেমন?

টেঁপি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল, তোমার কিছু মনে থাকে না বাবা, রোজই তুমি ভুলে যাও—আমাকে আজ গড়ের মাঠে নিয়ে চলো না বাবা!

সুরেশ হরিমোহনের জামার হাতা ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, হ্যাঁ, তুমি ত' গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে! সেদিন বায়োস্কোপে গিয়েই ত' ঘুমিয়ে পড়লে, আমরা কেমন লেমনেড্ খেলুম, না বাবা?

কোলের ছেলেটিও দাদা-দিদির দেখাদেখি হামা দিতে দিতে হরিমোহনের কাছে আসিয়া বাপের মুখের দিকে প্রত্যাশী করুণ চোখ দু'টি তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

হরিমোহন তাহার কাজল-সমাচ্ছন্ন মুখখানি রুমালে মুছিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হুকুম টুসুমণি, কই, বলো?

টুসু কি বুঝিল কে জানে, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিল, ঝা…

টেঁপি বয়স্থা গৃহিণীর মতো বলিয়া উঠিল, ওই ছাখো বাবা, এইবার ওর বোল্ ফুটবে!

ভুবনেশ্বরী আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বোধকরি দুই ফোঁটা অশ্রু মুছিলেন। সমস্ত হৃদয় তাঁহার আবেগে, বেদনায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নোটখানি হরিমোহনের হাতে দিয়া কহিলেন, বেশি দেরি করিস নি যেন।

হরিমোহন ছেলে-মেয়েকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া কহিল, ঠাকুমার কাছে যাও, তোমাদের জিনিষ আন্‌ব আজ।

টেঁপি একমুহূর্তে ম্লান হইয়া গেল। তথাপি টানিয়া-টানিয়া বলিতে চেষ্টা করিল, কাল নিয়ে যাবে ত' বাবা?

হরিমোহন অন্যমনস্কের মতো বলিল, হুঁ।

একমাসের মধ্যেই হরিমোহনের চেহারা যে এত খারাপ হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। চোখের দৃষ্টি উদাস, সর্ব্বদাই বসিয়া কি যেন ভাবে—অমন যে উজ্জ্বল গায়ের রঙ, তাহাও একেবারে কালী হইয়া গেছে। চোখের কোলে কালো কালো দাগ যেন ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছে। ভুবনেশ্বরী মনে-মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

প্রায় প্রত্যেক শনিবার সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কোথায় যে সে যায়, ভুবনেশ্বরী আজ-কাল যেন কিছু-কিছু বুঝিতে পারিতেছেন। ভাঙা নীড় জোড়া লাগাইবার করুণ চেষ্টার তাঁহার সীমা ছিল না, কিন্তু হরিমোহন কান পাতে না। সেদিন তিনি মরিয়া হইয়া কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ছাখ্ হরি, আমি আজ ওদের কথা দিয়ে ফেলি। বুড়োবয়সে আর এমন করে' আমাকে—বলিতে বলিতে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল।

হরিমোহন ব্যস্ত হইয়া কহিল, মা, তুমি তোমার ছেলের দিকটাই বড়ো করে' দেখচ, কিন্তু পরের মেয়েটির কথা ত' কিছুই ভাবচো না—তা ছাড়া দিন-কাল খারাপ। কারবারে টান্ পড়েছে, এই সময়ে আর একটির বোঝা আমাকে চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে! তুমি ছেলেমেয়েগুলোর কথাও একবার ভাবচো না?

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, সে আমার ভাবনা, আমি ভাববো—এদিকে আমি যে আর পেরে উঠি নে।

হরিমোহন তাড়াতাড়ি কহিল, আচ্ছা সে হবে' খন, কিছুদিন যাক্।

রবিবার দিন বিকালের দিকে হরিমোহনের বৈঠক-খানায় নিয়মিত গানের মজলিস্ বসে। ছেলেবেলা হইতেই এই বিদ্যাটির দিকে ঝোঁক তাহার একটু অতিরিক্ত রকম, কিন্তু বিধাতা বঞ্চিত করিয়াছেন। অনেক চেষ্টায় তবে সে গানের একজন বিশিষ্ট রসজ্ঞদার বলিয়া আজকাল সম্মানিত হইতে পারিয়াছে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। এখনই একে-একে অনেক আসিয়া জুটিবে, হরিমোহন চাকরকে দিয়া ঘরটাকে ঠিকঠাক করাইতেছিল।

এমন সময় একটি সুশ্রী যুবক আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, হরিমোহন বাবু!

হরিমোহন শশব্যস্তে ভিতর হইতেই বলিল, এই যে—আসুন, আসুন!

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া লোকটির দিকে তাকাইয়া তাহার মনে পড়িল, সুরবালার অয়েলপেন্টিংটা সে মাস ছয়েক আগে অর্ডার দিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আনিতে পারে নাই। কখনো সময় অভাবে, কখনো-বা মনেই ছিল না। আজ একেবারে সেই ফটো সঙ্গে লইয়া ভদ্রলোক নিজেই দিতে আসিয়াছেন। হরিমোহনের অপ্রস্তুতের আর সীমা রহিল না।

—এই যে আপনি নিজেই কষ্ট করে'…তা একেবারেই মনে ছিলো না…হ্যাঁ, কত আপনার পাওনা হ'লো ?

ভদ্রলোক কহিলেন, আপনি বলে' এসেছিলেন, শীগ্‌গির চাই, বাইরে যেতে হবে। আমরা ভাবলাম, হঠাৎ হয়ত কাজে বাইরে চলে' যেতে হয়েচে, তাই বোধকরি নিতে পারেন নি।

হরিমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল কিন্তু অনুতাপে তাহার সমস্ত মন পুড়িতে লাগিল।

অকস্মাৎ যেন ব্যস্ত হইয়া সে ডাকিল, বংশী!

বংশী বোধকরি কাছেই কোথাও ছিল। কহিল, বাবু!

হরিমোহন দরজার কাছে গিয়া বলিল, এই ছবিখানা আমার ঘরে টেবিলের ওপর রেখে আয়—আর…

তারপর চুপি-চুপি কি যেন বলিল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটি রেকাবীতে জল-খাবার এবং চা লইয়া বংশী ঘরে ঢুকিতেই ভদ্রলোকটি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

—না না, ওকি, আবার ও-সব কেন ?

হরিমোহন কহিল, না না, সে কি—আপনি দয়া করে' এসেছেন—

সেদিন হরিমোহন আর নীচে নামিল না—অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া আসর সর-গরম করিয়া তুলিলেন। সে বিনীতভাবে বলিয়া পাঠাইল, তাহার শরীর অসুস্থ কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন চলিয়া না যান।

আয়োজনের ত্রুটি হয় নাই, আদর-আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা অন্য দিনের চেয়ে যেন আজ একটু বেশিই দেখা গেল তবু গৃহস্বামীর দেখা মিলিল না। এদিকে গানের আসর পুরাদমে চলিতে লাগিল, আর উপরকার নির্জ্জন রুদ্ধগৃহে সুরবালার অয়েল-পেন্টিংয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া হরিমোহনের চক্ষু আর বাধা মানিল না। অনেকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া মনে-মনে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কি যেন সে বলিতে লাগিল। নীচে হইতে একটি করুণ পুরবীর সুর ভাসিয়া আসিতেছে। হরিমোহনের মনে পড়িতে লাগিল, গান সুরবালা কি ভালই যে বাসিত! কতদিন মধ্যরাত্রে অতি ধীর মৃদুকণ্ঠে সে গান গাহিত—হরিমোহনের সমস্ত সত্তা উন্মুখ হইয়া সেই দূর-বিস্মৃত বিগত দিনের স্বপ্নময় রাত্রের দিকে কান পাতিয়া রহিল।

মহাকালের পাখায় ভর করিয়া আরো দশটি বছর পার হইয়া গেছে।

হরিমোহনের ব্যবসায় ভাঁটা পড়িয়া আসিয়াছে—সমস্ত দেহে আগন্তুক জরার চিহ্ন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে কিন্তু বাহিরকে ঢাকিবার চেষ্টা হইয়া উঠিয়াছে হাস্যকর।

প্রৌঢ় পুত্রের প্রসাধনের পারিপাট্য এবং সন্ধ্যাবেলার সাজসজ্জা ভুবনেশ্বরীর চোখে যেন কাঁটার মতো বিঁধিতে থাকে। আজকাল আর টাকা চাহিতে তাহার সঙ্কোচ করিবার দরকার হয় না। টেঁপির বিবাহ হইয়া গেছে। অভিমান করিয়া সে আর বাপের বাড়ী আসিতেও চাহে না।

সুরেশ নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করে, মুখ ফুটিয়া কোনো কথা সে বলিতে পারে না, শুধু হতাশ-করুণ চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখে মাত্র।

দেবেশের চেহারা চমৎকার। সবসময়ে ফিট্‌ফাট্ বাবু সাজিয়া বিকাল বেলাই বাহির হইয়া যায়, আর ফেরে রাত দশটায়। সাহেবী পোষাকে যখন সে বেড়াইতে বাহির হয় তখন অনেকেরই বিস্মিত, মুগ্ধ, কৌতূহলী দৃষ্টি সহসা সেখান হইতে ফিরিতে পারে না।

সেদিন বিকাল বেলা মুখে পাউডার ঘষিতে ঘষিতে সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, ঠাকুমা!

ভুবনেশ্বরী পাশের ঘর হইতেই বলিলেন, কেন?

—সেই যে সকালে বল্‌লাম, দশটা টাকার কথা, চেয়ে রেখেছ?

ভুবনেশ্বরী কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, তুই নিজে চেয়ে নিস্—আমি পারবো না।

দেবেশ চীৎকার করিয়া কহিল, বেশ! কাল থেকে এ বাড়ীতে আমার ছায়াও দেখতে পাবে না, তা বলে' দিচ্চি। ভুবনেশ্বরী রুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বেশ ত', ভয় দেখাচ্চিস্ কা'কে?

দেবেশের রূঢ় কণ্ঠ হইতে শুধু বাহির হইল, আচ্ছা!

ভুবনেশ্বরীর এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ কিন্তু অন্যরকম। কিছুদিন আগে একটা কথা শুনিয়া অবধি মন তাঁহার একেবারে পাথর হইয়া গেছে। ছেলের সঙ্গে তিনি কথা কহেন না—অত্যন্ত গম্ভীর সেই কঠোর মুখের দিকে হরিমোহনেরও তাকাইতে আজকাল ভয়-ভয় করে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা হরিমোহন সাজ-পোষাক করিয়া বাহির হইতেছিল, ভুবনেশ্বরী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হরি, আমাকে এবার কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করে' দে।

হরিমোহন শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, সেও ত' তোমার পুত্রবধূ মা, তা'র ওপর…

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আমি বেঁচে থাকতে, আমার অমতে যা হয়েছে, তাতে সে যে এসে আমাকে…তা আমার মনে হয় না—না, না আর নয়, অনেক হয়েছে, তুই ব্যবস্থা কর। বলিয়া জোর করিয়া তিনি দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া রহিলেন। হরিমোহন বিব্রতভাবে কহিল, আচ্ছা দেখি।

আজ কয়েকদিন ধরিয়া ভুবনেশ্বরীর বেশ জ্বর। দুর্ভাবনায়, গ্লানিতে তাঁহার ভগ্ন-হৃদয় ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকেই যে আগাইয়া চলিয়াছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার শুধু বার বার এই কথাই মনে হয়, যে দুর্ভাগ্য লইয়া তাঁহার জীবনের প্রথমটা কাটিয়াছে, তাহার চেয়ে কত ভীষণ পরিণাম যে তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা জানেন শুধু তাঁহার অন্তর্যামী! ঘনমেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে চকিত বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত মধ্যে মাত্র কয়েকটা বৎসর তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া দিয়া গিয়াছে।

সুরেশ শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল।—ধীরে ধীরে রুহিল, তোমার ওষুধ খাবার সময় হ'লো ঠাকুমা।

ভুবনেশ্বরী সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, না, থাক ভাই।

এইবার চোখ দিয়া তাঁহার দরদর করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘরে পশ্চিমদিকের জানালা দিয়া শেষ সূর্য্যের এক ঝলক রক্ত-আভা রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। আসন্ন সন্ধ্যার সেই ধূসর ছায়ার মধ্যে শুধু বড় ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

ভুবনেশ্বরী ক্লান্তকণ্ঠে কহিলেন, টেঁপি বোধহয় আসতে পারলে না, না সুরেশ?

সুরেশ জবাব দিল না। সামনের আরশীর দিকে চাহিয়া সে তখন দেখিতেছিল, ঘরের দেয়ালে সুতা দিয়া টাঙানো লাল বেলুনটির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিয়া বোধকরি তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন সেই সুতাটি কাটিয়া দিতেই—বেলুনটি মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। সুরেশের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রাণপণে ঠাকুরমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, ঠাকুমা!

ভুবনেশ্বরী শান্তকণ্ঠে কহিলেন, কেন রে!

সুরেশ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, না, এমনিই।

বাহিরে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। হরিমোহন ঘরে ঢুকিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ডাকিল, মা!

—কি?

—টেঁপি ত' আসতে পারলে না, তার ছেলেটির জ্বর। তাই মনে করলুম, সেবা করবার জন্যে…তাই—

ভুবনেশ্বরী এইবার বুঝিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ছেলের দিকে চাহিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন, কিচ্ছু দরকার নেই, সে আমি নিজে বুঝবো।

হরিমোহন আর কথা কহিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া গেল।

ভুবনেশ্বরীর চোখে বোধকরি একটু তন্দ্রা লাগিয়া আসিয়াছিল, কাহার পায়ের শব্দে একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছিপ্‌ছিপে, সুন্দরী মেয়ে, গায়ে একখানি সিল্কের চাদর! চোখ দু'টিতে যেন একটি করুণ প্রার্থনার ভাষা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ভুবনেশ্বরী স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, অ' তুমি!

তারপর যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, একদিন ত' আসতেই, তা আমি থাক্‌তে-থাক্‌তেই এলে? তা বেশ!

মেয়েটি কোনো কথা কহিল না, শুধু একবার অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, আপনি এখন কথা কইবেন না, মা!

ভুবনেশ্বরীর হৃদয়ের কোনো একটা তার বোধকরি জোরে জোরে বাজিতে লাগিল।

মেয়েটি ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। সে-মুখে বোধকরি কিছু ছিল। তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, বেশ!

হঠাৎ পাশ ফিরিতেই ভুবনেশ্বরীর চোখে পড়িল, দেওয়ালে-টাঙানো তাঁহার মৃতা বড়বধূর ছবি। প্রশান্ত নির্ম্মল সুন্দর হাসিতে উদ্ভাসিত, কিন্তু ভুবনেশ্বরীর যেন হঠাৎ মনে হইল, ওই হাসির অন্তরালে সমস্ত জীবনের গভীর বেদনা বিদ্রূপে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি দুঃসহ বিস্ময়ে ও ভয়ে জোর করিয়া চোখ বুজিলেন।

—•—



['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

নিদ্রিত পুরী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস। মূল্য—দুই টাকা।

লেখক নূতন নন। বাঙলা সাহিত্যের দরবারে তাঁর অনেক দিন থেকেই আসন আছে। নাটক-নভেল, ছেলেদের বই—সব জিনিষই তিনি লিখেছেন। বইয়ের বাজারে তাঁর Best seller বইও আছে। তাঁর লেখার ধরণও সাধারণতঃ এই Best seller নামের তালিকায় প্রতিষ্ঠা নেবার জন্য। 'নিদ্রিত পুরী'র নাম ও তার একটা রূপক অর্থ আছে। তার মানে, বর্ত্তমান বাঙালী-জীবনে অজ্ঞানের নিদ্রা, তমের জড়তা। সেই জড়তা, সেই তমঃ বুঝাবার জন্য যদুবংশ ধ্বংসের কথকতা দিয়ে সুরু করেছেন।

বইয়ের আরম্ভ হ'ল মলিনার জীবনচরিত নিয়ে।

বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা—প্রদ্যোৎ নামে এক কায়স্থ জমিদারপুত্র তাকে ছলে বিয়ে করেন—তার পরে একটী ছেলে হবার পর মলিনাকে ত্যাগ করে গেছেন। দুঃখে 'লেকে' আত্মহত্যার চেষ্টা ও সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক উদ্ধার, পরে সেই সন্ন্যাসীর এক পরিচিতা মহিলার বাড়ীতে Lady Companion-এর কাজের যোগাড় করে দেওয়া।

দ্বিতীয় উপাখ্যান। সুচন্দ্রার পিতা ছিলেন না। প্রচুর অর্থ রেখে অল্প বয়সে মারা যাবার পর সুচন্দ্রা বীরেনকে বিবাহ করে। উপস্থিত বীরেনই সমস্ত সম্পত্তির মালিক—সুচন্দ্রা তাকে সব দান-পত্র করে দিয়েছে। সে এখন সুচন্দ্রাকে অবহেলা ক'রে অন্য এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম সুরু করেছে। সুচন্দ্রা তাও জেনেছে। এরি মধ্যে আবার বীরেন মলিনার সঙ্গেও প্রেমের খেলা খেলবার চেষ্টা করেছে। তার পর সুচন্দ্রার মৃত্যু।

তৃতীয় উপাখ্যান। মৈত্রেয়ী গরীবের মেয়ে, খুব বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'ল। বড় লোক হ'লে কি হবে, খুব বুড়ো। এখন সে বিধবা। কিন্তু বেশ-ভূষা দেখলে বিধবা বলে মনে হয় না। মৈত্রেয়ী ভালোবাসা পায় নি, ভালোবাসেও নি। আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই আছে, কত রকমের লোক তার কাছে আসে।

চতুর্থ উপাখ্যান। অমলা মৈত্রেয়ীর বন্ধু। দার্জ্জিলিঙে দেখা—মলিনা ও মলিনার ছেলে সুকুর সঙ্গে পরিচয়। বনেদী ঘরের মেয়ে—যত্নে মানুষ, দুঃখ-কষ্ট জানে না। ছেলে-পিলে নেই, সুকুর ওপর তার বড় স্নেহ। সুকু তাকে মাসিমা বলে ডাকে। তার স্বামী তড়িৎকে সে মলিনার কথা জানিয়েছে আভাসে। একদিন তার বাড়ীতে তড়িৎ বাবুকে দেখে মলিনার সন্দেহ—তড়িৎ বাবুই তার স্বামী প্রদ্যোৎ। সে বলে শরীর খারাপ হ'ল, অসুস্থ। অমলার বাড়িতে মুখোমুখী সাক্ষাৎ ও মূর্চ্ছা। বাড়িতে এসে ক্রমে অসুখ বাড়ে। একদিন মলিনা মৈত্রেয়ীকে সব কথা জানায় ও কলকাতায় ফেরবার আগের দিন বিকালে তড়িতের সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা হয়। মলিনা তাকে ক্ষমা করে। পরে রাত্রে চিঠি লিখে অমলার ঘরে রেখে আসবার জন্যে বার হ'য়ে—মৃত্যু।

এই হ'ল মোট আখ্যান। 'নিদ্রিত পুরী'র গ্রন্থকার "পুরুষের নির্ম্মমতায় নারী চিরদিন ব্যথা পাইয়াছে ও নিপীড়িত, নিগৃহীত হইয়া নারী চিরদিন আপনাকে আহুতি দিয়া আসিতেছে পুরুষের স্বার্থের অনলে..... আজো তার বিরাম নাই!"—এই কথাই প্রকাশ করেছেন তিনটী নারী-চরিত্র দিয়ে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার যে মহাকাব্যের আভাস দিয়েছেন, পরে তার একটা ভগ্নাংশ মাত্র নিয়ে প্রকাশ করতে গিয়েছেন। মলিনার দুঃখের একটানা স্রোত ভিতরে ফল্গু-নদীর প্রবাহের মত থাকলেও, পাঠকের অন্তরকে ঠিক স্পর্শ করে না। গ্রন্থখানি লিখিত হয়েছে সাধারণ পাঠকের মুখ চেয়ে। কিন্তু সেইটের সঙ্গে নানা অবান্তর কথা, যেমন, উড়িয়ার বেইমানীর কথা, বিলাস চৌধুরীর বই লেখার কথা ইত্যাদি এত পাই যে, তাতে বাঁধনের শিকল থাকে না। আর যেটা পাওয়ার কথা, মলিনার অন্তরতম বেদনার কথা, তা পাই না, আর পাই না মৈত্রেয়ীর অবলম্বনহীন জীবনের ব্যর্থতার পরিচয়। প্রারম্ভে যে Back ground, যে বিরাট ভূমিকা, তাঁর সঙ্গে কোন নিগূঢ় সম্পর্কের পরিচয় নাই। শুধু দুই-চারিটা নর-নারীর সুখ-দুঃখ নিয়ে খেলা। তাও স্থানে স্থানে শুধু চমক দেবার জন্য surprise element আনা হয়েছে। যে বিরাট ভূমিকায় এর সূচনা, সে রস-সৃষ্টি এতে পাই না। প্রবীণ গ্রন্থকারের কাছে, আমরা সৃষ্টি-সাহিত্য পাবারই আশা করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

সরল জ্যোতিষ—জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য—দুই টাকা।

জ্যোতি বাচস্পতি মহাশয় বিখ্যাত জ্যোতিষী। কোষ্ঠীগণনায় সারা বাংলা জোড়া তাঁর খ্যাতি। কোষ্ঠীগণনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিই এ গ্রন্থে নানা

দিক দিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এদেশে যাঁরা কোষ্ঠী তৈরী করেন তাঁরা সাধারণতঃ যে সব ভুল করেন, তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন নানা বিচার-বিতর্কের সাহায্যে। সুতরাং নির্ভুল কোষ্ঠী তৈরীর পক্ষে এ গ্রন্থ যে অনেককে সাহায্য করবে তা বলাই বাহুল্য। এত সহজ ও সরল ভাবে সব জিনিষ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মনে জানার কৌতূহল থাকলে সাধারণ শিক্ষিত লোকও এ গ্রন্থ পড়ে অনেক কিছু শিখ্‌তে পারবেন। জ্যোতিষ-সম্বন্ধে সহজবোধ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ তথ্যপরিপূর্ণ বই বাংলায় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন নিতান্ত অল্প নয়। বইখানি বাংলার সেই অভাব যে দূর করেছে তা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

শ্রীকনক রায়

যুগের বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। দিন দিন বাংলা সাহিত্যে যেরূপ 'রাবিস্' মাল ছাপা হইতেছে, সেই যুগে এইরূপ একখানি প্রয়োজনীয় বই লেখার জন্য লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি খুব ভাল লাগিল। লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীর পরিচয় দাস্ত-বুদ্ধিতে, কেরাণী-গিরির অভিশাপগ্রস্ত জীবনে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বাণিজ্য-কেন্দ্রে হাট্-পাগড়ির ভীড়ের মাঝে রাঙালীর টিকী মিলে না, কিন্তু বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাসাদোপম অফিসে বিজলী-পাখার নীচে হেঁট মুণ্ডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলম চালাইতে বাংলার তরুণের শ্রান্তি আসে না।",

তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আগামীবারে সমাপ্য—(উপন্যাস)—মোহাম্মদ কাসেম প্রণীত। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

লেখকের বাংলা লেখায় চমৎকার দখল আছে, বর্ণনা মিষ্টি, কবিত্বে সমুজ্জ্বল। কিন্তু প্রাদেশিক শব্দ এবং উর্দ্দু কথা এত প্রচুরভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে বুঝিয়া ওঠা সম্ভব হইবে না। ওস্মান নামে একটি যুবক সুফিয়া বলিয়া একটি কুমারীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পরের কথায় সন্দেহ করিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কিশোরীর 'পেছনে রইল স্মৃতিজড়ানো পদচিহ্ন, সুমুখে রইল জীবনের অসমাপ্ত অন্ধকার পথ।' —এই প্লট। ছাপা-বাঁধাই মনোরম।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

হিন্দুত্বের পুনরুত্থান—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

লেখক চিন্তাশীল। তাঁর চিন্তার পরিচয়—এ গ্রন্থ-খানির ছত্রে ছত্রে পাইলাম। শিক্ষায়-দীক্ষায় নানাভাবে হিন্দুর মনে যে-কৃষ্টি দেখা দিয়াছে, তাহাতে এ-কথা সকলেই বুঝিতেছি, আচারের দাস্ত ও ধর্ম্ম এক বস্তু নহে। লেখক ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম কালীঘাটে ছাগ-শিশু বলি দেওয়া নহে, ধর্ম্ম তীর্থক্ষেত্রের প্রাচীন বটের ডালে ছিন্নকেশ-সংযুক্ত লোষ্ট্র ঝুলাইয়া দেওয়া নহে, ধর্ম্ম সত্যই পাঁচ আনা দর্শনী দিয়া বিগ্রহ দর্শন করা নহে।" Rational না হইলে আচারের সেবা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে জীয়াইয়া রাখাও চলিবে না। প্রাচীন আদর্শ কাপট্যে, মিথ্যাচারে, স্বার্থ-প্রয়াসে আজ কলুষে পরিণত। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে এই কাপট্য ও মিথ্যাচারের গ্লানিতে বহু সমাজ রসাতলে গিয়াছে। ধর্ম্ম মরে নাই, মরিতে পারে না। ফ্রান্স, রুশিয়া, সর্ব্বত্র তাহাই ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় সে ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন।

তার উপর লেখক দেখাইয়াছেন, যুগে যুগে ধর্ম্ম-সাধনার আদর্শে রূপান্তর ঘটিয়াছে। ঘটা অনিবার্য্য। এ দেশেও কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ভিন্ন ধর্ম্ম-সাধনার অন্য উপায় নাই—এমন তথ্য একদিন লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু ইহলোকে বাস করিতে গেলে সে-আদর্শ-গ্রহণ অসম্ভব। তাই এ-শতাব্দীর সভ্যতার সংঘর্ষে যুগ-ধর্ম্ম চাহিতেছে,—ইহলোকে বাঁচা—পরাধীন হইয়াও বাঁচা; ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যে ও স্ব-মহিমায় বাঁচা। কামিনী-কাঞ্চনকে বর্জ্জন নয়, স্বীকার করিয়া বাঁচা। এজন্য চাই আত্ম-শোধন; ধর্ম্মানুষ্ঠান; তীর্থস্থান ও সাধনার সংস্কার চাই। মনকে উদার করিতে হইবে এবং ধর্ম্মকে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে আজ মুক্তি দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে উপাসনায় জাতি-বর্ণভেদ চলিবে না; ধর্ম্মানুভূতির ক্ষেত্রে সমষ্টি-সাধনার অবতারণা করিতে হইবে।

লেখক এজন্য যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সত্যই প্রণিধানযোগ্য।

ইতিহাস মানিতে গেলে এ কথা উড়াইয়া দিতে পারি না। ধর্ম্মধ্বজ গোঁড়াদের এ-বইখানি আমরা বিশেষ ভাবে পড়িতে বলি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খাদ্য-কথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য—আট আনা।

আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের পুষ্টি আমাদের খাদ্য-নির্ব্বাচনের উপরেই নির্ভর করে। অথচ এই খাদ্য-নির্ব্বাচনে আমাদের অবহেলার অন্তই নেই। এর ফল যা হয়েছে, বাঙালীর জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের ভিতর দিয়ে আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। এ সম্বন্ধে এত অনবধানতার কারণ প্রধানতঃ খাদ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতা। 'খাদ্য কথা' এই অজ্ঞ-তাই দূর করার সাহায্য করবে আমাদের ভিতর থেকে। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান, খাদ্যের পরিপাক প্রণালী, খাদ্যসমূহের গুণাগুণ, খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ প্রভৃতি খাদ্য-সম্পর্কীয় প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাই আলোচিত হয়েছে এই বইখানিতে। খাদ্য-সম্বন্ধে আমাদের যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে গ্রন্থকার তাও দেখিয়ে দিয়েছেন নানা রকমের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে। পারিবারিক প্রয়োজনের পক্ষে বইখানা চমৎকার হয়েছে। এর ভাষাও বেশ সহজ ও সরল। এত সোজা ও সুলিখিত যে, বাড়ীর মেয়েদের পক্ষেও প'ড়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। বইখানি যে জনসাধারণের কাছে সমাদর পেয়েছে তার প্রমাণ এর দ্বিতীয় সংস্করণ। খাদ্য-সম্বন্ধে আমাদের যে রকমের অজ্ঞতা তাতে এ গ্রন্থ প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকা দরকার। আর সেই জন্যই আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকনক রায়

ঝিকিমিকি—(গল্পের বই)—শ্রীযতীন সাহা প্রণীত। ৫৭-১ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসমর দে ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—দশ আনা।

সর্ব্বসমেত পাঁচটি ছোট গল্প ইহাতে আছে। ছেলেদের কাছে গ্রন্থকারের গল্প বলিবার ভঙ্গি সুন্দর। রুচি ও উপদেশের দিক্ দিয়া সব কয়টি গল্পই ভাল হইয়াছে—তার মধ্যে 'প্রভাত', 'রক্ষা-কবচ' ও 'ঝমরুর অভিমান' আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

প্রত্যেক গল্পের মধ্যে একাধিক এক-বর্ণ চিত্র আছে, ইহা ছাড়া দুইখানি দ্বি-বর্ণ চিত্র বইখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রচ্ছদ-পট চমৎকার হইয়াছে এবং 'ঝিকিমিকি' নাম সার্থক হইয়াছে। এক কথায় বলিতে হয়; এই বইখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরই হইয়াছে।

বাঁধা ও ছাপা ভাল, তবে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় দত্ত



সিংহলে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ

কলোম্বো মিউনিসিপাল কাউন্সিল সেখানকার 'টাউন হলে' বাঙলার কবি-গুরুকে অভিনন্দিত করেছেন। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথকে সানন্দে সিংহলবাসী বণিক সম্প্রদায়ও তাঁদের 'মার্কেণ্টাইল চেম্বারে' বিশেষভাবে সংবর্দ্ধনা করেছেন। সিংহলের 'অবজারভার' পত্রিকা এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা আমরা পাঠক ও পাঠিকাদের অবগতির জন্যে তুলে দিচ্ছি, "সিংহল তার উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে এঁর মতন এত বড় গুরু আর কখন পায় নি।...কবির যে দৃষ্টি সে শুধু তাঁর নিজের দেশের গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে বিরাট অনুশীলন, তাকে সমন্বয় করেছেন এই মহাকবি, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরাও মেনে নিয়েছেন।" কবির 'শাপ-মোচন' নাটিকা সেখানে অভিনীত হয়েছে—সিংহলবাসীরা খুব আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছেন ও আনন্দ পেয়েছেন।

কবি সেখানে কতকগুলি বক্তৃতা দান করেছেন। তার মধ্যে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ' সম্বন্ধে বলেছেন—আমাদের ভারতবর্ষের যে বিশ্ববিদ্যালয়, তাতে সব আছে, নেই কেবল মানুষ। যা এখানে শেখান হয়, তা কেবল ধার করা বিদ্যা। তারা সৃষ্টি করে না, কেবল অনুকরণ করে।...তারা ভুলে যায়, যে শিক্ষক, সে যদি নিজে না শিখে থাকে, অন্যকে শেখায় কি দিয়ে! একটা দীপ আর একটা দীপ জেলে দিতে কি করে পারে, যদি সে নিজে না জ্বলে। যে শিক্ষক কেবল মাত্র পাঠ আউড়ে যায় বার বার, সে শেখাবে কি করে! যেখানে ভিতরে সে আগুন নেই, সেখানে বাইরে থেকে সে আলো দেবে কি করে!...প্রতীচ্যের বিদ্যা আমাদের পেটের খাবারের যোগান দিতে পারে, দূরে থেকে আলো দেওয়ার মতন, কিন্তু আমাদের জীবনে সত্যকে-উপলব্ধি ক'রে আমাদের অনুশীলনের ভিতর দিয়ে জীবনের আসল সত্যকে সমভাবে দেখবার উপায় সে করে দেয় না। সেই জন্যই পশ্চিমী-বিদ্যা ভারতে শুধু পাঠশালার পড়ুয়া গড়ে তুলেছে, অনুশীলন আনে নি...প্রাচ্য যদি পশ্চিমের অনুশীলন ও জীবনযাত্রা নিয়ে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে, তা হলে সে চেষ্টা, সে অনুশীলন হবে আসল নয়, নকল- খাঁটি নয়, জাল।...মনীষী কবি-গুরুর কথাগুলি আমাদের দেশের চিন্তাশীলদের ভেবে দেখা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য।

কবি-গুরু যা বলেছেন, তা সবই আমরা মানি, তবে এইটুকু এ বিষয়ে বলতে চাই যে, নিজের দেশের দিকে তাকান মানে যে নিজের অন্তরের দিকেই তাকান, তা বুঝি। কিন্তু বাইরের জগৎ যেভাবে আমাদের চারিদিকে তার বাইরের শক্তির স্ফুরণ নিয়ে আমাদের চেপে ধরেছে, সেই বাইরের শক্তিকে যদি আমরা তেমনি ভাবে চালনা করতে না পারি, শুধু কি অন্তরের শক্তির দ্বারাই আজকের দিনের এই গতির বেগকে বাধা দিতে পারব কিম্বা নিজেকে রক্ষা করতে পারব? জগতের চলার পথে, গাছ যেমন প্রতি বছরে তার পুরানো পাতা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ নেয়, সবুজ হয়ে ওঠে, তার ভিতরে একই অন্তর-রস্তর প্রেরণা থাকলেও সে নিজেকে রূপে রূপে

বদল করে তারই আব-হাওয়ার অনুরূপ। মানুষ বা মানুষের সমাজ ও দেশ যুগে যুগে তেমনি তারও রূপ বদল করে না কি?

স্যর রমেশ অ্যাণ্টি-টিউবারকিউলোসিস্ এন্‌ডাউমেণ্ট

'দি টিউবারকিউলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসান্ অব্ বেঙ্গল' নামে বাঙলা দেশে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্য বাঙলা দেশ থেকে এই ভয়াবহ রোগ দূর করা। প্রবাদ আছে আমাদের দেশে যে, এ রোগ না কি 'শিবের অসাধ্য'। এই রোগের মূলতঃ উচ্ছেদ করা অথবা এই ব্যাধির প্রকোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য, বিজ্ঞান-সম্মত যত রকম উপায় আছে, তার দ্বারা মানুষের জীবনকে নিরাময় করার শুভ ইচ্ছায়, যে উৎসাহ, যে যত্ন, যে আপ্রাণ চেষ্টা, তার ভিতরই মানুষের মহত্ত্ব পরিস্ফুট। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে আর কিছু বড় কাজ সংসারে নেই, এ কথা কোন সহজ বুদ্ধির লোক নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। 'দি টিউবারকিউলোসিস্ অ্যাসোসিয়েসান্' সেই মহৎ কাজের ভার নিয়েছেন। 'স্যর রমেশ এন্‌ডাউমেণ্ট' এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য বারো হাজার টাকা দান করেছেন।

এই সঙ্ঘের সভাপতি হলেন, আমাদের বাঙলার শাসন-ছত্রপতি মহামান্য স্যর জন এণ্ডার্সন। বিগত মার্চ্চের ২৭-এ তারিখে, এই সঙ্ঘের কাছে তিনি যে উৎসাহ-বাণী পাঠিয়েছিলেন আমরা তার কিয়দংশ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন করছি। প্রতিষ্ঠানের সাধুসঙ্কল্প বিবৃত করে তিনি বলেছেন, "যদি এই অ্যাসোসিয়েসান্ দেশের লোককে শুধু এই কথাটা বুঝাতে পেরে থাকে যে, এ রোগ কি ভয়ানক, দেশের স্বাস্থ্য এই রোগের তাড়নায় কি পরিমাণ নষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে, তা হলেই এ প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ প্রতিষ্ঠান শুধু তা করে নি, তার চেয়ে আরও বড় কাজ করেছে। এর সব চেয়ে বড় কাম্য হ'ল, এই রোগ যাতে আর না হয়, আর সব চেয়ে বড় কাজ হল, এইটে প্রচার করা যে, কি করে এই ভয়াবহ রোগ নিবারণ করা যায়, তার শিক্ষা দেওয়া ও সেই মত ব্যবস্থা করে রোগের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করা। টিউবারকিউলোসিস্‌কে অনেকাংশে বাধা দেওয়া যায়, বন্ধ করা যায়। আর বাঙলার জনসাধারণ, নিজেরা এই প্রতিষ্ঠানকে যদি সাহায্য করেন, তবে তার সুফল ও পুণ্য তাঁরাই অর্জ্জন করবেন। শুধু তাই নয় এ রোগকে চিরদিনের মত দূর করতেও সক্ষম হবেন।"

এই প্রতিষ্ঠানটিকে সফল ও পূর্ণ করতে যে অর্থের প্রয়োজন, তা আমাদেরই সংগ্রহ করতে হবে, যদি সত্যই আমরা বাঁচতে চাই। 'স্যর রমেশ অ্যাণ্টি-টিউবারকিউলোসিস্ এন্‌ডাউমেণ্ট'-এর বারো হাজার টাকা ছাড়া 'রমণীমোহন চ্যাটার্জ্জী মেমোরিয়াল ফাণ্ড' নগদে ৫১৯ টাকা, ১৫ আনা, ১০ পাই দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মতে, এই হল প্রথম দান, আর এই যে অর্থ তার অতি বড় অভাব ছিল। ভবিষ্যতে এমনি আরও টাকা যে এর সাহায্যের জন্য পাওয়া যাবে, এরূপ আশা নিশ্চয়ই করা যায়।

এ বিষয়ে দেশের লোকেরও সকল রকমে সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। যা মানুষের হাতে, মানুষের যত্ন-চেষ্টায় যদি তা সম্পন্ন না হয়—তবে তার জন্য দায়ী মানুষ! আমরা যদি নিজেরা বাঁচতে চাই, তবে সকলের সমবেত চেষ্টা যে এর মধ্যে রাখতেই হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উদয়ন গল্প-প্রতিযোগিতার পুরস্কার

গল্প-প্রতিযোগিতার ফল বার করতে আমাদের দেরী হয়ে গেল। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা প্রতিযোগিতায় যাঁরা অনুগ্রহ করে গল্প দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে মার্জ্জনা চাইছি। এ অপরাধ আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। গল্প-বিচারের ভার আমরা কেবল নিজেদের উপরে

রাখি নি। বাংলার কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের অভিমতও আমরা চেয়েছিলুম। তাঁদের সময় মূল্যবান্, সেই সময়ের উপরে চড়াও ক'রেই জুলুম করেছি, তাগিদ দিয়ে সেই জুলুমের মাত্রা বাড়াতে ভরসা পাই নি। সুতরাং সহৃদয় প্রতিযোগীরা আশা করি আমাদের মার্জ্জনা করবেন।

গল্প-পরীক্ষকদিগের বিচারে খুব উচ্চ শ্রেণীর গল্প এই প্রতিযোগিতার গল্পগুলির ভিতরে একটিও পাওয়া যায় নি। তাঁরা তাই গল্পগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং পুরস্কারকেও সেই অনুপাতেই ভাগ করে দিতে অনুরোধ করেছেন। এই পুরস্কারের জন্য মোট ১০০৲ টাকা ঘোষণা করা হ'য়েছিল—প্রথম পুরস্কার ৫০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫৲ টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ১৫৲ টাকা, ও চতুর্থ পুরস্কার ১০৲ টাকা। তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন—প্রথম পুরস্কার ২৫৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ২০৲ টাকা, তৃতীয় ১৫৲ টাকা, চতুর্থ ১০৲ টাকা এবং বাকি ৩০৲ টাকা, ১০৲ টাকা হিসেবে ৩ জনের ভিতরে ভাগ করে দিলেই গল্পগুলির প্রতি সুবিচার করা হবে। আমাদের নিজের মতও কথাটাতে সায় দিয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস গল্পগুলি পড়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই এতে সায় দেবেন। এই গল্পগুলি শ্রাবণ সংখ্যা থেকে যথাক্রমে 'উদয়নে' প্রকাশিত হবে।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও 'সর্ব্বাণী' উপন্যাস

'উদয়নে' শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'সর্ব্বাণী' উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছিল, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদিগের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি যে, লেখিকার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুদিন 'সর্ব্বাণী' প্রকাশ বন্ধ থাকবেন ভূমিকম্পের সময় তিনি যে ভাবে আঘাত পেয়ে শয্যাগতা হয়ে ছিলেন, তাতে চিকিৎসকদের মতে, তাঁকে এখন কিছুদিন বিশ্রাম না দিলে হয় না, তাঁর শরীর এখনও নিতান্ত অপটু। তিনি সুস্থ হয়ে উঠে, আবার 'সর্ব্বাণী' লেখা আরম্ভ করবেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন ত্বরায় সুস্থ হন ও পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরে পান।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও মেয়র নির্ব্বাচন

কিছুদিন ধ'রে কলিকাতা মেয়র-নির্ব্বাচনের ব্যাপারে এক অপূর্ব্ব গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা শুধু অপেক্ষা করেছিলাম এইজন্যে যে, ভেবেছিলাম, আপনিই এ গোল মিটে যাবে। এখন এর রকম দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। শুধু বিস্ময় নয়, নিজেদের শক্তির প্রতি অনাস্থা আসছে। লজ্জায় মাথা নত হ'য়ে আসছে। এ কি! স্বায়ত্বশাসন, স্বরাজ, আরও অনেক কথাই আমরা বলি। কিন্তু! এই কিন্তু বলতেও কেমন 'কিন্তু' আসছে। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিনি নাহি লাজ'—অথচ সেই দশে মিলে এমন কাজ করছি, যাতে দেশের কাছে ত' মুখ দেখাতে পারি নে, বাইরের জগতের দরবারেও—আর বলতে পারা যায় না। এর জন্যে সরকারকে বাধ্য হয়ে যদি কোন রূঢ় ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে স্বায়ত্ব-শাসন একেবারে চরম কেন পরম হয়ে উঠবে। এ-দিকে চলুক দলাদলি, অভিযান, অভিমান, মন্ত্রণা দান, আর ও-দিকে কর্পোরেশনের কাজ বিনা মেয়রেই চলুক!

যাঁরা এই দলাদলি করছেন, তাঁদের জানা উচিত, কর্পোরেশনের কর্ত্তা আসলে তাঁরা নন, আসল কর্ত্তা যারা খাজনা দেয়। তাদেরও মন বলে পদার্থ আছে, দেহ বলে পদার্থ আছে। এই সামনে বর্ষা, রাস্তা-ঘাটের সব ব্যবস্থা যে বিনা মেয়রেই হবে—তা ত' বেশ বোঝাই যাচ্ছে। মিটমাট করাটা কি এতই অপমানের কথা? সংসারে ঝগড়া করা যদি সত্যের জন্য হয়—সেটা বলেরই পরিচয় বটে, কিন্তু যেখানে শুধু মিথ্যা ভুয়ো স্বার্থের জন্য, সেখানে অন্যের স্বার্থে আঘাত লাগে, ফল তাতে অশুভই হয়ে থাকে।

ভূদেব স্মৃতি-পূজা সভা

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধদিনে গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর চুঁচুড়ার বাড়ীতে স্মৃতি-সভার আয়োজন হয়েছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন রায় রমা প্রসাদ চন্দ বাহাদুর। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই সভায় মনীষী ভূদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সকলে সমবেত হয়েছিলেন। ভূদেববাবু সেকালের দিনে একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর দান আজও আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু। তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যা করে গেছেন, যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁর এই শিক্ষা দান ও চরিত্র গঠনের দিকে ছিল, সে প্রকৃতির মত দুর্লভ প্রকৃতির মানুষ আজ আর আমাদের চোখে পড়ে না। সেদিনের বাঙলার ভূদেব সত্য সত্যই আজকার দিনের গৌরব। আজও আমরা তাঁর স্মৃতিকে সশ্রদ্ধভাবে প্রণাম করি।

ঘোষ ট্র্যাভ্‌লিং ফেলোশিপ্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম একজন মহিলা ছাত্রীকে এই ফেলোশিপ্ দিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন মহিলা এ সম্মান লাভ করতে পারেন নি। এই মহিলার নাম কুমারী শকুন্তলা রাও। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বার এম্-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার ইংরেজীতে আর একবার সংস্কৃতে। সংস্কৃতে তিনি আরও একটি পরীক্ষা দিয়ে উপাধি পেয়েছেন 'বেদতীর্থ'। তিনি এতদিন ডক্টর ডি, আর, ভাণ্ডারকরের অধীনে গবেষণা করছিলেন। আমাদের দেশের একটি মেয়ের এই কৃতিত্ব দেখে আমরা যথার্থই আনন্দিত হয়েছি। এ থেকে আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, মেয়েদের যদি সে ভাবে জ্ঞান-অর্জ্জনের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহ'লে মেয়েরাও তাঁদের শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখাতে পারেন।

সাহিত্যিকের সম্মান

চন্দন নগরের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়কে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নূতন উপাধি দিয়েছেন 'Chevalier de la Legion d' Honneur'—এ সম্মান ফ্রান্সের একটি বিশিষ্ট সম্মান। শেঠ মহাশয় বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী সেবক। বিদ্যার প্রসারের জন্য তিনি অনেক অর্থ দান করেছেন। একজন বিশিষ্ট বাঙালীর এ সম্মান পাওয়া আমাদের বাঙলারই গৌরব। আমরা তাঁকে তাঁর এই সম্মান পাওয়ায় অভিনন্দিত করছি।

কর্পোরেশন ও তার 'মস্‌কিটো ব্রিগেড'

মশা মারতে কর্পোরেশন গোলন্দাজ সৈন্য সাজিয়েছেন। তাঁদের প্রচার কার্য্যের কয়েক পৃষ্ঠা আমরা পেয়েছি। তাতে একটি 'তর্ক-মীমাংসার' কথা আছে। একজন 'তর্ক', অন্যজন 'মীমাংসা'। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। কি কি ধরণের মশা আছে, তাদের ধারা-ধারণ কি, কোন্ জায়গার জলে তারা জন্মায় বেশী, লোনাজলে যারা জন্মায় তাদের প্রকার কি, সবই দেখলাম এবং চেষ্টা করে হয়ত বুঝতেও পারলাম। কিন্তু বারো মাসে খরচ হয়, মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। হিসাব দেখলাম। সেই টাকা যে খরচ হয়, তা বারো লক্ষ লোকের জন্য···গড়ে আধপয়সা করে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে প্রতিমাসে। বুঝলাম আমরা গরীব মশা মারতে কামান দাগতে পারি না। কিন্তু যেটুকু পারি তাই কি সুব্যবস্থায় হয়?

এই 'তর্ক' ও 'মীমাংসার' মধ্যে মীমাংসা 'লুই পাস্তরের' বাক্য উদ্ধৃত করে বলছেন, "যা কিছু বীজাণু-সংক্রান্ত রোগ মানুষের হয়, সে রোগকে দূর করা মানুষের শক্তির মধ্যেই আছে।" তারপর বলছেন, "সাধারণের স্বাস্থ্য-বিষয়ে ব্যবস্থা করা যে বিষয়টা না জানার জন্য শক্ত হয়ে ওঠে, তা নয়, ঠিক ভাবে এর ব্যবহার হয় না বলেই এটা কঠিন বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্যর ম্যালকম্ ওয়াটসনের কথা তুলে বলছেন "মশার সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে মানুষের সঙ্গে লড়াই করা আমি আরও বেশী শক্ত দেখেছি।"

তর্ক-মীমাংসার এই কথা-বার্ত্তার ভিতর থেকে

আমরা যা পেলাম, তাতে এই কথাটা আমাদেরও মনে হয় যে, মশার সঙ্গে লড়াই করা যায় কিন্তু মানুষের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত।

ইণ্ডিয়া ওয়েয়িং স্কেলস্ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার

আমরা এই কোম্পানীর একখণ্ড ক্যালেণ্ডার পেয়েছি। ক্যালেণ্ডারখানি ইংরাজী ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ নিয়ে গঠিত হয়েছে। ক্যালেণ্ডারে একখানি সুন্দর চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া আছে। আমাদের বিশ্বাস যাঁরা এ ক্যালেণ্ডার দেখবেন, তাঁরাই সুখ্যাতি করবেন। আমরা এই স্বদেশী কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

হিন্দুস্থানী বীমা কোম্পানী, লিমিটেড্

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ভারতবাসীরা নিতান্তই দরিদ্র। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর সাধারণতঃ অন্যান্য পরিবারবর্গের যা অবস্থা হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। জীবন বীমা যে সেই দুর্দ্দিনে, সেই অভাবের কঠোর তাড়নার মাঝে দরিদ্রকে কিছু সুযোগ দিয়ে বাঁচবার পথ করে দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে লোকে জীবন বীমা জিনিসটা ঠিক বুঝত না, এখনকার দিনে কতকটা বুঝছে। কিন্তু দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকে, এই জীবন বীমা জিনিসটা বুঝলেও তা কাজে লাগাবার সুযোগ পায় না। তার কারণ ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার হিসাব করে দেখলে বোধ হয় প্রায় শতকরা ৮৫ জনকে মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রই বলা যায়। এই দরিদ্র মধ্যবিত্তদের জন্য এই 'হিন্দুস্থানী বীমা কোম্পানী, লিমিটেড্' অল্প প্রিমিয়ামে অল্প টাকার জীবন বীমার এক নতুন পন্থা বার করেছেন। এই বীমা কোম্পানীটি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে ধনী, দরিদ্র—সকলের কাছে এঁরা সহানুভূতি পেয়েছেন। এই বীমা কোম্পানীতে পলিসি করলে, বীমাকারীর প্রিমিয়াম দিতে কোন অসুবিধা হয় না, Policyও বেশ নিরাপদ ও লাভজনক। এই কোম্পানীর হেড অফিস, লাহোর এবং শাখা অফিস ৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। এই কোম্পানীর মিটান-দাবীর পরিমাণ ১,৪০,০০০৲ টাকার উপর, আর মোট তহবিল ২,৬০,০০০৲ টাকা। 'ভারতবর্ষীয় জীবন বীমা কোম্পানী আইন' অনুসারে এই কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের নিকট ১,৫০,০০০৲ দেড় লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন।

এর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা ডাক্তারী পরীক্ষা না দিয়ে এই কোম্পানীতে জীবন বীমা করতে পারেন। মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটি সত্যই উপকারী। আমরা এই কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার লাহা
৬২, জোড়াবাগান রোড
কলিকাতা



শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন [শিল্পী — অশ্বিনীকুমার রায়



শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন [শিল্পী — অখিনীকুমার রায়

Blank page (s)

শ্রাবণ
১৩৪১

উদয়ন

দ্বিতীয় বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

শক্তির সাধনা

রাজরত্ন শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত এবং এ সম্বন্ধে কোন এক প্রকার বদ্ধমূল ধারণা না থাকার দরুণ শক্তি-সাধনা, শক্তি-পূজা ইত্যাদি লোকের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কেহ বলেন, শক্তি-সাধনাতে সকল প্রকার পাশবিক ব্যাপারের অভিনয় হয়, আবার কেহ বলেন, শক্তি-সাধনা পঞ্চ-মকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধকেরা বেহেড মাতাল হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নানারকম বিভীষিকা দেখিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার কালী, তারা ইত্যাদি স্ত্রী-মূর্ত্তির পূজাকেই শক্তি-সাধনা বলিয়া মনে করেন। অতএব বেশ স্পষ্টই দেখা যায় যে, শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে, শক্তির পূজা বা সাধনা সম্বন্ধে বেশ কাটা-ছাঁটা ধারণা খুব কম লোকেরই আছে।

শক্তি-মতবাদ ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের একটি অপূর্ব্ব দান। এই শক্তি উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, এবং শক্তি হইতেই সমগ্র জগতের প্রাদুর্ভাব। যখন জগতে জড় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, তখন শক্তি ছিল এবং শক্তি হইতেই জড়ের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদে শক্তি বলিতে কোন বিশেষ দেবতা বুঝায় না; শক্তির পূজায় পঞ্চ-মকারেরও প্রয়োজন নাই, পাশবিক ব্যাপারের অভিনয়ও তাহাতে নিষ্ফল। শক্তি-মতবাদ ব্রহ্মবাদ, শূন্যবাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু ইহাতে জড়ের উপর শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শক্তিবাদ বৈদিক দর্শনের বিরোধী তাই বেদের অনুগামিগণ শক্তিবাদ অবলম্বনকারীদের নাস্তিক আখ্যা দিয়াছিলেন। কারণ, বেদে সূর্য্যই জগতের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং তাঁহাতেই প্রলয়। বৈদিক ঋষিরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাহারই উপর আস্থাবান ছিলেন, অনুমান তাঁহাদের বড় প্রিয় ছিল না।

শক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে গেলে একটি শ্লোক মনে পড়ে। এই শ্লোকটি উমানন্দনাথের নিত্যোৎসব নামক পুস্তকে আছে। শ্লোকটি এই—

যস্যাদৃষ্টো নৈব ভূমণ্ডলাংশো
যস্যাদাসো বিদ্যতে ন ক্ষিতীশঃ।

যস্তাজ্ঞাতং নৈব শাস্ত্রং কিমন্যৈঃ

যস্তাকারঃ সা পরা শক্তিরেব ॥

ইহার অর্থ—পরাশক্তি তাঁহাকেই বলা যায় যাঁহার নিকট ভূমণ্ডলের কোন অংশই অগোচর থাকে না; যাঁহার নিকট এমন কোন রাজা নাই যিনি তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করেন না এবং যাঁহার নিকট এমন কোন শাস্ত্রই নাই যাহা তাঁহার অপরিচিত।

অতএব পরাশক্তি বলিতে শুধু সাহেবদের "Power" নহে, তাহা ছাড়াও অনেক কিছু। শক্তি বলিতে যিনি দিব্যচক্ষু, যিনি সমস্ত রাজশক্তির আধার, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের উৎস। তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান এবং তাঁহা হইতেই সমগ্র জগতের উৎপত্তি। এই শক্তি-মতবাদ সাঙ্খ্যদর্শনের দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া আর একটু অগ্রসর হইয়াছে এবং বেদান্তের ব্রহ্মবাদের অতি সন্নিকটে আসিয়াছে। কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে, শক্তিবাদের ভিতর transcendence (তদধিবাদ) ও immanence-এর (তদাত্মবাদ) ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

উপরি উক্ত শক্তিবাদের উপর তন্ত্রের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন কোন বিদ্বান মনে করেন যে, শক্তিবাদ সাঙ্খ্যের দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। সাঙ্খ্যে আছে পুরুষ ও প্রকৃতি, শক্তি ও জড়, আর তন্ত্রে আছে শিব ও শক্তি। কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়, কারণ শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্র নামক একখানি প্রামাণিক তন্ত্র-গ্রন্থে দেখা যায় যে, শিবের উৎপত্তি শক্তি হইতে। বলিতে গেলে শক্তির মানস-পুত্র শিব, অর্থাৎ শক্তি জড়েরও উপরে। শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রের শ্লোকটি নীচে উদ্ধৃত করা হইল—

ত্বং বিলোক্য মহেশানি সৃষ্ট্যুৎপাদন কারণাৎ।

আদিনাথং মানসিকং স্বভর্ত্তারং প্রকল্পয়েৎ ॥

অর্থাৎ, "হে মহেশানি! শক্তি আপনার বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া জগৎ উৎপাদনের নিমিত্ত নিজের মন হইতে আপনার ভর্ত্তা আদিনাথকে নির্ম্মাণ করিলেন।" এখানে আদিনাথ, মহাদেব, শিব, বলিতে জড় বুঝায়, শক্তি ভিন্ন পদার্থ বুঝায়, কোন শ্বেতকায়, সর্প-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমৌলি দেবতা বুঝায় না। তাহা হইলেই দেখা গেল তন্ত্রেরও সিদ্ধান্ত অদ্বৈতের ন্যায়, ইহাতে সাঙ্খ্যের দ্বৈতবাদের নামগন্ধও নাই।

এই শক্তি জগৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত নানাভাবে আপনাকে বিভাগ করিয়া নানারূপ প্রপঞ্চ দেখাইয়া থাকেন। শক্তিই দৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্র জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা ইত্যাদিতে নিহিত হইয়া থাকেন। কাজেই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তটাই শক্তিরই রূপান্তর মাত্র বলিয়া তান্ত্রিকেরা অনুমান করিয়া থাকেন।

মনুষ্যমাত্রেই পরাশক্তি হইতে প্রাপ্ত শক্তিতে শক্তিমান এবং সকলেরই ভিতর পরাশক্তির অংশ বিরাজ করিতেছে। এই মতবাদে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির নানারূপে বিকাশ করিবার পন্থা খুলিয়া দিয়াছে। পরাশক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত শক্তির অংশধারী মানবকে জীবাত্মা বলা হইয়া থাকে এবং পরা-শক্তিকে তন্ত্রে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। পরাশক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর নিহিত শক্তির আকর এবং উৎস। কাজেই জীবাত্মা আর পরমাত্মার ভিতর পার্থক্য বড় বেশী নহে, কেবল জীবাত্মা সসীম পরমাত্মা অসীম এবং অনাদি ও অনন্ত। তন্ত্রের মতে সাধনাদি দ্বারা জীবাত্মাও অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব লাভ করিতে পারে এবং তাহাকেই মোক্ষ বলে। এই মোক্ষলাভ হইলে জীবাত্মা পরমাত্মায় সংযুক্ত হইয়া তাহাতেই লীন হন। তন্ত্র-শাস্ত্র মতে যোগাদি ক্রিয়া দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা এবং নানাপ্রকার কঠিন সাধনাদি দ্বারা জীবাত্মা এইরূপে আপনাকে বন্ধন মুক্ত করিতে পারে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতেও বিধান একই রকমের। কিন্তু বৌদ্ধমতে নামকরণগুলি বিভিন্ন। বৌদ্ধতন্ত্রে শক্তি বা পরাশক্তির স্থলে দেখিতে পাই শূন্য। সে শূন্য বলিতে শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ—এই তিনের সমষ্টি বুঝায়। এই শূন্য হইতেই সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের

উৎপত্তি এবং সকলই অবশেষে শূন্যেই ফিরিয়া আসে। এখানে জীবাত্মা শব্দ দেখা যায় না, তাহার বদলে দেখি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ যিনি বোধিলাভ করিবেন। এই বোধিলাভ করাও যা হিন্দুদিগের মোক্ষলাভ করাও তাই। মোক্ষলাভ করিতে হইলে তন্ত্রোক্ত মার্গ অনুসরণ করিয়া নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে মানসিক উন্নতি করিয়া সিদ্ধ হইতে হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে শূন্যকে দেবীরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যখন বোধিসত্ত্ব শূন্যে আরোহণ করেন তখন নৈরাত্মা দেবীর সহিত সংযুক্ত হন এবং যেমন লবণ ও জল একত্র মিশিয়া জলই হইয়া যায় সেইরূপ তিনি শূন্যে মিশিয়া যান। ইহা হইতে স্বতঃই প্রতীতি হয় যে, বোধিসত্ত্ব ও নৈরাত্মার মধ্যে যে পার্থক্য বা দ্বৈতভাব বিদ্যমান তাহা প্রকৃত নহে, কেবল মায়াময় এবং যখন মোক্ষলাভ হয় তখন এই দ্বৈতভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিধানগুলি যাহাতে মানস-শক্তির বিকাশ এবং অভ্যুন্নতি ঘটিতে পারে, তাহারই জন্য রচিত হইয়াছে। তন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি মুখ্যতঃ মোক্ষলাভের পন্থারূপে পরিকল্পিত হইলেও সকলের পক্ষে এক জন্মে অত উচ্চে উঠা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না, কিন্তু দেখা গিয়াছে শাস্ত্রোক্ত বিধানে ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনেকে অনেক প্রকার ক্ষমতা লাভে সমর্থ হইতেন। এই ক্ষমতাগুলিকে সিদ্ধি বলিত, যিনি সিদ্ধিলাভ করিতেন তাঁহাকে সিদ্ধ বলা হইত এবং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ হইত তাহাকে সাধনা বলিত। যোগসূত্রে অণিমা-লঘিমাদি অষ্ট-প্রকারের সিদ্ধির বর্ণনা আছে। পরবর্ত্তী শাস্ত্রে ২৪ এমন কি, ৩৪ প্রকারের সিদ্ধির বিবরণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারই পক্ষে এই সকল ক্ষমতা প্রদর্শন করা সম্ভব, অপরের পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব। তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান করিতে করিতে কেহ এক, কেহ বা একাধিক সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। বাস্তবিক বলিতে কি, তন্ত্রের সিদ্ধান্তই এই যে, যাহা যাহা জড়জগতের ভিতর দিয়া করা সম্ভব সে সমস্তই বিনা আয়াসে, বিনা ক্লেশে কেবল মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশের দ্বারাই সম্ভবপর হইতে পারে।

ধরুন, আজকালকার দিনে কাহারও অসুখ হইল। তাহাকে সারাইবার জন্য ডাক্তার আসিল, ঔষধ আসিল এবং ক্রমে রোগী আরোগ্যলাভ করিল। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে এ সবের কিছুই দরকার নাই, তিনি অসুখ সারাইবেন হয় একবার রোগীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কিম্বা তাহাকে একবার মাত্র স্পর্শ করিয়া, অথবা দূর হইতে কোন মন্ত্রপাঠ করিয়া, অথবা অন্য কোনরূপ সামান্য অনুষ্ঠান করিয়া। যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহারা মৃতানয়ন, পুনরুজ্জীবন, প্রাণাকর্ষণ ইত্যাদি বিস্ময়কর ব্যাপারেরও অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। দূর-শ্রবণ, দূর-দৃষ্টি ইত্যাদিও তাঁহাদের ক্ষমতার মধ্যে পরিগণিত হয়। নানারকমের সিদ্ধির মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ এখানে করা হইল এবং যে মহাপুরুষ যোগাদি সাধনা দ্বারা একাধিক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তিনিই সিদ্ধনামে পরিগণিত হন। শুনা যায়, পাল-রাজত্বকালে চৌরাশীজন সিদ্ধ পুরুষ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তন্ত্রের চক্ষে শরীরের ভিতরই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জগতের ও শরীরের ব্যবধান ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে। ক্রমে জগতের সমস্ত শক্তির বিকাশ, শরীরের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই শক্তির ক্রমবিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে, তাহাই যোগীরা আবিষ্কার করিয়া মানবের কল্যাণার্থে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া যতদূর দেখা যায়, যোগ এবং হঠযোগের উপরই তন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত এবং এই উভয় প্রকার যোগই মানসিক শক্তির বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা শরীরস্থ কুণ্ডলিনী

শক্তি জাগ্রত হইয়া থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ ও অপরাপর তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। যোগ ভাল করিয়া অভ্যাস করিলে ধ্যানে বসিলেই একপ্রকার নিদ্রাবস্থা অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাকেই গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রাবস্থা বা সুষুপ্তি বলা হয়। এই অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ ঘটিয়া থাকে এবং যতক্ষণ সুষুপ্তি থাকে ততক্ষণই সাধক পরমানন্দ লাভ করিতে থাকে এবং তাহার শরীরে ও মনে শক্তির সঞ্চার হইতে থাকে। এই সুষুপ্তি দ্বারা পরমাত্মা বা পরাশক্তি হইতে শক্তি আকর্ষণ করিয়া সাধক আপনাকে শক্তিমান করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ যেমন যেমন এই শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমন তেমন তিনি এক বা একাধিক সিদ্ধির অধিকারী হইতে থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। পরাশক্তি সকল শক্তির আধার ও উৎস এবং তাহা হইতে শক্তিসঞ্চয় করা অসম্ভব নয়, যদি এই শক্তি আকর্ষণ করিবার প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জানা থাকে। সংক্ষেপে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, পরাশক্তি যেন একটি বিরাট বেতার প্রেরক (Radio Transmitter) আর যোগী যেন একটি ক্ষুদ্র বেতার গ্রাহক (Receiving Station)।

এই শক্তিলাভের ব্যাপারে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। কারণ জড় ও শক্তির মধ্যে সকলকেই শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হয়। যখন মানুষ মরে তখন তাহার জড়দেহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তাহার মুখ, চোখ, নাক, কাণ সবই বজায় থাকে কিন্তু একটা কিছু তাহার মধ্য হইতে চলিয়া যায় যাহা দেহকে একেবারে জড় করিয়া ফেলে। সেই একটা কিছুকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে মাপা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু যতক্ষণ তাহার অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ দেহের সমস্ত যন্ত্র ঠিক নিয়মিত-রূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সেই একটা কিছুকে যে কোন নামে অভিহিত করিতে পারেন, তাহাকে শক্তি বলিতে পারেন অথবা আত্মা বা জীবনীশক্তি বলিতে পারেন। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই জড় ও অ-জড়ের মধ্যে অ-জড়েরই প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। ভারতীয় ঋষিরা সভ্য ও জ্ঞানের সাধনা চিরদিনই করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা যেখানেই অখণ্ড সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা জগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই জড়রূপ মনুষ্যদেহের সাধনা করিতে পরামর্শ না দিয়া তাঁহারা অশরীরী আত্মার সাধনার দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। দেখা যায়, যাঁহারা শরীর-চর্চ্চা ও নিয়মিত ব্যায়ামাদি করেন, তাঁহারাও অপর মনুষ্যের সাধ্যাতীত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। একা রামমূর্ত্তি মোটর থামাইতে পারেন, লোহার মোটা চেন ছিঁড়িতে পারেন, বুকের উপর দিয়া হাতী চালাইতে পারেন। অপরে কেহ এরূপ পারে কি? যদি অ-জড় অপেক্ষা নিকৃষ্ট জড়ের পক্ষেই এরূপ ইন্দ্রজাল সম্ভব হয় তবে আত্ম-বলের বৃদ্ধি হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর সিদ্ধি প্রাপ্তিই বা অসম্ভব কেন হইবে?

মানসিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য তন্ত্রে আর এক প্রকার পদ্ধতি দেখিতে পাই। ইহা মন্ত্র-পদ্ধতি অর্থাৎ মন্ত্রের উচ্চারণ বা মনে মনে জপ করা। এই মন্ত্র কয়েকটি শব্দের সমষ্টি এবং তন্ত্রের বিধান অনুসারে ইহার পুরশ্চরণ করিতে হয়। যতবার পড়িলে সাফল্য বা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহারই নাম পুরশ্চরণ। আজ যদি বলা হয় মন্ত্ররূপ শব্দ-সমষ্টির উচ্চারণে ফল ফলে, তাহা হইলে বিলাতী শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা হয়ত মারিতেই আসিবেন। যদি তাহা না-ই করেন তাহা হইলেও কথাটা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু প্রাচীন-পন্থী কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, মন্ত্রের ভিতর অন্তর্নিহিত শক্তি আছে এবং সে শক্তি লোকের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা যায়। আজিও চণ্ডীপাঠ চলিতেছে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন চলিতেছে এবং এগুলি মন্ত্র-শাস্ত্রেরই বিষয়ীভূত।

শব্দের শক্তি নাই—এ কথা যিনি বলেন, তিনি ভ্রান্ত। রাজার মুখ হইতে শব্দ উচ্চারণ হইতে-না-হইতেই তাহা পালন করিতে হয়। হঠাৎ চাকুরি যাইবার সংবাদে লোকে বিহ্বল হয়, মৃত্যুসংবাদে কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হয়। শক্তিসম্পন্ন বক্তা তাঁহার ওজস্বিনী বাণী শুনাইয়া জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন। তাহা হইলে কেন না বিশ্বাস করিব যে, শব্দের আজ্ঞা পালন করাইবার, মূর্চ্ছা আনাইবার এবং লোক ক্ষেপাইবার ক্ষমতা আছে। ইংরাজ রাজত্বে শব্দের শক্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পূর্ব্বে তাহা কোন কালে দেখা যায় নাই। কোথায় দিল্লীতে দুইটি নূতন কথা দিয়া আইন গড়া হইল এবং তাহাতে ৩৫ কোটি লোক বাঁধা পড়িয়া গেল এবং সে আইন জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ভঙ্গ করিলেই যে কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ইহাও শব্দের শক্তি ছাড়া আর কি! যাঁহারা পূর্ব্বে শব্দের শক্তি মানিতেন না তাঁহাদেরও এ যুগে দেখিয়া শুনিয়া উহা না মানিয়া উপায় নাই।

মন্ত্র আর কিছুই নহে, কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই কতকগুলি তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ সূক্ষ্মদৃষ্টির বলেই হউক, আর যোগবলেই হউক এবং নানারকম প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারাই হউক, দেখিয়াছিলেন যে, মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ দ্বারা ভাল কিম্বা মন্দ ফল ফলিয়া থাকে। তবে এই ফল ফলিতে মন্ত্র বহুবার উচ্চারণ করিতে বা জপ করিতে হয়। বেতার তরঙ্গ-প্রবাহ যেমন বেতার-যন্ত্রের ভিতর দিয়া শ্রোতাদের সুখ ও দুঃখ উভয়ই দিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ মন্ত্র-সৃষ্ট তরঙ্গ-প্রবাহও ভাল ও মন্দ ফল দিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া গবেষণার ফলে তান্ত্রিক যোগিগণ কতকগুলি শব্দ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার ফল কি হয়, আর কি করিলে হয়, তাহা লোকের কল্যাণার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এক একটি অক্ষরের মন্ত্রকে বীজমন্ত্র বলে এবং অক্ষরের সমষ্টিকে হৃদয়মন্ত্র, পূজামন্ত্র, মালামন্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মানসিক শক্তিরও বৃদ্ধি হয় এবং জাপক সিদ্ধিলাভেও সমর্থ হয়। যে সকল মন্ত্র লক্ষবার জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় সে গুলিকে সিদ্ধমন্ত্র বলা হয়। মন্ত্র জপিবার সময় সাবধানে জপিতে হয়, চিত্ত অক্ষরগত করিতে হয় এবং নাতি দ্রুতভাবে উচ্চারণ করিতে হয়।

এই প্রবন্ধে শক্তির সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তাধারা একত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের পুরাতন শাস্ত্রে শক্তিবাদ একটি অপূর্ব্ব দান। মানবের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য শক্তিবাদ যে কত উপায় দেখাইয়া দিয়াছে তাহা লেখনীর অগোচর। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সকলকেই মন্ত্রজপ কিম্বা যোগ-যাগ করিবার পরামর্শ দিতেছি না, কারণ এই মার্গ অনুসরণ করিবার অধিকার থাকা চাই, মজা করিবার জন্য তান্ত্রিক মার্গ ঠিক উপযুক্ত নহে। ইহার জন্য চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আজীবন সাধনা, শুদ্ধতম অন্তঃকরণ, অসীম করুণা এবং নিখুঁত ও বলিষ্ঠ শরীর। কারণ হঠযোগে ও যোগ শিখিবার পূর্ব্বে শরীরটার কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই এবং তাহা ঠিক রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যরূপ ইন্ধন চাই। অপর কাহারও এই মার্গে অধিকার নাই, তাই আজ আর মন্ত্রে তেমন শক্তি নাই, কাজেই লোকের আর বিশ্বাসও নাই। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত রোগজর্জ্জরিত বাঙ্গালীর পক্ষে এ মার্গ অনুসরণ করা ঝিড়ম্বনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি কাহাকেও শক্তির সাধনা করিতে হয়, তাহাকে এখন ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর আশ্রমে পাঠাইতে হইবে, নহিলে অধুনা অজ্ঞাত শক্তির সাধনা অজ্ঞাতই রহিয়া যাইবে। আমার বিশ্বাস, তন্ত্রশাস্ত্র বা শক্তি-বিষয়ক জ্ঞানের চর্চ্চা আজকাল বেশী হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ অনেক ভণ্ড, তন্ত্র, শক্তি ও যোগের নামে বহুলোককে ঠকাইতেছে এবং বহুলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৭

রবীন মাষ্টার মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো, তার সঙ্গে অদৃষ্টের বিষম শত্রুতার কথা। এ শুধু তার দুর্ভাগ্যের ফের। নইলে এবার সে ক্ষেত থেকে যা ফসল ঘরে আনতে পারতো জন্মে সে কখনও তা পায় নি।

অমনি তার দৃষ্টি ফিরে গেল তার সমস্ত অতীত জীবনের দিকে। জীবনের সবগুলি ঘটনা একটি একটি ক'রে সে আলোচনা ক'রে গেল। অনেক বৈচিত্র্যময় সে জীবন—কেন না সে অনেক কিছু কল্পনা ক'রে অনেক রকম উৎসাহে অনেক কাজ আরম্ভ ক'রেছে—আংশিক সফলতাও সে অনেক পেয়েছে—কিন্তু পরিণাম তার বৈচিত্র্যহীন। সব চেষ্টা, সব সাধনার সীমায় গিয়ে সেই একই ফল—পরাভব! এমন নিয়ম ক'রে নির্য্যাতন অদৃষ্টের হাতে কেউ পেয়েছে কি কোনও দিন?

যে দিন ক্ষেতের ধান মাড়াই হ'য়ে জমা হ'চ্ছিল। গেল বছর বরগাদারও যা দিয়েছিল, এ তার চেয়ে অনেক কম। অন্য ফসল যা হ'য়েছিল সব নষ্ট হ'য়ে গেছে। শূয়োরের খাবার পর আখের যা অবশিষ্ট ছিল, ছেলে-পিলেরা চিবিয়েই তা' মেরে দিয়েছে।

সেই অপ্রচুর ধানের সমষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল রবীন মাষ্টার। তার সমস্ত জীবনের পুঞ্জীভূত নিষ্ফলতার ভারে যখন চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে তার হৃদয়, তখন নিস্তারিণী মুখটা বেঁকিয়ে ব'ললে, "আহা! বাপ বেটায় চাষ ক'রে ধান এনেছেন দেখ! ম'রে যাই আর কি!"

উঠোন ঝাঁট দিয়ে মাতঙ্গী ধানগুলো জড়ো ক'রে ধামায় ধামায় ভ'রে ঘরে নিচ্ছিল। নিস্তারিণী তার কাছে ছেলে কোলে ক'রে তদ্বির ক'রছিল। কোথায় কোন্ কোণায় দু'চার দানা ধান হয় তো প'ড়েছিল, মাতঙ্গীর চোখে পড়ে নি তখনও, সেই কটা কুড়িয়ে এনে ধামায় ফেলে সে মাতঙ্গীকে শাসাচ্ছিল, "ভাল ক'রে কুড়িয়ে নে ঠাকুরঝি—ধান লক্ষ্মী! একদানা যদি নষ্ট হয় তো লক্ষ্মী রাগ ক'রবেন! এমনি তো ঘরে ব'সে আছেন জ্যান্ত অলক্ষ্মী!"—ব'লে স্বামীর দিকে চাইলে।

নিস্তারিণীর কথাগুলো আজ যেন রবীন মাষ্টারের বুকে বিষের ছুরির মত বিঁধছিল। অনেক স'য়েছে সে, কিন্তু আজ যেন আর সইতে পারে না। ক্রোধ—যা জীবনে কোনও দিন সে দেখায় নি, ভাল ক'রে অন্তরেও অনুভব করে নি কোনও দিন, সেই ক্রোধ যেন গোখ্‌রো সাপের মত মনের মাঝে গর্জ্জন ক'রে উঠলো।

রণু বাড়ী নেই। নইলে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতো। সে মায়ের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারতো যে, তার ঘরে আজ যে ধান উঠেছে অন্য চাষীর ঘরে তার অর্দ্ধেকও ওঠে নি। কিন্তু সে নেই, কাজেই নিস্তারিণীকে জবাব দেবার বা বাধা দেবার কেউ নেই। তুচ্ছ বাস্তব অবস্থার খাতিরে নিস্তারিণী কথার ঝাঁঝটা কমাবার কোনও দরকার মনে ক'রলে না।

সে ব'লে গেল, "ঐ যে বলে,—'যার কর্ম্ম তারে সাজে' ভদ্রলোকের ছেলে তাদের না কি সাজে চাষ করা! আমি আগেই জানি এই হবে।"

রবীন মাষ্টার এবারে এমন একটা কাণ্ড ক'রলো

জীবনে যা কোন দিন কল্পনাও সে ক'রতে পারে নি। সে উঠে চোখ রাঙিয়ে নিস্তারিণীকে ব'ললে, "তুমি জান তোমার শুষ্টির মাথা। লক্ষ্মীছাড়ী!"—ব'লে দাঁত কড়্-মড়্ ক'রতে ক'রতে সে ঢুকলো গিয়ে তার বাইরের ঘরে।

নিস্তারিণী স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে এতই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যে, কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই ব'লতে পারলে না, রাগে কট্ মট্ ক'রে সে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে রইলো শুধু। তার পর আরম্ভ হ'ল তর্জ্জন, গর্জ্জন, বর্ষণ এবং শেষে বন্যা।

রবীন মাষ্টার তখন বাইরের ঘরে। হাতের সামনে যে বইটা সে পেলে সেইটা নিয়ে তার উপর চোখ বুলোতে লাগলো। কিছুক্ষণ মন বসাতে পারলে না। কিন্তু একটু পরেই তার মনটা একেবারে ডুবে গেল সে বইয়ে। বইখানা Westermarck-এর History of Marriage — পুরানো দোকানে সস্তায় পেয়ে সে কিনেছিলো। আরুন্টা জাতির অদ্ভুত যৌন সম্মিলন পদ্ধতির কথা প'ড়ে সে প'ড়তেই লাগলো। বাইরের জগৎ সে একেবারে এতটা ভুলে গেল যে, বাড়ীর ভিতর যে বজ্রনির্ঘোষ ও ঝটিকার সঙ্গে বর্ষণ হ'চ্ছিল তা' তার কানেই গেল না।

এ বই তার পড়া ছিল। এমন সম্পদ তার ছিল না যাতে সে বই কিনে সে না প'ড়ে সাজিয়ে বা জমিয়ে রাখতে পারে। যা সে কিনতো তা' সে আদ্যোপান্ত প'ড়তো, আর যা কিনতে পারতো না, তা' সে নানা-রকম ফিকির ক'রে প'ড়ে আসতো।

আরুন্টা জাতির কথা প'ড়তে প'ড়তে তার মনে এল Hobhouse-এর Evolution of Morals-এর কথা। সে বইখানা সে কিনতে পারে নি, ক'লকাতায় ব'সে প'ড়ে এসেছিল, আর আদ্যোপান্ত নোট ক'রে এনেছিল। আর একখানা বই সে কিনেছিল, তার মলাট ছিল না, লেখকের নামও সে জানে না, সে বই খানার নাম Evolution of Law।

Westermarck-এর বইয়ের সেই জায়গাটা পড়া হ'য়ে গেলে সে খুঁজে বের ক'রলে শেষোক্ত বইখানা, আর তার রাশি রাশি নোটের জীর্ণ খাতা ঘেঁটে বের ক'রলে, Hobhouse-এর যে নেমট ক'রেছিল সেই খাতা খানা। নিবিষ্টমনে সে প'ড়লে। বিবাহ অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও তার পরিণতির ক্রম সম্বন্ধে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো।

তার মনে একটা প্রশ্ন উঠলো যে, বিবাহের এই ইতিহাসের মধ্যে প্রেম—ভালবাসা, যা' নিয়ে কবিরা এত কাব্য লিখে গেছেন, যা' ছাড়া উপন্যাস, ব'লতে গেলে হয়ই না, সেই ভালবাসার স্থান কতটুকু?

আরুন্টাদের ভিতর একটি পুরুষ ও একটি নারীর বিবাহ হয় না, এক গোত্রের এক পুরুষের সব ছেলের বিয়ে হয়—আর এক গোত্রের এক পুরুষের সব মেয়ের সঙ্গে। তারপর এই দুই দলের মধ্যে সঙ্গম হয়—যার যেমন খুসী। রবীনের মনে হ'ল, এ ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারী তাদের সঙ্গিনী বা সাথী বেছে নেয় পছন্দ অনুসারে, যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গে যায়। এদের ভিতর আর এমনি অসভ্য জাতের ভিতর হয় তো যৌনসঙ্গমে ভালবাসার একটা বড় স্থান হ'তে পারে এই ব্যবস্থায়।

কিন্তু এই আরুন্টা জাতি—এদের ভিতরও যৌন মিলনে ভালবাসার পথ একেবারে নিরঙ্কুশ নয়। Tabu দিয়ে বারণ করা আছে অনেক কিছু—সেই tabu-র গণ্ডির ভিতরে ভালবাসার অধিকার।

তারপর অন্য নানা সভ্য ও অসভ্য জাতির বিয়ের পদ্ধতির কথা স্মরণ ক'রে দেখলে, যেন যতই মানুষের সমাজ সভ্য হ'চ্ছে ততই এই tabu-র গণ্ডি শক্ত আর অল্প পরিসর হ'য়ে যাচ্ছে—বিয়ের ভিতর ভালবাসার যে একটা স্থান আছে সেইটাই যেন চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। সব জাতের বিয়ের আইন প'ড়ে দেখ, আচার অনুশীলন ক'রে দেখ, দেখবে, তাতে শুধু বিরুদ্ধ সম্বন্ধের কথা, অনুষ্ঠান বাহুল্যের কথা, বাঁধাবাঁধির কথা, স্বত্ব ও অধিকারের কথা। সেই আদিম tabu, সমাজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন ভালবাসার গলা টিপে

মেরেছে। ভালবাসা চাপা পড়ে মারা গেছে নিয়মের ভারে—বিয়েটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শুধু নিয়মের বন্ধন, শাসনের পরিনিষ্ঠা। নিয়ম অনুষ্ঠান—যা' আদিম tabu-র অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র—যার লক্ষ্য হ'চ্ছে সমাজ বাঁধবার, ছেলে-পিলে মানুষ করবার একটা সুব্যবস্থা করা—তারই নাম বিবাহ। সমাজের খাতিরে ব্যক্তিকে বাঁধবার একটা বিশিষ্ট প্রণালী মাত্র এটা—এর ভিতর ভালবাসার ঠাঁই নেই—শুধু জবরদস্তি ক'রে মাঝে মাঝে ভালবাসা এসে নিয়মের এ দুর্গের ভিতর হানা দিয়ে যায়—চোখ রাঙিয়ে নিয়ম তার অনধিকার প্রবেশকে শাসন করে।

সমাজ ভেদে, অবস্থা ভেদে এ প্রণালী হ'য়েছে বিচিত্র, কিন্তু সর্ব্বত্রই—অন্ততঃ সভ্য সমাজে—বিবাহ হ'চ্ছে নিয়মের এই বন্ধন। রবীনের মনে হ'ল সমাজের জন্য এসবের দরকার যাই থাক, ব্যক্তিকে এতে বাঁধেই শুধু, মুক্তি দেয় না—অভ্যুদয় আনে না প্রাণে, যা' আনতে পারে শুধু ভালবাসায়!

অভ্যুদয় যে আনে ভালবাসায়, তার বাঁধনে প'ড়ে আত্মা যে কেমন একটা মুক্তি ও স্ফূর্ত্তির আস্বাদ পায় সে কথা রবীন মাষ্টার জানতো। একদিন সে জেনেছিল। অনেক দিনের কথা সে—তিরিশ বৎসরের উপর।

রবীন তখন ঢাকায় বি-এ পড়ে। একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে থেকে সে প'ড়তো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে সে তাঁর মেয়ে তড়িতের শিক্ষার ভার নিয়েছিল। তিন বছর সে পড়িয়েছিল তড়িৎকে—তারপর সে চ'লে এলো। তড়িৎ তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে।

তড়িৎ দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু রবীনের মনে হ'ত উর্ব্বশীর রূপও তার কাছে হার মেনে যায়। এমন মিষ্টি স্বভাব তার, এমন মধুর কণ্ঠ—আর তার চোখের দৃষ্টি—এত মাধুরী তাতে ছিল যে, এত দিনকার মরচে পড়া তার স্মৃতি মনে উঠে রবীনের প্রৌঢ় হৃদয় চঞ্চল ক'রে দিলে।

তড়িৎকে সে ভাল বেসেছিল। তড়িৎ তাকে ভাল বেসেছিল। ভালবাসার কথা কোন দিনও কয় নি তারা একটিও, তবু তারা পরস্পরকে ভালবাসতো, আর দু'জনেই জানতো যে, এ ওকে ভালবাসে।

সেই দিনকার সেই স্মৃতি আজ ভেসে উঠলো রবীনের মনে। মনে হ'ল তার কি অপূর্ব্ব উল্লাস, কি অভ্যুদয় হ'য়েছিল তার মনে সেই প্রেমে! নিস্তারিণীর সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যের নিগড়-বন্ধনের পাশে সেই প্রেমের স্মৃতি তার চিত্তে আরও গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠলো।

এই অভ্যুদয়, এই উল্লাস, এই মুক্তির আস্বাদ যা রবীন মাষ্টার পেয়েছিল একদিন, আজ তার মনে হ'ল যেন সভ্যসমাজ বিবাহের নিগড়-বেঁধে মানুষকে তা' থেকে বঞ্চিত ক'রেছে।

ভাবতে ভাবতে, আজ অনেক দিন পরে—প্রায় দশ বৎসর পরে, সে তার একটা তোরঙ্গ খুলে বের ক'রলে একটা পোটলা। একে একে তার শত আবরণ উন্মোচন ক'রে ক্রমে তার ভিতর থেকে বের হ'লো, এক তাড়া চিঠি—তড়িতের চিঠি।

ঢাকা থেকে সে চ'লে আসবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তড়িৎ তার কাছে চিঠি লিখেছিল, রবীন মাষ্টারও তার রীতিমত জবাব দিয়েছিল। লম্বা লম্বা সে চিঠি—তুচ্ছ ও মহান বহু বিবরণে ভরা। কত কথাই তড়িৎ তাকে জানিয়েছে, বাড়ীর নিতান্ত ছোট-খাট খবর,—তার আদরের বেড়ালের ক'টি ছানা হ'য়েছে, তার কোন্‌টি কেমন, এমনি সব ছোট কথা থেকে তার ভিতর জীবনের বড় বড় সমস্যার অনেক আলোচনা আছে। চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে এমন একটা প্রেম যাতে ক'রে একজন আর একজনের এত আপনার হ'য়ে যায় যে, জীবনের অতি তুচ্ছ কথাও তার কাছে ব'লতে সাধ যায়। কিন্তু স্পষ্ট কথায় প্রেমের প্রকাশের ছিটে-ফোঁটাও তাতে নেই।

সেই চিঠির ভিতর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হ'য়েছে তড়িতের সাত বছরের সমস্ত জীবনের ইতিহাস, অন্তরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সেই গুলি রবীন

খুলে প'ড়তে লাগলো। তড়িৎ কবে ম্যাট্রিক দিলে, কবে সে আই-এ পাশ ক'রলে, কবে বি-এ পাশ ক'রলে, সে কথা সে প'ড়লো।

বি-এ পাশ ক'রবার পর সে একখানা চিঠি লিখেছিল, সেখানা প'ড়তে গিয়ে রবীনের চোখ ঝাপসা হ'য়ে এলো। তড়িৎ লিখেছে—

"আপনি কি রাগ ক'রবেন এ চিঠি পেয়ে? আপনার পায়ে পড়ি আমাকে যেন ভুল বুঝবেন না। আমি বি-এ পাশ ক'রেছি, এটা স্পর্দ্ধা ক'রে আপনাকে জানাচ্ছি না। জানাচ্ছি এই আশায় যে, এ শুনে আপনার আহ্লাদ হবে। আর কেউ জানুক বা না জানুক, আমি জানি আর আপনিও জানেন যে, আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে শিক্ষা না পেলে আমার বি-এ পাশ ক'রবার শক্তি হ'ত না। তাই এ খবরটা আপনাকে আনন্দ ক'রে জানাচ্ছি, আশা করি আপনিও আনন্দ লাভ ক'রবেন।

* * * *

"মা-বাবার একান্ত ইচ্ছে যে, আমি বিয়ে করি। আপনি কি বলেন? কি হাসির কথা দেখুন, আমি জিজ্ঞেস ক'রছি এমন ভাবে যেন আমার বিয়ের সব ঠিকই আছে, কেবল আপনার মতের অপেক্ষা! কিন্তু আসলে কিছুই নেই। যিনি আমার পাণিগ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য ক'রবেন সেই পুরুষ-পুঙ্গবের দেখা আমি এখনও পাই নি কিম্বা হয় তো পেয়েছি—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। বলুন তো পেয়েছি কি না? সুতরাং এ প্রশ্নটা নিতান্ত বাজে—সম্পূর্ণ academic। বিয়ে আমার হবে কি না কোনও দিন জানি না। কিন্তু এ ঠিক যে, এমন কাউকে আমি বিয়ে ক'রতে রাজী হব না, যাকে পেয়ে আমার জীবন আমি ধন্য মনে না ক'রবো। আপনি তো জানেন আমার মনের সব খবর, বলুন তো কে বা কেমন সে লোক, যাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হবে?

"ভাল কথা, আপনি কি বিয়ে ক'রেছেন? ক'রে থাকলে কোন্ ভাগ্যবতীকে? তাঁর ফটো একটা পাঠিয়ে দেবেন।"

এ চিঠি প'ড়ে তখনি রবীনের মনে হ'য়েছিল যে, তড়িৎ এর উত্তরে আশা ক'রেছিল রবীনের কাছ থেকে একটা বিবাহের প্রস্তাব। রবীন তখন স্কুল নিয়ে ভারি ব্যস্ত, তার চাল-চুলোর কোনও ঠিকানা নেই, বিয়ের কথা সে ভাবতেই পারে না। তা ছাড়া তড়িৎ বি-এ পাশ ক'রেছে, সে বি-এ ফেল। কি সাহসে সে বিয়ে ক'রতে চাইবে তড়িৎকে!

এ-চিঠির উত্তরে রবীন লিখেছিল একখানা খুব ভাসা-ভাসা চিঠি। তাতে সে লিখেছিল যে, তার বিয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই—বিয়ে ক'রবার কথা ভাবেও নি সে, ভাববার মত শক্তিও নেই তার। তড়িতের কি রকম স্বামী হ'লে তার মন ভ'রবে, তার একটা আন্দাজ সে ক'রেছিল—সে লিখেছিল, তিনি হবেন মস্ত পণ্ডিত—ভারি রসিক, চরিত্র-বলে বলীয়ান ইত্যাদি। সে চিঠির উত্তরে তড়িৎ লিখেছিল—

"আপনার চিঠি পেয়ে আমার এত রাগ হ'য়েছিল যে, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আপনি কক্ষণও ঠিক আপনার মনের কথা লেখেন নি। সব জেনে-বুঝে মিথ্যে ক'রে লিখেছেন। কাকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে তা আপনি খুবই জানেন, মিথ্যে ভাঁড়িয়েছেন। যাক, এ কথা নিয়ে আপনাকে ঘাঁটান মিথ্যে।

"আপনার নিজের কথা শুনে আমার ভারি দুঃখ হ'ল। কেন মিছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে পাড়াগাঁয় ঐ স্কুল নিয়ে প'ড়ে আছেন? চ'লে আসুন না এখানে! (চিঠিখানা ক'লকাতা থেকে লেখা।) এখানে একটা উপায় হবেই।

"তবে যদি আপনার সে ইচ্ছে না থাকে, ব্রহ্মচারী হ'য়ে আপনার গ্রামের সেবা ক'রবেন আপনি—এই যদি আপনার আদর্শ হয়, তবে অবিশ্যি কথা স্বতন্ত্র। আপনার সে সাধু-সঙ্কল্পে আমি অন্তরায় হ'তে চাই নে।"

তড়িতের শেষ চিঠি তার তিন বছর পরে লেখা। তড়িৎ তখন এম্-এ পাশ ক'রেছে — চিঠিখানা লিখেছে সে তার বিয়ের আগের দিন। এ চিঠিতে আর কোনও কিছু ঢাকাঢাকি নেই। সে লিখেছে—

"কাল আমার বিয়ে!

"ভাববেন না হাসিমুখে আমি বিয়ে ক'রছি। কান্নায় আমার বুক ভ'রে যাচ্ছে। বিয়ে হ'চ্ছে আমার কিন্তু তাঁর সঙ্গে নয় যাঁকে আমি হৃদয়ের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে এতদিন পূজা ক'রে এসেছি। নিষ্ঠুর দেবতা আমার সে পূজা গ্রহণ ক'রলেন না। আজ যাচ্ছি আমি পরের ঘরে। নইলে বাবা-মা বড় দুঃখ পান, তাই এ কাজ ক'রতে হ'চ্ছে।

"আজ জন্মের শোধ একটি বার আপনাকে ব'লতে ইচ্ছে হ'চ্ছে যে, এতগুলি বছর ধ'রে আমি প্রাণে-প্রাণে কামনা ক'রেছিলাম আপনাকেই।—পেলাম না, দুর্ভাগ্য আমার!

"যাক, অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়েছে। এখন যাচ্ছি পরের ঘরে। দয়া ক'রে আর চিঠি লিখবেন না, চিঠির প্রত্যাশাও ক'রবেন না। এখন তো আর আমাদের চিঠি লেখা উচিত হবে না!"

যেদিন রবীন এই চিঠি পেয়েছিল সেদিন সে লুটোপুটি খেয়ে কেঁদেছিল। আজও এ চিঠি প'ড়ে তার চোখ জলে ভেসে গেল।

সে ভাবতে লাগলো, এখন তড়িৎ কোথায়? তার স্বামী কি করে? কতগুলি ছেলেপিলে হ'য়েছে তার? জানতে ভারী কৌতূহল হ'ল।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠিগুলো সে তুলে রাখলে। তার পর সে সব গুটিয়ে রেখে পায়-পায় চ'ললো ভুবনবাবুর বাড়ী দাবা খেলতে।

৮

আর এক বছর কেটে গেল। বলা বাহুল্য রবীন মাষ্টার নিজ হাতে চাষ-আবাদের চেষ্টা ছেড়ে দিলে, ঠিক যেমন সে আর সব চেষ্টাই ছেড়েছিল ঘা খেয়ে। রণু এতে আপত্তি ক'রেছিল। তার সঙ্গে রফা হ'ল এই যে, সে ঢাকায় গিয়ে ফার্ম্মে কৃষি-বিদ্যা শিখবে—শিখে এলে সে হাতে-কলমে চাষ ক'রবে।

হেড মাষ্টারের কাছে তাড়ার পর তাড়া খেয়ে রবীন মাষ্টার স্কুলের কোনও কথার সাতে-পাঁচে থাকতো না। সে সময় মত স্কুলে যেতো, রুটীন বেঁধে পাঁচ ঘণ্টা পড়াত, তারপর সে বাড়ী ফিরে আসতো। স্কুলে কোথায় কি হ'চ্ছে, কে কি ব'লছে, তার কোনও খবরই রাখতো না সে।

একদিন বাড়ী ফিরছে সে—ষষ্ঠ শ্রেণীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলে যে, মাষ্টার ম'শায় টেবিলের উপর কয়েকটা মেটে গেলাস আর গোটা-কয়েক গাছপালা নিয়ে বই থেকে প'ড়ছেন আর সেই সব জিনিষ নেড়েচেড়ে মাঝে মাঝে ছেলেদের দেখাচ্ছেন। ছেলেরা যে-যার বেঞ্চিতে ব'সে আছে। কৌতূহলী হ'য়ে রবীন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে শুনলে মাষ্টারের পড়ান। খুব ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাসে উঁকি মেরে সে দেখতে পেলে যে, ছেলেরা লাল-সবুজ কাগজ কেটে সেগুলো ভাঁজ ক'রছে।

স্কুলের ছুটির পর রবীন মাষ্টার সেই দুই ক্লাসের মাষ্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলে তারা কি ক'রছিলো। একজন ব'ললে, Nature study হ'চ্ছিল, আর একজন ব'ললে, Paper folding।

রবীন ব'ললে, "তোমরা যে এই সব কর, হেডমাষ্টার জানেন?" মাষ্টার দু'টি ছেলে মানুষ, রবীনের পুরোনো ছাত্র।

"কেন জানবেন না? তিনিই তো ব'লে দিয়েছেন।"

অবাক হ'য়ে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "তিনি ব'লে দিয়েছেন? বল কি? তিনি যে এ সবের ওপর ভারি চটা!"

একজন ব'ললে, "কই না! তিনিই তো আমাকে Teachers' Manual দিয়ে এ সব পড়াতে ব'লে দিয়েছিলেন।"

রবীন ব'ললে, "বটে, বটে, ভারি আশ্চর্য্য তো!"

আর একজন ব'ললে, "আশ্চর্য্য হবার কিছুই নয় স্যর। হেডমাষ্টার কি আর অমনি ক'রেছেন এ সব? ইনস্পেক্টারের সার্কুলার এসেছে, Nature study, Manual training—এ সব শেখাতে হবে।"

রবীন ব'ললে, "তাই না কি? বেশ তো। দেখ—কিন্তু তুমি ওই যা ক'রছিলে ওকে কিন্তু Nature study বলে না। সে কেমন ক'রে ক'রতে হয় তার বই আছে আমার কাছে। দেখতে চাও তো যেও আমার বাড়ী। আর তুমিও গিয়ে দেখে এসো না, কাগজ কাটা, কাগজ ভাঁজ ক'রবার কত প্যাটার্ণ আছে।"

মাষ্টার দু'টি তার বাড়ীতে এলে রবীন মাষ্টার তাদের বই খুলে অনেকক্ষণ অনেক কথা বোঝালে, অনেক ছবি দেখালে, শিক্ষার থিওরী নিয়ে অনেক বক্তৃতা ক'রলে। দু'খানা বই বগলে ক'রে তারা যখন বেরিয়ে গেল, রবীন মাষ্টার তখন তার ঘরে ব'সে ভাবতে লাগলো আর কেবলি হাসতে লাগলো।

তার মনে হ'ল ঠিক পোনেরো বছর আগে সে ছেলেদের নিয়ে Nature study করাত, হাতের কাজ শেখাত। তখন হেডমাষ্টার এসে তার উপর কি রাগ! তার সে কাজ বন্ধ ক'রতে হয়েছিল। আজ পোনেরো বছর পরে প্রভুরা শিখেছেন সবে এইসব জিনিষের কথা। বিশ বছর আগে সে যা ক'রতো আর পোনেরো বছর আগে জোর ক'রে যা বন্ধ করা হ'য়েছিল, আজ হেডমাষ্টারবাবু একেবারে নতুন-আমদানী ব'লে সে জিনিষ চালাতে আরম্ভ ক'রেছেন! কি বেকুব দুনিয়ার লোক, কি অজ্ঞ! ভাবতে তার হাসি পেল।

আর যদি বা এই সব শেখানোর হুকুম এলো তখন হেডমাষ্টার তো জানতেন যে, এ সব বিষয় রবীন মাষ্টার বেশ ভাল ক'রেই জানে, আর অন্য কেউ জানে না কিছু। কিন্তু রবীন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না ক'রে তিনি ভার দিলেন দুই ছোকরাকে, যারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কোন দিন শেখেও নি। রবীন মাষ্টার হাসতে হাসতে ভাবলে, "কোন্ মুখে আর ডাকবে সে আমায়? তা হ'লে যে নাক কাটা যায়, জব্দ হ'তে আর বাকী থাকে না।"

কথাটা তার আর অন্তরকে পীড়া দিল না, মনে হ'ল মহা হাস্যকর একটা ব্যাপার। সে চুপ-চাপ ব'সে হাসতে লাগলো।

নিস্তারিণী তখন সেই ঘরে এসে স্বামীকে অমনি একলা ব'সে হাসতে দেখে পেয়ে গেল মহা ভয়। স্বামী পাগল হ'য়ে গেছেন, তাই ভেবে সে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে লোক ডাকা-ডাকি সুরু ক'রলে।

অনেকে এলো, সবাই এসে এসে তফাৎ থেকে রবীন মাষ্টারকে দেখে, আর সরে গিয়ে জটলা করে। শেষে ক'বরেজ ম'শায় এলেন।

যখন ক'বরেজ ম'শায় এলেন তখন রবীন মাষ্টার উঠেছে। উঠে সে চ'লেছে ভুবনবাবুর কাছে।

ক'বরেজ ম'শায় ব'ললেন, "কোথায় যান মাষ্টার ম'শায় আমি যে আপনাকে দেখতে এসেছি? খবর পেলাম আপনার না কি অসুখ!"

"আমার অসুখ! পাগল হ'য়েছেন ক'বরেজ ম'শায়? আমার অসুখ দেখেছেন কোনও দিন?"

"আচ্ছা, দেখি একবার নাড়ীটা তবু।"

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "দেখুন, মন খুলী ক'রে দেখুন।"

ক'বরেজ ম'শায় অনেকক্ষণ নাড়ী টিপে থেকে ব'ললেন, "হুঁ।"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "হুঁ কি ম'শায়?"

"না বিশেষ কিছু নয়, যা ভেবেছিলাম তাই। বায়ু কুপিত! তা কোনও চিন্তা নেই, কয়েকদিন নারায়ণ তেল মাখলে আর একটু ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। এর জন্যে চিন্তা ক'রবেন না।"

হেসে রবীন ব'ললে, "চিন্তা তো আমার নয় ম'শায়, চিন্তা দেখছি আপনারই।"

ব'লে সে হাসতে হাসতে চ'ললো ভুবনবাবুর কাছে।

ক'বরেজ ম'শায় সাধারণ গ্রাম্য ক'বরেজ। কতকগুলি ওষুধ তৈরী ক'রতে জানেন আর তার মোটা-মুটি ব্যবহার জানেন। যা জানেন তাতে মোটা-মুটি অরটা, আমাশয়টার চিকিৎসা তিনি মন্দ করেন না। তার চেয়ে শক্ত কোনও ব্যারামের অভিজ্ঞতা তাঁর কিছুই নেই, নাড়ী-জ্ঞানও তাঁর ব'লতে গেলে কিছুই নেই।

রবীন মাষ্টার চ'লে গেলে, ক'বরেজ ম'শায় নিস্তারিণীর কাছে রোগের অবস্থা শুনলেন। ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "উন্মাদেরই লক্ষণ বটে, তবে ভাবনা ক'রবেন না বউ-মা, এক সপ্তাহ ওষুধ খেলেই বোধ হয় সেরে যাবে —একটু সাবধানে থাকবেন, আর ওঁকে একটু তোয়াজে রাখবেন, রাগাবেন না ওঁকে। একে বায়ু কুপিত তার উপর ক্রোধ হ'লে ঘোর অনিষ্ট হ'তে পারে।"

ক'বরেজ ম'শায়ের কাছে উন্মাদ রোগের ওষুধ তৈরী ছিল না, থাকবার কথাও নয়। খানিকটা নারায়ণ তেল ছিল আর সাধারণ যে ওষুধ ছিল তারই মধ্যে দু'একটা বেছে অনুপানের লম্বা ফর্দ্দ দিয়ে তিনি ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন নিস্তারিণীকে।

দাবা খেলে আজ রবীন মাষ্টার ভুবনবাবুকে তিনবার মাৎ ক'রে মহা উল্লাসে তার আজকের খেলার চালগুলো মনে মনে পুনরাবৃত্তি ক'রতে ক'রতে বাড়ী এল। এসে সে দেখে, নিস্তারিণী তার অপেক্ষায় বাইরে এসে ব'সে আছে।

রবীন মাষ্টারের প্রাণ কেঁপে উঠলো। তার দাবা খেলে ফিরতে রাত হয় ব'লে নিস্তারিণী রোজ সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে তার ভাত ঘরে চাপা দিয়ে শুয়ে থাকে। রবীন মাষ্টার এলে কোনও দিন ওঠে—সে দিন হয় তীব্র তিরস্কার—কোনও দিন ওঠেও না। আজ নিস্তারিণী না শুয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে, দেখে রবীনের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। সে ভাবলে, আজ বুঝি কুরুক্ষেত্র!

নিস্তারিণী তাকে দেখে হেসে ব'ললে, "যা হ'ক, এতক্ষণে আসবার বেলা হ'ল বাবুর। আমি দু'ঘণ্টা এখানে ব'সে আছি।"

রবীন মাষ্টার অবাক হ'য়ে ব'ললে, "কেন? শোও নি তুমি আজ?"

"কেন? শোব কেন? রোজই আমি শুয়ে থাকি না কি? দারাদিনের খাটুনীর পর একটু গা গড়াই বই তো নয়!"

"না, না, তা ক'রবে বই কি? বেশ তো বেশ তো।"

ব'লতে ব'লতে সে নিস্তারিণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে তার শোবার ঘরে গেল।

রোজ রাত্রে তার ভাত এখানে ঢাকা থাকে। আজ নেই দেখে সে ব'ললে, "এ কি?—ভাত?"

হেসে নিস্তারিণী ব'ললে, "হাঁ, হাঁ, আছে ভাত, পাবে। মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

রবীনের ভারি আশ্চর্য্য লাগলো নিস্তারিণীর এই হাসি আর এই সদয় ব্যবহার। এটা এতই অদ্ভুত যে, সে কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর দিকে। সেই দৃষ্টির ভাব দেখে নিস্তারিণীর বুক কেঁপে উঠলো—মনে হ'ল বুঝি এ আসন্ন উন্মাদের লক্ষণ।

মুখ হাত ধুয়ে এলে নিস্তারিণী হেঁসেল থেকে বেড়ে নিয়ে এলো গরম ভাত।

গরম ভাত—রাত্রে রবীন মাষ্টার আজ দশ-বিশ বছর খেয়েছে ব'লে মনে প'ড়লো না। ভাতে হাত দিয়েই সে হাঁ ক'রে নিস্তারিণীর দিকে চেয়ে রইলো অবাক হ'য়ে।

স্বামীর এই দৃষ্টিতে নিস্তারিণীকে আরও ভয় খাইয়ে দিলে, সে ব'ললে, "কি দেখছো? খাও!"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "ভাত যে গরম!"

"গরম তাই কি? নেড়ে-চেড়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেব?"

"না, না, ব'লছিলাম, ভাত গরম হ'ল কেমন ক'রে?"

নিস্তারিণী ভাবলে, এ পাগলের কথা। নইলে রবীন কি জানে না, ভাত গরম হয় কেমন ক'রে! নিস্তারিণী মনে মনে একটু ব্যস্ত হ'ল, সে ব'ললে, "আর রঙ্গ ক'রতে হবে না, খাও!"

খেলে রবীন মাষ্টার পরম তৃপ্তির সঙ্গে। তারপর নিস্তারিণী নিজ হাতে পান সেজে দিলে। সে গুলে নিস্তারিণী তাকে পাখা দিয়ে বাতাস ক'রতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার কেবলি ভাবতে লাগলো, এ হ'ল কি!

(ক্রমশঃ)

দেবতা ও ভক্ত

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

দেবতা ছিল মন্দিরে,
ভক্ত ব'সে ছিল পায়,
সহসা দূরে মঞ্জীরে
শব্দ ও কি শোনা যায়!
দেবতা কহে—ভক্ত আমার
ও দিকে তুই চাস্ না রে।
ভক্ত কহে—উতল হিয়া
ব্যাকুল প্রভু চাহিবারে।

দেবতা কহে—শক্ত যে
মায়ার ফাঁসী আছে হোথা,
—কি দোষে দোষী ভক্ত এ,
হে মোর প্রভু, তুমি কোথা?
দেবতা কহে—ভক্ত আমার
বুকেই আমি নিত্য তোর।
ভক্ত কহে—নহে—নহে
ঠাকুর তুমি নয় গো মোর!

দেবতা ক্ষোভে কুণ্ঠিত,
ভক্তের আজি হ'লো এ কি!
ভক্ত ধূলায় লুণ্ঠিত
দেবতারে তার নাহি দেখি!
ঠাকুর কহে—ভক্ত ওরে,
আমায় কেন চিনিছ না?
ভক্ত কহে—ভীরু যে জন
সে মোর প্রভু কভু তো না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন-দেবতা

ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে 'বলাকা' একটি বিশেষ ঋতু আনিয়াছিল। 'বলাকা'র অধিকাংশ কবিতা যখন রচিত হয় তখন য়ুরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, দুই একটি কবিতায় যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে যে এক নূতন জগৎ আনয়ন করিবে, কবি তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়া তাহা হয়ত অনুমান করিয়া থাকিবেন। বের্গসঁ-দর্শন তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকিতে পারে, অথবা কবির মনে এই নূতন ঋতুর আবির্ভাব একান্তভাবে আভ্যন্তরীণ হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, কবির এই কাব্য-গ্রন্থে সবচেয়ে বড়কথা হইতেছে পরিবর্ত্তনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি। জীবনের চঞ্চল প্রবাহের গান রচনা করাই যেন তাঁহার ইচ্ছা ছিল। হংস-বলাকার চঞ্চল গতি তাঁহাকে কবিতা লিখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহার অনুকরণে কবি এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন।

পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

ইহাই হইতেছে 'বলাকা'র বিশিষ্ট সুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো শুধু 'চলে যাওয়া'র গানের কবি নহেন, তিনি 'রয়ে থাকা'র কাব্যও রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
... ...
এমন একান্ত করা চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।

জীবনের চঞ্চল পরিবর্ত্তন ও অচঞ্চল স্থিতির সমন্বয় করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া কবি এই যুগে বিশেষ করিয়া পরিকল্পনা করিয়াছেন চির যৌবনের মূর্ত্তি। কারণ যৌবন চঞ্চল ও গতিশীল অথচ কবি কল্পনা করিয়াছেন ইহা মৃত্যুহীন, ইহা 'মৃত্যুসাগর মথন ক'রে অমৃতরস আনবে হ'রে।' কবির এই নূতন পরিকল্পনায় বিশ্ব ও বিশ্বদেবতা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিশ্বের মধ্যে তিনি যৌবনের বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা ও ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইলেন এবং জীবন-দেবতাও যৌবনের পরশমণি লইয়া উপনীত হইলেন। শান্তি-স্বর্গ খোঁজা ছাড়িয়া, কবি এবার দীপক রাগিণীর মূর্চ্ছনায় উদ্বোধিত হইয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র ঋতু আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোন সঞ্চয়ই নিঃশেষে নষ্ট হয় না। মধ্য বয়সে কবি যে অপ্রমত্ত, অচঞ্চল শান্তি ও বিশ্বাসের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হন নাই। যে বসন্ত একদিন কত কোলাহল করিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহা ফিরিয়া আসিলেও তাহার সে পূর্ব্ব উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। 'বলাকা'র কবিতায় যৌবনের রক্তিম বিহ্বলতা ও পরিণত বয়সের প্রশান্ত বিশ্বাসের সম্মিলন হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, ইহা কবির শ্রেষ্ঠ রচনা।

জীবন-দেবতা আজ কবির কাছে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছেন প্রিয়তমের মূর্ত্তিতে। একদিন কবি বলিয়াছিলেন, আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান দিয়াছ আপন হস্তে···

ইহার পর ভগবানের দান গ্রহণ করিবার কথাই কবি ভাবিয়াছেন, নিজেকে এত বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, প্রতিদানের কথা আর মনে আসে নাই। কিন্তু এখন বিশ্বদেবতা আসিয়াছেন চির-যৌবনের ভাণ্ডারীরূপে, প্রিয়ের মূর্ত্তিতে। তাই কবি শুধু গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নবোন্মেষিত প্রভাতে নিজ হাতে তাঁহাকে কি দিবেন, সেই কথাও চিন্তা করিয়াছেন এবং সদ্য-জাগ্রত চেতনার গৌরবে দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহার দান পাখীর গান, বাতাসের সেবা ও পূর্ণিমার হাসি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'অপরিচিতের চিরপরিচয়' লাভ করিয়া কবি প্রিয়কে আনিয়াছেন জীবনের স্রোতে। তিনি নিজে 'অপরিবর্ত্তন' হইলেও তাঁহার প্রকাশ চিরচঞ্চল জগতের প্রবাহে—

তা'রে নিয়ে হ'ল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তা'রে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।

'উৎসর্গ' কাব্যের 'সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো' কবিতায় কবি জীবন-দেবতার প্রকাশের বৈচিত্র্য কল্পনা করিয়াছেন, তিনি কখন আসেন বাঁশী হাতে সুন্দরের রূপে, আবার কখনও আসেন তাপস মূরতি ধরিয়া ভীষণ, মৌন, রিক্ত হইয়া। 'বলাকা'র 'হে মোর সুন্দর' কবিতায়ও অনুরূপ পরিকল্পনা আছে। জীবন-দেবতা সুন্দর, প্রেমিক ও রুদ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কাব্য হিসাবে দুইটি কবিতাই অতি উচ্চশ্রেণীর কিন্তু ভাবগত সাদৃশ্য থাকিলেও বিভিন্নক্ষেত্রে অনুভূতিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। 'উৎসর্গ' রহিয়াছে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' এবং 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র মাঝখানে ; ইহা দুই বিভিন্ন যুগের সংযোগ ক্ষেত্র। কবি এখনও জীবন-দেবতাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিতে পারেন নাই, তাঁহার সমস্ত রহস্যের নিরসন করিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহাকে বুঝিবার জন্য, জানিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। সুন্দরের মূর্ত্তিতে তিনি যখন আসিয়াছিলেন, তখন তো কবি তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারেন নাই, তাই তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা যেন মৌন, রিক্ত, ভীষণ প্রকাশকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। 'বলাকা'র পরিকল্পনার মূলে রহিয়াছে সুগভীর বিশ্বাস ও সুনিবিড় পরিচয় ; তিনি সানন্দে বিশ্বে জীবন-দেবতার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করিতেছেন, এই বৈচিত্র্যে অপরূপ মাধুর্য্য আছে কিন্তু কোন অনিশ্চিত রহস্য নাই। সেই তীব্র ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে এক বিরাট অনুভূতি ; কবি জীবন-দেবতার রূপ দেখিয়াছেন—

পুষ্পবনে
পুণ্য সমীরণে
তৃণ পুঞ্জে পত্রঙ্গ গুঞ্জনে
বসন্তের বিহঙ্গ কূজনে
তরঙ্গ চুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব বীজনে।

আর তাঁহার প্রেমের প্রকাশ হইয়াছে —

বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনা মাঝে
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয় রক্ত পাতে
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তির মার্জ্জনা রহিয়াছে —

গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

কবির অনুভূতির এই অপরূপ বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি কবিতায়, যেখানে আগেকার যুগের ভাব ও রূপক অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবন-দেবতা 'অপরিবর্ত্তন' হইলেও সঞ্চরণশীল, তিনি রহস্যের আবরণে লুক্কায়িত নহেন; তিনি অভিসারে বাহির হইয়াছেন সমস্ত দৈন্য ধন্য করিতে, অগৌরবার গৌরব বাড়াইয়া তাঁহার নিজের সাথী করিয়া লইতে। তাঁহার সঞ্চরণে সমস্ত বিশ্বে ঝড় উঠিয়াছে, উতলা ঢেউয়ের দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

রুক্ষ অলক উড়ে' পড়ে সিক্ত পলক আঁখি
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল বায়ে কাঁপচে থাকি' থাকি'
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বিশ্বপ্রকৃতির যে চঞ্চলতা দেখিয়াছি, এখানেও তাহারই পুনরাবৃত্তি আছে কিন্তু সেই সংশয় নাই কারণ এই যাত্রা নিরুদ্দেশ নহে।

'বলাকা'র সহিত 'পূরবী'র ভাবগত ঐক্য আছে। 'বলাকা'র কবি যৌবনকে রাজটীকা পরাইয়াছিলেন। 'পূরবী'তে দেখিতে পাই কবি জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে যৌবনকে চিরজীবী করিতে চাহিতেছেন। যৌবনের অনন্তজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস প্রগাঢ় হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, মনুষ্য-জীবনের বিশেষত্ব তাহার অশ্রান্ত গতি, অনন্ত চঞ্চলতা কিন্তু এই চঞ্চলতা শুধু চিরনবীনতা লাভের উপায়।

কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্ব্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা
হারায় যারা রয়ে রয়ে।

কবির বিশ্বাস আছে, তিনি পঞ্চর মত কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইবেন না, কারণ তাঁহার জীবন তো শুধু রক্তমাংসের জীবন নহে; তাঁহার মন নৃত্যের তালে চলিয়া গেছে জীবন-মৃত্যুর চির-সুন্দরের সুরপুরে, যেথায় রূপের পদ্মে তিনি করিয়াছেন অরূপ মধুপান। তাঁহার জীবন-দেবতা চিরনবীনতার দেবতা, ইনি 'চিত্রা'র দেবতার মত শুধু রহস্যময় অন্তরতম নহেন, 'গীতাঞ্জলি'র দেবতার মত কেবল প্রভু মাত্র নহেন; তিনি কবির জন্মদিনে (পঁচিশে বৈশাখ তারিখে) কবির কাছে উপস্থিত হইয়া কবিকে চিরনূতন বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কবির প্রথম জন্মদিন ক্ষয়হীন, মরণের পরপ্রান্তও কবির কাছে প্রতিভাত হইয়াছে চিরন্তন দেয়ালীর উৎসব প্রাঙ্গণরূপে। প্রাণ-দেবতার নিকট হইতে এই আশ্বাস পাইয়া সাহসী কবি সংহারের বিধাতা মহেশ্বরকেও অনন্ত যৌবনের ভাণ্ডারী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সংহারের উন্মত্ত নৃত্যলীলায় তিনি বারংবার মদনকে ধ্বংস করিতেছেন কিন্তু আবার তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন যৌবনের চঞ্চল মাধুর্য্যকে চিরজীবী করিবার জন্য।

বিদ্রোহী নবীন ধীর, স্থবিরের শাসন-নাশন
বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি' তার সিংহাসন,
তা'রি সম্ভাষণ।

এই কারণে কবি নিজেকে বলিয়াছেন, 'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের হে রুদ্র সন্ন্যাসী!' জীবন-দেবতাকে চিরসুন্দর, চিরনবীন ও চিরযুবা কল্পনা করিয়া কবি তাঁহার নিজের জীবনের সার্থকতারও সন্ধান পাইয়াছেন। পূর্ব্বে মুক্তিকে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন অসংখ্যবন্ধনের মাঝে, এখন তাঁহাকে তিনি পাইয়াছেন সুরের ও ছন্দের অশ্রান্ত নৃত্যে। গানের 'প্রাণগঙ্গা'র ধারায় তিনি অনির্ব্বচনীয়ের কত রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই এই গানের পূজা যদি

বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া যায়, তবুও কবির আক্ষেপ নাই; কারণ এই গানের মধ্য দিয়াই কবি বসন্তে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, শীতে জীবন-দেবতার অর্চনা করিয়াছেন।

কবির প্রথম বয়সের কবিতায় জীবন-দেবতার রূপ অস্পষ্ট, রহস্যময়, কবির তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাই, কবি অ-রূপ দেবতাকে আপনার করিয়া লইতে ব্যগ্র; 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'তে দেখি কবির আস্থা সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইয়াছে, জীবন-দেবতা অসীম, অনন্ত হইলেও কবি তাঁহার রহস্যময় অস্পষ্টতার কথা ভাবিতেছেন না, তাঁহার উপরে পরিপূর্ণরূপে আস্থাবান্ হইয়াছেন। 'বলাকা'য় সেই অজানার অস্পষ্টতার পুনরুন্মেষ হইলেও কবির পূর্ব্ববিশ্বাস ব্যাহত হয় নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবন-দেবতা চির-পরিচয়ের মাঝেও অপরিচিত, তাই তাঁহার বিচার আসে প্রেমের সাহায্যে এবং ক্ষমা আসে প্রলয়ের পথে। 'পূরবী'তে এই জানা-অজানার আলো-ছায়া লইয়া অনেকগুলি অতি সুন্দর কবিতা রচিত হইয়াছে। কবি-হৃদয়ের বৈচিত্র্যের শেষ নাই, কাজেই তিনি কোন স্থির মীমাংসায় আসিয়া থামেন নাই। তবে 'পূরবী'র কবিতাতে দেখিতে পাই, কবি 'না-পাওয়া', 'অ-দেখা', 'অ-চেনা'র রহস্য সম্পূর্ণ নিরসন না করিয়াও এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অপ্রাপ্ত চিরকাল প্রাপ্তের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িত আছে, অ-জানা অজ্ঞাত থাকিয়াও জানার সঙ্গে চিরকাল লীলা করিতেছে। জীবন-দেবতা অচেনা হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার প্রকাশ প্রেমের মধ্য দিয়া। সেই খানেই কবির আশ্বাস ও স্পর্দ্ধা। কবি তাঁহাকে দোসর বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে নিত্য লীলায় আবদ্ধ আছেন, এই দাবী করিয়াছেন। সেই দেবতা অ-দেখা, না-পাওয়া; কিন্তু কবি বলিতেছেন —

বুঝিয়াছি অনুভবে
বন-মর্ম্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।
... ...
ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ব-বনের গন্ধ জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
'কি কহ' সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

ইহার পরবর্ত্তী যে সকল কবিতা কবি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাহ্যিকসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে, কবির শক্তি ক্ষীণ হইতেছে, এমন ইঙ্গিত করা হইতেছে। কবি এখন বন্ধন মাঝে মুক্তি চাহেন না, বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহেন (পরিশেষ—মুক্তি)। 'ফসল যত উঠেছে ফলি' তাহা কণায় কণায় বিচিত্রার পায়ে নিবেদন করিয়া তিনি ছুটি চাহিতেছেন। কিন্তু তবুও দেখিতেছেন যে, ছুটি নাই; তাই প্রশ্ন করিয়াছেন —

তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে,
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি'
নিঃস্ব করা দানে! (পরিশেষ)

কবির একমাত্র ভরসা যে, তিনি বিশ্বের প্রাঙ্গণ হইতে কর্ম্মডোর ছিন্ন করিয়া গেলেও তাঁহার ভালবাসা থাকিয়াই যাইবে; আর সব কিছু তিনি দূর করিয়া দিয়াছেন। আজও তিনি চঞ্চলকে আহ্বান করিয়াছেন কিন্তু চিরচঞ্চলের মধ্যে যেন নূতন বিস্তৃতি আসিয়াছে;

জীবন-মৃত্যুর সঙ্গমতীর্থে জীবন-দেবতা তাঁহার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছেন। কবি বলিতেছেন —

হে মহা পথিক
অবারিত তব দশ দিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে;
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্ব্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্ব্বে পর্ব্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

(পরিশেষ)

(সমাপ্ত)

সোপান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিবাহের দশ বৎসর পরে গোপীনাথ সংসার ত্যাগ করিলেন। স্ত্রী সারদার শাসন, অনুনয়, ভালবাসা—কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

বৈষ্ণবের ছেলে; বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছেন, কৈশোরে তাহারই একটি অতি ক্ষুদ্র শিখা অন্তর-নিরালায় জ্বলিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ যৌবনকে পর্য্যন্ত আলোক-প্লাবিত করিয়া দিল।...তাঁহার মনে হইত...আকাঙ্ক্ষার সীমারেখা বিদীর্ণ করিয়া সংসার প্রতিনিয়ত তাঁহাকে নিম্নমুখে টানিতেছে। তাই, দীর্ঘ দশটি বৎসর পরে এই মায়ার রজ্জু ছিঁড়িয়া তিনি মুক্তির পথে পা বাড়াইলেন।

সংসারে পড়িয়া রহিল কয়েক বিঘা জমির উপর ছোট একখানি চালা আর পরিপূর্ণ হৃদয়ের পূজা-উপচার লইয়া অশ্রুমুখী এক যুবতী।

দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া গোপীনাথ কোলাহলময়ী কাশীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

একটি বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে আসিয়া সোপান-প্রান্তে বসিলেন ও গোপীনাথকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, কতদিন হ'ল এখানে আছেন?

গোপীনাথ আপন গৈরিক বসনের পানে চাহিয়া এ প্রণামের অর্থ বুঝিলেন।

মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তিন-চার দিন।—আপনি?

বৃদ্ধ সনিঃশ্বাসে কহিলেন, আমার অনেক দিন হ'য়ে গেল। জয় বাবা বিশ্বনাথ!—বলিয়া একটি হুঙ্কার দিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, সংসারে ছিল আমার সবই—ধন, জন, পুত্র, পরিবার। আবার ভোজবাজীর মত নিমিষে সব মিলিয়েও গেছে। তাই বাবার চরণের ছায়ায় পড়ে আছি। যে ক'টা দিন মা আমায় বুকে টেনে নিয়ে না জুড়িয়ে দেন।—বলিয়া তিনি অদূরে মণিকর্ণিকার চিতার পানে অঙ্গুলি প্রসারণ করিলেন। ব্যথাভরা দৃষ্টিতে গোপীনাথ বৃদ্ধের পানে চাহিলেন। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, এখন সংসারে আছে এক ছেলে। তা তারই বা ভরসা কি? সাত-সাতটা ছেলে যখন আমায় ফেলে পালালো!.....ভয়ে পালিয়ে এসেছি, বাবা! কিন্তু পালিয়ে এসেও তো নিস্তার নেই, বাবা! যতক্ষণ বিশ্বনাথের মাথায় ফুল-জল ঢালি, গঙ্গায় স্নান করি, নাম-কীর্ত্তন শুনি, আর পাঁচ জনের পানে চেয়ে পুরোনো শোক ভুলতে চেষ্টা করি—অমনি তাদেরই মুখগুলি মনের মধ্যে জেগে ওঠে!—হ্যাঁ বাবা, ব'লতে পার, আমার এ ভাবনা কিসে যায়?

গোপীনাথ বলিলেন, মায়াময় জগৎ!

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মায়াবন্ধন ছেদনের উপায় কি?

গোপীনাথ বলিলেন, মনকে বশীভূত করাই এর একমাত্র উপায়। কিন্তু সে বড় কঠিন। জন্ম-মুহূর্ত্তে জগৎ আমাদের মনের মধ্যে যে মায়ার সুতোটি টেনে দেয়, মরণ পর্য্যন্ত সে সুতোর টান সমান থাকে। চারদিকের ঝড়-তুফানে সুতো দুলতে থাকে—মনকে দোলায়। যে মনের ভার-কেন্দ্রে এই সুতোকে টান্‌-টান্‌ ক'রে বাঁধতে পারে, চারদিকের ঝড়-তুফানে তার সুতো দোলে না—তার মন টলে না।

তারপর অনেক কথা হইল। গীতা, উপনিষদ্‌, সাঙ্খ্য—গোপীনাথের যাহা কিছু জানা ছিল, একে-একে তিনি সমস্তই বলিলেন।

বৃদ্ধ শুনিবামাত্রই সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, আজ রাত হয়েছে, থাক। কাল এসে আবার শুনবো।

গোপীনাথ সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিলেন।

বৃদ্ধ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, কি জানেন, বাবা! আমরা সংসারী! অত শাস্ত্র-টাস্ত্র বুঝতে পারি না, এমন উপদেশ দিন, যাতে সবদিক বজায় থাকে!.....এখানে একখানা দোকান করেছি কি না—তাইতেই চলে!

গোপীনাথ হাসিয়া বলিলেন, মিছে সংসার-মায়া ছেদনের উপদেশ নেবার কি দরকার আপনার? দিব্যি সংসার ত' পাতিয়েছেন!

বৃদ্ধ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, কি করি বলুন, না হ'লে পেট যে চলে না। সকালে গঙ্গাস্নান ক'রে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে রোজ অঞ্জলি দিই, বিকেলে কীর্ত্তন-কথা শুনি—এতেও কি আমার পাপের ক্ষয় হবে না, বাবা!

গোপীনাথ কহিলেন, আজ আসুন—অনেক রাত হ'লো!

—হ্যাঁ, যাই! কিছু মনে ক'রবেন না, বাবা!—বলিয়া একটু দ্রুতপদেই তিনি চলিয়া গেলেন।

গোপীনাথ চাহিয়া দেখিলেন, গঙ্গার কূলে জনতা নাই—কোলাহল নাই। দূরের শঙ্খ-ঘণ্টা-বাদ্যও থামিয়া গিয়াছে—কাশীর কোলাহল রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গভীর নিশীথে যেন বহু যুগ পূর্ব্বের কাশী ধীরে-ধীরে গঙ্গার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনই তাহার কণ্ঠ হইতে উদাত্ত-গম্ভীর বেদ-মন্ত্র ধ্বনিত হইবে—এখনই তাহার অঙ্গ-সঞ্চালনে অতীতের জীর্ণ যবনিকাখানি খসিয়া পড়িবে। তারপর আবদ্ধ-লম্বিত শ্মশ্রু-জটাজুট সমন্বিত তপ-জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহকান্তি লইয়া কোন গৈরিক বসন যতি আসিয়া, এই গঙ্গার উপকূলে—নগরীর উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া, ভোগ-লালসা-পঙ্কিল জগতের কাণে অতীতের সুমহান বাণী-মন্ত্র প্রচার করিতে থাকিবেন।

রাত্রির নিস্তব্ধতায় অতীত এবং বর্ত্তমান আসিয়া প্রতিদিন বুঝি গঙ্গার সোপানে ভাষাহীন আলোচনায় ও শব্দহীন পদচারণায় কাটাইয়া দেয়। বর্ত্তমান, প্রভাতের মাঝে শতরূপে আত্মপ্রকাশ করে; অতীত, গঙ্গার পারে বালু-কিনারায় কোন চিহ্ন না রাখিয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অদূরে রমণী-কণ্ঠের মৃদু বিলাপ-ধ্বনি শ্রুত হইল। গোপীনাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিম্নতর সোপানে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া এক রমণী ক্রন্দনাবেগে ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে। তারই রোদনের মৃদু রেশ গঙ্গার তীরে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

গোপীনাথ নামিয়া আসিয়া রমণীর অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, মা!

রমণী মুখ তুলিয়া ভয়-চকিত দৃষ্টিতে গোপীনাথের পানে চাহিল।

গোপীনাথ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদচ কেন, মা!

রমণী লজ্জাবনতমুখী হইয়া উত্তর দিল, আমি পথ হারিয়ে গেছি।

ক্ষণপূর্ব্বে গোপীনাথেরও মনে হইয়াছিল—অনন্ত শূন্যে চলিবার পথে এই কাশীর বর্ত্তমানও বুঝি পথ হারাইয়াছে এবং অতীতের কাছে সেই হারানো পথের সন্ধান জানিতে চাহিতেছে।

কহিলেন, ভয় নাই। যদি কাহারও নাম জান বল, আমি বাড়ী পৌছে দেব।

রমণী নাম বলিল না—গোপীনাথের কথার কোন উত্তরও দিল না।

গোপীনাথ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, লজ্জা কি, মা! আমি তোমার ছেলে। নাম বল!

রমণী মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, আপনি যান।

কয়েকদিন কাশীতে থাকিয়া গোপীনাথ এখানকার বাজার কিছু কিছু বুঝিয়াছিলেন। কয়েকটি পথ-হারাকে এমনই রাত্রিকালে বাসায় পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। একই নারী উপর্য্যুপরি দুইদিন পথ হারাইয়াছিল। কিন্তু এ নারীও কি···

নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোপীনাথ কহিলেন, না, মা! তোমায় ফিরতেই হবে।

রমণী অবনত মুখে কহিল, আপনি কেন অনুরোধ ক'রছেন?—আপনি আমার কে?

গোপীনাথ মধুর স্বরে কহিলেন, জগতে জীব যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে, তখন সম্বন্ধ নিয়ে আসে না। আমি তোমার সন্তান—এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি আছে, মা!

রমণী মুখ তুলিয়া গোপীনাথের প্রশান্ত-সরল মুখের পানে চাহিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দু'টি গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, কিন্তু ঘরে ফিরে আমি কি ব'লবো তাঁদের?

গোপীনাথ বলিলেন, সে ভার সন্তানের। তুমি আমার সঙ্গে এস, মা!

রমণী উঠিল।

অনেক ডাকাডাকিতে দ্বার খুলিল।

একজন দীর্ঘকায় পুরুষ বাহির হইয়া কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, কে আপনি? কি চান?

পরে গোপীনাথের গৈরিক বসনের পানে দৃষ্টি পড়িতেই অপ্রতিভ হইয়া কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া কহিল, মাপ ক'রবেন। মনটা ভাল নেই।

গোপীনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, যাও মা, ঘরে যাও!

পুরুষ রমণীকে দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

গোপীনাথ উত্তর দিলেন, দশাশ্বমেধ ঘাটে!

রক্তবর্ণ চক্ষু ফিরাইয়া পুরুষ কহিল, আপনার কাছে বুঝি?

গোপীনাথ হাসিয়া কহিলেন, আমি যে ওঁর সন্তান! মায়ের কাছে ছেলের দিন-রাত্রির তফাৎ নেই।

পুরুষের রক্তবর্ণ চক্ষু মুহূর্ত্তে কোমল হইয়া গেল। গোপীনাথের চরণে মাথা রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আপনি বাঁচালেন!

গোপীনাথের পানে চাহিয়া রমণী কহিল, বাবা, আজ রাত্রিটা যদি এখানে—

গোপীনাথ কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, না, মা! আজ আমায় ফিরতেই হবে।

পুরুষ কহিল, তবে কাল আসবেন—বলুন! না, না, আমরা কিছুতেই শুনবো না।

গোপীনাথ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

একটা বৈষ্ণবের আখড়ায় গোপীনাথ আশ্রয় লইয়াছিলেন। বাবাজীরা সকাল-সন্ধ্যায় শহরে নাম-কীর্ত্তন করেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়াও কেহ-কেহ ভাগবত-কথার দ্বারা ভক্তি-পিপাসু নর-নারীর অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলেন। দ্বিপ্রহরে বাসায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থের আস্বাদ লইয়া পরম আনন্দে ভক্তিময় জীবন অতিবাহিত করেন। আশ্রমে খোলের মধুর-গম্ভীর শব্দ ও কীর্ত্তনের শ্রুতি-সুখকর আলাপও অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। এ সকল আলাপ-আলোচনা আজ কিছুই ছিল না।

গোপীনাথ বাসায় আসিয়া দেখিলেন, কয়েকজন বৈষ্ণবে মিলিয়া তুমুল বচসা চলিতেছে। চাটাইয়ের উপর চাল-ডাল, টাকা-পয়সা ছড়ানো রহিয়াছে ও উত্তেজিত বাবাজীরা হাত-মুখ নাড়িয়া পরস্পরের উপর বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। উহারই মধ্যে যিনি স্থূলকায়, ফোঁটা-তিলকে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, মাথার চৈতনটি সার্দ্ধহস্ত পরিমিত ও ভুঁড়ির পরিধি দু'টি হাতে আঁকড়াইয়া ধরা যায় না, তাঁহার কণ্ঠস্বরটাই আর সকল কণ্ঠকে ছাপাইয়া বাজিতেছিল।

—ওহে ভূমানন্দ, ও-সব দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর। শ্রীহরির কৃপায় যা উপার্জ্জন করি তার বারো আনা চার আনা নইলে আমার চ'লবে না। তোমরা উপরি রোজগার ক'রতে পার, কর না—আমার নিষেধ নেই!

ভূমানন্দ লোকটি রোগা লিক্‌লিকে। বৈষ্ণবের প্রধান গুণ—বিনয় হইতে ভগবান তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, কোপন-স্বভাবের অনুকূল চেহারাটি।

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, আরে রেখে দাও, তোমার বারো আনা চার আনা! যখন ন'দে থেকে কাশী আসি তখন কি কথা হ'য়েছিল?

ক্ষীণ রমণী-কণ্ঠে একজন কহিল, ওরে বাছা, ঝগড়া করিস কেন? প্রেমানন্দই ত' এত বড় আখড়াটা চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! ওঁর শ্রীচরণের কৃপায় কত পাপী তাপী—

ভূমানন্দ তাহার পানে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, তুমি থাম মা—ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী! সখীভাবে ভজনা কর গে, এ-সব টাকা-পয়সার ব্যাপারে আর সাউথুরি ক'রতে হবে না।

সে ব্যক্তি রাগিয়া কহিল, আ-মরণ! ড্যাক্‌রার কথা দেখ! আমি কি কম রোজগার করি! কাল বোসবাবুরা গান শুনে নগদ দু'টাকা—

প্রেমানন্দ তাহার পানে চাহিয়া কহিল, তুমি একটু চুপ কর ত' বিশাখে! ভূমানন্দকে আমি বোঝাচ্ছি।

ভূমানন্দ কিন্তু প্রেমানন্দের যুক্তি-তর্কের ধার দিয়াও গেল না। এক ভাবেই মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, দশ আনা ছ'আনায় বরং রাজী আছি, বারো আনা চার আনা হ'তেই পারে না।

একজন ছোকরা-গোছের বৈষ্ণব রহস্য করিয়া কহিল, কি ভূমানন্দ! বৈষ্ণবী জোগাড় ক'রেছ না কি? তাই টাকার এত টানাটানি!

ভূমানন্দ তাহার পানে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া কহিল, হ্যাঁ, ক'রেছি! আমি স্পষ্টই ব'লছি, তাকে সকলের সামনে কণ্ঠী বদল ক'রে ঘর পাতবো। তোমাদের মত লুকিয়ে লুকিয়ে এ ব্যবসা চালাতে চাই না।

প্রেমানন্দ এই কথায় ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ভূমানন্দ, তুমি ভুলে যাচ্ছ, বৈষ্ণবের প্রধান গুণ বিনয়!

ভূমানন্দও সমান তেজে উত্তর দিল, তুমিও ভুলে যাচ্ছ, প্রেমানন্দ!

প্রেমানন্দ নরম হইয়া কহিল, বেশ! এই ধর্ম্মকে তুমি ব্যবসা ব'লে বার বার এর অপমান ক'রো না। শ্রীগৌরাঙ্গ এর প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন।

ভূমানন্দ হাসিয়া বলিল, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম তাঁর সঙ্গেই স্বর্গে গেছে। এ তো তার খোলস মাত্র। এই

টাকা-পয়সা, ভাগ-বাঁটোয়ারা, বৈষ্ণবী-সেবাদাসী, ঝগড়া-কলহ—এ-সব কিসের ফল, মহাপ্রভু!

এই ব্যঙ্গোক্তিতে প্রেমানন্দের পূর্ব্বভাব জাগিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, তুমি দূর হও এই আশ্রম থেকে! তোমার মত পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন ক'রলে পাপ হয়।

ভূমানন্দ তীরবেগে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, আচ্ছা চ'ললাম! কিন্তু মনে থাকে যেন—এই পাপিষ্ঠের পায়ে ধ'রে কাল দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে ব'সে তোমায় কাঁদতে হবে। কাল তোমার ভণ্ডামীর খোলস সকলকে খুলে দেখাব।

'হাঁ-হাঁ' করিয়া পাঁচ-সাতজন ভূমানন্দকে ধরিয়া বসাইল।

প্রেমানন্দ অতি মৃদু-কোমল কণ্ঠে কহিল, বালক! বালক! আচ্ছা, আচ্ছা! দশ আনা ছ'আনাই সই। কিন্তু বাবা, বৈষ্ণব হ'তে চাও যদি এই ক্রোধটুকু পরিত্যাগ কর। কাল জগাই উদ্ধারের কাহিনী আর একবার প'ড়ো। শ্রীগৌরাঙ্গ হে!

অনেকেই উঠিয়া গেল।

প্রেমানন্দ গোপীনাথের পানে চাহিয়া হাসিল, কি ঠিক ক'রলে, বাবা? এই ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে? এমন শান্তিময়—প্রেমময় ধর্ম্ম আর জগতে নাই।

শান্তি এবং প্রেমের যে অপূর্ব্ব অভিনয় এইমাত্র হইয়া গেল গোপীনাথ তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কহিলেন, পরশু ব'লবো আপনাকে।

প্রেমানন্দ খুসী হইয়া কহিল, বেশ, বেশ! শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার মতি স্থির করুন—তুমি অনন্ত শান্তি লাভ কর। হ্যাঁ, দেখ বাবা! যা শুনলে এ-সব কোথাও গল্প ক'রো না যেন। ওটা পাগল! বুঝেছ তো, সব রকম মানিয়ে নিয়ে চ'লতে হয়।

গোপীনাথ বলিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অতঃপর আহারাদি সারিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পরদিন গোপীনাথ রমণীর বাটীতে আসিতেই তাঁহারা অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন।

কিছু শাস্ত্রালোচনাও হইল।

একজন প্রৌঢ়া গোপীনাথকে প্রশ্ন করিলেন, সংসারে তোমার কে আছেন, বাবা?

গোপীনাথ উত্তর দিলেন, স্ত্রী ভিন্ন আর কেউ নেই!

প্রৌঢ়া বলিলেন, আহা! তাকে একলা ফেলে চ'লে এসেছ! না, বাবা! তুমি ফিরে যাও। এ বয়সে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাজে!

গোপীনাথ কহিলেন, ধর্ম্মের কি কোন নির্দ্দিষ্ট বয়েস আছে, মা?

প্রৌঢ়া কহিলেন, তা-হোক, এমন যৌবনে সন্ন্যাসী! আর বৌমাকে রক্ষা করাও তোমার ধর্ম্ম। অগ্নি-সাক্ষী ক'রে যখন তাকে গ্রহণ ক'রেছ!

গোপীনাথ অন্তরে-অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলেন। সত্যই ত' আমার ধর্ম্ম আমি পালন করিতেছি কিন্তু তার ধর্ম্ম যে আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ এক জন্মের নহে—জন্ম-জন্মান্তরের। অর্দ্ধেক অঙ্গকে বাদ দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গের উন্নতি! তারপর ধর্ম্মের কাল যে নমুনা পাইয়াছি, সে ধর্ম্ম মাথায় থাকুক। সংসার ত্যাগ করিয়া ঐরূপ অর্থ লইয়াই যদি উঞ্ছবৃত্তি বা কাঙালপণা করিতে হয়, বৈষ্ণবী লইয়া ভোগ-বিলাসে মাতিতে হয় ত' সংসার আশ্রম ত্যাগ করিলাম কিসের জন্য? এই প্রবঞ্চনায় যাহার শান্তি আসে আসুক, আমি ত' ইহা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিব না।

তারপর এই আত্মীয়তার সূত্র। কোথা হইতে প্রসারিত হইয়া গেল। কতদূর ও কতদিন ধরিয়া ইহার জের টানিতে হইবে—কে জানে! সংসার ফেলিয়া ছুটিয়াছি মুক্তির সন্ধানে—পদে-পদে সংসার আসিয়া মায়াজাল বিস্তার করিতেছে!

মিথ্যা কথা! কাশী মুক্তি-ক্ষেত্র নহে—ভোগের ক্ষেত্র! কালই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রৌঢ়া বলিলেন, বৌমা ব'লছিলেন, তোমায় দু'দিন আমরা ছেড়ে দেব না। এখানে থেকে মন স্থির ক'রে আবার ঘরে ফিরে যাও। আমার এ-অনুরোধটি রাখতেই হবে।

রমণীর ছল-ছল স্নেহ-ব্যাকুল চক্ষের পানে চাহিয়া গোপীনাথের মায়ের অর্দ্ধ-বিস্মৃত মুখখানি মনে পড়িল। জ্ঞানের তখনও সম্পূর্ণ উন্মেষ হয় নাই। সেই আধ-অচেতনের মধ্যে একদা তিনি, তাঁহার হৃদয়-ভরা স্নেহ-মমতা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গোপীনাথ জানেন না, সে স্নেহ কি! কিন্তু বালক-মনেও তার অতি সূক্ষ্ম রেখাপাত হইয়াছিল। বাদল-রাত্রিতে বজ্রের ডাকে তাঁহার ঈষদুষ্ণ কোলটির মধ্যে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিতে সে কি আরাম! উঠানের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আকাশের পানে চাহিয়া আধখানা চাঁদ ধরিয়া দিবার জন্য তাঁহার সেই সুমিষ্ট 'আয় 'আয়' আহ্বান। ঘুমে চক্ষু ঢুলিয়া আসিত, তখন কোলের উপর তন্দ্রাময় দেহটি দোলাইতে দোলাইতে ঘুমের মিষ্ট গান শোনাইয়া—সে কি অনাস্বাদিত পুলক-সাগরে তিনি তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতেন। তারপর বুকে চাপিয়া ধরিয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়া একটি মোহময় সুরভি-স্পর্শের দ্বারা তিনি যখন তাহার ক্ষুদ্র চৈতন্যটুকু অভিভূত করিয়া দিতেন, তখন শিহরিত অন্তরের প্রতি লোমকূপে, রক্তের প্রতি কণিকায় স্নেহময়ীর সে অপূর্ব্ব স্নেহধারা রসোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

পরিপূর্ণ জ্ঞানের রাজত্বে সেই স্পর্শ মরিয়া গিয়াছিল। পিতা তাহাকে মায়ের স্নেহ-যত্ন ভালবাসা দিয়াছিলেন কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পুলক-স্পন্দনটুকু দিতে পারেন নাই। সে বুঝি একমাত্র মায়েরাই পারেন। তাঁদের বুকের স্নেহ-ভালবাসা মুখে যে কথাটি ফুটাইয়া তুলে ও দৃষ্টিতে যে সুকোমল আভাস জাগাইয়া দেয়, পুরুষের সে অন্তর কোথায়?

আজ বহুদিন পরে প্রৌঢ়ার চোখে সেই স্নেহময়ীর মমতাময় দৃষ্টিটি তিনি দেখিয়াছেন, কণ্ঠে সেই ব্যাকুল স্বর! মায়া তাহার বাগুরা বিস্তার করিয়াছে—জীবনকে শত পাকে জড়াইবে।

সেইদিন রাত্রিতে গোপীনাথ কাশী পরিত্যাগ করিলেন।

যমুনার তীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া গোপীনাথ ভাবিতেছিলেন, এই কি সেই দ্বাপরের বৃন্দাবন?—তীরে তীরে কালিন্দীর উচ্ছলিত জলরাশি কুলু কুলু স্বনে যে শ্যামনাম-গান গাহিত, নামে মাতোয়ারা হইয়া উজান বহিত—কোথায় নীলা কালিন্দীর সেই পরিপূর্ণ যৌবন! কোথায় বা তার ক্লান্তিহর মৃদু-কণ্ঠ! তীর-তরুরাজির প্রণত-শীর্ষে শ্যাম-পদচিহ্ন-রেখা মুছিয়া গিয়াছে, কদম্বের শাখে-শাখে কণ্টকিত নীপ-কোরক মৃদু বায়ু-বিক্ষেপে দুলিতেছে না, পাখী আসিয়া কুঞ্জনে গুঞ্জনে কুঞ্জ-বিতান ভরিয়া তুলিতেছে না! যমুনার কূলে রাখাল বালকের বেণু-বংশী তেমন মধুর 'রাধা' 'রাধা' ধ্বনিও বুঝি আর তুলিতেছে না!

পড়িয়া আছে শীর্ণা যমুনা—কঙ্কালের মত আপনার জরা-জীর্ণ বুকের মাঝে শ্যাম-রাধার লীলাচঞ্চল মুহূর্ত্ত-গুলি জড়াইয়া ধরিয়া। থামিয়া গিয়াছে তার জীবনের গতি! তীরে অর্দ্ধদগ্ধ তৃণরাশি ধেনু-মুখ-স্পর্শ-সুখ-হারা হইয়া বিষাদে শুকাইয়া যাইতেছে। পথের রজঃ-ধূলি জঞ্জালে ভরিয়া গিয়াছে, কুঞ্জে-কুঞ্জে অযত্ন-বর্দ্ধিত কণ্টক-গুল্ম। ব্রজ-নারীর অঙ্গসঞ্চালনে সেই রূপময়ের অনন্ত রূপের ক্ষুদ্র অংশও আর ফুটিয়া ওঠে না।

গোপীনাথের নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল।

—বাবুজী, আপনি কাঁদছেন?

মুখ ফিরাইয়া গোপীনাথ দেখিলেন, এক ব্রজবালা দু'টি বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে। মাথায় তার দুধের ভাঁড়—কোনও আহীরিণী বোধ হয়।

ঘাগরা পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কাঁচুলিতে আবদ্ধ সুঠাম দেহের লাবণ্য বাঙালীর চোখে অনেকটা যেন ম্লান বলিয়া মনে হয়। মুখে মৃদু হাসি এবং সে হাসির অধিকারিণীর স্বাস্থ্য অটুট।

রমণী অনতিক্রান্ত-যৌবনা, মুখে পরিষ্কার বাংলা বুলি। সে পুনরায় কহিল, কি ভাবচেন, বাবুজী?

গোপীনাথের বিস্ময় কাটিলে প্রশ্ন করিলেন, তুমি আমায় বাবুজী ব'লে ডাকচো কেন? সবাই 'সাধুবাবা' বলে।

যুবতী মধুর কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনি যে কাঁদচেন। সাধুরা ত' কাঁদেন না।

গোপীনাথ হাসিলেন, তোমার কথার যুক্তি আছে বটে!

যুবতী হাসিয়া কহিল, দুধ নেবেন?

—দাও! —বলিয়া গোপীনাথ তখন মাটির ভাঁড় পাতিলেন।

দুধ ঢালিয়া দিয়া যুবতী কহিল, কতদিন থাকবেন এখানে?

—যতদিন ভাল লাগে।

যুবতী কহিল, বেশ! আমার ঘর এই পাশেই। যে ঘরটা আপনি ভাড়া নিয়েচেন—ওটা আমারই এক মাসীর। তিনি হরিদ্বার গেছেন আমায় সব ভার দিয়ে।

গোপীনাথ বলিলেন, কিন্তু কাল যখন এ ঘর নিই—তখন তোমার সঙ্গে ত' কথা-বার্ত্তা হয় নি?

যুবতী বলিল, ব্রজবাসীর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ও একই কথা। দেখুন বাবুজী, না, না, আমি আপনাকে ওই নামেই ডাকবো। যখন যা দরকার হবে আমাদের জানাবেন। অসুবিধা হ'লে ব'লবেন।—বলিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় যুবতী ফিরিল। নাম তার ললিতা। আপন দাওয়ার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ডাকিল, বাবুজী আছেন?

—হ্যাঁ, আছি।

—চলুন, আপনাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখতে নিয়ে যাই!

গোপীনাথ বলিলেন, তুমি কি আমায় এতই অসহায় মনে কর যে, একলা গিয়ে আরতিটা দেখে আসতে পারি না?

ললিতা, আপনার কেঁড়ে-হাঁড়ি গোছাইয়া দুয়ারে শিকল তুলিয়া দিল ও গোপীনাথের দাওয়ার প্রান্তে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, নতুন সন্ন্যাসী ব'লেই আমার যা ভয়। তারপর সারাদিন কি রান্না ক'রলেন? খেয়েচেন তো?

গোপীনাথ কহিলেন, শরীরের ধর্ম্ম রাখতে হ'লে ও-গুলো বাদ দেওয়া চলে না। হ্যাঁ, তোমার নামটি কি?

—ললিতা।—

—শ্রীমতীর সখী। বেশ, বেশ। তা তুমি যাও—সারাদিন ঘুরেচ কষ্টও হ'য়েচে। আমি মন্দির চিনে যেতে পারবো।

ললিতা হাসিয়া কহিল, আমিও যে যাব। আরতি না দেখে এসে কোন দিন ত' আমি জল খাই না। উঠুন।

গোপীনাথ তথাপি উঠিলেন না।

ললিতা কহিল, আমার সঙ্গে যেতে সাহস হয় না বুঝি?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া গোপীনাথ বলিলেন, ভয় কিসের?

হাসিয়া ললিতা বলিল, নতুন সন্ন্যাসী কি না! তা যাক্, আজকের দিনটা ভয় কাটিয়ে মন্দিরটা চিনে আসুন—কাল থেকে আর ডাকবো না।

স্বরে কি যেন একটা সুর বাজিয়া উঠিল। গোপীনাথ মনে করিলেন, যুবতী ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

আরতি দেখিয়া ফিরিবার কালে ললিতা বলিল, কেমন দেখলেন?

গোপীনাথ বলিলেন, তোমায় সত্য ব'লতে কি ললিতা, তৃপ্তি পেলাম না।

—কেন?

গোপীনাথ উদাস স্বরে বলিতে লাগিলেন, আজ দুপুরবেলায় যমুনার পানে চেয়ে ভাবছিলাম—বৈষ্ণব কবির অমর কাব্যে যে মোহন চিত্রটি আঁকা র'য়েছে—এ-কি সেই বৃন্দাবন? এরা বনের রাখালকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো ক'রচে, তাকে ক্ষীর-সর-ননী বা বনফলের বদলে রাজভোগ খাওয়াচ্ছে, পাঁচন বাড়ি ও বাঁশের বাঁশী কেড়ে নিয়ে হাতে দিয়েচে সোনার বাঁশী, পায়ের নূপুর দেখে মনে হ'লো—জিঞ্জির। আর মাথার মণিময় মুকুটে শিখিপুচ্ছ ম্লানজ্যোতিঃ হ'য়ে গেচে।

ললিতা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চমকিত হইয়া গোপীনাথ কহিলেন, হাসলে যে?

ললিতা কহিল, আপনার হা-হুতোশ দেখে।

গোপীনাথ বলিলেন, আমি যা বলচি সত্য নয় কি?

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। আমরা যখন ঠাকুর দেখি তখন তো ও-সব মনে হয় না। আমরা তো মনের মধ্যে ভেবে দেখি না, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। কবিরা যা লিখে গেচেন, চোখ বুজলেই তা দেখতে পাই। কেন, আপনি মনের মধ্যে সেই ছবি মিলিয়ে দেখুন দেখি কেমন না খুঁজে পান। সেই যমুনার জল, কদম বন, বাঁশীর সুর, রাখালের কলরব আপনি এসে কানে বাজবে। আছে সবই, নেই অনুভব ক'রবার মন।

গোপীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ললিতার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তুমি এত কথা কোথা থেকে শিখলে, ললিতা?

ললিতা হাসিয়া বলিল, শেখাটা কি আপনাদেরই একচেটে?

গোপীনাথ কণ্ঠে জোর দিয়া বলিলেন, কিন্তু তুমি কখনই ব্রজরমণী নও, তুমি বাঙালীর মেয়ে।

ললিতা উত্তর না দিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। হাসি থামাইয়া কিছুক্ষণ পরে কহিল, কিন্তু যা আপনাকে ব'লেচি তা আমার কথা নয়। গুরুদেব বলেন, জীবের মনেই বৃন্দাবন। পরমাত্মা তার শ্যামধন, আত্মা তার শ্রীরাধা। এই দেহ-বৃন্দাবনে আত্মা-পরমাত্মার লীলা প্রতিনিয়তই চ'লচে।

গোপীনাথ বলিলেন, তাঁদের লীলা ত' প্রতিনিয়তই হয়, সে লীলা দেখে কে?

ললিতা বলিল, কেন, প্রেমের অধিকারী যে, সেই সে লীলা প্রত্যক্ষ করে। কৃষ্ণলীলার প্রাণ হ'চ্চে, প্রেম। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ প্রেম। মুক্তিমার্গে প্রথম ও প্রধান সোপান প্রেম। প্রেম যার আছে, বৃন্দাবন তার কাছে কখনও শুষ্ক বা নীরস হয় না। আপনি হয়ত জানেন, কলিযুগেই শ্রীগৌরাঙ্গ এই ব্রজেরই প্রতি ধূলিকণায় কৃষ্ণ-রাধার মূর্ত্তি দেখেছিলেন, প্রতি ধেনুর হাম্বা রবে শ্যামনাম শুনেছিলেন, প্রতি রাখালের বংশীস্বরে শ্যামের বাঁশী মনে ক'রে ছুটে গিয়েছিলেন।

গোপীনাথ পুলকিত স্বরে কহিলেন, ললিতা, তোমার গুরু কে জানি না কিন্তু তুমি আমার গুরু! আজ আমার চোখ খুলে দিয়েচ। আমি বুঝেচি—আমাদের সাধনা বাহিরের নয়, তাকে অন্তর থেকে অন্তর-পুরে নিয়ে যেতে হবে।

ললিতা কহিল, আজ আসি। হয়ত এতক্ষণে আমার ব্রজবাসী ফিরেচে।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

বিশীর্ণা যমুনার বুকে চাঁদের ম্লান ছায়া পড়িয়াছিল, এখন সে ছায়াটুকু সরিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে ক্ষীণাঙ্গীর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না…

অতীতের যবনিকান্তরালে অমনই এক অস্পষ্ট কাহিনী মনোবৃন্দাবনে গ্রথিত হইতে লাগিল।

ষোল বৎসরের বালক ও দশ বৎসরের বালিকার কলহ। পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে নূতন অংশীদারের আবির্ভাবে বালক বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কারণে অকারণে বালিকাকে প্রহার ও নির্য্যাতন করিয়া আপন একাধিপত্য বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বালিকা কিন্তু সহজে সে অধিকারচ্যুত হইতে স্বীকৃতা হইল না।

সময়ে সময়ে সাধ্যমত চড়টা-চাপড়টা ও প্রবল কণ্ঠের ভাষা দিয়া আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শ্বশুর বুঝাইতেন, ছি, মা! স্বামী গুরুজন—ওকে কি গাল দিতে আছে, মারতে আছে?

বালিকা মুখভঙ্গি সহকারে বলিত, ভারি ত' গুরু—ইঃ! ও কেন আমায় মারলে?

এমনই করিয়া তিনটি বৎসর চলিয়া গেলে অধিকার-বাদের বিবাদ উহাদের কমিয়া আসিল এবং এক শুভ মুহূর্ত্তে তাহারা আবিষ্কার করিল, ইহা সত্যই অশোভন। তখন বসন্ত কি বর্ষা মনে পড়ে না। একদা তরুণ-হৃদয় আনন্দে শিহরিত হইয়া শয্যালীনা বালিকার পানে চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

আনন্দের ত' অনেক তুলনা আছে কিন্তু প্রথম নূতন-দৃষ্টির সঙ্গে যাহা ফুটিয়া উঠিল তাহা অতুলন।

সে একদিন গিয়াছে।

তারপরে ক'টি বৎসরে পৃথিবী স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে এবং প্রেম-উচ্ছ্বসিত চিত্তের মাঝে বৈরাগ্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু রহিয়া রহিয়া বাজিতেছে। বৈষ্ণব-কাব্যে—ধর্ম্ম-চর্চ্চায় চিত্ত তাহার মানবীর ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রেম ছাড়িয়া ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম-রসের আস্বাদ লইতে অতি-মাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছে। দু'টি পরস্পর বিরোধী ভাবধারা একই সঙ্গে মনের মাঝে তুফান তুলিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর লক্ষ্যে ছুটিবার ইঙ্গিত করিতেছে। একটিকে মনে হইয়াছে মিথ্যা মোহমাত্র, অপরটি সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল! একটি জগতের, অন্যটি জগতের বাহিরের।

অবশেষে দশটি বৎসর এমনই যুঝিয়া অ-মূর্ত্তের আলোকই প্রখরতর হইয়া উঠিল এবং ক্ষুদ্র প্রেম তুচ্ছ করিয়া গোপীনাথ বৃহৎ প্রেম-সমুদ্রে ভাসিলেন। কিন্তু বৃহৎ প্রেমে বৃন্দাবন এমন অস্পষ্ট হইয়া গেল কেন?

ললিতা ঠিকই বলিয়াছে, বৃন্দাবন অন্তরে। কিন্তু অন্তর খুঁজিলে এ বৃন্দাবনে যে প্রেমটুকু জাগে—তাহা এই জগতের। তাহাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে দশটি বৎসরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাহিনী—সেই মানবীর ক্ষণ-ভঙ্গুর নশ্বর প্রেম, সেই ম্লান গম্ভীর মুখ ও অশ্রু-ভারাবনত চক্ষু দু'টি।

এখানে শ্যামের বংশীধ্বনিতে, যমুনার কুলু-স্বননে, ধেনুর হাম্বারবে, মাধবীকুঞ্জের কোকিল ঝঙ্কারে ও তমাল-তরুর নবপত্র সমারোহে যে প্রেম আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার চরণ ভূমিসংলগ্ন। তাহার অপরূপ পদধ্বনি—কুঞ্জকুটীর দ্বারে, রাঙ্‌চিতার বেড়ার ধারে, বনলতার ফুলে-ফলে, সযত্ন রোপিত মঞ্জরীশোভিত তুলসীমঞ্চের চারিধারে, ভগ্ন দাওয়ার প্রান্তে এবং কুটীরের এক সামান্য শয্যায় মধুর হইয়া বাজিতেছে। বৃন্দাবনের দৃশ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র মনোহরপুর গ্রামেরই স্মৃতি-চিত্র।

হায় বৃন্দাবন!

কে জানিত, সম্মুখের তীব্র আকর্ষণের অন্তরালে পশ্চাতের এরূপ তীব্রতর আকর্ষণ রহিয়াছে! ... ...

(আগামী বারে সমাপ্য)

উদয়ন — ১৩৪১

কলিকাতায় দেশবন্ধু দিবস



বামে—শানগর শ্মশান-ঘাটে চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-মন্দিরের সম্মুখ-দৃশ্য।
মধ্যে—পুষ্প-অর্ঘ্যদান দৃশ্য।
দক্ষিণে—চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-মন্দিরের পার্শ্ব-দৃশ্য।
নীচে—শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু, দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা সমিতির সেক্রেটারী, সমাগত জনগণের সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছেন।

নিউনিসিপ্যাল গেজেটে প্রকাশিত চিত্র হইতে]

Blank page (s)

বৈষ্ণব পদাবলীতে দেশবন্ধু কথিত অকিঞ্চন সমরস

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার প্রসিদ্ধ বাঁকিপুর অভিভাষণে (নারায়ণ—পৌষ, ১৩২৩) বলিয়াছেন —

এই নরদেহ ধারণ করিয়া, জীবন্মুক্ত হইয়া অজ্ঞ, রুগ্ন, শ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কানায় কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখনো গাহিতেছেন—

মেরেছ কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দেব না॥

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন, প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে। আঁখি ছল ছল করে। মনে হয়, আমার জন্ম সার্থক।

সার্থক আমি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছি।

এখানে দেশবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, আমার জন্ম সার্থক, কেন না আমি বাঙ্গালী। আমি বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছি। বাঙ্গালা দেশে ত' অনেক বড় বড় বাঙ্গালী জন্মিয়া গিয়াছেন, সকলেই ত' এরকম বলেন নাই। বাঙ্গালী বলিয়া দেশবন্ধুর এমন একটা গর্ব্ব ছিল, যা অপর কোন বাঙ্গালী প্রধানের মধ্যে দুর্লভ।

তারপরে কথা, বাঙ্গালা দেশের এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল, মুগ্ধ করিল, যাহাতে তিনি বলিলেন যে, বাঙ্গলা দেশে জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহার জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক। এমন-কি পুনর্জন্ম নিতে হয় ত' আবারও এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিবেন—এমন কথাও স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন।

সমগ্র গৌড়-মণ্ডলে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে চৈতন্যদেবের আদেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ 'স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ আদি'কে হরিনাম দিয়া একধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে কোন যুগেই সমস্ত বাঙ্গালীর জন্য একটা ধর্ম্ম ছিল না। ব্রাহ্মণ ছিল, বৌদ্ধ ছিল; জৈন কম ছিল। শৈব, নাথ-পন্থী, সহজ-পন্থী, মহাযানী ও বজ্রযানী, মন্ত্রযানী ও কালচক্রযানী ছিল। বিভিন্ন শাক্ত মতের উপাসক ছিল, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মুসলমানেরা আসিবার আগে এই সমস্ত এত রকমের ধর্ম্ম-মত ও পথ বাঙ্গালায় ছিল।

তিন শ' বছর পাঠান রাজত্বের পর চৈতন্যদেবের আদেশে, প্রভু নিত্যানন্দ স্ত্রী জাতি ও পতিত জাতিদের উদ্ধারের জন্য এমন একটা ধর্ম্মমত বাঙ্গালায় প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, যে-ধর্ম্মে সকল ধর্ম্মের লোকই আসিতে পারে। মুসলমান আসিতে পারে, খৃষ্টান যদি ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় থাকিত তবে খৃষ্টানও আসিতে পারিত। মূল কথা, কোন ধর্ম্মের লোকের পক্ষেই প্রভু নিত্যানন্দ-প্রচারিত বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিতে বাধা ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্মের এই মূর্ত্তিই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মুসলমানকে আর এখন গোস্বামী প্রভুগণ বৈষ্ণব করেন না। কিন্তু চৈতন্যদেব নিজে অনেক মুসলমানকে বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তাঁর খ্যাতি॥
(চৈঃ চঃ)

আচার্য্য অদ্বৈত শ্রীবাসের বাড়ীতে চৈতন্যদেবের মহা-অভিষেকের সময় এই বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি ভক্তি বিলাইবা তবে—

স্ত্রী শূদ্র মূর্খ আদি তাদেরে সে দিবা।

* * * * *

চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়া।

মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন, বলিলেন—"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার।" নীলাচলে চৈতন্যদেব এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়াই ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বলিলেন—

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে।

তা তুমিও যদি মুনি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এখানে আমার সঙ্গে থাকিলে—

তবে অবতার কি নিমিত্ত করিলে আমারে।

অবতার হওয়ার উদ্দেশ্য মূর্খ, নীচ, দরিদ্রকে প্রেম-সুখে ভাসান। এই গণ-তন্ত্র-যুগে বাঙ্গালীর মধ্য-যুগের এত বড় একটা কল্পনা ও ইতিহাস পথে তাহার সেই বিরাট সমারোহপূর্ণ বিচিত্র অভিযান আমরা আজ ভাল করিয়া ধারণাই করিতে পারি না। গণ-তন্ত্র-যুগে, মধ্যযুগের এই অকিঞ্চন সমরস—যাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন—

চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।

তাহা আত্ম-বিস্মৃত, জীবন-সংগ্রামে নিয়ত পর্য্যুদস্ত বাঙ্গালী জাতির কি একবার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর হইবে না?

বাঙ্গালার পতিত-উদ্ধার ব্রতে ব্রতী, নিত্যানন্দের কপাল ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ঝরিতেছে — তবু বাঙ্গালার অকিঞ্চন সমরসের জন্মদাতা, বাঙ্গালার অহিংস-মন্ত্রের পুরুষসিংহ বলিতেছেন—

মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ-দুই শরীর
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির।

অথচ

নিত্যানন্দ অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে,
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে।

মানস নয়নে, ইতিহাস পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এই দৃশ্যটি দেখিয়াই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন—

আমার জন্ম সার্থক।
সার্থক আমি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জীবন মাগো তোমায় ভালবেসে।

কেন না,

কোন্ কাননে ফুটে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠেরে চাঁদ, এমন হাসি হেসে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—

এই দেশেতে জনম আমার,
যেন এই দেশেতেই মরি।

কেন না,

ভাইয়ের মায়ের এমন স্নেহ,
কোথায় গেলে পাবে কেহ।

মাইকেল মধুসূদন তাঁর মত করিয়াই বলিয়াছেন—

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

কেন না তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন—

…রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

পরিশেষে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

এই সমস্ত পূর্ব্বগামী কবিদের উক্তির সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের উক্তি "সার্থক আমি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছি" মিলাইয়া দেখিলে এবং যে কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেশবন্ধুর মনের ও চরিত্রের এবং বাঙ্গালা দেশের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাক, প্রভু নিত্যানন্দ-প্রচারিত আধুনিক গণতন্ত্র যুগের অপরিহার্য্য নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যুগলরস হইতে পৃথক এই অকিঞ্চন সমরসকে পরবর্ত্তী-পদকর্ত্তারা কি রূপ ও আকার দিয়া গিয়াছেন।

(১) গোবিন্দ দাস বলিতেছেন—নিত্যানন্দ গৌর প্রেমে ডগমগ, তিনি পথ চলিতে পারেন না। তিনি 'পাষণ্ড খণ্ডন'। সুতরাং এই অকিঞ্চন সমরসের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ পাষণ্ডিদিগকে দমন করা অর্থাৎ এক সাম্যবাদী বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আনিয়া তাহাদিগকে দীক্ষিত করা—

প্রেম-সুধারস জগভরি বরিখল
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি।

জগৎ ভরিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রেম-সুধা-রস বর্ষণ করা অকিঞ্চন সমরসের একটি প্রধান কার্য্য এবং তাহার অভিব্যক্তি।

(২) প্রসাদ দাস নিত্যানন্দকে দেখিতেছেন 'শিরপর পাগড়ি বান্ধে নট-পটিয়া' আর দেখিতেছেন—

দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।

নিত্যানন্দ 'দয়ার ঠাকুর' এবং এই রূপে, এই মূর্ত্তিতে এবং এই ভাবে জগতে তাঁহার প্রকাশ। অকিঞ্চন সমরস দয়ার মধ্য দিয়াও আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

(৩) লোচন বলিতেছেন—

নিতাই গুণমণি মোর নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলে অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান॥
লোচন বোলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল জ্বালি দিয়ে তার মাঝ মুখখানে॥

লোচন নরহরির শিষ্য। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শিষ্য। বৃন্দাবনদাস নরহরিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তথাপি লোচন বৃন্দাবনদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও প্রভু নিত্যানন্দ-সম্পর্কে বিশেষতঃ তৎপ্রচারিত অকিঞ্চন সমরসের স্বরূপ বর্ণনায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা হয় না।

নিতাই প্রেমের বন্যা আনিয়া পৃথিবী ভাসাইল। নিতাই প্রেমের বন্যা লইয়া গৌড়দেশে আসিল—এই প্রেম যুগলরসের প্রেম নয়, ইহা 'দীন-হীন পতিত পামরের' প্রতি প্রেম। যে প্রেম হইতে নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহা সেই প্রেমের বন্যা—

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সভাকারে যাচে।

ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সভাকারে যাচে নাই। স্ত্রী শূদ্রকে উপেক্ষা করিয়াছে। নিত্যানন্দের সমরস সাম্যবাদ সভাকারে যাচিয়াছে। ইহাই নিত্যানন্দ-প্রচারিত বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

তৎকালীন হিন্দু সমাজে নিশ্চয়ই এই অকিঞ্চন সমরসের অভিব্যক্তি প্রথম ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ রূপে দেখা দিয়াছিল, দ্বিতীয় ইহা একটা ভয়ঙ্কর সমাজ বিপ্লব বলিয়াও ব্রাহ্মণেরা মনে করিয়াছিলেন।

লোচনে আমরা আভাস পাইতেছি যে, নিত্যানন্দের এই সমরস প্রচারে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিহাসে কোন বড় সত্যই বিনা প্রতিবাদে প্রচার হয় নাই। যে সত্য যত বড় তাহাকে তত বড় বিঘ্ন ও বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।
লোচন বলিতেছেন—

লোচন বোলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে,
আনল জ্বালি দিয়ে তার মাঝ মুখখানে॥

দেখা যাইতেছে, নিত্যানন্দের সমরস প্রচারের বিরুদ্ধে তখন একটা আপত্তি উঠিয়াছিল। এই অকিঞ্চন সমরসের প্রতিবাদকারী আবহমান কালের সনাতন পাষণ্ডীগণ বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে আজিও বিদ্যমান। সুতরাং অকিঞ্চন সমরসের প্রয়োজন শুধু ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালাতে নয়—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালাতেও সেই প্রয়োজন ও অভাব অনুভব করা যাইতেছে। কিন্তু যুগলরসে মুহ্যমান বাঙ্গালী তাহার রসকীর্ত্তনের নব্য সংস্করণে এই অকিঞ্চন সমরসকে একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছে। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আক্ষেপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—এই সমরসে "কল্পকলার সে রূপান্তর কোথায়ও ফুটিয়া উঠে নাই, শুধু আভাসেই থামিয়া গিয়াছে। তবে এখনও বাঙ্গালায় ভিখারী-বৈষ্ণবে তাহা গাহিয়া বেড়ায়।"

আমার মনে হয়, যাহা ভিখারী-বৈষ্ণবে এখনও গাহিয়া বেড়ায় তাহা ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সে দিন শুধু আভাসেই থামিয়া যায় নাই। যদি যাইত তবে আজ বাঙ্গালায় মাত্র ২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ১ কোটি সংখ্যক লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত না এবং বৈঠকী রস-কীর্ত্তন হইতে ইহা উঠিয়া গেলেও ভিখারী বৈষ্ণবে তাহা পথে পথে গাহিয়া বেড়াইত না। এমনও তো হইতে পারে যে, অকিঞ্চন সমরসের সমস্ত পদ আমরা এখন পর্য্যন্তও পাই নাই। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য সমস্তই উদ্ধার হইয়াছে—এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিবে? বিশেষতঃ যুগলরস আস্বাদনকারী পদ-সংগ্রহকারগণ অকিঞ্চন সমরসের পদগুলি সংগ্রহের প্রতি যে বিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন এমন তো মনে হয় না।

(৪) আত্মারাম দাস নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি
কঞ্জ-নয়নে বহে লোর।
প্রেমেত অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর॥

* * * *

আগম-নিগম-পর বেদ-বিধি-অগোচর
তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইলুঁ কৃপা-লেশে
রহি গেলু পাষাণ সমান॥

কর্ত্তা ভজা ও কিশোরী ভজনের বাঙ্গালায় পতিতেরে দেখিয়া প্রেমেতে অবশ নিত্যানন্দ-পন্থী বৈষ্ণব গোস্বামীগণ আর এখন হন না। সে বেদ-বিধি অগোচর অকিঞ্চন সমরসের ধারা বাঙ্গালায় লুপ্ত হইয়াছে। সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে ইহার প্রয়োজন এখন অনুভূত হইলেও আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি নিজের ইতিহাস না জানিয়া অজ্ঞতায় ও অক্ষমতায় এই প্রাচীন ধারাকে পুনরায় জাতীয় জীবনে প্রবাহিত করিবার পথ পাইতেছে না।

(৫) দুঃখী কৃষ্ণদাস বলিতেছেন—

এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দুঃখী কৃষ্ণদাসে।

* * * *

ইহ কলিযুগ জীবে উদ্ধার হইবে এবে
কহে দীনদুঃখী কৃষ্ণদাস।

কেন না রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে হারাই পণ্ডিতের পুত্ররূপে মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবতীর্ণ হইয়াছেন। নিত্যানন্দের অবতরণ কলিযুগের জীব উদ্ধারের প্রয়োজনে হইয়াছিল। বৈষ্ণব দাস বলিতেছেন তখন বাঙ্গালা দেশের লোকেরা—

নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে ধন ব্যয় করে সভে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানা মতে জীব হিংসে
এই মত ছিল সর্ব্ব দেশ॥

বৈষ্ণব দাসের পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাসও চৈতন্য ভাগবতে ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। লোকেরা তখন মদ্য-মাংস দিয়া যক্ষ পূজা করিত। যথা—

মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে॥
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।
নিরবধি নৃত্য-গীত বাদ্য কোলাহলে॥

(চৈঃ ভাঃ ১৭—১৮ পৃঃ)

(৬) প্রসাদ দাস নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

করুণায় সভা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে আইস আইস করি কোলে
প্রেম-ধন সভারে বিলায়॥
... ...
নিতাই করুণা সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন মদেত অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল॥

বাহু পসারিয়া পতিতদের (হরিজন?) 'আইস আইস' বলিয়া বাঙ্গালী ১৫১৬ খৃঃ হইতে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও বহু বৎসর ধরিয়া ডাকিয়াছিল। কবে কোন্ পাপে সে আবার বাঙ্গালীর সেই অকিঞ্চন সমরস বিলাইবার সিংহ গর্জ্জন থামিয়া গেল? কেন এমন হইল? কিসে এমন হইল? বেদ বিধির কর্ত্তা শুধু ব্রাহ্মণই কি ইহার জন্য দায়ী? ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। বিশেষ করিয়া উচিত তাহাদের যাহারা আজ রস কীর্ত্তনের নব্য সংস্করণের মধ্য দিয়া কেবল এক যুগল রস বিলাইবার ও ছড়াইবার জন্য ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাহারা কেবল যেন 'মদন-মদেতে অন্ধ' না হন। 'পতিত জনার বন্ধু' হইয়া করুণায় যেন জগৎ ডুবাইয়া দেন—ইহাই ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মনোগত অভিপ্রায়। কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া যে বিরাট কল্পনা তিনি করিয়া গিয়াছেন, আশঙ্কা হয় আজিও আমরা তাহা জানি না এবং তাহার গভীর অর্থও আমরা বুঝি নাই। দেশবন্ধুর কীর্ত্তনের অভিপ্রায় না জানিয়া ও না বুঝিয়া আমরা বাজার চল্‌তি কীর্ত্তন প্রহসনে মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষকে বাঙ্গালার এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের স্মৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দিতে পারিতেছি না।

দেশবন্ধু বলিয়াছেন —

(১) "সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য মিশ্রিত এই অকিঞ্চন সমরস আর কোন সাহিত্যে নাই। ইহা বাঙ্গালায়ই সম্ভব। কেন না ইহা বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল।"

(২) "এই রস-সৃষ্টি পরবর্ত্তী নরহরি, নরোত্তম, লোচন, বলরাম প্রভৃতি কবিরা সাধন করিয়াছিলেন।"

বৃন্দাবন দাসের কথাও দেশবন্ধু বলিয়াছেন কিন্তু (ক) গোবিন্দ দাস (খ) মনোহর দাস (গ) প্রসাদ দাস (ঘ) আত্মারাম দাস (ঙ) দুঃখী কৃষ্ণ দাস—ইঁহারাও যে পদাবলী সাহিত্যে অকিঞ্চন সমরসের সাধন করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। মনে হয়, আরও কত পদকর্ত্তা এই রসের সাধন করিয়া গিয়াছেন বাঙ্গালী তাহা জানে না। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কত বড় একটা ধারা আজ আমাদের সম্মুখে লুপ্তপ্রায়।

মানবের দেবজন্ম

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি-এ

ঐ দেবালয়, যেথানে মানুষ খুঁজিল শান্তি-পথ ;
প্রতিমার কাছে কাঁদিল নিত্য পুরাইতে মনোরথ।
ব্যথার অশ্রু করি' নিবেদন পূজিল প্রেমের ফুলে ;
অচল পাথর নিরব নিথর, চাহিল না মুখ তুলে।

দেবনাম-গাঁথা করিতে প্রচার ব্যথা পেয়ে নিজে কাঁদি,
ভাই বলে ডাকি নিজের শত্রু লইল বক্ষে বাঁধি।
দেবতা চাহিল মানব-অস্থি অপরূপ ইতিহাস ;
তারও প্রতিদানে চাহে নি মানব সু-লভ স্বর্গবাস।

স্বর্গে মিলে না শিবি, বলীরাজ, কর্ণ, পার্থবীর।
ধরণীর বুকে তারাই দেবতা সেই পদে নত শির—
তাদের শক্তি, ভক্তির কাছে দেবতারো পরাজয়।
মানুষ মহান্, অতি সুমহান্, কোন কালে ছোট নয়—

মানুষের গেহ সেই দেবালয়, স্নিগ্ধ সুষমা তাহে।
মিথ্যা সে কথা, মর্ত্ত্য-মানব ভিন্ন স্বরগ চাহে।



ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে একদিন ছিল, যখন আমাদের নিজেদের মন বলে বস্তু আমাদের অধিকারে ছিল, আর আমার মনে হয় যে, সে দিন সিংহলকেও তারই এক অংশ বলে মনে করতাম। সে বস্তুটি ছিল জীবন্ত, তার চিন্তা করবার শক্তি ছিল, সে অনুভব করত, সে নিজেকে প্রকাশ করে রূপ দিতে পারত। তার গ্রহণ করবার ক্ষমতাও যেমন ছিল, তার সৃষ্টি করবার শক্তিও তেমনি ছিল। কিন্তু আজকের এই আধুনিক শিক্ষা দানে, শিক্ষার যে চরম সার্থকতা ও উদ্দেশ্য সেটা একেবারে ভুল হয়ে গেছে। তার বদলে আমরা পেয়েছি, বড়-বড় বাড়ী, গাদা-গাদা কেতাব, আর অপূর্ব্ব রকমের হিসাব করা ভারি বোঝা, যা আমাদের মনকে দমিয়ে শেষ করে দিয়েছে—আমাদের যে সহজ সরল গানের সুর ছিল, তার জায়গায় এনেছি, ইংরেজী অরকেষ্ট্রা, সহজ চোখের দৃষ্টির বদলে চোখে পরেছি পরকলা।

ভারতবর্ষের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন দেবী সরস্বতী। তাঁর আসন ছিল, মানুষের হৃদ্দেশে ; জীবনের যে জীবন্ত আলোক, তার দীপ্তি, তাই থেকেই স্ফুরণ হত। প্রতীচ্যের যে বিদ্যা, যা আমরা ভাগ্যের খেলায় জানতে পেরেছি, তা হল ব্যক্তিত্বহীন। সে বিদ্যার রঙ শুভ্র, কিন্তু তার শুভ্রতা হল স্কুলের ক্লাস-ঘরের চুণকাম-করা—শাদা দেয়ালের মত। তার বাস হল বরফ-দেওয়া-খুবরির ভেতর, যাতে খাবার না পচে, সেই খুবরি। বালককালে আমাকে বাধ্য হয়ে সেই রকম স্কুলে যেতে হত, তার যে কি রকম ফল হয়েছিল, তার যে কি ছাপ আমার মনের উপর দিয়েছিল, সে আমি অন্যত্র বর্ণনা করেছি। আমার মনের ভাবটা ছিল ঠিক সেই রকম, যেমন একটা জীবন্ত গাছকে তার পরিপূর্ণ জীবনের ধারার গতিতে পূর্ণ ও সহজভাবে বাড়তে না দিয়ে তাকে কেটে ছেঁটে তার স্বাভাবিক গতিকে সঙ্কোচ করে একটা প্যাকিং বাক্সর ভেতর পুরে রাখার মত। স্বাভাবিকী শক্তি, তার বৃদ্ধি, তার পরিণতির জন্য স্বাধীনতারূপ যে সহজ খাদ্য, তা থেকে মনকে বঞ্চিত করে রাখা হত, আর তার বদলে শুধু একজামিন্-পাশ করার যে অস্বাভাবিক তৃষ্ণা ও ক্ষুধা তারই সৃষ্টি করা হত। যত-কম জ্ঞান সঞ্চয় করে যত-বেশী একজামিনের নম্বর পাওয়া যায়, তাই হল কৃতকার্য্যতার মাপকাঠী—তার ফলে হয় জ্ঞানকৃত অন্যায়, জ্ঞানের একটা শুধু অসৎ রকমের চাতুর্য্যের খেলা। এ অবস্থায় মন তার নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে। অথচ এই যেমন চলেছে, তার ফল ও কৃতকার্য্যতায় আমরা পরম সুখী। এই রকম করে আমরা একজামিন পাশ করে চলেছি আর দুমড়ে-মুসড়ে হয় কেরাণী হয়ে, না হয় পুলিশের দারোগা হয়ে অকালে চোখ বুজছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্দেশ্য হওয়া কখনও উচিত নয় যে, কতকগুলো যান্ত্রিক চাকার কল-কব্জা হবে সে জ্ঞান সঞ্চয়ের, আর সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের কাছে শুধু সেই জ্ঞানটুকু বিস্তার করে দেবে, যাতে তারা বেশ এক-রকম সুখে-স্বচ্ছন্দে খেয়ে-মেখে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য হচ্ছে, আমাদের ভিতর থেকে অনুশীলনের বীজ বপন করা, আর তা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া। এই বিশাল ভারতের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এতবড় দেশের ভিতর এমন একটিও বিশ্ববিদ্যালয় আজকার দিনে নেই, যেখানে কোন ভারতীয় বা বিদেশী ছাত্র, ভারত-অনুশীলনের যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তার দান বা তার স্বরূপকে অনুভূতিতে গ্রহণ করতে পারে কিম্বা তাকে সে বিষয়ে সজাগ করে দেয়। ভারতবর্ষীয় অনুশীলন-জাত যে মন, তার পূর্ণতা নিয়ে যে ফল, তা কোন ছাত্রই দেখাতে পারে না। যা আমাদের

অভাব, যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তা অর্জ্জন করতে হলে আমাদের যেতে হয় মহাসমুদ্র পার হয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স কিম্বা জার্ম্মাণীর দরজায় কড়া-নেড়ে ভিক্ষা করতে। যা আমরা করি, তাতে জ্ঞানের যে একটা আত্ম-সম্মান ও মর্য্যাদা আছে, তাকে পরের কাছে একেবারে হীন করে দিই।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু কতকগুলো ঢাক পিটনো শব্দের ডিগ্রী দেয়, যা শুধু ধার-করা ময়ূর-পুচ্ছের মতই দেখায়। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের যে জ্ঞান, তার স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠাই দরকার, আর সেই হল তার এই অনুশীলনের গৌরব। অনুশীলনের সিদ্ধিলাভ কতটা হয়েছে, তার মানদণ্ড বা নিকষ হল তার পূর্ণতার প্রকাশ দিয়ে—বাইরের এই সিদ্ধাই দিয়ে নয়। বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য যে সিদ্ধাইয়ের এই আকর্ষণ, মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান, তার শিরে চরম অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেয়—আজকের ভারতবর্ষ সেই অপমান, সেই হীনতাই মাথায় করে বইছে। একদিন ছিল, যে দিন ভারতবর্ষ তার নিজের অনুশীলন নিজেই যোগাত, আর তা তার নিজের দেশের প্রাণ থেকেই স্ফুরিত হত। আজ তার সন্তানেরা নিজেদের দেশের যা কিছু তা সব ফেলে দিয়ে পর পর শুধু একজামিন-পাশের জন্যে ঘুরে বেড়াতে চায়। জ্ঞান অর্জ্জনের জন্যে নয়, শুধু এই ইস্তাহারটুকু জারী করে বেড়াবার জন্য যে, তারা চাকরির উপযুক্ত হয়েছে, তাদের গড়া হয়েছে ইংরেজী ধরণে, তাদের পরিচালনা করা হয়েছে ইংরেজী ধরণে—তাতে হয়েছে এই যে, তারা কেবল চাকরিরই উপযুক্তই হয়েছে, তার বেশী আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষের ভেতর একটা অশান্তির ছায়া জেগে উঠে মাঝে একবার ন্যাশানাল স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলবার জন্যে অনেক চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু ভাগ্য বাম, তাদের সেই শিক্ষা-প্রণালীও তাদের আসল অনুশীলনের পথ থেকে বঞ্চিত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সহজ ভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও লোপ হয়ে গেছে। যে সব শিক্ষা তারা পেয়েছে তাদের স্কুলে, তা ত' মানুষকে গড়ে তোলবার জন্যে নয়, সৃষ্টি-শক্তি বাড়াবার জন্যে নয়—শুধু ধার-করবার বিদ্যাই শিক্ষার জন্য। যখন কোন বিদেশী প্রতিবেশীর কাছে এই বিদ্যা ধার করতে যায়, তখন তারা এটা একেবারে ভুলে যায় যে, বাইরের প্রকাশের অন্তরেই রয়েছে আসল উৎস। সে দিকে তাদের নজরই নেই। সে উৎস পাঠ্য-কেতাবের ভেতর নেই, আছে মানুষের গ্রহণ করবার মনে, তার সৃষ্টি করবার অন্তরকোণে। তাদের এটা ভাল করে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, য়ুরোপীয়দের নানা বিচিত্র জীবনের কর্ম্মের মধ্যে, তাদের সমবেত জীবন ধারার অন্তরে, তাদের সকল ক্রিয়া-কলাপের ভেতরে, তারা তাদের দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের বড় বড় মনীষীর সঙ্গে, অহরহঃ সম্পর্কের স্পর্শের মধ্যে আছে—যে মনীষীরা অবিরাম সৃষ্টি করছেন, আর সর্ব্বদাই তাঁদের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মহান্ ত্যাগ ও বীরত্বের প্রকাশ করছেন। ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবার সব কিছুই আছে নেই শুধু তাতে মানুষের প্রাণের স্পর্শ—তার প্রাণবন্ত অবয়ব।

সব চেয়ে দরকারী কথা, সব চেয়ে বড় সত্য যা, তা তারা সকল সময়েই ভুলে-যাওয়ার অভ্যাস করে নিয়েছে। সেটা এই যে, শিক্ষক যদি নিজে বিদ্যাবান্ না হয়, তবে সে অন্যকে বিদ্যা দান করে কি করে। —এক দীপ থেকে অন্য দীপের জ্বলন্—একটা দীপ অন্য একটা প্রদীপকে জ্বালাতে পারে না, যদি না সে নিজে জ্বলে, নিজে না আলো দেয়। যে শিক্ষক শুধু কেতাবের বুলিই আউড়ে চলে, সে কিছুই শেখাতে পারে না, কোন প্রেরণা সে কখনই জাগাতে পারে না। আর যেখানে সে অনুপ্রেরণা নেই, সেখানে চিন্তা তার নিজের গড়ে ওঠবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, আর বেশীর ভাগ সময়ই স্কুলে অপচয় হয়, কারণ, তাদের কাছে যা শেখান হয়, তার বেশীর ভাগ হল প্রাণহীন বস্তু-কথা। শিক্ষা-আয়তনের সকল সময়ই এই

জিনিসটি মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হল সত্য-জিজ্ঞাসার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পথ করে দেওয়া, আর জীবন্ত প্রাণবন্ত যে মন, তাকে যে ভাবে নকল-বিদ্যা দিয়ে তৈরী করা হয় তা নয়। শিক্ষা-আয়তনের এমন খোলা ভাব থাকা দরকার, খোলা দরজার মত, যেখানে অধ্যাপক আর ছাত্ররা নিজেদের বাড়ীর মত মেলা-মেশা করতে পারে। একই রকমের সঙ্কুচিত-জীবন যাপন করতে হবে—একজন আর একজনের সঙ্গে কর্ত্তৃত্বের কর্ত্তামীর আবহাওয়ায় বাস করলে চলবে না, তার উপর কর্ত্তৃত্ব না করে, উভয়েরই একই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সে উদ্দেশ্য শুধু অনুশীলন ও সত্যের সন্ধান করা। যাতে প্রত্যেকের নিজস্ব যে ব্যক্তিত্ব তার স্ফূরণ হয়, আর তাই গড়ে উঠে সেই জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের পথ করে দেয়। এই ভাবে সৃষ্টির দিক দিয়ে, তার ভাব দিয়ে তাদের মধ্যে চালনা করতে হবে, যার দ্বারা তাদের মধ্যে যে মানুষী-ভাব প্রাণবন্ত হয়ে আছে, তাকে বুঝিয়ে দিতে পারে; সত্যের জন্যে যে সাহস, ত্যাগের জন্য যে শক্তি, সৃষ্টির জন্য যে কারুতা, তা সব অনায়াস-সাধনে লাভ করতে পারে। মাত্র শুধু পড়ুয়ার শিক্ষা-প্রণালী দিয়ে মানুষের প্রকৃতিতে যে শ্রেয়ঃ আছে, তাকে প্রকাশ করতে কেউ পারে না। সেইজন্য শিক্ষার যে সত্য প্রাণ-শক্তি, তার প্রকাশ একেবারে অপূর্ণ থেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা দাবী করব সেই জিনিস গড়ে তোলবার, যা লেবেল-আঁটা ছাপ নয় বা ক্ষমতা-প্রাপ্ত এজেন্ট নয়। আমরা দাবী করব সেই শিক্ষার যা সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য অনুসন্ধিৎসা এনে দেবে, মানসে এমন একটা মনন-শক্তি জাগিয়ে তুলবে, যে শক্তি সারাটা দেশ জুড়ে তার খেলা খেলবে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইটাই হল সবচেয়ে বড় কাজ, যা একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত জীবের রস-সঞ্চালনের পথ হবে, আর যা দেশের লোকের ও জাতির জ্ঞানের একনিষ্ঠার ধারাকে স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করবে।

এ-কথা বলা হয় যে, জ্ঞানের ঐক্যতা বা একনিষ্ঠ ধারা ভারতবর্ষে না কি হওয়া একেবারে, অসম্ভব, কারণ ভারতে নানা বিভিন্ন ভাষা, নানা জাতির মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু আমি মনে করি, এ একটা অকারণ অবান্তর ধারণা। তারা অন্ততঃ একথা স্বীকার করুক যে, ভারতবর্ষ ঠিক অন্য দেশের মত নয়। যদি ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোক আছে বলে ধরা হয়, য়ুরোপের সম্বন্ধেও ঠিক সেই রকম কথা বলা যায় না কি? য়ুরোপের অধিবাসী-দের মধ্যে নানা বিভিন্ন ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা একই ধরণের স্বাভাবিক ঐক্যের বাঁধন দেওয়া শিক্ষাই পায়। সেখানেও ভাষার ঐক্য যে নাই, তাও সত্য।

এই ভারতবর্ষেও একদিন ছিল, যেদিন শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীতে স্বাভাবিক ঐক্য ছিল। সে কিন্তু এই প্রতীচ্যের যে শিক্ষা দেওয়ার বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশে এসে চেপে বসবার পূর্ব্বের যুগের ব্যাপার। বোঝা টানার ঘোড়াটাকে যদি ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার দেহে পরিণত করা হয়, তাতে যে ফল হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এতে এমন একটা বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় যে, না পারে সে ঘোড়দৌড়ে জয় লাভ করতে, না পারে সে গাড়ীর বোঝা টানতে। প্রতীচ্যের-শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের অন্নের সংস্থান হয়ত করে দিতে পারে, কিন্তু সুদূর গ্রহ থেকে আলো দেওয়ার মতন, এ-শিক্ষা কোনদিনই সত্যের অনুসন্ধানে সাহায্য করবে না, আর সেই সত্য উপলব্ধি করে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাবে না। এই কারণে ভারতবর্ষে য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষা শুধু স্কুলের পড়ুয়া তৈরী করে দেয়—অনুশীলনের সাধনা ও সার্থকতা আনে না। এ-শুধু কতকগুলো টেক্সট্-বুক—পাঠ্য-কেতাব এনেছে, আছে তাতে কতকগুলা জড়ো-করা বিদ্যা। তারা জীবনের যে সত্য-রূপমাধুর্য্য, তার অন্তরের যে নিগূঢ় রহস্য তা এনে দেয় না। সে রহস্যের দিকে তাকাবার চোখ

আমাদের অন্ধ হয়ে গেছে। যে অনুশীলন বিদেশী, বিদেশী বলেই সে অনুশীলনের উপর আমার কোন অবিশ্বাস নাই, শুধু এই শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে কোন সুফল দেয় নি ও দিতে পারে না বলেই আমি একে বিশ্বাস করি না। কারণ য়ুরোপের প্রাচীন অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের কোন সংযোগ নেই বলে নয়, তাদের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুশীলনের প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলে। আর য়ুরোপ শুধু তাদের জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে আমাদের কাছে আসে নি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রকৃতিগত আনুষঙ্গিক ভঙ্গিও নিয়ে এসেছে।

এই কারণে আমাদের যে অনুশীলন তাকে উন্নতির উচ্চ সোপানে তুলে ধরতে হবে প্রতীচ্যের জ্ঞান বা প্রতিভাকে বাধা দেবার জন্য নয়, তাকে এমন পথে চালিত করতে হবে, যাতে সেই জ্ঞান আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা শুধু নয়—একেবারে হজম করে নিতে পারি। তাদের সেই অনুশীলনকে আমলকী ফলের মত হাতের মধ্যে নিয়ে তাকে আমাদের কাজে লাগাবার মত করে নিতে হবে, শুধু কেতাবী-ভাষা আর কেতাব থেকে কতকগুলো জিনিস জড়ো করে তাই নিয়ে বাঁচা চলবে না। যা আমরা তাদের কাছ থেকে ঋণ করেছি, সে ঋণ আমাদের জমার খাতায় পড়ে নি—সে আমাদের ঘাড়ে দেনার ভার চাপিয়ে দিয়েছে। এ কথা আমরা বিশ্বাস করতে একেবারেই রাজী নই যে, একজন মানুষ হঠাৎ একটা বস্তু আবিষ্কার করে ফেলে ইতিহাসে একেবারে নবযুগ এনে দেয়। অতীতের যে প্রতিভা সেই এ ভবিষ্যতের নবরূপের জন্মদাতা। আমাদের হতভাগ্য দেশের লোক অতীতকে পাবার ও নেবার সমস্ত সুযোগ হারিয়েছে, আজ তারা বর্ত্তমানকেও হারাতে বসেছে। দিনের অন্নমুষ্টির জন্যে আমরা প্রতিদিন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এ যেন কেউ কল্পনায়ও অনুমান না করেন যে, আমরা পৃথিবীর মধ্যে সম্পত্তিহীন ত্যাজ্য-জাতি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আমাদের যে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে তা সহজ ভাবেই প্রকাশ হোক্। এস নিজেদের যে ভবিষ্যৎ তা আমরা নিজেরাই গড়ে তুলি, আর যেন এমন চিরকাল ধরে অন্য লোকের জঞ্জাল কুড়িয়ে নকল মানুষের রূপ নিয়ে এমন করে সংসারে আর না বেঁচে থাকতে না হয়।

শিক্ষার ভিতরে যে জ্ঞানের দিক, এতক্ষণ আমি তারই কথার আলোচনা করলাম, কারণ প্রকাশ-ভঙ্গির যে পূর্ণতা, তাই জীবনেরও পূর্ণতা। শুধু ভাষার মধ্যেই জীবনের সমস্ত প্রকাশ, পূর্ণ বিকাশ হয় না। সেইজন্য আমরা আমাদের ভাষায় প্রকাশ ছাড়া অন্য দিক দিয়েও জীবন ও অনুশীলনের প্রকাশ-ভঙ্গি চাই। আমাদের মানুষের মন ও চরিত্রকেও ভাল করে জানতে হবে, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শুধু জ্ঞান সম্ভারের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করে তোলা নয়, মানুষের সঙ্গে ভালবাসার বাঁধন রাখতে হবে, সৌখ্য আনতে হবে। আর সে জন্য মানুষকে বোঝা ও মানুষের চরিত্রকেও নিখুঁত ভাবে জানা অতি প্রয়োজন। আমাদের বুঝে নিতে হবে অপরের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—সেই ব্যক্তিত্বই মানুষের হৃদয়ের আসল ভাষা। আমাদের সৃষ্টি-প্রকৃতির দিকে বেশী করে নজর দিতে হবে, যাতে আমরা মনুষ্যত্বের মধ্যে সেই ভাব, সেই মানবতার যে প্রাণস্পর্শ তা থেকে না বঞ্চিত হই, যে প্রাণ যে সহানুভূতি যে ভাবসম্বেগ মানুষের ইতিহাসের আদি থেকে আজও চলে আসছে, আর যা মানুষের চিরন্তন সম্পদ।

আধুনিক প্রতীচ্যের অনুশীলন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান শুধু ব্যাকরণের কতকগুলো সূত্রের গণ্ডির ভিতরেই নিবদ্ধ। মানুষের প্রকৃতিতে এই রূপের মধ্যে যে একটা রসের দিক আছে, তাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কোথায় আমাদের সেই সহজ পূর্ণ হৃদয়, যা থেকে সেই অধ্যাত্ম-জীবনের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, যা অবিরাম সহজ স্রোতের ধারার মত আসে, তা কোথায়? আমাদের আধুনিক শিক্ষার এই মহৎ দোষের জন্যই যা কিছু মৃত জঞ্জাল-স্বরূপ অনুশীলন, যা জ্ঞানের অনশনের রূপ নিয়েছে, তার ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে—আর সংসারে পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেয়ঃ, যা কিছু সুন্দর ও মধুর, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের এ শিক্ষা-আয়তন নয়, এ আমাদের কারা-আয়তন। এর আছে দুটো দরজা, তার একটা হল সাজা ভদ্রতা আর একটা দৈননিন-প্রয়োজন, যার ভেতরে আমাদের শ্রুতি মনটাকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এতে আমাদের যে প্রাণ-শক্তি তাকে মুছে ফেলে দেওয়া হয়—আর মরণের রূপ-চিন্তায় মন অহরহঃ কাঁপতে থাকে।

আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন-যাত্রা হবে সহজ ও সরল। এ কথা কিছুতেই আমরা বিশ্বাস করব না যে, আমাদের এই সহজ-সরলতা—জীবনের পথে চলার পক্ষে কোন রকমে খাপ খায় না। প্রাচ্যের এই রকম করে প্রতীচ্যের পিছনে পিছনে একটা বাড়তি উপাঙ্গের মত ঝুলে বেড়ান কখন চলতে পারে না। প্রাচ্য যদি প্রতীচ্য-জীবন-যাত্রাকে এমন করে নকল করে, তবে তা কখন খাঁটী হবে না—হবে জাল। আমার নিজের দিক দিয়ে পরম শান্তি এই যে, কয়েক বৎসর ধরে আমি নিজে এমন একটি সঙ্ঘের আয়তনের সম্পর্কে থেকে জীবনের শেষ কয় বছর অতিবাহিত করছি, যেখানে সকল দেশ, সকল জাতি, সকল নর-নারীর এক অচ্ছেদ্য স্নেহ ও আত্মীয়-বন্ধনের মধ্য দিয়ে তা গড়ে উঠছে।

---

* সিংহলে 'রোটারী ক্লাবে' ডক্টর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজী বক্তৃতার (Ideals of an Indian University) অনুবাদ। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

হর-পার্ব্বতী-সংবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

১

একদা গ্রীষ্মঋতুর মধ্যভাগে মার্ত্তণ্ডদেব সারা দিনমান কিরণজাল বর্ষণ করিয়া হিমালয়ের পশ্চিম দেশে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পর, পার্ব্বতী কৈলাস হইতে সুদূর বঙ্গদেশের কোন-এক পল্লীপ্রান্তস্থিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের মুখপানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই কৈলাসপতি তাঁহাকে কহিলেন—"দেবি! যাহা জানিতে চাহিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; উত্তর দিতেছি—শ্রবণ কর। ঐ যে প্রান্তর মধ্যে এইমাত্র সপ্ত শকুনির একসঙ্গে মৃত্যু ঘটিল, নিশ্চয়ই ইহার সবিশেষ কারণ বর্ত্তমান আছে জানিবে।"

পার্ব্বতী কহিলেন—"জানি প্রভু, কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না।"

"এই সপ্ত শকুনের দেহান্তের সঙ্গে-সঙ্গেই উহাদের মিলিত সাতটি জীবন লইয়া এইমাত্র একটি মানব-জীবন সৃষ্ট হইল।"

"সেই মানবের জন্ম কোথায় হইল নাথ?"

"কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে ৩৬নং মদন মোহন সাহার লেনে। তুমি অবগত আছ কি পার্ব্বতী

যে, বঙ্গদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, সাতটি শকুন মরিয়া একটি কৃপণের জন্ম হয়? এ কথার ভিতর সত্য আছে কি না, ইচ্ছা হইলে এই নবজাত শিশুর প্রতি বরাবর দৃষ্টি রাখিলেই তাহা তুমি জানিতে পারিবে। ইহার নামকরণ হইবে শচীকুমার। ইহাদের বংশ-পদবী—নিয়োগী। যুবাবয়সে এই শচীকুমার, তাহার নামের আদ্যক্ষর সমন্বয়ে বাম বাহুর উপর 'শ-কু-নি'—এই উল্কী অঙ্কিত করিবে। তদ্বারা তাহাকে সহজেই চিনিতে পারা যাইবে। পরন্তু তাহার ইহ-জন্মের এই সংক্ষিপ্ত নামের সহিত পূর্ব্ব জন্মের জীবনেতিহাসের যে আশ্চর্য্য যোগাযোগ বর্ত্তমান, তাহাও তোমার স্মৃতিপটে সহজে উদয় হইবে।"

কৈলাস-শিখর দেশে হর-পার্ব্বতীর উক্ত আলাপের পর সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ৪০ বৎসর পরে একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার বহুবাজারস্থ ৩৬নং মদনমোহন সাহার লেনের ভগ্ন ও জীর্ণ বাড়ীখানির বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া এক পাঞ্জাবী সাধু-পুরুষ, মস্তকে গেরুয়ার পাগড়ী জড়াইয়া ও হাতে কতকগুলি কেতাব পত্র লইয়া, সদর দরজায় ধীরে ধীরে করাঘাত করিতেছিল। ভিতরের দিকে, দরজার পার্শ্বে, গৃহস্বামী শচীকুমার নিয়োগী মহাশয় দরজায় কাণ পাতিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি গামছা এবং হস্তে বংশদণ্ড।

বাহির হইতে দরজার ফুটা দিয়া দেখিয়া পাঞ্জাবীটি কহিতে লাগিল—"দরওয়াজা খুলিয়ে বাবুসাব্। হাম্ ফরচুন্-টেলার হায়, ডর্না মৎ। আপ্‌কো বর্ত্তমান অতীত, ভবিষ্যৎ—সব ঠিক্-সে-ঠিক্ বাতলায় দেগা। আপ্‌কো নক্স্‌ক্ষেত্র—

শচীবাবু অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে কবাটের খিল খুলিয়া হঠাৎ দরজা মুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং ফরচুন্-টেলারের প্রতি দণ্ড উঁচাইয়া ধরিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আব্‌ভি নিকালো, চোট্টা, পাজী, ডাকু কাঁহাকা! কব্‌সে বোলতা হায়— ভাগো-ভাগো— বাত্ নেই শুনকে—ফরচুন্-টেলার হায়, ফরচুন্-টেলার হায়!—ভাগো, নিকাল যাও!" শচীবাবু তাহাকে বংশদণ্ড দ্বারা সবলে এক ঠেলা দিলেন। তাঁহার পরিহিত গামছাখানি কষি-আলগা হইয়া কোমর হইতে খসিয়া পড়িতেছিল। বাম হস্তে তাহা চাপিয়া ধরিয়া লাঠির ঠেলায় ফরচুন্-টেলারকে রোয়াক হইতে নীচে রাস্তায় নামাইয়া দিয়া বকিতে বকিতে দরজায় আবার খিল লাগাইয়া দিলেন।

শচীবাবুর জীবনের একটি ঘটনার সূত্র হইতে তিনি 'ফরচুন্-টেলার', জ্যোতিষী, 'পামিষ্ট্' প্রভৃতির উপর বিষম ক্রুদ্ধ। সেই কারণে ইহাদিগকে দর্শন মাত্রই তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন।

সে আজ দশবৎসরের কথা। তাঁহার বয়স তখন এক-কুড়ি-নয় পূর্ণ হইয়া দেড়-কুড়িতে পদার্পণ করিয়াছে। পিতামাতা বহু পূর্ব্বেই একমাত্র পুত্রের হাতে সংসারের ভারার্পণ করতঃ—স্বর্গগত। সংসারে একক। কারণ, পিতামাতা তাঁহার বিবাহ দিয়া যাইবার অবসর পান নাই এবং তিনি নিজে এ বিষয়ে যদিচ যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন কিন্তু এই ভয়ানক কার্য্য করিতে তিনি সাহসী হন নাই। কারণ তিনি মনে ভাবিলেন যে, বিবাহ করিলে 'পুত্র-কন্যা, যদি আসে প্রবল বন্যা!' তাহা হইলে সংসারে বেজায় ব্যয়ের হিড়িক পড়িয়া যাইবে এবং তাহা হইলে·····

এই 'তাহা হইলে'র সূত্র ধরিয়া যে-সব খরচ-পত্রের কথা তাঁহার মনে সে সময় উদয় হয়, তাহাতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ না-করাই স্থির করিলেন। কিন্তু ভবিতব্যতা ছিল অন্যরূপ। নীলাম্বরবাবুর ছোট শ্যালী স্বর্ণকে দেখিয়া একদিন তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল। তাঁহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। সপ্তদিবস এবং সপ্ত রাত্র চিন্তা করিবার পর তিনি একদিন ইহা লইয়া যাঁহার দুয়ারে শরণ লইলেন, সেই দুয়ারের উপর দেওয়ালের গায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলিতেছিল

এবং তাহাতে লেখা ছিল—"কামরূপ-কামাখ্যা-প্রত্যাগত জগজ্জয়ী জ্যোতিষী ব্যোমকেশ জ্যোতিষ-রত্নাকর।"

রত্নাকর কহিলেন—"দুটো টাকা এখানে রেখে একটা ফুলের নাম করুন। আপনার মনের কথা আর তার সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি।"

নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে পকেট্ হইতে দুইটা টাকা কম্পিত হাতে বাহির করিয়া শচীবাবু কহিলেন—"একটা রাখলে হবে না? ফুলের নাম একটার বদলে না হয় দুটো করব এখন।"

রত্নাকর বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহা হয় না এবং নিজেও কৌশলে বুঝিয়া লইলেন যে, কোন্ কথাটি গণাইবার জন্য তাঁহার আগমন হইয়াছে। সুতরাং চোখ বুজিয়া কহিলেন—"একটা রাখলে হবে না, দুটোই রাখবার নিয়ম। এইবার একটা ফুলের নাম করুন?"

"টগর।"

"একটা বারের নাম?" রত্নাকর আবার চক্ষু বুজিলেন।

"বৃহস্পতি।"

চক্ষু চাহিয়া রত্নাকর টাকা দুইটি তুলিয়া লইলেন ও কাগজের উপর জ্যামিতির ফিগার আঁকিয়া ও অঙ্ক কষিয়া কহিলেন—

"টগর আর বৃহস্পতি।

বিয়ে হ'বে শীঘ্রগতি॥—অর্থাৎ শীঘ্রই আপনার বিবাহ হইবে, এ বিষয়ে একেবারেই নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ—বুঝেছেন ত'?"

"তা' ত' হ'ল! এটা অবিশ্যি খুব ভাল কথাই। কিন্তু আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে, সেইটে সুক্ষ্মস্য গণনা ক'রে—

"বলুন—বলুন, যা' কিছু জানবার আছে সব খুলে বলুন।"

"বলচি কি যে, বিয়ে যদি হয় তা' হ'লে ত' ছেলে-পুলে—অর্থাৎ তা' হ'লে ত' বড় মুস্কিল হ'য়ে পড়বে। সেইটে আপনি ভাল ক'রে একবার—

"সেইটিই খুব ভাল করে একবার গণনা ক'রে ঠিক্-ঠাক্ আপনাকে বলে দিচ্ছি। সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হবেন, তবু আমার গণনার বেঠিক হবে না জানবেন।"—বলিয়া রত্নাকর মহাশয় আবার কাগজের উপর নানাবিধ আঁক-জোঁক কাটিয়া, অঙ্ক কষিয়া ঘর-দ্বার আঁকিয়া কহিলেন—"আর দু'টি টাকা আপনি বা'র করুন। তার একটিকে পুত্র এবং অপরটিকে কন্যা মনে করে এই দু'টি ঘরে দু'টিকে রেখে দিন—যেন ঠেকা-ঠেকি না হয়।"

শচীবাবু আজ পকেট হইতে টাকা বাহির করা সম্বন্ধে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া আরও দুইটা টাকা বাহির করতঃ যথাস্থানে রাখিলেন।

"একটা ফলের নাম করুন ত'?"

"বেল।"

"একটা নদীর?"

"যমুনা।"

তখন মনে মনে খানিকক্ষণ এবং মনের বাহিরে অর্থাৎ কাগজের উপর খানিকক্ষণ হিসাবাদি করিয়া রত্নাকর যেন একটু বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন—

"বেল অগ্নি যমুনা।

ন পুত্র—ন চ কন্যা॥—দেখচি আপনার এ সম্বন্ধে বড়ই অশুভযোগ। আপনার মকরের ওপর বরাবরই চারটি গ্রহের দৃষ্টি। বিয়ে হবে কিন্তু গ্রহের কু-দৃষ্টিতে পুত্র-কন্যা ভাগ্যে নেই। তবে—

'তবে'র অপেক্ষা বিন্দুমাত্র না করিয়া শচীবাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং পরমানন্দচিত্তে সেই মাসের মধ্যেই শ্রীমতী স্বর্ণলতাকে গৃহিণীরূপে গৃহ-জাত করিলেন এবং শ্রীমতী স্বর্ণ আসিয়াই স্বামী ও সংসার বুঝিয়া লইল। যেহেতু বুঝিয়া লইবার মত তাহার বয়স হইয়াছিল। অর্থাৎ—সে-যুগে যদি এ-যুগের সর্দ্দা-আইনের চল থাকিত, তাহা হইলে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া টানিয়া-বুনিয়া, ডবল-সর্দ্দা ডিস্ট্রাইতেও হয় ত' স্বর্ণের বাধিত না। বিবাহের পূর্ব্বে স্বর্ণের খুড়া বলিয়াছিলেন—

তাহার বয়স পনর; নীলাম্বরবাবু বলিয়াছিলেন—সতেরো আঠারো। স্বামীগৃহে আসিয়া স্বর্ণ স্বয়ং জানাইয়াছিল—আসচে মাসে সে কুড়িতে পড়িবে।

যাহা হউক বিবাহের পর প্রথম বৎসর আনন্দে, উৎসাহে, সুখে, শান্তিতে, স্বপ্নে, মাধুর্য্যে কাটিল। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে শচীবাবুর সকল আনন্দ, উৎসাহ, সুখ, শান্তি নষ্ট করিয়া স্বর্ণ একটি কন্যা প্রসব করিল। শচীবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বর্ণের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কামরূপ-প্রত্যাগত সেই রত্নাকরের কাছে গিয়াও একদিন দু'কথা তাঁহাকে শুনাইয়া দিয়া আসিলেন। রত্নাকর কহিলেন—"আরে ম'শাই, সন্তান-সন্ততি কামনার জিনিষ, আপনার বিরক্ত হ'বার হেতুটা কি?"

বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া শচীবাবু দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা ও অনামিকা সংযোগে একরূপ ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"হেতু হচ্চে এই—রৌপ্য-চক্র! খাওয়ান-দাওয়ান, মানুষ করা, খরচের একেবারে রেলগাড়ী ছুটবে! আসে কোত্থেকে ম'শাই? তার ওপর অসুখ আছেন, বিসুখ আছেন, শুভ-বিবাহ আছেন। গুণতে না জানেন ত' সে সময় খুলে বল্লেই পারতেন।"

যাহা হউক, কাত্যায়নীর জন্ম-সূত্রেই জ্যোতিষীদের প্রতি শচীবাবুর আক্রোশের সৃষ্টি হয় এবং সেই আক্রোশ বছরের পর বছর তাঁহার চরমে উঠে, যখন কাত্যায়নীর পর এই কয় বৎসরের মধ্যে থাকমনি, আন্নাকালী, ছোট-খোকার শুভাগমনের পর গতকল্য আবার একটি নবাগত খুকীকে লইয়া স্বর্ণ আতুড়ঘরে আশ্রয় লইয়াছে।

ফরচুন্-টেলারের উপর শচীবাবুর অন্য এতটা বিরক্তির কারণ ইহাই।

ফরচুন্-টেলারকে বিদায় করিয়া দিয়া বংশদণ্ডখানি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া শচীবাবু রান্নাঘরে উনানের সামনে আসিয়া বসিতেই কাত্যায়নী ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"বাবা, মা বল্লে—চা ঠিক পাঁচনের মত হয়েচে। দুধ চিনি দাও নি বুঝি? চা মুখে দিতে মার বমি আসচে। আর একটু চিনি দাও!"

ভাতের হাঁড়িতে হাতা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে শচীবাবু কহিলেন—"কাল এক পয়সার চিনি এসেচে, আজ তার অর্দ্ধেক উঠে গেল, তবু মিষ্টি হ'ল না! চা কি সরবৎ করে খেতে হবে না কি? যা', বল গে যা', রেণী চিনি দিয়ে চা খেলে ইয়ে হবে।"

"কিয়ে হবে?"

"তোর অত কথায় দরকার কি, জ্যাঠা মেয়ে! বল গে যা', আর চিনি নেই।"

"ওই ত' রয়েচে, আমি ঐ মোড়া শুদ্ধ নিয়ে যাই।"

ভাতের হাতা উঁচাইয়া কাত্যায়নীকে মারিতে উদ্যত হইয়া শচীবাবু কহিলেন—"বেরো এখান থেকে দূর হ'।"

সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

২

ছয় মাস পরের কথা।

দ্বিপ্রহরে শচীবাবু আহারে বসিয়াছিলেন। দালানের একপার্শ্বে নিদ্রিত খুকীকে কোলে করিয়া স্বর্ণ স্বামীর আহারের পরিচর্য্যা করিতেছিল।

ছোট-খোকা দিগম্বর-বেশে উঠানের একধারে বসিয়া খেলা করিতেছিল। কাত্যায়নী, থাক, আন্না আজ কয়দিন হইল মামার বাড়ী গিয়াছে। শচীবাবু খিদিরপুরে বড় শ্যালকের কাছে গিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে, এবার প্রসবের পর হইতেই স্বর্ণের শরীরটা বড় খারাপ। তাহার উপর সংসারের কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট, বিশেষতঃ মেয়ে তিনটার পিছনে খাটিতে খাটিতে……তাই শ্যালক নগেন্দ্র সেদিন আসিয়া তাহাদের লইয়া গিয়াছে। স্বর্ণ শচীবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া সেদিন কহিয়াছিল—"হ্যাঁ গা, ওদের বিদেয় কচ্চ কেন—পয়সা বাঁচাতে? ৩০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের ওরা আর কতটা তোমার খেয়ে ফেলতো?" শচীবাবু কহিয়াছিলেন—"তুমি সব কাজ আমার উল্টো দিক দিয়েই দেখ স্বর্ণ! দিন কতক একটু 'ঠাঁই-নাড়া' হোয়ে আসুক না। ওদের

শরীরটাও একটু ভাল হোক, তোমার শরীরটাও একটু সারুক।" স্বর্ণ কহিয়াছিল—"এ সংসারে খাওয়া-দাওয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দের যে রকম ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করে রেখেচ, তাতে আমার শরীর শীগ্‌গিরই একেবারে সারবে, যেদিন নিমতলার ঘাটে কাঠের বিছানায় শোব।"

আজ ৮।১০ দিন হইল, কাত্যায়নীরা খিদিরপুর গিয়াছে। স্বর্ণ খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া শচীবাবুর পাতে—অর্থাৎ মেজেয় বাঁধান বেদীর গর্ত্তের মধ্যে কি-একটা তরকারী দিয়া কহিল—"হ্যাঁ গা, একদিন গিয়ে এদের খবরটা নিয়ে এস না একবার।"

শচীবাবু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কহিলেন—"ভাতে আজ বালি লাগচে কেন বল দেখি? চাল ভাল করে ধুয়ে দাও নি?"

স্বর্ণ কহিল—"ভাতে বালি আসবে কোথা থেকে? বোধ হয় তোমার থালা ভাল করে তা হলে ধোয়া হয় নি। বললুম—আমি ভাল করে ধুয়ে দি—তা' ত' দিলে না!"

থালা-বাটি ধোয়ার কাজটা প্রত্যহ শচীবাবু নিজের হাতেই করিয়া থাকেন। তাঁহার থালা-বাটি কাঁসার বা পিতলের নহে, পাথরের নহে, এলুমিনিয়মের বা এনামেলেরও নহে। এ দ্রব্য চোরে চুরি করিতে পারে না, পড়িয়া ভাঙ্গিতে পারে না, ব্যবহারে ইহার ক্ষয় নাই। দালানের একাংশে সারি-সারি থালার আকারে সিমেণ্টের বেদী কাটা, তাহাই অন্ন-থালী। প্রত্যেক অন্ন-থালীর পার্শ্বে দুই তিনটি করিয়া বাটির আকারে গর্ত্ত কাটা, সেগুলিও সব সিমেণ্ট দিয়া বাঁধান। তাহা তরকারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাসন-কোসন যে এ-সংসারে নাই, তাহা নহে। পৈতৃক-আমলের এক-সিন্দুক বাসন সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু নিত্য ব্যবহার করিলে বাসন-কোসন নিত্য মাজিতে হয়। তাহাতে অযথা একটা ক্ষয় আছে। তাহার পর, স্ত্রীলোকদিগের হাত হইতে বাসন-কোসন প্রায়ই ঝন্-ঝন্ শব্দে মেজের উপর পড়িয়া যায়। তাহাতে বাসন ফাটিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া যায়, টোল খাইয়া যায়। তাহা ছাড়া থালা-বাসন হাত হইতে পড়িয়া যাওয়া ভাল নহে, তাহাতে গৃহে কুটুম্ব-সমাগমের বিলক্ষণ ভয় থাকে। এ সব ছাড়া বাসন মাজিবার জন্য নিত্য একটি লোকেরও আবশ্যক হয়। কিন্তু, মাথাই যদি না থাকে ত' মাথা-ব্যথা কি করিয়া হইবে! বাসন না থাকিলে, মাজা হইবে কি? সুতরাং সব দিক বিবেচনা করিয়া শচীবাবু এই অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, সাকার অথচ নিরাকার থালা-বাটির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্বর্ণ কহিল—"যা ব'ললুম, তার কি উত্তর দিচ্চ?"

"কি বল দেখি?"

"একদিন খিদিরপুরে গিয়ে এদের দেখে-শুনে এস।"

"এস বললেই ত' আর আসা হয় না। একবার একটু দেখে আসতে গেলেই এককাঁড়ি পয়সা বার করতে হবে। এতটা পথ ত' আর হেঁটে যেতে পারব না।"

"হেঁটে যাবে কেন? ট্রামে কি বাসে যাবে।"

"তার ভাড়াটা কি তুমি দেবে? এখন খাবার সময় বিরক্ত ক'রো না।"

আহারান্তে মুখ ধুইয়া শচীবাবু পরণের গামছাখানি খুলিয়া তাহা কাঁধে ফেলিলেন এবং গামছার স্থানে একখানি আট-হাতি নীলাম্বরী শাড়ী কাঁচা-কোঁচা দিয়া পরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। প্রত্যহ আহারান্তে দুই বেলা বাড়ীর সম্মুখে চক্রবর্ত্তীদের দোকানে গিয়া তিনি তামাকটা খাইয়া আসেন। বাড়ীতে তাঁহার কাপড়ের আবশ্যক হয় না। কেবল দুই বেলা তামাক খাইয়া আসিবার জন্য তিনি এই আট-হাতি নীলাম্বরীখানা মাস পাঁচ ছয় আগে ৷৶০ আনা মূল্যে কিনিয়াছেন। কাপড়ওলার এখনো পাঁচ পয়সা বাকী আছে। এই কাপড়খানি কিনিবার পূর্ব্বে তিনি যে হিসাবের জমা-খরচ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোথাও একটু কড়া-ক্রান্তি ভুল হয় নাই। কাপড়খানির আয়ু কমপক্ষে

তিন বৎসর ধরিয়া লইয়া তিনি নিম্নলিখিত রূপ জমা-খরচের হিসাব কষিয়াছেন।

জমা—	খরচ—
প্রত্যহ দুই ছিলিম হিসাবে ৩ বৎসরে মোট ২১৯০ ছিলিম তামাকের মূল্য— পয়সায় ১০ ছিলিম হিঃ— ৩৷৵/১৫	কাপড় (৩ বৎসরের জন্য) মোট দাম— ৷৵০
বাদ খরচ— ৷৵০	
লাভ— ২৷৵/১৫	

এই লাভের উপর আরও লাভ আছে, তাহা তিনি ধরেন নাই। তিন বৎসর অন্তে কাপড়খানি দুই পয়সা ব্যয়ে ধোপ-দস্ত-ইস্ত্রি করাইয়া বাসন-উলীদের কাছে দুই আনায় সহজেই বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। কিম্বা তাঁহার সংসারটিতে যে-প্রকার কাঁথার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে মেয়াদ অন্তে কাপড়খানিকে উক্ত কার্য্যেও লাগাইতে পারা যাইবে। সর্ব্বোপরি ইহাও তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, যদি নৈসর্গিক বা আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক কারণে উপরি উক্ত লাভের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে, ঘটুক; তাহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র লোকসান নাই। যেহেতু কাপড় খরিদের ৷৵০ আনার /৫ পয়সা বাদে ৷৵১৫ পয়সা একদিন স্বর্গের নিদ্রাবস্থায় তাহার বাপের বাড়ীর বাক্স হইতে গোপনে—

৩

খিদিরপুরের বাস ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়াছে।

একগাড়ী প্যাসেঞ্জারের মধ্যে শচীবাবু চোগা-চাপকান পরিহিত হইয়া একটি ধারে বসিয়া আছেন। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে একজন চেকার উঠিয়া সকলের টিকেট দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"মাম্‌লী।" চেকার তাঁহাকে আলীপুর কোর্টের উকিল বা ভকিল মনে করিয়া, তাঁহার 'মাম্‌লী'খানি আর দেখিবার অপেক্ষা না করিয়া ও-দিকে চলিয়া গেল। তাঁহার বুকপকেটের মধ্যে 'মাম্‌লী'র অবস্থান বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না, যেহেতু খিদিরপুর আসিবার বাসভাড়া বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার প্রতিবাসী অবিনাশের 'মাম্‌লী'খানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে চেকারের উকীল মনে করার মধ্যে ষোল আনা ভ্রমধারণা ছিল। চোগা-চাপকান পদার্থটি তাঁহার পৈতৃক আমলের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। আজ বিশ বৎসরকাল হইতে কোথাও যাইতে হইলে, এই 'একমেবাদ্বিতীয়' পদার্থটিকে তিনি অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং চোগা-চাপকান সত্ত্বেও যে তিনি উকীল বা ভকিল নহেন, তাহা চেকার জানিবে কি করিয়া? তবে চেকারের যিনি অন্তর্যামী, তিনি অবশ্য জানেন যে, তিনি উকীল বা ভকিল না হইলেও বখিল বটে। উচ্চারণগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে যৎসামান্যই।

হাজরা রোডের মোড়ে বাসে আর একজন চেকার উঠিল।

"টিকেট, বাবু?"

"মাম্‌লী।"

"দেখি!" চেকারটি যে অত্যন্ত অসভ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—"এ-কি আপনার মাম্‌লী?"

"আমার নয় ত' কার? দেখচ না,—অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

"কিন্তু অবিনাশবাবু, আপনার কি ২৫ বছর বয়স? পঁচিশের মধ্যেই চুলগুলো সব পাকিয়ে বসেচেন দেখচি যে। পৈতে-গাছটা আছে, না—আজকালকার যুগধর্ম্মে সেটা ত্যাগ করে বসে আছেন?"

ঠুং—বাস থামিয়া গেল। একটি প্যাসেঞ্জার উঠিল।

"আরে, নিয়োগীমশাই যে!"

লোকটি শচীবাবুর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। কহিল—"তারপর শচীবাবু, এদিকে যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?"

বাস্-শুদ্ধ সকলের ঐকান্তিক মনোযোগ তখন শচীবাবুর দিকে। সকলেরই মুখে চাপা হাসি। তিনি দেখিলেন, আর উপায় নাই। মনে মনে আগন্তুকের চৌদ্দপুরুষের মস্তক চর্ব্বণ করিতে করিতে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং চেকার, কন্‌ডাক্টার ও অপর আরোহীদের ঠেলিয়া দ্রুতপদে চলন্ত বাস্ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সবেগে ঠিকরাইয়া আসিয়া প্রথমে ধাক্কা খাইলেন একজন পথিকের সঙ্গে, তাহার পর একটি টেলিগ্রাফের পোষ্টের সঙ্গে। সেখান হইতে টাল্ খাইয়া গিয়া পড়িলেন ফুটপাথের উপর রক্ষিত একটা মুটের ঝাঁকার মধ্যে। সঙ্গে-সঙ্গেই কপাল ফুলিয়া উঠিল, কাণ কাটিয়া গেল, চোগা ফাঁসিয়া হাঁটু ছড়িয়া গেল, চাপকানের একদিকে পানের পিক ও কাদা লাগিয়া গেল। তিনি একহাতে পকেটের মনি-ব্যাগ প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখের এক দোকানের বেঞ্চে আসিয়া বসিয়া সর্ব্বাঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যথার ব্যথী হইয়া দুই-একটি পথিক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শচীবাবু মনে-মনে তাহাদের গাল দিতে দিতে বেঞ্চি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়াইয়া কোন একখানি বিনীত এবং ভদ্র 'বাসে'র জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ন-বেলায় যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই কাত্যায়নী, থাক, আন্না প্রভৃতি ছুটিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, এই কয়দিনেই তাহাদের সকলের চেহারা বেশ একটু ফিরিয়াছে। আন্না কহিল, "আর তোমার কাছে থাকবো না—কিছুতেই থাকবো না। তুমি কিচ্ছুটি আমাদের খেতে দাও না, খালি মুখ খিঁচোও। এখানে দিদিমা কত তরকারী দেয়, কত মাছ! এখন সকলে এক বাটি ক'রে দুধ খেলুম। তুমি খাবে? দিদিমার কাছে গিয়ে চাইলেই দেবে।" থাক আন্নার চেয়ে দুই বছরের বড়। সে আন্নাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর, বাবাকে ও-সব কথা ব'লতে আছে?" আন্না পিতার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে কহিল, "হ্যাঁ, আছে! বাবা, মার জন্যে আমাদের সব মন কেমন ক'রছে বড্ড। আজ নিয়ে যেতে হবে আমাদের। মাকে একবারটি দেখে আবার এখানে চলে আসবো।"

বৈঠকখানাতে ঢুকিতেই ছোট শালা ফটিক আসিয়া ধরিল—"লটারীর টিকেট একখানা কিনতে হবে, জামাইবাবু! সেণ্ট এমিজ্ স্যুইপ। এক টাকা ক'রে। ফার্ষ্ট প্রাইজ—সাড়ে বাইশ হাজার। আমার এই দু'খানা বিক্রী হ'তে আর বাকী আছে। পরশু ক্লোজিং, ১৭ই ড্রয়িং।"

ফটিক একেবারে না-ছোড়-বান্দা। জামাইবাবুকে একেবারে পাইয়া বসিল। জামাইবাবু যতই তাহাকে ঠেলিয়া দেন, সে ততই গা-ঘেঁসিয়া আসে। তিনি যতই বলেন, 'না', সে ততই বলে, 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন, 'টাকা নেই', ইনি পকেটের ব্যাগ আক্রমণে উদ্যত হয়েন। চেঁচামিচি, হুড়োহুড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ক্রমে তথায় কাত্যায়নী, থাক, আন্না, নিমাই, দুখু, ভূতনাথ, নেড়া, শোভা, যুগল, হাসি, টুনি, কেষ্টা, মতির মা, কান্‌হাইয়া প্রভৃতি হাজির হইল। ভিতর হইতে শচীবাবুর শ্বশ্রূমাতা হাঁকিলেন—"ওরে, কিসের এত হুড়োহুড়ি রে?" তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া একটি টাকা ফটিকের হাতে দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে 'সেণ্ট এমিজে'র একখানি টিকেট তাঁহাকে লইতে হইল এবং আজ প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে কাহার মুখ দেখিয়াছিলেন, সেই কথা মনে করিতে গিয়া তাঁহার মনে পড়িল যে, আজ শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি দেওয়ালের আয়নাতে নিজের মুখই নিজে দেখিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিলে স্বর্ণ অন্ধকার ঘরের এককোণ হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে তিনটে কেমন আছে?"

শচীবাবু কোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিলেন—"জানি না।"

"কবে আনবে তাদের?"

তেমনি কোঁস এবং তেমনি গর্জ্জন—"জানি না।"

তারপর চোগা-চাপকান ছাড়িয়া গামছা পরিতে পরিতে কহিলেন—"যেমন বোন, তার তেমনি ভাই। ফটুকেকে আমি একবার দেখে নেবো। ওর কাছ থেকে একটাকার জায়গায় যদি দু'টাকা আদায় করতে না পারি ত' আমার নামই—" অসমাপ্ত বক্তব্যের দ্বারা স্বর্ণর মনে চিন্তা ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়া শচীবাবু হাতের আধ-পোড়া সিগারেটটি ধরাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে রান্না ঘরের নির্ব্বাপিত উনানের কাছে ও পরে সদর খুলিয়া চক্রবর্ত্তীদের দোকানাভিমুখে গমন করিলেন।

শচীবাবু ফটিকের নিকট হইতে লটারীর টিকেটখানি খরিদ করিলে পর ফটিক তাঁহাকে সিগারেটটি খাইতে দিয়াছিল। সেখানে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ উপভোগ করতঃ ভবিষ্যতের জন্য বাকী অর্দ্ধেকের আগুন নিভাইয়া তাহা পকেট-জাত করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন। বাসনা ছিল, যদি কোনদিন দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ আহারান্তে চক্রবর্ত্তীদের দোকানে ধূমপানের ব্যাঘাত ঘটে, তখন ঐ অর্দ্ধেকের শরণ লইবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি বশতঃ অন্যই তাহার শরণ লইতে তিনি বাধ্য হইলেন।

৪

রাম, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট—

শচীবাবু কাগজের ঠোঙার তাড়া গুণিতে ছিলেন।

আজ কয়দিন হইল, তিনি উঠিয়া পড়িয়া, ঠোঙা প্রস্তুতকার্য্যে লাগিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে পরিমাণ ঠোঙা তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, আরও প্রায় এই পরিমাণ তৈয়ার করিতে পারিলে তাহার মূল্য একটাকা পনর আনা আন্দাজ পাওয়া যাইবে। তাহা হইতে কাগজের দাম তের আনা ও ময়দা ছয় পয়সা, উনানের আঁচ দুই পয়সা, একুনে ৸৹ বাদে পুরাপুরি একটা টাকা তাঁহার লাভ থাকিবে অর্থাৎ লটারীর টাকাটা তাঁহার উসুল হইলে।

দিন তিন-চার পরে সমস্ত ঠোঙা লইয়া চক্রবর্ত্তীদের দোকানে তিনি দিয়া আসিলেন। ঠোঙার দাম দুই টাকা পাঁচ পয়সা, তাঁহার সেই আট-হাতি নীলাম্বরীর ট্যাঁকে যেমন একদিকে পাঁচকের পর পাকে গুঁজিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি ফটিকের উপর তাঁহার সঞ্চিত ক্রোধ পাকের পর পাক খুলিয়া আসিতে লাগিল। তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ হে যোগেন, 'সেণ্ট এমিজে'র কি হ'ল, খবরটা কিছু শুনেছ কেউ?—কত নম্বরে ফাষ্ট প্রাইজটা উঠলো?"

যোগেন কহিল—"শোনেন নি আপনি? ১৭০০৭। হাওড়া জেলার কে-একটা বুড়ী পেয়েছে। বাকী প্রাইজগুলো বাইরেকার লোকের নামে উঠেচে, রেঙ্গুন, বোম্বে, সি-পি, আসাম।"

"কত নম্বর বললে?"

"১৭০০৭।"

শচীবাবু ফটিকের উপর বিষম চটিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার টিকেটখানি সযত্নে রাখিতে এবং তাহার নম্বরটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে ভোলেন নাই। তাঁহার নম্বর ৩২৬৫১। সতের হাজারের ধারেও যায় না। মনে মনে ভাবিলেন, এমনও হইতে পারে, দ্বিতীয় আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিয়া উঠিবে—৩২৬৫১।

নন্দ সিম্‌লাই সকাল-সকাল কাজ হইতে ফিরিতেছিল। শচীবাবু হাঁকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সতের হাজার সাতই ফাষ্ট হোল বুঝি?"

সিম্‌লাই চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"কিসের বলুন ত'?"

"লটারীর হে। সেণ্ট্ এমিজ্।"

"ওঃ!—ও সব খবর রাখি না, মশাই।"

সিম্‌লাই চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া শচীবাবু তাঁহার চোগা-চাপকান বাহির করিলেন এবং তন্মধ্যে দেহ প্রবেশ করাইয়া দিয়া 'সেণ্ট্ এমিজের' সন্ধানের জন্য বাহির হইলেন।

ভিন্ন ভিন্ন বিশ জায়গায়, বিশ জনের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন যে, '১৭০০৭'ই শটে এবং বাকী কয় নম্বর প্রাইজ যে বাংলাদেশের কেহ পায় নাই, সে কথাও ঠিক। যদিও তাঁহার টিকেটের টাকাটা উসুল হইয়া গিয়াছে বটে, তথাপি সংবাদটায় তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি খারাপ হইয়া গেল এবং '১৭০০৭'-এর প্রতিও যেমন তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল, 'সেণ্ট এমিজ'দের প্রতিও তেমনি তাঁহার মন বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিল। ভগবানের নাম কখনো তাঁহার মনে বা মুখে আসিত না; আজ তাঁহার প্রতি এই অবিচারের জন্য ভগবানের উপরও তাঁহার ক্রোধের অন্ত রহিল না। সেই ক্রোধ লইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া তিনি যে কাণ্ড দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আর মাথার ঠিক রহিল না। দেখিলেন, স্বর্ণ কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া কি-একখানা বই পড়িতেছে। শুধু শুধু এই ভয়ানক অপব্যয় দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চোগা-চাপকান ছাড়িবার আর তিনি অবকাশ পাইলেন না। সেই অবস্থাতেই ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সেই বংশদণ্ডখানি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং স্বর্ণের পিঠে নেহাৎ আঘাতটা করিতে না পারিয়া জলন্ত ডিবাটার উপর সবলে এক আঘাত করিলেন। ডিবাটা ছিট্‌কাইয়া তক্তাপোষের তলায় গিয়া পড়িল, আলো নিভিয়া গেল, মাটির দেরকোটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, স্বর্ণ অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া ও-দিকে সরিয়া গেল।

গণ্ডগোলটা চরমে উঠিল, যখন শচীবাবু স্বর্ণের নিকট শুনিলেন যে, পাশের বাড়ীর যদুবাবুদের বাগান হইতে কাঁচা পেঁপে ও ডেঙ্গো ডাঁটা আসিয়াছিল, তাহারা কিছু ডাঁটা ও দু'টা পেঁপে দিয়া গিয়াছে এবং ডাঁটা কালকের জন্য রাখিয়া স্বর্ণ আজ পেঁপের তরকারি রাঁধিয়াছে।

পেঁপে দ্রব্যটার উপর শচীবাবু বিষম চটা। পেঁপে সারক। পেটে গেলে প্রাতঃ-সন্ধ্যা পেট পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তাহার ফলে অতিমাত্রায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়, যাহা একান্ত পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং স্বর্ণের এতটা অন্যায় অত্যাচার শচীবাবু আর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তখনি সেই চোগা-চাপকান পরিহিত অবস্থাতেই পুনরায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন ও একখানি ট্যাক্‌সি ডাকিয়া আনিয়া ড্রাইভারকে কহিলেন—"খিদিরপুর যানে হোগা। ভাঁড়া হুঁসিয়ে মাঙ্ লেগা।—সমঝা?"

"সাথমে আপ্ যাইয়েগা ত'?"

"হাম যায়েগা, লেকেন্ ফিন্ লটকে চলা আয়েগা।"

৫

কয়দিন হইল শচীবাবু স্বর্ণকে খিদিরপুরে রাখিয়া আসিয়াছেন ও কাত্যায়নীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। কারণ নিজেকে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে, একজন যোগাড়দার চাই। সকাল বেলা কাত্যায়নী আসিয়া কহিল—"বাবা, উনুনে আঁচ দেবে কখন? বেলা করে রাঁধলে আমার বড় ক্ষিধে পায়।"

শচীবাবুর মন কাত্যায়নীর কথার দিকে ছিল না। তিনি খোলা জানালা দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎ শশব্যস্তে কহিলেন—"ওরে বাগনানের মামী বুড়ী পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে আসচে। সেরেচে এইবার! বসে বসে কতদিন যে অন্ন ধ্বংস করবেন!—সর্ব্বনাশ!"—বলিয়াই তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং এত তাড়াতাড়ি যে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মনে মনে ভাবিলেন—'আনচেন হয় ত' পোঁটলার ভেতর পোয়াটাক পাটালি গুড় আর গোটা দুই ঝুনো নারকেল কিন্তু আধ মন চালের অন্ন ধ্বংস না করে কি আর বাড়ী ছাড়বেন?'

সদর দরজা খোলাই ছিল। বন্ধ থাকিলেই বা কি বিশেষ সুবিধা হইত। সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই বাগনানের মামী সদর ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"অ শচী, অ বৌমা, কোথায় গো তোরা?" শচীবাবু অকূলে কূল না দেখিয়া কাত্যায়নীকে কহিল—"ঘর থেকে বেরোস্ নি এখন। পরে ওকে বলবি যে, বাবা পাগল হোয়ে গেছে—বুঝলি?"

"অ শচী, অ বৌমা?"

শচীবাবু বুড়ীর সম্মুখে এক পা—এক পা করিয়া গিয়া তাহার মুখের দিকে কট্-মট্ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন সব আছিস্ বাবা? কেষ্টা নাতি হলে হবে কি, ওরা যা দুরবেবহারটা করে আমার সঙ্গে! তোরা আমার বেঁচে থাক্—তাই ত' তোদের কাছে ছুটে এলুম। তোরাই আমার সব।"

শচীবাবু মনে মনে চম্‌কাইয়া উঠিলেন। এবার তাহা হইলে দু'দশ দিন নয়, একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগাড়!

"হ্যাঁ রে শচী, ছেলে-মেয়ে গুলো সব ভাল আছে ত' বাবা? বৌমা কই?"

কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া, বুড়ীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শচীবাবু মৃদু স্বরে গান ধরিলেন—

"কই কই কই গো।
আমার প্রাণ-কানাই কই গো।
তোমায় চেন-চেন যেন করি গো।
তুমি কে গো—তুমি কে গো।"

বুড়ী প্রথমে একটু থতমত খাইয়া পরে হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ রে বাবা, বুড়ো মামীর সঙ্গে রসিকতা করতে আছে কি?—ওরে অ কাতি! অ আনি!"

শচীবাবু সহসা লম্ফাইয়া উঠিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—

"কি কহিলি পাপিষ্ঠ দুরাচার—
এই দণ্ডে ভীম বিক্রমে আমি
ফুৎকারেতে নিভাইতে পারি
ঘরের সকল প্রদীপ। দেখি,
কেবা হারে, কেবা জিনে—"

সঙ্গে সঙ্গেই সুর করিয়া গান ধরিলেন—

"চাই বেল ফুল—চাই বেল ফুল।
আমার এ ফুলের গন্ধে প্রাণ করে আকুল॥"

গানের সঙ্গে নাচও আরম্ভ হইল।

"চাই বেল ফুল।"

ভয়-চকিত কণ্ঠে বুড়ী ডাকিল—"অ বৌ-মা! ও-মা, শচী এ-রকম কচ্চে কেন গো?"

তখন উঠানে নামিয়া শচীবাবু ছুটা-ছুটি করিতে লাগিলেন আর অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় ছড়া কাটিতে লাগিলেন—

"রাম দুই তিন—নাড়ী বড় ক্ষীণ,
চার পাঁচ ছয়—গতিক ভাল নয়,
সাত আট নয়—এই বারেতেই ভয়,
দশ এগার বারো—খাট আনতে পারো,
তের থেকে ষোলো—হরি হরি বলো।"

এমন ভীষণ অঙ্গ-ভঙ্গি ও গলার আওয়াজের সহিত শচীবাবু 'হরি হরি বল' বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন যে, বুড়ী ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অ বৌ-মা, অ খুকীরা! ও-মা, সব গেল কোথা এরা? শচী এ-রকম করে কেন গো!"

"এ-রকম করে কেন গো? এই লাঠিদ্বারা মস্তক ভূমিসাৎ করিব।"—শচীবাবু ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সেই বংশদণ্ডখানি লইয়া আসিলেন এবং তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিতে লাগিলেন—"মস্তক ভূমিসাৎ করিব,

ভূমি মস্তকসাৎ করিব, আর মস্তক এবং ভূমি এই লাঠিসাৎ করিব।"

পোঁটলা-পুঁটলী তুলিয়া লইয়া মামী সামনের ঘরের মধ্যে পলাইয়া গেল। সেখানে এক কোণে কাত্যায়নী হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি এক নিঃশ্বাসে কহিল—"বাবা পাগল হোয়ে গেছে।" বুড়ী আর তথায় দাঁড়াইল না। উঠানে তখন প্রচণ্ড বংশ-দণ্ডের ভীম-লীলা চলিতেছিল। বুড়ী আর কোন দিকে দেখিল না। তাহার পোঁটলা-পুঁটলী লইয়া দ্রুতপদে সদর খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল এবং আপন মনে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "ও-মা, জল-জ্যান্ত লোক পাগল হোয়ে গেল গা। কেষ্টার বরাতেই আছে, আমি আর কি ক'রব।"

তখনও শচীবাবুর লাফা-লাফি, ছুটা-ছুটি সমভাবেই চলিতে ছিল। বক্তৃতা ও গানের বন্যা তখনো তাঁহার বন্ধ হয় নাই—

"আরে রে দুর্ম্মতি, এ কেমন মতি তোর!
মোর অন্ন ধ্বংসের কারণ,
তব আগমন হেথা। ফাটাইব মাথা।
বহাইব রক্তস্রোত মেদিনী প্লাবিয়া।"

পিতার হঠাৎ এইসব নানা প্রকার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া কাত্যায়নী মনে মনে যথেষ্ট ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কাঠ হইয়া ঘরের দেওয়াল ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

শচীবাবুর গৃহে হুলুস্থুল ব্যাপার।

তাঁর ভয়ানক ব্যাধি। খিদিরপুর হইতে স্বর্ণ আসিয়াছে, বড় শ্যালক আসিয়াছে, শ্যালীপতি ভাই নীলাম্বরবাবু আসিয়াছেন, চক্রবর্ত্তীদের যোগেন্দ্র আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকা হইয়াছে।

ব্যাধির বিশেষ কোন নাম নাই। হাঁফেল হইবার মত হইয়াছিল, ধাক্কাটা সামলাইয়াছেন। এখন মস্তিষ্কের গোলযোগ। খালি চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, ছট্-ফট্ করিতেছেন, আর 'হায় কি হোল!' বলিয়া কপাল ও বুক চাপড়াইতেছেন।

ডাক্তার বলিতেছেন—"অত্যন্ত শোকে এই রকম হোয়ে থাকে। আগে হার্টের ওপর র‍্যাকসন্ হয়, তারপর ব্রেন র‍্যাফেক্ট করে। যা হোক, ভয় নেই। দু'এক দিনের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হোয়ে উঠ্‌বেন।"

শচীবাবু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "জীবনে আর সুস্থ হব না। উঃ! বুড়ী ঘরে ব'য়ে দিতে এসেছিল। সাড়ে বাইশ হাজার! ওরে বাবারে, গেলুম রে!"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "চুপ কর, শচী, চুপ কর। তুমিও ত' টিকেট কিনেছিলে, ভাগ্যে থাকলে তোমার নামেই উঠতো। ভাগ্যে নেই, তাই বুড়ী তোমাকে সেধে দিতে এসেও তোমার হাত ছাড়া হোয়ে গেল।"

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া শচীবাবু কহিতে লাগিলেন, "সকলে বলেছিল বটে, হাওড়া জেলার কে-এক বুড়ীর নামে উঠেচে। উঃ, বাবারে! কে জানে যে, মামীবুড়ী! কেষ্টার ওপর রাগ করে আমাকেই সব দিতে এসেছিল, হেলায় হারালুম—হায় রে, হেলায় হারালুম। কেষ্টা তাকে চিরকাল জালিয়ে আসচে, তাই তার উপর রাগ। ওরে বাবারে—সেই কেষ্টার ভাগ্যেই হলু রে! উঃ, গেলুম, গেলুম! একটু জল দাও আমাকে; আমার বুকের ভেতর কেমন করচে!"

ডাক্তারটি শচীবাবুকে স্থির হইতে বলিলেন। উপস্থিত সকলকেও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণও ইহা লইয়া যেন একটা হৈ-চৈ আর না করেন।

সকলি ভবিতব্যতা।—অদৃষ্টের পরিহাস। '১৭০০৭' যে তাঁহারই মামী, এ স্বপ্নেরও অগোচর। আর সেই মামী যে কেষ্টচন্দরের উপর বিরূপ হইয়া আজ

ভাগিনেয়কে সাড়ে বাইশ হাজার ঘাচিয়া দিতে আসিবে তাহাও স্বপ্নের অগোচর। আর ইহাও স্বপ্নের অগোচর যে, যে লোক দুদিন আগে পাগলের ভাণ করিতেছিল, আজ সে সত্যই পাগলের মত চীৎকার করিতেছে—'ওরে বাবারে! গেলুম রে! সাড়ে বাইশ হাজার রে বাবা!'

এদিকে যখন শচীবাবুর এইরূপ অবস্থা, তখন কৈলাসে—

"হর প্রতি মৃদু হাসি' কহেন পার্ব্বতী,
'শকুনি'-চরিত-কথা চমৎকার অতি।"

শঙ্কর কহিলেন—

"শুদ্ধচিত্তে এই কথা যেজন শুনিবে,
ধন-ধান্যে তার ঘর ভরিয়া উঠিবে।"

পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া মহাদেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ইতি হর-পার্ব্বতী-সংবাদ সমাপ্ত।

আদি মানব

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভূতত্ত্ববিদ্ ও জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দিক হইতে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রস্তরীভূত হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়স প্রায় ১,৬০০,০০০,০০০ বৎসর। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের হিসাব মতে এই বয়সের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৫,০০০,০০০ বৎসর। প্রোফেসর হাক্সলি বলেন—৪০০,০০০,০০০ বৎসর। এই সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিয়া অস্‌বোর্ণ প্রস্তরীভূত হইবার যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—১০০,০০০,০০০ বৎসর। এক সময় ছিল যখন পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বয়স যতদূর সম্ভব কম করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু রেডিয়াম প্রভৃতি স্বদীপন পদার্থ আবিষ্কারের পর তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি স্বতঃ তেজবিকিরণকারী পদার্থের পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রণ নির্গত হইতে হইতে কালক্রমে ইহারা সীসাতে পরিণত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যায়। পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশের প্রস্তরাদিতে এই জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব এবং তাহাদের সীসকে পরিণতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সীসকে পরিণতির সময় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—খুব প্রাচীন প্রস্তরের বয়স ১২০ হইতে ১৫০ কোটী বৎসরের কম নহে। পৃথিবীর বয়সের পরিমাণ ১৫০ কোটী বৎসরই হউক বা ২০০ কোটী বৎসরই হউক তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। মোটের উপর ভূস্তর গঠনের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবী কোটী কোটী বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। পৃথিবীর বয়সের অর্দ্ধেক বা তাহারও বেশী সময় অতিক্রম করিবার পর মাত্র প্রোটারোজয়েক যুগ হইতে পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি সুরু হইয়াছে, এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা একমত।

জীবোৎপত্তির আনুমানিক সময় হইতে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে কয়েকটী বিভিন্ন যুগে ভাগ করিয়াছেন। সর্ব্ব নিম্ন হিসাবে, এখন হইতে ৮০,০০০,০০০ হইতে ৬০,০০০,০০০ বৎসরের মধ্যের সময় এজয়েক বা আর্কিয়োজয়েক যুগ। এই যুগে জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৬০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৩০,০০০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রোটারোজয়েক যুগ। এই যুগে পরিদৃশ্যমান কোন জীববংশের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, আণুবীক্ষণিক জীবাণু ও উদ্ভিদাণুর উৎপত্তি হইয়াছিল মাত্র। ৩০,০০০,০০০ বৎসর হইতে ২৬,০০০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পেলিয়োজয়েক যুগ। এই যুগে মেরুদণ্ডহীন জলবিচ্ছু, ট্রীলোবাইট প্রভৃতি সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিত। ২৬,০০০,০০০ বৎসর হইতে ১৪,০০০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী পেলিয়োজয়েক যুগ। এই যুগে উভচর জীব, মাছ ও ফার্ণ, অশ্বপুচ্ছ, ব্যাং-ছাতা ও জুল-শ্যাওলা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। ফার্ণ, অশ্বপুচ্ছ, লাঠি-শ্যাওলা প্রভৃতি আধুনিক তাল-গাছের মত বিরাট আয়তনের হইত। এই বিরাটকায় ফার্ণ অরণ্যসমূহ মাটির নীচে চাপা পড়িয়া কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ১৪,০০০,০০০ বৎসর হইতে ৪,০০০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত মেসোজয়েক যুগ। মেসোজয়েক যুগে বিশালবপু সরীসৃপেরা পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করিত। তাহাদের কয়েকটীর নামোল্লেখ করিতেছি—ইক্‌থিও-সোরাস—৪০ ফুটেরও অধিক লম্বা কতকটা তিমি মাছের আকারের জন্তু। প্লেসিওসোরাস্—কুমীর, তিমি, জিরাফ, কচ্ছপ প্রভৃতি জন্তুর কিছু কিছু লইয়া যেন এই বিরাটকায় গিরগিটীর আকার জন্তুটীর উৎপত্তি হইয়াছিল। ঘোড়ার মস্তকের মত মস্তকবিশিষ্ট অর্দ্ধভিমি অর্দ্ধ গিরগিটীর আকার ডাইনোসোরাস্ নামে এক প্রকার জানোয়ার পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিত। ব্রন্টোসোরাস্—দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট এবং ওজনে প্রায় ৬০ মণ। ইহাদের মাথাটী ছিল দেহের অনুপাতে অতি ক্ষুদ্র। এতদ্ব্যতীত ইগুয়ানডন্, প্রায় ৬০।৭০ ফুট দীর্ঘ; ডিপ্লোডোকাস, ৮০ ফুট দীর্ঘ; এটলান্‌টোসোরাস্, প্রায় ১০০ ফুট দীর্ঘ প্রভৃতি বহু প্রকার সরীসৃপের প্রাচুর্য্য ছিল। এই সময়েই টেরোডেক্‌টিল নামক অদ্ভুত পক্ষী জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হয়। তৎপরবর্ত্তী যুগের নাম কেইনো-

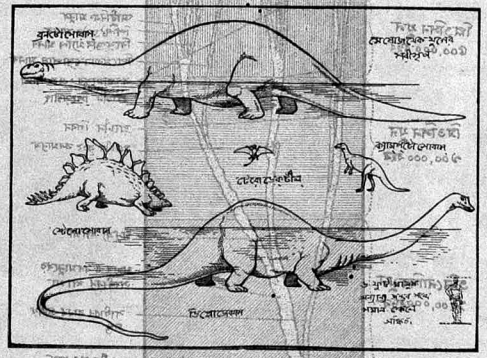

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব ও অন্যান্য বিরাটকায় জন্তুর তুলনা-মূলক চিত্র

জয়েক যুগ। এই সময়ে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জন্তুর উৎপত্তি হয়। উন্নত ভূভাগসমূহ ঘাস এবং গাছপালায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই সময়কে কয়েকটী বিভিন্নভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে ১২,০০০ ফুট নিম্নে যেস্তর পাওয়া যায়, আনুমানিক প্রায় ১২,০০,০০০ বছর পূর্ব্বে উহারই কিয়দংশে মনুষ্যাকৃতি জীবের আবির্ভাব হয়। এই সময়ের নাম ইয়োসিন যুগ। এই সময়ে পৃথিবীর আদিম এবং নব্য ভূভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্কট জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। তৎপরবর্ত্তী সময়কে

ভূতাত্ত্বিকেরা ওলিগোসিন যুগ নাম দিয়াছেন। এই যুগে মনুষ্যাকৃতি ক্ষুদ্র বানর জাতীয় বন্য জন্তুরা ক্রমোন্নতির বিভিন্ন ধারায় চলিয়া আসিয়া মিওসিন যুগের প্রারম্ভে ক্রমশঃ প্রকৃত মনুষ্যরূপে অবিব্যক্ত হইতে থাকে। প্রায় ৯০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিওসিন হইতে ৫,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫,০০০ ফুট নিম্নে প্লাইওসিন যুগের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সময়ে পিথেকানথ্রোপাস মানবের আবির্ভাব হয়। তৎপরে ৫,০০,০০০ বৎসর হইতে ১,০০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত চেলিয়ান যুগ। এই সময়ে হাইডেলবার্গ ও পিল্টডাউন

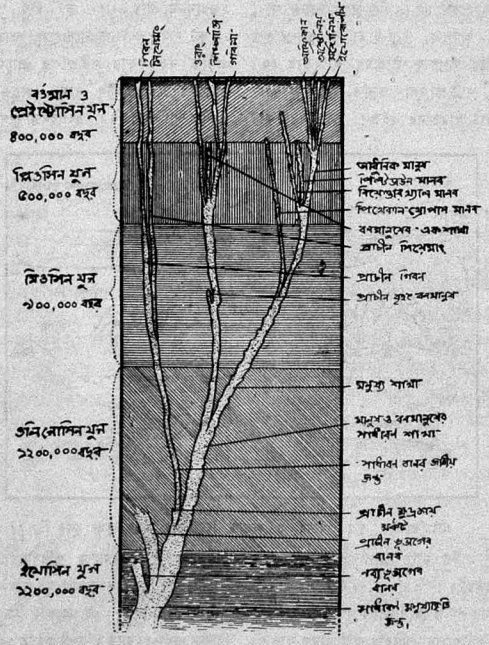

মানুষের ক্রম-বিবর্ত্তনের আনুমানিক চিত্র

যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। ভূগর্ভের ৯,০০০ ফুট নিম্নস্তরে এই যুগের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই মিওসিন যুগে প্রাগৈতিহাসিক গিবন এবং বিরাটকায় বনমানুষ প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ৬,০০,০০০ বৎসর মানব পৃথিবীতে চরিয়া বেড়াইত। তৎপরে ইহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। প্লাইওসিন যুগ হইতেই মানব জাতির সাধারণ শাখা প্রসূত নিয়েণ্ডারথ্যাল্ মানবের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার প্রায়

সমকালেই পিল্টডাউন মানবের আর এক শাখা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। প্রায় ৪,০০,০০০ বৎসর আগে, নিয়েণ্ডারথ্যাল ও পিল্টডাউন মানবের সমকালে বর্ত্তমান মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের উৎপত্তি হয়। তখন হইতে নানাপ্রকার বিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতির ফলে প্লেইষ্টোসিন যুগে মানবজাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িতে থাকে। প্রায় ১,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৪র্থ বরফ-যুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩৫,০০০ বৎসর হইতে মানুষ ক্রমশঃ নিগ্রো, অষ্ট্রেলিয়, মঙ্গোলিয় ও ইউরোপীয় প্রভৃতি সুস্পষ্ট বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িতে



নিয়েণ্ডারথ্যাল্ মানব

থাকে। নিয়েণ্ডারথ্যাল মানব প্লেইষ্টোসিন যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল তৎপরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পিল্টডাউন মানব প্লাইওসিন যুগের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ৩৫,০০০ বৎসর হইতেই বর্ত্তমান মানুষের দৈহিক গঠনের বিকাশ-প্রাপ্তি ঘটিতে আরম্ভ হয়। প্রায় ১৫,০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানুষ কৃষি-কার্য্য করিতে শিক্ষা করে। ইহার মধ্যযুগ হইতেই প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ।

এ পর্য্যন্ত মানবেতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাহা ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভূপঞ্জর হইতে প্রাপ্ত অস্থি-কঙ্কালের উপর নির্ভর করিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানব জাতির উৎপত্তির ইতিহাস এখনও কুহেলিকাচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ অনেকেরই ধারণা যে, গরিলা, শিম্পাঞ্জি বা ওরাং ওটাং প্রভৃতি জানোয়ার হইতেই মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। যদি কেহ বলেন এস্কিমো বা হটেন্‌টট্ হইতেই আমাদের ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে—তবে তাহা যে পরিমাণে সত্য, সাধারণের পূর্ব্বোক্ত ধারণাও ততদূর মাত্র সত্য। কেহ কেহ বলেন—গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং প্রভৃতির যে মূল হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, মানুষও সেই মূল হইতেই আসিয়াছে। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ এরূপ মতও পোষণ করেন যে, নিগ্রোরা গরিলা জাতীয় এবং চীনারা শিম্পাঞ্জি জাতীয় পূর্ব্বপুরুষের বংশধর এবং এইরূপ বিভিন্ন মানব জাতি এক একটী ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদ একান্ত শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বানর জাতীয় জীবের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য যদি মানুষ ও একটা গরিলার কঙ্কাল পাশাপাশি রাখা যায় তবে সহজেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, গরিলা হইতেই মানুষ ক্রমোন্নত হইয়াছে। কিন্তু যদি ইহাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পর তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে—পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈষম্যই বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পা এবং পায়ের আঙ্গুলের কথা ধরা যাইতে পারে। হাটিবার সময় মানুষের পায়ের গোড়ালি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরই চাপ পড়িয়া থাকে; পায়ের ছাপ দেখিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি উন্নত ধরণের বনমানুষের হাটিবার সময় পায়ের বাহিরের দিকেই চাপ পড়ে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর মোটেই চাপ পড়ে না। ইহাতেই মনে হয়, মানুষ যে অবস্থায় সোজা হইয়া হাটিতে শিখিয়াছিল, বনমানুষেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায়ই আয়ত্ব করিয়াছিল। কাজেই

মানুষের এবং বনমানুষের এই সৌসাদৃশ্যের কারণ বংশানুবর্তন বা উত্তরাধিকারিত্ব নহে। উন্নত বনমানুষেরা চিরকাল জঙ্গলেই বসবাস করিয়া থাকে; এখনও তাহাদের চলিবার ভঙ্গি, শারীরিক গঠন, ধরণ-ধারণ ঠিক গাছপালার মধ্যেই বাস করিবারই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানুষেরা এত সুন্দর ও সহজভাবে দ্রুত গতিতে হাটিতে ও দৌড়াইতে পারে যে, তাহাতে স্বতঃই মনে হয় মানুষ সোজা দাঁড়াইয়া পায়ে হাটিতে সক্ষম। এইরূপ কোন প্রাণীরই বংশধরা বিশেষতঃ মানুষ এখনও নির্ভয়ে ভালরূপে গাছে চড়িতে পারে না। মতটুকু চড়িতে পারে তাহা বিশেষ সতর্কতা ও ইতস্ততঃ করিয়া চড়ে। ইহাতেও বনমানুষের সঙ্গে বংশানুক্রম সম্বন্ধে মানুষের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহাছাড়া আর একটী জিনিসও লক্ষ্য করিবার বিষয়—মানুষ সভাবতঃ সাঁতার জানে না। তাহাদের বিশেষ যত্ন করিয়া সাঁতার শিখিতে হয়। ইহাতেই মনে হয়—মানুষের পূর্বপুরুষেরা নদ-নদী, হ্রদ-সাগর প্রভৃতির সঙ্গ-বর্জিত অবস্থায় বহুযুগ কাটাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি যুক্তিযুক্ত কারণ হইতে দৃঢ় প্রতীতি হয়, মানুষের আদি পুরুষেরা কেইনোজয়েক যুগের প্রথমাবস্থায় হাঁটিতে ও দৌড়াইতে সক্ষম লেমুর জাতীয় জন্তুর মত ছিল। তাহারা সাধারণতঃ মাটির উপর চরিয়া বেড়াইত এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে গাছে না চড়িয়া পর্বত-গহ্বরাদিতে আত্মগোপন করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিত।

মানুষের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে যতটুকু খবর জানা গিয়াছে তাহার ভিত্তি প্রধানতঃ প্লেইস্টোসিন যুগের পর্বত-গহ্বরাদিতে প্রাপ্ত অস্থি, নরকঙ্কাল এবং প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি। ইহার পূর্ববর্তী যুগের অস্থি-কঙ্কালাদি নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। আরও ব্যাপক এবং বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে এ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

কেইনোজয়েক যুগের প্রথমাবস্থা হইতেই খুব সম্ভব বানর ও বনমানুষ শ্রেণীর জানোয়ারদের বিভিন্ন ধারার ক্রমোন্নতির বিকাশ সুরু হইয়াছে। ওলিগোসিন এবং মিওসিন যুগের বিভিন্ন বনমানুষের পরস্পর সম্বন্ধ এবং মানুষের সঙ্গে তাহাদের কতটা ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল, তাহাও বিশেষরূপে নিরূপিত হয় নাই। তবে মিওসিন যুগের এই জানোয়ারদের মধ্যে মানুষের মত চোয়াল সমন্বিত ড্রাইওপিথেকাসের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে। উত্তর-ভারতের শিওয়ালিক পর্বতমালার মধ্যে নৃতত্ত্বের দিক হইতে বিস্ময়কর কতকগুলি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। তন্মধ্যে সিভা পিথেকাস এবং পেলিওপিথেকাস জাতীয় কঙ্কালগুলি খুব সম্ভব বিশেষভাবে আদিম মানবের সঙ্গে সম্পর্কিত। নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন এই জন্তুরা বোধ হয় কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিত। ডারউইন বলেন—



হাঁটিবার সময় গরিলা ও মানুষের পায়ের তলার ছাপ

বেবুন জাতীয় বানরেরা পাথরের সাহায্যে বাদামের খোলা ভাঙাইয়া, ভিতরের শাঁস খাইয়া থাকে এবং অন্যকে আঘাত করিবার জন্য সময়ে সময়ে লাঠী ও প্রস্তর-খণ্ড ব্যবহার করে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় রক্ষিত ওরাং-ওটাং-এর এই অভ্যাস অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। শিপাঞ্জিরা গাছের ডাল বুনিয়া এক প্রকার বদাকার কুটীর নির্মাণ করিতে পারে। কিন্তু এ সব বিষয়ে লেমুর জাতীয় জানোয়ারেরাই অধিকতর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। বেলজিয়ামের বোঁসেলিস নামক স্থানে ওলিগোসিন যুগের ভূস্তর হইতে এক প্রকার ছেনী এবং কর্তিত পাথর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই গুলি দেখিয়া মনে হয়, সেই যুগ হইতেই হয়তো লেমুর

জাতীয় পূর্বপুরুষদিগের মধ্যেই অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের প্রবৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছিল।

নরকঙ্কাল ব্যতীত অতি প্রাচীন মানুষ অথবা মনুষ্যাকৃতি অন্য কোন জন্তুর পৃথিবীতে অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় প্রস্তর-নির্মিত অতি বিকৃত ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র হইতে। ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার জানিবার পূর্বে এই প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের যুগকে পণ্ডিতেরা তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম—ইয়োলিথিক যুগ, প্রস্তর যুগের আদিম অবস্থা। এই যুগে অতি বিকৃতভাবে প্রস্তরের অস্ত্রাদি তৈয়ারী


জাভায়-প্রাপ্ত পিথেকান্থ্রোপাস মানবের পার্শ্ব-দৃশ্য

হইয়াছিল। দ্বিতীয়—পেলিওলিথিক যুগ; প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নতির মধ্যাবস্থা। তৃতীয়—নিওলিথিক যুগ; এই সময়ে প্রস্তরের সাহায্যে সুনিপুণভাবে অস্ত্র-শস্ত্রাদি নির্মিত হইয়াছিল। অর্ধমানব ও পূর্ণমানব নির্মিত প্রস্তরাস্ত্র অনুযায়ী পেলিওলিথিক যুগকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইয়োলিথিক যুগের এই প্রস্তরখণ্ডসমূহ দেখিয়া মনে হয়, সেই যুগের মনুষ্যাকৃতি জন্তুরা এই টুকরাগুলিকে প্রয়োজন মত চাঁছিয়া ছুলিয়া লইয়াছিল। এই প্রস্তরাস্ত্রসমূহ এত ভোতা ধরণের যে, এগুলি কৃত্রিম উপায়ে নির্মিত কি না, সে সম্বন্ধে অনেকদিন পর্য্যন্ত ঘোরতর মতভেদ বিদ্যমান ছিল। পণ্ডিতেরা এই জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের সময়কে প্রথম বরফ-যুগের পূর্ববর্ত্তী অর্থাৎ প্লাইয়োসিন যুগের বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রথম বরফ-যুগের মধ্যস্তরে প্রায় সর্বত্রই এই জাতীয় প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিত এমন কোন মনুষ্যাকৃতি জন্তুর অস্থি-পঞ্জরাদি এ পর্য্যন্ত ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন—প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের পূর্বযুগে আদিম মানবেরা কাঠ ও শামুক ঝিনুকের খোলা নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। নিগ্রো, বুসম্যান ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীরা এখনও কাঠ, সামুদ্রিক ও স্থলজ শামুক এবং ঝিনুক নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের সলো নদীর নিকটে ডাঃ ইউজেন ডুবয়েস এক আশ্চর্য্য কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। ভূগর্ভের যে স্তর হইতে এই কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই স্তর খুবসম্ভব আমেরিকা ও ইউরোপের প্রথম বরফ-যুগ অথবা পরবর্ত্তী প্লাইওসিন যুগের সমসাময়িক। এই কঙ্কালের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। ইহার খুলির মস্তিষ্কাধার মানুষ ও শিপাঞ্জির মস্তিষ্কাধারের মাঝামাঝি গড়নের কিন্তু পায়ের হাড় এমন ভাবে গঠিত যে, মানুষের মত সোজা হইয়া হাঁটিবার ও দৌড়াইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই জানোয়ারটী মানুষও ছিল না, আবার বৃক্ষারোহণে অভ্যস্ত শিপাঞ্জিও ছিল না। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন—পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস্—অর্থাৎ সোজা দাঁড়াইয়া হাটিতে সক্ষম বন-মানুষ। সর্বপ্রাচীন এই প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারকারী জন্তুরাই মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ। এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না; তবে এ কথা বলা যায় যে, ইহারা মানুষের নিকট সম্পর্কীয় বা নিকট জাতি ছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই শ্রেণীর প্রাণী ছিল।

এই কঙ্কালই মানুষের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষের একমাত্র নিদর্শন। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রাচীন মনুষ্য-কঙ্কাল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

যখন এই জাতীয় প্রাচীন মানব বা অর্দ্ধমানবেরা পাঁচ ছয় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, তখন ইউরোপ প্রভৃতি প্রদেশে অতিকায় ম্যামথ, গণ্ডার, বিশালকায় হিপোপটেমাস, বিরাট বিভার ও বন্য বাইসন প্রভৃতির রাজত্ব ছিল। ইহা ছাড়া বন্য ঘোটক, খড়্গ-দন্ত ব্যাঘ্র প্রভৃতিরও প্রাচুর্য্য ছিল। এই ব্যাঘ্রের সম্মুখের দাঁত দুইটি সিন্ধুঘোটকের দাঁতের মত বাহির হইয়া আসিত। এই দাঁতের আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহারা আধুনিক সিংহ ব্যাঘ্রের মত শিকারের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারিত না। মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার পক্ষে দাঁতই বিষম প্রতিবন্ধক ছিল। তাহারা বোধ হয় দূর হইতে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া শিকার মরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া থাকিত এবং পরে রক্ত চুষিয়া খাইত। ইহাদের সময়ে ইউরোপীয় প্রদেশে সিংহ ব্যাঘ্রের চিহ্ন মাত্র ছিল না, কিন্তু বন্যশূকর, ভল্লুক ও নেকড়ের প্রাদুর্ভাব ছিল।

ভূপৃষ্ঠস্থ অতি প্রাচীন যুগের এই একমাত্র অর্দ্ধ-নর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইবার পর হাজার হাজার বৎসর ব্যবধানে মানুষের ক্রম-পরিণতির আর কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই। তৎপরে প্রায় দুই লক্ষ বৎসরের পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ মধ্য বরফ-যুগের কয়েকখানা অস্থি মাত্র মানুষের হস্তগত হয়। কিছুদিন পরে আবার উহার চোয়ালের অস্থি আবিষ্কৃত হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৮০ ফুট নিম্নে জার্ম্মানীর হাইডেলবার্গ নামক স্থানে এই দুষ্প্রাপ্য জিনিষগুলি পাওয়া যায়। আমরা যেরূপ মানুষের সহিত পরিচিত এই চোয়ালের অস্থি সেই জাতীয় মানুষের নহে। অথচ ইহা যে মানুষের অস্থি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই চোয়ালের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে চিবুকের চিহ্নমাত্র নাই এবং সাধারণ মানুষের চোয়াল হইতে অসম্ভব রকমের মোটা। চোয়ালের পিছন দিকের হাড়ের যেরূপ সুস্থতা থাকিলে জিহ্বা সহজভাবে নড়াচড়া করিয়া বিভিন্নরূপ শব্দ উচ্চারণ সম্ভব, এই হাড়ের অবস্থা সেরূপ মোটেই নয়। ইহা হইতেই ধারণা হয়, এই চোয়াল যে জাতীয় প্রাণীর, তাহারা বিভিন্নরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না। অথচ ইহা বানর জাতীয় জীবের চোয়ালও নহে। দাঁতগুলিও মানুষের দাঁতের মত। পণ্ডিতেরা ইহার নাম দিয়াছেন—হাইডেলবার্গম্যান অথবা পেলিওয়েনথ্রোপাস হাইডেলবার্জেনসিস্। ইহারা প্রথম প্রস্তর-যুগে আবির্ভূত হয় নাই। যে স্তরে এই কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে সে স্তরে হাতী, ঘোড়া



পিথেকানথ্রোপাসের সম্মুখ-দৃশ্য

গণ্ডার ও বাইসন প্রভৃতির চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু বক্র-দন্ত ব্যাঘ্রের মোটেই অস্তিত্ব ছিল না। সেই সময়ে তাহারা বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময়ে ইউরোপ খণ্ডে সিংহের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের নাম দেওয়া হইয়াছে—চেলিয়ান যুগ। এই যুগের প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্লাইওসিন যুগ হইতে উন্নত ধরণের ছিল।

হাইডেলবার্গ কঙ্কাল আবিষ্কারের পর প্রায় লক্ষাধিক বৎসরের মানুষের আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস্ ডসন সাসেক্স

প্রদেশের পিল্টডাউন নামকস্থানে বহুখণ্ডে বিভক্ত এক অর্দ্ধ-নরের মাথার খুলি আবিষ্কার করেন। রাস্তা তৈয়ারী করিবার জন্য মাটি খুঁড়িবার সময় এই খুলির প্রথম টুকরা পাওয়া যায়। আর অতি সতর্কতার সহিত অনেকদিন খোঁজা-খুঁজি করিবার পর বাকী অংশসমূহ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার সমস্ত অংশ জুড়িয়া বিশেষ পরীক্ষান্তে ইহাকে এক জাতীয় মানুষের মাথার খুলি বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। এই খুলি কিন্তু সাধারণ মানুষের মাথার খুলি অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের। ইহার মস্তিষ্কের গঠন পিথেকানথ্রোপাস ও বর্ত্তমান মানুষের মাঝামাঝি। এই জাতীয় মানুষ তৃতীয় বরফযুগে পৃথিবীতে বিচরণ করিত। বৈজ্ঞানিকেরা এই জাতীয় মনুষ্যাকার প্রাণীর নাম দিয়াছেন—এয়োনথ্রোপাস অর্থাৎ বর্ত্তমান মানুষের ক্রম-বিবর্ত্তনের প্রথম উন্মেষ অবস্থা। এই মাথার খুলি ব্যতীত সেই একই গর্ত্তে গণ্ডার, হিপ্পো প্রভৃতির দাঁত এবং দাগকাটা হরিণের হাড় পাওয়া গিয়াছিল। এই খুলির সঙ্গে আর একটী চোয়ালের অস্থিও পাওয়া গিয়াছিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল—ইহাও এয়োন-থ্রোপাসের অস্থি, কিন্তু পরে স্থির হয় ইহা এক জাতীয় শিম্পাঞ্জির চোয়াল। আধুনিক শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ব-বিদ্ স্যর আর্থার কিথ্ কিন্তু বহু পরীক্ষার পর ইহাকে এয়োনথ্রোপাসের অস্থি বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। হাইডেলবার্গ মানবের অস্থির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অস্থির যতটা সাদৃশ্য আছে এয়োন-থ্রোপাসের অস্থির সঙ্গে সেই সাদৃশ্য অনেক কম। কিন্তু দাঁতগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মানুষের দাঁতের মত। স্যর আর্থার কিথের মতে এই মনুষ্যাকৃতি প্রাণীরাই বর্ত্তমান মানুষের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। ইহারা ছিল হাইডেলবার্গ ও নিয়েণ্ডারথ্যাল মানবের মধ্যবর্ত্তী মানুষ।

এই খুলি আবিষ্কারের পর কেবল প্রস্তরাস্ত্র ছাড়া অনেক শতাব্দীর মানুষের অস্থিকঙ্কালাদির আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। এই সময়ে চাঁচিবার, ছিদ্র করিবার, কাটিবার ও ছুঁড়িয়া মারিবার বিবিধ প্রস্তর নির্ম্মিত যন্ত্রের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুঠার-প্রভৃতি যন্ত্রেরও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী যুগের কঙ্কাল অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। চতুর্থ বরফযুগের কঙ্কালের অতি প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ক্রোপিনা এবং ডাসেলডর্ফের নিকট নিয়েণ্ডারথ্যাল নামক স্থানে মাথার খুলিসহ এক কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। ইহা যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের মানুষের কঙ্কাল সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। এখন হইতে পঞ্চাশ হাজার একলক্ষ বৎসরের মধ্যে নিয়েণ্ডারথ্যাল মনুষ্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল। নিয়েণ্ডারথ্যাল মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আধুনিক মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মত পরিণত হয় নাই। তাহারা পুরা-পুরি সোজা হইয়া হাঁটিতে পারিত না, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইত। চিবুকশূন্য হওয়ায় খুব সম্ভব মানুষের মত কথা বলিতে পারিত না। ইহারা কিন্তু এয়োনথ্রোপাস্ হইতে ক্রম-পরিণতি লাভ করে নাই। বরং চোয়ালের অস্থি ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায়—হাইডেলবার্গ মানবের সঙ্গে ইহাদের রক্তের সম্বন্ধ ছিল।

পিথেকানথ্রোপাস এবং এয়োনথ্রোপাস্ উভয়ে যে প্রকৃত মনুষ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কি সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা লইয়া এতদিন মতভেদ ছিল, কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের চৌ-কাউ-টিয়েন নামক স্থানে পূর্ব্ব প্লেইষ্টোসিন যুগের নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ বিষয়ে মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই কঙ্কালের নাম দেওয়া হইয়াছে—সিনেনথ্রোপাস্ পিকিনেনসিস্। জাভা কঙ্কাল ও পিল্টডাইন কঙ্কালের মধ্যে বৈষম্য যথেষ্ট; কিন্তু এই সিনেনথ্রোপাসের মধ্যে উক্ত উভয় কঙ্কালের সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ক্রোমাগ্‌নন্ গুহার মধ্যে পরবর্ত্তী প্যালিওলিথিক যুগের একটী পূর্ণ নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই ক্রোম্যাগনার্ড জাতীয় মনুষ্যেরা উন্নত নাসিকা ও

চঙলা মুখ সমন্বিত ছিল। ইহারা লম্বায় ৬ ফুটের নীচু হইত না। আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে ইহাদের মস্তিষ্ক বৃহত্তর ছিল। তৎপরে মেন্টোনের নিকট গ্রিমল্ডি গুহার মধ্যে এই যুগের দুইটী পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান মানুষের অধিকাংশ বিষয়েই সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে ইহাদের সঙ্গে নিয়েণ্ডারথ্যাল মনুষ্যের যে নিকট সম্বন্ধ নাই, একথাও পরিষ্কাররূপে বলা চলে না। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

স্মৃতিযজ্ঞ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে।

কাঁদছিস্ একলা কিসের ব্যথায় আজি হেথায়
অশ্রুর ধারায় রিক্ত-চোখ?
তোর ওই কণ্ঠে রোদন অপার সহে না আর,
দুঃখের আগার রিক্ত হোক।
দাসের লজ্জা, কলঙ্ক আর বেদনা-ভার
বক্ষের পাঁজর করছে চুর?
সন্তান তোর যে দাসত্ব-হীন মমতাহীন,
অক্ষম এ লাজ করতে দূর?

একদিন বুদ্ধ অশোকরাজের ত্রিশরণের
ধর্ম্মের ছায়ায় বিশ্বজন,
আর তোর অশ্ব-ঘোষের ভাসের কালিদাসের
কাব্যের সুধায় মুগ্ধমন,
ভিব্বত চীন তো তোমার ক্ষেমের মহা প্রেমের
মর্ম্মের জোরেই সভ্য হয়,—
তোর বুক-স্তন পিয়াই জগৎ ত্রাত মহৎ,
নয় এর কিছুই মিথ্যা নয়॥

গৌরব তোর সে বিলয়-বিহীন হ'লো কি ক্ষীণ্?
—মন্দর-কুসুম শুষ্ক হায়?
উজ্জ্বল মুক্তা গরব-মালায় ঝ'রে কি যায়,
সন্ধ্যার মলিন পুষ্প প্রায়?
একদিন হায় মা, ধ্যানের জ্ঞানের তরবারের
বিদ্যুৎ-বিভায় ছাইলে লোক;
আজ তার পূর্ব্ব-স্মৃতির যাগের অবশেষের
ভস্মের ধূলায় ছায় ত্রিলোক॥

সাহিত্যের বিষয়

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সাহিত্য কি তা নিয়ে সংজ্ঞানির্ণয়ের এত রকমারি প্রয়াস হয়েচে আর তাতে বৈয়াকরণিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যিক সংজ্ঞাও এত বেশি তৈরী হয়েচে যে, সেগুলোকে যদি একত্র করা যায় তা হলে সংজ্ঞারণ্যে পথ হারিয়ে সংজ্ঞালোপের মত দাঁড়াবে। অথচ আমার মনে হয় এটাই তো স্বাভাবিক। সাহিত্য যখন ভাষায় মানব মনের আত্মপ্রকাশ, তখন একমাত্র মানব মনের বহু বিচিত্রতাই তো সাহিত্যকে ক'রে তুলবে বহুরূপী। এই অজস্র বিচিত্রতাকে মানুষ যখনই চেয়েচে সংজ্ঞা দিয়ে বাঁধতে তখনই তার মনের মত ক'রে সেই বিচিত্রের খানিকটা গ্রহণ ক'রেচে। আর অনেকটা অগ্রাহ্য ক'রে সে রচনা করেচে সংজ্ঞা; তাতে তার ঐক্যাঘেষী মন খুসী হয়েচে এবং তারই মতো আরো কাউকে কাউকে খুসীও করেচে, কিন্তু তাতে সকল মানুষের মন কোনো দিনই সায় দিতে পারে নি এবং পারবেও না। কিন্তু তা বলে কি সাহিত্যের কোনো পরিচয় নেবার চেষ্টা করা চলবে না?

বিচার ক'রে দেখতে গেলে কোন্ বস্তুরই বা নিঃশেষ এবং নির্ভুল পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়? তবু প্রত্যেকেই নিজের নিজের অন্তরেরই তাগিদে এই বিশ্বের নানা ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে সচেষ্ট; সে চেষ্টার আর বিরাম নেই। এই পরিচয়কেই যখন ভাষায় প্রকাশ ক'রে আরো দশের ভাব এবং ভাবনা-গ্রাহ্য করে তোলা হয়, তখনই সাহিত্যের জন্ম হয়ে থাকে। সুতরাং সাহিত্য বলে যা আজ চলেচে, তা যে কি, তাকেও ঠিক ক'রে বোঝার চেষ্টা যে হবে, এতে আর বলবার কিই বা থাকতে পারে। এই কারণেই সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে বললেই প্রায় সর্ব্বত্রই পাই—সাহিত্য কি তা নিয়ে নানান্ রকমারি গুরু-গম্ভীর আলোচনা।

অতীতকাল থেকে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সাহিত্য কি তা নিয়ে যে-সব আলোচনা হয়েচে, তা নিয়ে একটু চিন্তা করলে একটা বস্তু কিন্তু আমাদের চোখে বেশ স্পষ্ট হয়ে আসে। সেটা হচ্চে এই—যে মানুষ যতটা দেখে যতটা অভিজ্ঞতায় পায়, তার বাইরে সে যেতে পারে না এবং পারে না বলেই অনেক সময় সে তার অভিজ্ঞ-

তাকেই সমগ্রতার গৌরব দিয়ে বসে। কিন্তু কালান্তর ঘটে এবং তখনকার নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব্বযুগের সিদ্ধান্তের সঙ্কীর্ণতাও সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। এই কারণেই যতটা দেখা গেছে ততটাকে উদারভাবে গ্রহণ ক'রে এমন সংজ্ঞা নির্ণয় করা উচিত যাতে আগামী কালের অভিজ্ঞতার আসার পথটি রুদ্ধ না হয়ে যায়। কোনো কালের অভিজ্ঞতা এবং অনুভবই মিথ্যাও নয়, নিন্দনীয়ও নয়, কিন্তু এককালের বাণী যদি অন্যকালের বাণীকে অস্পৃশ্য ক'রে রাখবার স্পর্দ্ধা করে তা হলে সে স্পর্দ্ধা কি প্রাচীনের, কি অর্ব্বাচীনের—কার' পক্ষেই শোভন নয়।

পূর্ব্বে (১) বলেচি—ভাষার জন্ম হয়েচে মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়, তার মনের কথাটিকে অন্যের গোচর করবার প্রয়াসে। এই আত্মপ্রকাশের প্রেরণা কতকগুলি স্থূল শারীরিক প্রয়োজনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। আপনাকে অন্যের নিকট পরিচিত করবার, একজনের অন্তরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ, ভাবনা-কল্পনাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করবার আনন্দও যে ভাষার বিকাশকে বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ করেচে, একথা হয়ত কেউই অস্বীকার করবেন না। কথাটিকে আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। 'মানুষ কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই যে ভাষার সাহায্যে আপনাকে অন্যের নিকট ব্যক্ত করতে চেয়েচে তা নয়, আপনাকে প্রকাশ করবার আনন্দও তাকে ভাষার শরণাপন্ন করেচে; এই বিচিত্র সৃষ্টি তাকে কেবল ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির দায় দিয়েই বাঁধে নি, এর বৈচিত্র্য তাকে বিস্ময় এবং আনন্দের বন্ধনেও বেঁধেচে। মানুষ এই আনন্দের এবং বিস্ময়ের ডোরে বিশ্বের সঙ্গে যে যোগ স্থাপন করেচে তাতে সে পেয়েচে মুক্তি এবং তৃপ্তি। এইখানেই জন্ম নিল তার খেলা, তার নাচ, তার গান। তারপর এইখানেই জন্ম নিল কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান।

ভাষার জন্ম নিয়ে কথাগুলো বলবার উদ্দেশ্য ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করা নয়। বলতে চাই যে, মানুষের এই ভাষাগত আত্ম-প্রকাশই সাহিত্যের আনন্দের সূত্রপাত এনেচে। বিশ্বসৃষ্টির ভাবনাগত, চিন্তাগত, কল্পনাগত এই যে উপলব্ধি, মানুষ যখনই একে প্রকাশ করেচে তখনই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েচে। সাহিত্যের বিষয় সেই আদিম মানবের প্রথম উপলব্ধির সময়ও যা ছিল, আজও সেই বিষয়টি পরিবর্ত্তিত হয় নি। সেই বিশ্বজগৎ, সেই মানব-মন আদিমকাল থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করে চলেচে। অবশ্য কালপ্রবাহের প্রভাবে সেই জগতের পরিবর্ত্তন হয়েই চলেচে, আর মানব-মনেরও নানা শক্তির বিকাশ ঘটেচে, ফলে পরস্পরের ওপর ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার রূপও অন্যরকম হতে বাধ্য হয়েচে।

তা হলেই খুব ব্যাপকভাবে বলতে গেলে এ বলতেই হবে যে, মানুষ ভাষায় যখনি কোনোরকমের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিকে প্রকাশ করেচে তখনি সে সাহিত্য সৃষ্টি করেচে। জানি একথায় অনেকেরই মন পুরো সায় দিতে নারাজ হবে। বামা পিসী অভাবগ্রস্ত হয়ে তার ভাইপোদের সহায়তা ভিক্ষা করে যে সব কথা লিখে থাকে বা লছমি গয়লানী যে ভাষায় তার গাভীটির প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করে অথবা আটবছরের ছেলেটি যে ভাষায় তার স্কুলের প্রবন্ধ রচনা করে, সে সবকেই যে কি ক'রে সাহিত্য বলা যাবে তাও বোঝা যায় না। কথাটা ভেবে দেখবার বটে। এখানে একটু অন্য কথা অলোচনা করা যাক। আদিম অসভ্য জাতিদের গানের সঙ্গে হয়ত অনেকেরই পরিচয় নেই; কিন্তু তারা যে সব গান গেয়ে পরম উল্লাস অনুভব ক'রে থাকে যদি তাদের দু'একটিও আজকের দিনের সুসভ্য আমরা পাঠ করি, তা হলে আমরা তাতে কোনো রসই আবিষ্কার করতে পারব কি না সন্দেহ। আরো এগিয়ে এসে যদি আমরা আমাদের দেশেরই সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের রচনা পাঠ করি তাতেও আজ আমরা কোনো আনন্দ পাব কি না সন্দেহ। স্থান বিশেষে হয়ত কোথাও চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হতে পারি কিন্তু সমগ্রভাবে তাদের মাঝে আজ কোনো আনন্দ নেই। এ থেকে কি একথা কেউ বলবেন যে,

(১) সাহিত্যের ভাষা—উদয়ন—ফাল্গুন, ১৩৪০।

ও-গুলো সাহিত্য কোনো কালেই ছিল না। যদি তা বলেন তা হলে চিরন্তন সাহিত্য-বস্তু যে কি, তার বিচার একমাত্র সেই বিধাতাই করতে পারবেন, যিনি প্রলয়ান্তে বিরাজ করবেন। কারণ যতদূর দেখা যায়, চিরন্তন সাহিত্য বলে কোনো কিছু হতে পারে কি না সন্দেহ। একদিন যা অর্থাৎ যে বাঙ্‌ময় সৃষ্টি বহুমানবকে আনন্দোল্লসিত করেছিল আজ তা করে না, এর চেয়ে স্থির সত্য কি আছে?

তা হলেই স্বীকার ক'রে নেওয়া যাক যে, সাহিত্য-বস্তুটি নানারূপে নানা যুগে নানা সমাজের লোকের নিকট প্রকটিত হয়েচে এবং প্রতি যুগের মানুষের নিকট সে তার এমন একটি বিশিষ্ট আবেদন নিয়ে এসেচে, যা সে কোনো রকমেই অন্যযুগের মানুষের নিকট এনে উপস্থাপিত করতে পারে নি। একাধিক যুগের কাছে তার আবেদন না-ও যদি পৌঁছে থাকে, একাধিক মানব-গোষ্ঠীকে না-ও যদি সে আনন্দ দিয়ে থাকে, তা হলেও আমরা সেই বাঙ্‌ময় সৃষ্টিকে সাহিত্য বলতে বাধ্য, যা একযুগে কোনো একটি মানব গোষ্ঠীকেও আনন্দ দিয়েচে।

সুতরাং সাহিত্যের সংজ্ঞা না পেলেও একটি লক্ষণ হচ্চে তার আনন্দ সঞ্চার করবার শক্তি। এই আনন্দ সঞ্চার করবার শক্তি ভাষায় আসে যে বিষয় থেকে তাকে সাহিত্যের বিষয় বলা অসঙ্গত হবে না। পূর্ব্বের আলোচনা থেকে একথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, এই বিষয়টি যে কি তা নির্দ্দেশ করা অথবা তার একটা মোটামুটি রকমের তালিকা দেওয়াও এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। আফ্রিকার অসভ্য রমণীরা একজন অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্বেতাঙ্গ পথিককে অতিথিরূপে পেয়ে তার দুরবস্থা বর্ণনা করে যে গান করেছিল, সেখানে সেই গানের বিষয়-বস্তুটি তাদের কাছে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল, কারণ সেই গানের কথাগুলো তাদের নিশ্চয় একটা অভিনব আনন্দের আস্বাদন দিয়েছিল। রামপ্রসাদের 'মা আমায় ঘুরাবি কত' এর মাঝেও কোথাও নিশ্চয় সাহিত্যের আবেদন ছিল, যা বহুকাল বাঙালীকে আনন্দ দিয়েচে। পাঁচকড়ি দের উপন্যাসও বহু পাঠককে আনন্দ দেয়, আবার রামেন্দ্র সুন্দরের রচনাও আরেকদল পাঠককে আনন্দ দিয়ে থাকে। এই যে নানা স্তরের নানা প্রকারের সাহিত্য, এদের বিষয়-বস্তু কতই না ভিন্ন, অথচ এক জায়গায় তাদের মিল রয়েচে; তারা সবাই পাঠককে বা শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। চিরকাল দেয় না বা দেবে না, সকল মানুষকে দেয় না বা দেবে না, কিন্তু এদের সাহিত্য-পর্য্যায় থেকে বাদ দেওয়া চলে না।

এই যে নানা রকমের বিষয়, এদের আনন্দ দেবার শক্তি কোথায়?

বিষয় যত ভিন্নই হোক্ যত বিচিত্রই হোক্ তাকে সর্ব্ব প্রথম কোনো একটি মানুষের অভিজ্ঞতায়—তার চিন্তায়, অনুভবে, কল্পনায়, উপলব্ধিতে—এসে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েচে। এ-কথা আগে বলবার চেষ্টা করেচি যে, প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার মনে একটি বিশিষ্ট জগৎ রচিত হয়ে চলেচে, ভাষার কাজই হচ্চে এই বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাকে সাধারণের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত করে তোলা। বহু লক্ষ বৎসরের ভাষা বিকাশের ফলে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার জগৎ আমাদের মাঝে গড়ে উঠেচে। অর্থাৎ এমন একটি জগৎ নিয়ে আমরা অহরহঃ নাড়াচাড়া করি, যা ব্যবহারের দ্বারাই হয়ে গেছে অতি প্রাচীন, নবীনতাহীন। এই হ'ল ব্যবহারিক জগৎ, বাস্তব কাজের লোকের জগৎ। পূর্ব্বে এও দেখাবার চেষ্টা করেচি, এই জগৎটা বাস্তবিক একটা কাটাছাঁটা জগৎ, কোনো ব্যক্তিরই বিশিষ্ট উপলব্ধির জগতের সঙ্গে এর হুবহু মিল নেই। প্রয়োজনের খাতিরে এর একটা সত্তা স্বীকৃত হলেও আমাদের কারো মনের কাছেই এই জগৎ পরিপূর্ণ সত্য নয়। এই কারণেই এর মাঝে এমন কোনো বৈচিত্র্য নেই যা আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু বিচিত্র জগৎ, বিস্ময়কর জগৎ রয়েচে আমাদের মনে। আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমরা সব সময় জানি নে বলেই আমাদের অভ্যস্ত বিশ্বাসের জগৎকে

অনেক সময় ভুল করে নিজস্ব জগৎ বলে মনে ক'রে থাকি। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। আমি বলছিলাম যে, সেই বর্ণনাই সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায় যা তার অভিনবত্বের দ্বারা আমাদের বিস্মিত করে, অপরূপত্বের দ্বারা আমাদের মুগ্ধ এবং আনন্দিত করে তোলে। আজ যাতে আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত সেই নিতান্ত এক-ঘেয়ে সত্যও একদিন কোনো না কোনো মানুষের অভিজ্ঞতায় এবং সেই সঙ্গে আরো বহু মানবের অভিজ্ঞতায় একেবারে অদৃষ্টপূর্ব বলে মনে হয়েছিল। তখন সেই অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ পেল সাহিত্য হয়ে, অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে। সেই বাঙ্‌ময় প্রকাশে সেদিনকার মানুষের আনন্দের সীমা ছিল না, কোনো বস্তুকে প্রথম নাম ধ'রে ডাকতে শিশুর যেমন আনন্দের সীমা থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে আবার সেই নবীনতা অভ্যস্ত হওয়ার ফলে, আজ হয়ত আর আনন্দ আনে না। শিশুর নিকট যে-অভিজ্ঞতা অভিনব বিচিত্র এবং আনন্দ-বিস্ময় মাখানো, বয়স্কের নিকট তাই বৈচিত্র্যহীন, সাহিত্যও তেমনি কোনো যুগের আনন্দপসরা হলেও, অন্য যুগের নিকট মূল্যহীন হতে পারে, একথাটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তবে প্রত্যেক যুগের মানুষের কাছে সাহিত্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ আছে বই কি। আজকের যুগের আমরা আমাদের বিগত বহু যুগের সঞ্চিত ভাবনা, কল্পনা, অনুভব প্রভৃতির দ্বারা রচিত একটি মনোময় জগতে অল্পাধিক বিচরণ করচি, ওই আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার জগৎ। কিন্তু এই জগৎ আমাদের সকল অনুভব, কল্পনা, ভাবনাকে নিঃশেষিত করে নি। পরম বিস্ময়ময় মানব-মনের অসীম ধারণায় বিচিত্রতর জগৎ সৃষ্ট হয়ে চলেচে তাই মনের কথার আর শেষ নেই। একটু যেই কেউ তার অন্তরের বিশিষ্ট এবং নিজস্ব জগতের দিকে দৃষ্টিকে প্রেরণ করচে অমনি তার চোখে পড়চে এক আশ্চর্য্য নতুন জগৎ, যার কথা বলতে গিয়ে গড়ে উঠচে নতুনতর সাহিত্য।

মানুষের এই অভিজ্ঞতায়—জ্ঞানের এবং অনুভবের—বিষয়কে যেমন কোনো সীমারেখা টেনেই নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া চলে না তেমনি সাহিত্যে বিষয় কি হবে বা কি হবে না, তাও নির্দ্দেশ করা চলে না। এই কারণেই বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, উপন্যাস, হাসি, তামাসা, রূপকথা, উপকথা, গান, নাটক, ইতিহাস—কোনো কিছুকেই সাহিত্যের গণ্ডির বাইরে নিক্ষেপ করা চলে না।

কিন্তু সাহিত্যের পরিভাষা নিয়ে যে তর্ক আবহমান কাল থেকে চলে এসেচে, সেটা এ নিয়ে নয়। এই বৃহৎ সাহিত্য-রাজ্যের একটি বিশেষ অংশকে বিশেষভাবে সাহিত্য নামের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েচে এবং সেই অংশের সীমা-নির্দ্দেশ নিয়ে এদেশের অলঙ্কার শাস্ত্রই যে কেবল টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ হয়েচে, তা নয়। পাশ্চাত্য জগতেও এই সাহিত্যিক দার্শনিকতার জঞ্জাল বড় কম সৃষ্টি হয় নি।

মোটামুটি ভাবে এই যে বিশেষ সাহিত্য—যাকে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বলা হয়ে থাকে—এর একটা পরিচয় জনসমাজে স্বীকৃত হয়ে আছে। অতীতকাল থেকে এই সাহিত্যিক রচনা হয়ে এসেচে এবং তারা পুস্তকালয়ের একটা সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষে স্থানও পেয়েচে। কিন্তু যারা সাহিত্য নামের পরিচয়-পত্র নিয়ে এই আসরে আসন পেতেচে তারা সবাই সত্য পরিচয় দিয়ে এসেচে অথবা মানুষের মনকে সাময়িক মোহের দ্বারা জয় ক'রে জাল-পরিচয় পত্র নিয়ে এই সম্মানের আসরে স্থান অধিকার করেচে—এই নিয়ে নানাজনের নানা সংশয়ের কোলাহল আর থামতেই চায় না। কেউ অতি জোরের সঙ্গে বলচেন যে, ওই পরিচয়-পত্র একেবারে বিধাতার দেওয়া আর কেউ বা ততোধিক জোরের সঙ্গে ঘোষণা করচেন যে, ও হচ্চে মানুষের কুরুচিকে বা মানুষের অন্য কোনো বৃত্তিকে ঘুস খাইয়ে আদায়-করা জাল-সার্টিফিকেট। এই যে সাহিত্যের স্বরূপ যাচাই করবার প্রয়াস, এটা কৃত্রিম নয়; মানব মনের জিজ্ঞাসু প্রকৃতির, এ একটি অকৃত্রিম চেষ্টা। এই চেষ্টার ইতিহাসই হচ্চে সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস। প্রত্যেক সাহিত্যেরই সমালোচনার একটি ধারা তার প্রায় জন্মকাল থেকে না হ'লেও তার একটু বড় হবার সময় থেকেই তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেচে। বাঙ্‌লা সাহিত্যের সমালোচনার ইতিহাস আজও অলিখিত বললেই চলে, ইতিহাস দূরের কথা আসল সমালোচনাও যে খুব বেশী পরিমাণ হয়েচে, তাও মনে হয় না।

যা হোক, সেই ইতিহাস রচনা বর্ত্তমান আলোচনার দুঃসাহস নয়। সাহিত্য কি, এ নিয়ে নানা সুধীজন কি কি আলোচনা করেচেন এবং তাঁদের আলোচনার মূল্যই বা কতখানি, সে সব নির্ণয় করবার চেষ্টাও আমার নয়। এখানে নিজের মনের দিক দিয়ে সাহিত্যের যা পরিচয় পেয়েচি তাই উপস্থিত করবার প্রয়াস পাব। বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে আমরা যে একটি বিশেষ রচনার ধারাকে লক্ষ্য করি সে ধারাটিও একটি মাত্র ধারা নয়, এর আবার শাখা-উপশাখা আছে। প্রথমতঃ সেই কয়েকটি ধারাকে ধরে নিয়েই বোঝার চেষ্টা করা যাক যে, এই বিশুদ্ধ সাহিত্য, সাহিত্যের অন্যতর প্রকাশ থেকে কি কারণে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ভাষার দিক দিয়ে গদ্য এবং পদ্য সাহিত্য বলে যে শ্রেণী-বিভাগ তার কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন; কারণ গদ্য এবং পদ্যের দ্বারা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে খুব বেশী সহায়তা হবে না; আর যদি বা তা থেকে আমাদের জানবার কিছু থাকে, সে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করার বাসনা আছে বলেও এখানে তা স্থগিত থাকুক। রূপের এবং বিষয়ের দিক দিয়ে সাহিত্যের যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী রচিত হয়েচে তার দিকে দৃষ্টি চালনা করলে আমরা কতকগুলো পরিভাষার সামনে উপস্থিত হই।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকবিতা, গল্প-উপন্যাস, কথাচিত্র, ছোটগল্প, নাটক (পঞ্চাঙ্ক থেকে একাঙ্ক) এই ধরণের রচনাই মোটামুটি ভাবে সাহিত্যের খাস দরবারের বস্তু বলে স্বীকৃত, তারপর প্রবন্ধ, ইতিহাস, ভ্রমণ-কাহিনী—এরাও কতকটা সাহিত্যের দরবারে আনাগোনা করবার অধিকার পেয়ে থাকে। তারপর পাই দর্শন এবং বিজ্ঞান—যার মাঝে তত্ত্বশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব থেকে সুরু করে অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, খনিজ-বিদ্যা ইত্যাদি সহস্র রকমের বিষয় স্থান পেয়েচে। এদের বিশুদ্ধ সাহিত্য বলবার কোনো উপায়ই নেই, গণিত শাস্ত্রের কথা তো একেবারে প্রশ্নাতীত।

এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত স্বরূপ আলোচনা এখানে অসম্ভব এবং হয়ত কতকটা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে দু'একটি বিষয়ের আলোচনা ক'রে এদের সঙ্গে বিশুদ্ধ সাহিত্যের কোথায় স্বরূপগত পার্থক্য, তাই দেখাবার চেষ্টা করব। ইতিহাসকেই প্রথম ধরা যাক। পূর্ব্বেই বলেচি, ব্যাপকভাবে সাহিত্যের যা পরিভাষা তাতে ইতিহাসও সাহিত্য এবং এই কারণেই ইতিহাস মানুষের অভিজ্ঞতার বিবরণ। কিন্তু সব অভিজ্ঞতার বিবরণই ইতিহাস নয়। কোনো বিশেষ দেশে এবং কালে বিশেষ কোনো মানব-সমূহের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা তাদের মাঝে সঙ্ঘটিত যে-সব প্রভাবশালী ঘটনা তার বিবরণই হ'ল ইতিহাস। অন্ততঃ প্রথম প্রথম এই ধরণের বিবরণকেই ইতিহাস ব'লে গ্রহণ করা হ'ল। সুতরাং ইতিহাস এই ব'লে আত্মপ্রচার করে যে, সে যা বর্ণনা করেচে তা বাস্তবিক ব্যাপার, কাল্পনিক নয়। সে এই বাস্তবিকতার দাবী দিয়ে অনুচ্চারিত ভাষায় আরো একটি কথা জানায় যে, এই সব ঘটনার বিবৃতির মাঝে ব্যক্তিগত অনুভূতির বিশিষ্টতা নেই। এই কথাটি ঠিক ঠিক পাঠকের নিকট স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরতে পেরেচি বলে আমার মনে হচ্চে না। অথচ এই কথাটি যদি ঠিক আমার মত ক'রে আমি পাঠককে না বোঝাতে পারি তা হ'লে আমার আসল বক্তব্যটাই অব্যক্ত থেকে যাবে। এমনও হতে পারে যে, আমার কথাটি হয়ত অনেকে নিজের অনুভব এবং উপলব্ধি দিয়ে বুঝে নিয়েচেন, তথাপি পাছে আমার বক্তব্যটি অন্য অর্থে গৃহীত হয়ে ভ্রান্তি উৎপন্ন করে, সেই শঙ্কায় যদি এখানে

আমার বলা বেশি-বলাতে দাঁড়ায়, আশা করি মার্জ্জনা পাব।

যে-কোনো একটা সাধারণ বাস্তবিক ঘটনাকেও দু'জন লোক ঠিক একভাবে প্রত্যক্ষ করে না। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী তিনজন লোকের দেওয়া কোনো বর্ণনা কখনো এক হয় না, এটা যে-কেউ পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন। আদালতের সাক্ষ্যে স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা যে অনেক থাকে সে কথা সবাই জানেন, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাও যে বড় কম থাকে না এও বোধ করি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করবেন। এর কারণ কি? একই ঘটনাকে তিনজন লোক চোখে দেখে, কানে শোনে অথচ তাদের সেই ঘটনার বর্ণনায় এত বিভিন্নতা এসে পড়ে কেন? এর কারণ দু'টি—একটি হ'ল দ্রষ্টাগত (subjective) আর একটি হ'ল দৃশ্যগত (objective)।

যে কোনো সামান্য ঘটনাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করবার শক্তি কারো নেই। কেবল দেশ কালের প্রভেদ থেকেই কত অসম্পূর্ণতা ওই প্রত্যক্ষের মাঝে হয়ে যায়। তারপর যে কোনো ঘটনাকে সামান্যভাবে জানতে হলেও তাকে তার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের যোগে দেখতে হবে। তাই কোনো ঘটনা যখন আমাদের জ্ঞানে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে আর ঠিক সেই ঘটনা কিছুতেই বলা চলে না। বাইরের ঘটনা শুধু একটা বিশেষ দিক দিয়ে আমার মনকে স্পর্শ করে, আমার মন তার পূর্ব্বাপর যোগ সাধন ক'রে একটা বিশেষ অর্থ দান করে। যা কিছু দেখা-শোনা তার মাঝে অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যায় বাইরেরই নানা কারণে। 'আমি যেখান থেকে দেখেচি সেখান থেকে আরেকজন দেখে নি, আমি যে সময় থেকে দেখেচি আরেকজন সেই সময় থেকে দেখে নি—এই কারণেও দু'জনের অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। এই তো গেল দৃশ্যগত বাধা। তার পর দ্রষ্টাগত বাধাও আছে। আমাদের মন যা কিছু প্রত্যক্ষ করে তাকে একেবারে শুদ্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। পূর্ব্ব সংস্কার, ব্যক্তিগত রাগ, বিরাগ এবং উপলব্ধির শক্তি দিয়ে আমরা ঘটনাকে পরিবর্ত্তিত ক'রে গ্রহণ করি। অভিজ্ঞতায় এই কারণেও স্বাতন্ত্র্য আসে।

এখন দেখা যাক ইতিহাস কি চায়। ইতিহাস চায় বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাকে নির্ভুল এবং যথাযথভাবে নিরূপণ করতে। ঘটনাবিবৃতির মাঝে যে দ্রষ্টাগত এবং দৃশ্যগত নানা পার্থক্য, তাকে দূর ক'রে ইতিহাস ঘটনাকে তার পরিপূর্ণ বাস্তবিকতায় প্রকাশ করবার ভার নিয়েচে। কোনো একটি ঘটনাকে পাঁচজন বর্ণনা করেচে; ইতিহাস কখনো সেই পাঁচটিকেই সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না। পাঁচজন দিয়েচে পাঁচজনের মনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, সুতরাং এরা পরস্পর থেকে কিছু না কিছু স্বতন্ত্র হবেই নানা কারণে। ইতিহাস ওই সব অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ ক'রে সেই ঘটনাটিকে আবিষ্কার করতে চায় যেটি বাস্তবিক ঘটেছিল। এ যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে কতকটা অসম্ভব রকমের ব্যাপার, তা নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়; সে কথা বাদ দিয়ে ইতিহাস কি ভাবে ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ করে তাই দেখা যাক। ইতিহাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিকে পারস্পরিক তুলনার দ্বারা কাটাছাঁটা আরম্ভ করে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার যে-সব অংশ পরস্পর বিরুদ্ধ সে গুলোকে বর্জ্জন করে এবং সে সব বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে একটা সঙ্গতি দিয়ে একটা রূপ দেয়। ঘটনার এই যে রূপ, এই হ'ল ঐতিহাসিক গবেষণামূলক সত্য নিরূপণ।

বলা বাহুল্য ইতিহাসের এই যে চেষ্টা, এটা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েচে। প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত বর্ণনাকেই ইতিহাস বলে ধরা হয়েছিল। ধীরে ধীরে একই ঘটনার যখন ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাঠককে বিচলিত করল তখন থেকেই তুলনামূলক পদ্ধতি দিয়ে সত্য নিরূপণ আরম্ভ হ'ল। একে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও বলা চলে কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের এই পদ্ধতির মিল আছে। বিজ্ঞানও ব্যক্তিগত জ্ঞানকে পরখ করে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানকে তুলনার দ্বারা তার যাথার্থ্য

নির্ণয় করে। তবে ইতিহাসের চেয়ে পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতির এক জায়গায় একটা বিশেষত্ব আছে। ইতিহাসের বিষয় মানুষের ক্রিয়াকলাপ এবং এমন ক্রিয়াকলাপ যাকে দ্বিতীয় বার প্রত্যক্ষ করবার উপায় নেই। কোনো একটি ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটি কি ছিল, কেমন ক'রে হয়েছিল তা চিত্রগুপ্তের খিতিয়ে চিরতরে আঁকা হয়ত হয়ে গেছে। কিন্তু চিত্রগুপ্তের সিনেমায় তার উদ্ঘাটন না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাদের তাকে জানবার আর কোনো উপায় নেই। এই কারণেই ইতিহাসের সত্য নির্ণয়ের উপায় সীমাবদ্ধ; তাকে সমসাময়িক দ্রষ্টার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। ফলে ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারে নির্ভুল সত্য বলে মনে করবার উপায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের এখানে দস্তের সীমা নেই। সে যে কোনো ঘটনাকে নানা অবস্থায় ইচ্ছামত ঘটিয়ে তাকে অনেক রকমে—যে রকমে ইচ্ছা যাচাই ক'রে দেখতে পারে। এই কারণেই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি যে সত্যকে নির্ণয় করে, তাকে সে ব্যক্তিগত ভ্রান্তিবর্জ্জিত বলে প্রচার করবার বেলায় নিঃসঙ্কোচ।

ফল কথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশেষত্বই হচ্চে নির্ব্যক্তিক তত্ত্ব বা তথ্যকে নির্ণয় করা। কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—ভাবনা, কল্পনারই এখানে নিঃসংশয় অভ্যর্থনা নেই। অখণ্ড অভিজ্ঞতার যে-রূপ সে-রূপের সমাদর এখানে নেই। বিশ্লেষণের যূপকাষ্ঠ এখানে নিয়তই সে-রূপটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে প্রস্তুত। সাহিত্যের বেদী কিন্তু রচিত হয়েচে পূর্ণ বিকশিত শতদলের উপর, যূপকাষ্ঠের মঞ্চে নয়। যাক্, রূপক ছেড়ে স্পষ্ট কথায় ফিরে আসা হোক্।

বৈজ্ঞানিক রীতির কথা বলেচি এবং তার বিষয় কি তারও ইঙ্গিত প্রকারান্তরে করা হয়েচে। বৈজ্ঞানিক রীতি আশ্রয় করে যে শাস্ত্রই চলেচে তার লক্ষ্য হয়েচে নির্ব্যক্তিক তত্ত্ব এবং তথ্য। অভিজ্ঞতা—মানবীয় জ্ঞান, অনুভব, কল্পনা—যাই এর বিষয় হোক্ না কেন, বিজ্ঞান-পন্থী কখনো এদের পরিপূর্ণ সমগ্রতায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তুলনাপদ্ধতির কাঁচি দিয়ে ইনি নিয়ত সত্যকে অর্থাৎ মানবীয় অভিজ্ঞতাকে কেটে ছেঁটে চলেছেন।

ওপরের কথাগুলো মনে নিয়ে এবার বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি চালনা করলেই আমরা সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা বুঝতে পারব। সাহিত্যের ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর রূপ-স্বাতন্ত্র্য বাদ দিলেও একটি কথা সর্ব্বত্রই স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্যের লক্ষ্য কোনো দিনই তত্ত্ব বা তথ্য নিরূপণ নয়, অভিজ্ঞতাকে তার অখণ্ড সমগ্রতায় প্রকাশ করাই হয়েচে সাহিত্যের লক্ষ্য। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মিলনে যে একটি অখণ্ড অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ আত্ম-প্রকাশই সাহিত্য। এই কারণেই সাহিত্য রূপময়।

রূপ কথাই হোক অথবা উপন্যাসই হোক, মহাকাব্যই হোক অথবা গীতি-কবিতাই হোক—সর্ব্বত্রই পাই কোনো-না-কোনো মানুষের কোনো-না-কোনো জাতের অভিজ্ঞতার কল্পনা-ভাবনা-অনুভূতির নিঃসঙ্কোচ, নিঃশঙ্ক, অসংশয় আত্ম-প্রকাশ। পাতাল-পুরীর রাজকন্যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মিথ্যা সাব্যস্ত হতে পারে, ভোমরার ভেতর সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিছক মিথ্যা হতে পারে কিন্তু সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এ একটি অখণ্ড অভিজ্ঞতা—একে যখন পরিপূর্ণ ক'রে প্রকাশ করা হ'ল তখনই তাকে সাহিত্য বলে স্বীকার না ক'রে পথ রইল না। ভূত দেখাটা হয়ত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিচারে ভুল প্রতিপন্ন হতেও পারে কিন্তু ভূত দেখার যে-একটি অনুভূতি এবং কল্পনা কোথাও-না-কোথাও মানব মনে সত্য হয়েচে, একথা অস্বীকার করা যাবে কি ক'রে? সেই অনুভূতিকে যদি ভাষায় এমন ক'রে ব্যক্ত করা যায়, যাতে সেই অভিব্যক্তি অপরের মনেও সেই অনুভূতিকে জাগ্রত ক'রে তুলতে পারে, তা হলেই কি বলব না সাহিত্য হয়েচে? অর্থাৎ কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা

নিয়ে আলোচনা করা, তার তত্ত্ব বা তথ্য নির্ণয়ের প্রয়াস সাহিত্যের কাজ নয়, সাহিত্যের কাজ সেই অভিজ্ঞতাকে কথার জগতে জন্ম দেওয়া, রূপ দেওয়া, যাতে আমি যাকে প্রত্যক্ষ করেচি অন্যেও তা প্রত্যক্ষ করে ভাষার জগতে শব্দ-রূপের মাঝে। সাহিত্যের বিষয় কাটা-ছাঁটা অভিজ্ঞতা নয়, অখণ্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা। সাহিত্যের কাজ অভিজ্ঞতাকে তার অখণ্ড বিশিষ্টতায় প্রকাশ করা। যা হোক, সাহিত্যের কাজ কি, সে আলোচনা আজ স্থগিত রইল। এই অভিজ্ঞতাকে মানুষ কেন প্রকাশ করে, সে দিকে একটু দৃষ্টি চালনা করা হয়ত অসঙ্গত হবে না।

কোনো বস্তুর প্রথম অভিজ্ঞতাটি বিস্ময়কর; তার অপূর্ব্বত্ব অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় ক'রে তোলে। এই কারণেই শিশুর কাছে এই জগতের শব্দ-স্পর্শ-রূপ এত বেশি উত্তেজনা ভরা। শিশুর সজাগ চেতনায় যে-কোনো নতুন বস্তু বা ঘটনা যে আলোড়ন আনে তেমন আলোড়ন আমাদের অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়-মনে জাগে না। অর্থাৎ আমাদের চেতনা অনেকটা অভ্যস্ততার দ্বারা অন্ধ হয়ে আছে। আমাদের চোখের সম্মুখে ধরণীর যা কিছু দেখি, তার অনেকটাই দেখি বলে মনে করা, বাস্তবিক দেখি না। চেতনার সূক্ষ্মস্নায়ুরাশিতে এদের ঘাত-প্রতিঘাতও জাগে না। এই অভ্যাসের আবরণই আমাদের অভিজ্ঞতার—নিজস্ব, ব্যক্তিগত চিন্তার, অনুভবের, কল্পনার ভীষণ বাধা। জগতের বহু বস্তু এবং বিষয়ের অভিজ্ঞতা, আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাই নয়, অনেক পরিমাণে পরানুকরণ, অনেকখানি অপরের অভিজ্ঞতার একটা গতানুগতিক অনুসরণ মাত্রই আমরা করে চলেচি। ফুল, প্রজাপতি, আকাশ, প্রকৃতি থেকে সুরু ক'রে মানব জীবনের সহস্র ব্যাপারের কয়টিকেই বা আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজের চোখে দেখেচি, নিজের চেতনা দিয়ে সহজভাবে গ্রহণ করেচি? প্রতিপদে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা যে একটি মনোবৃত্তি গড়ে উঠেচে সেই মন দিয়ে নির্ব্বিচারে আমরা এই জগৎকে গ্রহণ করি। কিন্তু এই যে পূর্ব্বানুসরণের জড়ধর্ম্ম, মন একে মাঝে মাঝে কাটিয়ে ওঠে, তখন সে নিজের চেতনায় তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাটিকে প্রত্যক্ষ করে। আর পূর্ব্বেই বলেচি এমনি ক'রে যখন কোনো অভিজ্ঞতা লাভ হয় তখন তা হয় অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র। এই কারণেই যখন কোনো ব্যক্তির বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাটি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাও হয় অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র। তখনই সেই প্রকাশ হয়ে ওঠে সাহিত্য; সাহিত্যের তাই প্রথম লক্ষণই তার এই অপূর্ব্বতা, তার মৌলিকতা। খাঁটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্রই মৌলিক।

সমাজ মানুষকে সুবিধার খাতিরে অনেক পরিমাণেই জড়ধর্ম্মী করে তোলে, অর্থাৎ জীবনের অভিনব বিশিষ্টধারা প্রবর্ত্তনে সমাজ প্রায়শঃই বিরোধী। স্থায়িত্বের দায়ে সে নবীনত্বকে ভয় করে। তাই সমাজের চাপে মানুষ হয় ব্যক্তিত্বহীন; tradition-এর চিরাচরিত প্রথার সে হয়ে ওঠে বাহন। এই কারণেই সামাজিক মানুষ বহু পরিমাণে মৌলিকতাহীন, বিগতযুগের ভাবনার সে করে অনুকরণ এবং অনুসরণ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাই মৌলিকতাহীন হয়ে পড়ে। এই কারণেই যখন বলি যে, খাঁটি অভিজ্ঞতা মাত্রই মৌলিক, তখন সে কথা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু কথাটি যে সত্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টি-চালনা করলেই উপলব্ধি করতে পারি। উপন্যাসে আমরা অনেক সময় আমাদের অতি পরিচিত ঘটনা বা চরিত্রকেও দেখে যে হর্ষপুলক অনুভব করি, তার কারণ কি? 'রামের সুমতি'র রাম কিছু অদ্ভুত বা অসাধারণ কোনো বালকের চরিত্র নয়, একে আমরা য়েন একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে থাকতেও কি একে আমরা কখনো দেখেছিলাম? সে অসাধারণ নয় বলেই আমাদের অভ্যস্ত চেতনা তাকে কখনো ভালো করে গ্রহণই করে নি। একজন অকস্মাৎ সেই অভ্যস্ততা

কাটিয়ে রামকে দেখলেন চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে, তখন আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই রাম যখন ভাষায় রূপ ধ'রে আত্মপ্রকাশ করল, তখন আমরাও তাকে সচকিত হয়ে দেখলাম এক অপূর্ব্ব আলোকে বিস্ময়ের দীপ্তিতে। যার এমনিতরো পূর্ব্বসংস্কারকে কাটিয়ে কোনো কিছুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার শক্তি আছে, তার পক্ষেই সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব; যদিচ কেবল মৌলিক অভিজ্ঞতা লাভ করবার শক্তিই সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, এ কথাটি এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সে যাই হোক, সাহিত্যের বিষয় যে মানুষের জীবন এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মৌলিক এবং ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ভাবনা, অনুভব এবং কল্পনা, আশা করি এই বলে আজকের আলোচনা থেকে নিরস্ত হতে পারা যায়। এই বিষয়টি কি ক'রে সাহিত্য হয়ে ওঠে এবং সাহিত্যের ভিন্ন-ভিন্ন রূপের বিশিষ্টতাই বা কোথায়, সে আলোচনা ভবিষ্যতে করা যাবে।

কাশফুল

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

বর্ষার নদী কূলে কূলে ভরা। ওপারের ঝাউবনে অবিরাম শন্ শন্ ধ্বনি উঠিতেছে। আকাশে ঘাদশীর চাঁদ। নদীর বুকে সাদা সাদা পাল তুলিয়া নৌকাগুলি ছুটিয়াছে। অবনীনাথ কিসের একটা ছুটীতে বিক্রমপুর মামার বাড়ীর দেশে চলিয়াছে। সে নারায়ণগঞ্জের সাবডিভিসানাল অফিসার, সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নী মীরা। মীরা সহরের মেয়ে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের সহিত তাহার দেখা-শোনা বড় একটা নাই, দু'একবার মাত্র দর্শনলাভ ঘটিয়াছে। ছইয়ের কিনারায় বসিয়া সে শুধু একমনে নদীর সেই শোভা আনমনে দেখিতেছিল। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় হাজার চাঁদ নাচিতেছে। অবনীনাথ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, গাঙটা যেখানে গভীর হইয়া গিয়াছে, তাহারই কাছাকাছি একটা জায়গায় আসিতেই সে বলিয়া উঠিল, মাঝি, নৌকা বাঁধো, রাতও কম হয় নি, আজ আর পাড়ি দিয়ে কাজ নেই। কাল ভোর-নাগাদ নৌকা ছাড়লেই চলবে।

ঘাটে আরও কয়েকখানি ডিঙা বাঁধা। নিস্তব্ধ পল্লী, অদূরে বন-জঙ্গলের নিবিড় ছায়ায় কি একটা দেশী ফুল ফুটিয়া চারিদিক গন্ধে আমোদ করিয়া দিয়াছে।

গাঙের বুকে উজান ঠেলিয়া আরও কয়েকখানি নৌকা ধীরে ধীরে ওপারের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, দাঁড়-বাওয়ার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ অনেক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল। মাঝিরা গলুয়ে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে।

অবনীনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, চল, তীরে উঠি!

মীরা মাথা নাড়িয়া বলিল, চল।

তীরে উঠিয়া তাহারা পল্লী-পথ ধরিয়া কিছুদূর আগাইয়া গেল। দূরে এক গৃহস্থের কুটীরের আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

একটা পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া আকাশ-বাতাস দীর্ণ করিয়া সুরের ঢেউ তুলিতেছিল। পথের দুই ধার বন-জঙ্গল, শিয়াকুল, ময়না, চেঁচো ঘাস, তেলাকুচার লতায় ভরিয়া আছে, কুসুম লতারও অভাব নাই। চারিদিকে চাহিয়া মীরা কহিল, এটা কোন গ্রাম বুঝি?

অবনীনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, তুমি বুঝি কখনো কোন গ্রামে আসো নি, না?

—ছোট বেলায় দু'একবার, আর বড়ো হয়ে একবার।

বাতাসে নলবনে বাজনা বাজিতেছে। বিস্ময়ে ও কৌতুকে মীরা প্রশ্ন করিল, দেখো, এখানে হাটবাজার নেই? ভালো খাবার পাওয়া যায় না?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অবনীনাথ জবাব দিল, খাবার তো সঙ্গেই রয়েছে, কিছু খাবে?

—না।—বলিয়া মীরা মুখ ফিরাইল, পরে কহিল, ঐ যে একটা বাজারের মতো কি দেখা যায় না? এ যেন রূপগঞ্জের বাজারের মতো—ওই একটা প্রকাণ্ড মঠ, দেখেছ? এ নিশ্চয়ই রূপগঞ্জ, না?

—কোন্ গাঁ, মীরা?

মীরা কোন জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেখতো কাছে কোন বড় বাড়ী দেখা যায় কি না!

—বড় বাড়ী তো……

ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ সনাতন মাঝি পিছনে আসিতেছে। সনাতনকে দেখিয়া অবনীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, এ কোন্ গ্রাম?

—আজ্ঞে, এটা রূপগঞ্জের হাট।

—খুব বড় গ্রাম বুঝি?

—আজ্ঞে, এই এলাকায় এত বড় গাঁও আর নাই…রূপগঞ্জের বাবুরো খুব বড়লোক।

মীরা কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা ঢাকায় থাকেন না?

—হ্যাঁ, মা-ঠাকরেণ!

অবনীনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—বাজার থেকে কিছু মাছ-তরকারী…

মীরার মনে একটা কিসের সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। প্রায় তিন বছর আগে সে এই গ্রামে একবার প্রেমেনের সঙ্গে আসিয়াছিল। তখন ছিল শরৎ কাল, নদীর দুই তীরে কাশফুলের অজস্র শোভায় বনানী আলোকিত। শাপলা ফুল ফুটিয়া খালের বুক রাঙা করিয়া থাকিত। ঘুঘুর বিষাদ-করুণ তান সে কতদিন শুনিয়া গেছে—উদাস মৌন ধরণীর নিস্তব্ধতা সে অনেক দিন অনুভব করিয়া গেছে এই পল্লীগ্রামে। আজ অনেক কথাই তার মনে পড়িয়া গেল … …

* * * *

ওপারের মঠ-বরাবর মাঝি গাঙে পাড়ি দিয়া কহিল, এই যে রূপগঞ্জ এসেছি!

ভানু উৎফুল্ল হইয়া কহিল, প্রেমেনদা, এই বুঝি তোমাদের গ্রাম? বড় সুন্দর কিন্তু!

মীরাও তাহার স্কুলের সাথীটির কথায় সায় দিয়া কহিল, নামই যে ভাই রূপগঞ্জ, সুন্দর হবে না ত' কি!

নৌকা তীরে পৌঁছিতেই তাহারা তিনজনে ডাঙায় নামিয়া পড়িল। সুমুখে প্রকাণ্ড একখানি ফুলের বাগান। দেশী ফুলের অন্ত নাই। বেলা, টগর, যুঁই, হাসুহানা, গন্ধরাজ, চাঁপা, চামেলী, নাগকেশর—কোন ফুলেরই অভাব নাই। এক দিকে ফলের বাগান, মাঝখানে পথ, সবুজ ঘাসের গালিচাপাতা। মীরা তখন নদীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল, আর ভানু আকাশের তারা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়া কহিল, পাড়া-গাঁয়ের আকাশ কি সুন্দর!

প্রেমেন সুর ধরিয়া কহিল, শুধু সুন্দর?…

কয়েকদিন তাহারা রূপগঞ্জে ছিল। দিনের বেলা এ-বাড়ী সে-বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, সন্ধ্যাবেলা তাহারা নৌকা করিয়া শীতলক্ষ্যার অনেক দূর অবধি বেড়াইয়া আসিত। মীরার মনে পড়ে কত কথা! স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া প্রেমেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে গান ধরিত—

কে আমার দুখের তরী চল্‌বে বেয়ে সন্ধ্যাবেলা!

ভানু বাধা দিয়া কহিত, 'সোনার তরী', আমি বেয়ে যাব… …

প্রেমেন হাসিয়া কহিত, যদি তুমি না যাও—

ভানু জবাব দেয়, তা' হলে তাই!

সেদিন আকাশে ছিল ত্রয়োদশীর চাঁদ। গাঙের কূলে কূলে জোয়ার জাগিয়া উঠিয়াছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশ যেন আজ অপূর্ব শ্রীতে ভরিয়া গিয়াছে। ভানু কহিল, প্রেমেনদা, তোমার একটা গান গাও না!

—আমি কি আর গান জানি? বরং তোমরা দু'জনে গাও, আমি শুনি।

মীরা হাসিয়া কহিল, প্রেমেনদা, তুমি গাও।

প্রেমেন দূর-সম্পর্কে মীরার জ্ঞাতি ভ্রাতা। সহরের বাসায় উভয়ের যাওয়া-আসা খুব বেশী। ভানু মীরার স্কুলের সমপাঠী, দু'জনে খুব ভাব। ভানু মৃদু হাসিয়া কহিল, তুমি গান ধর, আমরা দু'জনে তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাইব।

প্রেমেন যেমন সহজ, সরল, তেমনি উদার ও মহৎ। কলেজেও তার যথেষ্ট সুনাম, অথচ এমন ডান্‌পিটে ছেলে ঢাকার সহরে আর একটিও ছিল কি না সন্দেহ।

সে সহসা গ্রাম্য গান ধরিয়া কহিল, তোমরাও গাও!

কোন্ গেরামের গাঙের বুকে কোন্ দেশেরি নাইয়া,

বাঁশের বাঁশী বাজায় বসি' দূরের পানে চাইয়া—

ভানু খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কি ছাইয়ের গান, তার চেয়ে 'নাছিমপুরের গাঙে' গানটা ঢের ভালো! ভানুর কথা লুফিয়া লইয়া মীরা কহিল, চুপ কর্ না ভানু। প্রেমেনদার গান সবই মিষ্টি।

যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল, আকাশের চাঁদ তখন মেঘের কোলে মুখ লুকাইয়াছে।

কয়েকদিন উপর্যুপরি ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মীরার একটু জ্বর-ভাব হইয়াছিল। সেদিন সে কিছুই খায় নাই, বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়াছিল। প্রেমেন বারান্দায় পায়চারী করিতেছিল ও মাঝে মাঝে উদাসভাবে কি জানি লিখিতেছিল। ভানু পিছনে আসিয়া চুপি চুপি দাঁড়াইয়া দেখিল, কাগজে কালির আঁখরে কি লেখা হইতেছে……

আমি আর তুমি, মোরা অজানা-সাথী,

তুমি ভানু আমি……

প্রেমেন প্রথমে টের পায় নাই, তন্ময় হইয়া লিখিতেছিল—

তুমি ভানু, আমি হেম কিরণ ভাতি……

ভানুর সেদিন পরিচ্ছদের একটু নূতনত্ব ছিল। হাতের সোনার চুড়ি কয়গাছি দেহের সোনার রঙে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কানে দুইটি দুল, অঙ্গে ফিকা-নীল রঙের একখানি শাড়ী, জরীর পাড়টুকু মাঝে মাঝে চিক্‌মিক্ করিতেছে, পায়ে রঙিন স্যাণ্ডেল … মুখ ফিরিয়া চাইতেই প্রেমেনের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া ভানু কহিল, কি লিখ্‌ছ?

দেখ না!—বলিয়াই প্রেমেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—ও কি!—বলিয়াই ভানু সলজ্জভাবে কহিল, আচ্ছা, তোমার গানে এত ভানুর ছড়াছড়ি কেন? তুমি ভানুর বদলে রবি, তপন লিখতে পার না?

—ভাব কি আর বদলানো যায়, ভানু?

—খুব যায়, তুমি যদি এমনি করো, ত' আর কোন দিন তোমার সঙ্গে মেলা-মেশা করব না! জানো দিদিরা কি বলে?

—কি বলে?

চুপ করিয়া থাকিয়া ভানু কহিল, যা খুসী তাই—

—তারা বুঝি বলে, ভানুকে প্রেমেন একটু ভালো…

মুখ ফিরাইয়া ভানু খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, ও-সব কথা তারা মুখেও আনে না।

—তবে কি বলে?

—জানি না, তারা কি বলে। যাও—

মৃদু হাসিয়া প্রেমেন কহিল, বলতে তোমার লজ্জা করে ভানু যে, আমি তোমায় ভালোবাসি?

সলাজ মধুর হাসির সঙ্গে চটুল চাহনি দিয়া ভানু রাগতভাবে কহিল, ধ্যেৎ, আমি যেন……

—বা রে, ভুলে গেলে এরি মধ্যেই…

—কখন বলেছি তোমায়…

—বলো নি? বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, তুমি

আমায় ভালোবাসো কি না! আচ্ছা, আমি ছাড়া আর কারও কথা তোমার মনে কখনও এসেছে, আমি বুঝি জানি না···

ভানু সলজ্জভাবে বলিল, তুমি রোজ আমাকে কেন ঘাঁটাও, আমি কি জানি·····

প্রেমেন সহসা খপ্ করিয়া ভানুর শুভ্র কোমল হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তুমি আমায় একটুও ভালোবাসো না ভানু?

—না।—বলিয়াই ভানু সজোরে হাত ছাড়াইয়া মীরার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার বুকের ভিতরে তখনও শব্দ হইতেছিল···

আর একদিন তাহারা মুড়া-পাড়ার মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। ধানক্ষেতের বুক ভাঙিয়া শন্ শন্ শব্দ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে, পালে-পালে গঙ্গা-ফড়িঙ্ ছইয়ের ভিতর দিয়া আসিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছিল।

অদূরে জলা মাঠের দুই দিকে শাপলা ফুলের ঝাড়, ভানু হাত বাড়াইয়া দুই-চারিটি তুলিয়া লইয়া কহিল, কেমন সুন্দর ফুল দেখেছ প্রেমেনদা?

প্রেমেন হাসিয়া কহিল, সুন্দর হাতে সবই সুন্দর দেখায়।

ভানু মুখ টিপিয়া হাসিল।

খালের মুখে আসিতেই দেখিতে পাইল, কত মহাজনী নৌকা পাল তুলিয়া মালের বোঝা লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতেছে। খালের দুই পারে ছায়া-নিবিড় আম-নারিকেল-সুপারী গাছের শ্রেণী, বেতস লতারা এপার হইতে ওপারের গাছে সখ্যতা স্থাপন করিয়া বাতাসে দুলিতেছিল। একপাল বন্য-বানর কিচির-মিচির শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছিল, বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুষ্ট ছেলেরা তাহাদের প্রতি ঢিল ছুঁড়িতেছিল। তীরে তীরে মাঝিরা লগি গাড়িয়া বসিয়াছিল, ভাড়া পাওয়ার আশায়। কে একজন রসিক নাইয়া গলুয়ের ওপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গামছা মুখে দিয়া অনুচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছিল—

বন্ধুর বাড়ী গাঙের দেশ, যাইতে হয় রে
উজান বাইয়া।
পরাণটারে হাতে লইয়া, পাড়ের দিকে
চাইয়া চাইয়া॥

ভানু কৌতুক করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, প্রেমেন-দা, ওই শোন তোমার বেশ জুড়ি মিলেছে।

প্রেমেন সে কথায় কান না দিয়া মাথা নাড়িয়া নৌকায় কাঠের পাটাতনের উপর সানন্দে তাল ঠুকিতেছিল।

কয়েকটি গ্রাম্য-ছেলে জলে ডুব মারিয়া একবার নৌকার কাছে আসিয়া আবার ঝুপ করিয়া জলের অতলে গিয়া খানিক পরে আবার তীরের দিকে ধাবিত হইল। কয়েকটা রাজহাঁস তাহাদের অনুসরণ করিতে গিয়া বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেরা তাহাদের গলাজলে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিতেছিল। নারিকেল গাছের মাথায় বসিয়া একটা চিল উদাস নেত্রে দূরের পানে চাহিয়া-ছিল, হঠাৎ হোঁ মারিয়া একটা সরপুঁটি ঠোঁটে জড়াইয়া ধরিয়া তীরে গিয়া পৌঁছিতেই আর কি রক্ষা আছে, কয়েকটি দাঁড়কাক কর্কশ শব্দে তাহার পিছন লইল।

প্রেমেন তীরের পানে চাহিয়া কহিল, সাঁতার কাটতে জান, ভানু?

—না।

—যদি নৌকা উল্টে যায়?

—যায় যাবে।

প্রেমেন পুনরায় সে কথা পাড়িল, ডুবে যাবে যে···

—ডুবে যাব না আর কিছু, তুমি বুঝি সাঁতার জান না?

—তাতে তোমার লাভ?

—লাভ মস্ত, তুমি আমাকে অন্ততঃ বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

—যদি না করি···

ভানু প্রেমেনের চোখের দিকে চাহিয়া কহিল, না ক'রে তুমি পারবে!

প্রেমেনের মুখখানি সহসা আনত হইয়া আসিল—মনে মনে কহিল, ভানু, তোমাকে এখনও ভালো ক'রে ঠিক বুঝতে পারলুম না।

প্রেমেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভানু পুনরায় কহিল—প্রেমেনদা, তুমি না কি আমাকে ভালোবাস?

তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত, চোখে মুখে কেমন একটা অব্যক্ত ভাষা, যা বুঝি মানুষ আজও জানে না!

ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া প্রেমেনের সঙ্গে ভানুর বড় একটা আর দেখা-শোনা হয় নাই। মীরার মারফতে তাহাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান কতকটা চলিত বটে, কিন্তু প্রেমেন মাসিক কাগজে গল্প, কবিতা ও গান লিখিয়া তাহার মনের কথা মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়া ফেলিত। কবির প্রাণ অতীতের রহস্যে ঘেরা, ভবিষ্যতের ইন্দ্রজালে ভরা, রঙিন স্বপ্নের আবেশে ভরপুর! দু'-একদিন দেখা-শোনা হইয়াছে সত্য, তবে তেমন কিছু কথাবার্তা হয় নাই।

মুকুল-থিয়েটারে একদিন তাহাদের সহসা দেখা হইয়া গেল। ভানুর সঙ্গে তার ছোট বোন রাণু ছিল, আর কেহ ছিল না। প্রেমেন সুমুখে আসিতেই ভানু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আনত মুখে জবাব দিল, কখন এলেন, মীরা আসে নি?

প্রেমেন তাহার সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল—না, মীরা আসে নি।

আলো নিভিয়া যাইতেই প্রেমেন চুপ করিয়া পাশের আসনে বসিয়া পড়িল। ছবির পৃষ্ঠায় তখন দেখা দিয়াছে,···রূপরেখা···সঙ্গীত-রচয়িতা··· শ্রীপ্রেমেন্দ্র·····

ভানু সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, আপনি বুঝি গান লিখেছেন?

—কেন, তোমার ভালো লাগে নি বুঝি?

—সে কথা আমি কখন বলেছি!

—বল নি বটে, কিন্তু···

ভানু কেবল জবাব দিল, আপনি বড় বাজে বকেন।

—ওই টুকুই আমার লাভ।

ভানু ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, চুপ করুন না! রাণু কি মনে করবে?

প্রেমেন মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি যে কিছু না বলে থাকতে পারি না। তোমাকে আমার এত ভালো লাগে—

—আর আপনাকে আমার এত খারাপ লাগে···

—তুমি বড় দুষ্টু!

—বেশত। আপনি খুব ভালো, না?—বলিয়াই ভানু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, রাগ করলেন না কি?

—না।—বলিয়া প্রেমেন মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, তুমি কিছু মনে ক'রোনা কিন্তু, আমি অনেক সময় অমন যা-তা বলি।

চোখের নিমিষে সময় কাটিয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ তাহারা আর কথাবার্তা বলে নাই। বিদায়ের সময় ভানুর চোখ দু'টি ছলছল করিয়া উঠিল। প্রেমেন পথে নামিয়া কোন রকমে বাসায় ফিরিয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই কোন জমিদার-গৃহে ভানুর বিবাহ হইয়া গেল। সে সুখী হইয়াছে কি না তাহার খবর ভালো আমরা জানি না।

ঠিক সেই সময়ে প্রেমেনের ষ্টেট স্কলারসিপ্ নিয়া বিলাত-যাত্রার কথা ছিল। কাহার অমতে ভানুর বিবাহ যে প্রেমেনের সঙ্গে হয় নাই, একথা লোক-পরম্পরায় শোনা যায় নাই। ভানু মুখ ফুটিয়া সে কথা তাহার পিতামাতাকে কোন দিন বলেও নাই এবং

কোন বাঙালী মেয়েই বোধ হয় তাহা বলে না। মীরা না কি একদিন কথায় কথায় প্রেমেনের নাম উল্লেখ করিয়াছিল, কিন্তু সে কথা চাপা পড়িয়া যায় সময়ের প্রভাবে। যাক্, সে কথা আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই। যাহা হইবার, তাহা ত হইয়া গিয়াছে। প্রেমেন এখনও কবিতা লিখে, গান করে, পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে যে ঘরে বসিয়া থাকে, এমন নয়। ভানু শিলঙ্ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা চেঞ্জে গিয়াছিল, মীরা আসিয়াছিল দেখা করিতে।

বিবাহের পর কোন্ তরুণীর মুখে না হাসি উছলিয়া উঠে! কিন্তু ভানুর চোখে-মুখে তেমন-কিছু বড় একটা দেখা গেল না।

মীরা হাসিয়া কহিল, তপন আসে নি?

মুখ নীচু করিয়া ভানু জবাব দিল, না।

মীরা কৌতুক করিয়া কহিল, তপন আর আস্‌বে কি, সেতো ভানুর সাথে মিশেই আছে।

ভানু বড় বেশী একটা কথাবার্ত্তা বলিল না।

শিলঙের কথাবার্ত্তা উঠিলে সে শুধু সরল গাছের কথা, বৃষ্টির উৎপাত, হাওয়ার জ্বালা—এই সব বাজে কথা বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিল। মীরাও আর কোন কথা সেদিন বলিল না।

তিনমাস পরে আবার দেখা। ভানুর প্রশান্ত মূর্ত্তি মীরা তেমন ভালো চোখে দেখিল না। তবু ঠাট্টা-তামাসা করিতে ছাড়িল না, তুমি ভাই বেজায় গম্ভীর হয়ে গেছ, দেখ্‌ছি। বিয়ে কি আর কারও হয় না?

একরকম জোর করিয়া হাসিয়া ভানু জবাব দিল, গম্ভীর হয়ে গেছি, ও তোমার চোখের ভুল। এ বয়সে কি···

—তাই ত' দেখ্‌ছি!

—ও চোখের দোষ, চশমা নাও, দেখ মা আমি কেমন চশমা নিয়েছি।

—সে ত' বিয়ের আগেই নিয়েছ।

কিছুক্ষণ বাজে কথাবার্ত্তার পর ভানু ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রেমেনদা কোথায় আছেন, মীরা?

—এখানেই আছেন। মাঝখানে বিলেত যাওয়ার কথা ছিল, তা আর গেলেন কই! ষ্টেট্ স্কলারসিপও 'ক্যান্‌সেল' হয়ে গেছে।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে ভানু জিজ্ঞাসা করিল, কেন রে, কি হয়েছে? ব্যবা-মা বুঝি একটি মাত্র ছেলেকে বিলেত পাঠাতে রাজী হন নি, এ কিন্তু ভারি অন্যায়!

হতাশার সুরে মীরা জবাব দিল, ঠিক ব্যাপার বোধ হয় তা'ও নয়। শরীর না-কি খুব ভেঙে পড়েছে। এতদিন ত' কোলকাতায়ই ছিলেন ডাঃ রায়ের চিকিৎসায়। কয়েকদিন হ'ল ফিরে এসেছেন। শুনলাম হার্ট-ডিজিজ্, বোধ করি আর ভালো হবেন কি না সন্দেহ! মাঝে মাঝে বুকে খুব ব্যথা হয়, কঁকিয়ে কাঁদতে থাকেন, কাঁদতে কাঁদতে শেষে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। এ অনেকটা মেয়েদের হিষ্টিরিয়া ব্যারামের মতো। যখন-তখন ফিট্ হয়।

একমনে ভানু কথাগুলি সব শুনিতেছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এখন কেমন আছেন?

—সেই একরকমই। কয়েকদিন যেতে পারি নি, তাই খবর নেওয়া হয় নি। আজ বিকেলে একবার যাব ভেবেছি।

—আমিও কাল একবার যাবো ভেবেছি, প্রেমেনদাকে দেখে আসব।

—যেয়ো।

একটুখানি ভাবিয়া ভানু পুনরায় কহিল, আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি?

মীরা সহজভাবে জবাব দিল, কই, না—জিজ্ঞাসা করেন নি ত'!

আমার কথা ব'লো, আমি কাল একবার যাবো তাঁকে দেখতে।

—আচ্ছা মনে থাকে তো বলবো!

ধরা-গলায় ভানু পুনরায় কহিল, ব'লো কিন্তু,

ভুলোনা যেন!—বলিয়াই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, প্রেমেনদা আজকাল আর কবিতা লিখেন না?

—কবিতা লিখেন কি না, ঠিক জানি না। কই! আজকাল কথা বলেন খুব কম। ব্যারামে ভুগে ভুগে তিনি কেমন জানি আন্‌মনা হয়ে গেছেন। প্রায়ই থাকেন একা, ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেন তাঁর শরীরে কি আর কিছু আছে?

করুণ চোখে চাহিয়া ভানু কহিল, কেন এমন হলো তাঁর। মীরা, তুমি কিছু জানো? বলো না ভাই?

—না ভাই, আমি কিচ্ছু জানি না। জানলে আর না বলবার কি কারণ আছে বলো ত'?

—ডাঃ রায়ও কিছু করতে পারলেন না?

—না;—এ-রকমই ত' শুনে এলাম।

কয়েকদিন রাত্রিতে ভানু ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই। চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিলে সব সময়ই ঘুম আসে না, এ-কথা খুব সত্য। ছাদের আনাচে-কানাচে সকলের অলক্ষ্যে বসিয়া সে গুমরিয়া কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চোখ মুখ হঠাৎ ফুলিয়া যায়।

অনেকের চোখেই একদিন সে সহজেই ধরা পড়িয়া গেল। জননী ভাবিলেন, হয়ত তপনের জন্য·····

তিন চারি দিন কাটিয়া গেল এমনি ভাবে। আর একদিন সে নানান্ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সোফারকে লইয়া মীরাদের ওখানে গেল, তাহার বুক ধড়্‌ফড়্ করিতেছিল। মীরা কাছে আসিতেই ভানু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, প্রেমেনদা কেমন আছেন?

ম্লানমুখে মীরা জবাব দিল, ভালো না। একটু থামিয়া কহিল, যাবে না কি সেখানে?

—চল, আমায় যেতে বল সেখানে?

—কেন, কী হয়েছে,···মীরা আরো জানি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। তাহার চোখ মুখ সহসা নত হইয়া আসিল।

ভানু আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, চলো মীরা, আমি যাবো, আমি প্রেমেনদাকে দেখতে যাবো, শুধু একবার····· বলিয়াই করুণ ও ব্যথা-ভরা দৃষ্টিতে মীরার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মীরা কুণ্ঠার সহিত কহিল, তা বেশ তো চলো না!

পরে ঘরের ভিতর ফিরিয়া যাইবার সময় শুধু কহিয়া গেল, তুমি একটু দাঁড়াও না ভাই, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আসি।

ভানুর চোখ ততক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

প্রেমেনের রোগ যে কি ডাক্তারী-শাস্ত্রে নির্ণয় হইল না। সে বসিয়া বসিয়া শুধু কাঁদে। কেন কাঁদে, তাহার কোন কারণ জানা নাই। আহার-নিদ্রা একরকম ত্যাগই করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কেহ কেহ বলেন ক্ষয়রোগ। অসম্ভব নয়!

ভানু ও মীরা ঘরে পৌঁছিতেই প্রেমেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। কোন পরিচিতের সন্ধান পাইলে মানুষ যেমন উল্লসিত হইয়া ওঠে, প্রেমেনের অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়াছিল।

প্রেমেনের বর্ণ মলিন, চক্ষু কোটরগত, জীর্ণ-শীর্ণ দেহখানি বিছানায় যেন মিশাইয়া গিয়াছে। একটি বসন্তের মুকুল অকালে বুঝি ঝরিয়া যায়। ভানু যেন কিছু হয় নাই, ঠিক এই ভাবে তাহার বিছানার পাশে গিয়া বসিল। একটুখানি মৌন থাকিয়া ভানু জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন প্রেমেনদা?

প্রেমেন শুধু উত্তর করিল, তুমি আমায় দেখতে এসেছ, ভানু?

ভানুর মানসিক অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। কোন মতে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার কপোলে মুখে কেশে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

প্রেমেনের দুই গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল।

মীরা শুধু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ভানু অনেকক্ষণ বসিয়াছিল, প্রেমেন ধীরে ধীরে তাহার শুভ্র হাতখানি তাহার নিজের হাতের মুঠার ভিতর নিয়া কহিল, ভানু আমায় ক্ষমা ক'রো, যদি কোনদিন কিছু বলে থাকি···

ভানু খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখে বসনের আঁচল চাপা দিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পরেই প্রেমেন ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

* * * *

সারারাত্রি মীরা একটুও চোখ বোজে নাই। এপাশ-ওপাশ করিয়া রাত কাটাইয়াছে। সারারাত তার মনে সেই ছবি বারে বারে দেখা দিয়াছে। রূপগঞ্জে আসিয়া সেই কথা তার প্রাণটাকে তোল-পাড় করিয়া দিতেছিল।

অবনীনাথ শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি হয়েছে মীরা?

—কই, কিছু ত' হয় নি।

ভোরের গাঙে হাওয়া না উঠিতেই মাঝিরা কখন নৌকা ছাড়িয়া দিল। রূপগঞ্জের বিশাল প্রাসাদগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মীরার চোখ দু'টি শুধু জলে ভিজিয়া উঠিল।

সাহিত্যে নিজস্ব ও পরস্ব

শ্রীজগৎমোহন সেন, বি-এস্-সি, বি-এড্

এমন একদিন ছিল যখন মানুষের অধিকারের সীমা ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সে জানত নিজেকে এবং নিজের গোষ্ঠীকে। এর বাইরে তার আপনার ব'লে কিছু ছিল না। এই বংশ-সর্ব্বস্ব স্বার্থের জন্য মানুষ এক সময়ে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করেছে অনেক। তারপর যখন সে সমাজ সৃষ্টি করল, তখন তার অধিকারের পরিধিও বেড়ে গেল। হয়ত সমাজ-সৃষ্টির মূলে ছিল এই অধিকার-বিস্তৃতির বাসনা। কিন্তু মানুষের জীবনের ইতিহাসে সে যুগও গেছে, তার পরে বৃহত্তর এবং পূর্ণতর স্বার্থের প্রতীক স্বদেশপ্রীতির যুগ এসেছিল, সেও আজ যাবার মুখে। সে অনেক কথা।

আজ মানুষের স্বার্থ-বোধ স্বদেশের মাঝে আর তৃপ্তি পায় না, সে চায় সমগ্র বিশ্বকে নিজের ব'লে আলিঙ্গন করতে। আজ মানুষ বুঝতে চায় "বিশ্ব তার নিজের ঘর।" এ যুগ বিশ্ব-মানবতার,—সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের। সকলে না বুঝুক, যুগনায়কেরা বুঝেছেন যে, মানুষের পক্ষে স্বদেশের গণ্ডি পর্য্যাপ্ত নয়। সমস্ত পৃথিবী তাকে চায়, নির্ব্বিচারেই চায় হয়ত। প্রকৃতির সৃষ্টি-রহস্যের একটি গোপনতম ভাণ্ডারের চাবি মানুষ পেয়েছে, তাই আজ বিশ্ববাসী সকলেরই সেখানে নিমন্ত্রণ; একজনকেও বাদ দেওয়া চলে না, বাদ দিলে ভাণ্ডারের সঞ্চিত রত্ন মানুষের সম্পূর্ণ উপভোগ্য হবে না।

বিশ্ববাসী সকলের প্রাণে এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে বিশ্বমাতার বক্ষসুধার আশায় মানুষ অভিযান করবে। যাঁরা অগ্রণী তাঁরা চান আর সকলকে গড়ে তুলতে, তাই বিদ্যালয়েও civics পড়িয়ে world-citizens গড়ে তোলবার চেষ্টায় তাঁরা ব্যাপৃত। প্রত্যেক মানুষকে তাঁরা এই উপলব্ধি দিতে চান যে সে বিশ্ব-পরিবারেরই একজন। তার যা কিছু স্বাতন্ত্র্য তাকে যেন সে সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধ বাদ দিয়ে বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। পৃথিবীতে তার

একটা বিশিষ্ট সত্তা আছে, তার অভাব অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না, তাই সমস্ত পৃথিবী তার বৈশিষ্ট্যের দানের আশায় হাত পেতে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ভিক্ষা তাকে দিতে হবে না, সে যা দেবে তার পরিবর্ত্তে পাবে পৃথিবীর যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল। এই বিরাট যজ্ঞে তাই বিশ্ববাসী সকল নরদেবতার নিমন্ত্রণ, যজ্ঞভাগ থেকে কেউ বঞ্চিত হবেন না।

প্রকৃতির সর্জ্জন-লীলার একটি পরম রহস্য আবিষ্কার করে আজ যাঁরা এই যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা একথাও উপলব্ধি করেছেন যে, বিশ্ববাসী প্রত্যেকের প্রাণে এই ভ্রাতৃত্ব-বোধ জাগিয়ে তোলা কত দুষ্কর। মানুষ তার সঙ্কীর্ণতার অন্ধকূপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সহজে রাজী হয় না। তার আজন্মপোষিত সংস্কারের মোহ তাকে এমনই প্রবলভাবে আকর্ষণ করে যে, বাইরের মুক্ত বায়ু তার ভাল লাগলেও তাকে সে পরিহার করেই চলে। এক জায়গা থেকে টেনে বার করলেও সে পরমুহূর্ত্তে অন্য বিবরে আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আমরা আমাদের কথাই একটু ভেবে দেখি।

এই বিশ্বমানব-সভার সভ্যরূপে পরিগণিত হ'বার বাসনা আজ আমাদের অনেকের মধ্যেই পাওয়া যাবে হয়ত। কিন্তু সত্যকার চেষ্টা আমাদের নেই বললে অত্যুক্তি হ'বে না। যা কিছু আমরা করতে চাই সে কেবল সাহিত্যের দিক দিয়ে, তাও কথা-সাহিত্য। সাহিত্যের অপরাপর অঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। কথাগুলি সম্ভবতঃ কটু, কিন্তু না বলেও উপায় নেই যে, সাহিত্যে নূতন কিছু করবার চেষ্টা এসেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে। তার আগে রবীন্দ্রনাথের মূল্য বুঝতে আমরা চাই নি। এখন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার জন্য যতই আস্ফালন করি না কেন, এ কথা আমরা বুঝেছি যে, কাব্যের দিকে বাংলাতে নূতন কিছু করবার মত লোক এখনও আসেন নি। সম্ভবতঃ সেই জন্যই কথা-সাহিত্যের দিকে আমরা ঝুঁকেছি। তা ছাড়া গল্প লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ বলেই অনেকের ধারণা, তাই দর যাই হোক না কেন, আমাদের সাহিত্যে গল্পের বই সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। তার উপর শরৎচন্দ্রও নোবেল প্রাইজ পান নি, তাঁর দাম পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সে কষাও হয় নি।

এ কথা শতবার স্বীকার করা উচিত যে, আগের চেয়ে চোখ আমাদের একটু বেশী খুলেছে, কেউ ডাকলে সাড়া দেওয়ার মত অবস্থায় আমরা আছি, কিন্তু সেই সঙ্গে এও মেনে নেওয়া ভাল যে, ঝিমুচ্ছি আমরা এখনও। স্বপ্নালু ভাবপ্রবণতার খ্যাতি আমাদের চিরকালের, ঘরের পরিধির ভিতর চোখ খুলে তাকাতে আমরা জানি না; পরপারের দিকেই বরাবর দৃষ্টি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতীন্দ্রিয় ভবসাগরের ওপারের খবর রাখতেন, সে সব এখন আমাদের মনে তেমন লাগে না; আমরা আরব-সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝিমুতে থাকি আলোর বাণী পাবার আশায়।

ঐ বিশ্বজনীনতার কথা দিয়েই দেখা যাক্ না কেন। কথাটা এদেশের পক্ষে নূতন নয়ই, অনেক দিনের পুরানো। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" আমরা স্কুল থেকে মুখস্ত করেছি, কিন্তু হৃদয় দিয়ে কখনও গ্রহণ করি নি। অবশ্য এমন যুগ আমাদের গেছে যখন "ঘর ছিল বাহির, বাহির ছিল ঘর", তারপর যখন বিদেশী patriotism-এর মোহ আমাদের পেয়ে বসল তখন "বসুধৈব কুটুম্বকম্"-কে পক্ষী বিশেষের বক্‌বকম্ বলে হয়ত উপেক্ষাই করেছি। ইংলিশ চ্যানেল এখনও আমাদের কাছে একটু বেশী চওড়াই ঠেকে। এখন এসেছে ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে গ্রীসের citizenship তার বহু সংস্কৃত মূর্ত্তি নিয়ে; আমাদের আর কিছু না হোক্, সাহিত্যের খিড়কীর দরজা তার প্রবেশের জন্য আমরা ফাঁক করে দিয়েছি। যদি গ্রীস থেকে না এসে সে হনলুলু কি জেকোস্লোভাকিয়া থেকে আসত, তবে তাকেও

শাঁখ বাজিয়ে বরণ করতাম। আমাদের বিশ্বজনীনতার ধারণা অনেকটা এই রকমই।

বিশ্বজনীনতা মনের যতখানি মুক্তি দাবী করে, ততটা মুক্তি আমরা মনকে দিতে পারি নি এখনও। সংস্কারের চশমা খুলে ফেললেই চোখে অন্ধকার দেখি, তাড়াতাড়ি অন্য একটী চোখে লাগাতে পথ পাই না। তবে এমন হ'তে পারে যে, আমাদের ঝোঁক goggles-এর দিকে, যে চশমা পণ্ডিত মহাশয়রা নাকের ডগায় চাপিয়ে বই পড়েন আবার মাঝে মাঝে চোখ তুলে ছাত্রদের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সে চশমা আমাদের পছন্দ নয়। সংস্কারই বলি আর গোঁড়ামীই বলি, কোনো না কোনো রকমে আমাদের সেটা চাই। এক ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে বিরক্ত হয়ে যাঁরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, দেখা যায় যে, নবধর্ম্মের গোঁড়ামিগুলিও তাঁদের অনেকের মধ্যেই শিকড় গেড়েছে। "বামে শব-শিবা-কুত্তাঃ"-কে যাঁরা কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করেন তাঁরাই হয়ত ঘোড়ার খুর বা সাদা বেড়ালের মোহ কাটাতে পারেন না। শুধু আমরা কেন হয়ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তাই। কিন্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে বলছি, নিজের সঙ্গে এই বঞ্চনা চলে বেশীর ভাগ আমাদের মত জাতির মধ্যে যাদের কপালে দাসত্বের তিলক উল্কির মত কেঁটে বসেছে। দাসত্ববোধ যতই মজ্জাগত হয়েছে ততই আমরা স্বাধীন চিন্তার শক্তি হারিয়ে সংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়েছি। ইংরেজের কাছে আমাদের প্রধান পরাজয় চিন্তানীতির মধ্যে, চিন্তার বাণিজ্যের মধ্যে, পলাশীর যুদ্ধে নয়। 'নিমে দত্তর' কথা যে এমন ভাবে ফলে যাবে সে কথা কে জানত?

এই সংস্কারই আজ আমাদের হাত দিয়ে আমাদের মাতৃভাষার জাতি নাশ করাচ্ছে। বিশ্ব-সাহিত্য-সৃষ্টির মোহে আমরা ভুলে গিয়েছি বিশ্ব-সাহিত্য আমাদের কাছে কি চায়,—আমাদের নিজস্ব সম্পদ কি? বিশ্ব-সাহিত্য যেন রেলগাড়ীর ইউরোপীয়ান থার্ড ক্লাস, কিংবা পুরীর বি, এন, আর হোটেল। ধুতি চাদরের সেখানে প্রবেশ নিষেধ, ডাল-ভাতও চলবে না, হুঁকো-তামাক-বিড়িও চলবে না; চলবে খালি কোট-পেণ্টালুন, চা-বিস্কুট, আর সিগারেট, কি বড় জোর, বর্ম্মা-চুরুট। অন্ততঃ আমাদের অনেকের ধারণা তাই।

আমাদের অবস্থা আজ এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আমরা বাংলা ভাষায় চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছি। আমরা হয়ত ভাবি ইংরেজীতে, তারপর তর্জ্জমা করে বাংলায় বক্তব্য প্রকাশ করি। ইংরাজী যে বাংলার চেয়ে আমাদের কাছে সহজ মনে হয়, এ-কথা অনেকেই স্বীকার করবেন। তাই প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে বাংলার বিশিষ্ট সুর বজায় থাকে না অনেক ক্ষেত্রেই। তাই আমরা এ-দিক দিয়ে মৌলিক কোনো কিছু দিতে পারি নি, যা দিয়েছি তা রোমন্থিত পুরানো জিনিষ। সে জিনিষ হয় বাংলার, না হয় অন্য দেশের। তবে এতে যে আমাদের কিছু লাভ হয় নি এমন কথা বলা চলে না, কিন্তু লাভের তুলনায় লোকসানের মাত্রা কতখানি সেটা সুধীজনের বিচার্য্য।

বিষয়-বস্তুর দিকেও তাই। সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ কতখানি, সে-কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। তাই বাংলা গল্পে জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা চলেছি নরনারীর সনাতন সম্বন্ধ নিয়ে, তাও বিদেশী ধরণে। এর মূলে আছে বিশ্বসাহিত্য সভায় ডায়াস্-এর উপর যাঁরা বসে আছেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা। অন্য কথা বললে তাঁরা বুঝবেন না, অন্য ভাবে বললেও বুঝবেন না, সম্ভবতঃ এমন ভয় আমাদের আছে।

ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে গেলে, এ-সব যে সাহিত্যিকের কতখানি সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির পরিচয়, সেটা সম্ভবতঃ আমরা বুঝি না। সাহিত্যিক এই চেষ্টা করতে গিয়ে হারানও অনেকখানি। সংযমের মধ্যে যে মহাকাব্য লুকিয়ে আছে, সেটা তাঁর চোখে পড়ে না। ইউরোপিয়ান থার্ডক্লাসে নিরিবিলিতে বসে সকলের ঈর্ষা উৎপাদন করবার আগ্রহ তাঁর এমনিই প্রবল। বাংলা অক্ষরে বিদেশী ভাষা লিখে, কিংবা বাঙালীকে বিদেশী পোষাকে সাজিয়ে খিঁচুড়ী তৈরী করার কৃতিত্ব কতটুকু? Grotesque-সৃষ্টির মধ্যে একটা শিল্প-বিদ্যার পরিচয় আছে, কিন্তু এই জাতীয় সৃষ্টিকে grotesque-এর কোঠায় ফেলা চলে কি?

সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান এবং অভিব্যক্তির মধ্যেই শিল্প এবং শিল্পীর যথার্থ গৌরব। শিল্প দেশ কাল পাত্রের সঙ্কীর্ণ পরিধির সম্পত্তি নয়, সে সমস্ত পৃথিবীর সকল অধিবাসীর সর্ব্বকালের উপভোগ্যের বস্তু। আজ সাহিত্যের জন্য এর চেয়ে বড় আদর্শের কল্পনা আমরা করতে পারি না। কিন্তু আমাদের সাহিত্য যে পথে চলেছে সে পথ আমাদের কতখানি আদর্শের দিকে নিয়ে যাবে সেটাও সেই সঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত।

সাহিত্যের দিক দিয়ে আমাদের দেশ এ-পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীকে যা কিছু দিয়েছে তার মধ্যে কি কি তার যথার্থ দান, আর কি কি নয়, সে-কথা বিচার করতে হলে সব রকম সংস্কার থেকে মুক্ত হ'য়েই করা উচিত। ফরাসী ধরণের হাসি-কাশির অবকাশে কোনোটাকে "বাহবা বেড়ে", কোনোটাকে বা "rubbish" বলে রায় দিলে চলবে না।

বাংলা সাহিত্যের ঋদ্ধির জন্য বিশ্ব-সাহিত্য থেকে প্রয়োজনীয় যা কিছু আমরা আহরণ করব, তার জন্যে যে আমাদের দাম দেওয়া উচিত, এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। ভুভিক্ষগ্রস্তের মত ভিক্ষাপাত্র হাতে যেন আমরা বাজারে না বেরোই। আমাদের দান করতে বিশ্বসাহিত্যের আপত্তি না থাকতে পারে, তাই বলে দীনতার লজ্জা যেন আমাদের পেতে না হয়। বিশ্বের দরবারে ভিক্ষুকের স্থান নেই, সেটা চাঁদা-করা বারোয়ারী সভা। সেখানে দাম দেওয়া চাই, আর এই দাম পাওয়া যাবে পাঞ্জাবীর পকেটে কিংবা ধুতির ট্যাঁকে; কোট-পাৎলুনের পকেটে পাউণ্ড বা সেণ্ট্ বা ডলার যাই থাক না কেন, তাতে আমাদের অধিকার নেই, তা পরস্ব।

শ্রাবণ-নিশীথে

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

শ্রাবণ-গগন বেদনায় ভর ভর,
আঁখি-নীর তার ঝরিতেছে ঝর ঝর,
পরাণ আমার কাঁপিতেছে থর থর,
ঘুম নাহি আঁখি-পাতে।

যেন সে কাহার বিরহ-বেদনা-বাণী
আমার দুয়ারে কাঁদিয়া বহিয়া আনি'
কী কথা আমারে জানাতে চাহে, কি জানি
নীরব-নিশীথ-রাতে॥

হৃদয় আমার ছুটিয়াছে কোন্ পুরে
ব্যাকুল-ব্যথায়, না জানি কতোই দূরে,
বক্ষ ভরিয়া ধ্বনিছে বিষম-সুরে
রুদ্ধ-আবেগ-রাশি।

এই ব্যথা আজি হানিছে আমার মনে—
এই রজনীর ঘন-দেয়া-গরজনে
— সেই বুঝি মোরে মাগিতেছে ক্ষণে-ক্ষণে
আমি যারে ভালবাসি॥

বন্দিনী কোথা কোন্-সে পথের ধারে
কাঁদিছে কোথায় গোপন-অন্ধকারে,
ঊর্ম্মি-মুখর কোন্ সাগরের পারে
ব্যাকুল-রোদন বাজে!

রোদনে তাহার পাষাণের বুক ফাটি'
বাহিরিয়া আসে শ্যামল-কোমল-মাটি;
পরাণে আমার বাঁধিছে বেদনা আঁটি'
করুণ-মর্ম্ম-মাঝে॥

আজিকে তাহার বিরহ-ব্যথার মেঘে
স্তব্ধ-দুখের ক্ষুব্ধ-বাতাস লেগে
নয়নের কোণে বিরাম-বিহীন-বেগে
অশ্রু-বরষা ঝরে।

নাইকো অধরে মধুর-অরুণ-রেখা,
আছে ক্ষণে ক্ষণে প্রখর-বিজুলী-লেখা,
আনন্দ-ভানু যায় না তো ওরে দেখা!
কেমনে রহিবো ঘরে॥

শরৎ হইয়া হিরণ-কিরণে ভেসে
তাহারে খুঁজিয়া ফিরিবো সকল দেশে,
ফাল্গুন হ'য়ে সাজাবো ফুলের বেশে
ব্যথিত-অঙ্গখানি।

জ্যোৎস্না-ধারায় নাশিয়া বিষাদ-ছায়া
আনন তাহার রচিবো মোহন-মায়া,
হেরিয়া তাহার রূপে অপরূপ কায়া
জাগিবে আমার বাণী॥

মধু-সমীরণে জুড়াবো দহন-জ্বালা,
পরাবো কণ্ঠে নব-চম্পক-মালা,
আমার পরশে বিরহ-বিধুরা-বালা
হাসিবে শোভন-হাসি।

সে-হাসি করিবে আকুল সকল দিশি,
উতলা হইবে আমার দিবস-নিশি;
আমার বাণীতে তাহার হাসিতে মিশি'
বাজিবে মিলন-বাঁশী॥

ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ

শ্রীসচী শীল, বি-এ

ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ জ্ঞানের যুগের বিশিষ্ট অঙ্গ। এই বিশ্লেষণের স্পৃহা সভ্য মানুষ মাত্রেরই মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি যখন মানুষকে সভ্যতার উত্তর পথে চালিয়ে নিয়ে যায়, তখন মানুষকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ধর্ম্মের বিশ্লেষণ করতে হয়। তবে সেটাকে ধর্ম্মের 'পরে বুদ্ধির প্রভুত্ব বল্লে ভুল করা হবে; প্রকৃতপক্ষে মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম্মের মর্ম্মকে আপন ক'রে নেয় মাত্র। ধর্ম্মের নিত্যতা বজায় রাখতে গেলে, তাকে প্রতিদিনই বিশ্লেষণ ক'রে তার রসাস্বাদ করতে হয় এবং তার মধ্য দিয়েই ধর্ম্মের শাশ্বতরূপ উজ্জ্বল হয়ে ফোটে মানুষের চোখের সামনে। পরীক্ষাই ত' সব কিছুর জীবন-কাল নিরূপণ করে। পৃথিবীতে যার পরীক্ষা হল না, তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। মানুষ হয়ত তাকে দেখেও অবহেলায় এড়িয়ে চলে গেল। মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগই নেই। তাই উপেক্ষার সীমারেখার মধ্যে সে হয়ে গেল বিলীন। যার সঙ্গে মানুষের জীবনের নিত্যযোগ, মানুষ তাকে নিজের করবার জন্য যাচিয়ে দেখবে না? তার ফলে ধর্ম্মের মধ্যে যদি কোন চিরন্তন সত্যের সন্ধান মেলে ত' তাতে মানুষের বিশ্লেষণ স্পৃহা হবে সার্থক, আর ধর্ম্মের হবে গৌরববৃদ্ধি।

আধ্যাত্মিক তথ্যগুলিকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার আগ্রহ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। সেই পরীক্ষার গভীরতার অনুপাতে সভ্যতার পরিণতি

সুন্দর হবে। Scepticism মানুষের মধ্যে যখন জাগে তখনই বুঝতে হবে সে চাইচে religious doctrine-গুলির মধ্যে সত্যের সন্ধান। Dogmatism ত' মানুষের সভ্যতার অপরিণত অবস্থার নিদর্শন। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা Dogmatism-এর মধ্য দিয়ে নয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে অতি সহজে স্বীকার ক'রে নেওয়া মানে তাদের গভীরতাকে অবমাননা করা। তাতে ধর্ম্মের সত্যিকার প্রতিষ্ঠা কেবল পেছিয়ে পড়ে। ঈশ্বরবাদকে মনের সামনে সাজিয়ে রেখে যদি কেবল তার অন্ধ পূজাই মানুষ ক'রে আসে, তবে ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ আর তার মেলে না। অন্ধ বিশ্বাসের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ প্রতীককে ঈশ্বর ঠাউরে মানুষ তার পায়ে দেয় পূজার ফুল; ফুলের সোহাগ ঐ কল্পনার প্রতীকের সীমানার মধ্যেই অন্ধ আগ্রহে ফিরতে থাকে; নেপথ্যে থেকে ঈশ্বর শুধু নীরবে হাসেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক যুগের সন্ধান মেলে, যেখানে ধর্ম্মের কর্ত্তারা মানুষের ধর্ম্মবিশ্লেষণের আগ্রহকে দাবিয়ে রেখেছেন নিজেদের আধ্যাত্মিক কর্ত্তৃত্ব দিয়ে। ভগবান কি এতই অসার জিনিষ, যে তাঁকে এই কর্ত্তৃত্বের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে না রাখলে তাঁর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে? ভগবানের অস্তিত্বকে কোন রকমে খাড়া ক'রে রাখবার যে প্রচেষ্টা আমরা আজও ধর্ম্মের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে দেখতে পাই, সেটা কেবল সেই বিশ্বমানবের মহাশক্তিকে অবমাননা ক'রেছে। ভগবানের শক্তির আধার কেবল তাঁরাই; ভগবানের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতকে ব্যাখ্যা করবার ভার তাঁদের ওপর—এই দাবীই তাঁরা ক'রে আসছেন। আর যখনই তাঁদের কর্ত্তৃত্ব অত্যাচারের আকারে ফুটে বেড়িয়েছে, তখন জন-সমাজকে বাধ্য হয়ে কলের পুতুলের মত মূর্ত্তি-পূজা করতে হয়েছে, নিজের মনের ও বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে। এতে ধর্ম্মের বাহিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ প্রভূত ক'রেছে সমাজের পরে। ফলে, ধর্ম্মের সঙ্গে নৈতিকতার যোগ গেছে ছিঁড়ে, পূজার সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ গেছে লুপ্ত হয়ে। মানবতাকে উপেক্ষা ক'রে ধর্ম্মের তথাকথিত রক্ষাকর্ত্তারা স্বার্থপুষ্টির জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চালিয়েছেন অমানুষিক অত্যাচার এবং ঈশ্বর গিয়ে লজ্জায় আশ্রয় নিয়েছেন জগতের বাইরে—শুধু রেখে গেছেন একটা জলন্ত অভিশাপ।

অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্ত্তিতা মানুষের ধর্ম্মবোধ, বুদ্ধি ও বিকাশলাভের শক্তিকে পঙ্গু করে মাত্র। স্বাধীনভাবে ধর্ম্মবিশ্লেষণের কুফল যাই হোক না কেন, অপর কারও কর্ত্তৃত্বের অধীন হয়ে মূর্খের মত অনেক কিছু মিথ্যাকে মেনে নেওয়ার কুফল বা অসার নির্জ্জীব ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষময় পরিণতির তুলনায় সেটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জন-সমাজের ধর্ম্মবোধের ওপর কর্ত্তৃত্ব বা তার বিশ্বাসকে একটা নির্দ্দিষ্ট কিছুর মধ্যে আবদ্ধ করবার প্রয়াস শুধু এনেছে একটা বিরাট অভিশপ্ত ব্যর্থতা। ধর্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কোন মানুষই নির্ভুল বা perfect হওয়ার দাবী করতে পারে না। ধর্ম্মের conception এক যুগে যা ছিল, পরের যুগে তার কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। মানব জাতির শিক্ষা যুগে যুগে ক্রমবিকাশ লাভ ক'রে পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি লর্ড টেনিসন ঠিক এই সত্যেরই মর্ম্ম উদ্ঘাটিত ক'রেছেন এই কয়টি কথায়—

"Yet I doubt not through the ages one
increasing purpose runs
And the thoughts of men are widened
with the process of the suns."

অতীত থেকে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যৎ—এই বিরাট কালস্রোতের মধ্য দিয়ে বিকাশের একটি অখণ্ড সুর পরিপুষ্টি লাভ করছে এবং এই ক্রমবিকাশের মাঝখানে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ একটু একটু ক'রে জেগে উঠছে। মানুষ তাকে লাভ করবে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসা দিয়ে, হৃদয়ের আগ্রহ দিয়ে, অ-জানার অস্তিত্বকে বিনা চেষ্টায় স্বীকার ক'রে নিয়ে নয়।

তাই যুগে যুগে Spiritual Evolution-এর পরিচয় আমরা পেয়ে আসছি এবং বিভিন্ন উন্নতিশীল যুগে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হচ্চে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আজ পর্য্যন্ত অসংখ্য আধ্যাত্মিক গবেষণার পর মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব গবেষণার ফলে ধর্ম্মের মূলসত্যগুলি কি মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে? মানুষ ধর্ম্মকে পূর্ণতরভাবে উপলব্ধি ক'রেছে, না ধর্ম্মের 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে? ধর্ম্মবিশ্লেষণের যৌক্তিকতার কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই সব প্রশ্নগুলি নিগূঢ় ভাবে আলোচনা করতে হবে। অবশ্য এত বড় বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এই শতাব্দীতেই শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয়েছিল সারা ইউরোপে; অনেক নবযুগ-প্রবর্ত্তনকারী গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছিল এই শিক্ষার ফলে। এই শতাব্দীর জ্ঞানোন্মেষ বিজ্ঞানের নব নব সৃষ্টির মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান এবং এই প্রশ্ন আজ আমাদের মধ্যে স্বতঃই জাগবে যে, এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা লীন হয়ে এসেছে? অবশ্যই নয়। ইতিহাস খুললেই দেখতে পাব, আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে অবিশ্বাস একমাত্রাও বাড়ে নি। বরং এ-কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, ফরাসী বিপ্লবের যুগের চেয়ে এই যুগে অবিশ্বাসের প্রাবল্য অনেক কমে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা যদি ধরা যায়, তবে তখনকার আবহাওয়ার সঙ্গে এখনকার আবহাওয়ার কোন মিলই প্রায় নেই। তখনকার জগতের মানুষ ধর্ম্মের নাম শুনলে হাসত, ধর্ম্মকে উপেক্ষা করতে পারলে তারা করত গৌরব অনুভব, ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনাকে তারা বিদ্রূপের তীব্র হাসি দিয়ে দিত উড়িয়ে। খৃষ্ট ধর্ম্ম তখন খৃষ্টজগতে উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। এখনকার অবস্থা ত' আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কই, ধর্ম্মের ওপর অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস এখন ত' পূর্ব্বের মত নেই! অনেক সময়ে হয়ত শুনতে পাওয়া যায় যে, নাস্তিকদের সংখ্যা এখনও বিশেষ কম নয়। কিন্তু নীতিকে জীবনের অবলম্বন না ক'রেও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে না—এমন অনেক মানুষেরই সন্ধান মেলে। নাস্তিকদের সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক কমে এসেছে।

এ-যুগে অবশ্য অনেক অজ্ঞেয়তাবাদী দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভুল করি আমরা এদের নাস্তিকের পর্য্যায়ে ফেলে। নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়তাবাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান রয়েছে। সাধারণতঃ মনীষীরাই অজ্ঞেয়তাবাদী। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিশ্লেষণ মানুষের সহজ বিশ্বাসের অনিত্যতাকে হৃদয়ঙ্গম করায়। প্রকৃত যিনি জ্ঞানী, তিনি শুধু এইটুকু জানেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব এত গভীর ও এত সূক্ষ্ম যে, একমাত্র বিস্ময় দিয়েই তাকে মাপা চলতে পারে, মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দিয়ে নয়। পরলোকের বা পরকালের তত্ত্ব অজ্ঞেয় এবং অতি রহস্যময়—শুধু এই কথাই মনীষিগণ তাঁদের বুদ্ধির সাহায্যে বুঝে নিয়েছেন। বস্তুতঃ মানুষ নিজের মনের ও বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা অনুভব ক'রে যদি স্বীকার করে যে, ঈশ্বর তার কাছে একটা বিরাট প্রহেলিকা, তবে সেইটাই ঈশ্বরের অনন্তরূপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন। ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিয়ে মানুষ যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সৃষ্টি করেছে, তার ওপর অজ্ঞেয়তাবাদীর বিশ্বাস নেই। অনন্তরূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁদের পূর্ণমাত্রায় আছে। ঈশ্বর অজ্ঞেয় ব'লে তাঁকে জীবনের বাইরে রেখে তাঁরা ত' কোনদিন চলেন নি! এ-যুগের মহামনীষীমাত্রেই এ-কথা বলেন যে, পুণ্য ও সত্যের পূজা যেখানে সেখানে ঈশ্বরের অনন্তরূপের পুণ্যস্পর্শ রয়েছে; পুণ্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের মাঝে নেমে আসবেন। বিখ্যাত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল ঈশ্বরকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ব'লে মেনে নিলেও, এটুকু তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ সত্য ও পুণ্যকে আশ্রয় ক'রে জীবন-পথে

নিরাপদে চলতে পারে। একটা Supreme Moral Force যে বিশ্বের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে—এ-বিশ্বাস জ্ঞানীমাত্রেরই আছে। অ-পরিণত বয়সে বুদ্ধির প্রথম উচ্ছ্বাসে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রেছিলেন, তাঁদের সেই সন্দেহ পরিণত বয়সে ভক্তি হয়ে ফুটেছে—এমনও অনেক দেখা গেছে। কাজেই, জ্ঞানের আলো পেয়ে জ্ঞানীরা যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন—এ-কথা বলা একেবারেই অসঙ্গত।

তারপর ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা। বাইবেলই বলুন, আর রামায়ণ, মহাভারত, গীতাই বলুন, এগুলি ত' প্রায় সবই allegory ব'লে অনেকে ধ'রে নিয়েছেন। allegory যে একেবারেই নয়, এ-কথাও জোর ক'রে বলা যেতে পারে না। তবে গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি allegory-র আকারে দেখা দিয়েছে ব'লে ঐ-সব ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছে, এ-কথাও বলা চলে না। বাইবেলের parable-গুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা। বাইবেলের গল্পগুলি সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার কোন দরকারই নেই, কিন্তু তাই ব'লে যে বাইবেলের প্রতি ভক্তি থাকবে না, তারও কোন মানে নেই। এই প্রসঙ্গে Coleridge-এর কথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'Divines of the most unimpeachable orthodoxy and most averse to the allegorising of Scripture history in general, have held without blame the allegoric explanation." কল্পনা-প্রসূত ঘটনারাজির সমাবেশে বাইবেলের সৃষ্টি হলেও খৃষ্টজগতের হৃদয়স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই বাইবেলেরই গভীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম ক'রে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে জ্ঞানবীর ও কবি Heinrich Heine ব'লেছিলেন—

"What a book! Vast and wide as the world, rooted in the abysses of 'creation, and towering up beyond the blue secrets of heaven! Sunrise and sunset, promise and fulfilment, birth and death, the whole drama of humanity are all in this book! Its eclipse would be the return of chaos; its extinction the epitaph of history."

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা হিন্দুদের ধর্ম্মজগতে এক বিরাট ঐশ্বর্য্যসম্ভার। অনেকেই হয়ত এই ধর্ম্মকাব্যগুলিকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও তাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি। বাইবেলের মত এদের সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে যে, এদের অন্তর্গত সব কিছুই সত্য ঘটনা ব'লে মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই। এরা allegory হলেও এদের অন্তর্নিহিত সত্য উপেক্ষার জিনিষ নয়। যুগ যুগ ধ'রে এরা হিন্দুজাতির জীবনে কল্পনাতীত প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে। সর্ব্বগ্রাসী মহাকালের মধ্য দিয়েও এদের গৌরব ম্লান হয় নি। এখনও সীতার কাহিনী শুনলে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম তলে সাড়া পড়ে; লক্ষ্মণের আদর্শ ভ্রাতৃস্নেহ আজও ভায়েদের মধ্যে মিলনের প্রেরণা জাগাচ্ছে। মহাভারত সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। গীতার সম্বন্ধেও বলতে পারি, এর পেছনে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেরণা না থাকলে এত মহান্ গ্রন্থের সৃষ্টি সম্ভব হত না। স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী এর ছত্রে-ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিশ্লেষণ করছে বটে, কিন্তু সেই বিশ্লেষণের অনুপাতে সে শাস্ত্রের গভীর সত্যকে নিবিড়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার স্বাধীনতা সভ্যতার অঙ্গবিশেষ। সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক পরিণতির সামঞ্জস্য থাকতেই হবে। সভ্যতার যুগে মানুষ শুধু বলছে এই যে, ধর্ম্মের সঙ্গে যখন জীবনের অচ্ছেদ্য যোগ, ধর্ম্মের পথেই যখন জীবনের উন্নতি, তখন ধর্ম্মতত্ত্বগুলিকে অন্ধের মত মেনে না নিয়ে, সেগুলিকে বিশেষ ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবার অধিকার তার আছে।

বন্ধন ও মুক্তি

শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ, বি-এল্

সাহিত্যিক হইবার দুরাশা রমেনের আজন্ম-পোষিত বাসনা। এম্-এ পরীক্ষা দিয়া যখন অবসর-ঘন দিনগুলি চলিতে চায় না, তখন রমেন সংকল্প করিল, সে দেশ-মাতৃকার পরিচয় লইবে। বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য রঘুয়া, কবিতার খাতা অনামিকা, আর কোডাক্ ক্যামেরা। রাজপুর গ্রাম, পদ্মার চরে, সেখানে আসিয়া বাসা বাঁধিল। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে আম্রের মুকুলোদ্গত শাখে কোকিলের কুহরব ওঠে, রমেন কবিতা লেখে —

হে আমার! হে চির-অপরিচিতা!
বসন্তে শরতে নিত্য যুগে যুগে রচিলাম, তোমারি
বন্দনা-গীতা
অয়ি অনিন্দিতা!

ফাল্গুনের মধুর দ্বিপ্রহরে দক্ষিণ-পবন মেদুর অপরাহ্ণে গড়াইয়া পড়ে। কাল-বৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব রাজে—ঝড়ের দোলায় কবির চোখে ধূলি আসিয়া পড়ে। কিন্তু ধূলির সাথে-সাথে আসিল তরুণী ইরা। রূপ-লাবণ্যে অনুপমা ভাস্বর-দ্যুতি শুকতারার মত দীপ্তিময়ী; বিস্ময়ের চমক এবং বার্ত্তা তার চোখে মুখে ঝলসিয়া ওঠে।

অপরিচিতা তরুণীর সহিত আলাপ পরিচয় সে জীবনে করে নাই—কাব্য-পড়া সমস্ত সম্বোধনগুলি তার কণ্ঠে বাধিয়া যায়। লজ্জা সঙ্কোচ এড়াইয়া বাধ-বাধ ভাবে সে বলিল "বসুন"।

প্রথম আলাপের জড়তা কাটিল। কালবৈশাখীর নর্ত্তন চলে—উন্মাদ আলোড়ন! রুদ্রের ক্রোধ-বহ্নি যেন আজ প্রজ্জ্বলিত! রমেনের তৃণ-গৃহ আশঙ্কায় আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে!

"কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"ও আমি!" অন্যমনস্ক তরুণী বাহিরের ঝড়ের দোলা দেখিতেছিল—মন তার শঙ্কা-কাতর।

"আমি পদ্মা দেখতে বেরিয়েছিলুম—কলকাতা সহরের দেওয়াল-ঘেরা ঘরে মন আটকে ওঠে—দেখতে বেরিয়েছিলুম — বাংলা-মায়ের সৌন্দর্য্য! ছায়াশীতল নদীতীরে তাঁর শ্যামল আঁচলের মায়া—" ঝড়ের ঝট্‌কা কথা থামাইয়া দেয়—

ছোট একখানি ঘর—সমুখে ছোট বারান্দা, পাশে রান্নার জন্য একটী চালা—রুদ্রের আক্রোশ থামিল, কিন্তু ছোট ঘরখানিকে ভাঙ্গিয়া। রমেন ও ইরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঝঞ্ঝার তাণ্ডব-শেষে আকাশে মেঘের লীলা চলে—নীচে রমেন ও ইরা। রঘুয়া ভগ্ন গৃহটিতে জিনিষ-পত্র বাহির করিতে গিয়াছে—পাশে পদ্মার বিস্তৃত চর।

ইরা বলিল "এখন কি করবেন? চলুন আমার নৌকোয় কলকাতায় যাবেন।"

অপরিচিতার আহ্বান! সঙ্কোচ ও ইচ্ছার দ্বন্দ্ব চলে—ইচ্ছাই জয়লাভ করে।

রমেন জিজ্ঞাসা করে—'আপনি ত খুব সাহসী একা-একা বেরিয়ে পড়েছেন;

ইরা বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসিতে মুগ্ধ করিয়া বলে "ঘরের আড়ালকে আমি মানিনে।"

রঘুয়া জিনিষ-পত্র আনিয়া বজ্‌রা ভরে। রমেন ইরার সহিত কলিকাতায় চলিল। পিছনে আকর্ষণ ছিল যত, সম্মুখ তার চেয়ে অনেক আনন্দের প্রলোভন দেখায়, রমেন তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিল না—রমেনের অবস্থায় বোধ হয় কেহই পারে না।

পদ্মা বাহিয়া নৌকা চলে।

নানা দেশ, নানা ছবি। রমেন ও ইরা কৌতুক-মুগ্ধ হৃদয়ে বজ্‌রার ছাদে বসিয়া দেখে, হাসে ও গল্প করে।

অপরিচয়ের আড়ষ্ট-ভাব কাটিয়াছে।

রমেন বলিল "কলকাতায় আপনার বাসা কোথায়?

ইরা ভাসমান বৃক্ষ'পরে উপবিষ্টমান গাং-শালিকের খেলা দেখিতেছিল, ফিরিয়া বলিল "তার প্রয়োজন কি? পথের পরিচয় পথেই শেষ হবে, তার চেয়ে হৃদ্যতার দাবি আমার নেই।"

রমেন বিস্ময় অনুভব করে!

শিক্ষিতা তরুণী, কিন্তু তার মাঝে এ কি রহস্য-জাল! ইরা আপনাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়, একি বিনয়—না আর কিছু!

রমেন ভাবিয়া পায় না—বসিয়া বসিয়া ভাবে, আর মাঝে মাঝে অনল-দ্যুতি-ভরা ইরার লাবণ্য-ললিত-মুখে অপাঙ্গে চাহিয়া লয়। মকর-কেতনের পুষ্পশর অলক্ষ্যে ঝরিয়া পড়ে, কেহই তাহা লক্ষ্য করে না।

রমেন হৃদয়ের আকুতি জানাইতে চাহে—

বলে "ইরা, পড়া শেষ হলে তুমি কি করবে?"

"জানি না, হয় মাষ্টারি করব, না হয় নার্শ হব।

"না না, সে কেন করবে—তুমি যার ঘরে যাবে, সে ঘর আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে হাস্যে, গানে, দীপ্তিতে মেধায়…

"কিন্তু ঘর-গড়াই ত সকলের কাম্য নয়—"

"এসব তোমার মনের কথা নয়! যতই বল আদিম যুগ থেকে মানুষ ঘরই বেঁধেছে, ঘর না বাঁধলে আজকের এই চমৎকার বিশ্ব-সভ্যতা, কোথায় ভেসে যেত কে জানে?

"বিশ্বের ভাবনা ভাবতে পারি এত বড় মনীষা আমার নেই"—

রমেন তর্ক করে না, নীরব হইয়া নদীর শোভা দেখে।

ইরা বোঝে, রমেনের রাগ হইয়াছে। হাসিতে হাসিতে বলে "রাগ করলেন?"

"না কার ওপরে রাগ করব?

"ওঃ তাই বলুন, রাগ করবার লোক চাই আপনার—

রমেন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে—আপনার দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া লজ্জা হয় কিন্তু হাসি লজ্জাকে ছাপাইয়া ওঠে।

"এই জন্যেই ত ঘর বাঁধতে চাইনে, আপনারা ত' আমাদের আসল মূল্য দিতে চান না?

"তার মানে?"

"অস্পষ্টতা কিছু নেই এর মধ্যে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন পাশা খেলায়, তার কারণ, তাঁর ধারণায় দ্রৌপদী তাঁর সামগ্রী। কথাটা রূঢ় শোনাচ্ছে, অত্যুক্তি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মোটেই নয়, এটা একেবারে নিছক সত্যি কথা।"

ইরা যখন আগ্রহে বক্তৃতা করে, তখন তাহাকে মানায় ভাল। রমেন তন্ময়ের মত সেই রূপ-সুধা পান করে। ইরার কথা থামিলে বিভ্রান্ত ভাবে বলে "এ আমি মানিনে—"

"মানেন না মুখে, মনে মনে বেশ মানেন, পত্নীকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য না পেলে কিছুতেই মন শান্ত হয় না"

"এসব তোমার বই-পড়া কথা, জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার নেই। আমাদের দেশে নরনারীর মাঝে যে সুমধুর দাম্পত্যপ্রেম তার তুলনা নেই।"

"এ বক্তৃতা আপনার মুখেই সাজে, কারণ আপনি বিয়ে করেন নি—"

রমেন অপ্রতিভ হয়ে যায়—তবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলে, "বিয়ে করি নি বটে, কিন্তু যারা করেছে তাদের ত দেখেছি।

"যা দেখেছেন, প্রাণহীন জড়ের স্বস্তি, সে একটা আবেগহীন মরণের মত শান্তি—

"তার মানে?"

"কারণ আমাদের দেশে প্রেম জীবন্ত নয়, নারীকে মানুষ জয় করে নেয় না—তাই যে ভালবাসা গড়ে ওঠে, সে শুধু নৈকট্যের আকর্ষণ—সে প্রেম সবল নয়, জীবন্ত নয়।

রমেন চুপ করিয়া ভাবে, একি কোনও ইঙ্গিত? এই বিদ্যুৎ-জ্বালাময়ী নারী যে প্রেম নিবেদন চাহে, সে কি তাহা দিতে পারিতেছে না? কাব্যের সঙ্গে

জীবনের এতটুক সঙ্গতি নাই—বই-পড়া বুলি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

সে ধীর সংযত-কণ্ঠে বলিল, "তা হয়ত সত্য, আমাদের দেশের বিবাহ-পদ্ধতি হয়ত তার জন্য দায়ী, কিন্তু সে বিবাহ কল্যাণে গড়া, তা শত-শতাব্দীর ভারতীয়-শীলতার জলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

"সে প্রেম মানুষকে বড় করে তোলে নি—মানুষকে গৃহের ক্ষুদ্র আয়তনে ক্ষুদ্র করেই রেখেছে—"

সেদিন কথা আর অধিক চলিল না—রঘুয়া আসিয়া আহারের বার্ত্তা জানাইল। ক্ষুধার আহ্বান তর্ককে জয় করিল না, কারণ তার্কিকের একজন নারী। ইরা বলিল, "যাক্ এখন খেতে চলুন"।

ভাগিরথীর কূলে ছায়া-শ্যামল একটি গ্রামের হাটে মাঝিরা রাত্রির জন্য নৌকা বাঁধিয়াছিল।

অনুকূল স্রোতের বিলম্ব আছে বলিয়া রমেন গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। পথে বন্যফুলের তোড়া গাঁথিয়া ফিরিতেছিল, শুনিল নৌকায় গান চলিয়াছে। মনে করিল—ইরা গাহিতেছে। অগ্রসর হইতে বুঝিল বৈরাগীরা খঞ্জনী বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে।

ভক্ত ও ভাবুক চিত্তে রাধাকৃষ্ণের গানের মহিমা অনন্ত, সে গানের ফোয়ারা তাই অফুরন্ত চলে। বৈরাগী গাহিতেছিল,

"সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয়,
ভাল হ'লে ভালই ভাল নইলে ল্যাঠা হয়।
সামান্যে কি এ-জগতে পারে কি কেউ প্রেম যজিতে
প্রেমী নাম পাড়ায়ে মিছে, হুকুল হারায়।
এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার,
প্রাপ্তি হয় সে ভাব অনুসার,
ভাব জেনে ভাব না দিলে তার, প্রেমে কি কূল পায়।
গোপী যেমন প্রেম আচারী যাতে রাধা বংশীধারী
লালন বলে সে প্রেমেরি ধন্য জগৎময়।

তন্ময় হইয়া রমেন গান শুনিতেছিল। ফিরিতেই ইরা বলিল, "গান শুনলেন?" "শুনেছি, প্রেম-সাধনা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-সাধনা, অথচ আপনি বলছিলেন আমাদের দেশে প্রেম নেই"।

ইরা তাহার আয়ত কৃষ্ণ দীপ্ত চক্ষু মেলিয়া রমেনের মুখের দিকে চাহিল, পরে চিত্তবিভ্রমকর কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "কিন্তু এ-প্রেম আপনার সমাজে অচল, রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম গাঁট-ছড়ার মাঝে হয় নি"।

"তা ঠিক, এই প্রেমকে আমরা আধ্যাত্মিক চোখে দেখি।"

"আপনাদের আধ্যাত্মিকতা রাখুন, কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন সাহসী, দুর্দ্দম, তাই তিনি রাধার চিত্ত জয় করেছিলেন। সত্যকার প্রেম এমনই প্রাণবন্ত, সে হৃদয়কে জয় করে। তরুণ বীরধর্ম্মী নারীকে সে জয় করে চলে।

তর্কস্থলে রঘুয়া আসিল, মৌন মিনতিপূর্ণ ভঙ্গীতে কহিল, 'হুজুর'—

ইরা বলিল, "আপনার খাওয়া হয় নি, চলুন চা করে দিই।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া রমেন বলিল, "কলকাতায় আজ সন্ধ্যায় বোধ হয় পৌষব, কিন্তু একটা কথা—

রমেন কথা শেষ করিল না, মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া ইরার নিকট উৎসাহের সাড়া পাইবার উদ্দেশ্যে করুণ-দৃষ্টিতে ইরার মুখের পানে চাহিল।

ইরা বলিল, "বলুন।"

'হয়ত অন্যায় হচ্ছে, স্বল্প পরিচয়ের সুযোগকে আমি হয়ত—আমি হয়ত—রমেনের মুখে কথা বাধিয়া যায়।

ইরা হাসিতে আরম্ভ করে। চপল, লঘু, স্বচ্ছন্দ হাসি—অনাবিল হাস্যের ফুলঝুরি ঝরিয়া চারিদিকে যেন জীবন্ত করিয়া তোলে। হাসি থামিলে বলে, "গৌরের দেশে এসেছেন বলে, বুঝি, গৌরচন্দ্রিকায় জোর দিচ্ছেন খুব—"

"তা নয়! তা নয়! তবে?"

"তবে কি?"

"আপনি যদি অসঙ্গত মনে করেন, যদি ভাবেন ঔদ্ধত্য, তাই ভয় হয়—"

"না, না, আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে বলুন, ভয় করব না শুনতে, আর শুনে রাগও করব না।"

"আমি হয়ত আপনার যোগ্য নই, কিন্তু এ কয়দিনে আপনাকে যেমন নিবিড়ভাবে চিনবার সুযোগ হয়েছে, এমন আর কারও সঙ্গে হয় নি।"

"কাজেই আমি আপনার গৃহে যাই এই কথা ত?"

রমেন কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পায় না। ইরা প্রগল্‌ভা, তাহার সঙ্গে সে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, একেবারে চুপ হইয়া যায়।

ভাগিরথীর জলে কল্লোল চলে—তরঙ্গের লক্ষ নর্ত্তন। দু'টি তরুণ ও তরুণীর হৃদয়েরও ভাবের তরঙ্গ চলে!

ইরা খানিক পরে বলে, "চা-টা শেষ করে ফেলুন, রাগ করে ওকে পরিত্যাগ করলে লাভ কিছুই নেই।"

রমেন বলে, "আমি হয়ত তেমন ক'রে কথা বলতে পারিনে কিন্তু এ কথা আমার আন্তরিক জানবেন যে, আমি আপনাকে ভালবেসেছি।"

"কিন্তু ভালবাসা আমাদের দেশে চলে না জানেন?" রমেন অবাক্ হইয়া বিস্ময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহে। কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। ইরা বলে, "অবাক্ হচ্ছেন কেন? আমি ত খুব সোজা কথাই বলছি।"

"কেন চলবে না?"

"আমাদের দেশের বিয়েতে হৃদয়ের কোনও স্থান নেই—এ-দেশের বিয়ে প্রেমহীন, প্রাণহীন···"

"না, না এ অন্যায় বলছেন, এ সত্য নয়।"

"সত্য, কিন্তু তাকে আপনি জানেন না, আমার পরিচয় জানেন না, আমার কুলজী জানেন না, আমাকে আপনি ভালবেসে ফেল্লেন কি করে?

রমেন এত কথা ভাবে নাই। কবির মত যে সংসার জ্ঞানহীন, সংসারকে সে শুধু ভাবের চোখে দেখিয়াছে, বস্তু-জগতের ও রস-জগতের কোথায় যে সীমারেখা তাহার সন্ধান কোন দিনই করে নাই।

এই অপরিচিতা তরুণীর চঞ্চল চারু কথার সাবলীল ভঙ্গী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার দীপ্ত রূপশিখা তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে কিন্তু হৃদয়ের সাথে বুদ্ধির যোগ নাই, তাই দিনে দিনে সাহচর্য্যে যে প্রীতি জাগিয়াছে, তাহাকে সে যাচাই করিয়া লইবার ভাবনাই ভাবে নাই।

ইরার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে বলিল, শকুন্তলার কথাই আমার মনে জাগছে, দুষ্মন্তের মত আমার মন বলছে তুমি আমার—একান্তই আমার"···

"থাক্, হয়েছে পাগলামি করবেন না—" এই বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে ইরা চলিয়া গেল। রমেন হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

ইরা একটি রহস্য। মরুদেশের মরীচিকার মত সে নয়ন ধাঁধায়, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না।

সেদিন সারাদিন আর ইরা রমেনকে দেখা দিল না। আপনার কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া বই নিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বজরা ঘাটে ভিড়িল, ইরা বাহির হইয়া রমেনকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন?"

রমেন চাহিয়া চাহিয়া কলিকাতার জনতা ও কোলাহল দেখিতেছিল, ফিরিয়া বলিল, "অপরাধ আপনার নয়, অপরাধ ত আমিই করেছি।"

"তর্ক করে লাভ নেই, আপনার হৃদয় কোমল, আপনি ব্যথা পেয়েছেন!"

"সংসারে থাকলে মাঝে মাঝে ব্যথা লাগে, তার জন্যে দুর্ভাবনা করে লাভ নেই।"

রঘুয়া আসিয়া জানাইল, ট্যাক্সি ঠিক করিয়াছে, রমেন বলিল, "আপনার জিনিষপত্র আগে উঠিয়ে দিন···"

"সেজন্য ভাবতে হবে না, আমার ঝি পাকা লোক, ও সব ঠিক করে নেবে।"

রমেন রঘুয়াকে বলিল, "যা, সব জিনিষ-পত্র তোলা হলে আসবি।"

ইরা বলিল, "এতদিন ধরে মেয়েরা ভেবেছে, নীড় বেঁধে শাবক পালন করাই তার চরম সার্থকতা কিন্তু একথা আমরা মানতে চাই নে, আমরা পরখ করে দেখতে চাই, জীবনকে আর নানা বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে—

"আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক্।"

ইরা হাসিতে হাসিতে বলে, "তবু অভিমান?"

"অভিমান করব কেন?"

"কারণ এতদিন ধরে অভিমান করে এসেছেন, নারীকে চেয়ে এসেছেন দাসীরূপে—তাই তার অবাধ্যতা কিছুতেই আপনাদের ধাতে সয় না।"

বুদ্ধিমতী ইরার বাক্যবাণ তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার মত হৃদয়কে বেঁধে, রমেন বলে, "কিন্তু নারীকে যে পূজা সে দিয়েছে—"

"সে অন্ধ স্তাবকতা, বশীকরণের মন্ত্র। সে সত্য নয়—"

"থাক্, আমার বোকামিকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনার বাসার ঠিকানাটা"—

"না—তার প্রয়োজন কি, আমাদের পরিচয় পথে হয়েছিল—পথেই তার সমাপ্তি হোক্—আমরা তার জের টেনে নিতে চাইনে—"

"কিন্তু কোন আশাই কি করব না ইরা?"

চলিতে চলিতে ইরা উত্তর দিল, "যাকে ভাল লাগে, তাকে সব সময়ে সংসারে পাওয়া যায় না—তাই তার আশা সব সময়ে না করাই ভাল—"

রমেন উষ্ণ হইয়া বলিল, "আমি তত্ত্ব-কথা শুনতে চাই নি—"

ইরা রমেনের কাতর বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহে, পরে ধীরে ধীরে বলে, "আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে—আপনার বন্ধুত্ব পেয়েছি, ওইটাই আমার খুব দামী পাওয়া, কিন্তু প্রতিদিনের মাঝে তাকে হারাতে আমি চাই নি—"

"তোমার কথা যে শুধু হেঁয়ালি হয়েই দাঁড়ায়।"

"হয়, তার কারণ আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে চাই নি।"

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ট্যাক্সির কাছে আসিয়া পৌঁছিল, রমেন ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "নমস্কার, কিন্তু ঠিকানাটা দিন।"

ইরা রমেনকে বলিল —বালীগঞ্জে, কিন্তু আমার খোঁজ করবেন না, আপনি জীবনে সুখী হ'ন, নমস্কার"। ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

ফিরিতেই মা বলিলেন "ভালই হল, তোকে চিঠি দেব ভাবছিলাম, শ্যামপুরের গোঁসাইরা এখন খুব জরুরী তাড়া দিচ্ছে—" রমেনের মুখে উৎসাহের জ্যোতি খেলে না। পরিণয়ের পুলকোচ্ছাস তাহাকে আপ্লুত করে না।

মাতা পুত্রকে লজ্জা-কাতর মনে করিয়া বলিয়া যান "গোঁসাইদের ঘরে কাজ করবার ওঁর খুবই ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তখন ওরা রাজি হয় নি—এবার যখন লক্ষ্মী সেধে আসছে—"

রমেন বলিল "এখন দুদিন সবুর করনা মা—এত তাড়াতাড়ি—"

"তাড়াতাড়ি কই রে—তোর বয়সী সবার ছেলে-পুলে হয়ে গেল, আর তোর এখনও বিয়েই হল না—

"না মা, আমার মন ভাল নেই—পরে না হয় হবে"

পড়ার ঘরে গিয়া কবিতার খাতা তুলিতেই দেখিল একখানি ফটো, বুঝিল শ্যামপুরের লক্ষ্মী। বোধ হয় পাশের বাড়ীর বৌদি কৌতুকের জন্য রাখিয়াছেন—

ফটোর নীচে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—এণাক্ষি। ষোড়শী তরুণীর লাবণ্যমাখা মুখচ্ছবি। এণা সত্যই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা!

কিন্তু ছবি—ছবি! আর ইরা প্রাণময়ী! রমেনের সারা প্রাণে ইরার ছবি গাঁথিয়া গিয়াছে।

দু' তিন দিন পরে রমেন বালিগঞ্জে গেল ইরার দেওয়া ঠিকানা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—সে বাসা মিলিল না। ভুল হইয়াছে মনে করিয়া অলিগলি খুঁজিল। পোষ্ট আফিসের পিয়নকে বলিল "এখানে ইরা দেবী কোথায় থাকেন জানেন?"

পিয়ন ভদ্র, ভদ্রভাবেই উত্তর দিল "আজ্ঞে না বাবু, আমার এখানে ও-নামে কেউ আছেন বলে জানিনে—"

রমেন নিরাশ হইয়া ফেরে। রাগ হয়—ইরা তাহাকে এমন কৌতুক করিল কেন? রমেনের প্রীতি কি এতই হেয়, এতই তুচ্ছ!

রমেন রাগ করিল, সংকল্প করিল ইরার নাম মুখে আনিবে না, কিন্তু কাজে তাহা করিতে পারে না। শয়নে-স্বপনে ইরা তাহার মানস-নয়নে ভাসিতে থাকে।

ভালবাসা সে এমন সুকঠোর সত্য-ভাবে কোন দিনই অনুভব করে নাই। প্রেমের কবিতা লিখিয়াছে কিন্তু সে ভাবের বাষ্প। আজ এল প্লাবন; সে প্লাবন সমস্ত হৃদয় ভাসাইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ঠিকানা ভুলিয়াছে মনে করিয়া রমেন প্রত্যহ বালিগঞ্জে যায়—ইরার বাড়ী মনে করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পথচারিণী ইরার বয়সী তরুণীদের ইরা বলিয়া ভ্রম করে, কিন্তু ইরার দেখা মেলে না।

সেদিন ফিরিবার পথে বন্ধু বরেনের সহিত দেখা—সে বলিল "চল্ না থিয়েটার দেখবি—রূপরেখায় নূতন একটা বই নেমেছে—আর তার নায়িকার ছবিতে নেমেছে একটী ভদ্রঘরের মেয়ে"—

রমেন বলিল "না ভাই তুই যা"—

বরেন বলিল "ওরে কূপমণ্ডুক! থিয়েটারে গেলে তোর কোনই ক্ষতি হবে না, বরং ইরা দেবীর অভিনয় দেখলে বুঝবি বাংলার রঙ্গ জগৎ কতদূর এগিয়েছে—"

"কি নাম বললি ভাই?"

"কেন—ইরা?"

রমেনের অন্তরে বিদ্যুৎ-চমক খেলিয়া গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই ভাবের তরঙ্গ বহিয়া চলে।

বরেন বলিল "কিরে এ যে দেখছি রাধার ভাব—না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো"···

রমেন আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "তা নয়, তবে ঐ নামের একটী মেয়েকে আমি জানি"···

'তা হলে তোর যাওয়াই দরকার—পরিচিতার সঙ্গে এই অপরিচিতার তুলনা করে নিতে পারবি।'

বরেনের হাত এড়াইতে না পারিয়া রমেন থিয়েটারে গেল।

থিয়েটারে অভিনয় রমেন কখন দেখে নাই!

সেদিন যথেষ্ট ভিড়। পুস্তকখানি চমকপ্রদ আর সর্ব্বোপরি ইরা দেবীর নাম দর্শকদের জনতা জমাইয়াছে।

রমেনের মন চঞ্চল হইয়া প্রতীক্ষায় রহে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নায়িকাবেশে ইরার আবির্ভাব।

নায়িকা স্বামীকে বলছে—"আমায় ছেড়ে দাও আমি মুক্তি চাই।"

রমেনের মন কথোপকথনের মধ্যে রহিল না—সে ইরার পানে চাহিয়া রহিল। চঞ্চলা, রূপময়ী—দীপ্তিময়ী ইরার অভিনয় বিপুল জনসঙ্ঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

একবার যবনিকা পড়িলে বরেন রমেনকে আইসক্রিম খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল "ভদ্র মেয়েরা থিয়েটারে এলে থিয়েটারের অভিনয় নৈপুণ্য বাড়ে, কিন্তু আসাই মুস্কিল, তবে —রঙ্গজগতে চরিত্র রাখাই দায়, শুনছি এই মেয়েটি জীবেশ সান্যালের রক্ষিতা—কিন্তু দেখলি ত ভাই অভিনয় করল কেমন চমৎকার, বাংলা থিয়েটারে এমন সজীবতা, এমন তন্ময়তা দেখিনি"।

রমেনের হৃদয়ে কে যেন শেলাঘাত করিল। ইরা শেষে রক্ষিতা—হায়! হায়! দুঃখে ও বেদনায় তাহার

সমস্ত অন্তর মথিত হইয়া গেল। য়ুরোপীয় ভাবের স্বরা দেশকে কি এমন করিয়া ছন্নছাড়া করিবে?

বরেন বলিল "কথা বলছিস নে যে?"

"ভাবছি, মেয়েটির দুর্ভাগ্য—আধুনিকতার প্রায়শ্চিত্ত কে করছে—"

"তা সত্যি—ও যখন আসে তখন কাগজে কাগজে কি হৈ চৈ—শিক্ষিতা, সভ্যা, তরুণী কিন্তু হলে কি হয়—এ বড় কঠিন ঠাঁই—যবনিকা উঠিল, অভিনয় চলিল।

কি যে অভিনয় হইতেছিল রমেন তাহা দেখিল না—তাহার সমস্ত অন্তর ইরার শোচনীয় অধঃপতনে দুঃখে ও অভিমানে জলিতে লাগিল।

ইরা রূপসী—ইরার মনীষা অদ্ভুত, ইরার বচনপটুতা অনুপম, ইরা সমাজের অলঙ্কার হইত, সেই ইরা আজ পঙ্কের কর্দ্দম, মলিন—রমেনের কান্না পাইতে লাগিল।

করতালি-ধ্বনির মধ্যে অভিনয় তাঙ্গিল। রমেন অজ্ঞাতে করিয়া পিছনে রহিয়া গেল। ইরার সহিত সে আলাপ করিবে—ইরার সঙ্গে শেষ দেখা না করিয়া তাহার মন কিছুতেই তৃপ্ত নহে।

থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া সে বলিল "ইরার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার চশমা খুলিয়া রমেনের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন, পরে বলিলেন "ইরা দেবীর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"আমার নাম করলেই দেখা করবেন।"

"না না মশায় যান, এখানে কাপ্তেনি করবার জায়গা নয়!"

ক্ষোভে ও বেদনায় চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। থিয়েটারের লোক যে সমাজে মেশে, যে ভাবে চলে, তাহাদের নিকট ভদ্র ও মধুর সৌজন্য আশা করাই অন্যায়, সে মনে করিল ফিরিয়া যায়।

কিন্তু মন ফিরিতেই চায় না, নীচে আসিয়া সে দরোয়ানকে একটি টাকা ঘুষ দিয়া বলিল, "ইরাদেবীর গাড়ীটা আমার দেখিয়ে দিবি।"

দরোয়ান খুসী হইয়া গেল, ভয়ে ভয়ে বলিল, যে ইরা অন্যান্য অভিনেত্রীর মত নহে, তাহার প্রতি প্রেম কৌতুক করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে।

ইরা যখন মটরে উঠিবে, রমেন আসিয়া ডাকিল "ইরা।"

"কে রমেন বাবু, আসুন আসুন—তারপর এখানে?"

"এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এসেছিলাম, কিন্তু না এলে হয়ত ভাল হ'ত।"

"ইরা মটরের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল "ভিতরে বসুন, যেতে যেতে আপনার কথা শুনব।"

রমেন উঠিল, মটর বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। ইরা বলিল, "তারপর কি বলছিলেন?"

"তুমি এমন করে আত্মহত্যা করলে কেন?

"আত্মহত্যা কিসের? অভিনয়ের জগৎ তুচ্ছ নয়, মানুষের মনের উপর এর অসামান্য প্রভাব···"

"কিন্তু তুমি কেন এলে?"

"তার মানে তুমি দাসীপণা না করে কেন এলে, এইত? সে কথা ত সেদিন বলেছি, সংসারে ফুটে ওঠাই সার্থকতা, আমার মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে তা দিয়ে আমি বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা নূতন-সৃষ্টি গড়ে তুলতে পারব, এর কি কোনই মূল্য নেই!"

"ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি! পরকালের পথ ঝরঝরে হবে, পরকালের ভাবনা ছেড়ে দিন, কর্ম্মের জগতে একটা নূতন অবদান দিলেই জীবন সার্থক হয়ে যাবে"

রমেন বলিল "আমায় ক্ষমা করুন—কিন্তু জীবেশ সান্যাল?"

ইরা বলিল "আসল কথা বলুন, আপনার শিকার হাতছাড়া হয়েছে তাই রাগ হয়েছে?"

ইরা দমিল না, শ্লেষ ও কৌতুকের বাণ তার অফুরন্ত।

"কি চুপ করলেন যে?

"চুপ করব কেন কিন্তু এত বড় অধঃপতন আশা করতে পারিনি।"

"জীবেশ সান্যাল বাংলার অদ্বিতীয় নট তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে?"

"বিয়ে হয়েছে?

"আপনারা যাকে বিয়ে বলেন এ তা নয়, যতদিন খুসি ততদিন এ বিয়ের মেয়াদ, তবু এটা বিয়ে…"

রমেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল সে কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল "আমায় নামিয়ে দিন—"

"কেন আমার সঙ্গ আপনার অতিষ্ট হয়ে উঠছে, বলুন বাসায় দিয়ে আসি"

"না না, এই মোড়েই নামিয়ে দিন, আপনার সঙ্গে আমি বাসায় যেতে পারব না।"

ইরা নামাইয়া দিয়া বলিল, "রমেন বাবু! কিন্তু যে ভালবাসা জানিয়েছিলেন, এইত তার পরিচয়?"

"না না, ভুলে যাবেন, কোন দিন কোন সময় আপনাকে ভাল বাসিনি, সে মোহ—সে মিথ্যা—"

ইরা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল "পুরাতন সংস্কারের ভূত আপনার মাথায় চেপে আছে তাই নূতনকে তার মর্য্যাদা দিতে পারেন না, নূতনের সজীবতা ও মুক্ত প্রাণ আপনাদের ভয়ে দমে যাবে না—যাক্, নমস্কার।"

ইরা চলিয়া গেল! রমেন হতভম্বের মত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিল বাসায় ফিরিয়া সে মাকে বলিল "মা বিয়ের ঠিক করে ফেলো।"

রমেনের মাতা অবাক বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমেন বলিল, "উপহাস নয় মা, যত তাড়াতাড়ি হয় হোক্ আমার কোনই আপত্তি নেই।"

মরমিয়া

শ্রীসুভো ঠাকুর

সে কোন
লক্ষ-যুগের
মরমিয়া মোর তুই!
তোর, অশ্রুজলে উর্ব্বরা হোলো
মোর, পতিত্ মনের ভুঁই……

তাই আনন্দে,
বিরহ-ব্যথায়—
ভরেছে হিয়ার কূল;
কত অতীতের স্মৃতির পুলক
বিস্ময় হোলো ফুল!

থরো-থরো কত অথির আবেগ
আতুর দীর্ঘশ্বাস—
ফলের মত ফলেছে আজি,
কেহ বা সবুজ ঘাস্!

সকলেরই মাঝে ছড়িয়ে রহেছে
তোমার অশ্রুজল,
ছলো-ছলো সেই
উতলা নয়ন,
ভরিয়া হৃদয় তল।

যত ক্ষেত মোর
এই যে ফসল……
ফলেছে দেখিলে প্রিয়া—
সকলেই জেনো—পুষ্ট তোমার
করুণ কান্না নিয়া!

কঃ পন্থা?

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কে-টি

চলিয়াছি কোথায়! দেশ, সমাজ চলিয়াছে কোথায়—যাইবে কোথায়! গণের, গণ-তান্ত্রিকের এবং গণ-নায়কগণের গন্তব্য কোথা, কর্ত্তব্য কি, উদ্দেশ্যই বা কি—কেহ জানে না। দেশ-সেবা, দেশ-মাতৃকা-সেবা, সমাজ-সেবা, গণসেবা, জন-সেবা প্রভৃতি প্রচলিত 'বুলি'—Slogan বলিতে হয় ব'ল—মুখে মুখে প্রচারিত, কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত এবং লেখনীতে লেখনীতে মসী-আপ্লুত। জেরা কর, জিজ্ঞাসা কর—কেহ কিছুই জানে না। নবীন-পন্থীও জানে না, প্রবীণ-পন্থীও জানে না, মধ্য-পন্থীও জানে না—দুইদণ্ড ভাবিবার, ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিবার শক্তি-সামর্থ্যও নাই, ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিও নাই। কালস্রোতে ভাসিয়াছি, বাক্যস্রোতে ডুবিতেছি—ভাবস্রোত, চিন্তা-স্রোত, ধারণাস্রোত অন্তর্হিত।

তাই নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ভরা ভয়হৃদয় হইতে রুদ্ধ-শ্বাসে, স্বতঃনির্গত হয় পরিপ্রশ্ন—কঃ পন্থা? 'যুগ-মহাজন' কে? ধর্ম্ম, কিম্বা গুহাস্থিত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া ঘষিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া কে পথ নির্দ্দেশ

করিবে! আজকাল বুঝি-বা যুগধর্ম্মেরই বশে মহোপদেশক এবং পথনির্দ্দেশকের স্থান পাইয়াছেন—মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গন্ধী মহারাজ। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, সবিনয় নির্ভীকতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সুগন্ধে দেশ আপ্লুত। সহস্র সহস্র নরনারী, শিশু, কিশোর, পোগণ্ড, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং স্থবির সেই সুগন্ধে মুগ্ধ, দেবতা বোধে, অবতার বোধে পূজা করিতে বিচলিত হয় না। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কয় কে, কাজ করে কার সাধ্য! স্বয়ং সরকার বাহাদুর তাঁহার ঈপ্সিত হরিজন-কার্য্য সৌকার্য্যার্থে সেই মর্ম্মে প্রকাশ্য উক্তি সহকারে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন, তিনিও সরকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া সে বদান্যতার অপমান করেন নাই। রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র আপাততঃ ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য রীতি বর্জ্জন করিয়া তিনি তাঁহার মতাচরিত হরিজন সেবায় নিযুক্ত, সামাজিক অস্পৃশ্যতা নিবারণে বদ্ধ পরিকর। দেশ-বিদেশে বক্তৃতা আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন, পুরাতন-পন্থী ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থ-পর্য্যটকের ন্যায় নগ্নপ্রায়-গাত্রে পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছেন—কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মনোবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছেন এবং শ্রমিক ও ধনিকের বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন।

আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যাল কংগ্রেসওয়ালাদিগের বাদবিতণ্ডার মীমাংসা এবং বোম্বাই আমেদাবাদ অঞ্চলের কুলী-ধর্ম্মঘট মীমাংসার ভার তাঁহারই উপর। অতএব তাঁহার কাজ জটীল ও ভার গুরু। ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিদ্বেষী দলও সৃষ্টির সম্ভব। এখন দেখা যাইতেছে যে, আততায়ী শত্রুরও অভাব নাই।

বহু-জন-বরেণ্য বহু-ভক্ত-সেবিত মহাত্মা গন্ধীজীর প্রতি আততায়ীর আক্রমণ দুর্ব্বোধ্য। দেশের সমাজের এবং রাজ্যের মঙ্গল যে, তাঁহার বহুমূল্য জীবন রক্ষা পাইয়াছে, তিনি বিচলিত হইবার নহেন, স্বাভাবিক অকুতোভয়তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন।

পুণার আততায়ীর সঠিক সন্ধান এবং সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই, সময়ে পাওয়া যাইতে পারে, পাওয়া না যাইতেও পারে, যথার্থ অপরাধী ধৃত হইয়া এই শ্রেণীর অপরাধ দমনের চেষ্টা নিশ্চয়ই হইবে। মহাত্মা গন্ধী তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় এবং দ্বন্দ্ব-বিরোধী স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন যে, আততায়ীকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বোয়ার হস্তে প্রহার-জর্জ্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় মহাত্মা এই কথাই বলিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সাজে কিন্তু সমাজ-নিয়ন্তার তাহা সাজে না এবং তাহা অকর্ত্তব্য। যথাবিহিত শাসন এই মহাব্যাধির যথার্থ চিকিৎসা।

একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয় উপর্য্যুপরি চারবার আক্রমণ হইল। পুনায় বোমা—বৈদ্যনাথে ও আমেদাবাদে লাঠি এবং পুনা হইতে আমেদাবাদের পথে তাঁহার রেলগাড়ী উল্টাইয়া দিয়া মারিবার চেষ্টা। এ সকল কাজ বদ্ধ-সঙ্কল্প জটীল-বুদ্ধি এবং ব্যাপক ব্যবস্থার ফল। স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কলিকাতা আলবার্ট হলে, এই ভীষণ জিঘাংসা-বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছে, সংবাদ পত্রে তুমুল আন্দোলন হইতেছে। হইবার কথা—হওয়াই উচিত। বাঙ্গলার লাট সার জন এণ্ডারসনের উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং-এ ঘোড়দৌড়-মাঠে "রিভলভার" ছোঁড়ার বিরুদ্ধে কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভা-গৃহে তীব্র আন্দোলন হইয়াছে হইবার কথা, হওয়াই উচিত। এইরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কথা উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে যে জনসাধারণের পক্ষে সভা-সমিতিতে এরূপ আলোচনা আন্দোলনের ফল কি। যাঁহারা এইরূপ আলোচনা ও আন্দোলন করেন ও করিতেছেন তাঁহাদের কেহ এই ঘোর দুর্নীতির পক্ষ নহেন—ইহার সহিত তাঁহাদের কোনও সহানুভূতি নাই, থাকিতেও পারে না। কথা—কথা,

কথাদ্বারা এ সকল রোগের মূলোৎপাটন হয় না। সংযত অথচ কঠোরদ্বারা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাবিবার কথা, স্থির করিবার কথা এবং ব্যবস্থা করিবার কথা—কোন্ উপায়ে এই ঘোর দুর্নীতির দমন সম্ভব! বর্ত্তমান স্থায়ী গবর্ণমেণ্টের অধিকারের বিরুদ্ধে বৈপরীত্যে এখনও কেহ কোন অধিকার পান নাই অথচ অধিকার প্রার্থীগণের মধ্যে ইহারই মধ্যে এরূপ ধরণ-ধারণ রকম-সকম চাল-চলন আসিয়াছে ও আসিয়া পড়িতেছে যে, দেখিয়া জনসাধারণের মনে আতঙ্ক ও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে সে সমিতির অধিনায়কগণের মতের বিরুদ্ধে মত-প্রকাশের চেষ্টা করিলে দুঃসাহসের পরিচয় মাত্র দেওয়া হয়। অপমানিত হওয়া, পর্য্যুদস্ত হওয়া, আক্রান্ত ও প্রহৃত হওয়া, সভা হইতে তাড়িত ও নিষ্কাশিত হওয়া সাধারণ প্রচলনের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুরাট কংগ্রেসে মারহাট্টা জুতা নিক্ষেপ হইতে আরম্ভ করিয়া চেয়ার-ভাঙ্গা, লাঠি-চালান ও বাতি-লণ্ঠন ভাঙ্গা এ-শ্রেণীর সভা সমিতির কার্য্য-প্রণালীর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমশঃ ও পরিশেষে ফল বোমা ও পিস্তল। এখন সরকারী ও বে-সরকারী অধিনায়ক নির্ব্বিশেষে এই শ্রেণীর আক্রমণ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষকে পরিম্লান করিয়া রাখিলে চলিবে না। পুণার ঘটনা উপলক্ষে বহুতর ব্যক্তি আহত হইয়াছিলেন, কাহারও কাহারও আঘাত গুরুতর, অতএব ব্যাপার গুরুতর। বৃটীশ রাজেই হউক, স্বরাজেই হউক, পূর্ণ স্বরাজেই হউক, কিম্বা অবাধ উচ্ছৃঙ্খল গণতন্ত্রের অধীনেই হউক, গণতন্ত্র বিরোধী সর্ব্বাধিকার-প্রাপ্ত সর্ব্বময়-কর্ত্তার (Dictator) অধীনেই হউক, এ-ব্যাধি অপরিহার্য্য, অতএব ইহার কঠোর ও কঠিন চিকিৎসাও অপরিহার্য্য। পুণা নগরে এই ভীষণ ঘটনার দুই দিন পরে আমেদাবাদে মহাত্মা করমচাঁদ ও তাঁহার রক্ষীগণ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এবার বোমা নয় মোটা লাঠি। আহত হইয়াছিলেন অনেকে, ব্যাপার এ-ক্ষেত্রেও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।

দেশে বাদ-বিসম্বাদ, চিন্তা-প্রভেদ, দলাদলির অভাব নাই, ক্রমশঃ দলের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত আততায়ীর সংখ্যাও বাড়িতে চলিল। শাসক এবং শাসিতের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে রহিয়াছে। প্রান্ত হইতে প্রান্ত, প্রদেশ হইতে প্রদেশ, সমাজ হইতে সমাজ এবং ব্যক্তি হইতে ব্যক্তি মধ্যে, যথেষ্ট প্রভেদ ও পার্থক্য। এখন বাড়িতে চলিল সেই প্রভেদ ও পার্থক্যের বিস্তার ও আকার। সে প্রভেদ ও পার্থক্য অতিক্রম করিয়া দেশের মধ্যে সার্ব্বজনীন একতা এবং একতা-নিবন্ধন সার্ব্বজনীন মঙ্গল ও উন্নতি সুদূর পরাহত। যে অবস্থা বিপর্য্যয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সকল বিষয়ে ভারতের নানা অবনতি সাধিত হইয়াছে, সে বিপর্য্যয় ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল। ভারত-প্রেমিক যাহা ইচ্ছা করেন ও আশা করেন, তাহার প্রচলন পন্থা কোথায়, কতদূর ও কিরূপ? কে বলিবে? ইংরাজ-বিরোধী আততায়ী জানেন যে, রাজপুরুষ বিশেষের নিধনে তাঁহাদের শাসনের ক্ষুণ্ণতা বা হীনতা অসম্ভব। একের পরে আর একজন প্রাণ দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। ভারতীয় পুলিশ, সৈনিক ও রাজ-কর্ম্মচারী একের পর এক, ইংরাজ রাজপুরুষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিবেন। অতএব আততায়ীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ! আততায়ীর আশা ভরসা ও উদ্দেশ্য যে, এই সকল ভীষণ ঘটনা কেন্দ্র করিয়া দেশের প্রতি দুঃশাসন ক্রমশঃ বাড়িবে এবং উক্তব্যক্ত দেশবাসী সেই অবসরে তাঁহাদের দলভুক্ত ও পথাবলম্বী হইবেন। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। যাঁহারা এখন যে কারণেই হউক গন্ধী-বিদ্বেষী, শুধু বিদ্বেষী নন আততায়ী—তাঁহাদের মনে আশা, এইরূপ বিভীষিকা-বলে গন্ধীজী এবং তাঁহার পথাবলম্বিগণ কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইবেন। গন্ধীজী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন এবং এ অবস্থায় সরকারী বে-সরকারী কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন যে, আততায়ীর এ ধারণা ভ্রান্ত। এই সকল

বিষম ব্যাপারের একমাত্র ফল, উদ্ভ্রান্ত এবং বিদ্রুত সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আততায়ীর বিরুদ্ধে ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান ভীষণ বিদ্বেষ-বুদ্ধি। এ কথা বুঝিবার ক্ষমতা বিকৃত মস্তিষ্ক সত্ত্বেও আততায়ী নেতাদিগের মধ্যে—যথেষ্ট থাকিবার কথা। কোন কালে কোন দেশে গুপ্ত সম্প্রদায়ের এরূপ বাতুল চেষ্টায় কখন মঙ্গল সংসাধিত হয় নাই। এই দুর্ব্বোধ্য ঘটনাবলী উপলক্ষে মহাত্মাজীর অপূর্ব্ব লোকপ্রিয়তা অপূর্বতর হইয়াছে। অতএব এখানেও আততায়ীর ভ্রান্তি প্রমাণিত।

এইরূপ ভীষণ অপরাধ-চেষ্টার পর, যাহা হয় হইতেছে, ধরপাকড় চলিতেছে—খানাতল্লাস চলিতেছে, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি ইঙ্গিত চলিতেছে, গ্লানি চলিতেছে—চলিবারই কথা। শাসনদণ্ড এ বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের প্রভেদ করে না, সরকারী বে-সরকারী আক্রান্তের প্রভেদ করে না। অপরাধী, চক্রান্তকারী ও আততায়ী ধৃত হউক, শাস্তি পাক্—অপরাধ প্রবাহ বন্ধ হউক—সাধু মাত্রেরই এই ইচ্ছা, এই কথা, এই চেষ্টা! তাঁহারা সে বিষয়ে শ্বেত-কৃষ্ণাঙ্গে প্রভেদ করেন না, সরকারী বে-সরকারী আক্রান্তের প্রভেদ করেন না—কিন্তু সে কথা জানেন না অনেকে, বোঝেন না অনেকে, স্বীকার করেন না অনেকে। সম্প্রতি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভার মিটিং কলিকাতা এলবার্ট-হলের মিটিং এবং টাউন-হলের মিটিং-এ বর্ণাশ্রম ও সনাতনধর্ম্ম সমর্থকগণের সার জন এণ্ডারসন এবং মহাত্মা গন্ধীর প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মহাত্মা গন্ধীর প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জন্য এলবার্ট-হলে গত ৪ঠা জুলাই যে সাধারণ সভা হয়, তাহাতে শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উক্তিতে আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। সভা আহ্বায়কগণের মধ্যে ছিলাম আমি—সেই জন্য এই উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত মনে করি। স্থির-বুদ্ধি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থলেই তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতার সহিত, সে উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই স্তর প্রফুল্লচন্দ্রের কথায় মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ টাউন-হল-সভায় মহাত্মার প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিবাদ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছেন।

সম্যক্ প্রণিধানের অভাবেই এই ভ্রান্তি ঘটে। বিপ্লব ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা সমাজরক্ষার মূলমন্ত্র, কেন্দ্র এবং ভিত্তি—ইহা সাধারণ স্বীকার্য্য। এই বিপ্লব চেষ্টার কারণ নির্দ্দেশ ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে রাজপুরুষ এবং রাজপুরুষেতর নাগরিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে—মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু নিবারণ প্রকরণের সুষ্ঠু পথ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না। বিপ্লববাদী, সন্ত্রাসবাদী, বিভীষিকা-বাদী, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের গুপ্ত কেন্দ্র কোথায় এবং কিসে তাহা উদ্ভূত হয়, কিসে তাহার অপচেষ্টা নিবারণ হইতে পারে, সে তত্ত্বের বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা দেশে দেশে বহুদিন চলিয়াছে—তথ্য নির্ণয় হয় নাই—প্রাচ্যে ত হয়ই নাই, যে প্রতীচ্য হইতে ইহার আমদানী সেখানেও হয় নাই। বহু পূর্ব্বে ফ্রান্সে যাহা ঘটিয়াছে, কিছু পূর্ব্বে রাশিয়াতে যাহা ঘটিয়াছে এবং সম্প্রতি হিটলার-গোয়েরিং তথাকথিত "জোলাপ" ফলে জার্ম্মানীতে যাহা ঘটিতেছে, তাহার পুনরভিনয় ভারতবর্ষে যাঁহারা না চান, তাঁহাদিগকে এখন হইতে বিশেষ সাবধান, যত্নবান্ ও বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী। মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেই এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেই যদি ছিন্ন পাদুকা ও লাঠি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে বোমা-পিস্তলের পথে যখন পৌঁছিয়াছে তখন ক্রমশঃ poisoned gas-এর পথে পৌঁছিতে কতক্ষণ?

স্বাধীনতা প্রয়াসী বা ভ্রান্ত স্বাধীনতা প্রয়াসী সম্প্রদায়ের গুহানিহিত চেষ্টার গুহ্য মন্ত্রণা ও নিগূঢ় কার্য্য ব্যবস্থা সকল দেশেই সুপরিচিত কিন্তু তাহার কারণ অজ্ঞাত এবং সেই জন্য নিরাকরণ চেষ্টাও প্রায়শঃ বিফল। এ ক্ষেত্রে স্থির-মস্তিষ্ক এবং যথার্থ

সাম্যপন্থী ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌স্‌কে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অস্‌ওয়াল্ড মস্‌লী প্রমুখ গণতন্ত্র-বিদ্বেষী নব-অধিকারান্বেষী কমিউনিষ্ট-দল ইংলণ্ড স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌কে বিচলিত করিতে পারে নাই, কিন্তু আয়রল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকার তথাকথিত গুণতন্ত্রী প্রদেশসমূহ—স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইটালী, আপাততঃ বাড়াবাড়ি রকমে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস্ প্রভৃতি স্বাধীনতা পতাকাবাহী দেশ ও প্রদেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই অস্বাভাবিক গুহ্য বিপ্লবের ধারা অল্প-বিস্তর লক্ষিত হইবে—অতএব সিদ্ধান্ত অসমীচীন হইবে না যে, এই দারুণ দুষ্কর্ম্ম, শৃঙ্খলাযুক্ত সমাজের ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অস্বাভাবিক অভিযান—দেশের ও সমাজের যথার্থ স্বাধীনতা প্রয়াসীদিগের কাজ নয়। বিকৃত মস্তিষ্কের সতত আরাব উঠিতেছে—একটা কিছু কর, যাহাই কিছু কর, একটা নূতন কিছু কর। শক্তিমানের বিরুদ্ধে অশক্তিমানের বিরোধ ও সংগ্রাম সর্ব্বদা গুহ্য পন্থা অবলম্বন করে তাহা সত্য—Guerrilla warfare তাহার প্রমাণ, কিন্তু বোমা-ব্যবসায়ী গুপ্ত আততায়ীকে এই পদে উন্নীত করা যায় না, অতএব স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা এই গুহ্য পন্থার প্রণোদক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায় যে, দেশের অন্ন-সমস্যা এবং বেকার-সমস্যা এবং শাসকদলের অযথা রূঢ়তা এই পন্থার অনুকূল। শেষোক্ত কারণের বিচার ছাড়িয়া দিয়া অন্ন-সমস্যার ও বেকার-সমস্যার কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, অন্ততঃ ভারতবর্ষে এ কথা প্রযোজ্য নহে। দৈন্য দারিদ্র্য প্রপীড়িত হতমান্ ভারতবাসী আধ্যাত্মিক বিষয়ে নির্জ্জীব নহে। অহেতুক নরহত্যা কেন, প্রাণীহত্যা জনসাধারণের ঘৃণার্হ এবং ত্যাজ্য। সম্প্রতি মাদ্রাজের ইলোরে শীতলা দেবীর কৃপালাভের জন্য সহস্র বলির বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন হইয়াছে—আইন আদালতের সাহায্য চাওয়া হইয়াছে ও আরও কত কি হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবে। তবে আন্দোলন-কারীগণ বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ইহা বহু পুরাতন ধর্ম্মবিশেষ প্রদিষ্ট, অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য অর্চ্চনা মার্গ মাত্র। এক বলি বা সহস্র বলি এ বিষয়ে তারতম্য নাই। বৈদিক যুগ, বাইবেলের যুগ, কোরাণের যুগ, এবং তন্ত্রের যুগ ইহার সাক্ষ্য। কলিকাতার মত দুর্ম্মূল্য-জীবিকা সহস্রেও যাহাদের চার পাঁচ পয়সায় দিনপাত হইতে পারে, তাহার অন্ন-সমস্যা বা বেকার-সমস্যার তাড়নায় এরূপ বিভীষিকা উৎপাদনের অনুকূল নয়।

ইলোরের এই বলিদানের আমরা সমর্থক ইহা কেহ যেন মনে না করেন, তবে এই বলিদান ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রণোদিত, ইহাই আমাদের বলা উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে কিন্তু অবুঝ পুরুষ "মেয়ো"র দলের আতঙ্ক ঘটিয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কি সংবাদ রাখেন না যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, দিল্লী ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে প্রতি বৎসর কত লক্ষ সদ্যজাত মেষ ও ছাগ-শাবক নৃশংস ভাবে হত হয় ও তাহাদের চামড়া রৌদ্রে শুকাইয়া আমেরিকা ও ইউরোপে প্রেরিত হয়? এই ব্যাপারের গুরুত্ব কিরূপ তাহা কলিকাতার Director General of Commercial Intelligence-এর নিকট যে আবেদন আসিয়াছে তাহার কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাহা হইতেই উপলব্ধি হইবে—

The pelts of these animals are exported (sun-dried) to Europe and America to make a type of cheap fur * * *

In 1933 the commitee estimate * * these exports amounted to at least 30,00,000 lamb and 10,00,000 goat-skins— পাঠক-পাঠিকা-গণ ইহাতেই শিহরিয়া উঠিবেন না, আরও কিছু আছে—

"Not only are newly born animals slaugh-

tered but in a large number of cases premature birth is induced in most cruel and inhuman ways to have the lambs and kids born with more curl in the hair etc."

এইরূপ নৃশংস প্রাণিহত্যা যে কেবল এই দুর্ভাগ্য দেশেই সংঘটিত হয় তাহা নহে, আয়ারল্যাণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে—আমাদের চক্ষে অকারণে—গত কয়মাসের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ পশুবধ হইয়াছে, তাহার সংবাদ কে রাখে!

তৃতীয় কথা, শুনিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষা-বিভ্রাটে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। প্রতীচ্যের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে একথা সমর্থন করা সহজ হয় না। প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যাঁহাদের নাম দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লব-ব্যাপারে জড়িত তাঁহাদের অনেকেই উচ্চ-শিক্ষিত, যথার্থই উচ্চ-শিক্ষিত। শিক্ষা-প্রাচুর্য্যে এবং শিক্ষার ঔৎকর্ষে তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিভ্রাট দমিত হয় নাই, হয়ত অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ তাঁহাদের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে সময় সময় জড়িত হইয়া পড়েন। হিন্দুর বিপ্লববাদের মূল-সাধকেরা উচ্চ-শিক্ষায় বঞ্চিত নয়। অতএব স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটী প্রভৃতির প্রতি প্রকোপে এই সমস্যার মীমাংসা হইবে না।

স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে এবং বলা কর্ত্তব্য যে, সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার মূলমন্ত্ররূপে রাজনৈতিক বিধানের উৎকর্ষ, প্রয়োজন এবং সকল সমাজের সম্প্রদায়ের তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ও বিশেষ প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। এই সকল বিষয়ে সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তি থাকিলে বিবাদীগণের দল সংগ্রহ অসম্ভব হইবে।

কিন্তু ইহা অতি বড় কথা, বহু চেষ্টাসাপেক্ষ, সহজসাধ্য নহে। এই দারুণ সামাজিক ব্যাধির কারণ ও প্রতিকার নিরূপণ আরও দুঃসাধ্য। সাময়িক উত্তেজনার ফলে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ বা প্রদেশকে গ্লানিযুক্ত করিলে ইহার নিরাকরণ হইবে না। লম্ব্রোজো, এলিস্ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নিদারুণ সমাজ কলঙ্ক অপরাধ মাত্রকে মানসিক ব্যাধির শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়া তাহার নিরাকরণ চেষ্টার পরামর্শ দিয়াছেন। বিভীষিকাবাদ এই মানসিক ব্যাধির অন্যতর এবং অধমতর। সামাজিক, নাগরিক এবং শাসনভার প্রাপ্ত অধিকারী মাত্রেরই সমবেত চেষ্টায় ইহার দমন সম্ভব—প্লেগ, কলেরা, বসন্ত বিভীষিকা হইতে রক্ষার জন্য যেরূপ সার্ব্বজনীন চেষ্টার প্রয়োজন, সেইরূপ চেষ্টা ও উদ্যম এই দারুণ বিভীষিকার বিরুদ্ধে নাগরিক-মাত্রকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

আজ স্যর ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন, কাল স্যর জন এণ্ডারসন্, পরশু মহাত্মা করমচাঁদ গন্ধী আততায়ীর লক্ষ্য। ব্যক্তিগত বা সমাজগত কারণ বিশেষে এই দারুণ বিভ্রাট ঘটিতেছে মনে করিলেই কারণ নির্দ্দেশও হইবে না, প্রতিকার সম্ভাবনাও হইবে না। বিকট ক্যান্সারের মত ব্যাধির বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি ও সতর্ক ব্যবস্থা ইহার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন। রাজা ও প্রজার, শাসক এবং শাসিতের সমবেত চেষ্টায় এ প্রতিকার সম্ভব, মহাত্মা গন্ধীর প্রতি আক্রমণে একথা মনে স্বতঃ উদিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেই উদয়ের ফলে 'উদয়ন' শিখর হইতে গম্ভীর নির্ঘোষে বহু প্রাচীন সনাতন প্রশ্ন উঠুক—'কঃ পন্থা'?

স্রোতের শৈবাল

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

আজ সকাল হইতেই আকাশ মেঘে মেদুর। হাতে আমার কোনো কাজই ছিল না। রবিবার, আপিসের হাঙ্গাম নাই। একখানি কবিতার বই খুলিয়া এমন-সকালে পড়িবার মতো একটি কবিতা বাছিতেছিলাম। শুধু ফিকা মেঘ—বৃষ্টি নাই, বৃষ্টির সম্ভাবনাও নাই। এ মেঘ দেখিয়া মন ময়ূরের মতো পেখম মেলিয়া নৃত্য করিতে চাহে না। কেবল ঝিমাইতে ইচ্ছা হয়। তাই মনোমত কবিতা আর কিছুতেই নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছিলাম না। অনর্থক কেবলই পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া চলিতেছিলাম। ভুল করিয়াছিলাম। ইহার চেয়ে যদি কোনো পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে মনো-নিবেশ করিতাম, কিম্বা রেলের টাইম টেব্‌লে, ঢের বেশী ভালো লাগিত।

বাহিরে দুটি ছেলেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে অর্থাৎ কর্ণবিদারী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। বিরক্তভাবে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া পুনরায় পাতা উল্‌টাইতে লাগিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী হাসি-হাসি মুখে একখানি পোষ্টকার্ড আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন।

চেনা হাতের লেখা। কিন্তু এত সকালে এ চিঠি কি করিয়া আসিতে পারে ভাবিয়া না পাইয়া ডাক ঘরের ছাপ দেখিবার জন্য উল্‌টাইতেছিলাম, ললিতা তেমনিভাবে হাসিয়া কৈফিয়ৎ স্বরূপে বলিলেন,—কাল বিকেলের ডাকে এসেছে। তোমাকে দিতে মনে ছিল না।

এ একটা কৈফিয়ৎই নয়। বনলতার চিঠি। আসিয়াছে কাল। সে চিঠি দিতে মনে ছিল না, এমন হইতেই পারে না। বোধ করি কাল রাত্রেও একবার তাহার কথা উঠিয়াছিল। আমি জানি, নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনের পরেও বনলতা-সম্বন্ধে ললিতার আশঙ্কা সম্পূর্ণ যায় নাই।

অথচ সামান্য একখানি পোষ্টকার্ডে কিছুই ছিল না। এমন কি নিতান্ত অনন্যোপায় না হইলে হয়তো আমাকে এ কয় লাইনও লিখিত না। কলিকাতার একটা হাসপাতালে তাহার একটা চাকুরি জুটিয়াছে। চাকুরি মানে নার্সগিরি। আজ সন্ধ্যার মেলে সে লক্ষ্ণৌ হইতে এখানে পৌঁছিবে। আমাকে ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। বুঝিলাম, বনলতা আজকাল নার্সগিরি করিতেছে। এবং এতকাল না হউক অন্ততঃ কিছুকাল ধরিয়া সে লক্ষ্ণৌতেই আছে। কেবল এইটুকু বুঝিলাম না, কেন দয়া করিয়া বাছিয়া বাছিয়া এই অধমের উপরেই তাহার সম্বর্দ্ধনার ভার অর্পণ করিল। কলিকাতা সহরে তাহার বন্ধুর তো অভাব নাই। অর্থোপার্জ্জন, সংসার প্রতিপালন, কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চ্চা এবং অবসর সময়ে স্ত্রীর সহিত রহস্যালাপ, ইহাতেই আমার জীবন এক্‌েবারে ভরাট হইয়া আছে। দেহে একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ির উদ্গম হইয়াছে এবং গৃহটিও সে কালের তপোবনের মতো শান্ত-রসাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় আমার নাম স্মরণ করিবার জন্য তাহার স্মৃতিশক্তিকে পীড়ন করিবার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না, এবং পদপল্লবের ধূলিও আমার অঙ্গনে না দিলেও চলিত।

ললিতা টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখে চোখ পড়িতেই হাসিয়া ফেলিল। সে হাসি কেমন তাহার বর্ণনা করিতে পারিব না। ফিকা নয়, অশ্রুবিধৌত মল্লিকা ফুলের হাসিও নয়। কেবল এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, আপনাকে সহজ করিবার জন্য এই মেয়েটি কি দুরন্ত প্রয়াসই না পাইতেছে।

ললিতা আমার হাত হইতে চিঠিখানি টানিয়া লইয়া আর একবার তাহার উপর চোখ বুলাইল। পরে

আমার দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ চমৎকার হাতের লেখা —না?

বলিলাম, বেশ লেখা।

চিঠিখানি একবার দূরে, একবার কাছে নানা ভঙ্গিতে দেখিয়া ললিতা আবার বলিল, আমার চেয়ে ঢের ভালো।

অনাবশ্যক বিধায় এ প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। আমি অন্য কথা ভাবিতেছিলাম। বনলতাকে চিনিতে আমার বাকী নাই। তাহার চোখে আগুন আছে, পুরুষ পতঙ্গের মতো সে আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া যায়। চোখের কটাক্ষে, ঠোঁটের শাণিত হাস্যে এবং রূপের তরঙ্গে মানুষের ধাঁধা লাগে। আমার জীবনে তাহার উদয় ধূমকেতুর মতো। তাই এতদিন তাহার প্রসঙ্গে অত্যন্ত লঘু এমন কি কখনও কখনও অত্যন্ত কদর্য্য পরিহাস করিলেও আজ অতীত কথা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, এ আবার কি জঞ্জাল!

কোনো উত্তর না পাইয়া ললিতা আবার বলিল, যেন কতকটা আপন মনেই—বেশ হবে! তাকে দেখার আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল। বেশ হবে!

অঞ্চল দিয়া টেবিলের একপ্রান্ত ললিতা আপন মনেই মুছিতে লাগিল। তারপর কহিল, শুনেছি অসামান্যা সুন্দরী! তাই না?

এবারে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলাম। এতক্ষণ নিজের কথাই কেবল ভাবিতেছিলাম। তাহারও যে ভাবিবার কথা থাকিতে পারে তাহা ভাবি নাই। এখন বুঝিলাম, কাল এই চিঠি পাওয়ার পর হইতে তাহার চিন্তার ধারা কোথা দিয়া কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকা ভালো হয় নাই। হয়তো আমার মুখের চিন্তার ছায়া তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ললিতা এমনিতেই বড় ভীতু। বুঝিলাম, আসন্নঝড়ের আশঙ্কায় এই অসহায় পাখীটি বড় ভয় পাইয়া গিয়াছে। দুই হাতে তাহার মুখখানি প্রভাতের আলোর দিকে তুলিয়া ধরিলাম। একটি কোমল মমতায় মন অভিষিক্ত হইয়া গেল।

বলিলাম, অসামান্যা সুন্দরী? হ্যাঁ অসামান্যাই—কিন্তু তোমার চেয়ে নয়!

আমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ললিতা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, যাও! আমি বুঝি সুন্দরী? আমি তো কালো।

—হাঁ, তুমি কালো। কিন্তু অসামান্যা সুন্দরী। কেমন ক'রে হ'লে সে বুঝতে গেলে আমার চোখ দিয়ে দেখতে হবে।

ললিতাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া শোফার দিকে টানিয়া লইয়া গেলাম। আনন্দে তাহার দেহের গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণে দু'ফোঁটা জলও জমিয়াছে। এমন করিয়া বহুদিন আদর করি নাই। দুজনে পাশাপাশি বসিলাম। ললিতা কোনো কথা না কহিয়া আপন মনে আমার আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল,—মেয়েটা লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে! রূপের অহঙ্কারেই গেল!

—কেন?

উত্তেজিতভাবে কহিলাম,—নয়? আমার বাড়ীতে সে কি সাহসে উঠতে আসছে তাই ভাবছি।

—হয় তো আর কোথাও ওঠবার জায়গা নেই।

—আর কোথাও ওঠবার জায়গা না থাকলেই লোকে আমার বাড়ীতে উঠবে? এটা কি হোটেল?

ললিতা হাসিয়া, চোখ নাচাইয়া বলিল,—পুরোণো বন্ধু তুমি! তা ছাড়া বুঝে দেখ, মোহনবাবুর ওখানে তো ওর কিছুতেই ওঠা চলে না। কিন্তু আমি ভাবছি, ওই মোহনবাবুর জন্যে একদিন বেচারা সব ছেড়েছিল। আবার তাকেই বা ও ছেড়ে চলে গেল কেন?

বিরক্তভাবে উত্তর করিলাম,—ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তার আগে ও বহুলোককে ছেড়েছে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, মোহন ওকে বিয়ে করতে সম্মত হ'ল কেন? ওর সবই তো সে জানত।

কৌতুকে আবার ললিতার চোখের তারা নাচিয়া উঠিল।—ওকে দেখে নাকি সবাই বিয়ে করতে রাজি হয়। রাজি না হ'য়ে উপায় নেই।—আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—তুমিও তো রাজি হ'য়েছিলে।

—তার আগে আমি একবার বিষ খেতেও রাজি হ'য়েছিলাম। আমি না পারি কি? কিন্তু মোহনকে তো দেখ নি। অমন শান্ত, স্থির, ধীর, সচ্চরিত্র ছেলে একালে আর একটাও মেলে কি না সন্দেহ। আর বেচারাকে কি সইতে হয়েছে! তার সমাজ, সংসার, আত্মীয়-স্বজন সব গেছে। এমন কি অমন চাকরিটা পর্য্যন্ত যেতে ব'সেছিল, কিন্তু তাও নিঃশব্দে সয়েছিল। এবারে বনলতা ছেড়ে যাওয়ার পর একেবারে কেমন যেন মুসড়ে পড়েছে।

—সে সময় বনলতার সঙ্গে তুমি একদিনও দেখা কর নি?

—না। কারণ বনলতা মোহনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করত না, কোথাও বের হ'ত না। নিজেকে তো সে জানে।

—আচ্ছা, ওর প্রথম স্বামীকে তো তুমি জানতে, না?

—না। শুনেছি নাকি পাড়-মাতাল ছিল। একদিন মাতাল হ'য়ে বনলতার পিঠে এমন চাবুক মেরেছিল যে, তার দাগ এখনও আছে।

শুনিয়া ললিতা শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—আহা! বেচারা, বহু দুঃখই পেয়েছে, এই বয়সে।

বনলতার সম্বন্ধে আমি একটা কুৎসিত মন্তব্য করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ললিতার চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলাম। কেবল বলিলাম,—দুঃখ যে সেধে বেড়ায় তার দুঃখ কে ঘোচাবে বল?

—তা বটে!

ললিতা যেন অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—ওর মোহনের ওখানেই গিয়ে ওঠা উচিত ছিল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, মোহনের দরজা ওর জন্যে আজও খোলা আছে।

কথাটা ললিতা ঠিক বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চাহিল। হাসিয়া বলিল,—তা কি আর হয়?

উত্তেজিতভাবে বলিলাম,—কেন হয় না? আমি তোমাকে ব'লে রাখলাম, ও শুধু মোহনকে জব্দ করবার জন্যেই এখানে আসছে।

—কি ক'রে?

—আবার কি করে! মোহনকে কলকাতায় কে না চেনে। তার স্ত্রী তার ঘর ছেড়ে এসে হাসপাতালে নার্সগিরি করছে, তুমি ভেবেছ এ কথা রাষ্ট্র হ'তে বেশী দেরী লাগবে?

এ কথা শুনিয়া ললিতা যেন শিহরিয়া উঠিল। ব্যথাভরা চোখ মেলিয়া শুধু কহিল,—না, না।

—আর না, না। দেখনা ও কি কেলেঙ্কারীটা করে। ও সব পারে।

আমি আরও অনেকগুলি কড়া কথা বলিতে যাইতেছিলাম। এমন সময় আমাদের গাড়ী-বারান্দায় একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। এখন বনলতার আসার কথা নয়। কিন্তু দুইজনেই উচ্চকিত হইয়া উঠিলাম,—ওই বুঝি বনলতা আসিল। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিটের জন্য উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিবার শক্তি পর্য্যন্তও যেন লোপ পাইল।

গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। কে যেন নামিয়া কি বলিল। ললিতা আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের দিকের দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

—কে?

ললিতা উত্তর দিল না। আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল না পর্য্যন্ত। অবাক হইয়া যেন কাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

—আপনি বুঝি মিসেস্ ব্যানার্জ্জি? নমস্কার! শরৎ আছে?

উত্তরে ললিতা শুধু একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তাহার দোষ নাই। যে বনলতাকে না দেখিয়াছে, সে এত সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখে নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। সে খট্‌-খট্‌ করিতে করিতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহার সেই আশ্চর্য্য-হাসি হাসিয়া কহিল,—কিগো, চিনতে পারছ না? আমি কি এই ক' বছরে এমনি বদলে গেছি?

এত দিনেও যে সে কিছুমাত্র বদলায় নাই, এই ভাবিয়াই আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। প্রথম দিন যেমন দেখিয়াছিলাম অবিকল তেমনি। কেবল মুখে কেমন একটি চমৎকার শীর্ণতা আসায় আরও একটু, যাহাকে বলে, 'স্মার্ট' হইয়াছে।

কিন্তু আমি কোনো উত্তর দিবার পূর্ব্বে সে আমার জামার আস্তিন ধরিয়া টানিয়া একটা কোণে লইয়া গিয়া একেবারে কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল,—আমার কাছে আর কিচ্ছু নেই। ওর গাড়ীভাড়াটা দিয়ে দেবে?

আমি ভাড়াটা দিবার জন্য নিঃশব্দে চলিয়া আসিতেছিলাম। আমার বাহুমূলে একটা চাপ দিয়া বলিল,—শুড্‌ বয়!

আমি এবারও কোনো উত্তর না দিয়া উপরে চলিয়া আসিলাম। তাহার জুতার শব্দে বুঝিলাম আমাকে ছাড়িয়া দিয়া এবারে বনলতা ললিতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমি আর ফিরিয়া চাহিতে সাহস করিলাম না। গাড়ীভাড়া মিটাইয়া দিয়া বাহিরেই পায়চারী করিতে লাগিলাম। ভিতরে আসিতে ইচ্ছা হইল না। আমার বাহুমূলে তখনও তাহার স্পর্শ কাঁটার মতো বিঁধিতেছিল। তাহার মধ্যে অস্বস্তিকর জ্বালা ছিল, বিরক্তিকর বেদনা ছিল এবং কি-এক মধুর মোহও ছিল। আমি ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম,—বনলতার উপর, ললিতার উপর, এই বিশ্রী সকাল বেলার উপর, এমন কি নিজের উপরও।

এমনি মনের অবস্থা লইয়া কতক্ষণ পাইচারী করিয়াছিলাম জানি না। এক সময় মনে হইল, বাহিরের বসিবার ঘর যেন শূন্য। কেহই নাই। উঁকি দিয়া দেখি সত্যই তাই। বনলতা কোনো কালেই চুপ করিয়া এক স্থানে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। এতক্ষণ হয় তো সে ললিতাকে লইয়া উপরে নীচে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, আর ছেলে দুটি অবাক্ হইয়া এই চঞ্চলা মেয়েটিকে দেখিতেছে।

বসিবার ঘরে আমার সোফাটিতে আসিয়া বসিলাম। টেবিলের উপরে তখনও কবিতার বইখানি পড়িয়া আছে এবং সেই চিঠিখানি। কিন্তু সেদিক পানে চাহিতেও মন ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। বাহিরে আবার তেমনি বিশ্রী বাদল নামিল। আমি সোফার একটি কোণে জড়সড় হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ? অনতিবিলম্বেই শুনিলাম সিঁড়িতে চট্‌-পট্‌ চটি জুতার শব্দ এবং পরক্ষণেই দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া বনলতা আসিয়া প্রবেশ করিল। পিছনে ললিতা, জাহাজের পিছনে-পিছনে গাদাবোটের মতো আসিয়া থামিল। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ললিতার মুখের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ীতে সে যেন নবাগতা। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে যেন কেবল ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছে। দু'জনের পানে ক্লান্ত চোখে চাহিয়া কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া কেবল একটু কাশিলাম।

বনলতা কোনো প্রকার দ্বিধা না করিয়া একেবারে আমার পাশে বসিয়া অনর্গল বকিতে লাগিল।

—তুমি অমন ঝিম্‌ হ'য়ে ব'সে রয়েছ কেন? সেই মাথাধরার অসুখটা কি এখনও যায় নি? দুটো এ্যাস্‌পিরিন্‌ খেয়ে নিলে না কেন? কিম্বা গরম্‌ একটু চা খাও। কি বলছ? ও কিছু নয়? তবু ভালো। আমি ভয়ে মরি আবার বুঝি সেই···তোমার ঘরগুলো তো চমৎকার সাজিয়েছ শরৎ! অনেক নতুন আসবাব কিনেছ দেখলাম। ও-দিককার ঘরগুলোর সব আসবাবই তো নতুন। তখন দেখি নি তো? তোমার শোবার ঘরেও যে বড় আয়নাটা দেখলাম···

আশ্চর্য্য নির্লজ্জতা!

কিন্তু আমিও আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, তুমি আমাকে অপ্রস্তুত করতে পারলে না বনলতা। তুমি যে আমার শোবার ঘরে অনেকবার এসেছ সে খবর ললিতা জানেন। আমিই বলেছি।

—জানেন? তুমি বলেছ?

বনলতা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। যেন নিস্তব্ধ দৈত্যপুরীতে একসঙ্গে হাজার-পাখী ডাকিয়া উঠিল। আমি এবং ললিতা আমরা দু'জনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম। এ আবার কি হাসি! কিন্তু বনলতার হাসিই অমনি। ওই ওর চিরদিনের হাসি!

বলিল, আমার কথা আর কিছুই গোপন রইল না দেখছি। কিন্তু ললিতা, তুমি অমন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওই চেয়ারটা টেনে বোসো।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আত্মীয়তা জ্ঞাপক 'তুমি' সম্বোধন ললিতার কেমন লাগিল বলিতে পারি না। বোধ করি বহু বিভিন্ন ভাবের প্রাবল্যে তাহার গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফাঁক করিল। হয়তো বলিতে চেষ্টা করিল, থাক্‌।

আমার জামার হাতা হইতে কি যেন একটা আঙ্গুলের ডগা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বনলতা কহিল, ধূমকেতুর মতো হঠাৎ তোমাদের সংসারে এসে পড়ায় তোমরা যে কেউ খুসী হ'তে পার নি, সে আমি এসেই টের পেয়েছি। তোমাদেরও দোষ নেই। সুখের দিনে একটিবারও তোমাদের স্মরণ করলাম না, আজ দুঃখের দিন ব'লেই তো ঘারস্থ হয়েছি। কিন্তু যাদের ঘারস্থ হ'লে কৃতার্থ হ'ত, এমন বন্ধুও তো আমার কম নেই। তাদের কারও কাছে উঠতে মন সরলো না। ভেবে দেখলাম, আজও একমাত্র তুমিই আছ, যার বাড়ীতে অসঙ্কোচে ওঠা যায়। অন্ততঃ এই জন্যও তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল।

বলিয়া বনলতা একবার হাসিল।

ভালো করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, তোমার সন্ধ্যের গাড়ীতে আসার কথা ছিল যে?

বনলতা আবার তেমনি ঝঙ্কার দিয়া হাসিয়া বলিল, সে আমার টাইম-টেবেল্‌ দেখার গুণে। এমন ভুল যে কত হয়! ভাই ললিতা, আমি চা একটু বেশী খাই। তোমার চাকরকে যদি একবারটি বল···

ললিতা বোধ করি পালাইবার একটা সুযোগ পাইয়া বাঁচিল। তাহার পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইতেই বনলতা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বন্ধুর কোনো খবর রাখ?

বলিয়া চোখের ইঙ্গিতে মোহনকে নির্দ্দেশ করিল।

কোনো খবরই রাখিতাম না। ঘাড় নাড়িয়া তাহাই জানাইয়া দিলাম। মোহনের সংবাদের জন্য তাহার যে বিশেষ আগ্রহ আছে এমন মনে হইল না। তবে খবরটা পাইলে খুসীই হইত।

অতঃপর আমার পক্ষে কৌতূহল সম্বরণ করা কঠিন হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে বনলতা? মোহনকে অমন ক'রে হঠাৎ ত্যাগ করে গেলে কেন?

এ প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটি কেমন উদাস হইয়া গেল। অলস-কণ্ঠে কহিল, ভালো লাগছিল না!

এ আবার কি উত্তর!

বলিলাম, কিন্তু লোকে রটাচ্ছে, মোহন তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নি। সেই জন্যেই তুমি···

বনলতার চোখ দুইটি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিরক্ত-কণ্ঠে বলিল, লোকে অনেক কথাই বলবে। কিন্তু তুমি তো তাঁকে জানো। তুমি কি ব'লে এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করলে?

সে কথা আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু শুদ্ধ মাত্র ভালো না লাগার অজুহাতে স্বামী ত্যাগ করার কৈফিয়ৎও ভালো মনে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর না তুলিয়া বলিলাম—তুমি আমার অতিথি। কথাটা বলা তোমাকে

ভালো হচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, মোহনের ওখানে উঠলেই তুমি ভালো করতে।

ক্লান্তস্বরে সে কহিল, না, না, তা হয় না। সে আমি অনেক ভেবেছি। ভদ্রলোক আমার জন্যে অনেক সয়েছেন। অনেক ক্ষতিই তাঁর করেছি। তবু তাঁকে এ ভাবে অপমান করার কোনো অধিকার আমার নেই। কিন্তু এ-সব কথা থাক, শরৎ।

—আমার আর একটি কথার জবাব দাও বনলতা। মোহনকে কি তুমি ভালোবাসতে পারো নি?

বনলতা কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কহিল, সত্যি কথা শুনতে চাও?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিকথা! চিরদিন শুধু মিথ্যে ব'লে ভুলিয়ে এলে। জীবনে অন্ততঃ এই একটিবার সত্যি কথা বলো, নইলে কিছুই ব'লো না।

বনলতা এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিল। তারপর সিংহিনীর মতো গ্রীবা বাঁকাইয়া দৃপ্ত-কণ্ঠে কহিল,—সত্যি কথাই বলব। মিথ্যে দিয়ে লোক ঠকাবার আর আমারও ইচ্ছে নেই। দেখেছি, যত ঠকিয়েছি নিজে ঠকেছি তার চেয়ে বেশী। সত্যি কথা শুনবে শরৎ? জীবনে ভালোবাসার খেদ আমার মিটল না, কাউকেই কোনোদিন প্রাণভ'রে ভালোবাসতে পারলাম না। প্রথম জীবনে যাঁকে পেলাম তিনি শুধু পিঠের ওপর চাবুক নাচিয়েই গেলেন। তারপরে যিনি এলেন তিনি আমাকে একেবারে মাথায় তুলে নিলেন, কোনো কারণেই আর ধূলোয় নামাতে চান না। আজ দু'জনের কেউই আমার কাছে নেই। তাঁদের কাছ থেকে এত দূরে স'রে এসে আজ আর দু'জনের মধ্যে কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাচ্ছি না। দু'জনেই আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে গেছেন।

এক মিনিট থামিয়া বনলতা বলিল,—অথচ আজ আর কোনো দুঃখই করি না। মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি যে, আমার যিনি স্বামী এ জন্মে তিনি আর এলেন না, তাঁকে আর পেলাম না! সান্ত্বনার কথা এই যে, আমার তরফ থেকে কোনো ত্রুটি ঘটে নি। হাজারো মানুষের মনের অন্ধকারে আলো জেলে-জেলে কেবল তাঁকেই খুঁজেছি। নিন্দায় এবং কলঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে গেল, যাক্, শুধু তাঁকে যদি পাওয়া যেত!

বনলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধ্যানমগ্নের মতো স্থির হইয়া রহিল। তারপরে যেন আপনাকে গুটাইয়া লইবার জন্য বলিল,—কিন্তু এ তোমার অনাবশ্যক কৌতূহল শরৎ! মেয়েদের এ দুর্ভাগ্যের কথা তোমরা কিছুতে বুঝতে পারবে না। অথচ জলের মধ্যে মানুষ যেমন হাঁপিয়ে ওঠে তোমাদের মধ্যে এসে আমিও তেমনি হাঁফিয়ে উঠি। সে কি তোমরা বুঝবে? তোমরা শুধু নিন্দেই করবে, কলঙ্কই রটাবে, গায়ে পাঁকই ছিটুবে।

হঠাৎ বনলতা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—আমাকে নিয়ে আমার প্রথম স্বামীর উদ্বেগের সীমা ছিল না। আজ জানালার চারিদিকে কাঠের ঘেরাটোপ বসাচ্ছেন, কাল বারান্দায় কাঠের খড়্-খড়ি বসছে। পাছে কখন কার দৃষ্টিতে প'ড়ে খারাপ হ'য়ে যাই। কিন্তু তিনি যে কোন্ সতী-শিরোমণির কাছে রাত বারোটা পর্য্যন্ত মধু-রজনী কাটিয়ে টল্‌তে-টল্‌তে বাড়ী ফিরতেন, সত্যি বলছি, একদিনের তরে আমার জিগ্যেস করার প্রবৃত্তিও হয় নি।

ললিতা নিজেই বনলতার জন্য চা আনিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বনলতার চিরদিনের দুষ্ট-বুদ্ধি জাগ্রত হইল। চায়ের বাটি তাহার হাত হইতে লইয়া বলিল,—এই যে আমি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছি, ললিতার মনে যত ভয়ই হোক্, সে আমাকে ভদ্রভাবে সহ্য করবে। কিন্তু তার ছেলে বেলার কোনো বন্ধু যদি এমনিভাবে আসত তুমি নিশ্চয় তাকে গুলি ক'রে মারতে। অমন ক'রে চাইছ কি? ললিতার দু'একজন বন্ধু থাকা কি এমনই অসম্ভব?

বলিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমরা উভয়েই এই বিশ্রী রসিকতায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। গম্ভীরভাবে বলিলাম,—খুব হয়েচে। চা-টা খেয়ে নাও দিকি, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

প্রত্যুত্তরে বনলতা হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, এই আমি চুপ করলাম। ভালো কথা, দুপুরে আমি একটু ঘুমবো। বিকেলে,—তোমার গাড়ীটা আছে তো? বিকেলে তুমি নিজে আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে? অপরিচিত জায়গা। ললিতা, তোমাদের বাথ-রুমটা আমাকে দেখিয়ে দেবে চল না ভাই। স্নানটা সেরে নিই গে।

ললিতা তাহাকে লইয়া বাহিরে গেল। আমি অন্যমনস্কভাবে বসিয়া বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিলাম। একটু পরে ললিতা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—ওর বিছানাটা কি তবে তোমার ঘরেই ক'রে দোব?

অন্য দিন এমন রসিকতার উত্তরে কি বলিতাম জানি না। কিন্তু আজ জ্বলিয়া উঠিলাম। তথাপি মনের সে ক্রোধ যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া শুধু বলিলাম,—ছিঃ! ললিতা!

উর্ম্মিলা

অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ রায়, এম্-এ

বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে ফুটিয়াছে
বনে বনে চৈত্র-ফুলরাশি, বায়ুপথে
আসে ভাসি' অজ্ঞানিত শত-পুষ্প গন্ধ
অবদান। দিকে দিকে অধীরতা, দিবা
অবসান! আরক্ত সন্ধ্যার নভে ফুটে
ওঠে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ, শুভ্র চন্দ্রলেখা!
অযোধ্যার রাজপুরী—অন্তঃপুরে তার
স্ফটিক-শিলার কক্ষ, বাতায়ন-পথে
দাঁড়ায়ে একটি নারী। ললাট-লুণ্ঠিত
অবগুণ্ঠনের তলে, মুখ-চন্দ্রখানি
আধ-আধ দেখা যায়—পল্লব মাঝারে
যেন শুভ্র পুষ্পকলি!···প্রাসাদ প্রাচীর
বাহি' কুসুমিত লতা উঠে শ্লথ-গতি
ভুজঙ্গ-প্রয়াত-ছন্দে—পুষ্পিত, সঙ্গীত—
বাতায়ন-পুরোভাগে ক্ষণ থামি'—নব-
পল্লবিত অভিসারী সহকার-শাখে
সাদরে জড়ায়ে আগ্রহ-বন্ধনে বাঁধি
আপনার তনু-দেহ করে নিবেদন—

সেই শাখে পিক বসি' করে উচ্চারণ
বসন্ত-বিহ্বল-বাণী—মলয় পবন
ধীরে দেয় দোল···দাঁড়াইয়া রহে নারী
আপনা বিস্মরি—বসন্তের ইন্দ্রজালে
বিলুপ্ত-চেতন !···ত্রস্তপদে কক্ষমাঝে
সহসা প্রবেশে কম্বিত-কাঞ্চন দ্যুতি
কিশোর কুমার—অবাক-বিস্ময়ে হেরে
ধ্যান মৌন মূর্ত্তিখানি !···উত্তরিয়া ক্ষণ
পরে সন্নিধানে তরুণীর, সন্তর্পণে
স্কন্ধে রাখে হাত। ফুলশাখে দেয় দোল
বায়ু যথা···চমকিয়া অনবগুণ্ঠিত
মুখে ফিরে চাহে নারী, স্মিতহাস্যে ভরি—
মুখ-ইন্দু উঠে উজলিয়া···মুহূর্ত্তের
পরে—দীরঘ ঘোমটা টানে, ত্রস্তকরে
কম-লজ্জা ভরে—বধূ সে যে! গাহে কবি
রূপমুগ্ধ দৃষ্টি তার—রূপস্তোত্র গান—
শিশু শশাঙ্ক উদিল কি আজি
অরুণ বর্ণ নভে,
ওগো সুন্দরি! তোমার হাস্য
ক্ষণিক মহোৎসবে!

"কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থা-বিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া-সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

প্রতিযোগিতার গল্প

[প্রথম পুরস্কার]

বাঁশীর সুর

শ্রীবিজন মুখোপাধ্যায়

(১)

তার নাম ছিল রূপরাজ। বাপ-মায়ের দেওয়া নয়—রাজ-দরবারে পাওয়া। যৌবনে কাজ করে খ্যাতি লাভ করেছিল, নামটী তারই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রাজার দেওয়া ঘরে, রাজধানীরই একপাশে—রাজ-ভোগে না হলেও, মনের সুখেই তার দিন কাটত। কিন্তু বিধাতার হাসি—আলোর পূর্ণিমা, সে ত চিরস্থায়ী নয়, তারপর কালো অমাবস্যা আছেই। রূপরাজের সুখের গগনেও তার কালো ছোঁয়াচ লেগেছিল। রূপরাজের রূপরাণী করুণা, সত্যই একদিন তাকে ছেড়ে চলে যায়। রূপরাজের বুকে সে আঘাত বাজে খুবই, তবুও মুখে তাকে হাসিই ফুটিয়ে তুলতে হয়। সইতে হয় সবই, শুধু চলে-যাওয়া তারই স্নিগ্ধ স্মৃতির দান ছোট্ট কচি উৎপলার মুখ চেয়ে। কচি মেয়ে মাকে খোঁজে। ভোরের বেলা ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় খুঁজে পায় না। ঘুমন্ত রূপরাজের গলা জড়িয়ে ডাকে "বাবা! বাবা!"—তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে উৎপলা বলে "বাবা! মা কোথা?" চোখে তার জল! রূপরাজ ভাষা খুঁজে পায় না—কি ভাবে! মেয়েকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে, উদাস দৃষ্টি মেলে অকারণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকে—অজানিতে চোখ বেয়ে তার জল নামে, যেন শ্রাবণের ঝর্-ঝর্ ধারা!

ক্রমে রাজধানীর আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত তার কাছে যেন বিষিয়ে ওঠে; বুকের মাঝে প্রাণ যেন তার হাঁফিয়ে ওঠে। চোখের জল, তার সমস্ত বল যেন নিঃশেষ করে ধুয়ে দেয়। রূপরাজের সে রূপও নেই, সে শক্তিও আর নেই। করুণার সাথে সাথে তার আসল আধখানা চলে গিয়েছে—যে আছে, এ সে রূপরাজ নয়, এ তার শুধু ছায়া! রাজধানী তাকে ছাড়তেই হবে—রূপরাজ ভেবে দেখে, উপায় নেই। অনেক দিনের ছেড়ে-আসা নিরালা সেই গ্রামের পথ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। মেয়ের হাত ধরে, সকল মায়ার বাঁধন কেটে, সবার কাছে বিদায় নিয়ে, রূপরাজ একদিন তারই উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। রাজধানী হতে দুদিনের পথ। বহুকাল পরে আবার পাখী-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা সেই গ্রামের কোল তাকে যেন সব ভুলিয়ে দেয়। তবু মাঝে-মাঝে বুকের ভেতর তার ব্যথা বাজে। রূপরাজ চেষ্টা করে, জোর করে ভুলতে, কিন্তু পারে না, মানুষ ত? স্মৃতির দাগ, যা একবার আঁকে, তা কি মোছে? না কখন মোছা যায়!

(২)

গ্রামের অন্তে, নদীর প্রান্তে তার ঘর। বহুকালের পরিত্যক্ত কুটীরের জীর্ণ চিহ্নের উপর রূপরাজ জীবনের সঞ্চিত অর্থে মনের মত করে তার শেষের আস্তানা গড়ে তোলে। সে ছিল ভাস্কর। করুণার অসুখের সময় হতে একাজ সে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু গ্রামে ফিরে কে জানে কেন প্রবল উদ্যমে আবার তাইতে মন দিলে। সামান্য কয়েক বিঘা জমি, যা তার ছিল, তাতেই দু'জনের কোন প্রকারে চলে যেত। রূপরাজ সারাদিন তার কাজ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকত। আর উৎপলা, সে ছিল যেন একটী জীবন্ত কবিতা! একেবারে

সৃষ্টিছাড়া—তার সাথে কারো মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। ছোট্ট মেয়ে, সুন্দর যেন ঠিক প্রভাতের শিশির-ধোয়া সদ্য-ফোটা গোলাপ কুঁড়ি।—সবে সাতটা বছর তার এই মাটীর ধরায় কেটেছে। কিন্তু মুখে তার বেদনার ছাপ, চোখে তার অর্থহারা উদাস দৃষ্টি। কারো সাথে তার ভাব নেই, খেলায় তার মন নেই, খাবারেও তার লোভ নেই, এক কথায় বলতে গেলে তুলনাও তার নেই। সারাদিন বাপের পাশে ব'সে তার কাজ দেখে। ছোট্ট মেয়ের একটুও বিরক্তি নেই। রূপরাজ প্রাণ দিয়ে পাষাণে করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, আর উৎপলা যেন করে তারই প্রাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। কাজের অবসরে রূপরাজ হয়ত বা কখনও ফিরে দেখে বলে, "পাগলী মেয়ে এখনও বসে আছিস্, যা না মা, একটু খেলগে যা না!" উৎপলা ওঠে না।

উৎপলার বয়স বাড়ে, কিন্তু পাগলামি তার কমে না, বরং বেড়েই চলে। আকাশের রঙ, পাখীর গান, বাতাসের সুর এরা তাকে ঘরের বাইরে আনে টেনে, তাকে সব ভুলিয়ে দেয়। ম্লান সন্ধ্যায় আকাশের মুখ আবীর-রঙে রাঙা হয়ে ওঠে, মুগ্ধ উৎপলা তারই পানে চেয়ে থাকে! ভোরের আলোর সঙ্গে ঘরের পাশে বনে পাখীদের সভা বসে, উৎপলা মন দিয়ে তাদের কথা শোনে—জ্যোৎস্না রজনীতে দখিণের বাতাসে পাপিয়ার পাগল-করা সুর আসে ভেসে, উৎপলা উৎকর্ণ হয়ে ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে আসে। তাদের বাড়ীর পাশেই নদী। কি একটা নাম করা বড় নদীর, বেশ বড় একটা শাখা। গাঁয়ের লোকে তার আসল নাম যে কি, তা জানে না। নদীতে জল থাকে বারো-মাস। খুব কালো আর গভীর তার জল, তাই সবাই বলে কাজলা। নদীর ওপাশে বন, শুধু শালের বন, তারি ফাঁকে-ফাঁকে দূরে-দূরে খোড়ো চালের একটু-একটু দেখা যায়, বোধ হয় গ্রাম-টাম কিছু আছে। বর্ষায় নদীর কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, কখনও বা বান আসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখন ওপারে ভাঙ্গন, তাই রক্ষে! চারিদিক জলে থৈ থৈ করে। গাঁয়ের লোক বলে, "বাপ্‌রে! কাজলা নদী নয়ত, যেন সুমুদ্দুর।" আবার গ্রীষ্মের দিনে তার আয়তন ছোট হয়ে আসে, পাগলা প্রকৃতি তার শান্ত হয়ে যায়, মাঝে মাঝে চড়া পড়ে, কাজলার কালো জল থেকে সেই দূরে যেখানে সবুজ গাছের বন, বরাবর সব বালুর চর ধূ ধূ করে।

কাজলার এই জল, তার এই চর, উৎপলার যে কি ভালোই লাগে, তা সেই জানে। যখন বেলা প'ড়ে আসে, সবুজ গাছের মাথায় মাথায় সোনালি রোদ চক্‌চক্ করে, যখন নদীর কালো জলে তার ছায়া জলে, তখন উৎপলা পলকহীন আঁখি মেলে তারই দিকে চেয়ে থাকে। নদীর ঘাটে গাঁয়ের বধূরা, আসে-যায়, হাসে-গায়, জল-ভরে, আবার ফিরে যায়। উৎপলার মন যেন আর ফিরতে চায় না। অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, কাজলার কালো জল আরও কালো হয়ে ওঠে, আকাশের রঙ মিলিয়ে যায়—তার বুকে তারার মালা জলে ওঠে, উৎপলা বসে থাকে—দেখে দেখে যেন তার আর আশ মেটে না। মুখ দেখে মনে হয়, যেন সে কোন অচিন্ দেশের অতিথি, পথ ভুলে এসেছে এ ধরণীর পারে, তাই চেয়ে থাকে প্রকৃতির মুখের পানে, আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে, যদি কিছু সেই আশা তার মেলে। এমনি করে তার দিন কাটে। নদীর তীর, আর আকাশের মুখ, এই তার সঙ্গী, তার ছেলে-খেলায় এরাই যেন তার সাথী।

(৩)

কিন্তু সঙ্গীর উপবাস বেশী দিন তাকে সইতে হয় না। দোসর তাঁর জোটে; ভিন্‌গাঁয়ে তার বাড়ী—বাপ-মা-হারা সব-হারানো ছেলে বংশী যেদিন তাদেরই বাড়ীর পাশে, বনের ওপারে পোড়ো বাড়ীটায় এসে আশ্রয় নেয়। এখানে তার মামার বাড়ী বুঝি! বংশী তার নাম নয়, তার নাম রঞ্জন। কিন্তু বাঁশী ছিল তার সাথী, আর বাজাতও সে সুন্দর, তাই নাম তার রঞ্জন হলেও গাঁয়ের লোকে ডাকত "বংশী"।

মামার বাড়ী মামী-মামার বালাই তার ছিল না। তার আসার কিছু আগেই তারা পরপারের যাত্রাপথে চলা সুরু করে দিয়েছিল। তাই বাড়ীতে সে ছিল একা। উৎপলার চেয়ে আরও একা! বাড়ীতে থাকবার ভেতর শুধু তার বুড়ো দাদামশায়ের আমলের একটা বুড়ি-ঝি, বাড়ীর দেখা-শোনা যা-কিছু সেই সব করে।

বয়স বংশীর হয়েছে, তবে যৌবনের সীমা পার হয়ে যায় নি, সে সীমার মাঝে সবে পা দিয়েছে। কাজ কিছু তার ছিল না, তাই অকাজের তার অভাব হোত না। সারাদিন বনে বনে ঘুরে বেড়ান, আর নানা গাছের নানা ফুল কুড়িয়ে কোঁচড়-ভরান, এই ছিল তার দিনের কাজ। তারপর দিনের শেষে যখন গোধূলির ম্লান আলো ধরার বুকে ছড়িয়ে যেত, তখন বনের নেশা তার ছুটে যেত। সারা মন তার পুলকে ভরে যেত, চোখে-মুখে তার কিসের একটা দীপ্তি ফুটে উঠত। নীরবে তার সাধের বাঁশের বাঁশীটা হাতে নিয়ে, সে বাইরে এসে দাঁড়াত, তারপর নদী তীরের সেই পথ আর সেই শীতল হাওয়া, তাকে যেন পথ দেখিয়ে হাত ধরে নিয়ে আসত। নির্জন বনপথ, নীরবে বেয়ে এসে সে সেই বকুলের তলে দাঁড়াত। তারপর তার হাতের বাঁশী বেজে উঠত; ধীরে ধীরে তার আশে-পাশে, জগৎ-সংসার সবই হারিয়ে যেত, সবই মিলিয়ে যেত, জেগে থাকত শুধু বাঁশীর সুর, আর সে সুরের মাঝে আপনহারা সে।

উৎপলা রোজই নদীর ঘাটে আসে, রোজই যায়, বাঁশী শোনে, কেমন যেন ভালো লাগে, ভাবে যাই কিন্তু যায় না, যেতে পারেও না। ওই ত বকুলতলা ঘাটটার ও-পাশে, নদীর ঠিক পারেই, পথটা যেখানে বাঁকের পরে মাঠে নেমে গিয়েছে, ওখানে সে কতদিন গিয়েছে, কত ফুল কুড়িয়েছে, কত মালা গেঁথেছে, তার পর নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছে—ভাবে কিসের বাধা! কিন্তু বাধা ঘোচে না। দু'জনেই দু'জনকে দেখে, মনের ভেতর কি একটা আকাঙ্ক্ষা গুম্‌রে মরে, কিন্তু মাঝের ব্যবধান ঠিকই থাকে—বাধার বাঁধ ভাঙ্গে না। এ যেন দু'টী নদী পাহাড়ের পথে কত খেলাই করেছে, মুখ যেন চেনা-চেনা, তার পর যেই এসেছে প্রান্তরে নেমে, আর অমনি তাদের মাঝে বাধা উঠেছে তার মাথা তুলে। দু'জনেই চলেছে পাশাপাশি—কিন্তু মধ্যে জনপদের ব্যবধান—তাই চেয়ে আছে সেদিনের পানে, কবে সব ভাসিয়ে আবার তারা এক হয়ে যাবে!

সত্যই বাধা তাদের একদিন ভাঙ্গে, প্রাণের জোয়ার এসে তাদের মাঝের ব্যবধান ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিত্যকার মত সেদিনও উৎপলা নদীর ঘাটে বসেছিল—বুক-ভরা কালো জল নিয়ে কাজলা তেমনি বয়ে যাচ্ছে—ওপারের ঈষৎ-ঘন শালবনের ফাঁকে-ফাঁকে অস্তমান সূর্য্যের রাঙা মুখ দেখা যায়—যেন ছবির মত সুন্দর! উৎপলা বসে বসে কি ভাবে, কিসের যেন একটা অভাব তাকে ব্যথা দেয়। তারপর আপন মনেই পথ বেয়ে নেমে আসে সামনের সেই বালুর চরের 'পর। বালুর চর—মাতাল হাওয়া গায়ে তার হাত বুলিয়ে দিয়ে গেছে, বুকে তার কোন্ নিপুণ শিল্পীর হাতের কি এক অজানা লিপি লেখা! উৎপলা চলতে চলতে তারই 'পরে বসে পড়ে। ভ্রমর-কালো চুল তার এলো-মেলো হাওয়ায় উড়তে থাকে, মুখের 'পরে এসে পড়ে, আঁচলখানা বালুর বুকে লুটোপুটি খায়, আর উৎপলা আপন মনেই দু'হাতে সেই বালু দিয়ে স্তূপ গড়ে আবার মুঠো-মুঠো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তারি দিকে চেয়ে থাকে—যেন প্রকৃতির স্নেহশিশু, দেবতার দূত এসেছে শুভাশীষের পশরা নিয়ে নেমে, এই ধরণীর 'পর। হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে যায়, পিছন হতে কে বলে "সন্ধ্যে যে হয়ে এল বাড়ী যাবে না? তোমার নাম কি ভাই?" উৎপলা ফিরে দেখে, এ তার চেনা বকুল তলার সেই—কি ভাবে, তারপর মুখ তুলে বলে "কৈ তোমার বাঁশী কৈ? আজ বুঝি আর বাজাবে না?" বংশী বলে, "কেন তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে?" উৎপলা খানিকক্ষণ নীচু-মুখে বালুর গায়ে হাত বুলায়, তারপর বলে, "হ্যাঁ,

ও বকুলগাছটা আমিও খুব ভালোবাসি।" হঠাৎ কি ভেবে একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসে, "তোমার বুঝি কেউ নেই?" বংশী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "না! কেন?" উৎপলার চোখ-দুটো শুধু ছল-ছল করে ওঠে, কিছু জবাব দেয় না।

(৪)

সেই হতে সুরু। তারপর দিনের পর দিন কেটে যায়, তাদের লজ্জাও চলে যায়। এর আগে যে তারা অজানা ছিল, তা আর বোঝা যায় না। উৎপলা রোজই নদীর ঘাটে যায়, কার পথ চেয়ে থাকে! তারপর বংশী এসে বাঁশী হাতে সেই বকুলতলায় দাঁড়ায়। বকুলগাছের যে ডালটা নদীর দিকে হেলে পড়েছে, সেই ডালটাতে পা ঝুলিয়ে বংশী আপন মনে বাঁশী বাজায়—আর মুগ্ধা উৎপলা তারই তলে বসে বন-লতিকার ডোরে সেই বকুলের মালা গাঁথে। গানের সুরে সব ডুবে যায়, উৎপলার মালা গাঁথা থেমে যায়, বংশীর মুখের দিকে চেয়ে সে বসে থাকে যেন ধ্যানমুগ্ধা। বাঁশী থামিয়ে বংশী বলে, "উৎপলা, ফুল নেই বুঝি?" এ-ডাল ও-ডাল ঘুরে সে নাড়া দেয় শিথিল-বকুল উৎপলার চারিদিকে গায়ে-মাথায় ঝরে পড়ে। ধ্যান তার ভেঙ্গে যায়। ক্রমে আঁধার ঘনিয়ে আসে, বংশী নেমে এসে বলে, "কৈ উৎপলা বাড়ী যাবে না?" উৎপলা তার হাতের মালাগাছটা নীরবে বংশীর সামনে ধরে বলে, "নাও"। বংশী বলে, "না, তুমি নাও"। শেষ পর্য্যন্ত কেউ নেয় না। বংশীর হাতের বাঁশীটার দিকে চেয়ে উৎপলা বলে "দাও"। তারপর পরম-যত্নে সেই কালো বাঁশীটার অঙ্গে, সেই মালা ছড়াটি সে জড়িয়ে দেয়।

দিনগুলি তাদের এমনি করেই যায়। তাদের আসা-যাওয়ায় বন-গাছ-ভরা সেই বকুল-তলাও বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। রোজ সকালে ঘাটের সঙ্গে উৎপলা যখন নদীতে নাইতে আসে, তখন তার তলাটা সে জল দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে দেয়। জ্যোৎস্না-রাতে যখন ধরার অঙ্গন রূপালি আলোয় ভরে যায়, মন্দ-সমীরণে বকুলের শাখে দোলা লাগে, তখনও ওঠবার কথা তাদের মনে থাকে না। শিল্পী রূপরাজ—প্রাণের সাধক, সময় তার মনে থাকে না, মেয়ের কথাও তার মনে থাকে না। হয়ত কখনো মনে পড়ে যায়, ডাকে, "উৎপলা! উৎপলা!" সাড়া পায় না—চারিদিকে চেয়ে দেখে, কি ভাবে, আবার কাজের মাঝে নিবিড় হয়ে ডুবে যায়।

উৎপলার দিন কাটে বেশ! এখন তার বয়স হয়েছে বার কি চৌদ্দ। রূপের প্রভা তার আরো ফুটে উঠেছে, কিন্তু সে শুদ্ধা তাপসীর রূপ! বংশী যেন তার দেবতা, বাঁশীর সুর তার আবাহনী, বকুলের মূল তার মন্দির, আর সে নিজে যেন সেথায় জন্ম-জন্মান্তরের পূজারিণী! এ-পূজা, এ-পরিচয়, এ-তার দু'দিনের নয়; এ পুরাতন, বহু পুরাতন, নূতনের মাঝে নূতন রূপ, তাই নূতন! বংশীর সাথে তার পরিচয় এই মাত্র তিন বৎসরের, কিন্তু মনের পরিচয় যেন তারও কত যুগ আগে, বহু আগে! এই তিন বৎসরে সেই বকুলের তল, সেই মালা-গাঁথা, আর সেই বাঁশীর সুর, যা শুধু কাব্যে পাওয়া যায়, যা শুধুই কবিতা—তাদের জীবনে তা সত্য হয়েই দাঁড়িয়েছে।

বংশী আর উৎপলা—তাদের নিয়ে গ্রামে কত কথাই হয়, লোকে কত কথাই বলে। উৎপলার কানেও যে তা না আসে, তা নয়, কিন্তু যে সীমার বাইরে, তাকে সীমাবদ্ধ ময়লা, মনের ময়লা-কথা ত ছুঁতে পারে না। সেদিন বাড়ীর পথে আসতে এমনি কয়েকটা কথা উৎপলার কানে পৌঁছয়। পথের কথা মনে দাগ না আঁকলেও প্রাণে তার কি হয়—ভেবে ভেবে সে ঠিক করে, বাড়ীর বার আর সে হবে না।

বংশীর সাথে পরিচয়ের পর জীবনে বকুলতলায় যাওয়ার তার এই প্রথম ব্যতিক্রম। তখন বিকালে আকাশের মুখখানা গভীর কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। তারই দিকে চেয়ে, বসে বসে উৎপলা কি

ভাবে। ভেবে ভেবে ভাবের ঘোরে কখন নেমে পড়ে, তারপর বনের সীমা পার হয়ে, বংশীর অঙ্গনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের রোয়াকের একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে সে কি ভাবছিল, উৎপলার পায়ের শব্দে চমকিত হয়ে বিস্মিত চোখে তার পানে চাইলে। তাকে কথা কইবার অবকাশ না দিয়ে উৎপলা তারই কাছে পা দু'টী ঝুলিয়ে বসে পড়ে, বলে, "বাঁশীটা একটু বাজাও না"!

বাঁশের বাঁশী বেজে ওঠে। তারপর আকাশের মুখ আরও কালো হয়ে ওঠে, গাছের শাখায়-শাখায় ঝড়ের দোলা লাগে—কালো আকাশের সজল কালো চোখ হ'তে মুক্তাবিন্দু ঝরতে থাকে। ঝর্-ঝর্-ঝর্—ঝির্-ঝির্-ঝির্ একটা একটানা শব্দ, তার আর বিরাম নেই। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, শুধু চির-মৌন প্রকৃতির মুখর বৃষ্টির গান মনকে যেন কেমন সব ভুলিয়ে দেয়। দেয়ালের গা-বেয়ে গোটা দুই নারিকেল গাছ মন্দ-মন্দ হাওয়ায় বৃষ্টি ধারায় সিক্ত হয়ে দোল খায়। অভিষেকের বারিধারা, আর সবুজ-সবুজ পাতার চামর, মনে হয় এ যেন কার নীরব বন্দনা! উৎপলার পায়ে জলের ছাট্ এসে লাগে—তার খেয়াল থাকে না—সে বুঝতে পারে না। বাঁশীর সুর বৃষ্টি-ধারার সাথে মিশে গিয়ে, জলভরা হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। উৎপলা বিমুগ্ধা! বংশীও তাই! বাঁশীর সুর তাকে যেন আজ পাগল করে দিয়েছে। কখন যে বৃষ্টি থেমে যায় তারা জানতে পারে না। ছিন্ন-মেঘের ফাঁকে নীল আকাশের মুখ আবার দেখা যায়—চাঁদ ওঠে—উঠানের কোলে তার ছায়া পড়ে, তবুও তাদের সুরের ঘুম ভাঙ্গে না। কি একটা পাখীর ডাকে হঠাৎ দু'জনেরই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—দু'জনেই বিস্ময়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে। ধীরে ধীরে উৎপলা উঠে দাঁড়ায়—বংশীর দিকে ফিরে বলে, "যাই"। বংশীর তখনও ঘোর কাটে না—কি উত্তর দেবে সে ভেবে পায় না। সহসা কি ভেবে উৎপলার হাত-দুটো নিজের মুঠোর মাঝে নিয়ে সে ব্যথা-কাতর নয়নে উৎপলার মুখের পানে চেয়ে থাকে। উৎপলা নত হয়ে আঁচল-মূলে বংশীর পদধূলি তুলে মাথায় নেয়, তারপর বংশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কি জানি কেন তার কালো নয়ন হ'তে ফোঁটা-দুই জল টপ্-টপ্ করে ঝরে পড়ে। সে আর দাঁড়ায় না—তাড়াতাড়ি উঠানে নেমে পড়ে।

পরের দিন রূপরাজ তখন কাজে মগ্ন—হঠাৎ দ্বার খুলে কে একজন ভিতরে প্রবেশ করে। রূপরাজ চমকিত হয়ে চেয়ে দেখে। তারপর কথা আরম্ভ হয়। শুনতে শুনতে তার মুখে যেন কেমন একটা বেদনার আভাষ ফুটে ওঠে। আগন্তুককে কিছু উত্তর না দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে এসে দু'হাতে মাথাটা ধরে সে বসে পড়ে। সে সইতে পারে না—আগন্তুককে ইসারায় চলে যেতে বলে। তারই কন্যার সম্বন্ধে এই অযাচিত উপদেশ। উৎপলা! না তাকে ত সে শাসন করতে পারবে না। উৎপলাকে শাসন, সে ভাবতেও পারে না। আহা!—সে যে মাতৃহারা! প্রাণের আবেগে ডাকে, "উৎপলা! উৎপলা!" সাড়া মেলে না। সহসা মুখে তার আর একটা কিসের চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে ঠিক করে—না—উৎপলাকে শাসনই করতে হবে!

বংশীকে সে চিনত—তাকে সে ভালো বলেই জানত। রূপরাজ তারই বাড়ীর সামনে এসে মেয়ের নাম ধরে ডাকতে থাকে, সেখানেও উত্তর মেলে না। বাড়ীখানা শূন্য খাঁ-খাঁ করছে। রূপরাজ দাঁড়িয়ে ডাকে, আবার ডাকে—হঠাৎ বুড়ী-ঝিটা কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের ওপর পড়ে, বলে—"বাবুগো, ছোঁড়াটাকে আজ সকালে ধরে নিয়ে গেছে।" রূপরাজ কোন মতে তাকে শান্ত ক'রে যা শোনে, তাতে বংশীর প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। কাল রাতে কাছেই একটা গাঁয়ে একটা অসুখের কথা শুনে সে বার হয়ে যায়। এমনি যাওয়া তার নূতন নয়। পথে ঝোপের পাশে আধো-অন্ধকারে হঠাৎ একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনে সে যায় ছুটে। সেখানে এক

অসহায়াকে রক্ষা করতে শেষে তাকে লাঠি ধরতে হয়। একটু জখমও হয়, আর সকলে পালিয়ে যায়। রমণীকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ভোর রাতে সে বাড়ী এসে পৌঁছয়। তারপর সকালেই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। রূপরাজের মন বংশীর প্রতি করুণায় ভরে ওঠে। উৎপলাকে খুঁজতে খুঁজতে রূপরাজ নদীর ঘাটে আসে। ঘাট শূন্য—সে চারিদিক চেয়ে দেখে, তারপর চোখ পড়ে সেই বকুলতলায়। উৎপলা ব'সে—তার অলকদাম খুলে পড়েছে—মাথাটা গাছের গোড়ায় ঢলে পড়েছে, আর দুই চোখ দিয়ে ঝর্-ঝর্ করে জল ঝরে পড়ছে। রূপরাজ বোঝে উৎপলা বংশীর কথা শুনেছে। মেয়েকে শাসন করা তার আর হয় না। নীরবে হাতের পাশে চোখ দু'টা পুঁছে—আবার ঘরে ফিরে যায়।

জগতের নিয়মই এই, যে একা, তার ঠেকা সব ঠাঁই। তাই বংশীর কপালে শেষ পর্য্যন্ত তার সৎসাহসের জন্য কারাবাসেরই আদেশ হয়। বিনা বাধায় টাকা আর মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে, তার অপরাধ প্রমাণ হয়ে যায়। রূপরাজ, আর তার আরও ক'জন হিতৈষী অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সফলকাম হয় না। রাজার অতিথিশালার দ্বার তার কাছে খুলে যায়—দীর্ঘ দশটা বছর ধরে, তা আর কেউ ঠেকাতে পারে না। বিচারালয়ের আদেশ নিয়ে রূপরাজ তার সাথে মাঝে মাঝে দেখা করে, কিন্তু বংশীর মুখে কথা ফোটে না, শুধু চোখের দু'পাশ বয়ে কোঁটা-কয়েক জল গড়িয়ে পড়ে।

(৫)

এই ধরণীর পান্থশালায়, কত পথিক আসে যায়, কেউ তার হিসাব রাখে না! তাদের অভাব কা'র বুকে বড় একটা বাজে না। বংশী আজ নেই। দিনের গতি তেমনি সচ্ছন্দভাবেই চলে—তার কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না। কিন্তু এ অভাব সবার মাঝে একজনকে বেশ ভালভাবেই আঘাত করে—উৎপলার বুকে এ ব্যথা ভীষণভাবেই বাজে। সব কেমন তার বদল হয়ে যায়! আগেকার সে উদাস ভাব তার আরও উদাস হয়ে ওঠে; উজল তার রূপের প্রভা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে, শুধু কাজেরই মাত্রা তার বেড়ে যায়।

সেই বকুলতলা! সেই নদীতীর! বংশী আর সেথা আসে না, তার বাঁশীও আর বাজে না। উৎপলার প্রাণের বাঁশীও যেন আর বাজে না। প্রভাতে সেথা সে যায়, সেই বকুলের মূল অনেকক্ষণ ধরে তুলসী-তলার মত পরম ভক্তিভরে পরিষ্কার করে দিয়ে আসে। দুপুরে যায় বনের পথ হয়ে বংশীর সেই ঘরে। বুড়ী-ঝিটা মারা গেছে। উৎপলা আপন মনে ঘরের মাঝে ভাঙ্গা-চোরা যা কিছু আছে, সমস্ত পরিষ্কার করে, ধূলা ঝাড়ে, চারিদিক মার্জ্জনা করে। বংশীর ফেলে-যাওয়া সেই কালো বাঁশীটাকে হাতে তুলে নেয়। কি ভাবে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, নিজের আঁচল দিয়ে বার বার তার ধূলা ঝেড়ে-মুছে একবার পরম ভক্তিভরে মাথায় ঠেকায়। তারপর তুলে রাখে উঁচু জায়গায়, নিরাপদ স্থানে। নীরব-সন্ধ্যায় আঁচলের আড়ালে সন্ধ্যা-প্রদীপ ঢেকে নিয়ে বনপথ ধরে সেই বকুলতলায় আসে। সেখানে সন্ধ্যা দেখায়, তারপর গলায় আঁচল দিয়ে, কি জানি কার উদ্দেশে, নত হয়ে প্রণাম করে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গিয়ে বছর ঘুরে যায়; বংশীহীন উৎপলার জীবনের পাঁচটা বছর অতীত হয়ে যায়। বংশীর কারাবাসের অর্দ্ধেক দিন ফুরিয়ে যায়, কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে উৎপলার কারাজীবনের প্রায় শেষ হয়ে আসে। দেহ তার ভেঙ্গে পড়ে, হঠাৎ চেনা যায় না। ক্রমে চলবার শক্তিও তার আর কুলায় না। তবু মরে-মরেও একবার করে তার জীবন-তীর্থ সেই বকুল তলায় সে যায়। বেশী দিন পারে না। একেবারে শয্যার কোলে ঢলে পড়ে। ওঠবার সামর্থ্যও তার আর থাকে না। শুধু চোখ-দু'টো রাতদিন জলে ভেসে যায়!

রূপরাজ তার সব কাজ ছেড়ে দেয়। মেয়ের

অবস্থা দেখে বুক তার ফেটে যায়। সারাদিন, সারারাত্রি তারই মুখের দিকে চেয়ে শিয়রে বসে থাকে। মাঝে মাঝে শুধু আকুল-কণ্ঠে ডাকে "উৎপলা! উৎপলা! মা আমার!" উৎপলা উত্তর দেয় না, শুধু বাপের শীতল হাত দু'খানা নিয়ে আপন মাথার 'পরে রাখে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারে, জীবনের দীপ তার নিভে এসেছে। তাই একদিন চোখের জলের মাঝে বাপকে তার শেষের সাধ জানায়। বলে—"তারা জানে তাদের শশ্মান কত পবিত্র, তার আদর্শ কত উচ্চ, কত মহান্ তাও সে জানে, আর স্বীকারও করে, কিন্তু তাতে তার আস্থা নেই—সেখানে তার আত্মা শান্তি পাবে না। তার চেয়ে বরং তাকে যেন কাজলা-তীরের সেই বকুল তলায় সমাধি দিয়ে, তার বুকে তার নিজের হাতে নিজের নাম লেখা সেই পাথরখানি বসিয়ে দেওয়া হয়।" বিস্মিত রূপরাজ তার শীর্ণ চির-নীরব মেয়েটীর মুখের দিকে চেয়ে শুধু ভাবে, উৎপলা আজ এত মুখর কেমন করে হ'ল?

(৬)

চারিদিকে সু-উচ্চ কারা-প্রাচীর। তারই ভিতরে একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে নীরবে বংশীর দিন কাটে।

বাইরের জগৎ হতে সে বিচ্ছিন্ন—তার সঙ্গে তার আর একটু কোথাও কোন যোগ নেই। প্রথমটা সে মানুষের চরিত্রের ওপর নিতান্ত সন্দিহান্ হয়ে পড়ে—সকল বিশ্বাস সে হারায়। তাতে বুকে তার ব্যথাও যে না বাজে, তা নয়, কিন্তু পরে সবই মুছে যায়। সারা জীবনের ইতিহাস সে নীরবে নিজের মনের-চোখ দিয়ে পাঠ করে, গভীর ভাবে আলোচনা করে দেখে, কিন্তু বিশেষ কিছু তার চোখে পড়ে না। সব ঝাপ্সা—সব অন্ধকার, শুধু উৎপলার মুখই তার মাঝে ফুটে উঠে সুস্পষ্টরূপে। উৎপলা বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে সে তার খবর পেত, তারপর এই কয়বৎসর আর কিছু শোনে নি। উৎপলার মুখ তার প্রাণে গাঁথা হয়ে গেছে—তাই চেষ্টা করেও সে তাকে ভুলতে পারে না।

উচ্চ প্রাচীরের অনেক উচ্চে, লোহার-শিক্ পোতা একটু ফাঁক—তারই মাঝ দিয়ে বাইরের নীল আকাশের মুখ একটু দেখা যায়—বাইরের একটু হাওয়া, দূরের ফোটা ফুলের একটু গন্ধ, তারই ফাঁক দিয়ে বংশীর কাছে এসে পৌঁছয়। যখন বাইরে বৃষ্টির ধারা নামে—আকুল আগ্রহে তারই দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সব মুছে যায়—তারপর অন্ধকারের মাঝ হ'তে একখানা আবছা-ছবি ফুটে ওঠে, ক্রমে সে ছবি স্পষ্ট হয়। এ-ছবি বংশীর পরিচিত, এ-তার প্রাণের তুলিতে, মনের রঙে আঁকা! তবু সে চোখ মুছে চেয়ে দেখে—এ সেই কাজলার তীর, সেই বকুলের তল—তার ছবি! নীরব সন্ধ্যা, চারিদিকে আধো-অন্ধকারে ভরে গেছে—ডালের উপর পা রেখে সে বাঁশী বাজাচ্ছে, আর তারই তলে বসে আছে উৎপলা! আঁচল-ভরা ফুল, আশে-পাশে তার ঝরা-বকুল, হাতের মালা তার গাঁথা শেষ হয়ে গেছে। বেদনায় বংশীর বুক টন্-টন্ করে ওঠে!

ক্রমে গোনা দিনগুলো তার ফুরিয়ে যায়। তার মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসে। তার দশ বছরের দীর্ঘ কারাবাসের শেষ হয় সেদিন সে মুক্তি পাবে। আবার সে সেই পরিচিত পৃথিবীর মুখ দেখতে পাবে—বাইরের সে আলোক, সে লোক, আবার সবই সে পাবে! কিন্তু মনে ত সে আনন্দ পায় না—কোন উৎসাহই তার কই আসে না ত?—কেন?—পা দুটো নড়তে চায় না—তবু জোর করে তাদের টেনে নিয়ে সে এগিয়ে চলে।

দশ বছরের ফেলে-আসা সেই গ্রাম—তার সেই কাজলার তীর, সেই বকুলতলা আবার তার কাছে ক্রমেই এগিয়ে আসে। কিন্তু মন তার যেন কেমন করতে থাকে। পরিষ্কার দিন, মাথার ওপর সুনীল আকাশ, ডাইনে-বাঁয়ে সবুজ মাঠ। সেই পাখীর ডাক—গ্রামের সেই মন-ভোলান মধুর রূপ, সবই যেন তার মনে কি একটা ব্যথা জাগিয়ে তোলে। চলতে যেন সে আর পারে না, কেন যে, সে নিজেও তা

বুঝতে পারে না। তারপরে গাঁয়ের ভেতর এসে পড়ে।

এই সেই গ্রাম! দশ বছর আগে এমনি একদিন—প্রথম সে এ-গাঁয়ে আসে, সেই কথা তার মনে পড়ে। এখন তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার পরিচিত সে সব বাড়ী-ঘর বড়-একটা আর নেই। লোকজনও কেউ আর তাকে চিনতে পারে না। দু'একজন, যারা আগে তাকে দেখেছিল, চিনত, তারাও প্রায় তাকে ভুলেই গেছে। তার মাথার চুল রুক্ষ, পরিধেয় ছিন্ন-মলিন, বাস্তবিক তাকে চেনাও আর যায় না!

বিস্মিত চোখে চারিদিকে চাইতে চাইতে উৎপলার বাড়ীর উঠানে এসে সে দাঁড়ায়। শূন্য বাড়ী সাড়া-শব্দ কিছু নেই—যেন খাঁ-খাঁ করছে। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দেখে, কারও সন্ধান মেলে না। মনে তার কত কথাই আসে, বার-কতক সমস্ত শক্তি দিয়ে উৎপলার নাম ধরে ডাকে, উত্তর পায় না—শুধু প্রতিধ্বনি, বাজের মত ফিরে এসে তার বুকে বাজে। মাথাটা ঘুরতে থাকে, পা দু'টা টলতে থাকে। মাতালের মত টলতে-টলতে সে বাইরে যেতে চেষ্টা করে, পারে না—উঠানের সেই ধূলার 'পরেই মাথাটা দু'হাতে চেপে সে বসে পড়ে। অতীত জীবনের একখানা ছবি তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়, সে সইতে পারে না। চোখ দিয়ে তার হুহু করে জল ঝরে। হঠাৎ কার ডাকে চমকে উঠে ফিরে দেখে···কে!—সে উৎপলাও নয় আর রূপরাজও নয়, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বৃদ্ধ!

তারই মুখে সে উৎপলার আর রূপরাজের কথা সব শোনে। মেয়ের শোকে রূপরাজ নাকি পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। রূপরাজের যাওয়ার পর হতে এই বৃদ্ধ, এই বাড়ীতেই বাস করছে। রূপরাজের মুখে বৃদ্ধ বোধ হয় তাদের সব কথাই শুনে থাকবে! বংশীর ওই মুখ আর তার চোখের জল দেখে, সে তাকে চিনতে পারে। তাই তাকে থাকবার জন্য সে অনুরোধ করে।

বংশী উঠে পড়ে। ঘুরতে-ঘুরতে এসে দাঁড়ায় তার নিজের বাড়ীর পাশে। সে বাড়ী আর নেই। খোড়ো-চাল তার ভেঙ্গে পড়েছে, মাটীর দেওয়াল তাও ধ্বসে গিয়েছে। উঠান ঘাস আর আগাছায় ভরা—তার মাঝে একটা গরু বাঁধা। নূতন লোক দেখে গরুটা একবার মুখ তুলে চায়। বংশী উঠান পার হয়ে যেখানে তার ঘরের রোয়াক ছিল, সেখানে দাঁড়ায়, কি ভাবে, তার মনে পড়ে, ধরা পড়ার আগের দিন এই রোয়াকে বসে সে বাঁশী বাজিয়েছিল—এইখানেই উৎপলা সেদিন তার পায়ের ধূলো নিয়ে তার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে গেছে। সে রোয়াক আজ নেই. উঠানের সাথে সব সমান হয়ে গেছে। ঘরের ভিতর শুধনো পাতার বন। ওপরে চাল নেই, দেওয়ালগুলো শুধু কোনমতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বংশী চারিদিক চেয়ে দেখে—কি ভাবে! তারপর সেই পাতায়-ভরা মেঝের ওপরেই বসে পড়ে। হঠাৎ পাতার ঘরের এক কোনে তার হাত-বাক্সটার দিকে তার চোখ পড়ে। সেটাকে তুলে নিয়ে কোলে রেখে খুলে দেখে, একরাশ শুখনো-বকুল, আর তার মাঝে তার বড় সাধের সেই কালো বাঁশীটা! সেই ঝরা-ফুলের মাঝে সে উৎপলার হাতের সুবাস পায়—সেগুলো মাথায় ঠেকায়, তারপর বাঁশীটা হাতে নিয়ে উঠান পার হয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে।

সেই নদী তীর—সেই কাজলা! এখন তার আর সে রূপ নেই। কূলে কূলে ভরা—এখন তার এপারে ভাঙ্গন। ধীরে ধীরে এসে সেই বকুলতলায় দাঁড়ায়—সেখানে আগাছায় ভরে গেছে। যেখানে উৎপলা বসে মালা গাঁথত, সেইখানেই তার শেষ-শয্যা রচিত হয়েছে। রূপরাজ তার সমস্ত দিয়ে তার ওপরে সাদা পাথরের ধব-ধবে বেদী তৈরী করে দিয়েছে। তার মাঝখানে উৎপলার নিজের হাতে লেখা তার নাম। ঝরা-বকুলে সে পাষাণ বেদী ভরে রয়েছে!

বংশী সমস্ত নীরব-দুপুর নীরবে সেই নিস্তব্ধ নদী তীরে বসে থাকে। দুপুরের সমস্ত রোদ্দুর তার

মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। বেলা যায়, ছায়া পড়ে, সে স্থিরভাবে সেইখানে ঠিক তেমনি ভাবেই বসে থাকে। সেই বৃদ্ধ খুঁজে খুঁজে তার কাছে আসে—তাকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে কত অনুরোধ করে, কিন্তু বংশী ওঠে না। সে শুধু হেসে ওঠে, তারপর নিজের মনেই বাঁশী বাজায় সারা রাত ধ'রে। একদিন, দু'দিন করে চারমাস কেটে যায়—বংশী সে বকুলতলা ছেড়ে আর কোথাও যায় না। সমস্ত দিন সেই বেদীর উপর মাথা রেখে বসে থাকে—কখনও বা আপন মনে হেসেই উঠে—নিজের মনে চুপি-চুপি কত কথাই কয়। তারপর সারা রাত জেগে বাঁশী বাজায়। গাঁয়ের লোকে যারা জানে না, তারা বলে, "পাগল"—শুধু সেই বৃদ্ধ, বংশীর ব্যথা জানে—বোঝে। সে প্রতিদিন সেই বকুলতলায় কিছু আহার্য্য তাকে দিয়ে যায়। বংশী কোনদিন খায়, আবার কোনদিন হয়ত পড়েই থাকে, ছোঁয়ও না। এমনি করেই দিন যায়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের লোকে সকলেই বলে, আগের রাতে শেষরাত পর্য্যন্ত সকলেই তার বাঁশীর শব্দ শুনেছে। বৃদ্ধ লোক-জন নিয়ে তার খোঁজ করে, কিন্তু কোথায়ও তার দেখা মেলে না। অবশেষে সেই বকুলতলায় এসে তারা দেখে বকুলতলা শূন্য, বংশী নেই, শুধু ঝরা-ফুলে-ভরা সেই বেদীর ওপর পড়ে আছে তার বড় সাধের কালো বাঁশীটা। সেই থেকে গাঁয়ের লোকে সেই বকুলের নাম রাখে, "বংশী-বকুল"।

* * * *
* * * *

তারপর কত বছর গিয়েছে—শান্ত কাজলার অশান্ত জল আবার শান্ত হয়েছে। বকুলতলা হতে এখন জল তার নেমে গিয়েছে। বংশীর কথা গাঁয়ের লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছে। সে বৃদ্ধও মরে গিয়েছে। রূপ-রাজের সে কুটীর আজ নেই—সেখানে এখন ধান-ক্ষেত, তাতে ফসল ফলেছে, কিন্তু সে বকুলতলা আজও ঠিক তেমনি আছে। তার পাশ দিয়ে এখন রাস্তা চলেছে। কত পথিক আসে যায়—কেহ বা বকুলের ছায়ায় সে পাষাণ বেদীর ওপরে বসে সে নাম পড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। এর ইতিহাস তারা কেউই জানে না। রূপরাজ আজ নেই, উৎপলাও নেই, বংশীর কথাও কেউ জানে না, কিন্তু তাদের মৌন প্রেমের নীরব সাক্ষী সেই "বংশী-বকুল" উৎপলার সমাধি কোলে নিয়ে আজও তেমনি বেঁচে আছে। আজও প্রভাতের শিশির আর ঝরা-বকুল সেই পাষাণ বেদীর 'পরে তেমনি ঝ'রে পড়ে। ভোরের বেলা তেমনি পাখীদের সভা বসে, আজও তেমনি মেঘেরা আসে যায়, ছায়া ফেলে, আজও তেমনি কালো আকাশ কেঁদে কেঁদে সেই পাষাণ বেদী ধুইয়ে দিয়ে যায়!



স্বপ্ন ও কল্পনা

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

রজনীতে কাল চাঁদ জেগেছিল মোর খোলা বাতায়নে—
হেনার গন্ধ এসেছিল ভেসে মন্দ পবন সনে।
একা একা আমি শয্যায় শুয়ে জ্যোৎস্না পরশ পেয়ে,
আপনার মনে আনমনা হোয়ে উঠেছিনু গান গেয়ে।
ওগো প্রিয়তমা! সে গানের সুর বুঝিবা তোমার কানে
গিয়েছিল ভেসে সুরে বাঁধা ঐ তোমার স্বর্গ পানে।
স্তব্ধ চরণে কখন আসিয়া ব'সেছিলে মোর পাশে,
লুটাইয়াছিলে অঙ্গ মাধুরী বাসর-বিছানা-বাসে।
টের পাই নাই সেই কথাটুকু বিভোর ছিনু যে গানে,
ফিরে গেলে তাই নীরবে আবার দুর্জ্জয় অভিমানে।
দুয়ারের পাশে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আবার আসিলে ফিরে,
আঁখি দু'টি মোর ডুবে গেছে যবে ঘুমের সাগর নীরে।
গালে গাল রেখে শুয়েছিলে সুখে তুমি মোর পাশে এসে,
উপাধানটুকু দিয়েছিলে ঢেকে ঘন কালো তব কেশে।
বেঁধেছিলে মোরে বাহু দিয়ে তব নিবিড় আলিঙ্গনে
ভ'রেছিলে প্রিয়ে অধর আমার চুম্বনে চুম্বনে।
ঘুম ভেঙে যেতে দেখি তুমি নাই, আছে শুধু চাঁদ জেগে,
হেনার গন্ধ ফিরিছে বাতাসে তোমার সঙ্গ মেগে।
মনে হোল মোর ও-ত নহে চাঁদ, ও-নহে হেনার গন্ধ,
তোমারি অঙ্গ সুরভিত ও-যে দেহের পুলক ছন্দ!

রাতের ফুল

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

রজনীর শেষ কথা

বিশুর মা এসেছিল দুধ নিয়ে। আর ভাল লাগে না ছাই!

আমি বালিসে মুখ গুঁজড়ে বললুম, দুধ এখন ঢাকা দিয়ে রেখে দাও গে, খেতে ইচ্ছে নেই।

রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল, সেটা ঘুম কিম্বা ইন্‌জেক্‌শনের দরুণ আচ্ছন্ন ভাবও হতে পারে।

সকালবেলা চোখ খুলতেই দেখি উনি আমার পাশে বসে। আমার গায়ে হাত দিয়ে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ রোজি? রাত্তিরে তো বেশ ঘুমিয়েছিলে, আমি দু'বার এসে দেখে গেছি।

সে ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে আমি রোজকার মত 'ভাল আছি' বলতে পারলুম না, কেমন করে বলি গো? ভাল আলা হয়েছে! ওঁর কিন্তু··· এমন রাগ হচ্ছিল আমার নিজের ওপর! কোথায় আশা করেছিলুম রোগের অবসাদ, সারারাত অনাহার, অতিরিক্ত দুর্ব্বলতায় হয়তো রাতারাতি হার্ট-ফেল করবে, কিম্বা অতটা না হলেও, অন্ততঃ অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকব, তা নয়, দিব্যি টন্-টনে জ্ঞান নিয়ে আবার 'ভাল আছি' বলতে হবে!

একেই ত ভাল থাকা বলে!

কি অধর্ম্মের ভোগ আমার!

আমার নীরবতায় উনি হাতখানা সরিয়ে নিয়ে একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা হলে আজও যেতে পারবে না—অ্যাঁ? কিন্তু····· কি গভীর হতাশা, তাঁর কথার সুরে!

হ্যাঁ, পারবো বই কি?

আমি উত্তেজনার ঝোঁকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম। গা ঝিম্-ঝিম্ করছিল, মাথা ঘুরছিল, তবু জোর করে উঠে, সমস্ত গ্লানি অবসাদ জোর করে ঝেড়ে ফেলে বললুম, না পারলে 'তো চলবে না, আজ যে যেতেই হবে! খুব পারবো, চল!

আমার মুখের পানে তাকিয়ে উনি একটু থতমত খেয়ে বললেন—না, তা কেন? তোমার যদি কষ্ট হয় যেতে, তা'হলে·····ঐ যে গাড়ী রিজার্ভ করা হয়ে গেছে কি না— সেই হয়েছে মুস্কিল, তবে নেহাৎ যদি না পারো—

কেন পারবো না? খুব পারবো! খুব পারবো!

কথাটা বলতে বলতে আমি খাট থেকে নাবছিলুম, উনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন — উঠনা, উঠনা— আহা! অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখনো ঢের সময় আছে। বেশ ধীরে-সুস্থে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে বেরোলেই হবে, যা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ, ভয় করে, এতখানি পথ, কি ক'রে যে ··· শেষ কি ···

—কিসের ভয়? আমার আর কিছু হবে না,— এততেও কিছু হল না যখন···

কথাটার মর্ম্ম যেন একেবারেই বোঝেন নি, এমনি ভাবে—তা'হলে শম্ভুর মাকে পাঠিয়ে দিই গে, এই বেলা হাত-মুখ ধুয়ে তুমি 'এগ-ফ্লিপ্'টা আগে খেয়ে নাও, তারপর, বলতে বলতে উনি চলে গেলেন, শম্ভুর মাকে ডেকে দিতে কি? না, পাশ কাটাবার জন্যে—আমি কি এতটুকুও বুঝি না? আমায় কি মনে করেন ·····

বাস্তবিক আমারও কিছুই হ'ল না, কোনো বাধাই আর পড়ল না। বেশ চলে এলাম।

আবার সেই কলকাতায়, সেই আমার ভ্রষ্ট স্বর্গে

ফিরে যেতে হ'ল। অনধিকার প্রবেশের দুঃসহ লজ্জা, বেদনা ও ক্ষোভ নিয়ে, আজ যেন আমি কত অপরাধী!

সঙ্কোচে নেমে-পড়া চোখের পাতা দু'খানি জোর ক'রে তুলে দেখলুম, ওঁর সে প্রফুল্লতা আর নেই, মুখে-চোখে, কেমন যেন উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন ভাব, কেন? উনি একলা ফিরতে পারলেই বেশ ভাল হ'ত না?···

হায়-রে! মানুষের মৃত্যু যদি নিজের ইচ্ছাধীন হ'ত?

জিনিষ-পত্র তখনো সব খোলা হয় নি। স্নান করে এসে দেখি, উনি বেরোবার জন্য প্রস্তুত! এসে পর্য্যন্তই ছট্-ফট্ করছিলেন—সম্ভব হ'লে হয়তো ষ্টেশন থেকেই সোজা চলে যেতেন। আমি বাধা দেব না মনে করেও হঠাৎ বলে ফেললুম—তুমি কি বেরোচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ, কেন?

—এত বেলায় একেবারে খেয়ে-দেয়ে বেরুলেই তো···

—খাব অখন —এত তাড়া কিসের?

না তাড়া কেন? যত তাড়া তোমার—লিলির—

উদ্যত-রসনা সংযত করে আমি চলে এলুম।

খানিক বাদেই শুনলুম শম্ভুর মা বলছে—ঘর ঝাড়া এখন থাক্ না শঙ্কর! বাবু ঘুমুচ্ছেন—

ঘুমুচ্ছেন! তবে কি উনি এখনো যান নি? কথাটা বিশ্বাস হল না, তাই চুপি-চুপি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলুম, উনি ড্রয়িং-রুমে সোফার ওপর চোখ বুজিয়ে শুয়ে, হয়তো সত্যিই ঘুমিয়েছেন।

রিজার্ভ-গাড়ীতে এলেও পথে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে বই কি? মনে-মনে যেখানে এত ডাকা-ডাকি, সেখানে কি আর ঘুম আসে গা!

পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, উনি ডাকলেন —শোনো!

ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলুম,

—কই? তুমি গেলে না?

—কোথায়?

গা জ্বলে গেল! সে জ্বাকামোর কথা শুনে, ইচ্ছা হ'ল বলি, যেখানে যাবার জন্যে প্রাণটা ছট্-ফট্ করছে!

কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললুম,

—তা' কি করে বলব? তখন তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছিলে তাই।

—যাচ্ছিলুম তো! কিন্তু·····আঃ! যাবার কি জো আছে ছাই?

আবার! আবার সেই প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তরে এতদিন আমি চুপ করেই থেকেছি, কিন্তু আজ আর তা হবে না, ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে একটা স্পষ্টাস্পষ্টি করে নেওয়া দরকার —কিন্তু কি বলি? কেমন করে বলি!

আমার মুখের পানে চেয়ে উনি যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন···

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো! পথে তো তেমন কষ্ট কিছু হয়নি? কেবল গরমের জন্যে·····

বাইরে মোটরের হর্ন্ বেজে উঠ্‌ল তীব্র শব্দে, সে শব্দ আমাদের 'কারে'র নয়। কে এলো?

উনি সচকিত হয়ে শশব্যস্তে উঠে সার্টটা গায়ে দিতে-দিতেই বেরিয়ে গেলেন, দেখতে।

কে আস্‌বে আবার? সেই···না এসে কি থাকতে পারে গা?

এ যে প্রাণের টান! এখন তো আর সঙ্কোচ করবার কিছু নেই! এখন তো রাস্তা খোলসা!

আমি অভ্যাগতার জন্য ড্রয়িং-রুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে পালিয়ে এলুম, কৌতূহল হচ্ছিল দেখবার জন্যে খুবই, কিন্তু সাহস হ'ল না, কি জানি মানুষের মন, যদি সহ্য করতে না পারি!

অচিরে সাম্‌নের করাইডারে হিল্ দেওয়া জুতোর খুট্-খুট্ শব্দ এবং মেয়েলী-গলার শব্দ শোনা গেল। করাইডারের ওধারে ড্রয়িং-রুম, এ-ধারে আমার শয়ন ঘর।

আড়াল থেকে শুধু একবারটী দেখব বলে আমি সেদিককার দরজার কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক, দরজার পর্দা তুলে একেবারে আমার সাম্‌নে, এ কি? এ যে মাসিমা!

আমার দিকে তাকিয়ে মাসিমা থম্‌কে বলে উঠ্‌লেন, আরে! রজনী যে!—তবে না শুনলুম···হ্যাঁ, খোকোন?

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি শশব্যস্তে,

—ও ঘরে না, মাসিমা! রজনীর শরীর বড় খারাপ। এদিকে ড্রয়িং-রুমে আসুন!

বলে, মাসিমার হাত ধ'রে প্রায় টেনেই নিয়ে গেলেন।

আমি স্তম্ভিত, হতবাক্! এ বাড়ীতে আমার আসা পর্য্যন্ত মাসিমা একদিনও পদার্পণ করেন নি, তবু তাঁর আজকের আসাটা তেমন বিস্ময়কর নয়, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তিনি এমন কি শুনেছেন, যাতে আমায় দেখামাত্র চম্‌কে উঠলেন?

—আমার মৃত্যু? না পরিবর্জ্জন?

জানবার জন্য মন তখন এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে আমাকে বাধ্য হয়ে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হল।

বিমূঢ়-ভাব কাটিয়ে আস্তে আস্তে আমি করাইডারে এসে দেখলুম ড্রয়িং-রুমের এ ধারের দরজা ভেজানো রয়েছে আল্‌গা ভাবে, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে কতক কতক।

আমি ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মত কম্পিত চরণে, স্পন্দমান-বক্ষে সেই দরজার কাছে গিয়ে কাণ পেতে শুন্‌লুম—

মাসিমা চাপা-গলায় বলছেন, "এঃ! তুমি যে এত বোকা ছেলে বাবা, তা জানতুম না! কোথায় মনে করছি যে, একেবারে আপদ বিদেয় করে আসবে তা' নয়! সত্যি, এদ্দিনেও একটা হেস্ত-নেস্ত করতে পারলে না? তবে আর·····"

উনি এ কথার উত্তরে আরো আস্তে, মৃদু-কুণ্ঠিত-স্বরে বললেন, "এ-কি আর অমনি বললেই পারা যায় মাসিমা? মানুষের প্রাণ তো? ও যে-রকম কাতর হয়ে পড়েছে·····

আহা! কাতর সেই কি হয় নি? দেখলে বুঝতে বেচারী কি করে যে দিন কাটাচ্ছে, সুধাতা সেদিন দেখে এসে কত দুঃখ করছিল। যাক্, এখন কি-রকম ব্যবস্থা করা যায় বল তো?

কি জানি মাসিমা! আমার তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, এ-যে কি বিষম সমস্যা···এত ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারছি না।

তা'তো বটেই, আচ্ছা, পুরীতে তোমাদের একখানা বাড়ী আছে না! ওকে যদি সেখানে···

তা স্বচ্ছন্দে হতে পারে, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জী যে চান ওর সঙ্গে আমি এতটুকু কোন সংশ্রবও না রাখি, সেই হয়েছে মুস্কিল!

তা'হলে একটা কাজ করলে হয় না?

কি?·····

এর পরে ওঁরা এত আস্তে কথা বলতে লাগলেন যে, কিছুই বোঝা গেল না। বোঝাবুঝির দরকারও ছিল না আর, যা শুনলুম, তাই যথেষ্ট!

আমার মাথা ঘুরে উঠ্‌ল, গা কাঁপতে লাগল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এবার বন্ধ হ'য়ে যায় বুঝি! কোনো-মতে সাম্‌লে নিয়ে টল্‌তে-টল্‌তে এসে, আমি বিছানায় শুয়ে পড়লুম উপুড় হয়ে, আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো তখন অবশ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল, যেন মূর্চ্ছাহতের মত।

—বউরাণী! ঘুমুলে নাকি গা?

কতক্ষণ পরে কি জানি, শম্ভুর মা'র ডাকে সেই মূর্চ্ছাপন্ন-ভাব থেকে জেগে আস্তে-আস্তে পাশ ফিরে শুয়ে বললুম—

—না!

—তা'হলে ওঠো, ঠাকুর ভাত দিয়েছে যে?

—উনি···

—বাবু তো মাসিমার সঙ্গে গেছেন, মাসিমার বাড়ীতেই খাবেন, বল্‌লেন ওনার জন্যে অপেক্ষা না করতে।

—তা হলে তোমরা খেয়ে নাওগে, আমার ক্ষিদে নেই।

—ওমা! সে কি কথা? কাল থেকে পেটে অন্ন পড়েনি, আর কিছু না হোক্ দু'টী মাছের-ঝোল ভাত···

—না!

—তা'হলে ফল-টল কিছু…

—থাক্, আমাকে বিরক্ত করো না শঙ্কর মা! শরীরটা বড় খারাপ লাগছে—

—শরীরের অপরাধ কি? এমন করে না খেয়ে শুকিয়ে থাক্‌লে, শরীর থাকে কি করে মা?

দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকালও যায়, ওঁর এখনো দেখা নেই! আজ ষড়যন্ত্রটা ভাল মতেই হচ্ছে আর কি? একটা অসহায়া অবলার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে…কিন্তু কিছুই করতে হবে না গো! সে আপনিই সরে যাবে, তোমাদের সুখের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে। বাস্তবিক আর দেরী করা চল্‌বে না, আজই, নিশুতি গভীর রাতে, যে-দিকে দু'চক্ষু যায়…কিন্তু ওঁকে ছেড়ে… না, না, সে আমি পারব না গো! ওঁকে ছেড়ে প্রাণ থাক্‌তে আমি—

শঙ্কর এসে বললে—মা, বাবু মোটর চেয়ে পাঠিয়েছেন, আর বলেছেন, তাঁর আস্‌তে রাত হতে পারে, এ-বেলাও খাবার যেন না করা হয়।

কথাটা যেন তীরের মত এসে বুকে লাগল। বেশ তো! এসে আর কাজ নেই! থাক্ সে তার লিলিকে নিয়ে, সুখে থাক্, ভাল থাক্! আমি কোথাকার কে, যে, আমার জন্যে…নাঃ—দরকার নেই, আমি নিজের পথ নিজেই বেছে নেব। এ অবিচ্ছেদ্য মোহপাশ সবলে ছিন্ন করে, এক ফোঁটা চোখের জলও আর ফেল্‌ব না! কেন? আমার নারীত্ব কি এতই অবহেলার জিনিষ? এ লাঞ্ছিত জীবনের বাস্তবিকই কি কোনো মূল্যই নেই?

থাক্, আর না, এ কেঁদে মান যেচে 'সোহাগ, আর না, ঢের হয়েছে! এবার আমি মুক্তি চাই, শুধু মুক্তি!

চোখ-ভরা অশ্রুর উচ্ছ্বাস কষ্টে রোধ করে, আমি গায়ের গহনা গুলো একে একে খুলে, আলমারীতে রেখে দিলুম। কেবল গু'গাছি চুড়ী হাতে রইল। কি হবে আর জঞ্জাল বয়ে?

শঙ্কর মা ঘরে এসে হঠাৎ আমার নিরাভরণা মূর্ত্তি দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠ্‌ল—

—ওমা একি! হার-টার গুলো কি করলে?

—খুলে রাখলুম, কষ্ট হয় পরতে—

—গয়না পরতে কষ্ট হয়? এ-যে অনাছিষ্টি কথা বাপু!

অনাছিষ্টি হলেও—সত্যি সত্যি কষ্ট বোধ হচ্ছিল। ও গুলো আমার গায়ে এখন কাঁটার-মত ফোটে যেন! আমি কি হীরে-মোতির কাঙাল? কিছুই চাই না, আমি সব ছেড়ে, সব ফেলে যাব, রিক্ত নিঃস্ব হয়ে, কিন্তু…আমার স্মৃতির-পাতা থেকে এই দেড়টা বছর যদি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারতুম, এখানকারটা, এইখানেই, ঐ গহনা গুলোর মত…তা হয় নাকি?

আঃ! আবার! এ পোড়া-চোখের জল কিছুতেই বারণ মানে না যে! যত মুছি ততই…এ যেন অসুরস্ত হয়েছে। বুকের ভেতর কি রকম টন্‌-টন্‌ করছে! আবার সেই বেদনা, উঃ! মাগো! আর পারি না যে! দু'হাতে বুক চেপে পরিত্যক্ত শয্যায় আবার লুটিয়ে পড়লুম, হে ভগবান! এই শোওয়াই যেন আমার শেষ শোওয়া হয়, আর যেন উঠতে না হয় আমাকে!

শঙ্কর মা বললে, শঙ্করকে বলি ডাক্তার বাবুকে একবারটী…

—না, কি করবে ডাক্তার?

—তা'হলে সেই ওষুধটাই একবার খাও…

—থাক্‌গে! কিছুই হয় না ওতে।

শঙ্কর মা ছাড়ে না, মিনিট কতক বাদেই সে আবার এসে বললে…

সোজা হয়ে শোও দেখি, এই তেলটা একটু মালিশ করে দিই, তাহ'লে ব্যথাটা নরম পড়ে যাবে।

—থাক্ না, আপনিই কমবে…

—থাক্ তবে! ওষুধ খাবে না, পথ্যি করবে না, এ-যে জেনে শুনে, ইচ্ছে করে আত্মহত্যে করা মা!…

আত্মহত্যা! আত্মহত্যা! বেশ কথাটা তো! আশ্চর্য্য! বেদনাটা আজ সত্যি সত্যি আপনিই

কম হয়ে গেল, খুব শীগ্‌গির। কায়-মনে মৃত্যু কামনা করছি বলেই কি? খানিক পরে, সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে শুলুম। তখন আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে শুধু ঘুরছিল ওই একটী শব্দ—'আত্মহত্যা'! ঐ যে শঙ্কর মা বলে গেল, এখনি তাই করলে হয় না? অ্যাঁ! তা'হলে……ওঁদের সেই লুকিয়ে শোনা-কথাগুলো আবার চকিতে মনে পড়ে গেল—

"মনে করেছিলুম আপদ-বালাই বিদেয় হয়েছে তা নয়!"

"এতটুকু সংশ্রব রাখাও চলবে না—আর"

তাই হোক্! এমন করে আপদ-বালাই হয়ে, জীবন্মৃত হয়ে থেকে, মিছে দুঃখ-পাওয়া, দুঃখ-দেওয়া আর কেন? এ-জীবনের এইখানেই শেষ হয়ে যাক্ না কেন—কি দরকার!—বিষ! তা'ও তো রয়েছে, ঐ-যে মালিশের তেলের শিশিটা, তার গায়ে বড় বড় লাল অক্ষরে স্পষ্ট করে লেখা 'পয়জন্'! ওতেই এ রোগ-জর্জ্জরিত ব্যথাহত জীবনের অবসান হবে না কি? তাই করি তবে, এ-পথ ছাড়া আমার নিষ্কৃতির আর কোনো উপায় নেই, মরণেই আমার মুক্তি! কিন্তু… মুক্তির আগে যদি ওঁকে একবারটী তেমনি নিবিড়ভাবে পেতুম, এই শেষ বার, আর কোনো দিন…নাঃ!

শঙ্কর ঘরে এসে ফিরে যাচ্ছে দেখে ডাকলুম, "শঙ্কর"!

"কি মা?"…

"বাবু অনেক রাতে ফিরবেন, না?"

"বোধ হয়, নইলে খাবার করতে মানা করলেন কেন?"

আমার মুখের পানে ব্যগ্র করুণ-দৃষ্টিতে চেয়ে শঙ্কর বললে, "বাবুকে ডেকে আনি মা? তিনি তো জানেন না অসুখের কথা।"

ছেলেটা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে নাকি? আমি মাথা তুলে ব্যগ্রভাবে বললুম, "কোথায় পাবে তাঁকে? তিনি কি এখনো মাসিমার বাড়ীতে…"

যেখানেই থাকুন, ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীও আমি জানি মা।

থাক্, কি দরকার? এখন তো ভাল বোধ করছি একটু। কথাটা বলতে একটা মর্ম্ম-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে যেন বুকখানা দীর্ণ হয়ে গেল। হায়! আমি তাঁকে ডেকে পাঠাব? আর কিসের জোরে—কোন্ অধিকারে? কাজ নেই! এতদিন এত সহ্য করেছি যেমন করে, তেমনি এ-ব্যথাও সইব। দাও! আমার এ-ভাঙা বুকে তুমি যত ব্যথা দিতে পারো দাও…ওগো নিষ্ঠুর! আর তো দিতে পারবে না! আর কতক্ষণ!—এই শেষ…

আবার সন্ধ্যা হ'ল—আর কি? এই সন্ধ্যাই তবে শেষ, শেষ-সন্ধ্যা হোক্!

পশ্চিম-দিগন্তে ছিন্নমেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্ত-রবির শেষ শিখাটী এখনো জ্বলছে, তার আভা বন্ধ-দরজার সার্শীতে ঠিকরে পড়ে, সমস্ত ঘরখানা আলোয় আলোময় করছিল, কি সুন্দর আলো! এ-আলো কাল আর দেখতে পাব না…

দেখেও কাজ নেই আর!

সামনের টেবিলে ফোটো-ষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে আমাদের দু'জনের পাশাপাশি করে তোলা ফোটোখানা এখনো তেমনি ভাবে রাখা রয়েছে। এই ঘর, আমার ফুল-শয্যার সুখের বাসর, একদিন কত সাধ করে সাজিয়েছিলুম নিজের হাতে—তখন জানতুম না, এ আর-একজনের……ওঃ! আমার শেষ নিঃশ্বাস এই ঘরেই পড়বে, আর কোথাও নয়!…

মাগো! তোমার দুঃখিনী রজনীকে তোমার কোলে স্থান দাও, মা! এ-জগতে তার স্থান হ'ল না আর……

ফাঁকি, ফাঁকি! সমস্ত জীবনটাই শুধু ফাঁকির ওপর দিয়ে চলে গেল! আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে কোথায়, কোন্ আঁধারের দেশে, কে জানে? সে দেশও কি এমনি! সাঁঝের ঝাপসা-ছায়া ঘনিয়ে-আসা বিষণ্ণতার মত যেন বুক চেপে ধরছে। এখনো এলেন না! কত রাতে আসবেন কে জানে? সে ছেড়ে দিলে তবে তো?…কি করে আসবেন?

তার আগেই তা'হলে……হ্যাঁ, কি হবে আর শুধু চোখের-দেখা দেখার আশায় থেকে! তার আগেই আপদ বিদায় হোক্……

শ্বশুর মা এসে আলোর সুইচ্‌টা খুলে দিতেই আমি চোখ বুজিয়ে নিলুম।

আমাকে ঘুমন্ত মনে করে সে নিঃশব্দে চলে গেল। বাঁচলুম! এখন ঘরে আর কেউ নেই। আস্তে-আস্তে চোখ মেলে দেখি, সামনে হাতের কাছেই ছোট টেবিলটার ওপর সেই শিশি……তার লাল অক্ষরে লেখাটা কি রকম জ্বল্-জ্বল্ করছে! উঃ!…

ও কার বুকের রক্তধারা গো?…আমার মত কোন্ সর্ব্বহারা অভাগিনীর বুঝি?……

—ও যে এদিকে এগিয়ে আস্‌ছে! আমার চোখে-মুখে সর্ব্বশরীরে একেবারে রক্তে রক্ত করে দিলে যে! উঃ! মাগো! বুক জলে গেল, জলে গেল! এতো রক্ত নয় আগুন—এ আগুনে যে আমার সব পুড়ে গেল! উঃ-হু-হু! চোখেও যে দেখতে পাই না আর, সব অন্ধকার! সব অন্ধকার!…

আমার বুকের কাছে এ কেরে? খোকন? ও আমার সোণারে!……সরে যা, সরে যা ধন! এ আগুনে তুই যে ভস্ম হয়ে যাবি মাণিক!

অন্ধকারে ও কারা সব বকাবকি করছে? কি বলে? বিশুর মা, সর্ব্বনাশ, আন্ আন্ ডাক্তার! ওমা বালিশ আঁচড়ায় কেন? বউরাণী……

এ কিসের গণ্ডগোল? কিছুই বোঝা যায় না!

রোজি!…ও কে? কে ডাকলে গো? ডাকো ডাকো, আবার ডাকো! তোমার ওই মধুর ডাক দিয়ে, মধুর স্পর্শ দিয়ে আমার এ বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দাও—ওগো দরদী আমার! তোমার দেওয়ার শেষ হয়ে গেছে, আমার নেওয়ার শেষ যে এখনো হল না প্রিয়তম!

এসো, ওগো! কাছে এসো! আরো কাছে, আমি তোমাকে চাই, তোমাকে…ওঃ!

মুক্তি চাই না, স্বর্গ চাই না, শুধু তোমাকে… আঃ! মাগো।

পবিত্রর কথা

চলে গেলে, সত্যিই চলে গেলে?

ওঃ! একবার, শেষবার, পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইবার অবকাশও দিলে না…

শুধু আমাকে চির-অপরাধী করে গেলে, জনমের মত!

—আমি কি অন্ধ হ'য়ে ছিলুম? পাগল হয়ে-ছিলুম? উঃ!

—রোজি! রজনী! রজনী-গন্ধা আমার!

না, সে নেই, সে নেই গো! নেই—সে চলে গেছে। রজনী-গন্ধা রাতের ফুল, রাতের আঁধারেই ঝরে গেল!

— শেষ —

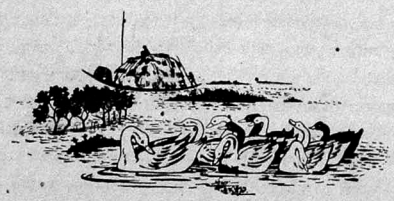



['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

লক্ষ্যহারা—(উপন্যাস) শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—গোলাপ পাবলিশিং হাউস, ২২, হরীতকীবাগান লেন, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে খুব বেশি পরিচিত বলে' ত' আমার মনে হয় না। লেখকের এই 'লক্ষ্যহারা' বইখানিই যদি প্রথম লেখা হয়ে থাকে, তাহ'লে তাঁর মুন্সিয়ানা আছে বলতে হবে। আগা-গোড়া উপন্যাসখানির মধ্যে কাঁচা-হাতের পরিচয় কোথাও নেই—অন্ততঃ লিখন-ভঙ্গীর দিক থেকে। উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে মনে হয় এখানি তাঁর প্রথম লেখা কিছুতেই হতে পারে না, গোপনে-গোপনে তিনি অনেকদিন ধরেই লেখা মক্‌সো করেছেন। কিন্তু গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করতে তিনি পারেন নি। না পারুন, সে আশাও আমরা তাঁর কাছ থেকে করিনি। গল্পটি তিনি ভাল করে' বলতে পেরেছেন এইটুকুই যথেষ্ট। তবে অতি আধুনিক হ'তে গিয়ে যে ভুল তিনি করেছেন, সে ভুল অমার্জ্জনীয়। গায়ের-জোরে সব কিছুর সীমা-লঙ্ঘন করা এবং কারণে অকারণে বড় বড় দার্শনিক 'বুক্‌নি' আওড়ানোই অতি-আধুনিকের ধর্ম্ম নয়। লিখতে এগুলি মন্দ লাগে না, কিন্তু রস-সৃষ্টির পথে ওরাই শেষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষেত্রমোহন বাবুর লেখার শক্তির পরিচয় পেলাম বলেই এই অপ্রীতিকর মতের অবতারণা করতে হ'লো। সে যাই হোক, এই উপন্যাসখানির গ্রন্থকার যদি অবহিত হ'য়ে সাহিত্য সাধনা করে' চলেন ত' অচির-ভবিষ্যতেই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবেন। নবীন আগন্তুক হলেও ক্ষেত্রমোহন বাবু শক্তিশালী লেখক তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকোষ—(সচিত্র) বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক-বৃন্দের সহায়তায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ৮নং বিশ্বকোষ লেন বাগবাজার হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আট আনা। বর্ত্তমানে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বার খণ্ডের মূল্য অগ্রিম পাঁচ টাকা।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সহায়-সম্পত্তিহীন উদ্যমশীল যুবক শ্রীভগবানের নাম লইয়া আপন অধ্যবসায় সম্বল করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যাঁহার অদম্য অনুরাগ, ঐকান্তিকী চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্বকোষের ন্যায় বিরাট অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেই স্বনাম-ধন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম বাঙ্গালায়—শুধু বাঙ্গালায় কেন ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। সে দিনের যুবক আজ প্রৌঢ় হইয়াছেন, সেদিন যাঁহারা তাঁহার বন্ধু ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। দেহে সে বল নাই, পরিশ্রমের সে শক্তি নাই, কিন্তু তথাপি নগেন্দ্রনাথ দমিবার পাত্র নহেন। উদ্যম তাঁহার আজিও অদম্য, অধ্যবসায় তেমনি অটুট, মনে তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ। এই সেদিন তিনি হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। আজো আবার নূতনতর আয়োজনে বিপুল উদ্যোগে

তিনি বাঙ্গালা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, দর্শনে, বিজ্ঞানে কত নূতন নূতন তথ্য, নূতন নূতন আবিষ্কার! সত্যই তো সে এক বিরাট ব্যাপার! কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাহাতে দিশাহারা হন নাই। তিনি নূতন নূতন বিশেষজ্ঞের সন্ধান করিয়া যাঁহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাকে দিয়া সেই সেই বিষয় লেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশ বিদেশ হইতে নূতন নূতন চিত্রাবলী বিশ্বকোষে মুদ্রিত করাইতেছেন। বিংশ-শতাব্দীর জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্বকোষে সমাহরণের প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য বহু কৃতবিদ্যযুবক এই প্রৌঢ়ের সহায় হইয়াছেন। প্রবীন এবং নবীনের এই অপূর্ব্ব সমাবেশে কার্য্য যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। দশম খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। একাদশ, দ্বাদশ যন্ত্রস্থ। 'অঙ্গুলি' শব্দ চলিতেছে। ছাপা ছবি উৎকৃষ্ট, বইখানার মূল্যও যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি বাঙ্গলার ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই বিশ্বকোষের গ্রাহক হইয়া নগেন্দ্রনাথের উদ্যমকে জয়যুক্ত করিবেন। লাইব্রেরীতে বিশ্বকোষ না থাকা লজ্জার কথা। ইহার উপকারিতা কত তাহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এবারকার বিশ্বকোষের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যে বিষয় লিখিতেছেন, সেই বিষয়ের সূচী-পত্রে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইবে। সুতরাং কর্ম্মীগণের পক্ষে ইহাও একটী আনন্দের সংবাদ বলিতে হইবে। শ্রীভগবান নগেন্দ্রনাথের আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। তাঁহাকে নিরাময় ও দীর্ঘজীবি করুন। যেন প্রথম সংস্করণের মত দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন।

মায়া-কাজল—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। প্রকাশক—শ্রীবারিদকান্ত বসু, আর্য্য সাহিত্য-ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

'মায়া-কাজল' কবিতার বই। কাব্যের সমালোচনা হয় না, কেননা কাব্য অনুভূতির বস্তু, তার রস অনুভব দিয়ে বোধ করতে হয়। তবে সকল দেশেই সমালোচনা করার একটা প্রথা আছে। কেননা লেখক বা কবির চেয়ে সমালোচকেরা নিজেদের মনে করেন যে, তাঁরাই সর্ব্বরস-বেত্তা বা সর্ব্বরস-বোদ্ধা। সেইখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সমালোচনা করে, সব বিষয় টিপ্পনী কেটে একটা তথাকথিত বিচার করে দেন। সে বিচারের মাপকাঠি, সাধারণতঃ তাঁদের নিজস্ব রসানুভূতির যে পরম মাপকাঠি, তা প্রায় সকলের আছে বলে বোধ হয় না। কাজেই যেখানে কাব্য বা কবিতার সমালোচনা হয়েছে, সেইখানে সে সমালোচকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও রসানুভূতির ভিতর দিয়ে যতটা তিনি পেয়েছেন, ততটাই বলতে পেরেছেন। তবে কাব্য বা কবিতার একটা সহজ বিচার আছে যে, সেটা সত্যি কবিতা কি না? সে যদি কবিতা হয়, তবে তার রূপ কি, বৈশিষ্ট কি? এই দুটো প্রশ্নের উত্তর হলেই 'মায়া-কাজল' সম্বন্ধে প্রাথমিক যা বলবার তা হয়ে যায়। সেটা হ'ল এই যে, কবিতা বা কাব্য জিনিষটা হচ্ছে ঠিক সেই রকম যা গাছের পাতার মত, আপনিই সহজে তার সবুজ রঙ ও গঠনের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে—অবশ্য সবুজের যে রঙের আভা, তা খানিকটা বাইরের রোদের ও আলোর অপেক্ষা রাখে। কাব্য বস্তুটা ঠিক সেই রকম, বের হ'য়ে আসে একেবারে প্রাণের ভেতর থেকে, রঙ নেয় তার বাইরের রোদ আর আলো থেকে। 'মায়া-কাজল' ঠিক তাই হয়েছে কি না, এই রস-বস্তুটি যদি তাতে থাকে, আর আমরা তা ধরে নিতে পারি, তবেই 'মায়া-কাজল' সম্বন্ধে যা বলবার সেটা বলাও সহজ হয়ে আসে।

আমার নিজের ধারণা, পদ্য লেখাটা অনেকের কাছে গদ্য লেখার চেয়ে সহজ। কেননা কবি বাঙলা দেশের মাঠে ঘাসের মত নিত্য-নিত্য জন্মাচ্ছে—শীতের দিনে মুসড়ে যায়, বর্ষার জল পেলেই আবার গজিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর ধরে এই বাঙলা দেশকে ছেয়ে

রাখার পর, দেশে কবির আর অভাব নেই। কেননা কবিতা পড়ে কবি হওয়া, আগের কালে যেটা শক্ত ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটা সোজা ক'রে দিয়েছেন। তাঁর ছন্দ, তাঁর কথা, তাঁর ভাব ওলট-পালট ক'রে দিয়ে, বুঝে বা না বুঝে, চেষ্টা ক'রে, প্রায় তাঁর পরবর্ত্তী সব কবিই কবি হ'য়ে গেলেন। চন্দনের বনে অন্য গাছ চন্দনের গন্ধরস কিছু পেয়ে, নিজেরা চন্দনের দর হাঁকে, আসলে চন্দন হ'তে হ'লে, সারবান নিজে হ'তে হয়। নইলে দারুচিনির খোলায় যেমন পেয়ারা গাছের খোলা দিয়ে দারুচিনি তৈরী হয়, বাঙলা দেশের অনেক কাব্যই পেয়ারার কষা-ছাল দারুচিনি বলে বাজার-চলন-গন্ধ নিয়ে চলেছে। এতগুলো কথা বলবার কারণ এই যে, 'মায়া-কাজল' তা ঠিক নয়। এর মধ্যে অন্তর-বস্তু কিছু আছে। চন্দন গাছের গন্ধরস নিয়ে এ চন্দন-ছন্দ হয় নি। এতে চন্দনের সার কিছু আছে, সেই কথাটা বলার জন্যেই এই ভনিতা আমায় করতে হল।

আগে যা বলেছি যে, পদ্য লেখাটা গদ্য লেখার চেয়ে অনেক সহজ। ঠিকমত অক্ষরগুলি সাজাতে পারলে, একটা (ছন্দের সৃষ্টি) ধ্বনির সৃষ্টি হয়—ধ্বনির একটা মূল্য আছে। অর্থ হয়ত তাতে না থাকতেও পারে কিন্তু ধ্বনির মাধুর্য্যটুকু কেমন তাতে থেকে যায়! কাজে-কাজেই অক্ষর-সাজানর কৌশলটা আয়ত্ব করা নিয়ে কথা—সেটা যদি আয়ত্ব হয়, তবে আর ভাবনা থাকে না।

কিন্তু এ কৌশল না হয় হ'ল, তারপর?—মন ত' শুধু এই ধ্বনির কৌশলে ভোলে না, সে তখন ধ্বনির মাদকতা কাটিয়ে তার অন্তর-বস্তুর সন্ধান ক'রে দেখে, এ ধ্বনি যে ভাব-সঙ্গেত আন্‌ল, তার স্বরূপ কি, কোথায় তার আসল রূপ! ধ্বনিকে ছাড়িয়ে যে বাণী চিত্তে, তার প্রভাব বিস্তার করে, সেই ভাবের মধ্যে যে অশ্রুত ধ্বনি-হীন বার্ত্তা, যতখানি মরমের কাছে জাগিয়ে তোলে, সেই খানে হয় কবিতার পরিচয়। সেই খানে তার অন্তর, সেই খানেই তার সবুজ-আলো, যে সবুজ আলো কবি তাঁর প্রাণের মণি-কোঠায় জেলে রেখে দেন, যে আলো পেয়ে জগতের লোক চলার পথে বাধা পায় না—সেই সবুজ ল্যাম্প-পোষ্ট!

বর্ত্তমানের কবিতাগুলির পক্ষে এই বিচার পদ্ধতি যদি চলে, তবে কবি যে বিশেষ ক'রে এই কবিতা লেখার কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ব ক'রে এই ধ্বনি-সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর যে কোন কবিতা পড়লেই প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে অন্তর-বস্তুরও অভাব নাই। কবিতাগুলির মধ্যে একটী একটানা নিজস্ব-ভাবের সহজ সুর আছে, যে সুরটী বস্তু-পূজারীর নয়। বস্তুকে ছাড়িয়ে অ-বস্তুর রূপ-অরূপের খেলায় পৌঁচেছে। শিল্পীর চোখে কে যেন মায়া-কাজল পরিয়ে দিয়েছে—তিনি যেন ফকিরের মত চোখে কাজল দিয়ে সাধারণ চোখের আড়ালে, যে অজস্র রত্ন-ভাণ্ডার আছে, তার সন্ধান পেয়েছেন। "আকাশ মরু সমুদ্রে" উধাও হয়ে তাঁর চিত্ত উড়ে, অপরূপের রূপের ভাঁজ পর্দ্দায়-পর্দ্দায় খুলে যায়। তাঁর মন-ময়ূরী তাঁকে অজস্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মাঝে এনেছে—সোনার পালঙ্কে রাজ-কুমারী, জিয়ন-কাঠির পরশ পেয়ে কুমারীর চোখের পাতার-তলায় কি সুখ শিহরায়, (দিব্য দৃষ্টিতে সবই সেই মায়া-কাজল চোখে দিয়ে) কবির চোখে সবই প্রতিফলিত হচ্ছে। আবার দুরন্ত বর্ষায় কালো-কালো মেঘ-সাথে দৈত্যেরা ছাড়া পেয়েছে, সারা বিশ্ব তারা রোষে যেন গুঁড়িয়ে ফেলবে। দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পালিয়েছেন—

"বর্শা বাগায়ে বর্ষা-রমণী আকাশেরে ভাঙিয়া,
বৃষ্টি-সুতায় গড়িছে ধরার বক্ষের আঙিয়া।"

এমনি একটির পর একটি, ছবির পর ছবি, অপরূপ মায়াচিত্র সুকৌশলী কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে। আমাদের চোখে অমনি মায়া-কাজল লাগে। কবি বলেন, তা এস্ব হোক্ ফাঁকি, তবু ছ-আঁখি বাড়ায়ে, তারি পানে চেয়ে থাকি। কবির চোখে মায়া-কাজলের যে মোহ তাঁকে নিয়ে চলেছে সাঁগরিকার সন্ধানে, অকূলে ভেসে যেতে চান তারি পথ পানে চেয়ে—হাতছানি

দিয়ে ডাকে সাগরিকা সাগর-তলের বালা। এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির এক সার্থকতা আছে, মনে আনন্দ দেয়। কবি নবীন নন্, বরং প্রবীণ। তাঁকে কিন্তু দু'টো কথা বলবার আছে আমাদের। শব্দ-সম্পদ ও শব্দ-কৌশল থাকলেও দু'চার জায়গায় সত্যেন্-দত্তের ছাঁচে কতকগুলি শব্দ ব্যবহার আমাদের কানে বাজে। সত্যেন্-দত্তের শব্দ-কৌশল গীতি-কবিতায় প্রাণ-স্পর্শ কতখানি জাগিয়েছে তার বিচারের এ স্থান নয়, তবে সত্যেন্-দত্তের শব্দ-চয়ন ও 'মায়া-কাজলে'র কবির শব্দ-চয়ন হয়ত তুলনা হতে পারে। তবে 'মায়া-কাজলে'র কবির স্বাভাবিকতা হয়ত তার চেয়ে বেশী বলেই মনে হয়।

আর একটা কথা—'মায়া-কাজলে'র প্রথম কবিতা, 'মানুষ গড়িবে স্বর্গ' ও আরো কয়েকটীতে মায়া-কাজলের কোন রঙ নেই, তাতে আছে বুদ্ধির খেলা, তা ছাড়া এর ভিতরে 'শরৎ-প্রশস্তি' কেমন করে এল, তা বলা দুরূহ।

বইখানির মধ্যে গুটি কয়েক কবিতা বিশেষ করে চোখে পড়ে—প্রথম 'উর্ব্বশীর অভিশাপ' আর একটি সনেট 'চিরন্তন'। 'উর্ব্বশীর অভিশাপে' কবি এক নতুন উর্ব্বশীর সৃষ্টি করেছেন—সে মুখরা, কিন্তু সে মুখরতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে এক রক্ত-মাংস, প্রাণ-মন তীব্র-উপেক্ষায় ক্ষুব্ধা জ্বালাময়ী রমণী—অন্তর-মাধুর্য্যের চেয়ে খর অগ্নি-বরিষণই তার ভঙ্গী। তবে এ কবিতা বড় হলেও শব্দ-চাতুর্য্যে, ছন্দের-দোলে, আমাদের খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু কাব্যের যে আসল রস, যা কখনো পুরানো হয় না, তা আছে 'চিরন্তন' কবিতায় যা সত্যিকারের কবিতা। কবির অন্যান্য কবিতার চেয়েও এই সনেটগুলি আমাদের বেশী ভাল লাগে। তবে কবি নিজেই বলেছেন—

"বসন্ত কার জীবনে অক্ষয়?
রসের সাথে যাহার পরিচয়!"

আমরাও তাই বলি—রসের সাথে যাহার পরিচয়, সে এ কাব্য অনুভব ও রস আস্বাদন করবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ক্লাইভ ষ্ট্রীট—প্রথম বার্ষিক বীমা সংখ্যা—আফিস, ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সম্পাদক—শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০। এই সংখ্যা—১৲ টাকা।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বার্ষিক সংখ্যা দেখে আমরা পরম প্রীত হয়েছি। বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোন পত্রিকা বাঙলায়, আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। এই পত্রিকা, সেই অভাব পূরণ করার জন্য আসরে নেমেছেন। এই বর্ষ থেকে তাঁদের দ্বিতীয় বর্ষ। দ্বিতীয় বর্ষের এই প্রথম সংখ্যা, বহুল-চিত্র সমন্বিত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যাঁরা সত্য-সত্য কাজ করছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই প্রতিলিপি ও তাঁদের স্বাক্ষরিত পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার সবচেয়ে ঠিক হয়েছে, তার এই নামকরণ—এই 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট'—আমরা অন্তরের সহিত এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ও আশা করি ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এঁরা সকল বিষয়ে অগ্রণী হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, যাতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে আবার আমাদের দেশবাসীর সত্য প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রতিযোগিতার গল্প ক্রমশঃ
প্রকাশিত হইবে।



কলিকাতায় দেশবন্ধু দিবস

আজ নয় বৎসর হ'ল, মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশ প্রয়াণ করেছেন। আষাঢ়ের সে দিন তাঁর স্মৃতির পূজায় শ্রদ্ধা-অঞ্জলি দেবার জন্য দেশের লোক সমবেত হয়েছিলেন। বলতে গেলে এ কথা গর্ব্বের সঙ্গে বলা যায় যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এ যুগে সত্যই একমাত্র বাঙালীর মতন বাঙালী। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় ঠিকই বলেছেন, বাঙলার শেষ-বৈষ্ণব, পুরুষ সিংহ। বাঙলায় এক মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর, আর মানুষ চিত্তরঞ্জন। হৃদয়ের দিক দিয়ে এ দু'জনের মত মানুষ আর হয় নি। রাজনীতির দিক দিয়ে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি কালোপযোগী কি না, সে রাজনীতিতে বাঙলা বেঁচেছে, কি, ওলট-পালট হয়ে গেছে, তা হয়ত, ভাববার, বিচার করবার আছে, কিন্তু মানুষ হিসাবে ত্যাগের প্রতিষ্ঠায়, নিজের হৃদয়ের মহত্ত্বে, তার করুণার দীপ্তিতে, বাঙলায় যে, আর দ্বিতীয় কেউ তাঁর সমান-ভাবে এ মাটীতে পা ফেলতে পেরেছেন, এমন কাকেও আমরা আর দেখিনি। বছরের পর বছর শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিই, মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা দেখানতে জাতির কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রকাশ হয় সত্য—কিন্তু এই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে মনুষত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাম্য করেছিলেন, যে কাম্যকে তিনি ধ্যানে, জ্ঞানে, 'প্রাণাৎ পরতরঃ' করে সাধনায় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে, বাঙলার বুকে দিয়ে গিয়েছেন, কই দ্বিতীয় সাধক যে, সেই সাধনার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন, সে ভাব-স্রোতকে কল-কল ধারায় বইয়ে নিয়ে চলেছেন সেই মহাভাব-গঙ্গাকে? রাজনীতি কালস্রোতে ভেঙে যায়, বদল হয়, রূপ পরিবর্ত্তন করে; কিন্তু ভাব-ধারার প্রতি জাতির যদি সে নিষ্ঠা না থাকে, তবে জাতির পথ-চলার গতি রোধ হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিকে আমরা পূজা ক'রে আসছি, কিন্তু সে পূজা কি প্রাণ থেকে মর্ম্মের পূজা, না লোক দেখান জটলা—দিকে দিকে দেশের যে আবহাওয়া, তাতে মনে হয় কি যে, মর্ম্ম দিয়েই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে আসছি? যদি ক'রে থাকি তবে এত দলা-দলি ভাঙা-ভাঙি কেন? যে সহজ সরল স্বচ্ছ প্রাণ নিয়ে সেই কালজয়ী মহাপুরুষ এসেছিলেন, যে 'মৃত্যুহীন প্রাণ' নিয়ে তিনি এ দেশে এসেছিলেন, জীবনে তাহাই তিনি দান করে গেছেন—তবে সে অমর প্রাণের স্ফূর্ত্তি কই!

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বোমা নিক্ষেপ

এই খবরটা আমাদের কাছে প্রথম বাতুলের প্রলাপ বলে মনে হয়েছিল। কারণ, মহাত্মাজীর গাড়ীতে বোমা ফেলার উদ্দেশ্যটা আমরা সহজ-বুদ্ধিতে ধরতে পারি নি। তবে যখন-তখন এই বোমার চল দেখে আমাদের মনে নানান কথা জাগে। আজ রাজপুরুষদের উপর, কাল রাজকর্ম্মচারীদের উপর, সেদিন মহাত্মাজীর উপর। যে বা যাহারা এ কাজ করে—বা করছে, তারা যে কি ভেবে এ কাজ করে, সেটা যদি অনুমান করতে হয়, তবে সব প্রথম এই কথাটাই মনে আসে যে, পৃথিবীতে যে সকলকে আপনার করে, শত্রু নাকি তারই বেশী! মহাত্মাজীর মতামতের সঙ্গে, তাঁর কার্য্য-পদ্ধতির সঙ্গে, হয় ত কার' মতের বা পদ্ধতির মিল না থাকতে পারে—রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বার্থ ও নিজের মত অনেক সময় অনেক খেলাই খেলে—কিন্তু মহাত্মা সম্বন্ধে কেউ এ কথা অস্বীকার করবে না যে, তিনি

একজন এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ—তাঁর নিষ্ঠাকে সকল রকমে প্রণত হ'য়ে শ্রদ্ধা করা ছাড়া, অন্য কোন মনোভাব মানুষের মনে আসতে পারে। আজ যে কার্য্যে তিনি ব্রতী—সে কার্য্য হ'ল, মানুষের শূদ্রত্ব দূর ক'রে, মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠার সাধনা। যুগের পর যুগ ধ'রে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যে ভাবে আমরা সমাজের অঙ্গে এত বড় একটা বিশাল রোগ তৈরী ক'রে রেখে এসেছি, তাকে দূর করবার জন্য যদি বৈদ্যে ঔষধ দেয়—তবে সে বৈদ্যকে কর নাশ—এই আমাদের বুদ্ধি! মহাত্মার কার্য্যকলাপ থেকে এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, তাঁর প্রতি এ ব্যবহার করবার তিনি কোন কারণ নিজে করেছেন।···আনন্দ এই যে, তাঁকে কোন আঘাত দিতে পারি নি। দুঃখ এই যে, সাতজন তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের আঘাত লেগেছে। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ এই যে, আমরা এমনি হতভাগ্য, যে নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টকে বহন ক'রে নিয়ে আসে, আমরা তারই বিরোধী হই। আমরা বলতে এই কথাই বলি—যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে মহাত্মাকে নাশ করবার জন্যে কেউ নিশ্চয় আসে নি। অধঃপতিত দেশ ও জাতির পক্ষে অনেক কলঙ্ক গা-সওয়া হয়ে যায়, বটে, কিন্তু আত্মঘাতীর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর হয় না।

মাইকেল মধুসূদন

"যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-নদ"

নদের মত দুর্দ্দাম, দুর্ব্বার গতি কার? মধুসূদনের মত দুর্দ্দাম, দুর্ব্বার গতি আজই বা কার? মধুসূদন লিখেছেন,

যে দেশে উদয় রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিদ্যাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে • • •
সে দেশে জনম মম ··· ···

বাঙ্‌লা সাহিত্যের দেশে যে-দিন মধুসূদন উদয়-অচলে উদয় হ'য়ে সাহিত্যের বিদ্যাধরে আদরে চুম্বন করলেন, সেই দিন নব-নব-উন্মেষ নিয়ে বাঙলার সৃষ্টি-সাহিত্য জন্ম নিলে। একদিন মধুসূদনের 'শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী'—মৃদুহাসি—

"ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই, ওথা যার গতি
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!"

মধুসূদন বাঙলায় অমর কবি—আজও তাঁর প্রতিদ্বন্দী কেহ জাগে নি। মধুসূদন প্রতীচ্যকে গ্রাস করে যে নবরূপ সাহিত্যে সৃষ্টি ক'রে গেছেন, তার ত্রুটী-বিচ্যুতি যতই থাক, সে মহাদান, সে অপূর্ব্ব! তাঁর স্মৃতিপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ, তাঁর সাধনাকে নূতন ক'রে জাগিয়ে তোলা। কি ভাবে সে সাধনাকে জাগিয়ে রাখব তা' আমরা তাঁর একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করে পাঠক-পাঠিকাদের নিবেদন করছি, আশা করি তাঁরা অবহিত হয়ে, D. H. Lawrence-এর অনুভাবের দিনে সংযত হ'য়ে অনুধাবন করবেন—সে কয়টী পঙ্‌ক্তি এই···"I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language" অর্থাৎ শিক্ষিত বলে যে মিছে অহঙ্কার করে, তারে ঘৃণার সঙ্গে এই কথাই বলি যে, যে নিজের মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে না পারে, সে কখন শিক্ষিত নয়।

মধুসূদনের এই কথা কয়টী আজিকার শিক্ষিতদের কাছে অবশ্য নিবেদন করায় অন্যায় হবে না। গ্রহণ করায় কোন আপত্তি নেই, তবে ঋণ করলে শোধ দিতে হয়, মধুসূদন সে ঋণ শোধ করে গেছেন, তাঁর সৃষ্টি দিয়ে। তথাকথিত সাহিত্য-ঋণের ভারে মেরুদণ্ড-ভাঙা জাতির সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি হয় না। মধুসূদনের স্মৃতির পূজার অর্থ, সেই দুর্দ্দাম দুর্ব্বার নদের কলকোলাহলের সঙ্গে, তটভূমিকে উর্ব্বর করে দিয়ে যাওয়া। সিজন্-ফ্লাওয়ার বা জঙলা-আগাছার সৃষ্টির জন্য নয়।

নাট্যকার ৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অপরেশচন্দ্র একধারে নট ও নাট্যকার ছিলেন। ত্রিশ বৎসর তিনি বাঙলার নাট-শালে বিশেষ খেলা খেলে গেছেন। অপরেশচন্দ্রের জন্ম যশোরের মহেশপুর গ্রামে। অপরেশ বাবুর শিক্ষা-দীক্ষা কিন্তু সবই এই কলকাতা সহরে। তিনি বহু নাটক রচনা করে গেছেন, Play-write হিসাবে তাঁর খ্যাতিও যথেষ্ট। তাঁর বহু নাটক রঙ্গমঞ্চে, দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। নাটকীয় পদ্ধতি হিসাবে তিনি পুরানো-পন্থী। মহাকবি গিরিশ-ঘোষের পথই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। তবে মহাকবি গিরিশের সৃষ্টি-শক্তির সঙ্গে তাঁর তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না বাঙলা দেশে গিরিশ-ঘোষের পর, সত্য যাকে নাটক বলে, তা কি নূতন, কি পুরানো কোন-পন্থাই পারেন নি। অপরেশচন্দ্র বরং সে ধারাকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা ও সাধনা করেছিলেন।

তবে একটী জিনিষ তিনি বাঙলাকে দিয়ে গেছেন, যা বাঙলা চিরদিন সাদরে গ্রহণ করবে—সে হ'ল 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—এই আত্মকথা ও ইতিহাস, বাঙলার নাট্যকলা সাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের নিখুঁত ইতিহাস ও নিখুঁত ছবি।

আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করেন।

পণ্ডিত ৺কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ

গত ২২-এ জুন শুক্রবার কলিকাতা কলেজ-স্কোয়ারে এলবার্ট-হলে হিতবাদী-সম্পাদক স্বর্গীয় পণ্ডিত কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের স্মৃতি-পূজার সভা হয়ে গিয়েছে। কালীপ্রসন্নবাবু হিতবাদীর সম্পাদক হিসাবে, সকল সময়ে নির্ভীকভাবে মত প্রকাশ করতেন। তিনি যেমন চরিত্রবান্ ছিলেন, তেমনি তাঁর বন্ধু-প্রীতিও অসাধারণ ছিল। সকলের চেয়ে বড় কথা তাঁর জীবনে যে, তিনি চিরদিন দুষ্টের দমনে কুণ্ঠাহীন নির্ভয় ও শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন—তাঁর সারাজীবনেই। হিতবাদী ছাড়া, আরো অনেক কাগজের সম্পাদনা তিনি ক'রে গেছেন, সে সম্পাদনায় তাঁর চিরদিনই সুযশ ছিল, আজও তাঁর সেই শক্তির স্মৃতিকে আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্যই দেব।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্ট

বাঙলার শিক্ষা বিভাগের ১৯৩২-৩৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে। রিপোর্টে আইন-কানুন, নিয়ম-শাসন অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আসলে সকল কথার এক কথা এই যে, টাকা নাই, অতএব শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধা নাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা তা নাকি আর্থিক অনাটনের জন্যই হয় নি, তবে ডাঃ ডবলিউ এ জেঙ্কিন্স পরিকল্পনা করেছেন যে, এবার স্থানে স্থানে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডকে দিয়ে এই পরিকল্পনা সত্যে পরিণত করবেন।

শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্য থেকে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডকে যে সাহায্য করা হয়, তা যাতে অন্য খরচ বাবদ ব্যয় না হয়, সেই সম্বন্ধে সরকার নূতন করে ব্যবস্থা করেছেন। অনেক সেকেণ্ডারী স্কুলে কৃষি-বিদ্যার ক্লাশ খোলা হয়েছে। তবে স্কুল ও কলেজে যে সাহায্যের পরিমাণ কমান হয়েছে, তার কারণ ব্যয়-সঙ্কোচ। ব্যয় করবার টাকা নাই।

সরকারী কর্ম্মচারীদের যে ট্রেনিং কলেজে পাঠান বন্ধ করা হয়েছে, তারও কারণ টাকা নাই। কিন্তু নূতন শাসন-সংস্কারের যে প্রস্তাব উঠেছে ও আন্দোলন চলেছে, তাতে শিক্ষা দিয়েই হয়ত ভোটাধিকার দাঁড়াবে, এমন কথা আছে। কিন্তু শিক্ষার যদি প্রসার না বাড়ে, তবে, সেখানে যে অনেক গোল বাধবে, এ অতি সহজেই বোঝা যায়।

বাঙলার ব্যবস্থাপক সভা

বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার আর এক বৎসর পরমায়ুঃ বাড়ল। বার ঝর, আবার তৃতীয়বার! তবে কি কারণে যে এক্ পরমায়ুঃ বেড়ে গেল তা কিন্তু

আমাদের বুদ্ধি ও ধারণাতে আসে না। রাজকার্য্য ও শাসনকার্য্য সুচারুরূপে চলে—ভালোই, কিন্তু তাতে কি বিশেষ সুবিধা হবে? যদি নূতন-শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্যই এই ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে; তবে, সেকি কাউন্সিলের নূতন নির্ব্বাচন করলেই অসুবিধা হ'ত?

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

আর একজন বিশিষ্ট বাঙালীকে আমাদের মহামান্য হাইকোর্টের চিফ্-জাষ্টিস্-পদে অভিষিক্ত দেখে পরম গৌরব লাভ করলাম। যদিও অস্থায়ী, তথাপি এ বাঙলারই গৌরব। আমরা পরম বিজ্ঞ ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর এই গৌরবের জন্য অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কলিকাতার নূতন মেয়র ও ডেপুটি-মেয়র

এতদিনে কলিকাতার মেয়র-নির্ব্বাচনের গোল মিটে গেল। কর্পোরেশনের কাজের বিশৃঙ্খলা এইবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে চলবে। যিনি মেয়র হলেন, তিনি কৃতী-পুরুষ। তাঁর শক্তি ও সাধনার কথা সকলেই প্রায় জানেন। সামান্য অবস্থা থেকে তাঁর উন্নতি, এরূপ উন্নতি কদাচিৎ দেখা যায়। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়কে তাঁর শক্তি ও ব্যক্তিত্বের সম্মান আমরা দিতে বাধ্য। তিনি উত্তরোত্তর আরো সম্মান ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হন, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও কামনা। আমরা তাঁর এই শক্তি ও সাফল্যকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করছি, আরো এইজন্য যে, এতদিন ধরে শুধু উকীল-ব্যারিষ্টারের দলই দুই মেয়রের আসনে বসেছেন, আজ একজন কৃতী ব্যবসায়ী সেখানে এসেছেন। ব্যবসায়ীদের দিক থেকে তাঁর এই প্রথম গৌরব ও প্রতিষ্ঠা।

এই সঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়কেও সানন্দে অভিনন্দিত করছি—তিনি হয়েছেন ডেপুটী-মেয়র। তাঁর কৃতী পিতা, মাননীয় রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় তিনিও যেন সর্ব্বাংশে দেশের কার্য্যে সহানুভূতি ও কৃতিত্ব দেখান, এই আমাদের আন্তরিক কামনা!

ভয়াবহ প্রতিশোধ—

অন্যায় অন্যায়েরই সৃষ্টি করে, এক পাপ নূতন পাপের জন্মদাতা। লাহোরে নারীর প্রতি অত্যাচারের যে প্রতিশোধ নেবার সংবাদ আমরা পেয়েছি, তা শুনে মন আতঙ্কে ও ঘৃণায় শিউরে ওঠে। শেখপুরা জেলার মধ্যে একটি মুসলমান রমণীর প্রতি অত্যাচারের ফলে যে নূতন অত্যাচার হয়েছে, তার ফল—অত্যাচারীর দেহ শতাধিক গুলির আঘাতে বিধ্বস্ত ক'রে, তারপর তার মাথা কেটে, একটা বর্শার ফলকে বিঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ান হয়েছে, তার পরিবারবর্গের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে, তার ভাইকেও গুলি ক'রে মারা হয়েছে।

লাহোর হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ এই অপরাধের যে শাস্তি দিয়েছেন, তাও বেশ পর্য্যাপ্ত। পাপ করলেই ভুগতে হয়—এ না হয় মানতে হবে, কিন্তু কতদিন ধরে নারীর প্রতি এই যে অত্যাচার, এই অনাচার চলবে, একথা শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষকেই জিজ্ঞাসা করলে কি বড় অন্যায় হবে? এমন দিন নেই, যে দিন এই একটা-না-একটা অত্যাচারের কাহিনী শুনতে না পাওয়া যায়—অথবা তার শাস্তি না হয়। কই, শাস্তিতেও ত' এর অবসান নেই!

অন্ধ-বালকের কৃতিত্ব

শ্রীযুত জে, সি, গুপ্তের পুত্র শ্রীমান সাধনচন্দ্র গুপ্ত, এবারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয়—কৃতিত্বের সঙ্গে। দেশের একটি অন্ধ-ছেলের এই সাফল্য দেখে আমরা অত্যন্ত প্রীত। শ্রীমান্ সাধনকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি যে, চোখ না থাকা সত্ত্বেও সে যেমন জ্ঞানের পথে এগিয়ে চলেছে, তেমনি যেন সেই মহাজ্ঞান তার হয়—অন্ধ হয়েও সে যেন পূর্ব্বকালের ঋষিদের মতন জ্ঞান ও ঋদ্ধি সম্পন্ন হ'য়ে অন্তর-সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনে চরম জ্ঞান লাভ করে।

সহ-শিক্ষা

মিঃ ফ্রাঙ্ক সি, ব্যানক্রফট, বি-এ, বি-ডি, সহ-শিক্ষা সম্বন্ধে একটা সাবধানের কথা তুলেছেন। তিনি ভারতবর্ষে এই যে ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলতে সুরু হয়েছে, আর ভারতবর্ষের বাইরে যে ভাবে চলে, তার সঙ্গে একটা তুলনা করে বলছেন—

The purpose of Co-education is to minimise and not to maximise consciousness of sexual differences. This can never be done while there is a completely lopsided disparity of numbers"—অর্থাৎ সহ-শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নর-নারীর মধ্যে যৌন-পার্থক্য, তার জ্ঞান, তার বোধকে যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া, সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া নয়। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কখন সম্ভব হতে পারে না, যতক্ষণ সংখ্যার দিক দিয়ে থাকবে বৈষম্য—অথবা একদিকে সংখ্যার ভার বেশী থাকবে।...

সহ-শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে নানা আলোচনা চলছে, চলবে এবং চলা উচিত। কিন্তু তাতে যে সুফল হবে, এমন কথা কি কেউ জোর-গলায় বলতে পারেন। অতি শিশুকাল থেকে একসঙ্গে ছেলে-মেয়েরা যদি পড়ে, তাতে অবশ্য কোন দোষ স্পর্শ করে না—কেন না, সে সময়ে তাদের যৌন-প্রকৃতি সজাগ হয় না। কিন্তু যখন সেই যৌন-প্রকৃতি সজাগ হ'য়ে ওঠে, তখন তাদের এক সঙ্গে রাখা যে সকল সময় যুক্তি-সঙ্গত, এ কথা খুব সহজে স্বীকার করা কোন মতেই যায় না। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, সমানভাবে ছেলেদের মত বিদ্যা অর্জ্জন করতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, শিক্ষা দানের মধ্যে কোন ত্রুটী, কোন ভেদ রাখা একেবারেই সঙ্গত নয়—এ কথা আমরাও স্বীকার করি, এবং সে মতেরও আমরা পক্ষপাতী। তবে যে বয়সটায় চাঞ্চল্য স্বাভাবিক সে বয়স থেকে সংযত হওয়া এবং মেলা-মেশা করতে না দেওয়া আমাদের মতে সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষা হিসাবে কর্ত্তব্য।

আসামের বন্যা ও প্লাবন

বিধির মার দুনিয়ার বার—আমাদের আজ সেই অবস্থা। দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম সব ভেসে গেল। এই সেদিন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত, আবার এই প্লাবন। দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবাসী যে কার পানে মুখ তুলে চাইবে, কি যে করবে, তার আর দিশা পায় না। দিনের পর দিন রোগে, ম্যালেরিয়ায়, খাদ্যাভাবে দেশের লোকের হাহাকার করা ছাড়া আর কোন শক্তিই তাদের নেই। তার ওপর প্রকৃতির ইচ্ছামত কৃপা—দেবতার কৃপায়—সবই যেতে বসেছে। আসাম প্রদেশ থেকে যে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, প্রতিদিন সংবাদ পত্রে যে সমস্ত চিত্র—এই বন্যা-পীড়িত নরনারীর দুর্দ্দশার চিত্র দেখছি, তাদের অভাব, তাদের দুরবস্থার কথা যা শুনছি, যাঁরা চোখে দেখে এসেছেন তাঁদের কাছে—এই আমার দেশের দুর্গতদের কথা যা শুনছি—তাতে মুখে বলবার কিছু নেই সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। কি যে এর উপায়, কে বলে দেবে! বন্যা-পীড়িত দুর্গতদের সাহায্যের জন্য যে সব সমিতি হয়েছে, তাঁরা সকলেই যথাসাধ্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, এই দুঃখের দিনে সাহায্য করতে, কিন্তু কোথায় সে অর্থ, যা দিয়ে এই এতবড় কাজ সম্পূরণ হতে পারে। ঘর গেছে, দোর গেছে, মাটিতে দাঁড়াবার জায়গা নেই, গাছে চ'ড়ে, মাচানে চ'ড়ে প্রাণ বাঁচান। গরু-বাছুর, গৃহপালিত পশু, জঙ্গলের ঐরাবৎ পর্য্যন্ত সে বানের তোড়ের মুখে ভেসে গেছে। কে আছে যে, এ মহা বিপদ থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করবে! সকল রকমে যারা পীড়িত, যারা সহায়হীন দুর্ব্বল, তাদের আছেন ভগবান—এই কথাই চিরদিন শুনে আসছি—কিন্তু কোথায় ভগবান! যদি সত্য তুমি থাক, একবার মুখ তোলে চাও! দেশের ধনীদের হৃদয়ে সহানুভূতি জাগিয়ে দাও, যাতে তাঁরা অর্থ দিয়ে এই দুর্গতদের প্রাণ রক্ষা করেন।

মাদাম কুরী

বিজ্ঞান-জগতের একটী জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল! বর্ত্তমান নারী-জগতের মাথার মণি অন্ধকারে আজ লুকাল। মাদাম কুরী ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। মাদাম কুরী বিজ্ঞান-জগতে যে আবিষ্কার করে গেছেন, সে আবিষ্কার যে কত বিরাট, তা, যাঁরা বিজ্ঞানের সংবাদ রাখেন, তাঁরা অতি অবশ্যই জানেন। এই আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন যুগ এনেছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে অর্পণ করা হয়। আবার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বারও নোবেল পুরস্কার পান। পাশ্চাত্য দেশে নারী শিক্ষা পেয়ে কি অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে, তার নিদর্শন এই মাদাম কুরী। শুধু শিল্প-সাহিত্য নয়—বিজ্ঞানের প্রতিভা আজকের দিনে সাহিত্য প্রতিভার চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ, একথা স্বীকার করতেই হবে, কেননা বিজ্ঞান আজ মানুষকে বাঁচাবার, কর্ম্ম-জগতে কর্ম্মের প্রসার বাড়াবার, জগতে অগ্রসর হবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

আমরা মাদাম কুরীর প্রতিভাকে শুধু নোবেল-পুরস্কার-প্রতিভা বলে সম্মান দেব না, তার চেয়ে বড় সম্মান দেব এই বলে, যে জগতের নারী জাতির মধ্যে তিনি ধন্যা। আশা করি আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে আমরাও একদিন মাদাম কুরী পাব। তাঁরা যেন এই মহান আদর্শ নিত্য স্মরণ করেন।

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এ্যালবার্ট-হলে কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির মৃত্যুর জন্য শোকসভা হয়ে গিয়েছে। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোক এই সভায় যোগদান করেছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের জন্য সকলেই শোক-প্রকাশ করেছেন। বাঙলার এতবড় গুণী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য বাঙলা দেশ তাঁর যথোপযুক্ত অর্ঘ্যই দান করবার প্রস্তাব করেছে। শিরোমণি মহাশয় যে কত বড় অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন, তা যিনিই তাঁর সম্পর্কে এসেছেন, তিনিই জানেন। তিনি যে, দারিদ্র্য থেকে নিজের বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও সুচিকিৎসার বলে কবিরাজ শিরোমণি হয়েছিলেন—সে মণীষা, সে সাধনা ভবিষ্যতে এই পথের পথিকদের সেই মহান্ আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। তাঁর জীবন চিরদিন আমাদের দেশের আদর্শকে জাগিয়ে রাখবে, এই আশাই আমরা করি। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়কে আমাদের সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই, কেন না মৃত্যু আছেই, তাকে কেউ রোধ করতে পারে না। শুধু এইটুকু বলার আছে, তিনি যেন তাঁর স্বর্গগত পিতার মুখোজ্জ্বল করেন, আর তাঁর একখানি জীবন-চরিত বাঙলা দেশকে দান করেন। যা পেয়ে বাঙলার লোক তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন পূজা করতে পারে।



ভাদ্র ১৩৪১ — দ্বিতীয় বর্ষ — পঞ্চম সংখ্যা

উদয়ন

বৃহত্তর বঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্

"বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটী আমরা আজকাল খুবই ব্যবহার করিতেছি। কয় বৎসর ধরিয়া আমাদের "প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন"-এর যে সকল অধিবেশন হইতেছে, সেগুলিতে "সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান" শাখার উপরন্তু একটী "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখাও স্থান পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, পত্র-পত্রিকায়ও "বৃহত্তর বঙ্গ"কে হালের বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব বলিয়া আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা, উচ্ছ্বাস-আলোচনা করিতেছি। কথাটা কিন্তু বেশী দিনের নহে; আমার মনে হয়, ১৯২৬ সালে ভারতের বাহিরের দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" স্থাপিত হয়, তাহার পরে "বৃহত্তর ভারত"—এই সংযুক্ত পদ দুইটীর দেখাদেখি "বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটীও ব্যবহৃত হইতে থাকে। আগে আমরা "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" জানিতাম, "প্রবাসী বাঙ্গালী" জানিতাম। ১৯০০ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে "বৃহত্তর বঙ্গ" শব্দদ্বয় ও তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব দুর্ব্বোধ্য হইত; ১৮৫০ সালের বাঙ্গালীর পক্ষে কথাটী ও তাহার অর্থ উভয়ই অবোধ্য লাগিত। অথচ এই কয় বৎসরে এই কথাটী হালের বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গৌরববোধ, আত্ম-প্রসাদ ও শক্তিসংগ্রহ (এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবঞ্চনার) একটা মস্ত বড় সহায়ক হইয়া পড়িতেছে।

জিনিসটা আমাদের তলাইয়া বুঝা দরকার।

"বৃহত্তর বঙ্গ"—এই কথাটার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এই — ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, অ-বাঙ্গালী অর্থাৎ যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বলে না, এমন লোকেদের মধ্যে, ব্যক্তিগত বা সমাজগত ভাবে আজীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বসবাস কালে যে সকল কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে, মুখ্যতঃ সেই কৃতিত্বের বিচার, এবং সেই কৃতিত্ব-জনিত আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তির আবাহন। সঙ্গে সঙ্গে, উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার ও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতির আলোচনা ও যথাযথ

ইহাদের বিবর্দ্ধন বা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের স্বার্থ বা অস্তিত্ব রক্ষা করা, তথা আধুনিক ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্থান গৌরবের ও সম্মানের স্থান করিয়া রাখা।

* * * *

সন ১৩০৮ সালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রয়াগ হইতে "প্রবাসী" পত্রিকা বাহির করেন, তখন হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী বা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিতজনগণ একটু বেশী করিয়া সচেত হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে "প্রবাসী" পত্রিকার মারফৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়, "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" শীর্ষক জীবন-চরিতাত্মক প্রবন্ধাবলীতে, যে সব কৃতী বঙ্গ-সন্তান বিগত দুই পুরুষ ধরিয়া (এবং ক্বচিৎ তাহার পূর্ব্বেও) বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে গিয়া বীয় বিদ্যা ও চরিত্রগুণে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, ধারাবাহিক ভাবে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের নিকটে তাঁহাদের সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুপরিচিত "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকের দুইটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে—এই বইয়ের দ্বারা বৃহত্তর বঙ্গের বোধ বাঙ্গালী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আজকাল যাতায়াতের সুবিধা খুবই বাড়িয়া যাওয়ায়, পশ্চিমের দূরতম প্রদেশ মাত্র দুই এক রাত্রির, ক্বচিৎ তিন চার রাত্রির রেল-ভ্রমণের পথে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী আর সত্য সত্য প্রবাসী থাকিতেছেন না, দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ রাখা সম্ভব হইতেছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা—প্রাচীন ভারতের নাবিক, বণিক, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শিল্পী ও সাধারণ ব্যক্তি—ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া সেই সব দেশে ধর্ম্ম ও সভ্যতার এক অভিনব বৃহত্তর ভারতের পত্তন করিয়াছিলেন। "বৃহত্তর ভারত", ভারতের এক গৌরবময় অবদান। ইহারই অনুকরণে "বৃহত্তর বঙ্গ", এই ভাবময় সমস্ত-পদের সৃষ্টি। "বৃহত্তর ভারত"—মুসলমান-পূর্ব্ব ভারতের কৃতিত্বের পরিচায়ক; ব্যাপকভাবে, আধুনিক ভারতের প্রসারের কথাও ইহার মধ্যে নিহিত। "বৃহত্তর বঙ্গ"—মুখ্যতঃ উনবিংশ শতকে ভারতের অন্য প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা।

* * * *

এখন, এই কয় বৎসর ধরিয়া "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া আমরা একটু বেশী সাত্মাভিমান হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটী কারণ আছে। এই কারণ দুইটী প্রবাসী বাঙ্গালী ও ঘরবাসী বাঙ্গালী উভয়েরই মধ্যে পরিদৃশ্যমান।

প্রথমতঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা তেমনই (কোথাও কোথাও বরং অনেক বেশী) খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে বঙ্গের বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। অনেক ক্ষেত্রে আবার বাঙ্গালীর সম্মানপূর্ণ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালী আর ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র নহে; ইংরেজের আশ্রয়ে উন্নতি-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালার বাহিরের বহু স্থানের লোকেদের মনে যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে, রাম এবং রাবণ উভয়েরই হাতে তাহার লাঞ্ছনা। এক্ষেত্রে উচ্চ পদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্ভবতঃ অর্থের প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত প্রবাসী বাঙ্গালীকে নৈতিক প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে হইবে, নহিলে কালধর্ম্মের প্রতিকূল স্রোতে তাহাকে ভাসিয়া যাইতে হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অন্ন-সংস্থানের জন্য, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছিল, সত্য; কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদের কারণ, যে যে স্থানে চিরতরে সে বাসা পাতিয়াছে, সেই সেই স্থানে শিক্ষা ও মানসিক

সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাহার জাতির পক্ষে গৌরবেরই কথা। এই ইতিবৃত্তের আলোচনা ও অনুশীলন তাহাকে যথেষ্ট শক্তি দিতে পারে। এই জন্য বৃহত্তর বঙ্গের চর্চ্চা।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে, আমাদের ভিতরে একটা পরাজয় ও পরাভবের হাওয়া বহিতেছে। সকলেরই মনে এই ভাবটী অল্প-বিস্তর জাগরিত হইতেছে যে—আমাদের অবস্থা বনের হরিণের মত—"হরিণ জগতবৈরী আপনার মাসে।" বাঙ্গালাকে সকলে মিলিয়া লুঠিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ হইতেছি না। অন্য বিষয়েও আমরা হঠিয়া পড়িতেছি। আমাদের এখন অর্থনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সব রকমের আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে। "বৃহত্তর বঙ্গ" আমাদের একটী বড় আধ্যাত্মিক আশ্রয়। দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া যাওয়ায়, এখন আমাদের কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। হাতী পাঁকে পড়িলে, বেঙেও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। আমরা অতীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছি, যখন হইতে ভারতে ভারতীয় তথা প্রাদেশিক জাতি-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তখন হইতে বাঙ্গালী ভারতের অন্য জাতিদের পশ্চাতে কখনও থাকে নাই। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—বঙ্গ-মাতাকে আমরা আত্মবিশ্বাস পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একথা বলিতে পারি। "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালীর অধুনাতন কৃতিত্বের একটী লক্ষণীয় নিদর্শন, ইহার চর্চ্চায় আত্মবিশ্বাস আসিবে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি আমরা পাইব,—সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি হিসাবে পাইব।

বাহিরে ও ভিতরে, অন্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে, "বৃহত্তর বঙ্গ"-বাদ আমাদের কতটা শক্তি দিতে পারে, আমাদের বাঙ্গালী জীবনে কি ভাবে ইহাকে সার্থক করিতে পারা যায়—তাহা আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এই আলোচনা ঐতিহাসিক বিচার দিয়া আরম্ভ না করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিতে গেলে, তিনটী কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে তিনটী কথা এই—

[১] বাঙ্গালা-দেশ ভারতেরই অংশ।

[২] বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় জাতি-মণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত, ভারত-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা তাহার নাই।

[৩] বাঙ্গালার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশ—ভারত-বিরোধী পৃথক্ বাঙ্গালী-সংস্কৃতি নাই।

এইরূপে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেও, বাঙ্গালা-দেশের সংস্কৃতিতে দুই-একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া, সংস্কৃতি-বিষয়ে "বাঙ্গালা-বনাম-ভারত" এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সংস্কৃতি-বিষয়ে এক হইলেও, অর্থ-নৈতিক ও অন্য বিষয়ে পার্থক্য বা বিরোধ আসিতে পারে। যেমন ইংল্যাণ্ডের ইংরেজ ও আমেরিকায় উপনিবিষ্ট ইংরেজদের মধ্যে ঘটিয়াছিল। সেরূপ বিরোধ আসিলে, সংস্কৃতির ঐক্য কিছুই করিতে পারে না; তখন আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রত্যেক সম্প্রদায় বা সমাজকে সচেষ্ট হইতে হয়। নিজ অস্তিত্ব বা নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বাধা প্রদান করা তখন কর্ত্তব্যই হইয়া দাঁড়ায়।

* * * *

বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্ব কথায়, "বৃহত্তর বঙ্গ" এই আদর্শ কত প্রাচীন? বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, মগধ হইতে আর্য্যভাষা ও উত্তর ভারতের আর্য্যানার্য্য-মিশ্র গাঙ্গ সভ্যতা ভারত-বিজয়ী সভ্যতারূপে বাঙ্গালা-দেশে আসিবার পূর্ব্বে, এদেশে অস্ট্রিক্ (কোল ও মোন্-খ্মের) জাতীয় এবং দ্রাবিড় জাতীয় অনার্য্য জাতি বাস করিত। ইহাদের নিজস্ব পৃথক্ পৃথক্ সংস্কৃতি ছিল; এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে, কোথাও কোথাও ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতি-গত

এবং শোণিত-গত মিশ্রণও হইয়াছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির লোকেরা কিন্তু নিজ জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইতে পারে নাই। তাহা হইলে, আজ পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি জীবিত থাকিত—অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালা দেশ পুরাপুরি আর্য্যভাষী হইয়া পড়িত না। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির লোক—ইহাদের মধ্যে কোনও সংহতি-শক্তির উদ্ভব হয় নাই; দুইটী পৃথক্ জগৎ—অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়—দুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় তখনও হইতে পারে নাই; ঐক্য-বিধায়ক এমন কিছু বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠে নাই, যদ্দ্বারা উত্তর-ভারতের আর্য্যভাষা ও উত্তর-ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রতিহত হইতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অনুমান হয়, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে বঙ্গদেশ মৌর্য্যরাজগণের আমলে বিজিত হয়। মৌর্য্য যুগে পূর্ব্ববঙ্গে "সংঘ" নামে সঙ্ঘ-বদ্ধ বঙ্গীয় গণসঙ্ঘের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গবাসিগণের প্রাদেশিক গৌরব বা স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোনও পরিচয় আমরা পাই না।

মৌর্য্য যুগের পরে সুঙ্গ ও কুষাণ যুগ আসিল, গুপ্ত ও পাল যুগ আসিল। পাল যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেন রাজাদের শাসনকাল আসিল। তারপরে ত্রয়োদশ শতকের সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইল। তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্ব্বেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা আর্য্যভাষী হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর ভারতের সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল; জাতির সেই যুগান্তরের সময়ে বঙ্গবাসিগণের পক্ষে সাত্মাভিমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের আজকালকার প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার মূল হইতেছে সমভাষিত্ব। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে এই সমভাষিত্ব বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না, তখন দেশের লোকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর নানা ভাষা বলিত, এবং অনার্য্য ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষার বাঁধন মানিয়া লইয়া তখন এ দেশের লোকেরা সবেমাত্র একতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। গুপ্ত ও প্রথম পাল যুগে বাঙ্গালার সহিত বিহার ও কাশী অঞ্চলের ভাষাগত সাম্য ছিল বলিয়া মনে হয়, তখন একই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ (খুব খুঁটীনাটী প্রাদেশিক ভেদ হয় তো ছিল, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে) সারা পূর্ব্বভারতে আর্য্যভাষারূপে সর্ব্বজনগৃহীত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল পাল বংশীয় রাজাদের রাজত্বের শেষ ভাগে—খ্রীষ্টীয় দশম শতকের দিকে। তখনও বঙ্গদেশবাসীর—গৌড়-বঙ্গজনের—"বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা" জন্মলাভ করে নাই; বাঙ্গালারই মত, ভারতের অন্যত্র কোথাও এরূপ ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতা তখন উদ্ভূত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী তাহার ঘরোয়া ভাষাকে "প্রাকৃত" বলিত, ঘরোয়া ভাষায় সে অল্প-স্বল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়ই সে বেশী লিখিত; এবং এতদ্ভিন্ন, উচ্চকোটির সাহিত্য-রচনার জন্য নিখিল ভারতের সর্ব্ব-প্রধান ভাষা সংস্কৃত তো ছিলই।

তুর্কী-বিজয়ের পূর্ব্বে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা যেমন, তেমনিই বিশেষ একটী প্রান্ত-নিবদ্ধ গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় গৌরব অনুভব না করিয়া, বঙ্গদেশের রাজা, পণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রচারক, কবি, শিল্পী, ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টিসাধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতটুকু উপায়ন ভারতমাতার চরণতলে সেদিনের গৌড়-বঙ্গ-বাসী আনয়ন করিয়াছে, তাহা সে আত্মসত্তা অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবাসীর সত্তা বা চেতনা উপলব্ধি না করিয়াই করিয়াছে। রাজনৈতিক দিকে গৌড়-বঙ্গ-মগধেশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপালের আমলে একবার বঙ্গবাসী উত্তর ভারতের কনোজের রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণ-ভারত পর্য্যন্ত জয়যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক প্রভাব ও দিগ্বিজয় আদি ব্যাপারে বঙ্গবাসিগণের

কৃতিত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; মাটি আঁচড়াইলেই যে দেশে ধান মিলিত, সে দেশের লোকেদের বাহিরে যাইবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃতি-বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা, ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে লক্ষণীয় দান যোগাইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ যুগের ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে। বৃহত্তর ভারতের পত্তনে বাঙ্গালার সহায়তাও যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া সুবর্ণ-দ্বীপ বা সুমাত্রা ও যবদ্বীপের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগ ছিল। বাঙ্গালার তাম্রলিপ্তি বা তমলুক বন্দর ভারতের সভ্যতার বাহিরে প্রসারের জন্য এক প্রধান পথ ছিল। ভারতের প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসে গৌড়-মগধ রীতির ভাস্কর্য্য একটী প্রধান বস্তু—এই রীতির বিকাশে বাঙ্গালার বরেন্দ্রভূমির বীতপাল ও ধীমান্ নামক ভাস্করদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্গদেশের দান অল্প নহে। "গৌড়ী রীতি" নামক সংস্কৃত কাব্য-রচনার রীতি বাঙ্গালা-দেশেই উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ব্যাকরণ, শব্দকোষ, টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

মোটের উপর, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অংশগ্রহণ-কার্য্য যখন ঘটিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া বিশেষ গৌরব বোধ হওয়া সম্ভব ছিল না—তখন বাঙ্গালা ভাষা সূতিকাগারে, এবং বাঙ্গালী জাতির বা অন্য কোনও প্রাদেশিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা আসে নাই। চন্দ্রগোমিন্, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভট্ট ভবদেব, জয়দেব, বন্দিঘটীয় সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি—ইঁহারা প্রাচীন ভারতের, ইঁহাদের লইয়া সমস্ত ভারত গৌরব করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বিশিষ্ট বোধ বা চেতনা ইঁহাদের সময়ে ছিল না।

মুসলমান যুগে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী তখনও পূর্ণভাবে সাত্মাভিমান হয় নাই। তুর্কী-বিজয় বাঙ্গালীর জীবনের অঞ্চল-দেশ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল; ইহা তাহার জীবনকে পুরাপুরি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটা উন্মুখ আন্তর্ভারতিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল,—হিন্দু আমলে স্বাধীনভাবে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিক জীবনকে পূর্ণ করিয়া দিতেছিল, কিন্তু মুসলমান রাজশক্তি আসিয়া তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। আসন্ন আপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী কূর্ম্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিল, বাধ্য হইয়া সে তাহার গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই অঙ্গ-সংহরণ করিয়া লইল। খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের পর হইতে, ১৮৫০ সালের দিকে ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়া ভারতের চারিদিকে ছড়িয়া পড়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, সাড়ে সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে জীবন ছিল, তাহা মোটের উপর গ্রাম্য জীবন ছিল। যখন রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ, উড়িয়া, তেলুগু, কানাড়ী, উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, এই সব জাতি মিলন করিয়া বা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া ভারতের মধ্যযুগের বা মুসলমান-যুগের ইতিহাস রচনা করিতে নিযুক্ত, তখন, কবির ভাষায়—

> সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
> পায় নি সংবাদ,
> বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
> শুভ শঙ্খনাদ!
> শান্ত মুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল-
> শ্যামল উত্তরী',
> তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী সন্তানের দল
> ছিল বক্ষে করি'॥

মুসলমান-যুগে বাঙ্গালী হিন্দুদের নিজ সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার প্রথার ফলে বাঙ্গালীর সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে একটা গেঁয়ো

ভাব কায়েমী হইয়া গেল। হিন্দুযুগে বাহিরকে লইয়া তাহার যেটুকু কারবার ছিল—ভারতের অন্য প্রদেশকে লইয়া, যবদ্বীপ, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশকে লইয়া ছিল,—সেটুকু আর বজায় রহিল না। বাঙ্গালী নিজ সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য সমাজ ছাড়িয়া ক্বচিৎ বাহিরে যাইত—সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মিথিলা ও কাশী এবং তীর্থযাত্রার জন্য পুরী, গয়া, কাশী পরে বৃন্দাবন, ক্বচিৎ কাঞ্চী, রামেশ্বর, দ্বারকা—ইহাই তাহার দৌড় ছিল। এতদ্ভিন্ন, কখন-সখন (বিশেষতঃ মোগল-বিজয়ের পরে) কোনও বাঙ্গালী জমীদার দিল্লী, আগরা পর্য্যন্ত যাইতেন,—বাদশাহের দরবারে সেলাম দিবার জন্য, জমীদারীর সনদ আনিবার জন্য। বাঙ্গালী মুসলমান এবং সম্ভবতঃ দুই চারিজন হিন্দুও—বহির্বাণিজ্যের জন্য ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া এদিকে বর্ম্মা, মালয়দেশ, দ্বীপময় ভারত, ওদিকে দক্ষিণ ভারত ও সিংহল, গোয়া, গুজরাট, আরবদেশ পর্য্যন্ত যাইত। কিন্তু এই সাগর-যাত্রাটুকুও ফিরিঙ্গী "হর্মাদ" বা পোর্ত্তুগীস বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী পুরাপুরি ঘরবাসী হইয়া দাঁড়াইল, তাহার জীবনে সাগরের ছাপ আর পড়িল না। কালাপানি পার হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এবং পণ্ডিতেরা এই কলিযুগে সাগরযাত্রা নিষিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর একটা গৌরবের পথ এই ভাবে চর্চ্চার অভাবেই রুদ্ধ হইয়া গেল—মুসলমান রাজশক্তিও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিল, কোনও সাহায্য করিতে পারিল না। মোগল-পূর্ব্ব যুগে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতীর মত এক আধজন বাঙ্গালী, বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে গিয়া, বাঙ্গালার সঙ্গে বাহিরের যোগ পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু তখন গেঁয়ো ঘরমুখা বাঙ্গালীর কাছে তাহার কুঁড়ে ঘরের প্রদীপটীই প্রিয় হইয়া গিয়াছিল, সে বাহিরের আলেয়ার পিছনে ঘুরিতে ভয় পাইল।

* * * *

"বৃহত্তর বঙ্গ" বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রসার মোগল-পূর্ব্ব যুগে একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের মত সজ্ঞান গৌড়িয়াপনা বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই ছিল না। চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালীকে আর "ঘ'রো" ও "কুপো" থাকিতে দিলেন না; তিনি যে নাম-প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর কুটীর ও গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড় হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গালা দেশের নহেন—তিনি বাঙ্গালীত্বের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহাকে লইয়া কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এবং সেরূপ করিলে তদ্বারা চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্য্যাদা করা হইবে। পুরীতে জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছিলাম—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গভীর ভক্তির সহিত তিনি বলিতেছিলেন—"মহাপ্রভু লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ জাতির নন; তাঁহার বাল্য-জীবন ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে; দক্ষিণীদের মধ্যে ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে মধ্য-জীবনের কিয়দংশ তিনি অতিবাহিত করেন; এবং তাঁহার শেষ জীবন তিনি যাপন করেন উড়িয়াদের মধ্যে।" চৈতন্যদেবের শিক্ষায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল; বাঙ্গালী পুরীতে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলি উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দু-যুগের পরে আবার বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী কর্ম্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে, বাঙ্গালী ভাবের—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের—প্রচার বাহিরে কিছু কিছু হইল বটে, কিন্তু তখনও এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সজ্ঞান ও সাত্মাভিমান বাঙ্গালীয়ানা দেখা দিল না।

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মানসিংহ আসিয়া বাঙ্গালার যশোহরেশ্বরীকে আম্বেরে লইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত গেল। বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব তদ্রূপ জয়পুরে হিন্দুরাজার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার কতকগুলি রাজ্যে বাঙ্গালী গোস্বামীদের অধিষ্ঠান হইল। বাঙ্গালী জ্যোতিষী পণ্ডিত বিদ্যাধর, জয়পুর-নগর স্থাপনের সময়, সবাই রাজা জয়সিংহের সহায়ক হইলেন। ষোড়শ শতক হইতে শ্রীরূপ সনাতন জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অবস্থানের ফলে, বৃন্দাবন বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই সব কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালী মর্য্যাদার বড়াই কেহ করেন নাই—ভারতের আর পাঁচটী জাতির মধ্যে অন্যতম জাতি-হিসাবে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

মোগল-যুগে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হইল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ফারসীর চর্চ্চা বাড়িল। উত্তর-ভারতের রাজ-দরবারে বাঙ্গালার মলমলের চাহিদা বেশী করিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গালার বাঁশের কুঁড়ের চাল-রচনার ধাঁচা রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে pavilion বা বিমান নির্ম্মাণে গৃহীত হইল, ইহার ফলে রাজপুত-মোগল বাস্তুশিল্পে "রেওটী" নামক বাঁকা-ছাত বিমানের উদ্ভব হইল।

মুসলমান-যুগে চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছাড়া বাঙ্গালাদেশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভূত হয় নাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান ছিল না। সজ্ঞান "বৃহত্তর বঙ্গ" তখন হয় নাই,—যদিও প্রশংসনীয় ভাবে বঙ্গভাষীর প্রভাব বঙ্গের বাহিরে কোনও কোনও দেশে গিয়া পঁহুছিতেছিল।

* * * *

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতেই বাঙ্গালাদেশে ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাদুর্ভাব ঘটিতে থাকে। পারস্য-রাজের আর্ম্মানী প্রজারা ষোড়শ শতক হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, বাঙ্গালা দেশেও তাহাদের গতায়াত ছিল। ১৬৩০ সালের পূর্ব্বেই আর্ম্মানীরা কলিকাতায় একটী ব্যবসায়-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা তৈয়ারী জমীতে, ১৬৯১ সালে ইংরেজ জব চার্ণক ইংরেজদের একটা আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে দেশমধ্যে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মূর্খ, দুর্ব্বল অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলার রাজ্যকালে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। অজ্ঞান, স্বার্থপর, কুচক্রী, মনুষ্যত্ব-বিহীন জনকয়েক বাঙ্গালী ও বঙ্গপ্রবাসী জমীদার, সমাজ-নেতা, সেনানী ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া স্বদেশকে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিল।

* * * *

অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজ বাঙ্গালাদেশে রাজা হইয়া বসিল, এবং বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষময় ইংরেজের রাজ্যের প্রসার ঘটিল। কেবল পয়সার জন্য যাহারা ধাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত, এরূপ তেলেঙ্গা ও ভোজপুরিয়া সিপাহীর সাহায্যে, এবং বাঙ্গালারই পয়সায়, ইংরেজ ধীরে ধীরে উনবিংশ-শতকের প্রথমার্দ্ধে প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া ফেলিল। ইংরেজ শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজের তল্পীদার-হিসাবে বাঙ্গালীরও বিস্তার ঘটিল। যেখানে যেখানে ইংরেজের ছাউনী, ইংরেজের তহশীল, ইংরেজের পুলিস, ইংরেজের দপ্তর, ইংরেজের আদালত, ইংরেজের স্কুল, ইংরেজের দোকান ও ইংরেজের ডাকঘর বসিল, সেখানে সেখানে ইংরেজী-জানা কেরাণী, রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষক, উকীল দরকার হইল, এবং বাঙ্গালী অল্প দু'পাতা বা বেশী করিয়া ইংরেজী পড়িয়া সেখানকার

ইংরেজী-নবীস লোকের অভাব দূর করিল। হাস-পাতাল হইল, ইংরেজ ডাক্তারের নীচে বাঙ্গালী ডাক্তার গিয়া হাজির হইল। কেবল বাঙ্গালী মজুরের যাইবার দরকার হইল না—উত্তর ভারতে দৈহিক শ্রমের দ্বারা যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এমন অশিক্ষিত লোকের অভাব ছিল না। আর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কেহ গেল না, কারণ ইংরেজের সাহচর্য্যে আসিয়া সে বিষয়ে বাঙ্গালীর উৎসাহ ও প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। ওদিকে উত্তর ভারত হইতে দলে দলে মজুর, চাকর, দরোয়ান, বণিক্ আসিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে কায়েম হইয়া বসিল, পরে দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। বিহারী আসিল, হিন্দুস্থানী আসিল, উড়িয়া আসিল; পরে মাড়ওয়ারী ও পাঞ্জাবী আসিল—এখন ভাটিয়া ও গুজরাটী আসিতেছে, নেপালী আসিতেছে, তেলুগু আসিতেছে, অন্য মাদ্রাজীও আসিতেছে।

এইরূপে বাঙ্গালার বাহিরে ইংরেজের আমলে ও ইংরেজের আশ্রয়ে নবীন যুগের এক "বৃহত্তর বঙ্গ" যেমন প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমন—সে দিকে আমরা কোনও দৃষ্টি দেই নাই—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এক-একটী "বৃহত্তর বিহার", "বৃহত্তর হিন্দুস্থান", "বৃহত্তর মারওয়াড়", "বৃহত্তর উড়িষ্যা", এবং হালে "বৃহত্তর পাঞ্জাব", "বৃহত্তর গুজরাট", "বৃহত্তর অঙ্গ"ও স্থাপিত হইতে লাগিল। "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বুকের ভিতরে এই সকল বৃহত্তর অন্য প্রদেশ বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায়, বেশ জাঁকাইয়া বিদ্যমান—আমরা স্বেচ্ছায় ইহাদের নিগড় পরিয়া রহিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিলেও নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

ইংরেজ-আমলে যে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা খুব সচেতন, খুব সাত্মাভিমান বটে,—কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই; একদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, নবীন যুগের এই বৃহত্তর বঙ্গ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে চরম অগৌরবের। ভারতবর্ষের রাজধানী হইতে সুদূর কোণে অবস্থিত একটী প্রদেশের অধিবাসী একটী গেঁয়ো জাতি,—মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে যাহার কোনও স্থান ছিল না, রাজপুত, মারাঠা, কানাড়ী, তেলুগুর মত, ভারতের মুসলমানের মত, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িতে যাহার বিশেষ কোনও লক্ষণীয় সহায়তা হয় নাই, যাহার একমাত্র গর্ব্বের বস্তু হইতেছে কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা এবং মধ্যযুগের আন্তর্ভারতিক ভাবজগতে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বকে দান করা—সেই অনাদৃত গেঁয়ো জাতি, তাহার নেতাদের অশ্রুতপূর্ব্ব নীচতা ও মূর্খতার বশে মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে স্বদেশকে বিকাইয়া দিল; এবং পরে যখন তাহার দেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ দিয়া বাহির হইতে সিপাহীদের কিনিয়া, বিদেশীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা অম্লান-বদনে—অম্লান-বদনে নহে, মহোল্লাসে—বিদেশীর পিছনে-পিছনে চলিল। গরীবের হঠাৎ বড়মানুষী ঘটিল, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল। সাহেবদের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী বড়-সাহেবের পাশে ছোট-সাহেব হইয়া উঠিল। উড়িষ্যা-প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত জন-নেতার ভাষায়—ruling race-এর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী একটী intermediate ruling race হইয়া দাঁড়াইল।

ময়ূর-পুচ্ছে দেহ আবৃত করিয়া বাঙ্গালীর মন অহমিকায়—"হাম্-বড়া" ভাবে পূর্ণ হইল; ইংরেজ কর্ত্তৃক নূতন বিজিত প্রদেশে তাহার সর্দ্দারী করিতে যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি দৈন্য ছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না;—স্থানীয় লোকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না, তবে ইহাতে তাহাদের মনের অন্তস্তলে অজ্ঞাত বা প্রচ্ছন্নভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে একটুখানি জুগুপ্সা, বিদ্বেষ বা হিংসার-ভাব না আসিয়া গেল, তাহা নহে। ইংরেজের সাহচর্য্যের বলে, নূতন-লব্ধ ইংরেজী শিক্ষার দম্ভ ও মোহে, সে ভারতের সুপ্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলিকে বহুস্থলে হেয় ভাবিতে লাগিল। সূর্য্যের তাপ লোকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বালির তাপ লোকে সহিতে চাহে না। বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীদের যে লোকে

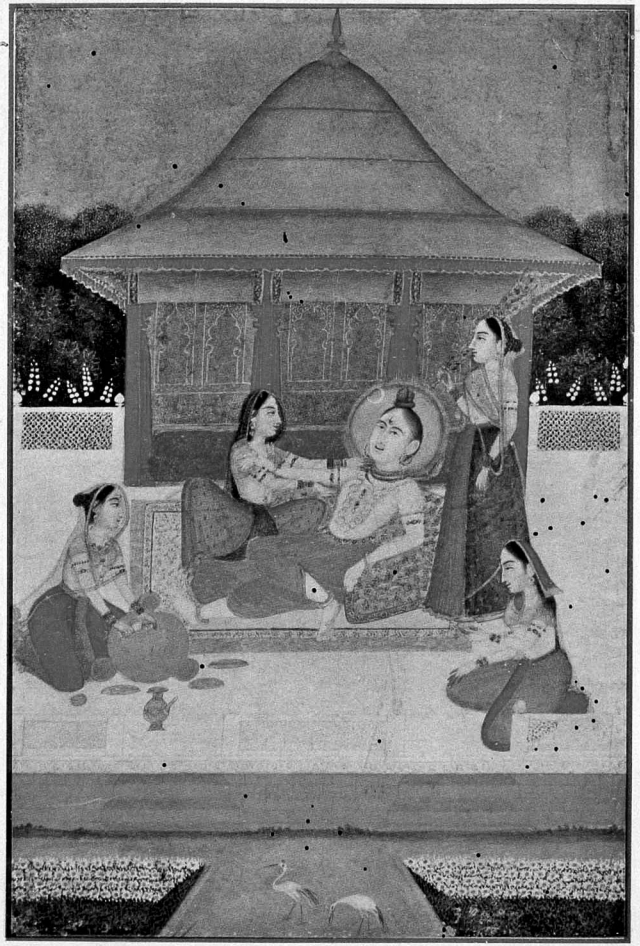

প্রাচীন চিত্র হইতে] ভৈরব-রাগ [শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের সৌজন্যে

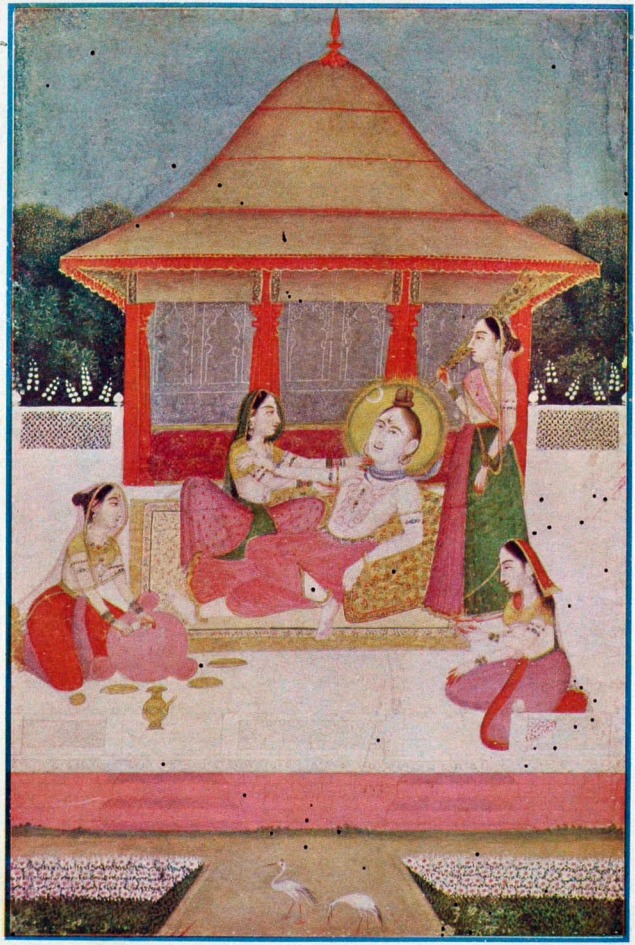

প্রাচীন চিত্র হইতে]　　ভৈরব-রাগ　　[শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের সৌজন্যে

আর তিষ্ঠিতে দিতেছে না, তাহার অন্তর্নিহিত অন্যতম কারণ বোধ হয় এই ;—বিশেষতঃ এখন, যখন সকলেই বুঝিতেছে যে, সরকার বাহাদুর আর বাঙ্গালীর প্রতি ততটা প্রীত নহেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাতী পাকে পড়িলে বেঙেও আসিয়া লাথি মারিয়া যায়—এ প্রবাদ অতি সত্য অভিজ্ঞতার ফল।

গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে, এই "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া হৈ-চৈ করা খুব শোভন ব্যাপার হইবে না। বাঙ্গালীদের "বৃহত্তর বঙ্গ"-র দেখাদেখি মহারাষ্ট্রীয়েরা "বৃহন্মহারাষ্ট্র" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—"বৃহন্মহারাষ্ট্র" লইয়া সভা-সমিতিও হইয়া গিয়াছে। সকলেই বৃহৎ, সকলেই মহান্। কিন্তু "বৃহন্মহারাষ্ট্র" যে-ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল, সে-ভাবে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রসার লাভ করে নাই। আবার প্রাচীন কালে (অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দু-যুগে) যদি আমরা "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার প্রতিষ্ঠা যে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ভাবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে দেরী লাগে না। আধুনিক কালের "বৃহত্তর বিহার" ও "বৃহত্তর উড়িষ্যা" যেভাবে বঙ্গ-দেশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা আবার বঙ্গদেশের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর মারওয়াড়", "বৃহত্তর গুজরাট" ও "বৃহত্তর পাঞ্জাব" হইতে পৃথক্। ইংরেজের "বৃহত্তর ইংল্যাণ্ড" লইয়া ইংরেজ জাতি গর্ব্ব করিয়া থাকে, তাহাদের গর্ব্ব করিবার অধিকারও আছে; আরবের "বৃহত্তর আরব", যাহা আরব দেশ ছাপাইয়া এরাক বা মেসোপোতামিয়া, শাম বা সিরিয়া, মিসর, সুদান, ত্রিপোলি, তুনিসিয়া, আল্-জযাইর বা আল্জিয়র্স্, মঘ্রব্ বা মরক্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত, স্পেন, কর্সিকা, সিসিলি, মাল্টা, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এক সময়ে যে "বৃহত্তর আরবদেশ"-এর পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল, সেই বৃহত্তর আরব লইয়া খালি আরব কেন, আরবজাতির মাওয়ালী বা শিষ্য অথবা ভাবজগতের প্রজা অন্য মুসলমান জাতিও গর্ব্ব করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ভারতের ভাবরাজ্যের, ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের ফলে এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র যে "বৃহত্তর ভারত" সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা সেরিন্দিয়া বা প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীন বা ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ-চম্পায়, ইন্দোনেসিয়া বা মালয়দেশ ও দ্বীপময়-ভারতে, তথা ভোট বা তিব্বত, চীন, আনাম, কোরিয়া ও জাপানে দেখিতেছি, তাহা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের অবদান,—আমরা অধঃপতিত ভারতীয়েরা এই কথা স্মরণ করিয়াও এখন ধন্য হইতে পারি। কিন্তু এখনকার "বৃহত্তর ভারত"? যে ভাবে আড়কাঠীর সাহায্যে কুলী চালান দিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফিজি, গায়েনা প্রভৃতি দেশে নূতন বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কি আমাদের বুক দশ হাত হইতে পারে? এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে—অথবা নিগ্রো ক্রীতদাসদের আগমনের ফলে সংযুক্ত-রাষ্ট্রে যে "বৃহত্তর আফ্রিকা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে—কেহও কি বৃহত্তর ইংল্যাণ্ডের তুলনা করা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে? —"রামচন্দ্র" ও "রামছাগল" উভয়ের মধ্য "রাম" শব্দটী সাধারণ—অতএব এই দুই শব্দ সামান্য-ধর্ম্মী—ইহা এই ধরণের হাস্যজনক কথা হইবে।

আধুনিক বৃহত্তর বঙ্গ আমরা জানি। ইহার যে কোনও সার্থকতা ছিল না, ইহার দ্বারা যে ভারতের কোনও কাজ হয় নাই, তাহা কেহ বলিবে না? কিন্তু রামদাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজী কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতকে বৃহন্মহারাষ্ট্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যে ভাবে তাহা অষ্টাদশ শতকে পেশওয়াদের দ্বারা ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হয়, তাহা বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পশ্চিমে ও দক্ষিণে ঘুরিয়া একটু আসিলেই বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দর্শনে মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ও মহারাষ্ট্র-সরস্বতীর নিকটে, মহারাষ্ট্র-শক্তি ও মহারাষ্ট্র-বুদ্ধির সমক্ষে মস্তক অবনত না করিয়া পারা যায় না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণ এই বৃহন্মহারাষ্ট্র দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা সত্য বটে, সর্ব্বত্রই যে বৃহন্মহারাষ্ট্র, রামদাস ও শিবাজীর এবং রামশাস্ত্রী ও বালাজী বাজী রাওয়ের মহান্ আদর্শ—

"গো-ব্রাহ্মণ" রক্ষার আদর্শ, অর্থাৎ হিন্দুর সংসার ও সমাজ এবং হিন্দুর জ্ঞান ও সাধনা রক্ষার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গালাদেশে কতক-গুলা মারহাট্টা লুঠেরা আসিয়া যে অমানুষিক অত্যাচার বাঙ্গালার প্রজাদের উপর করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি "বর্গী" নামের সঙ্গে এখনও জড়িত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অপচার দুই দশ স্থলে হইয়াছিল বলিয়া, আদর্শের মহত্ত্ব এবং অন্যত্র তাহার কার্য্যকারিতা খর্ব্ব হয় না। উত্তর-ভারতের হিন্দী কবি ভূষণ যে বলিয়াছিলেন, শিবাজী আসিয়া হিন্দুর "চোটী বেটী রোটী" অর্থাৎ তাহার মাথার শিখা বা ধর্ম্ম, স্ত্রীলোকের সম্মান, এবং রুটী অর্থাৎ অন্ন ও অর্থ-নৈতিক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য উক্তি। বিজেতা ধর্ম্মান্ধ মুসলমান, —কি বিদেশী মুসলমান, কি হিন্দু-সন্তান মুসলমান —যেখানে যাহা ভাঙ্গিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে, লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশক্তি তাহার উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে জীয়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে, কাশীতে এবং অন্যত্র, সংস্কৃত বিদ্যা রক্ষা পাইয়াছিল—অনেকটা পেশোয়াদের পৃষ্ঠ-পোষিত মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের চেষ্টায়। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির, কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দির, মহারাষ্ট্রীয় রাণী অহল্যা বাঈয়ের কীর্ত্তি। উজ্জয়িনীতে গিয়া দেখিলাম, মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রভাবেই অত বড় হিন্দুতীর্থটী পুনরায় প্রাণ পাইয়া টিকিয়া আছে। সুদূর দক্ষিণে তামিলদেশ তাঞ্জোরেও মহারাষ্ট্র হিন্দুর পূর্ণ প্রভাব। এ একেবারে অন্য জিনিস; এ জিনিস উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ও তৃতীয় পাদে বাঙ্গালী কিছু কিছু বুঝিতে পারিত—কিন্তু হিন্দু নামের মর্য্যাদা যাহারা ভুলিতে বসিয়াছে এমন অতি-আধুনিক বাঙ্গালী এ জিনিস বুঝিবে না।

ইংরেজদের middlemen হইয়া, অর্থাৎ তাহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া আমাদের হালের বৃহত্তর বঙ্গের প্রসার। ইহা নায়েবী গোমস্তাগিরি দারোগা-গিরির মতই ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যকার আত্মপ্রসাদের যে কিছুই নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহার এই তল্পিদারীর, এই ফড়িয়াগিরির অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গালী যে জিনিসটী ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির অনেক আগেই পাইয়াছিল—তাহার মনের আধুনিকতা, মনের সংস্কার-মুক্ত ভাব —তাহা তাহাকে এমন একটী স্থানে উন্নীত করিয়াছিল যেখানে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্দ্ধেও সাধারণ ভারত-বাসীর (বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর পক্ষে) পহুঁছান একেবারে অসম্ভব না হইলেও বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। দুইটী জিনিস বাঙ্গালী তাহার ইংরেজ গুরুর নিকটে পাইয়াছিল,—জ্ঞানলিপ্সা, অর্থাৎ নূতন খবর, বাহিরের জগতের খবর জানিবার আকাঙ্ক্ষা,—এবং স্বাধীন চিন্তা। তাহার স্বাধীনতার স্পৃহা এবং জাতীয়তার উন্মেষও এই স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয়।

বঙ্গের বাহিরে গিয়া বাঙ্গালী চাকুরিজীবী এই দুইটী বস্তু ভারতমাতার সেবায় উপস্থাপিত করিল। প্রবাসী বাঙ্গালী উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র যেখানে যেখানে গিয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্রই ইংরেজী স্কুল খুলিয়াছে, অথবা ইংরেজী স্কুল খুলিতে সাহায্য করিয়াছে; ইংরেজী শিক্ষার —অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, টাকা-কড়ি দিয়াছে, জমি দিয়াছে, বিনা বেতনে পরিশ্রম করিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রচার দ্বারা, বিচার করিয়া দেখিলে, এক হিসাবে সে নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়াছে—স্থানীয় লোকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত হইলে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যে ও-সব দেশে আর থাকিবে না, সে কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই;—এই সকল ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রাদেশিক স্বার্থবোধ তাঁহাদের একেবারেই ছিল না, সমগ্র ভারতের হিতৈষণা ইহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী উকিল ও অন্য স্বাধীন ব্যবসায়ীর হাতে

ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রসূত হয়। বাঙ্গালীই ভারতমাতার কল্পনা ও বোধ ভারত-ময় প্রচার করে, "স্বদেশী" মন্ত্র বাঙ্গালীরই প্রচারিত। রাজসরকারে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আগে যাহা ছিল, তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের মন্ত্র বাঙ্গালী যখন প্রচার করিল, ভারতের লোকেরা তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না,—বাঙ্গালার বাহি-রের লোকের চরিত্রে এ বিষয়ে গ্রহণ-শক্তিও যথেষ্ট ছিল।

* * * *

আধুনিক বৃহত্তর বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে চাকুরি-গত-প্রাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের দ্বারা। এইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের সব প্রদেশে নাই। চাকুরিজীবী ছাড়া, কারিগর ও ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরে ও কাশীতে কিছু কিছু আছে, এবং বহু তীর্থবাসী কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবাসী হইয়া আছেন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা, উভয়ই বৃহত্তর বঙ্গে বিদ্যমান। নিজের সম্প্রদায়ের বা সামাজিক গণ্ডির বাহিরে কিছু দেখিলে, সে জিনিসকে সহজে বুঝিতে না পারা, বা বুঝিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা না করা — ইহা এক সাধারণ সঙ্কীর্ণতা; বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত নহে। এই সঙ্কীর্ণতার আনু-সঙ্গিক আর একটি অবগুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিদ্যমান —অনুচিত দম্ভ বা অহমিকা। অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি সাধারণ গালি এই সঙ্কীর্ণতা ও দম্ভ হইতে উদ্ভূত। এই সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে আবার আত্মভোলা উদারতাও দেখা যায়।

বাঙ্গালী যেখানে যেখানে বাস করিয়াছে, তাহার শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সাধ্যমত সেখানকার লোকেদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু —

The evil that men do lives after them;
The good is oft interred with their bones.

—প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইংরেজী শিক্ষার ফলে, উত্তর ভারতের নানাস্থানে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর অভাব বা অল্পতা ছিল, ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, এবং ইংরেজী-শিক্ষিত কেরাণী ও রাজকর্ম্মচারী, উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদির আবশ্যকতা হওয়ায়, এই শ্রেণী বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং শিক্ষাদানে ও অন্য রূপে ইংরেজের সহায়তা করিয়া, বাঙ্গালার বাহিরে এই শ্রেণীর উদ্ভবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন যেমন এক এক পুরুষের লোক অস্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, তেমন তেমন এখন তাহাদের কৃত জনহিতকর অনুষ্ঠান বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর উদারতার কথা ভুলিয়া যাইতেছে,—কিন্তু বাঙ্গালী যে সরকারের পিয়ারা ছিল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ কেহ যে তুচ্ছতার সহিত বাহিরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করিত, সে কথা তাহারা মনে করিয়া রাখিতেছে। এখন সরকার ও জনসাধারণ এক হইয়াছেন—অবস্থা-গতিকে প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্ছেদ-সাধন ঘটিতেছে। ইহার উপর বিধাতার মার আছে; বিহারের ভূমিকম্পে কয়েক মিনিটের মধ্যে বিগত তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাঙ্গালী যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গেল; বিহারে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন হতশ্রী, মৃতপ্রায়।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আবশ্যকতা হয় নাই, কাজেই বাঙ্গালী চাকুরিকে সেখানে যাইতে হয় নাই। ও-দিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেল-লাইনের প্রসাদে, তেলুগু, তামিল ও মালয়ালী কেরাণী আসিয়া এখন বাঙ্গালীর ঘরের ভিতরে চড়াও হইতেছে।

* * * *

এই অবস্থার প্রতিকার কি? "বৃহত্তর বঙ্গ"-র দুরবস্থা বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির নিজের দুরবস্থারই

অংশ মাত্র। বাঙ্গালা দেশের,—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—জীবন-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ এ-দিকে কেহ তেমন চিন্তা করিতেছেন না। "ওরিএণ্টাল" নৃত্য, তরুণী-নৃত্য, বিভিন্ন সিনেমাওয়ালাদের নব-নব "অবদান", যৌনতত্ত্ব লইয়া রচিত উপন্যাস, সহ-শিক্ষা, ফুট-বল, এবং অবসর-মত একটু-আধটু নিজ পঙ্গু সমাজের নিন্দা-কটূক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে "রাশ্যা" অর্থাৎ রুষদেশের প্রগতির প্রশংসাময় আলোচনা,—এই পথে আমাদের যুবকদের মন চালিত হইতেছে। নিজ পারিপার্শ্বিকের, অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার কোনও কাজ করিবার কথা উঠিলে, সমগ্র ভারতীয় অথবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গ তুলিয়া এ-সমস্ত ছোট কথা চাপা দিয়া আমরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। হিন্দু হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে আমরা communalism বলিয়া গালি দেই। দেশের ভিতরে তো আমাদের এই অবস্থা। বাহিরের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাই না—প্রতীকারের চিন্তা তো দূরের কথা।

বিহার ও সংযুক্ত-প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের কতকগুলি চিন্তাশীল প্রবাসী বাঙ্গালী, যাঁহারা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে চিন্তিত এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সম্বন্ধে ভীত, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি— চাকুরির দিকে তাকাইয়া থাকিলে "বৃহত্তর বঙ্গ" আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঝুঁকিতে হইবে। এ-দিকে প্রতিযোগিতা খুবই আছে, তবে ঈর্ষ্যাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আত্মলঘুতাবোধপূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই, —যে-প্রকারের প্রতিযোগিতা চাকুরির ক্ষেত্রে ও "ভদ্রলোক"-শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়ে বিদ্যমান দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশেরও বাঙ্গালীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সকল বাণিজ্য ও ব্যাপার, সেগুলির একটা বড় অংশ প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাতেই থাকা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বেনারসী কাপড়ের ব্যবসায়ের কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্র-গৃহস্থের বিবাহে বেনারসী জোড় ও শাড়ী (অভাবে বিষ্ণুপুরের চেলীর জোড় ও শাড়ী) না হইলে চলে না। বেনারসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন জরীর কাজযুক্ত চেলী বা রেশমের বস্ত্র বিষ্ণুপুরে এখনও তৈয়ারী হয় নাই, তবে হওয়া উচিত; এতদ্ভিন্ন বেনারসী জরীর কাজের কাপড়ের একটী আভিজাত্য আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে বেনারসী কাপড়ের এত আদর থাকায়, এ ভীষণ দুর্দ্দিনেও বেনারসী বস্ত্র শিল্প কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—এ-কথা বেনারসী কাপড়ের ব্যবসায়ীর মুখে শুনিয়াছি। এই কাজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালী কিছু কিছু হাতে লইয়াছেন। আরও বেশী লোকের এই প্রকারের কাজে নামা উচিত। বাহির হইতে যে ঘিয়ের, মাছের ও অন্য খাদ্য-দ্রব্যের চালান আসে, সেদিকেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের মাল যাহা বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশে যায়, তাহা যথাসম্ভব প্রবাসী বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাহাতে যাইতে পারে তদ্বিষয়েও চেষ্টা করা উচিত। ব্যাপারটী সোজা বা সহজসাধ্য নহে। এক তো আমাদের বাণিজ্যের উপযুক্ত বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ে রুচি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলতা অনেক। পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে কোনও sentiment বা সুকুমার ভাব নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা টাকা করিতে নামে, তাহারা (অন্য বহু ব্যবসায়েরই মত) অনেক সময়ে নির্ম্মম হৃদয়হীনতার ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালার সহিত গুজরাটের কলওয়ালা ও বণিক্‌দিগের ব্যবহার আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা—আমার মনে হয়, এ বিষয় এখন কিছুকালের জন্য ধামা-চাপা থাক্। এখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সাহিত্যিক ব্যসনের সময় এখন নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা ঘরে বাপ-মায়ের সঙ্গে বাঙ্গালা বলিবে, এবং অন্ততঃ বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটুকু হইলেই যথেষ্ট। যাতায়াতের সুবিধার প্রসাদে বঙ্গের

সঙ্গে "বৃহত্তর বঙ্গ"র যোগসূত্র সহজে নষ্ট হইবার নহে; বৈবাহিক আদান-প্রদান যতদিন স্বশ্রেণীর বা স্বজাতির মধ্যেই হইবে, ততদিন প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা আম্বেরের শিলামাতা যশোহরেশ্বরীর পুরোহিতদের মত অথবা করৌলীর গোস্বামীদের মত আর সহজে হইবে না। স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ বন্ধ হইলে, অর্থাৎ বিবাহ-বিষয়ে আধুনিক হিঁদুয়ানী যে ভাবে চলিতেছে তাহা অচল হইল, প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ঘুচিবার বেশী দেরী আর থাকিবে না।

বৃহত্তর বঙ্গ যাঁহাদের লইয়া, তাঁহারা আর একটী জিনিস সহজে করিতে পারেন, এবং তদ্বারা তাঁহারা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন। বাঙ্গালীর সহিত অন্য প্রদেশের লোকদের, এবং অন্য প্রদেশের লোকদের সহিত বাঙ্গালার পরিচয় তাঁহাদের দ্বারাই ভাল করিয়া হইতে পারে। এই কাজের জন্য তাঁহাদের মাতৃভাষা ভাল করিয়া শেখা উচিত, এবং স্থানীয় ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষার মত করিয়া লওয়া উচিত। হিন্দী, উর্দ্দূ, উড়িয়া সাহিত্যে কতকগুলি বাঙ্গালী সম্মানের স্থান করিয়া লইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের ও গৌরবের কথা নহে। রাধানাথ রায়, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, বাবু যমুনাদাস, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—ইঁহারাই যথার্থ বৃহত্তর বঙ্গের সেবক। হিন্দী, উর্দ্দূ, রাজস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, মারহাট্টি প্রভৃতি ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করা—এদিক দিয়াই তাঁহাদের বঙ্গবাণীর সেবা সার্থক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহার শক্তি আছে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন সেই অবস্থায়ই তিনি সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

* * * *

ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ" ধরিব না—সেখানে "বৃহত্তর ভারত" বিদ্যমান,—সেখানে দু-পাঁচজন বাঙ্গালী থাকিলে একত্র মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা গান, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশীদের সমক্ষে বিশেষভাবে বাঙ্গালার তিলক কপালে পরিয়া বেড়াইলে, সমগ্র ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য একত্বের বিরুদ্ধেই কার্য্য করা হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতের বাহিরে কোথাও বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া উঠে নাই। বর্ম্মা—সে তো এতাবৎ ভারতেরই অংশ হইয়া আছে। বর্ম্মায় প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী মুসলমান (কৃষক ও মাঝি শ্রেণীর লোক) যায়, কিছু কিছু কেরাণী যায়; অন্য প্রদেশ থেকে তেলুগু ও তামিল কুলি, শিখ পাহারাওয়ালা, হিন্দুস্থানী দরওয়ান, উড়িয়া মালী ও মিস্ত্রী, এবং খোজা ও ভাটিয়া, চেট্টি, চুলিয়া ও লাব্বে যায়। তাহারা এতাবৎ বর্ম্মীদের সংস্কৃতিতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—কোনও রকমে বর্ম্মার মাটি হইতে বা বর্ম্মার লোকেদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জ্জন করা, অথবা চাকুরিজীবী হইলে, কোনও রকমে চাকুরিটুকু বজায় রাখা। বর্ম্মায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব নাই; এবং বর্ম্মী জানেন, বেশ ভাল রকম বর্ম্মী জানেন, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীও প্রচুর। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু বর্ম্মার বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা বাড়াইয়া তুলিতে পারিয়াছেন? ভারতবর্ষীয়েরা বর্ম্মীদের কাছে "কালা খোয়ে" অর্থাৎ "সাগর পারের কুকুর" মাত্র রহিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে ক্রমে একটী তীব্র ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা যাইতেছে—তাহার বহু নিষ্ঠুর পরিচয় আমরা খবরের কাগজে পড়িতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বর্ম্মীদের দ্বারে পঁহুছাইয়া দিতে কয়জন চেষ্টা করিয়াছেন? বর্ম্মীদের সম্বন্ধেও আমরা কতটা অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছি—তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও খবর আমাদের কাছে পঁহুছায় নাই। বর্ম্মার বাহিরে অন্যত্র বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। শ্যামদেশে দুই এক জন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কেরাণী; মালয়েও তাই, অধিকন্তু দুই চারিজন ব্যারিষ্টার; পূর্ব্ব আফ্রিকায়, কেনিয়ায় ও ডাঙাঞ্চিকায় দুই চারিজন

বাঙ্গালী আছেন শুনিয়াছি। ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতে কিছু কিছু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী গুরুকুলবাস করিতে যান মাত্র, স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসী খুবই কম। সুতরাং ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজের কথা নহে।

• • • •

উপসংহারে খালি এই কথা বলিতে চাই—বাঙ্গালী ঘরে বড় হইলেই বাহিরেও বড় হইবে। "বৃহত্তর বঙ্গ"কে একটী জীবন্ত আদর্শ হিসাবে সার্থক করিতে গেলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুবই আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ দায়িত্ব, বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালী চারিত্র্য-যুক্ত হইলে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রবাসে সর্ব্বত্র তাহার জয় হইবেই।

"বৃহত্তর বঙ্গ", "বৃহত্তর বঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজের middleman হইয়া, ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়ী ফল দেখা যাইতেছে না। উৎকট বাঙ্গালীয়ানা লইয়া বাঙ্গালী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্র, আত্ম-প্রসারের জন্য সে অস্ত্র অনেক সময়ে মোটেই উপযোগী হয় না। সমগ্র ভারতের একাত্মতাবোধ ভিন্ন, আন্তঃ-প্রাদেশিক ঐক্য হওয়া সম্ভব নহে। এক প্রদেশ কর্ত্তৃক অন্য প্রদেশের উপরে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রভাব চলিতে পারে না; অর্থ-নৈতিক প্রভাব বা চাপ কখনও কেহ সহ্য করিবে না। গুজরাট, মারওয়াড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অর্থ-নৈতিক exploitation বা শোষণ আমাদের প্রাণপণে প্রতিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সব প্রদেশ হইতে যদি আমরা কোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক বস্তু পাই, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। সমগ্র ভারত এক, ভারতের অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য একত্ব—এই বোধ আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান; ইংরেজের শাসনে নূতন যুগে এই কথাই বাঙ্গালী ভারত-বর্ষকে শুনাইয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রধান গৌরব; বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথের বাণী, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতের একতাবোধকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল; তাই ১৯০৫ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নেতৃত্ব সমস্ত ভারত এক রকম মানিয়াই লইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর কল্পনা ও চিন্তা-শক্তি এবং শিক্ষা-বিষয়ে যোগ্যতা ইহার মূলে ছিল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেমন জ্ঞান ও শক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এদিকে তেমন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা শক্তিহীন হইতেছি। ঘর সামলাইয়া লইলেই বাহির আপনা হইতেই নিজেকে সামলাইবে। জ্ঞানে, চারিত্র্যে, কর্ম্মশীলতায় বাঙ্গালী আবার যখন বড় হইবে, এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত যথার্থ মানুষের সংখ্যা যখন বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশী করিয়া হইবে, তখনই বাঙ্গালী যেখানেই যাইবে, সেখানে নূতনভাবে এক গৌরবময় "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

* তালতলা সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে প্রদত্ত "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

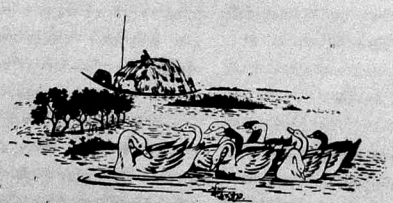

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

ক'বরেজ ম'শায় যেমন ক'রে যে সব কথা ব'লে গেলেন, তাতে নিস্তারিণী যথেষ্ট ভয় খেয়ে গেলো। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভয় হ'লো রণুর।

ক'বরেজ ম'শায় চ'লে গেলে সে তার মাকে এমন বকুনি দিলে, যা নিস্তারিণী জন্মে কখনও খায় নি। ব'কতে ব'কতে রণু কেঁদে ফেললে। সে ব'ললে, "পাগল যদি হয় বাবা সে তোমারই জন্যে। তুমিই বাবাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে—মেরেই ফেলবে।" মনের দুঃখে রণুর আর মুখের কোনও পরদা রইলো না। বাপের উপর মার অত্যাচার ও অনাদরের অনেক পরিচয় সে অনেক দিন চোখে দেখেছে, দেখে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু সঙ্কোচে মুখ ফুটে বলে নি সে কোনও দিন। আজ তার বাপ পাগল হ'য়ে যেতে পারেন শুনে সে প্রাণ খুলে সেই সব কথা একটি একটি ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে ব'লতে লাগলো; আর বার বার ব'ললে, "তুমিই বাবাকে মেরে ফেলবে।"

ছেলের কথা শুনে নিস্তারিণীর মনে ভারী দুঃখ হ'ল। রাগও হ'ল, কিন্তু রাগটা প'ড়ে যেতে তার মনে হ'ল ছেলে যা ব'লছে তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। সে স্বামীর উপর যতখানি চটা-চটি করে, যতটা অনাদর করে তাঁকে, সে সত্যিই তার অন্যায়। আর সেই জন্যই যে স্বামীর এই ব্যাধি, এও হওয়া খুবই সম্ভব। তা ছাড়া ক'বরেজ ম'শায় বিশেষ ক'রে ব'লে গেছেন যে, এখন তার স্বামীকে বিশেষ যত্ন না ক'রলে আর মেজাজটা খুসী না রাখলে অনিষ্ট হ'তে পারে।

তাই নিস্তারিণী ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে, এখন থেকে সে স্বামীর উপর আর কোনও রাগ ক'রবে না। তাই সে আজ রাত্রে নিজে গিয়ে রেঁধে, আঁচ টেনে উনোনের উপর ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে রেখে, রবীন মাষ্টারের প্রতীক্ষায় ব'সেছিল। তাই আজ তার এ আদর-যত্ন।

এর পর প্রতিদিনই এমনি তোয়াজ চ'লতে লাগলো। এ সবে রবীন মাষ্টার এতই অনভ্যস্ত যে, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না ব্যাপারখানা কি? কিন্তু এতদিন পরে দাম্পত্য জীবনের আরামের আস্বাদ পেয়ে সে ভারী তৃপ্ত হ'ল।

মাসখানেক পর ক'বরেজ ম'শায় রবীন মাষ্টারকে পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন যে, বায়ু শান্ত হ'য়ে গেছে—আর কোনও ভয় নেই। কিন্তু ওষুধ এখনো কিছুদিন খেতে হবে। আর যত্নটা ক'রতে হবে।

নিস্তারিণীর মনের ভয়টা কেটে গেল। কিন্তু তবু তার পুরোনো উগ্রমূর্ত্তি ফুটে উঠলো না। তোয়াজটা রীতিমতই চ'লতে লাগলো।

এতে রবীন মাষ্টারের যেন একটা নবজীবন লাভ হ'ল। ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার পড়ার উৎসাহ বেড়ে গেল, কাজেও উৎসাহ এলো।

সে ভাবলে যে, এতদিন পর হেডমাষ্টার জানতে পেরেছেন যে, রবীন মাষ্টার Nature study সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন সে-কথাটা ঠিক, আর তাঁর কথাটা ভুল—যদিও রবীন মাষ্টারের কাছে সে-কথাটা স্বীকার করেন নি তিনি, তবু রবীনের মনে হ'ল যে, এখন হেডমাষ্টার রবীনকে নিশ্চয় একটু শ্রদ্ধার চক্ষে

দেখবেন। তাই সে আবার সাহস ক'রে নিজের মতামত প্রকাশ ক'রতে লাগলো। এতদূর তার সাহস বেড়ে গেল যে, সে ক্লাশে ম্যাপ নিয়ে তার নিজের মনের মতন ক'রে হিষ্টরী পড়াতে আরম্ভ ক'রলে। এমন কি একদিন materialistic interpretation of history-র একটা সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়ে ফেললে।

সেদিন তার বক্তব্য শেষ ক'রে সে ব'ললে, "এমনি ক'রে যুগে যুগে ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ দল বেঁধে পরস্পর আড়া-আড়ি ক'রতে ক'রতে ইতিহাস সৃষ্টি ক'রেছে। মানব সমাজের এই ক্রম-পরিণতির স্বরূপ-টাকে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল ইতিহাসের সার্থকতা—এতেই ইতিহাস হয় একটা science বা ফিলসফি।"

পেছনে পদশব্দ শুনে রবীন মাষ্টার ফিরে তাকিয়ে দেখে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ইংরেজ!

তড়্ বড়্ ক'রে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে রবীন মাষ্টার চেয়ারটাকে ফেললে উল্টে, চাদর গেল তার কাঁধ থেকে প'ড়ে। সে কোনও মতে দাঁড়িয়ে সাহেবকে সেলাম ক'রতে ক'রতে বাঁ হাতে চেয়ার সোজা ক'রে বসিয়ে চাদরটা টেনে কাঁধের উপর দিলে।

সাহেব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন—কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়ে রবীন তার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলে।

সাহেব ব'ললেন, "Good morning। আমি ব্ল্যাক—স্কুলের ইনস্পেক্টর।"

স্কুল-ইনস্পেক্টার!, রবীন মাষ্টার ভয়ানক ঘামতে সুরু ক'রলে। হায় রে অদৃষ্ট! অনেক দিন বাদে আজ সে প্রথম প্রাণ খুলে স্কুলের পাঠ্যের বাইরে গিয়ে মার্কসের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়েছিল, আর আজই কি না ঠিক সেই সময় এসে প'ড়লো ইনস্পেক্টার! বরাতে দুঃখ থাকলে এমনি হয়।

ব্ল্যাক সাহেব বছর পাঁচেক হ'ল বিলেত থেকে এসে, এখানে কয়েকদিন কলেজে প্রফেসরী ক'রে অস্থায়ী ভাবে সম্প্রতি এ-দিককার ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হ'য়ে এসেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি র'টে গেছে একটা ভয়াবহ জন্তু ব'লে। অন্য ইনস্পেক্টারের মত ইনি কোনও স্কুল দেখতে আসবার আগে নোটিশ দিয়ে আসেন না। তিনি পহুঁছবার বড়-জোর আধঘণ্টা আগে হেডমাষ্টার খবর পান। এমনি হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাবে এসে প'ড়ে তিনি স্কুলের যা দোষ-ত্রুটি দেখতে পান তার জন্য না কি যার পর নাই গালিগালাজ করেন, এমনি ছিল প্রসিদ্ধি।

মাত্র পোনেরো মিনিট আগে হেডমাষ্টার খবর পেয়ে সাহেবের সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন ঘাটে, আর নিজে তাড়াতাড়ি চাপকান চোগা প'রতে বাড়ী গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টার বাইসিকেল চ'ড়ে স্কুলে এসে সামনেই দেখলেন ফার্ষ্ট ক্লাসে হিষ্টরী পড়াচ্ছে রবীন মাষ্টার। দরজায় দাঁড়িয়ে খানিক ক্ষণ তিনি শুনলেন, তার পর ক্লাশে ঢুকে প'ড়লেন।

ক্লাশে ঢুকেই তিনি একটি ছেলেকে ব'ললেন মাষ্টার ম'শায় যা ব'লছিলেন তার একটা চুম্বক ক'রতে। ছেলেটি ভারী মেধাবী। রবীন মাষ্টার যা ব'লেছিল সে তা হুবহু বুঝিয়ে দিলে।

রবীন মাষ্টার এতক্ষণ আশা ক'রছিল যে, সে যা ব'লেছে তা সাহেব শুনতে পায় নি, শুনলেও হালের ইংরেজ, বাঙ্গলা বোঝে নি কিছুই। কিন্তু ছেলেটিকে যখন সে পরিষ্কার বাঙ্গলায় প্রশ্ন ক'রলে আর ছেলেটির বাঙ্গলা উত্তর শুনে বেশ বুঝলে দেখা গেল, তখন আর রবীন মাষ্টারের আশা-ভরসা বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইলো না। সে হাত-পা ছেড়ে অসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বোর্ডের উপর ম্যাপ টাঙ্গান ছিল। সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "এখন কি জিওগ্রাফী পড়ান হবে?"

শুষ্ককণ্ঠে রবীন মাষ্টার শুধু ব'ললেন, "আজ্ঞে না, হিষ্টরী—রিভিশন।"

সাহেব ছেলেদের পাশে বেঞ্চে ব'সে ব'ললেন, "আচ্ছা আপনি পড়ান, শুনি।"

কি পড়াবে মাথা-মুণ্ড সে? ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে রবীন ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে সে ব'ললে "এই জায়গাটা কি?"

একটি ছেলে ব'ললে, "পাঞ্জাব।"

"এই পাঞ্জাবে প্রথম আর্য্য-সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু সে সভ্যতাটা সমস্ত পাঞ্জাবে ছড়িয়ে প'ড়বার আগে আরও পশ্চিম থেকে এসেছিল, তার পরিচয় আমরা পাই কতকটা বেদে, কতক অন্যান্য জায়গায়। পাঞ্জাবের পশ্চিমে এই আফগানিস্তানে, এই পারস্যে এবং তার চেয়েও দূরে—এই যে দেখছো জায়গাটা এই-খানে—মিটানী ব'লে একটা রাজ্য ছিল—এখানে, এই আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার হ'য়ে ছিল।"

ব'লেই রবীন মাষ্টার মিটানী রাজের সঙ্গে হিটাইট-দের সন্ধির যে লিপি পাওয়া গিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে গেল।

তার মুখ খুলে গিয়েছিল। তার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ ক'রতেই সে তার আবেষ্টন ভুলে গেল, ছেলেদের মাঝখানে যে ব'সে আছেন ইনস্পেক্টার, সে কথা ভুলে গেল। সে সহজ ভাবে ব'লে গেল।

সে ব'ললে, "যে জাতি এই আর্য্য-সভ্যতা ভারতে এনেছিল, তাদের আগে এ দেশে কি লোক ছিল না? ছিল। তাদের এঁরা ব'লতেন অনার্য্য। সে অনার্য্য কিন্তু এক জাত নয়, অনেক জাতের লোক ছিল তারা। তাদের ভিতর কেউ কেউ ছিল দারুণ অসভ্য—কাঁচা মাংস খেতো—আবার অনেকে ছিল খুব বেশী সভ্য। এটা খুবই সম্ভব যে, এদেশের অনেকটা স্থানে ছিল একটা মহা সভ্যজাতি। সম্প্রতি এই বেলুচিস্তানে মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পা নামক দুই জায়গায় মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে, এমন সব বস্তু যাতে বোঝা যায় যে, এইখানে বৈদিক সভ্যতার আগে বাস ক'রতো এক মহা সভ্যজাতি—যারা আর্য্য নয়।"

ইনস্পেক্টার লাফিয়ে উঠলেন।

রবীন মাষ্টারকে তিনি ব'ললেন, "আপনার স্কুলের কাজ হ'য়ে গেলে আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই। আপনার নামটা কি?"

রবীন ব'ললে।

সাহেব ব'ললেন, "আপনি কি হেড মাষ্টার?"

"আজ্ঞে না, থার্ড মাষ্টার।"

"হুঁ" ব'লে সাহেব সব তাঁর নোট বইয়ে লিখলেন। তারপর জিজ্ঞেস ক'রলেন, "এম-এ আপনি?"

"আজ্ঞে না, আমি বি-এ পাশ ক'রতে পারি নি।"

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে ব'ললেন "silly!" শুনে রবীন মাষ্টারের পিলে চ'মকে গেল। সে বুঝলে ভারী একটা অপরাধ হ'য়েছে তার—কিন্তু কি সে অপরাধ? বি-এ পাশ ক'রতে পারে নি, কিন্তু সেটা 'silly' কিসে? শেষে ভাবলে, বি-এ পাশ না ক'রে সে থার্ড মাষ্টারি ক'রছে, সাহেবের মতে বোধ হয় এইটে silly।

ভারী ঘামতে লাগলো সে। এদিকে ততক্ষণ হেড মাষ্টার খবর পেয়েছেন যে, ইনস্পেক্টার সাহেব এসে রবীন মাষ্টারের ক্লাশে ঢুকেছেন।

মাথায় হাত দিয়ে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "এই খেয়েছে! রবীনবাবুর চেহারা দেখেই তো সাহেবের মেজাজ যাবে খিঁচড়ে।" মনে মনে প্রমাদ গ'ণে হেড মাষ্টার তাঁর মাথায় পাগড়ী প'রতে প'রতে ছুটলেন ফার্ষ্ট ক্লাসে।

ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে ব্ল্যাক সাহেব ছোট ছোট খুঁটি-নাটি ধ'রে মাষ্টারদেরকে তিরস্কার ক'রলেন, হেড মাষ্টারকে দু'তিনটা ধমক লাগালেন।

যে ক্লাশে Nature study হ'চ্ছিল সে ক্লাশে গিয়ে তিনি থ'মকে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ দেখে তিনি মাষ্টারকে ব'ললেন, "ইনস্পেক্টারের সার্কুলারে কি এমনি ক'রে শেখাবার বিধান আছে?"

মাষ্টার কাঁপতে কাঁপতে ব'ললে, "আজ্ঞে না, ঠিক এমন নেই।"

"তবে তুমি এ প্রণালী পেলে কোথায়?"

কাঁপতে কাঁপতে মাষ্টার তার টেবিল থেকে একখানা জীর্ণ বই তুলে সাহেবের হাতে দিলে।

বইখানার নাম প'ড়ে সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "এ বই কি লাইব্রেরীর, না তোমার নিজের?"

ব'লতে ব'লতেই তিনি পাতা উল্টে দেখলেন, বইয়ে নাম লেখা আছে রবীন মাষ্টারের।

ব'ললেন, "তা হ'লে রবীন মাষ্টারের উপদেশেই তুমি এমনি শিক্ষা দিচ্ছ ?"

স্বীকার ক'রতেই হ'ল। মাষ্টার প্রমাদ গণলো হেড মাষ্টার তাড়াতাড়ি ব'ললেন, "আমি ভারী দুঃখিত স্তর। উনি যে আমাকে গোপন ক'রে ইনস্পেক্টারের সার্কুলারের বাইরে—"

ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে ইনস্পেক্টার ব'ললেন, "That was stupid. It was neither nature study nor anything !"

হেড মাষ্টার থ' হ'য়ে গেলেন। কি যে 'ষ্টুপিড' ঠিক বোঝা গেল না।

তারপর আফিসে গিয়ে সাহেব কাগজ-পত্র দেখতে লাগলেন। ধমকে ধমকে হেড মাষ্টারের পিলে একদম চ'মকে দিলেন।

মাষ্টারদের 'লিষ্ট' নিয়ে ইনস্পেক্টার প্রথমেই রবীন মাষ্টারের নাম বের ক'রে দেখলেন তার মাইনে চল্লিশ টাকা। সাহেবের মুখে বিরক্তির ভাব দেখে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "এই—অনেক কাল আছেন উনি তাই চল্লিশ টাকা পাচ্ছেন, নইলে আগে তিরিশ টাকাই ছিল।"

একটা আণ্ডার গ্রাজুয়েট মাষ্টারকে চল্লিশ টাকা দেওয়াটা বড় বাড়াবাড়ি ব'লে সাহেব মনে ক'রছেন—এই ভেবে হেড মাষ্টার এই ব্যাখা দিচ্ছিলেন।

সাহেব কিন্তু ব'ললেন, "What a shame ! একে অন্ততঃ এক শো টাকা দেওয়া উচিত।"

হেড মাষ্টার আকাশ থেকে প'ড়লেন। বিস্ময়টা যখন তাঁর হজম হ'ল তখনি তিনি ব'ললেন, "উনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—"

"Silly ! এ স্কুলে একটি মাত্র শিক্ষক আছে—সে রবীন।"

হেড মাষ্টার তো থ' !

আফিসের কাজ সেরে ইনস্পেক্টার সাহেব বেরিয়ে দেখলেন রবীন মাষ্টার দাঁড়িয়ে আছে, নিতান্ত ভীত, সঙ্কুচিত ভাবে। ইনস্পেক্টার তার দুষ্কার্য্য হাতে-নাতে ধ'রে ফেলে তার নাম টুকে নিয়েছেন, ব'লেছেন "silly !" তারপর আবার সে খবর পেয়েছে যে, nature study class-এ গিয়ে ইনস্পেক্টারের আইন-অমান্য করার সম্পর্কে তার নাম উঠেছে, সেখানে ব'লেছেন "stupid !" তার আর সন্দেহ ছিল না যে, তাকে আজই বরখাস্ত ক'রবার জন্যেই সাহেব তাকে দেখা ক'রতে ব'লেছেন।

সে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের প্রতীক্ষা ক'রছিল। ব্ল্যাক সাহেব হেসে ব'ললেন, "এই যে আপনি ? আপনি এখন বাড়ী যাবেন কি ?"

একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—হুজুরের হুকুম পেলে।"

সাহেব তার বাইসিকেল টেনে নিয়ে ব'ললেন, "চলুন, পথে চ'লতে চ'লতে আপনার সঙ্গে কথা হবে।"

সাহেবের ভাব চরিত্র দেখে রবীনের একটু ভরসা হ'ল। সে ভাবলে, "বরখাস্ত বোধ হয় ক'রবেন না।"

সাহেব তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একেবারে রবীনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সাহেবের মুখে একটি কথা শুনে রবীন শুধু আশ্বস্ত নয়, উল্লাসিত হ'য়ে উঠলো। সাহেব ব'ললেন যে, রবীনের প্রবর্ত্তিত nature study-র প্রণালীটাই ঠিক প্রণালী; ইনস্পেক্টারের সার্কুলারের প্রণালী stupid। এ সার্কলে আর কোনও স্কুলেই সত্যিকারের প্রকৃতি পরিচয় হয়ই না, এখানে ছাড়া।

এইবারে রবীন মাষ্টার একেবারে ভীষণ বিব্রত হ'য়ে প'ড়লো।

তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেই রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন ?"

সাহেব ব'ললেন, "হ্যাঁ, কোনও আপত্তি আছে কি ?"

রবীন ব'ললে, "না, না, আপত্তি কেন থাকবে ?—সৌভাগ্য আমার।" কিন্তু মনে মনে সে ভাবতে লাগলো, কি বিভ্রাটেই পড়া গেল—কোথায় বা বসায় সাহেবকে সে, কিই-বা কেমন ক'রে করে।

সাহেব ব'ললেন, "আপনার study কোথায় ?"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে তাঁর বাইরের ঘর দেখিয়ে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "এইখানে।"

সাহেব গট্-গট্ ক'রে ঢুকে অবাক্ হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

যাচ্ছেতাই মলিন সে ঘর। তার ভিতর আছে শুধু একটা ময়লা ফরাস, তার সমস্তটা জুড়ে ব'সেছে পাঁজা পাঁজা বই—আর তার চারদিকে মেঝের ওপর তক্তা পেতে কাঁড়ি করা র'য়েছে শুধু বই।

ফরাসের মাঝে যেটুকু ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে ব'সে ব্লাক সাহেব জিজ্ঞেস ক'রলেন, "আচ্ছা মহেঞ্জোদারোর খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে, সে তো বেশী দিন বেরোয় নি।"

তখনো মহেঞ্জোদারোর কথা স্কুলের বইয়ে ওঠে নি, সে সম্বন্ধে কোনও বইও লেখা হয় নি।

রবীন দারুণ অস্বস্তি বোধ ক'রছিল প্রবল প্রতাপ ইনস্পেক্টার সাহেবকে এই দীন আবেষ্টনের মাঝখানে তার মলিন ফরাসে ব'সতে দেখে। কোনও কথা না ব'লে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে তার বইয়ের একটা তাড়া নেড়ে-চেড়ে তার ভিতর থেকে টেনে বের ক'রলে একখানা Illustrated London News—যাতে বেরিয়ে ছিল স্তর জন মার্শালের এ বিষয়ে প্রবন্ধ।

সাহেব জিজ্ঞেস ক'রে জানলেন যে, এ কাগজ পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা।

তারপর অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ব'ললেন, "মার্কশের সব বই আপনি প'ড়েছেন ?"

যা প'ড়েছিল, রবীন মাষ্টার ব'ললে।

সাহেব তখন তার সঙ্গে মার্কসের মতামত নিয়ে তর্ক ক'রতে লাগলেন।

ক্রমে রবীনের আড়ষ্টতা কেটে গেল। এই আলোচনার মাঝখানে এসে সে ভুলে গেল যে, সে ভুবনমোহন স্কুলের থার্ড মাষ্টার আর সাহেব স্বয়ং প্রবল প্রতাপ ইনস্পেক্টার বাহাদুর। সে প্রবল বেগে তর্ক ক'রতে লাগলো।

রবীন মাষ্টারের কথাটা খেয়াল থাকবার কথা নয়, কিন্তু তার বাড়ীতে ইনস্পেক্টার এসেছেন স্কুলের পরে—এ-খবরে অনেকের চাঞ্চল্য হ'য়েছিল। নিস্তারিণীরও হ'য়েছিল। সে তাড়াতাড়ি জমীদার বাড়ী পাঠিয়ে সেখান থেকে চায়ের সরঞ্জাম আর কিছু খাবার আনিয়ে আর নিজের ঘরের তৈরী কিছু জিনিষ দিয়ে চা সাজিয়ে সাহেবের জন্য পাঠিয়ে দিলে রণুর হাতে।

চা পান ক'রতে ক'রতে সাহেব ব'ললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী খুশী হ'লাম। Marxism সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার ধারণা আমি খুব কম লোকের দেখেছি।"

প্রসঙ্গক্রমে সাহেব ব'ললেন যে, তিনি ইকনমিক্সের ফার্ষ্টক্লাশ অনার্স পেয়ে বিলেত থেকে পাশ ক'রে এসেছেন এবং তিনি সোস্যালিজমে বিশ্বাসী।

রবীন মাষ্টার তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলো। মার্কসের value তত্ত্বের যে সমস্যা সে সমাধান ক'রতে পারে নি, সেই সমস্যাটা সাহেবের কাছে তুলে সে তাকে বোঝাতে ব'ললে। এই নিয়ে আর খানিকক্ষণ আলোচনা ক'রে শেষে সাহেব বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। তার ভিতর চারখানা বই বেছে নিয়ে তিনি ব'ললেন, "এ-বই ক'খানা আমি নিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে ?"

রবীন হিসেব ক'রলে না যে, কত কষ্টে সে ঐ বই সংগ্রহ ক'রছে। সে কৃতার্থ হ'য়ে ব'ললে, "নিশ্চয়।" বরং বইগুলি যে জীর্ণ মলিন, তাইতে সে বড় কুণ্ঠা বোধ ক'রলো। যাবার সময় ইনস্পেক্টার ব'ললেন, "আপনি এখানে নিজেকে অপচয় ক'রছেন। আপনি ক'লকাতায় যান না কেন ?" মুখ মলিন ক'রে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "চেষ্টা ক'রেছিলাম স্তর, সেখানে কোনও চাকরি পেলাম না।" ইনস্পেক্টার ব'ললেন, "আচ্ছা আমি দেখি কিছু ক'রতে পারি কি না আপনার জন্যে। আর দেখুন, হেড মাষ্টারকেও ব'লেছি আমার রিপোর্টেও লিখছি আপনার মাইনে বাড়াবার জন্যে।

যদি ওরা না দেয়, কি অন্ততঃ আশি টাকার চেয়ে কম দেয়, তবে আমাকে জানাবেন।"

ব'লে সাহেব বাইকে ক'রে চ'লে গেলেন।

ইনস্পেক্টার যে সবাইকে গালাগালি দিয়ে রবীন মাষ্টারকে এমন সমাদর ক'রে গেছেন, তাতে সবার চোখ টাটিয়ে উঠলো। ইনস্পেক্টার চ'লে যাবার পর হেড মাষ্টার ব'ললেন, "সালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। পাগল সাহেব, পাগল না হ'লে তাঁর চোখে লাগে?"

এই কথাই সবাই ব'লতে লাগলো।

কিছুদিন পর ক'লকাতা থেকে এক প্যাকেট বই এলো রবীনের নামে—ব্ল্যাক সাহেবের অর্ডার মোতাবেক—রবীন লোভীর মত সেই বইগুলো খুলে নিয়ে মনের আনন্দে তা প'ড়তে লাগলো।

তার মাইনে বাড়াবার কথা নিয়ে কমিটিতে গবেষণা হ'তে লাগলো। মাস দুই গবেষণার পর কমিটি সিদ্ধান্ত ক'রলেন দশ টাকা বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাক সাহেব তার পরই বদলী হ'য়ে যাওয়ায় সে সিদ্ধান্ত উল্টে গেল।

কিন্তু রবীন মাষ্টারের সে দিকে খেয়াল ছিল না। জীবনে প্রথম সে একটা সত্য সত্য পণ্ডিত লোকের কাছে সমাদর পেয়ে এতটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে ছিল, কৃতার্থতায় তার অন্তর এত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল যে, তারপর আর তার কোনও জ্ঞানই ছিল না। সে এই উৎসাহ পেয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বারো খানা চকচকে নূতন বই পেয়ে মনের আনন্দে সে প'ড়ে যেতে লাগলো।

তারপর যখন ব্ল্যাক সাহেব তাকে চিঠি লিখলেন, আর মাসে দু'মাসে একখানা ক'রে চিঠি লিখে তার সঙ্গে ইকনমিক্স ও সোসিয়লজির সমস্যা আলোচনা ক'রতে লাগলেন, তখন আর তার তৃপ্তির সীমা রইলো না।

তার এতদিনকার অসার্থকতার বোঝা যেন অঙ্গ থেকে ঝ'রে প'ড়ে গেল, যৌবনের উৎসাহ যেন আবার তার অন্তর ভ'রে দিল।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা-পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরিশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—

দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল-কুল দশ-দিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাস; ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে।

— মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ-ডি

১

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছে। যাহাকে আমরা আধুনিক বা অতি-আধুনিক যুগ নামে অভিহিত করি, তাহার সূচনা বঙ্কিমের পরবর্ত্তী যুগে। এই যুগের প্রবেশ-তোরণে যে নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের। প্রধানতঃ দুইটী লক্ষণের দ্বারা এই যুগ-পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে। (১) ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোভাব; (২) সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার প্রবর্ত্তন।

(১) বঙ্কিমচন্দ্র যে অদ্ভুত শক্তির সহিত কল্পনা ও তথ্য মিশাইয়া তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, সে শক্তি কোন পরবর্ত্তী লেখক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন নাই। যে মন্ত্রবলে তিনি অতীতের সিংহদ্বার খুলিয়া বিস্মৃত ইতিহাসকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র-রহস্য তাঁহার সহিতই লোপ পাইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের অন্ধ ও অক্ষম অনুকারিগণ তাঁহার প্রণালীর রহস্যটী মোটেই ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাস তাঁহাদের হাতে প্রাণহীন হইয়া তাহার গৌরবময় উদ্দীপনা হারাইয়াছে; রোমান্স আতিশয্য-দুষ্ট ও কল্পনা-স্ফীত হইয়া একেবারে অপ্রাকৃতের চরম সীমায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিম যেরূপ সুকৌশলে ইতিহাস, রোমান্স ও বাস্তব জীবনকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন, অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহাদের একটা সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীদের মধ্যে সেই গুণের একান্ত অভাব। বঙ্কিমের প্রতিভা আমাদের সমাজ-জীবনের চিরন্তন অভাব কল্পনার প্রভাবে কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া, একপ্রকার অসাধ্য-সাধন করিয়াছিল বলিলেও চলে। তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্য ও রিক্ততা, অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের একান্ত অজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে প্রকট হইয়া ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাসের পথে অনতিক্রমনীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমের পরবর্ত্তী কোন প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিকই তাঁহার পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিকতার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই এবং যাতায়াতের অভাব-জন্য সেই পথের রেখা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাসে যে গভীরতর বাস্তবতা পরিণতিলাভ করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্ব্বজ্ঞান-বলে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরা-বালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কাজে লাগাইয়াছেন। যদিও বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাসে তাঁহার বাস্তব-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যেই রোমান্সের দীপ্তি ও উত্তেজনা আনিবার জন্য লেখকের একটা বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়। 'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধান ও অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাব রোমান্সের রাজ্য হইতে আমদানী; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পিস্তলের শব্দটী রোমান্সের ক্ষীণ নিঃশ্বাস বায়ুরূপেই আমাদিগকে স্পর্শ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হইতে এই রোমান্স-সুলভ আকস্মিকতার ক্ষীণ ইঙ্গিত ও আভাসগুলিই প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাহ-

বৈচিত্র্য ও চমকপ্রদ সংঘটনের পরিবর্তে তাঁহার উপন্যাসে যে রোমান্স পাওয়া যায়, তাহা আরও উচ্চ ও গভীর সুরের—তাহা প্রকৃতির সহিত মানব মনের সুগভীর ভাব-বিনিময়, আত্ম-সমাহিত চিত্তের ধ্যানময় বিহ্বলতা বা সৌন্দর্য্যের অসীম-প্রসারিত অতলস্পর্শ রহস্যের চকিত উপলব্ধি প্রভৃতি রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি 'নৌকাডুবি' বা 'গোরা'র মত উপন্যাসে—যেখানে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘটন আমাদিগকে বিস্ময়কর পরিণতির প্রতি উন্মুখ করিয়া রাখে, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাভাবিক আশার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বাস্তব ফলাফলের বিশ্লেষণের দিকেই জোর দিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে রোমান্স তাহা প্রায় সম্পূর্ণই অন্তর্মুখী, বাহ্য বৈচিত্র্যের নিকট সম্পূর্ণ অঋণী। এইখানে উপন্যাস-সাহিত্য অতীতের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া এক নূতন পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণেই ইহাদের প্রধান রস; অন্তরের প্রবৃত্তি-সমূহের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও সংঘাত বর্ণনাতেই ইহাদের মুখ্য আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের উপন্যাসে রোমান্সের অবসর কত অল্প এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে জোর করিয়া অসাধারণত্ব আরোপ করিতে গেলে অস্বাভাবিকতাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে। বঙ্কিম তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও কল্পনার রঙ্গীন আলো ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বৈধ ও অবৈধ যে কোন উপায়েই হউক জীবনকে একটা উচ্চ আদর্শ-লোকের আলোকে রঞ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্বাভাবিক ধীর প্রবাহটীর অনুসরণ করিয়াছেন এবং আমাদের জীবনে স্বাভাবিক কারণে যে সমস্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় সেই গুলিতেই আপন দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা যে অল্প অথবা অগভীর, তাহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে—তবে তিনি অন্তর্দৃষ্টি-বলে একটী বিশেষ অবস্থার মর্ম্মভেদ করিয়া খুব অল্প কথায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতের একটা সাধারণ সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা আভ্যন্তরীণ বিরোধের চিত্রটী ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের গ্লানি ও বিরোধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া চিত্রটী আরও অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন ও পুঞ্জীভূত অথচ সুনির্ব্বাচিত তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে বাস্তবতার ভাবটী দৃঢ়তর ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাই রোমান্স ও বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রভেদ।

সুতরাং এই বাস্তবতার প্রবর্ত্তনেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার প্রথম পরিচয়। এই বাস্তবতার সুরই আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। ইহাই ক্রমশঃ তীব্রতর ও উগ্রতর হইয়া, বিদ্রোহের সুরটী উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠাইয়া, অবিমিশ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শে প্রচলিত নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুলিয়া, সমগ্র উপন্যাস-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবনের উপন্যাসেও বাস্তবতার এই বিশেষ পরিণতি, এই বিদ্রোহাত্মক রূপের সূচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে এই বাস্তবতার প্রকৃতি ও সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই গভীরতর বাস্তবতাই বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের প্রধান হেতু ও উপন্যাস-ক্ষেত্রে নবযুগ-প্রবর্ত্তনের সুস্পষ্ট সূচনা।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রভাব-মুক্ত নহে। তাঁহার 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত ও সেই পর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভা-যাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের রুদ্র মূর্ত্তি ও হিংস্র ভীষণতা অপেক্ষা বসন্ত রায়ের আনন্দ-বিভোর সরলতা, উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ও বিল্বার করুণ জীবন-কাহিনী আমাদের মনে গভীরতর ভাবে মুদ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত চরিত্রগুলি লেখকের গভীর ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিজের জীবন-পাত্রে যে করুণ মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি ইহাদের ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—যে উদাস বিরহ-ব্যথাতুর রাগিণী তাঁহার গীতি-কবিতায় এরূপ মনোহরণ-সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রথম কাকলী এই তরুণ বয়সের উপন্যাসে শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট ঠিক জীবন্ত ঐতিহাসিক মানুষ নহে—সংসারের নির্ম্মম ক্রূরতা, যাহা আততায়ীভাবে আমাদের সুখ-শান্তির কণ্ঠ চাপিয়া ধরে ও আমাদের সুকুমার সৌন্দর্য্য-প্রবণ বৃত্তিগুলিকে নির্দ্দয় পেষণে পীড়িত করিতে চাহে, তাহারই একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি মাত্র। সেইরূপ 'রাজর্ষিতে'ও ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র্য ও কোলাহল লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; ইতিহাসের রঙ্গভূমি যেন দুইটী আত্মার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্যই পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মোগল-সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার রাজধানী—এ সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক-ধ্যান-নিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজীর মত চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের জনশূন্য প্রান্তরের উপর রাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার অর্থহীন কোলাহল ও ব্যর্থতর প্রচেষ্টার পশ্চাতে এক মুক্ত প্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তি নীরবে স্থির হইয়া আছে। এক বালিকার করুণ-কোমল হৃদয় ও একটি শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত, অস্পষ্ট কথা তাঁহাকে সংসারের সাধারণ কর্ম্মপ্রবাহ হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে ও তাঁহার গভীরতম অন্তরে যে শান্তির মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে অবিরত বারিসেকের দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই দুইখানি উপন্যাসে ইতিহাস এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রসে ভরপুর হইয়া তাহার কঠিন বস্তুতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এই সমস্ত মন্তব্য হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' ও 'রাজর্ষিতে' উপন্যাসের বিশেষত্ব সেরূপ সুপরিস্ফুট নহে। এই দুই উপন্যাসে লেখকের মনোবৃত্তি ও কার্য্য-প্রণালী ঔপন্যাসিক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ উভয়েই নিতান্ত সহজ, অগভীর ও জটিলতা-বর্জ্জিত। প্রতাপাদিত্য, বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য প্রভৃতি সকলেই যেন এক একটী অবিমিশ্রগুণের প্রতিমূর্ত্তি, কোন বিরোধী উপাদানের সমন্বয় তাহাদের চরিত্রকে বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করে নাই। এমন কি যে দুইটী চরিত্র-চিত্রণে লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি ও বিশ্লেষণ-কুশলতা নিয়োগ করিয়াছেন সেই রাজা ও রঘুপতিও ঠিক উপন্যাসোচিত প্রসার ও নমনীয়তা (flexibility) লাভ করে নাই। তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় যেন কবি-প্রতিভার ক্ষণিক বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে, উপন্যাসের প্রখর সূর্য্যালোকে নহে। তাহাদিগকে আমরা যতবারই উপন্যাসের মধ্যে দেখি না কেন, তাহারা কখনই প্রথম পরিচয়ের অস্পষ্ট কুহেলিকা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই; তাহাদের মুখের যে অংশ লেখক আমাদের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন শেষ পর্য্যন্ত সেই খণ্ডাংশেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে। রঘুপতির চরিত্রে লেখক অনেকটা জটিলতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন—দ্বিধাহীন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মক্ষেত্রে রাজ-শক্তির অনধিকার-প্রবেশের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ, ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা ও নির্ম্মম ক্রূরতার সহিত জয়সিংহের প্রতি সুগভীর স্নেহ ও রমণীসুলভ কোমলতা তাহার চরিত্রে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় ধারা মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই।

রঘুপতি-চরিত্রের এই দুইটী দিকের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহার উপর জীবনের সুগভীর, রহস্যময় সমন্বয় কোন সংযোগ-সেতু রচনা করে নাই। নক্ষত্র রায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা ও পরমুখাপেক্ষিতা একেবারে অবিমিশ্র ও নিরবচ্ছিন্ন; তাহার নগ্ন আতিশয্য কেবল হাস্যরসের ও ঘৃণার উদ্রেক করে। তবে সিংহাসন-লাভের পর তাহার চরিত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাই লেখকের ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণ-শক্তির একমাত্র পরিচয়। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগুচ্ছ 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যেমন, সেইরূপ তাঁহার প্রথম দুইখানি উপন্যাসেও, একটা অসমাপ্ত সৃষ্টি-কার্য্যের লক্ষণ প্রচুরভাবে বিদ্যমান — কবিতা বা উপন্যাসের বিশেষ রূপ ও আকৃতিটী স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই।

৩

যে সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটী রোমান্সের ন্যায় একটী বিস্ময়কর সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দৈব-বিপর্য্যয়ে রমেশ ও কমলা পরস্পরের সহিত দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে ফেলা যায় না; আবার নলিনাক্ষ ও কমলার পুনর্ম্মিলনের মধ্যেও দৈবের অঙ্গুলি-সঙ্কেত একটু বেশী রকম সুস্পষ্ট। যে ভ্রান্তি-যবনিকা রমেশ ও কমলার মধ্যের সম্বন্ধটী সত্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে তাহার অপসারণ একটু অনাবশ্যকরূপেই বিলম্বিত হইয়াছে। রমেশের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পক্ষে এই ভ্রান্তি-নিরসন নিতান্তই সহজ ছিল, দুই চারিটী কৌতূহলী প্রশ্নেই সমস্ত জটিলতার মর্ম্মচ্ছেদ হইতে পারিত। সুতরাং উপন্যাসটীর মধ্যে অপ্রত্যাশিত অংশ একটু অনুচিত রকম বেশী ও এই হিসাবে ইহা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ঘটনা-বিন্যাস বাদ দিলে লেখকের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন বাস্তবতার পথ অবলম্বন করিয়াছে। রমেশ ও কমলার মধ্যে সম্বন্ধটী, নৌকা-যাত্রার প্রত্যেকটী দিনের নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনাতে, প্রেমোন্মুখ অথচ অভিমান-প্রবণ কমলার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণে ও রমেশের প্রণয় ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সংঘাতের চিত্রণে খুব মধুর ও জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। উপন্যাসটী আগাগোড়া একটী মৃদু স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে—ইহার লঘু, চপল প্রবাহ কোথাও গভীর আবর্ত্তের দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। ইহার মধ্যে কোথাও খুব গভীর সুর ঝঙ্কৃত হয় নাই বা খুব জটিল বিশ্লেষণের চেষ্টা নাই। রমেশ, কমলা, অক্ষয়, যোগেন, অন্নদাবাবু, চক্রবর্ত্তী খুড়া খুব সরল (বিশ্লেষণের দিক হইতে) ও স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ—ইহাদের মধ্যে কোন গভীর আলোড়ন বা বিক্ষোভের অবকাশ নাই। কোন বিশেষ দৃশ্যও গভীর ঘাত-প্রতিঘাতের বা রহস্য-গূঢ় উপলব্ধির পরিচয় দেয় না। যেখানেই হৃদয়-সংঘাত আসন্ন-বর্ষণ মেঘের মত একটা প্রগাঢ় সঙ্কটময় পরিণতির লক্ষণ দেখাইয়াছে, সেখানেই লেখক হাস্য-কৌতুকের বিশৃঙ্খল বাতাস বহাইয়া তাহার অশ্রু-ভারাকুল গাম্ভীর্য্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া প্রতীক্ষার গুরু-ভারের লাঘব করিয়াছেন। নৌকাযাত্রার নির্জ্জনতায় রমেশ-কমলার সম্পর্কটী যখন একটা অসংবরণীয় পরিণতির দিকে ঝুঁকিয়াছে, যেন লেখক কোথা হইতে উমেশ ও চক্রবর্ত্তী-খুড়াকে আমদানী করিয়া সঙ্কট কাটাইয়া দিয়াছেন ও গল্পের সরল প্রবাহকে বাধামুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি রমেশ ও হেমনলিনীর মিলন ও বিদায়ের দৃশ্যগুলিও খুব উঁচু সুরে বাঁধা হয় নাই—তাহাদের মিলনে নিবিড় আনন্দ ও বিরহে পরিপূর্ণ দুঃখের অতলস্পর্শ ব্যাকুলতা নাই।

চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া গ্রন্থমধ্যে হেমনলিনীর স্থানই সর্ব্বোচ্চ। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসে আমরা যে জাতীয় নায়িকার সহিত পরিচিত হই, হেমনলিনীই সেই সুপরিচিত type-এর প্রথম উদাহরণ। সে 'গোরা'র সুচরিতা, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও 'যোগাযোগে'র কুমুদিনীর পূর্ব্ববর্ত্তিনী—শান্ত, সংযত,

নীরব, অথচ একনিষ্ঠ প্রেমে আত্ম-সমাহিত, কোমল, অথচ অবিচলিত দৃঢ়তায় সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন—এই জাতীয় নায়িকারা একদিকে যেমন তাহাদের চারিদিকে একটী মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করে, সেইরূপ অপরদিকে একটা উত্তেজনাহীন অন্তঃসঞ্চিত শক্তির আভাস দেয়। অবশ্য হেমনলিনীর চরিত্রে সুচরিতার পূর্ণতা, লাবণ্যের সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও সুগভীর আত্ম-জিজ্ঞাসা বা কুমুদিনীর কবিত্বময় নারী-সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ নাই। সে সুচরিতার একটা অপরিণত সংস্করণের মত রহিয়া গিয়াছে—সে গ্রন্থের শেষ দিকে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, "আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে—" পাঠকের চিত্তও তাহারই সমর্থন করে। সে প্রণয়িনীরূপে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় গৌরবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, নলিনাক্ষের শিষ্যা ও ভাবী-স্ত্রী রূপেও তাহার আকৃতি অস্পষ্টতার কুহেলিকা-জাল কাটাইয়া উঠে নাই—কেবল পিতা-পুত্রীর মধুর অথচ সূক্ষ্ম সহানুভূতিময় সম্পর্কের মধ্য দিয়াই সে আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম অংশে কমলা-চরিত্র খুবই জীবন্ত। তাহার উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ রমেশের দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহ-জনক ব্যবহারে তাহার দিক হইতে প্রতিহত হইয়া স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির আকারে রূপান্তরিত হইয়া নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছে। রমেশের প্রতি তাহার ব্যবহারে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। শৈলজার সহিত সখিত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সে নিজের প্রেমের অবাস্তবতা ও অপূর্ণতা আরও স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছে ও অল্পে অল্পে রমেশের প্রতি একটা প্রগঢ় বিমুখতা তাহার পূর্ব্ব প্রণয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। অহার জীবনের যে চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত—যখন হেমনলিনীকে লিখিত রমেশের পত্রে তাহার জীবনের লজ্জাকর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—তাহার বিশ্লেষণে আশানুরূপ গভীরতা ও আবেগের অভাব লক্ষিত হয়। যে আবিষ্কারের বজ্রপাতের ন্যায় তাহার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত ও সংজ্ঞাহীন করা উচিত ছিল, তাহা যেন সামান্য সূচিবেধের ন্যায়ই অনুভূত হইয়াছে। তাহার পর কমলা যেন তাহার স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি হারাইয়া, তাহাকে স্বামী-পরিবারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চক্রবর্ত্তী-পরিবার যে স্নেহময় চক্রান্ত-জাল বিস্তার করিয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া গিয়াছে ও অনেকটা যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত হইয়া গিয়াছে। নলিনাক্ষকে পাইবার আগ্রহাতিশয্যেই সে তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে নলিনাক্ষ মোটেই ফোটে নাই—সে যেন বক্তার ও ধর্ম্ম-প্রচারকের উচ্চ-মঞ্চ হইতে সাধারণ জীবনের সমতলভূমিতে কোন দিনই অবতরণ করে নাই। তাহার মাতৃভক্তির দিকটাও তাহার মধ্যে রক্তমাংসের সঞ্চার করিতে পারে নাই। ক্ষেমঙ্করীর নিগূঢ় পুত্রাভিমান ও হেমনলিনীর প্রতি বিরাগ তাহার আচারপূত হিন্দু-বিধবার চরিত্রে কতকটা বৈশিষ্ট্য আনিয়াছে। রমেশ অনেকটা 'গোরা'র বিনয়ের সমশ্রেণীভুক্ত, তাহার সমস্যা তাহার শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত দ্বিধবাদ নাবিকের ন্যায় সে তাহার বোঝা ফেলিতে পারে নাই, আবার দৃঢ় সহিষ্ণুতার সহিত বহিতেও পারে নাই। হেমনলিনী ও কমলা-ঘটিত তাহার সমস্ত ব্যবহারই দ্বিধাগ্রস্ত দুর্ব্বলতায় টলমল। তাহার জীবন-সমস্যার সমাধানের সে কোন সহজ ও সরল উপায় অবলম্বন করে নাই, দৈবানুকূল্যের উপর একটা শঙ্কিত, অস্থির নির্ভরই তাহার প্রধান প্রচেষ্টা। কমলাকে বোর্ডিং-এ রাখিয়া সে বিরক্তিকর বর্ত্তমানকে চক্ষুর আড়াল করিয়াছে ও হেমনলিনীর উদ্বেগজনক প্রেম, অক্ষয়ের অশ্রান্ত খোঁচা ও অন্নদাবাবুর টেবিলে চা সমান অক্লান্ত সহিতই গলাধঃকরণ করিয়াছে। হেমনলিনীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে তাহার রহস্য-উদ্‌ঘাটনে অনিচ্ছার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না—ইহাও তাহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি মাত্র। স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাওয়ার

এই প্রবৃত্তিই তাহার সহজ ভদ্রতা ও চরিত্র-সংযমের উপর বিশেষত্ব আনিয়া দিয়াছে।

মোটের উপর এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, 'নৌকা-ডুবি' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ইহার মধ্যেই প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে ও নূতন ধরণের বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাসের প্রথম উদাহরণ বলিয়া উপন্যাস-সাহিত্যে ইহার স্থান যথেষ্ট উচ্চ।

(ক্রমশঃ)

তাতল সৈকতে

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

অশেষ সেন লেখে কবিতা। বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রগুলির পাতায় পাইকা হরফের কালো চেহারা প'রে তারা বেরিয়ে আসে, কিন্তু তাদের বুকে জলে বিদ্রোহের আগুন। লালসার মশাল জ্বালিয়ে তারা নাচে প্রলয়-নৃত্য, প'ড়ে পাঠকের রক্ত ফুটতে থাকে টগ্‌বগ্‌ ক'রে। তাদের ছন্দে, সুরে, ব্যঞ্জনায় ফুটে' ওঠে দেহের জয়-যাত্রার একটা অতৃপ্ত উন্মাদনা।

রেবা শুধু আঁকে ছবি। তার ছবিও ছাপা হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রগুলোতেই। কিন্তু তার সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তার কারবার শুধু চোখের একটা ইঙ্গিত বা মুখের একটা ভঙ্গি নিয়ে। অর্থাৎ তার ছবি দেখেই মনে হয়, তাদের আশ্রয় রচিত হয়েছে দেহের সীমানার ভিতরে নয়, দেহ ছাড়িয়ে কোনো একটা অতীন্দ্রিয় রহস্য-লোকের মাঝখানে।

এই রেবার সঙ্গে হ'লো অশেষের পরিচয়। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি চট্‌-পট্‌ তাদের বিবাহটাও হ'য়ে যেতো, তবে একটা সেরা ঘটকালী যে মদন-ঠাকুরের করা হ'তো তাতে ভুল নেই। কারণ রেবার দেহে ছিল ইস্পাতের তলোয়ারের মতো খর-ধার রূপ, অশেষের ছিল স্বাস্থ্যের আনন্দে ভরা তারুণ্যের দীপ্তি। রেবার বাপের ব্যাঙ্কে ছিল প্রচুর টাকা, অশেষের ছিল বড় জমীদারীর একটা মোটা আয়। রেবার মনে ছিল বর্ত্তমান সভ্যতার শিক্ষা ও আলো, অশেষের ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধির 'পাশপোর্ট' এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের জ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম একটা অনুরাগ।

কিন্তু মদন-ঠাকুরের চলনটা বরাবরই একটু বাঁকা রকমের। সুতরাং এত সহজ ঘটকালী তিনি করলেন না। বাঁকা পথেই চল্‌ল তাঁর বাঁনের গতি।

তাই অশেষ যখন বল্‌লে—রেবা, তোমাকে পাওয়া আমার দরকার।

রেবা বল্‌লে — আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু হলুম।

অশেষ বল্‌লে—কিন্তু বন্ধুত্ব কি ততখানি সান্নিধ্য আমাদের দিতে পারবে, যতটা মন চাইবে এবং সম্ভবতঃ দেহও চাইবে?

রেবা বল্‌লে — মনের চাহিদা যদি মেটে, তবে দেহের চাহিদা মিটানো কঠিন হ'বে না। তখন না হয় পাতানো যাবে সেই সম্পর্ক, যা বন্ধুত্বকে ছাড়িয়ে ওঠে।

অশেষ হেসে বল্‌লে—বেশ!

যে যুগে দেহটাই ছিল বিবাহের সব, মানুষ সে যুগকে ছাড়িয়ে উঠেছে ব'লে গর্ব্ব করে। সে চলেছে আজ মনের অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে। কিন্তু এই যে মন, এর তো কোনো ধরা-বাঁধা চেহারা নেই। এ কি চায়, হয়তো নিজেও তা জানে না। হয়তো

যা চায় ব'লে মনে করে, সত্যিকারের চাওয়ার জিনিসই তা ওর নয় এবং বিভ্রাট্‌ বাধে সেইখানেই।

রেবা ও অশেষেরও বিবাহ হ'লো না। কিন্তু বিবাহ না হ'লেও মেলামেশা হ'য়ে উঠ্‌ল ওদের বিবাহিত নর-নারীর চাইতেও ঘনিষ্ঠ। অশেষের আস্‌বার সময়টাতে রেবা পরে কাল-বৈশাখীর ঘন মেঘের মতো নীল শাড়ী, যার আঁচ্‌লায় জলে বিদ্যুতের মতো ঝক্‌মকানো জরীর পাড়। অথবা বেছে নেয় সেই রকমের আর কোনো একখানা, যার রক্তের মতো লাল রং-এ বুকের রক্ত-ধারা চন্‌মনিয়ে ওঠে। ঠোঁটে ও 'লিপ্‌-ষ্টিক' লাগায় না বটে, কিন্তু স্বাভাবিক লাল ঠোঁটখানিকে আরো খানিকটা লাল ক'রে তোলে পানের অলক্তক দিয়ে। কোনো দিন বা কানে দোলায় হীরের দুল, দিনের আলো লেগে রাতের তারার মতো যা ঝল্‌মল্‌ ক'রে ওঠে। কোনো দিন বা ভালো সাবানের ফেনা দিয়ে বেণী ঝুলিয়ে তুলে' ও এলিয়ে দেয় ওর পিঠের উপরে।

কিন্তু ওর এই বেশ-ভূষার বাহুল্যগুলো যে খানিকটা coquetry হচ্ছে ও তা নিজেই টের পায়। তাই অশেষ এলে সোজাসুজি ভাবেই তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসে—আমার এই সাজ-সজ্জার বাহুল্যে তুমি চঞ্চল হও ক্ষতি নেই বন্ধু, কিন্তু তুমি বিরক্ত হ'চ্ছ না তো?

অশেষ জবাব দেয়—বিরক্ত হবার কিছু নেই তো ওতে। মেয়েরা যে by nature coquette, তোমার সাজ-সজ্জার ভিতর দিয়ে ফুটে' উঠ্‌ছে তারি একটা ইঙ্গিত। এতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই।

সে কথা জানা সত্ত্বেও রেবা মাথা নেড়ে তার প্রতিবাদ করে এবং বলে—কক্‌খনো নয়। তাই যদি হ'বে, তবে কই, সবার সাম্‌নে তো এই প্রসাধনের প্রয়োজন আমি অনুভব করি নে!

সবার সাম্‌নে প্রয়োজন বোধ না-করা কথাটার সঙ্গে আরো একটা ইঙ্গিত জড়ানো থাকে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইঙ্গিতটাও ধরা প'ড়ে যায় ওদের কাছে। অশেষের চোখ্‌ ভ'রে ওঠে হাসিতে, রেবার মুখ আরক্ত হ'য়ে ওঠে লজ্জায়। সেই আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে অশেষ আবার বলে—এতে প্রমাণ হ'লো, যে জিনিসটাকে আমরা eternal womanhood বলি, অতি-আধুনিক সভ্যতার খর-তাপেও তা তোমাদেরও ভিতর হ'তে শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে নি। প্রিয়তমের জন্য আদিযুগ হ'তে নারী এম্‌নি ক'রেই তার প্রলোভনের জাল রচনা ক'রে এসেছে।

এ তো গেল ওদের নিজেদের কথা, যখন মনের তারে ওদের বাজ্‌তে থাকে ধরা দেবার ও ধরা পড়্‌বার ছন্দ। কিন্তু তাই ব'লে ওদের সব কথাবার্ত্তা যে কেবল এই ধরণের ব্যক্তিগত গণ্ডির ভিতরেই গড়িয়ে চলে তা নয়। বাইরে বেরিয়ে যে সব কথা হয়, তা অধিকাংশ সময়েই ঘুরপাক খেতে থাকে জগতের আবহাওয়ার অরণ্যের মধ্যে। সে আলোচনারও নমুনা দিচ্ছি।

মোটর ছুটেছে ওদের হয়তো ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে পথের নানা বৈচিত্র্যের দোলায় দোল খেতে খেতে। রেবা সাম্‌নের দিকে চায়, বহির্জগতের কর্ম্ম-ব্যস্ততায় ও যেন হাঁফিয়ে ওঠে। মানুষের ক্লান্ত আড়ষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কান্না পায়। অশেষের কাছে আর একটু ঘেঁসে এসে ও বলে—জানো বন্ধু, মানুষের ভিতর এই যে অসাম্য, বিধাতার রাজ্যে এইটেই মানুষের সব চেয়ে বড় অপরাধ।

অশেষ বলে—তার মানে!

রেবা বলে — মানে তুমি চলেছ আনকোরা নতুন-কেনা মোটরে চ'ড়ে রেস্তোরাঁতে—খেয়ে পেট ভরাতে নয়, ফ্যাসানের দাবী মিটাতে। কিন্তু এই পথ-যাত্রীদের ভিতরে এমন অনেক লোক আছে যারা ভাঙা একখানা বাইসাইকেলের কল্পনাও করতে পারে না — এমন কি দু'বেলা পেট ভ'রে আহারের কল্পনাও যাদের কাছে দুর্লভ।

অশেষ বলে — কিন্তু রেবা এই অসাম্যের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায় মানুষের সত্যিকারের

শক্তির পরিচয়। মোটর গাড়ীতে যে চড়ে, আর যে রেস্তোঁরাতে খেয়ে স্ফূর্তি করে, তার এমন কোনো যোগ্যতা আছে যা সকল লোকের নেই। যোগ্যতমের উদ্বর্তনই তো পৃথিবীর নিয়ম!

— কিন্তু এই যে আমি দিনের মাঝে সাতবার ক'রে শাড়ী বদ্‌লাই যার একখানার দামে সাতায় জনের বয়ের অভাব মিটতে পারে, এই যে তুমি সাত হাজার টাকার গাড়ী বছরে একবার ক'রে বদ্‌লাতে সুরু করেছ — এ তোমার ও আমার কোন্ যোগ্যতার ফল!

অশেষ বলে — যে ভোগ করে, যোগ্যতা যে ঠিক তারই হ'বে, তা নাও হ'তে পারে। কিন্তু কারো যোগ্যতার ফল যে আমরা ভোগ কর্‌ছি তাতে তো আর ভুল নেই। ব্যারিষ্টার বিমল গুপ্ত তাঁর অসাধারণ মনীষার ফল ভোগ কর্‌তে দিচ্ছেন তাঁর মেয়েকে, আর অশেষ সেনের পিতামহ তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার দ্বারা যা অর্জন ক'রে গেছেন অশেষ সেন্ তাই ভাঙ্গিয়ে জোগাড় কর্‌ছে তার এই খুদে নবাবি-আনার মাল-মশ্‌লাগুলো।

রেবা বলে — তাই যদি হয় তবে তাতেও তো নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। একজনের ফল আর একজন যদি ভোগ কর্‌তে পারে, তবে বহুজনেই বা পার্‌বে না কেন? বিমল গুপ্ত ব্যারিষ্টারের প্রতিভার দানে কেবল রেবাই বা পুষ্ট হ'বে কেন, সে দান কেনই বা ছড়িয়ে পড়্‌বে না আর দশ জনের ভিতরে?

অশেষ হেসে বলে—কারণ প্রতিভা নিজে মস্ত বড় স্বার্থপর। জন-সাধারণের সঙ্গে ভেদ-রচনার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং···

বাধা দিয়ে রেবা বলে — কিন্তু তুমি ভুলে' যাচ্ছ বন্ধু, দুনিয়ার চাকা ঘুরে' গেছে। প্রতিভার চেয়েও বড় শক্তি আছে এবং সে তার সেলামী প্রতিভার কাছে থেকেও জোর ক'রে আদর ক'রে নিতে সুরু ক'রে দিয়েছে। র‍্যাশাতে এই বিদ্রোহ তার সঙ্গীন যে ভাবে উচিয়ে ধরেছে তাতে তার দিকে না-তাকানোও তো আজ আর সম্ভবপর নয়।

হেসে অশেষ বলে — তাকিয়েও খুব বেশী ভরসা পাই নে রেবা। জগতের সাম্য র‍্যাশার ঐ বিদ্রোহও এনে দিতে পার্‌বে না। আর যদি পারেই তবে সে সাম্য হ'বে, পথের যাদের দেখে তোমার চোখ্ সজল হ'য়ে উঠেছে তাদের সেই চোখ্-সজল-করা সাম্যই। দিনের ভিতরে সাতখানা ক'রে শাড়ী বদ্‌লাবার বা বছরে একখানা ক'রে আনকোরা নতুন মোটরকার কিন্‌বার সাম্য তা কখনো এনে দিতে পার্‌বে না। প্রতিভাকে তুমি জানো না — তার স্বার্থপরতা বাঘের রক্ত-পিপাসার মতো নিষ্ঠুর। তার চাকার তলে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের স্বপ্ন পথের ধূলোর মতোই চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে মিলিয়ে যায়, সে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। মানুষের স্বপ্নকে সার্থক কর্‌তে পার্‌ত ঐ প্রতিভা, যদি সে ভুলে' যেত পার্‌ত তার প্রতিভা আছে। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন র‍্যাশার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, কখনো এসে পহুঁছবে না বাস্তবতার কোঠায়।

গাড়ী এসে পহুঁছয় ওদের 'ফিরপোর' ফটকে। মানব-প্রীতির আচম্‌কা উচ্ছ্বাস সঙ্গে সঙ্গেই চাপা প'ড়ে যায় ওদের। তর্ক যায় বন্ধ হ'য়ে। খানিকটা রূপ ও খানিকটা সেন্টের হাওয়ায় ফুটপাথের দর্শকদের সচকিত ক'রে তুলে' ওরা পাশাপাশি ঢুকে' পড়ে তার 'করিডোরে'র ভিতরে।

বায়স্কোপ দেখে ওরা হামেসাই এবং বায়স্কোপের ফিল্‌ম্ নিয়ে ঝগ্‌ড়াও করে ওরা অনবরত। খুব কম ফিল্‌মই আসে বাংলায় যার রুচি নিয়ে, যার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরিস্থিতি নিয়ে ওদের মতের মিল হয়। ওদের সে ঝগ্‌ড়ার চেহারা এই রকমের।

গ্লোবে সেদিন যে ফিল্‌মটা ছিল সেটা ইউরোপের অতি আধুনিক যুগের একটি ছবি। নায়িকা ডোরা

দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে বাছাই ক'রে চলেছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বামীকে। বছরখানেকের ভিতরে সে যাচাই ক'রে দেখেছে খুব কম হ'লেও গুটি সাতেক সঙ্গী। তারা যে ভোগের অর্ঘ্য সাজিয়ে এনে ধরেছে তার দেহের সম্মুখে, ডোরার দেহ তা গ্রহণ করেছে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গেই। ডোরা বল্‌তে চায়—এই তৃপ্তিই দেহের পক্ষে সত্যিকারের কামনার জিনিস। এর ভিতরে নতুনত্বের আনন্দও আছে, অভিজ্ঞতার আলোও আছে। তার মতে স্বামীর সঙ্গে যারা ধরা-বাঁধা প্রেমের একঘেয়ে জীবন-যাপন করে, অত্যন্ত কৃত্রিম জীবন যাপন করে তারাই। কারণ কোথায় পাবে তারা প্রতিদিন আন্‌কোরা নতুনত্বের আস্বাদ, কোথায় পাবে তারা নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতার সম্পদ? ডোরার কাছে জীবনকে আস্বাদন কর্‌বার মাপকাঠিই হচ্ছে মত্ততা— সে মত্ততা প্রেমেরই হোক্, আর পানীয়েরই হোক্।

ঘণ্টা দুই ধ'রে এই অভিনয় দেখে অশেষ ও রেবা গ্লোবের সেই জনাকীর্ণ ঘরটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বস্‌ল ওদের গাড়ীতে।

অশেষ বলে—বলো তো গঙ্গার ধার দিয়ে গাড়ীটা একবার ঘুরিয়ে নিই। রাত এখনো বেশী হয় নি।

মাথা নেড়ে রেবা সায় দেয়।

গাড়ীর চলা সুরু হ'তে-না-হ'তেই কি মনে ক'রে রেবা হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—বন্ধু, কেমন লাগ্‌ল আজকের এই ফিল্‌মটা তোমার কাছে?

অশেষ বলে—বেশ ভালো।

রেবা বলে—ভালো! এমন নোংরা জিনিসটাকেও তুমি ভালো বল্‌তে চাও! ও-ছবি দেখে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার গা যে উঠেছে শির্-শির্ ক'রে ঘৃণায়, রাগে আর লজ্জায়।

অশেষ বলে—তার মানে বর্ত্তমান সভ্যতায় যাকে up-to-date বলে সে ধাপে এখনো তুমি এসে পহুঁছও নি।

উষ্ণ হ'য়ে রেবা জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু পহুঁছানোর কিছু প্রয়োজন আছে কি?

অশেষ উত্তর দেয়—তাদের আছে বই-কি জীবনকে যারা ত্যাগের দিক্ থেকে নেয় নি, নিয়েছে ভোগের দিক্ থেকে, রসের দিক্ থেকে নেয় নি, নিয়েছে মত্ততার দিক্ থেকে। তাদের ও-পথ ছাড়া তো আর পথই নেই। কারণ জীবনটাকে তারা চায় ভোগ কর্‌তে পুরোপুরি ভাবে—সমগ্র ভাবে। জীবনের উপভোগে দেহটাই তো তাদের প্রধান উপকরণ।

—কিন্তু জীবনকে তো ওরা ভোগ কর্‌ছে না, ওরা চলেছে নিজের জীবনটাকে দগ্ধ করে।

—তার প্রমাণ?

—প্রমাণ ঐ 'ভারমাউথ' প্রতি মুহূর্ত্তে যার প্রয়োজন হ'চ্ছে ডোরার জীবনে। কিন্তু জীবনের চার দিক্ ঘিরে' যার জ্বল্‌ছে আগুন, ভারমাউথের দু'-এক ফোঁটা জল কি ক'রে নিবোবে তার জ্বালা?

হেসে রেবার একখানা হাত নিজের হাতের ভিতরে তুলে' নিয়ে অশেষ বলে—এই যদি তোমার সত্যিকারের মত হয় রেবা, আমাদের এই প্রতীক্ষার পালাটার গণ্ডি টেনে চল্‌বারই বা আ হ'লে আর কোন্ প্রয়োজন আছে?

হেসেই রেবা উত্তর দেয়—তর্ক যেখানে ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকে ঝুঁকে' পড়ে তর্কের গণ্ডিও সেইখানেই টানা দরকার—এই হচ্ছে সুধীজনের মত। সুতরাং এ নিয়ে আর আলোচনা নয়।

তর্ক বন্ধ হয় বটে, কিন্তু অশেষ ওর হাতের চাপ্‌টা আরো একটু নিবিড় ভাবে অনুভব করে নিজের হাতের ভিতরে।

গাড়ী ওদের এসে পড়ে ময়দান পেরিয়ে গঙ্গার ধারে। আকাশে আবছা জ্যোৎস্নার বান। জাহাজ-গুলোকে সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দেখায় কতকটা ময়ূরপঙ্খী নৌকার মতো, রূপকথার রাজপুত্র যাতে চ'ড়ে সে যুগে যেতেন রাজকন্যার সন্ধানে। মাঠের মাঝখানে, গঙ্গার ও-পারে, দূরে কাছে জ্বলে আলোর তারা— কতকটা আকাশের নক্ষত্র-লোকের ভঙ্গিতে।

ওদের পাশ দিয়ে হুস্ ক'রে বেরিয়ে যায় হুড-খোলা একখানা মোটর। তার ভিতর থেকে ইংরেজ-দম্পতির মধুর কলহাস্যের খানিকটা ছট্‌কে এসে লাগে ওদের গায়ে। তার পরেই আসে একখানা 'ফিটন', হুডটা তার তোলা। হুড তো নয় যেন রহস্যলোকের পর্দা। কি যে আছে ওর ভিতরে জানা নেই। আর সেই জন্যই নানা রকমের অসম্ভবের সম্ভাবনা তার চারদিক ঘিরে' রচনা করে নানা কৌতূহলের জাল।

এই রহস্যলোকের মাঝখানে গাড়ী চালাতে আর ওদের ভালো লাগে না। গাড়ীখানা রাস্তার একপাশে ঠেলে দিয়ে ওরা এসে দাঁড়ায় একটা খালি 'জেটি'র ওপরে, যার নীচে গঙ্গার জল-ধারায় বাজুতে থাকে ছল্-ছল জল-তরঙ্গের সুর।

সেইখানে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে রেবা বলে — কাল আঁক্‌ব আমি এই নিস্তব্ধতার রাগিণী আমার ছবিতে। জানো বন্ধু, তাতে কোনো রং থাক্‌বে না, শুধু থাক্‌বে পেন্সিলের কয়েকটা আঁচড়, আর একটুখানি ফিকে নীলের 'ওয়াস্'।

অশেষ বল্ল—আর আমার কবিতার ভিতরে রূপ পাবে রেবা, তোমার হাতের ঐ ছোঁয়া। রক্তের রং-এ রাঙিয়ে উঠ্‌বে তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি লাইন, প্রত্যেকটি ইঙ্গিত।

কিন্তু জীবন-যাত্রার এই যে বিচিত্র গতি—তার মোড়ও ওদের ঘুরে' গেল। এইবার সেই মোড়-ঘোরার ইতিহাসটাই বলা দরকার।

বৈশাখের বিদগ্ধ মধ্যাহ্ন ঝিমিয়ে পড়েছে। কড়া হ'য়ে উঠেছে রোদের ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে বাতাসের ঘূর্ণী এসে জড়িয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার উদ্বেগ ও অসংযম নিয়ে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রেবাদের বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তাটা নির্জ্জন হ'য়ে উঠ্‌ল। পথ-চারীদের কল-কোলাহলের মুখরতা গেল বন্ধ হ'য়ে।

সেই অলস মধ্যাহ্নে ঘরের জানালা-দরজাগুলো সব বন্ধ ক'রে দিয়ে ফ্যান খুলে' রেবা এসে বস্‌ল তার আরাম-কেদারাখানাতে। একটু বাদেই একটা 'ট্রে'তে ক'রে সেদিনের চিঠিপত্র ও সাময়িক পত্রগুলো তার 'বয়' এনে রেখে গেল তার সাম্‌নে। দিনের সেই সময়টাতেই রেবা তার ডাকের আগন্তুকদের খবরদারী করে। চিঠিপত্রগুলো পড়ার পাট শেষ ক'রে দিয়ে ও খুলে' বস্‌ল সেই মাসের সদ্য-আগত 'চিত্রলেখা'-খানা। পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতে ওর চোখ্ আট্‌কে গেল 'ছবি ও 'কবিতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের উপরে। বল্‌বার ভঙ্গি ও নতুনত্ব টান্‌ল ওর মনকে। কবিতা ও ছবি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমালোচনা করা চলে এবং সে রকমের সমালোচনা হামেসা হ'য়েও থাকে প্রায় সব কাগজেই। কিন্তু ছবি ও কবিতার ভিতরে একটা যোগাযোগের সূত্র বা'র ক'রে রসের একই নিক্তিতে মেপে তাদের ওজন ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা নতুন। এই নতুন চেষ্টাতেই হাত দিয়েছেন প্রবন্ধ-লেখক। তিনি বল্‌তে চান—ছবি ও কবিতা বাস্তবিক পক্ষে ভিন্ন জিনিস নয়—একই জিনিস। রসের পরিবেশনের উপরে ওদের উভয়েরই প্রতিষ্ঠা—শুধু পরিবেশনের পাত্রটি ভিন্ন। কবিতা রসের পরিবেশন করে শব্দের দ্বারা, আর ছবি করে রেখার দ্বারা। প্রবন্ধটি রেবা প'ড়ে চল্‌ল বেশ একটা বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিস্ময় হঠাৎ উদ্ভত হ'য়ে উঠ্‌ল ওর চোখের সাম্‌নে দু'-তিন খানা পাতা ওল্‌টাতে-না-ওল্‌টাতেই, যখন ও দেখ্‌লে ওকে এবং অশেষকে ঘিরে'ই জমাট হ'য়ে উঠেছে প্রবন্ধকারের যুক্তি।

ওর ছবি ও অশেষের কবিতার তুলনামূলক আলোচনায় প্রবন্ধকারের যুক্তি প্রশংসার পুষ্প ছড়িয়ে চলেছে ওর সম্পর্কে এবং আঘাতের সঙ্গীন উঁচিয়ে চলেছে অশেষের বিরুদ্ধে। বড় বড় পণ্ডিতদের মত সংগ্রহ ক'রে, নানা নজির দেখিয়ে নিজের বক্তব্যকে অভ্রান্ত উপমার সাহায্যে সুস্পষ্ট ক'রে প্রবন্ধকার প্রমাণ করেছেন—অশেষ সেন যা রচনা করেছেন তা ফেনার বুদ্‌বুদ, কিন্তু রেবা গুপ্তা যা এঁকেছেন তা হ'য়ে রইল ভারতের চিরন্তন গৌরবের

সামগ্রী। অশেষের কবিতা যে উত্তেজনার মদ পরিবেশন করেছে, তাতে মনকে নাড়া দেবার মতো ঝাঁঝ আছে সত্য, কিন্তু সে ঝাঁঝ মদের নেশার মতোই ক্ষণস্থায়ী। বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার উপরেও তার একটা দাবী আছে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ জিনিস নিয়ে। তাতে নতুনত্ব কিছুই নেই। নর-নারীর দেহের মিলনের প্রতিদিনকার ঘটনার ভিতর দিয়েই পাওয়া যায় তার পরিচয়। কিন্তু রেবার ছবি পরিবেশন করে যে রসের, সে রসের সন্ধান পেতে হ'লে প্রয়োজন হয় দিব্য দৃষ্টির। আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে যে না দাঁড়িয়েছে সে দৃষ্টি সে পায় না। দেহের ভোগের ভিতর দিয়ে এ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় না, এ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় আত্মার বিলাসের ভিতর দিয়ে।

নিজের প্রশংসা রেবার মনকে মাতাল ক'রে তুল্‌লে, কিন্তু এই মত্ততাকেও ছাপিয়ে উঠ্‌ল প্রবন্ধে অশেষের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তারি বেদনাটা। লেখকের ঔদ্ধত্য, তার অহঙ্কার যেন চাবুক চালিয়ে ফির্‌তে লাগ্‌ল রেবার বুকের উপরে। তার মন উঠ্‌ল উত্তেজিত হ'য়ে। কিন্তু তবু প্রবন্ধটিকে কিছু-না ব'লে সে উপেক্ষাও কর্‌তে পার্‌লো না। মানুষের সব চেয়ে বিপদ হয় তাকে নিয়েই যাকে উপেক্ষা করা যায় না, অথচ যে প্রতি মুহূর্ত্তে মনের ভিতরে খোঁচা দিয়ে ফির্‌তে থাকে।

প্রবন্ধ-লেখকের নাম রজত রায়। নামটার সঙ্গে রেবার পরিচয় নেই। কিন্তু ও দেখ্‌লে তার নামের পেছনে রয়েছে ইউরোপের তিন-চারটে বড় বড় ইউনিভার্সিটির পাশপোর্ট। তা ছাড়া যা বল্‌তে চায়, তা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বল্‌বার চংটাকেও সে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে চমৎকার। সুতরাং এ প্রবন্ধ প'ড়ে অশেষ কি ভাব্‌বে তারি চিন্তায় একটা নিবিড় অসোয়াস্তি জেগে উঠ্‌ল ওর মনের ভিতরে।

সারা দুপুরটাই প্রায় কেটে গেল রেবার এই অসোয়াস্তির ভিতর দিয়ে। অবশেষে মনের এই ভারটাকে লঘু ক'রে ফেল্‌বার জন্যই ও তুলি, রং ও ক্যান্‌ভাস্ নিয়ে বস্‌লে ছবি আঁক্‌তে। কিন্তু ছবি আঁকায় সেদিন ও আর মন বসাতে পার্‌লে না। ওর বুকের ভিতরে কেবলি খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফির্‌তে লাগ্‌ল রজত রায়ের সেই প্রবন্ধটা। তবু তুলিটা ফেলে দিয়ে যে উঠে' পড়্‌বে তাও ওর ভালো লাগ্‌ল না। তাই মনের চাঞ্চল্য ঢাক্‌বার জন্যই ও যেন তুলির আঁচড় কাট্‌তে লাগ্‌ল ওর নিজের মনের গায়ে ছবিটাকে উপলক্ষ্য ক'রে।

কিন্তু এই অসোয়াস্তির হাত হ'তে মুক্তি দিল ওকে অশেষ নিজে। ঘরে ঢুক্‌েই স্মিত হাস্যের দীপ্তি খানিকটা চার পাশে ছড়িয়ে দিয়ে সে বল্‌লে—ছবি রাখো, দিকে দিকে তোমার জয়-শঙ্খ বেজে উঠেছে—তার বার্ত্তা শোনো, ভক্ত আমি আমার কাছ থেকে। আর এই সংবাদ বহন ক'রে আনার জন্য আমার যা যোগ্য পুরস্কার তাও দাও আমাকে আদায় ক'রে নিতে।

হেসে তুলিটা রেখে দিয়ে রেবা বল্‌লে—অর্থাৎ

—অর্থাৎ আজকার 'চিত্রলেখা'য় রেবার চিত্র পেয়েছে যশের জয়-মাল্য, যা যে-কোনো শিল্পীর পক্ষে দুর্লভ।

চোখ্ দু'টো একটা অব্যক্ত বেদনায় ম্লান ক'রে তুলে' রেবা বল্‌লে — আজকের 'চিত্রলেখা' আমি দেখেছি বন্ধু। কিন্তু তুমি কি মনে করো, কোথাকার কোন্ 'ভ্যাগাবণ্ড' কি সব রাবিশ দিয়ে কোন্ মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিকের পাতা ভরিয়ে তুলছে তাই প'ড়ে আমিও ঘুলিয়ে ফেল্‌ব আমার মাথার মগজ?

তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে অশেষ বল্‌লে — ভ্যাগাবণ্ড নয় রেবা, ভ্যাগাবণ্ড নয়। একটা বড় কলেজের বিলাত-ফেরত অধ্যাপক। তা ছাড়া ঐ প্রবন্ধও পরিচয় দিচ্ছে যে, ওর যুক্তির ভিতরে ধারও আছে, ভারও আছে। আমার প্রতি কটাক্ষই হয়তো বিরূপ ক'রে তুলেছে তোমাকে প্রবন্ধটির সম্বন্ধে। কিন্তু সব মানুষের বিচারের ধারা এক নয়। সুতরাং ওর বিচারের কষ্টি-পাথরে আমার জিনিসটা যদি মেকি ব'লেই ওর মনে হ'য়ে থাকে, তবে তা বল্‌বার অধিকারও তো ওর আছে।

রেবা বল্‌লে—তোমার যুক্তি আমি বুঝি নে। ভালো জিনিসকে কিছু-না ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার ভিতরে থাকে হয় হিংসা, না হয় নির্ব্বুদ্ধিতা। নির্ব্বোধ যদি না হয়, তবে ওর এই প্রবন্ধ-রচনার মূলে আছে বিদ্বেষ। সুতরাং তাকেও তো সহ্য করার কোনো অর্থ নেই।

তার কথার দিকে কান না দিয়ে ধীরে ধীরে রেবার হাতখানা অশেষ নিজের হাতের ভিতরে তুলে' নিলে। আঙুলের সঙ্গে আঙুল গেল জড়িয়ে। স্পর্শটা রক্তের ভিতর দিয়ে চন্‌মন্ ক'রে চারিয়ে গেল। অশেষ বল্‌লে—দেহটাও যে শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করতে পারে, আমি তার পরিচয় পাচ্ছি তোমার এই স্পর্শের ভিতর দিয়ে আমার রক্তের কণাগুলোতে। যে এই স্পর্শ পায় নি সে যদি একে ছোট ব'লে অগ্রাহ্য করে, তাতে ক্ষুণ্ণ হবারও তো কিছু নেই!

স্পর্শের যাদু থামিয়ে দেয় ওদের তর্ক, কমিয়ে আনে ওদের মনের তিক্ততা। হাতের ভিতরে হাত রেখেই ওরা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু প্রবন্ধটার জের যে শুধু প্রবন্ধের ভিতর দিয়েই শেষ হ'লো তা নয়। তা রীতিমতভাবে জট পাকিয়ে তুল্‌লে ওদের জীবনেও। কারণ প্রবন্ধকার রজত রায় প্রবন্ধ ছেড়ে শরীরের ভিতর দিয়েও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন ওদের সাম্‌নে। বেলা প্রায় সাড়ে চারটে—আকাশে অগ্নির জ্বালা রয়েছে তখনো যথেষ্ট—হঠাৎ এম্‌নি সময় রেবার শোবার ঘরে ঢুকে' 'বয়' তার হাতে দিলে একখানা কার্ড। কার্ডের নামটা দেখে রেবা উঠ্‌ল চম্‌কে। রজত রায়! নামের পাশেই ছোট ছোট অথচ ভারি পরিষ্কার ছাঁদের হরপের লেখা—আমি আপনার ছবির ভক্ত। 'ষ্টুডিও'টা দেখ্‌তে চাই।

রজত রায়ের প্রতি ওর মন প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু যে মন অপ্রসন্নতার খাতিরে সাধারণ ভদ্রতার অসম্মান করে, সে মনের সঙ্গেও পরিচয় ছিল না রেবার। তাই শাড়ীখানা একটু গুছিয়ে নিয়ে, আল্‌গা চুলের গোছাগুলো চিরুণীর টানে ভিতরের দিকে ঠেলে দিয়ে ও এসে ঢুকে' পড়্‌ল 'ড্রয়িং-রুমে'র ভিতরে।

কেবল লেখা নয়, রজত রায়ের চেহারার ভিতরেও ছিল একটা বিশিষ্টতার ছাপ যা সাধারণ বাঙালীর চেহারায় বিশেষ চোখে পড়ে না। দেহ দীর্ঘ বলিষ্ঠ। রং-এ আছে একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা—যা মনে সহসা বিস্ময় জাগায়। গোঁফের একটা সরু রেখা চ'লে গিয়েছে নাকের নীচ দিয়ে ঠোঁটের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত। দাড়ি খুর দিয়ে নির্ম্মমভাবে চাঁচা। লম্বা টানা চোখ্ কানের দিকটাতে খানিকটা ঘেঁসে এসেছে। চশ্‌মার বিড়ম্বনা নেই তাতে। চশ্‌মার প্রয়োজন হ'লেও সুন্দর চোখ্ দু'টো ঢাকা পড়্‌বার ভয়ে ও যে চশ্‌মা পর্‌ত না—ওর মুখ দেখেই হয়তো তা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে ওর সারা মুখের উপরে। হয়তো অহঙ্কারের খাদও খানিকটা মিশানো রয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি সে ছাপটাকে ফুটে' উঠ্‌তে দেয় নি। গায়ে একটা ঢিলা হাতার পাঞ্জাবী—এত ঢিলা যে হাত উঠালে একেবারে বাহুমূল পর্য্যন্ত দেখা যায়। পায়ে তালতলার চটি, চামড়ার রং তার লাল, মাথাটা অনেক দূর পর্য্যন্ত বেঁকে এসেছে, তার চূড়ায় একটা জরীর ঝুঁটি। ও যে বিলাত-ফেরৎ তার পরিচয় পাওয়া যায় ওর এই বেশভূষার ভিতর দিয়েও, যদিও তাতে পা-জামা বা টাই-কোটের সম্পর্ক নেই।

রেবা ঘরে ঢুক্‌তেই উঠে' দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে ও বল্‌লে—নমস্কার!

রেবার ঠোঁটে ফুটে' উঠ্‌ল স্বাভাবিক সৌজন্যের হাসি। সেই হাসি দিয়ে রজতকে অভিনন্দিত ক'রে সেও বল্‌লে—নমস্কার! বসুন।

রজত বল্‌লে—আপনার ছবির original আমি দেখি নি। ওদের print-ই আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আপনার 'ষ্টুডিও' দেখ্‌তে চাই।

রেবা বল্‌লে—ষ্টুডিও ব'লে তো আমার কিছু নেই। যখন খেয়াল হয় ঘরে ব'সেই ছবি আঁকি। অশেষের যেখানা ভাল লাগে হয় মাসিকপত্রে পাঠায়, নইলে বাঁধিয়ে নিয়ে আসে আমার জন্যে। বাদ-বাকিগুলো উপেক্ষিত হ'য়ে প'ড়ে থাকে হয় বাক্সের ভিতরে, নয় দেরাজের মধ্যে রদ্দিমাত্রের গাদায়।

রজত বল্‌লে—অশেষ, অশেষ কে?

রেবা বল্‌লে—কবি অশেষ, যার কবিতার সমালোচনা করেছিলেন আপনি 'চিত্রলেখা'তে।

রজত বল্‌লে—আমাকে মাফ্ করবেন। অশেষবাবু আপনার বন্ধু তা আমি জান্‌তুম না। তা হ'লে তাঁকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতুম না। আমার বক্তব্যটা পরিস্ফুট করবার জন্য অন্য যে-কোনো বস্তু-তান্ত্রিক কবির লেখা নিলেও চল্‌ত। কিন্তু সে কথা থাক্। আমি দেখ্‌তে চাই আপনার খেয়ালের সেই সৃষ্টিগুলো।

রেবা রজতকে নিয়ে ঢুক্‌লে পাশের ঘরটাতে। দেয়ালে অনেকগুলো ছবি ঝুল্‌ছিল। তাদের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ ক'রে রেবা বল্‌লে—ঐ গুলোই আমার খেয়ালী মনের স্বপ্ন। খেয়ালেরও দাম নেই, স্বপ্নেরও দাম নেই। সুতরাং আমি জানি ও-গুলোর দামও কিছু নেই। আপনার শ্রম সার্থক হ'বে না, রজতবাবু। কিন্তু সেজন্য আমাকে দোষও আপনি দিতে পারবেন না।—ব'লেই রেবা হেসে উঠ্‌ল। হাসির টুক্‌রোগুলো অকারণেই ওর ঠোঁটের প্রান্ত ঘিরে' ঠিক্‌রে পড়ে।

রজত কোনো জবাব দিলে না। এক একখানা ছবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেই পটগুলোকে—তাদের রেখা, তাদের ভঙ্গি, তাদের ব্যঞ্জনাকে। তার মুখে ফুট্‌ল আনন্দের আলো, চোখে জাগ্‌ল বিস্ময়ের দীপ্তি। ঘণ্টাখানেক সময় তাদের প্রায় নিঃশব্দেই মিলিয়ে গেল। তারপর ঘুরিয়ে এলো ছবির রাজ্য। এইবার চোখ্ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে রজত বল্‌লে—মিস্ গুপ্তা, বিলেত হ'লে এর যে-কোনো একখানা ছবি আপনাকে বিখ্যাত ক'রে তুলত একদিনের মধ্যে—এম্‌নি সব শক্তির ছাপ রয়েছে এ-গুলোর ভিতরে। যে স্বপ্ন inspired মন ছাড়া আর কারো কাছে ধরা পড়ে না, আপনার ছবির ভিতরে রূপ নিয়েছে সেই সব স্বপ্নই। আর সেই জন্যই এগুলো হ'য়েছে এত অপূর্ব্ব। কিন্তু আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। ঐ দেখুন, কে একজন ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। আপনার রদ্দিমালগুলোর খবর আজ আর আমার নেওয়া হ'লো না। সেগুলো ঘাঁট্‌তে গিয়ে হয়তো দেখ্‌তে পাবো অনেক মণি-মুক্তাও ছড়িয়ে রয়েছে তার ভিতরে। সুতরাং আর এক দিন আপনার এখানে আমার নিমন্ত্রণ রইল।

তার পরেই রেবাকে ছোট্ট একটা নমস্কার ক'রে ও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রেবার মনে হ'লো, ওর বেরিয়ে যাওয়াটা একটু বেশী রকমের ড্রামাটিক। কিন্তু তা' হ'লেও তা' মনের উপরে ছাপ রেখে যায়।

রেবার নিয়ম ছিল—অশেষের নিত্যকার আসার সময়টাতে আর সকলকেই এড়িয়ে চলা। দিনের ঐ কয়েকটি ঘণ্টা ও একেবারে আলাদা ক'রে রাখ্‌ত তার জন্য। জিজ্ঞাসা করলে হেসে বল্‌ত—মানুষের দিন-দণ্ডগুলো তার নিজের নয়। নানা কাজ সময়কে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেয় তাদের নিজেদের ভিতরে। কিন্তু এমন খানিকটা সময় সব মানুষেরই থাকা দরকার, যাকে আপনার ব'লে দাবী করা যায়। অশেষের সঙ্গের এই মুহূর্ত্তগুলিই আমার নিজের মুহূর্ত্ত। সুতরাং তার আর কোনো ভাগিদার না থাকাই তো ঠিক।

যে সময়টার সম্বন্ধে রেবার এই ইঙ্গিত সে সময়টা তার নিজের জন্য আলাদা-ক'রে-রাখা সময় হ'য়ে হয়তো থাক্‌লই, কিন্তু তা যে অশেষ ও রেবার দু'জনের সময় হ'য়ে থাক্‌ল না, তার পরিচয়ও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল দু-চার দিনের ভিতরেই—বিশেষ ক'রে

অশেষের কাছে। বিকেল বেলায় নিত্যকার মতোই সে এসে ঢুক্‌ত্ রেবাদের এই ঘরটিতে, কিন্তু আগেকার মতো সে আর এখন একলা পেতো না তাকে। কোনো দিন দেখ্‌ত—রজত রায়ের সঙ্গে চলেছে তার ছবি নিয়ে আলোচনা, যে-ছবিগুলোকে তার অশেষ বাজে ব'লে রদ্দিমালের তালিকার ভিতরে ফেলে রেখেছিল, ও হয়তো সেইগুলি বেছে নিয়ে তাদের অপূর্ব্বতায় উচ্ছ্বসিত বিশেষভাবে মুখর হ'য়ে। কোনো দিন কাব্যের রহস্যলোকে চল্‌ত ওদের বিচরণের পালা। এম্‌নি ক'রেই যে মিলন ছিল একান্তভাবে অশেষ ও রেবার, সে মিলনের ভিতরে বিপ্লবের ঘূর্ণি ঘনিয়ে এলো। তার পরেই গেল সব ডামাডোল পাকিয়ে।

সেদিন রবিবার। অসময়ে রেবাদের বাড়ীতে অশেষের খেয়াল নিয়ে এলো তাকে টেনে। ঘরে ঢুকেই সে দেখ্‌লে, রেবা পরেছে তার সেই মেঘলা রঙের শাড়ীখানা, অশেষকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যই যা সে এতদিন ধ'রে প'রে এসেছে বরাবর। তার বিদ্যুতের মতো দেহের উপরে সেখানা জড়িয়ে আছে একটা অপরূপ ছন্দের সৃষ্টি ক'রে। কালো কেশের দু'একটা গুচ্ছ ও ইচ্ছা ক'রেই এলিয়ে দিয়েছে ওর কপোলের উপরে, যেমন ক'রে ও এলিয়ে দিত অশেষের সঙ্গে বেড়াতে বেরুবার সময়। ওর এই চুলের গোছাগুলো নিয়ে খেলা করা কয়েক দিন আগেও ছিল অশেষের সব চেয়ে বড় বিলাস। অনেক দিন পরে অশেষের বুকের ভিতরে রক্তের ধারা ওর এই সাজ-সজ্জায় যেন ঝড়ের দোলায় দু'লে উঠ্‌ল। এ সজ্জা যে ওর জন্য না-ও হ'তে পারে, সে কথাটা একবার মনেও হ'লো না অশেষের। সে ওর হাতখানা নিজের হাতের ভিতরে তুলে' নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি যে এখনই আস্‌ব রেবা, সে কথা তুমি কি ক'রে টের পেলে?

রেবা বল্‌লে—তুমি আস্‌বে তা তো জান্‌তুম না বন্ধু। আসার কথা আছে রজতের। তার সঙ্গে তিনটের শো-তে দেখ্‌তে যাবো রাস্‌পুটিন। তাই সেজে-গুজে ব'সে আছি। কিন্তু তুমি এসেছ ভালোই হ'য়েছে, চলো আমাদের সঙ্গে। ছবিটাতে না কি ফিল্‌ম-আর্ট-এর perfection কোথায় এসে পৌঁচেছে, তারি একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

অশেষের হাতের ভিতর থেকে রেবার হাতখানা একটা আচম্‌কা ঝাঁকুনি লেগে খ'সে পড়্‌ল। ধীরে ধীরে অশেষ বল্‌লে—তা হ'বে। কিন্তু রেবা, আমার তো যাবার জো নেই। রেখা নিমন্ত্রণ করেছে বেলা চারটায় তাদের চায়ের আসরে। সুতরাং বিদায়। তোমাদের অপরাহ্নের আসর রাস্‌পুটিনের রস-ধারায় মধুর হোক্।

ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ও বস্‌ল ওর মোটরের উপরে। তার পরেই একটা হর্ণ উঠ্‌ল বেজে। নিজের চলায় ওর চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু মোটরের চাকায় জাগ্‌ল বিদ্যুতের বেগ।

বর্ষা আকাশে সেবার অকালেই বেশ সমারোহ জমিয়ে তুলেছে। সবে আষাঢ় মাসের সুরু। এই গোড়াকার দিকটাতেই আজকাল ভোর হ'তে-না-হ'তে সুরু হয় মেঘের মৃদঙ্গের রসালাপ। ঝর্-ঝর্ ধারা ঝরে। তার অবিশ্রান্ত একটানা সুরের ভিতর দিয়ে ক্লান্ত ধরণীর বুকের নিঃশ্বাস ওঠে ভারি হ'য়ে। চির-বিরহিণী এই ধরণীর অশ্রু ও নিঃশ্বাস হঠাৎ সেদিন চারিয়ে গেল অশেষের মনে। দুঃসহ ব্যথা মরীয়া ক'রে তুল্‌লে অকস্মাৎ তার মনটাকে। একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সে লিখ্‌ল—রেবা, আমার মন আজ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে তোমাকে কাছে পাবার জন্য এবং কয়েকটা কথা বল্‌বার জন্য। কিন্তু তোমার ওখানে যেয়ে তো তোমাকে একলা পাওয়া যায় না। বর্ষার ঘন বর্ষণ-মুখর নিভৃত দুপুরে তোমাকে কাছে

পাওয়ার লোভ যে আমার কত তাও তুমি জানো। আজ সারা দুপুর আমি তোমার প্রতীক্ষা ক'রে রইব। তারপর চিঠিখানা মুড়ে' খামে পুরে' সে পাঠিয়ে দিলে রেবার কাছে।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া অশেষ সকাল সকাল মিটিয়ে নিলে। তারপর থেকেই চল্‌ল ওর প্রতীক্ষার পালা। আকাশ ঘন হ'য়ে মেঘে ছেয়ে গেছে। বুকের মাঝখান থেকে যেন তার ডুক্‌রে উঠেছে কান্না, অথচ জোর ক'রে সে রাখ্‌ছে তাকে চেপে। এই চেপে রাখা যে বেশীক্ষণ চল্‌বে না, আকাশের চেহারা দেখেই তা ধরা যায়।

অশেষও তাই চায়। ঘন বুনোনো চিকের মতো জলের ধারা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চিক্ রচিত হ'বে সারা বিশ্বের উপরে। তারি আড়ালে ঢাকা প'ড়ে যাবে যা দূরের তাও, যা কাছের তাও। সেই ঘন ধারার কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়ে এসে দাঁড়াবে তার প্রিয়তমার রথ তার দ্বারের কাছে। হয় তো রেবা নিজেই চালিয়ে নিয়ে আস্‌বে তার মোটর। শোফারকেও সে সঙ্গী কর্‌বে না তার এই অভিসারে। সে যুগে মেঘ-মেদুর রজনীর অন্ধকার পঙ্কিল পথ-রেখার উপর দিয়েই ছিল বিরহিণীদের অভিসার। এ যুগের মনের পরিবর্ত্তন হয় নি, কিন্তু পথ-ঘাট যান-বাহনের ঢের রদ-বদল হ'য়ে গেছে। সুতরাং নিবিড় বৃষ্টিপাতের ভিতর দিয়ে মেঘের মন্দ্রধ্বনি একলা সেই মোটর-যাত্রিণীকে টেনে নিয়ে আস্‌ছে তারি বাড়ীর দোরে—এ কল্পনা অশেষের কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হ'লো না, বরং এই কল্পনার ইন্দ্রধনুর স্পর্শে তার প্রতীক্ষার দণ্ডগুলো নানা আলোকের বুবুদে রঙিন হ'য়ে উঠে' ছড়িয়ে পড়্‌ল তার মনের দিগ্বিদিকে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যি সত্যিই আকাশ ছাপিয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে এলো। অশান্ত বাতাস বৃষ্টির সেই ধারাগুলোকে নিয়ে সুরু ক'রে দিলে তাদের মাতামাতি। গাছের পাতা ভিজে হ'য়ে উঠ্‌ল শ্যামল ও উজ্জ্বল। তাদের দেহ ছাপিয়ে টুপিয়ে টুপিয়ে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল মোটা মোটা জলের ফোঁটাগুলো।

একখানা চৌকী জানালার কাছে সরিয়ে এনে অশেষ বাইরের সেই দুর্দ্দান্ত মাতামাতির দিকে চোখ্ ফেলে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। জলের ছাঁট এসে মাঝে মাঝে ওকে ভিজিয়ে দিতে সুরু কর্‌লে। কিন্তু চৌকী ছেড়ে ও নড়্‌ল না—চৌকীখানাকেও দূরে সরিয়ে নিলে না। ঐ জলের ছাঁটের স্পর্শের ভিতর দিয়ে ও যেন অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল—ওর যোগ রেবার সঙ্গে। রেবা বেরিয়েছে মোটরে, এই জলের ছাঁট এসে লাগ্‌ছে তার গায়েও। তার সেই নীল শাড়ীর প্রান্তটা—হয় তো বা সবটাই ভিজে' গেছে। ভিজে কাপড়ের রং-এর ছোপ লেগেছে হয় তো তার পায়ের পাপ্‌ড়ির মতো অপরূপ ত্বকের উপরে। অশেষ ভাব্‌তে লাগ্‌ল—দোরে এসে মোটরের হর্ণ বাজ্‌তেই ও ছুটে' যেয়ে হাতে ধ'রে রেবাকে নিয়ে আস্‌বে ঘরের ভিতরে। আর এই হাতে ধরার ভঙ্গিটা হ'বে তার কতকটা আলিঙ্গনের মতো।

তারপর···তারপর সে আজ তার হৃদয়ের সবগুলো পর্দ্দা তুলে' ধর্‌বে রেবার সাম্‌নে—যে আবরণ সে এতদিনেও ঘুচাতে পারে নি, এই মেঘ-মেদুর মধ্যাহ্ন যে মোহের সৃষ্টি করেছে, ওর মনে হ'লো, তারি অন্তরালে ব'সে তাকে তুলে' ধরা আজ আর ওর পক্ষে মোটেই কঠিন হ'বে না।

স্বপ্নের পর স্বপ্নের জাল রচনা ক'রে চল্‌ল ও এম্‌নি ক'রে ওর মনে। আর সেই মন-গড়া সহস্র স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দিনের ঘণ্টাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পৌঁছালো মেঘলা দিনের অপরাহ্নে। কিন্তু হায় রে বিধাতার অভিশাপ! অতিথি এলো না। তার বদলে এলো শুধু তার একখানি চিঠি। রেবা লিখেছে—

বন্ধু, আজ তোমার নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে পার্‌লুম না। রজত আজ আস্‌বে আমাকে তার একটি রচনা শুনাতে। তোমার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়ার আগেই তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। সুতরাং কাল সকালে হাজিরা দেবো তোমার দরবারে।

মানুষের স্বপ্ন ভাঙ্গেই। কিন্তু এমন কতকগুলো স্বপ্ন আছে যা ভাঙ্‌লে সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে প'ড়ে তার মেরুদণ্ড — তার সমস্ত জীবনটা। সমাধি হ'য়ে যায় তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার। সেই রকমের একটা স্বপ্নই ভেঙে পড়্‌ল অশেষের মনের। তার হাতের ভিতরে রেবার চিঠিখানা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বাইরে বর্ষার রোদন তখন থেমে গেছে। কিন্তু সারা আকাশ তখনও থম্ থম্ কর্‌ছে সারা রাত্রি ধ'রে নিজেকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দেবার জন্যে।

ঘণ্টাখানেক পরে অশেষ এসে দাঁড়ালো বাইরে ওর গাড়ী-বারান্দার ছাদের উপরে। তারপর সেইখান থেকেই ও ডাক্‌লে ওর শোফারকে তার নাম ধ'রে।

শোফার এসে দাঁড়ালো ওর সাম্‌নে।

অশেষ বল্‌লে — আব্‌দুল গাড়ী বা'র করো, ষ্টেপ্‌নিতে দু'টো নতুন টায়ার নাও। ট্যাঙ্ক ভ'রে নাও পেট্রোল্। অনেক দূরের পাল্লা পাড়ি দিতে হ'বে আজ রাত্রিতে এবং কবে কোথায় যেয়ে যে আমার এবারকার যাত্রা শেষ হ'বে তা আমি নিজেও জানি নে।

আব্‌দুল একবার আকাশের দিকে তাকালে। দেখ্‌লে কালো মেঘগুলো সেখানে ঘনিয়ে আস্‌ছে পরস্পরের কাছে একটা প্রচণ্ড বিপ্লবের মতলব নিয়ে। সেখান থেকে চোখ্ ফিরিয়ে সে তাকালে অশেষের মুখের দিকে। তারপর তাকে সেলাম ক'রে বল্‌লে— বহুৎ আচ্ছা হুজুর! আধা ঘণ্টাকা ভিতর 'কার' জানেকো লিয়ে জরুর তৈয়ারী হো জায়ে গা।

আধঘণ্টার ভিতরেই অশেষের গাড়ী বেরিয়ে পড়্‌ল পথের প্রান্তে। তার মিনিট পনেরো পরেই কলিকাতা শহর ও শহরতলী ছাড়িয়ে তারা ধর্‌ল গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পথ। গাড়ীর হুইল অশেষের হাতে। মিটারে চলার বেগ অঙ্ক কেটে চলেছে তখন ঘণ্টায় ৭০ মাইল।

* * *

বছর খানেক পরের কথা। বাংলার বড় বড় মাসিক পত্রের পাতায় বেরুতে সুরু হয়েছে আবার অশেষ সেনের কবিতা এবং রেবা গুপ্তার ছবি। কিন্তু ছন্দ তাদের গেছে একেবারে বদ্‌লে। রেবা গুপ্তার ছবিতে থাকে আজকাল রঙের অনন্ত বিলাস — তার টানে টানে ফুটে' ওঠে দেহের জয়-যাত্রার বিচিত্র ভঙ্গি। কামনার অজস্র ইঙ্গিত টগবগ্ ক'রে ফুট্‌তে থাকে তার প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনার ভিতর থেকে। আর অশেষের কবিতা হ'য়ে উঠেছে এমন একটা বস্তু যা ধরা-ছোঁয়া যায় না — যা ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যায় সাধারণ লোকের কাছে। অথচ যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন —বাষ্পের পরিণতি আকাশের ঐ মেঘের মতোই ওর কবিতা বিদ্যুৎ-গর্ভ! রসের উৎস তার চারপাশ ছাপিয়ে একেবারে টইটম্বুর হ'য়ে ছড়িয়ে আছে।



স্বস্তিক চিহ্ন

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

ভারতের সর্ব্বত্রই স্বস্তিক চিহ্ন দেখা যায় মেয়েদের কানের দুলে স্বস্তিক, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে স্বস্তিক, স্বেচ্ছাসেবকদের স্বস্তিক-ব্যাজ, আলপনায় স্বস্তিক, পার্ব্বত্য গুহার গাত্রে স্বস্তিক। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার বহুল প্রচলন থাকিলেও বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর নাজীদের মধ্যেই ইহার সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জার্ম্মানীতে স্বস্তিক চিহ্নের সমাদর খুব বেশী। কি করিয়া জার্ম্মানীতে নাজীদের মধ্যে এই স্বস্তিক চিহ্ন এরূপ সমাদর লাভ করিল, তাহা বলা কঠিন। তবে হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে যে

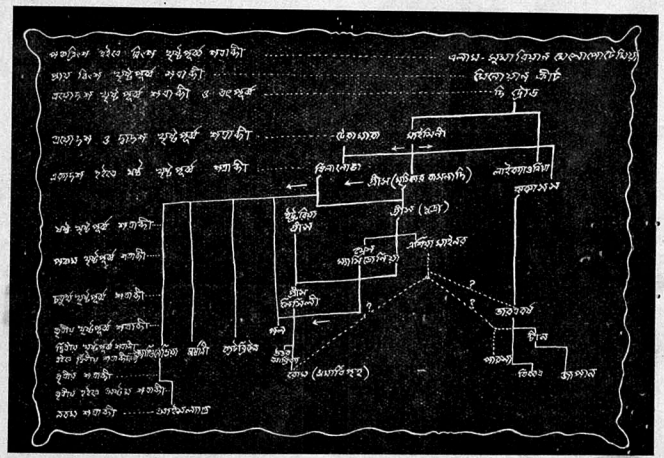

[স্বস্তিক চিহ্নের কালানুক্রমিক চিত্র-ইতিবৃত্ত। গব্‌লে ডি এলভিয়েলার অঙ্কনানুসারে লেখিকা কর্ত্তৃক মূল-অঙ্কিত।]

স্বস্তিকের ইতিকথার আলোচনা সত্যই মনে বিস্ময় জাগায়। দেখা যায়, শুধু ভারতবর্ষ আর জার্ম্মানী নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই চিহ্নের প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। কোন্ বিস্মৃত অতীতে, কোন্ দেশে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেলেও, নিশ্চিতভাবে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

ইহার একটা যোগ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিট্‌লার স্বস্তিক চিহ্নের সংস্পর্শে আসেন তাঁহার ছাত্র-জীবনেই। নাজী-আন্দোলনের নেতা হার হিট্‌লারের পিতা লাম্বাক-অন-ট্রনের বেনিডিক্টাইন্ মনাষ্টারির শুল্ক-কর্ম্মচারী ছিলেন। হিট্‌লার ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ এই দুইটি বৎসর সেখানকার বিদ্যালয়ে পড়েন।

মনাষ্টারির কয়েকস্থানে স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। অন্যান্য বালকদের মত হিট্‌লারের কাছেও স্বস্তিক চিহ্ন এইরূপে সুপরিচিত হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মনাষ্টারিতে স্বস্তিকের প্রথম প্রবর্ত্তন

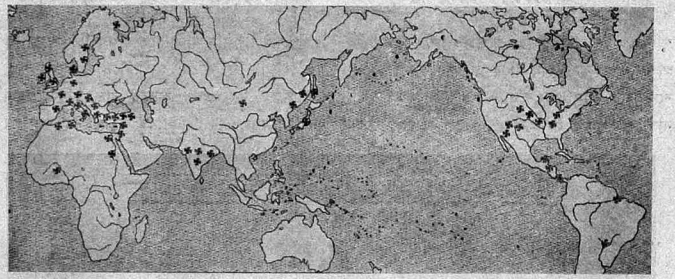

[সমগ্র পৃথিবীতে স্বস্তিক চিহ্নের ভৌগোলিক চিত্র-ইতিবৃত্ত। টমাস্ উইল্‌সনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অঙ্কিত।]

হয়। মনাষ্টারির অধ্যক্ষই সেখানে উক্ত চিহ্নের প্রবর্ত্তন করেন। অধ্যক্ষ থিওডারিক ভন্ হেগেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মনাষ্টারির বর্ম্মোপরের চিহ্ন-স্বরূপে



[অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত লাম্বাক-অন্-টনের বেনিডিক্টাইন মনাষ্টারি।]

উহা ব্যবহার করেন। তিনি প্রাঙ্গণের একটি পুরাতন কূপের খিলানের উপরেও উক্ত চিহ্ন অঙ্কিত করান।

কিন্তু স্বস্তিক চিহ্নের উপর তাঁহার এই অনুরাগের কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

উক্ত চিহ্ন অবিরাম দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে হিট্‌লারের মনের উপরে তাহার বেশ একটা ছাপ বসিয়া যায়। পরিশেষে তাঁহার স্মৃতির চেতনাকে সচেতন করিয়া এই চিহ্ন আজ তাঁহার লক্ষ লক্ষ অনুচরবৃন্দের পতাকায় দেখা দিয়াছে।



[লাম্বাকে হিট্‌লারের শৈশব-বাসভবন (১৮৯৭ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)। বর্ত্তমানে উহা একটি 'কাফে'।]

স্বস্তিক দুই প্রকার—শুভ (ডান দিকের) এবং অশুভ (বাম দিকের)। শুভ-চিহ্নে সূর্য্যের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমের গতি-পথ এবং অশুভ-চিহ্নে—পশ্চিম হইতে পূর্ব্বের গতি-পথ বুঝায়। শুভ-চিহ্ন—দিন, আলো, জীবন, গৌরব ও স্বর্গের আশীর্ব্বাদের এবং অশুভ-চিহ্ন—রাত্রি, অন্ধকার, মৃত্যু, নরক ও ধ্বংসের



[মনাষ্টারির প্রাঙ্গণে একটি কূপের উপরে স্বস্তিক চিহ্ন (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ)।]



[দুইজন জেপেলিন-চালকের সমাধি-স্তম্ভে স্বস্তিকাঙ্কিত পুষ্পস্তবক। এইখানে প্রতি বৎসর নাজিরা অজস্র স্বস্তিক-মাল্য, পুষ্পস্তবক প্রদান করিয়া জেপেলিন-চালকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।]

নিদর্শন। জার্ম্মানীতে প্রায় সর্ব্বত্র শুভ-চিহ্নেরই প্রচলন হইয়াছে। যাহাতে উক্ত চিহ্নের অবমাননা না হয় তজ্জন্য জার্ম্মান সরকার বহু প্রকার বিধি-নিষেধ জারী করিয়াছেন। পেয়ালা, ছাইদানি, ব্লাউজ-পিন, জলপাত্র,



[লাম্বাকের মনাষ্টারি স্কুলে আর একটি স্বস্তিক চিহ্নের নিদর্শন।]

চকোলেট প্রভৃতিতে উক্ত চিহ্নের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ফ্যাসিষ্টদের মধ্যেও এই চিহ্নের প্রতি অনুরাগ

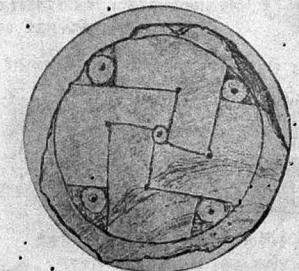

[আমেরিকার স্বস্তিক চিহ্ন। ঝিনুকের দুল। তেনেসী নদীর কেন্‌স দ্বীপে প্রাপ্ত।]

ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিলাতের স্যর অসোয়াল্ড মোসলের 'ব্রিটীশ লীগ্ অব্ ফ্যাসিষ্ট'দের মধ্যে ইহার

বিশেষ সমাদর দেখা না গেলেও 'ইম্পিরীয়াল লীগ অব ফ্যাসিষ্ট'দের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা দিয়াছে।

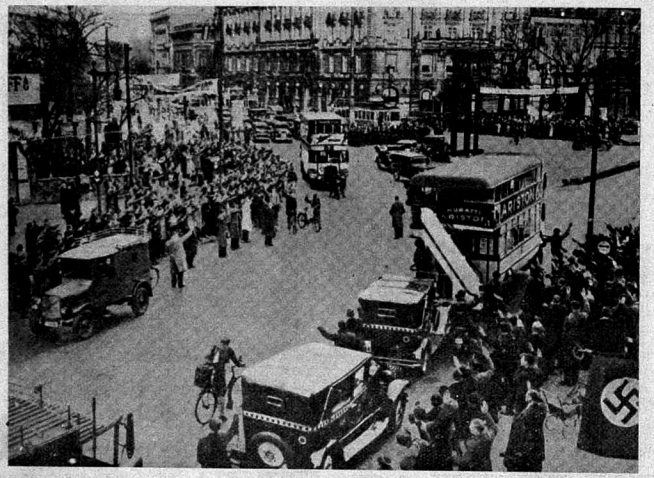

[বার্লিনের রাজপথে জনতা।॰ হার হিটলারের বেতার বক্তৃতা শুনিবার জন্য যান-বাহনাদি থামিয়া আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে সুবৃহৎ পতাকায় স্বস্তিক চিহ্ন।]

এবার সাম্রাজ্য-দিবস উৎসবের দিন রাত্রিতে তাহারাই ওয়েষ্টমিনিষ্টারের 'কাউন্টি হলে' স্বস্তিক-শোভিত পতাকা

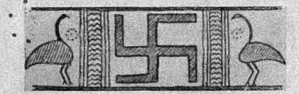

[দুইটি হংসজাতীয় সামুদ্রিক পক্ষীর মধ্যস্থলে স্বস্তিক চিহ্ন। গ্রীস দেশে প্রাপ্ত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পাত্রের অংশ। বর্ত্তমানে ব্রিটীশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।]

উত্তোলন করিয়াছিল। পরে সেই পতাকা অপসারিত করা হয়।



[উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে স্বস্তিক চিহ্ন প্রসারের নিদর্শন। 'কংস' জাতির মুক্তা-নির্ম্মিত উৎসব-ফিতা।]

পাশ্চাত্যের বহু পত্রিকায় এই স্বস্তিক সম্বন্ধে বহু ইতিকথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বস্তিকের পুরা-তত্ত্বের গবেষণার উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু এই উদ্যমের ভিতরে প্রাদেশিক প্রীতির যে পরিচয় দেখা দিতে সুরু করিয়াছে, তাহার প্রশংসা করা যায় না। কারণ তাহা সত্য আবিষ্কারের পথেই বাধার সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রাদেশিক বুদ্ধি হইতেই পাশ্চাত্য লেখকগণ সম্ভবতঃ বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, ভারতে স্বস্তিকের

প্রবর্ত্তন বহু পরে আরম্ভ হয়। তাঁহাদের এ-কথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়।

গুব্‌লে ডি্ এলভিয়েলা যে কালানুক্রমিক চিত্র-ইতিবৃত্ত অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায়, তৃতীয় খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে ভারতে স্বস্তিক চিহ্নের প্রবর্ত্তন হয়। এ গবেষণা অদ্ভুত, সন্দেহ নাই। কারণ স্বস্তিক চিহ্নের সহিত ভারতের পরিচয় বৈদিক যুগ হইতে। ইহা হইতেই বুঝা যায় পাশ্চাত্য লেখকগণের ভিতরেও অনেকের বিনা প্রমাণে কথা বলার অভ্যাস আছে।



[মিউনিকের সমাধি-স্তম্ভ। এই স্থানে হিট্‌লারের অনুচরদের গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।]

বৈদিক গৃহ্যসূত্র (অভিধান), গৌভিল গৃহ্যসূত্র ও আশ্বালয়ণ গৃহ্যসূত্রে স্বস্তিক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়—বেদে স্বস্তিক শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহা হইতে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে স্বস্তিকের প্রচলন ছিল।

বৈদিক যুগের কাল সঠিক নিরূপিত হয় নাই। প্রাচীন পন্থীদের মতে বৈদিক যুগ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় 'আর্কটিক হিষ্টরী ইন্ দি বেদাস' গ্রন্থে ঐ যুগকে ছয় হাজার খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাশ



[মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত সুসায় প্রাপ্ত স্বস্তিক-অঙ্কিত পানপাত্র। অনুমান—পানপাত্রটি পঞ্চত্রিংশ হইতে ত্রিংশ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয়। শুভ ও অশুভ (Dexter and Sinister) স্বস্তিক চিহ্ন পরস্পর বিপরীতভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।]

মহাশয়ের অভিমত, বৈদিক যুগ চল্লিশ হাজার খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দের। জার্ম্মান পণ্ডিতদের দুই-একজনের অভিমতও ওই রূপ।



[মিনোয়ান্ যুগের ক্রীটের নাম-মোহর। প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব অব্দে প্রাপ্ত।]

স্পেনের আলতামীরা গুহার চিত্রকলা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে জনৈক ফরাসী পণ্ডিত বলেন, ঐ চিত্র-যুগের বহুপূর্ব্বে বেদ লিখিত হইয়াছে। গবেষণায় স্থির হইয়াছে, উক্ত চিত্রযুগ চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের। কিন্তু সে যাহাই হোক বেদের সৃষ্টি যে তৃতীয় খৃষ্ট পূর্ব্বের ঢের আগের ব্যাপার তাহাতে

সন্দেহ নাই। আর তাহাই যদি হয় তবে এ-স্বস্তিক চিহ্ন যে ভারতবর্ষে তৃতীয় খৃষ্ট-পূর্ব্বের ঢের আগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতেও ভুল নাই।

স্বস্তিক চিহ্নের প্রথম প্রবর্ত্তন কোথায় হয়, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতার ধারা প্রভৃতির সহিত স্বস্তিক চিহ্নের যোগ এত বেশী যে, স্বস্তিকের প্রবর্ত্তন প্রথমে ভারতেই হয়, এরূপ একটা কথা মনে করা অসম্ভব ও অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কেবল কল্পনার আশ্রয় না লইয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের আশ্রয় লওয়াই



[চীনের স্বস্তিক চিহ্ন। ৬৮৪-৭০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী 'উ' এই চিহ্নকে সৌর চিহ্নরূপে পরিগণিত করেন। এম লি কর্ত্তৃক অঙ্কিত। এক্ষণে চিত্রটি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ন্যাসান্যাল মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।]

বাঞ্ছনীয়। ইহার প্রয়োজন আছে এবং যোগ্যতর লোকের সাধনাই এ-উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হওয়া সঙ্গত।

স্বস্তিকের জন্ম যেখানেই হোক্—সাধারণের কাছে ইহার আকর্ষণ ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। তাহার কারণ অন্য রকমের। সে কারণের মূলে আছে স্বস্তিক চিহ্নের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির শক্তি। স্বস্তিক চিহ্নের কয়েকটি ঋজু রেখাকে ঘিরিয়া রূপ-দক্ষের স্বপ্ন যে সৌন্দর্য্যের পরিবেশন করে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। রেখার এই রূপই মানব মনের



[বৌদ্ধযুগে স্বস্তিক চিহ্ন। ভারতে প্রাপ্ত। ...বুদ্ধের পদযুগলে স্বস্তিক চিহ্ন।]

কাছে ইহার দাবী অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। কোনো

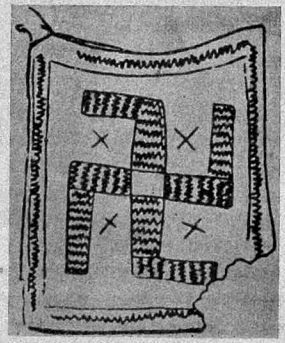

[গ্রীক্ অলঙ্কারে স্বস্তিক চিহ্নের নিদর্শন। মহিলাদের অলঙ্কার ব্রচের অংশ।]

একটা বিশেষ ভাবধারার প্রতীক রূপে ইহার যে

দাবী, তাহাও ইহার গৌন দাবী বলিয়াই আমার মনে হয়।

স্বস্তিক চিহ্নের ইতিহাসের মত তাহার রূপের এই দিকটার আলোচনারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে চেষ্টা আমি এখানে করিব না। কারণ সে যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে বলিয়া আমি মনে করি না। বিভিন্ন দেশের রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ভিতর দিয়া স্বস্তিক চিহ্ন যুগে যুগে পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া কোথায় কি রূপ গ্রহণ করিয়াছে—তাহার ছবিগুলি মাত্র বাংলার জন-সাধারণকে সংগ্রহ করিয়া উপহার দেওয়া হইতেছে। ইহার সৌন্দর্য্য কোথায়, ইহার আকর্ষণ কোথায়—ছবির ভিতর দিয়াই তাহার সাধারণ পরিচয় বাংলার জন-সাধারণ পাইতে পারিবেন। কিন্তু ইহার বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য আমি আকর্ষণ করিতেছি, তাঁহাদেরই দৃষ্টি ও মনোযোগ যাঁহারা রেখা-চিত্রে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত।



[হার হিট্‌লার বক্তৃতা দিতেছেন, দক্ষিণ পার্শ্বে জেনারেল গোয়েরিং। জনতার প্রায় সকলের বাহুতেই স্বস্তিক চিহ্ন রহিয়াছে।]

নবোন্মেষ

সুফী মোতাহার হোসেন, বি-এ

সে কোন্ অতল হ'তে উঠে এল সোনার কমল
মানস-সরসে মোর, উন্মথিয়া সারা তনু-মন ?
গোপন সৌরভে তার আঁখি ঢুলে, অন্তর উন্মন ;
গানের ভ্রমর তারে চুমা দেয় আবেশে বিহ্বল।
স্ফুটন-ব্যথায় সে যে ক্ষণে ক্ষণে করে টলমল,
হৃদয়ের কূলে কূলে শিহরায় পুলক-স্পন্দন !
একটি একটি করি দলগুলি টুটিয়া বন্ধন
বর্ণের ঐশ্বর্য্যে জাগে, রাঙ্গাইয়া মুগ্ধ হিয়া-তল।

মোর মাঝে দেখো চাহি হে ভুবন, অনাদি আকাশ,
অকস্মাৎ দুলে উঠে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !
ভুলেছি জন্মের গ্লানি, অকারণ যত দুঃখ শোক।
কমল-আসনা দেবী—আজি তারি অমৃত-আভাষ
চিত্তের আকাশে ছায়—সুধার যে নাহি অবশেষ !
ছন্দের ঝঙ্কারে শুনি কথা কয় স্বর্গ-মর্ত্ত্য-লোক।

সোপান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রভাতে ললিতা আসিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, উঠুন, অত বেলা অবধি পড়ে থাকলে বৈরাগ্য সাধনে ব্যাঘাত হবে। দুধ এনেচি, নিন।

গোপীনাথ উঠিয়া বসিলেন।

তাঁহার পানে চাহিয়া ললিতা সবিস্ময়ে কহিল, ও-মা, ও-কি ? আপনার চোখ-মুখ ব'সে গেছে—মুখ ফুলে উঠেছে ! অসুখ করেছে বুঝি ?—

গোপীনাথ কহিলেন, না।

—তবে ?—বলিয়া ললিতা পৈঁঠার উপর বসিয়া তালবৃন্ত তুলিয়া লইল। কহিল, শুয়ে থাকুন, আমি বাতাস করচি।

গোপীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, ললিতা, বৃন্দাবনে মনের শান্তি পেলাম না। কাল হরিদ্বার যাব।

ললিতা কহিল, বেশ যাবেন। এখন একটু সেবা নিতে দোষ আছে কি ?

গোপীনাথ কহিলেন, তোমার সেবা নেবার অধিকার আমার আছে কি ?

ললিতা কহিল, সবতাতেই অধিকার-অনধিকার বুঝে চলতে গেলে চলাই যে দুষ্কর !

গোপীনাথ কহিলেন, কিন্তু মনের দরদ যেখানে নেই—

হাসিয়া ললিতা কহিল, সেবার ইচ্ছাই যে দরদে ভরা—এ-কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ? যাক্ আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

গোপীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, রহস্য ক'রো না, ললিতা।

—বেশ গম্ভীর হ'য়েই বলচি।—বলিয়া ললিতা কপট গাম্ভীর্য্যে কি বলিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

গোপীনাথ বিরক্ত হইয়া পাত্র বাহির করিয়া বলিলেন, দুধ দাও। আর দাম—

ললিতা দুধ ঢালিয়া দিয়া কহিল, দামটা না-হয় সাধু-সেবা ব'লে—

গোপীনাথ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইলেন। মুহূর্ত্তে ললিতার মুখ ম্লান হইয়া গেল। কহিল, কালই সব বুঝে নেব।

গোপীনাথ ললিতার মলিন মুখের পানে চাহিয়া ব্যথা অনুভব করিলেন। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন, আচ্ছা ললিতা, আমি চ'লে গেলে তোমার দুঃখ হবে না ?

ললিতা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

বিস্মিত গোপীনাথ অন্যমনস্কে কহিলেন, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম অন্যরূপ।

মুহূর্ত্তে ললিতার দু'টি চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রীবা উন্নত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে কহিল, আপনি না সন্ন্যাসী ? ঘর ছেড়ে, স্ত্রী ছেড়ে, ঈশ্বর-ভজন ক'রতে বেরিয়েছেন ? আপনার মনেও অন্য ভাব আসে ?

বিস্মিত গোপীনাথ অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, তুমি কি ব'লচো, ললিতা ?

ললিতা তেমনই ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য ! খোলস বদলালেও ভেতরে সব পুরুষ এক। আমি সামান্যা রমণী—সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, জাতেও ছোট, কাজেই আমার আত্মীয়তা আপনার মনে অন্য ভাব জাগিয়ে তুলেচে। মনে ক'রচেন, আমার দরদ, না—থাক। গেরুয়া প'রে ভেক্ নিলে কি হবে, মনটাকে ত' গেরুয়া পরাতে পারেন নি !—বলিয়া ক্রোধভরে ললিতা চলিয়া গেল। স্তম্ভিত গোপীনাথের মনে হইল ক্রীড়ারত সুন্দর ব্যাঘ্র-শাবক অকস্মাৎ দষ্টা মেলিয়া গর্জ্জন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ললিতা বলে কি ? গৃহের পরিপূর্ণ সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যে শান্তি-আশায় দূর দুরান্তরে ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহার নিস্পৃহ মমতাকে সে এমনই কালি-মাখা চোখে দেখিল ? কিন্তু ললিতার কথায় যে প্রচ্ছন্ন সুরটুকু আজ স্পষ্ট সত্যের মত চোখ রাঙাইয়া শাসন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাঁহার অবনমিত ভীরু প্রাণ সে শাসনের রক্ত-নেত্রতলে শঙ্কায়, কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল কেন ? গৃহ তিনি ছাড়িয়াছেন, কিন্তু মমতার একটা সূক্ষ্ম তন্তু গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়াসে অবিরত জাল রচনা করিতেছে। ললিতার আসিবার সময়টুকু, তার কথার ভঙ্গীটি, হাসির মাধুর্য্যরস—সবই যেন কেমন অস্পষ্ট মায়ার মত হৃদয়েও মায়ার সৃষ্টি করে। সে মায়ার বর্ণ নাই, রূপ নাই, কিন্তু এতটুকু প্রত্যাশা আছে।

সত্যই বাহিরের গৈরিক অন্তরকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুরঞ্জিত করিতে পারে নাই।

কাল রাত্রিতে মানস-বৃন্দাবনে দশ বৎসরের সে লোভনীয় চিত্রটি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতেছিল—কে জানে ললিতার ক্ষুদ্র সঙ্গের অবকাশে সে প্রলোভন দুর্নিবার হইয়া উঠিবে কি না ? নারীর স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি মায়ার লৌহ-পাশ বিনির্ম্মিত। কালই তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিবেন।

সন্ধ্যা বেলায় ললিতা আসিল না। গোপীনাথের মনে হইয়াছিল, সে আসিবে—কিন্তু সে আসে নাই। শেষ বিদায়ের বাণীটুকু উচ্চারণ করিতে না পাইয়া অন্তর তাঁহার কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।.....না, এ-দুর্ব্বলতা মায়া-সম্ভূত। আজ রাত্রি থাকিতেই তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিবেন।

রাত্রির অন্ধকার যমুনার শীর্ণ বুকখানিকে তখনও ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। গাছে-গাছে অন্ধকারের অলস-

ছায়া ধূসর হইয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছে, এখনই পিঙ্গলালোকে তরল হইয়া গলিয়া পড়িবে। পায়ে চলা পথটির রেখা অন্ধকারে চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। পরপারে পূর্ব্বাকাশের একপ্রান্তে প্রভাত তারাটি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সহসা পশ্চাতে মৃদু পদধ্বনি হইতেই চমকিত গোপীনাথ মুখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলেন না। তরল অন্ধকারের মধ্যে সে মূর্ত্তি যেন এইমাত্র মনের কামনা কেন্দ্রে শরীর পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। সে ললিতা।

হতভম্ব গোপীনাথের বিহ্বল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ললিতা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, বড্ড অবাক হ'য়ে গেছেন, নয়? চুপি-চুপি পালিয়ে যাচ্ছেন, ভেবেছেন কেউ টের পাবে না!

গোপীনাথ কোন কথা কহিলেন না।

অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া ললিতা কহিল, কিন্তু অনুতপ্তের চোখ্‌কে ফাঁকি দেওয়া বড় সোজা নয়, বুঝেচেন?

অনুতাপ কিসের গোপীনাথ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু মনে হইল কথা বলিবার সময় ললিতার স্বর কাঁপিতেছে।

একমুহূর্ত্ত থামিয়া ললিতা পুনরায় কহিল, যাই হোক, ব্যথা দিয়ে কাল থেকে কম ব্যথা পাই নি। বাইরের ব্যথাটাই লোকে বোঝে, ভেতরটা তো কেউ দেখে না!—বলিয়া গোপীনাথের একখানা হাত তুলিয়া লইয়া আপন অনাবৃত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া একটু মৃদু হাসিল।

গোপীনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। প্রহারের নিষ্ঠুর চিহ্ন অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিলেও স্পর্শে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কহিলেন, এ-কি! ব্রজবাসী তোমায় মারে?

ললিতা হাসিয়া বলিল, না সোহাগ। বাঙ্গালীর মেয়ের অদৃষ্টে এমন সোহাগ—

গোপীনাথ কহিলেন, তাহ'লে তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে?

ললিতা হাসিতে লাগিল।

গোপীনাথের অন্তর সহসা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এই ললিতা! এই তাহার স্বরূপ মূর্ত্তি! অথচ কাল সে অকুণ্ঠিত গর্ব্বে গোপীনাথকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছিল। কুহকিনী মায়ার ফাঁদ পাতিয়া তাঁহাকে বাঁধিতে রাত্রিশেষে যমুনার তীরে অনুসরণ করিতেছে না কি? আর তিনি দাঁড়াইলেন না। ললিতাকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন।

ললিতা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, সবটা না শুনে আমার ওপর অবিচার ক'রবেন না।

কর্কশকণ্ঠে গোপীনাথ কহিলেন, পথ ছাড়।

ললিতা ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, সবাই ভুল বুঝে আমায় পরিত্যাগ ক'রেচে—আপনিও ভুল বুঝবেন না। জানি না, ভাল ক'রেচি—কি মন্দ ক'রেচি, কিন্তু আমায় গাঁ থেকে চুরি ক'রে এনে যারা আমায় এখানে বেচে গেছে—তাদের দোষ কি কিছুই নয়? তাদের ব্যবসা—কিন্তু ওসব কথা যাক। চোখে দেখেচি কত বিধবার এমন দুর্দ্দশা হ'য়েচে,—আমি তবু কুমারী ছিলাম। জ্ঞান হ'য়ে ব্রজবাসীকেই স্বামী ব'লে জেনেছি—এতেও আমার দোষ?

গোপীনাথের সমস্ত ক্রোধ সমবেদনায় গলিয়া গেল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, তুমি সত্যই অভাগী। বুঝেছি, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছ ব'লে বাংলার সংস্কার বিসর্জ্জন দিতে পার নি। স্বামীকে দেবতা ব'লে জেনেছ; কিন্তু আত্মীয় স্বজনের কথা ভুলতে পার নি। তাই বাঙ্গালী দেখলেই স্বভাব-বশে তাদের কাছে ছুটে আস। তোমার স্বামীর প্রহার নির্য্যাতন সয়েও হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করো।

ললিতার হাসির সংযম ভাঙ্গিয়া গিয়া দু'টি চক্ষে দর-বিগলিত ধারা বহিতেছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতে অবনত হইয়া গোপীনাথের চরণ স্পর্শ করিয়া গাঢ় অশ্রু-কম্পিত স্বরে কহিল, বলুন, আমায় ক্ষমা ক'রলেন?

গোপীনাথ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, ওঠ। অনন্ত করুণাময়ের ক্ষমা তুমি পেয়েচ। তোমার মনোবৃন্দাবনে ঝড়্-জল-তুফান কিছুই ত' নেই, ললিতা।

ললিতার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মৃদুস্বরে সে কহিল, আজ আপনাকে সাধুবাবা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, আবার যখন বৃন্দাবনে আসবে—তখন মেয়ের এখানে উঠবে ত'?—

গোপীনাথ হাসিয়া কহিলেন, উঠবো বৈ কি, মা।

পায়ে-চলা পথটির বিপরীত দিকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লইয়া ললিতা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

গোপীনাথ অগ্রসর হইলেন।

প্রভাতের পিঙ্গলালোক তখন বৃক্ষ চূড়া বাহিয়া নামিয়া আসিতেছে। নদী প্রান্তর দিক চরাচর একটা মধুর হাসির ছটায় কোমল হইয়া উঠিতেছে। ভোরের শুক তারাটি বিদায় লইবার আয়োজন করিলেও—তার মুখেও প্রভাতের মিষ্ট হাসিটি লাগিয়া আছে।

* * * *

পরদিন সন্ধ্যাতারার মুখে সেই মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। গোপীনাথ তখন ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া—পর্ব্বত দুহিতার আহত স্রোতের কাকলী শুনিতেছিলেন।

আকাশ নক্ষত্রময়—গঙ্গার বুকে তার ছায়া ছবি। জল বক্ষে দেহ বিছাইয়া বিস্তীর্ণ পাষাণ চত্বর অর্দ্ধ অবগাহন-রত। পৃষ্ঠে তার বহু সদালাপী সাধু মৃদুকণ্ঠে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। জাহ্নবী তীরে—অপর প্রান্তে বহুদূরের পাহাড়টি চিত্রলেখাবৎ অস্পষ্ট। রাত্রি বাড়িলে আলাপচারীরা একে একে উঠিয়া গেলেন। গোপীনাথের পানে কেহ চাহিলেন না। সর্ব্বশেষ যে লোকটি উঠিলেন—তিনি সংসারাশ্রমের কেহ নহেন। বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য। বার্দ্ধক্য-ভারে দেহ কিছুমাত্র ন্যুব্জ হয় নাই। মুখে বলি-চিহ্ন পড়িয়াছে বটে,—কিন্তু সে গুলি মুখমণ্ডলের সৌম্যতাকে রূপ দিয়াছে। তুষার ধবল শ্বেতকান্তি দেখিলে বয়সের হিসাব ভুলিতে ইচ্ছা হয়।

চিন্তামগ্ন গোপীনাথের পাশ দিয়া যাইবার সময় সাধু তাঁহাকে ডাকিলেন।

গোপীনাথ মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিতেই তিনি প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, ভেক নিয়ে ভাবনা! বেটা, তোর মন এখনও ঠিক হয় নি।

গোপীনাথ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমার উপায় কি, বাবা?

সাধু সিঁড়ির দু'টি ধাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারণ করিয়া উপরের ধাপগুলি দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি ও-গুলো?

—সিঁড়ি।

সাধু বলিলেন, ও গুলো বাদ দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে পারিস্?

গোপীনাথ মাথা নাড়িলেন।

সাধু মৃদু হাসিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, তবে, এত কি ভাবছিস্? ও-গুলো আছে—থাকবে। উঠতে হ'লে ওর ওপর দিয়েই উঠতে হবে। আর ওই দেখ্ জল, কেমন বাধা ঠেলে এগিয়ে আসচে।

গোপীনাথ বেগবান্ প্রবাহের পানে চাহিলেন। অগ্র পশ্চাতে তার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কিন্তু তরঙ্গ বাহু-বিক্ষেপে তরঙ্গিণী—সে বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়াছে। পাষাণ সোপানে জলস্রোত নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তথাপি তার কি প্রচণ্ড উৎক্ষেপ! কে অস্বীকার করিবে—তাহার অহোরাত্রব্যাপী একাগ্র সাধনার এই তীব্র নিঃশঙ্ক দুর্দ্দমনীয় গতিকে!

পিছন ফিরিতেই দেখিলেন—সাধু সেখানে নাই। ঊর্দ্ধ সোপানে তুলিয়া একটিমাত্র ইঙ্গিতে ভাবী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

পরদিন কন্‌খালে—সতী-তীর্থে আসিয়া পুরাতন অগ্নি প্রধূমিত হইয়া শিখা বিস্তার করিল।

স্বামী-নিন্দা সহিতে না পারিয়া প্রকৃতিরূপা দক্ষ-সুতা অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্‌খালে তাঁর স্মৃতি-তীর্থ। যখন তিনি মানুষ ছিলেন তখন

তাঁর এই দুর্জ্জয় অভিমান। পতি-নিন্দা শ্রবণে দেহ-ত্যাগ করিয়া দেবতা হইয়াছেন।

দশটি বৎসরের জীবনে—একদিন।

গোপীনাথ রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, লোকে কি বলে জানিস্, সারদা?

সারদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি?

গোপীনাথ বলিয়াছিলেন, কণ্ঠিবদল করে লোকে সুখের জন্য। আমাদের বোষ্টমের ঘরে মুখে 'হরিবোল' ব'ললেও সিন্দুকের খবরটা যে না নিয়ে ও-কাজ করে তার চেয়ে বোকা না-কি আর কেউ নেই।

ভ্রূকুটি করিয়া সারদা বলিয়াছিল, বেশ, তাতে কি?

গোপীনাথ তাহার ভ্রূকুটি দেখিয়া মুখখানা যথা-সম্ভব গম্ভীর করিয়াই বলিয়াছিলেন, এই তোর কথাই বলাবলি হচ্ছিল হরিসভায়। তোর বাপেরও ইচ্ছা ছিল ছিদামের সঙ্গে কাজ ক'রতে, কিন্তু—

অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া সারদা বলিয়াছিল, তোমাদের হরিসভায় আজকাল বুঝি কীর্ত্তন উঠে গেছে, কেবল লোকের কুচ্ছো গান হয়? যত সব হ'য়েচে—হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে—

সহসা থামিয়া গিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

গোপীনাথ স্তম্ভিত! কি করিবেন, কি বলিবেন—কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া নীরবে তাহার পানে চাহিয়াছিলেন।

সারদা খুব খানিকক্ষণ কাঁদিল। পরে সন্ধ্যা আগত দেখিয়া প্রদীপটি জ্বালিয়া আঁচল আড়াল দিয়া তুলসী-মঞ্চের নিকটে বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা নত করিয়া কি যেন একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

সে মুখ তুলিলে গোপীনাথ দেখিলেন, তখনও দু'টি গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। কিন্তু এ ধারা যেন আগেকার তীব্র সন্তাপের জল-ধারা নহে,—এ ধারায় পরিপূর্ণ প্রশান্তির একটি স্নিগ্ধ নির্ম্মল জ্যোতিঃ মাখানো।

বুঝিয়াছিলেন—সে ভালবাসার খাদ এতটুকু নাই।

কিন্তু এই ভালবাসাই তিনি শৃঙ্খল-স্বরূপ মনে করিলেন। সারদার হৃদয়ভরা অনুরাগে তাঁহার পরকালের সকল তত্ত্বই বুঝি ডুবিয়া যায়,—তাই ক্ষিপ্ত জলমগ্নের মত প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িয়া জানাইয়াছিলেন—জীবন তাঁর আছে এবং সে জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতর ভাবে মিটিবে প্রেমময়ের প্রেমে।

* * * *

হৃষিকেশে আসিয়া গোপীনাথ দেখিলেন, দলে দলে গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ও গৃহী স্ত্রী-পুরুষ ভিক্ষায় ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া ফিরিতেছে,—কেহ বা ভিক্ষার আশায় যাইতেছে।

কালি কম্‌লীওয়ালার ছত্রের অবারিত দ্বার। প্রার্থী আসিয়া বিমুখ হয় না। তীব্র রৌদ্রের উত্তাপে পথ চলিতে না পারিয়া গোপীনাথ ছত্রের বিশাল তোরণ-ছায়ায় আশ্রয় লইলেন।

তাঁহার অদূরে একজন গৈরিকধারিণী বোধ হয় ক্লান্তি বশতঃ চলিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। গোপীনাথ বলিলেন—মা, রোদে ব'সলেন কেন, এদিকে সরে আসুন।

রমণী কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া আসিল এবং কম্পিত কণ্ঠে কহিল—আর বাবা, মরণ হ'লেই বাঁচি।

মৃত্যুকে দুঃখে কষ্টে গৃহীরাই অহরহ প্রার্থনা করিয়া থাকে, গৈরিকধারিণীর মুখে এ উচ্ছ্বাস কেন?

গোপীনাথ কহিলেন—মা, দেখচি আপনি বাঙ্গালী—

রমণী কহিল, হ্যাঁ বাবা, আমার বাড়ী খড়দয়ে। আমার বাপ-মার অবস্থা খুব ভাল। অনেক দিন হ'লো— গুরুর আশ্রমে সাধন-ভজন ক'রবার জন্য আসি; সেই থেকে এইখানেই আছি।

সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই না পাইয়া গোপীনাথ কহিলেন, দেখচি আপনার জ্বর হ'য়েচে। তা এ রকম কষ্ট না ক'রে দেশে ফিরে গেলেই ত' পারেন।

রমণী ললাটে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া মুখখানি অবনত করিল।

বিগত যৌবনা প্রৌঢ়ার পানে চাহিয়া গোপীনাথ যেন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন। দলে দলে যুবক-যুবতী — প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া — বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গৈরিকবসনে দেহ আবৃত করিয়া প্রখর রৌদ্রে এক মুষ্টি আটার জন্য দূর-দূরান্তর হইতে ছত্রের দুয়ারে আসিয়া হাত পাতিতেছে কোন্ সাধনাকে সিদ্ধি-পথে লইয়া যাইবার জন্য? গৃহ ছাড়িয়াছে, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। গৈরিক ধরিয়াছে—অন্তরালে ভোগ-বিলাস-বিহ্বল মনটিকে সাবধানে পোষণ করিয়া চলিয়াছে।

এই প্রৌঢ়া—কি না ছিল তাহার? কিন্তু অসংযত যৌবন হয়ত একদিন গৃহের শান্তি-বেদী হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাকে এই বালুতপ্ত মরুভূমির মাঝে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে; পথহারা পথ খুঁজিয়া পায় নাই। যে যৌবন নূতন পথে চলিবার উৎসাহ দিয়াছিল, সে আজ মরিয়া গিয়াছে। জরাগ্রস্ত দেহের ভার বহিয়া অবশিষ্ট জীবন অনুশোচনায় কাটাইয়া দিতে হইবে। গৈরিক তাহার দেহের ক্ষুধা মিটাইতেছে একমুষ্টি আটা দিয়া।

সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে সত্যকে গোপন করিয়া চলিতে হয়। ঘাটে পাণ্ডাদের যাত্রী লইয়া শোষণের একাগ্রতা—'দেহি', 'দেহি'-রব। যাত্রীদের অল্পব্যয়ে বেশী পুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা, সাধু-সন্ন্যাসীর এই উঞ্ছবৃত্তি! এ জগতের ধর্ম্মই ত' স্বার্থ-গণ্ডি ঘেরা।

তিন দিন পরে বিরক্তচিত্তে গোপীনাথ হরিদ্বার পরিত্যাগ করিলেন।

* * * *

বাধ্য হইয়া আগ্রায় নামিতে হইল। যমুনার সেতু-বক্ষ হইতে মর্ম্মর সৌধের অতুল সৌন্দর্য্য গোপীনাথের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। আগ্রায় নামিয়া তিনি তাজের দিকে চলিলেন।

হ্যাঁ, ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন ইঁহারা। রিক্ততায় সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিয়া ভোগ-উন্মুখ অন্তরকে অপরিতৃপ্তির পথে লইয়া যান নাই। ধর্ম্মের বিমূঢ়তা সে ভোগকে ক্ষণেকের তরেও দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া অবসাদে মুহ্যমান করে নাই। আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদতলে আসিলে সে কথা মনে জাগে, তাজের পানে চাহিলে এ সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

যমুনার বুকেই—কিন্তু যমুনা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাজমহলের ভিত্তি হইতে দূরে তাহার কঙ্কালসার রুগ্নমূর্ত্তি অতীতের সমৃদ্ধি-স্মরণে ঝুঁকিতেছে। কিন্তু শতাব্দী অন্তে মর্ম্মর স্মৃতির শুভ্র-ধবল মিনার—তেমনই শোভাময়। মনে হয়, কাল যেন ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে।

যে প্রেম বৃন্দাবনে—সেই প্রেম এখানেও আছে। বৃন্দাবনে অন্তর্মুখী—এখানে বহির্মুখী। কিন্তু সাধু বলিয়াছিলেন—সোপান—উপরে উঠিবার সোপানমাত্র। এই ত' সোপান। এই মানবীয় মহান্ প্রেমই ত' ষড়ৈশ্বর্য্যময়ের চরণ-তলে লইয়া যাইবার উন্নমিত সোপান। সৌন্দর্য্য যেখানে সারভূত, সৃষ্টি যার ত্রিখুঁত, বাণী যার নীরব অথচ সর্ব্বভাবময়, রূপ যাহার প্রাণকে আকর্ষণ করে—তাহার চেয়ে পুণ্যময় প্রতিষ্ঠান আর কি আছে? সে প্রেম। প্রেমের ছোট-বড় বিচার নাই। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ প্রেম অগ্রগতি সাধনার সোপান মাত্র। গোবিন্দজীর মন্দিরের চেয়ে এই তাজমহল? ভক্তি প্রাণ নরনারীর কাছে কোন অংশে হীন নহে।

গোপীনাথ পাষাণ ভিত্তি গাত্রে মস্তক রাখিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন—তোমায় প্রণাম করি, প্রণাম করি হে মহতো-মহীয়ান্ বিরাট প্রেম! বৈরাগ্য ও ভোগ দু'টি রূপে তুমি আছ। কিন্তু দু'টি রূপের সাধনা অভিন্ন। ত্যাগ ও নিষ্ঠা তোমার পূজার উপচার, স্বার্থ তোমার বলি-স্বরূপ। এ বলি যে দিতে শিখে নাই—তোমায় লাভ করিবার সাধনা তার বৃথা। তোমার আলো যখন জ্বলে, তখন ছোট-বড়—সুন্দর-অসুন্দর সকলই আলোময় হইয়া উঠে। কামনাকে

আশ্রয় করিয়া তোমার জন্ম কিন্তু তোমার লাবণ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সমগ্র অন্তর পূর্ণ করিয়া দিলে মলা-মাটি আর কিছুই থাকে না। তখন তোমাতে তুমি পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের পানে টানিয়া লইয়া যাও।

রাত্রি অনেকখানি হইয়াছিল। জ্যোৎস্না ছিল না, কাজেই তাজমহলে সৌন্দর্য্য-পিপাসুর যাতায়াতও ছিল না।

সোপান বহিয়া গোপীনাথ নামিয়া আসিতেছিলেন—সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল অদূরে দণ্ডায়মানা এক রমণীর উপর। রমণী হস্তের ইঙ্গিতে তাঁহাকে ডাকিতেছিল। গোপীনাথ নিকটে আসিলে সে ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, যদি দয়া ক'রে আমায় বাসায় পৌঁছে দেন। আমার সঙ্গে কেউ নেই।

গোপীনাথ কহিলেন, আসুন।

রমণী কহিল, কিন্তু অতটা পথ হেঁটে যেতে ত' পারব না, একখানা গাড়ী ডাকুন।

তাজ-তোরণের সামনে কয়েকখানা গাড়ী ছিল। গোপীনাথ তাহার একখানিতে রমণীকে লইয়া উঠিলেন। দু'ধারে ফাঁকা মাঠ—তার বুকে ছোট-বড় অসংখ্য সমাধি-সৌধ। মোগল গৌরবের দুর্দ্দম শাসনদণ্ড স্খলিত হইয়া কাল-প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, দিল্লী ও আগ্রার সমাধি-স্তূপ মাত্র তার স্মরণ-চিহ্ন।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কতদিন এখানে এসেছেন?

গোপীনাথ উত্তর দিলেন, আজ।

রমণী পুনরায় প্রশ্ন করিল, সংসার-আশ্রম ত্যাগ ক'রেছেন কতদিন?

—অতি অল্পদিন মাত্র।

রমণী বলিলেন, দেখুন, আমার একটি মাত্র সাধ আছে—যদি পূর্ণ করেন।

বিস্মিত গোপীনাথ সেদিকে চাহিলেন।

রমণী বলিল, দেখুন, সহায় আমার বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু সম্পদ্ আছে। স্বামী, কন্যা, স্বামী নেই,—কাজেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়-বন্ধু এই দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—

গোপীনাথ কহিলেন—আমি সন্ন্যাসী, আপনাকে কি সাহায্য ক'রবো?

রমণী বলিল, আপনি গৃহত্যাগী ব'লেই ব'লচি—আপনিই আমায় এ জঞ্জাল থেকে মুক্ত ক'রতে পারেন। আমি অনেক দিন থেকে মনে করেচি—আমার যা-কিছু সম্পত্তি, সমস্তই দেব-সেবায় দান ক'রবো কোনো একটি মঠ বা মন্দির বা জনহিতকর কোনো কার্য্যে। আমার স্বামী এখানকার সিভিল সার্জ্জন ছিলেন—উপায়ও করেছিলেন প্রচুর। আমার ইচ্ছা তাঁর কর্ম্ম-স্থানেই কিছু প্রতিষ্ঠা করি।

গোপীনাথ বিপন্নভাবে কহিলেন, আমি যে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি—কোথাও বদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারবো না ত'!

রমণী কাতরকণ্ঠে কহিল, তবে আমার এত সাধ, এত যত্ন সফল হবে না? টাকাটা পাঁচজনে লুটে-পুটে খাবে? এ কি দেবতার কাজ নয়? এর চেয়ে পুণ্য মানুষের আর কি আছে।

গোপীনাথ বহুক্ষণ পরে কহিলেন, আচ্ছা ভেবে দেখি, কাল আপনাকে এর উত্তর দেব।

রমণী কহিল, শুভকার্য্যে বিলম্ব ক'রতে নেই, আজই মনস্থির করুন।

গাড়ী আসিয়া গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল।

রমণী গাড়ী হইতে নামিয়া কহিল, বলুন—আমায় কথা দিন।

গোপীনাথ বলিলেন, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কাল আমি আবার আসবো।

রমণীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে গোপীনাথ আসিয়া দেখিলেন, প্রাসাদোপম অট্টালিকা সজ্জা-পারিপাট্যে ধন-গৌরবের পরিচয় দিতেছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ

করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন—এমন সময় একজন দাসী আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

গোপীনাথ কখনও বিলাস-সজ্জার আড়ম্বর দেখেন নাই। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টি তাঁহার চারিদিকের সযত্ন-রক্ষিত বহুমূল্য আসবাবের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। ধন ইঁহার আছে—অপরিমিত ভাবেই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐশ্বর্য্যেও মনটি তাঁহার ঐশ্বর্য্যময়ের চরণ সংলগ্ন হইয়া আছে।

বৃহৎ কক্ষে মর্ম্মর মেঝের উপর রমণী বসিয়াছিল—গোপীনাথকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল—বসুন, বসুন।

গোপীনাথ অদূরে উপবেশন করিলেন।

রমণী প্রশ্ন করিল, আপনি কোথায় উঠেছেন?

গোপীনাথ কহিলেন, ধর্ম্মশালায়।

রমণী কহিল, সেখানে ত' বড় কষ্ট হ'চ্ছে আপনার। যাই হোক, আজই সেখান থেকে চলে আসুন।—এখানে না থাকলে কাজের সুবিধা হবে না।

গোপীনাথ কহিলেন, এতে আমার অসুবিধা কিছুই হবে না।

রমণী কহিল, কিন্তু দয়া করে এখানে যদি আহারের ব্যবস্থা—

গোপীনাথ অনুনয় করিয়া কহিলেন, গৃহত্যাগীর গৃহের সুখ প্রত্যাশা করা উচিত নয়, আপনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

রমণী দুঃখিত হইয়া কহিল, বেশ—তাই। তা'হলে খাওয়া-দাওয়া ক'রেই আসবেন। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জায়গা যেখানে কেনা হবে—বৈকালে সেখান থেকে ঘুরে আসবো, কি বলেন?

—তাই হবে।—বলিয়া গোপীনাথ আসন ত্যাগ করিলেন।

আপন মনে পথাতিবাহন করিতেছেন, এমন সময় পিছন হইতে কে সসম্ভ্রমে কহিল—নমস্কার, সাধুবাবা।

গোপীনাথ ফিরিয়া দেখিলেন, এক প্রৌঢ় তাঁহার নব-নির্ম্মিত গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আহবান করিতেছেন।

গোপীনাথ নিকটে আসিলে তিনি পুনরায় প্রণাম করিয়া কহিলেন, বাবা, একবার এ দীনের কুটীরে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

কুটীরই বটে! নবনির্ম্মিত সৌধ—সম্মুখভাগ লতা-পাতার কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত—গৃহস্বামীর শিল্প-সমাদরের পরিচয় দিতেছে।

গোপীনাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কেন বাবা?

প্রৌঢ় সকরুণ দৃষ্টিতে বাড়িখানার পানে চাহিয়া সনিঃশ্বাসে বলিলেন—আর কেন, এত কষ্ট ক'রে বাড়ি-খানা তৈরী করালাম—এবার বুঝি সব যায়।

গোপীনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন—বাধা দিয়া লোকটি তেমনই করুণ কণ্ঠে কহিলেন, ঐ যে দেখচেন দোতলার ব্লক টাওয়ার—ওটা আমার স্ত্রীর সখ। ওর নীচেই যে পাণ্ডটে রংয়ের খড়খড়ি—নিজের হাতে রং করে সে ওটায় লাগিয়ে দিয়েচে। ওই পাশে দেখুন দেখি, ছোট্ট একটু তাজমহলের নক্সা—ওটাও তার খেয়াল। দরজার দু'পাশে এই দু'টো বাঘের চেহারা কিন্তু আমার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, ব্যাটা মিস্ত্রীরা তৈরী ক'রেচে। আর দুয়োরের এই কাঠের ফুল পাতা—এগুলো কিন্তু আমার খেয়ালেই হ'য়েচে।—বলিয়া তিনি চুপ করিয়া সেগুলি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ কোন কথা কহিলেন না।

লোকটি অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, কেমন মানি-য়েচে—বাড়িখানি চমৎকার, নয়? যে দেখে, সেই এর সুখ্যাতি করে।—বলিয়া কোথাকার কাদির কত বেতনে ও কিরূপ দীর্ঘ সময়ে এই সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার নাতি-দীর্ঘ ইতিবৃত্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

গোপীনাথ কহিলেন, আমি এখন যাই।

লোকটি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, সে কি বাবা, যাই কি? আমার কেমন বদ অভ্যাস—বড় বাজে বকি। এইজন্যে বাড়িতেও বকুনি খাই দিনরাত। আসল

কথা কি জানেন, এত যত্ন ক'রে যে বাড়িটা তৈরী করালাম, বুঝি ভোগে আর হয় না।

—কেন?—

লোকটির নয়ন প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু আসিয়া জমিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, যার জন্যে এত পরিশ্রম ক'রলাম তাকেই বাঁচাতে পারি নে বুঝি! আজ তিন দিন সে জ্বরে অচৈতন্য—একটি কথাও বলে নি।

বলিতে বলিতে বালকের মত হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গোপীনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, কাঁদবেন না। ভাল ডাক্তার ডাকুন।

—তা কি আর ডাকি নি, বাবা?—সেই দিনই ডেকেচি।

—ডাক্তার কি ব'ললেন?

—ব'লবে আর কি ছাই মাথা-মুণ্ডু! ওষুধ খাওয়াও, যত্ন কর—ভাল হ'য়ে উঠবে। যদি জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, সারবে তো? বলেন, চেষ্টার ত' ত্রুটি ক'রবো না। আরে, পষ্টা-পষ্টি যা হয় একটা বল। যদি না বাঁচাতেই পারবি ত' ডাক্তার হ'য়েচিস কেন?

গোপীনাথ বলিলেন, ভগবানের উপর ভরসা রাখুন, শুভাশুভের মালিক তিনি।

—সে মনের জোর কৈ, সাধুবাবা! ভিতরে আসুন একবার।

কুণ্ঠিত হইয়া গোপীনাথ কহিলেন, আমি ত' ডাক্তার নই, দাদা!

লোকটি ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিলেন, আপনার পায়ের ধূলোয় যা কাজ হবে, ডাক্তারের আলমারী শুদ্ধ ওষুধে তার সিকির সিকিও হবে না। আসুন!

অগত্যা গোপীনাথকে যাইতে হইল।

সুশৃঙ্খল সংসার—সযত্ন-রোপিত এক প্রিয় কুসুম তরু। অনুকূল বায়ুর স্পর্শে ও মেঘমেদুর আকাশের পানে চাহিয়া অতি সোহাগেই লালিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ কল্যাণকরের অমৃত পরিবেষণ সমস্ত বাড়িখানি ঘেরিয়া রহিয়াছে।

অচৈতন্য রোগিণীর শিয়রে দাঁড়াইয়া গোপীনাথ যুক্তকরে প্রার্থনা করিলেন, এমন শান্তিময় সোনার সংসার অকালে দগ্ধ করিও না, প্রভু!

গৃহস্বামী তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া রোগিণীর মাথায় দিলেন। ফিরিবার মুখে গোপীনাথ আর একবার বাড়িখানির পানে চাহিলেন। প্রাণের সমস্ত সত্তা ঢালিয়া গৃহস্বামী উহার অঙ্গ সাজাইয়াছেন। যেখানে যেটি দিলে মানায়, দিয়াছেন। লোকের চক্ষে প্রশংসার পারিজাত ফুটাইবার এই যে অদম্য প্রয়াস, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটিমাত্র সুর। সে-সুর বৃন্দাবনের জলে-স্থলে বাজিতেছে, সে-সুর তাজমহলের মায়া-রচনার লীলা প্রমত্ত, সে-সুর মানব-মনের অন্তরীক্ষে অনাদি কাল হইতে নিয়ত প্রতিধ্বনিত।

আজ সেই সুরের বিকৃতিতে উহার সমগ্র সৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

গোপীনাথ প্রার্থনা করিয়াছেন, দেখিও প্রভু, প্রেমের এই পুণ্য-দীপ যেন অকালে নিবিয়া না যায়।

হাসি পায় বটে! ভগবানের প্রেম-সমুদ্রে তরী ভাসাইয়া পশ্চাতের তীর-লগ্ন ভূমিখণ্ডের জন্য, এই আকুল আবেদন—সংসারী মনেরই পরিচয় দিতেছে। তাঁহারও ত' অমনি সংসার ছিল; না হউক তাহা ধন-ঐশ্বর্য্য-বিলাস-সম্ভারে সমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ সুখ ত' ছিল সে সংসারের। মুখোমুখী বসিয়া অনন্ত প্রকৃতির রসাস্বাদ করিতেন তাঁহারা কুণ্ঠালেশ হীন হইয়াই। একের পীড়ায় অন্যের মুখে এমনই উদ্বেগ আশঙ্কা ভাসিয়া উঠিত, একের চক্ষে অন্যের দৃষ্টি এমনই মধুর হইয়া তৃপ্তি-স্নান করাইত। তবু সে সুখ তাঁহার সহে নাই। অনন্ত শূন্যে নীড় বাঁধিবার আশায় অনির্দ্দিষ্ট সীমাহীন পথে পা বাড়াইয়াছেন।

এমনই নিষ্ঠুর সংসার যে, চলিতে গেলে প্রতি পদে উপল-খণ্ডের মত তাহার ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্মৃতিগুলি আসিয়া বাজিতে থাকে। কর্ম্মের গ্রন্থি খুলিতে গেলে শতপাকে

জড়াইয়া জটীল ফাঁসের সৃষ্টি করে। সংসারকে উপেক্ষা-ভরে ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোতির সন্ধানে চলিয়াছেন, কিন্তু ঊর্দ্ধে তারায়-তারায়, শশী-সূর্য্যে—মেঘে, আলোকে ও দিবস-সন্ধ্যায় সেই সংসারেরই প্রতিচ্ছায়া নৃত্য-মুখর। জ্যোতিঃ স্বরূপ বিন্দুবৎ জ্বলিতেছে ঐ যে চিরবাঞ্ছিত ধন উহা ধরণীর ধূলি-লাঞ্ছিত বাসনায় পরিশুদ্ধ প্রেম-কণারই অংশ মাত্র। বৃহৎ প্রেম হয়ত বৃহৎ আলো, আকারহীন অবয়বহীন চরাচর ব্যাপ্ত, কিন্তু রূপে সে বিন্দুবৎ। ঐ গৃহপ্রান্তের ক্ষুদ্র দীপ-শিখাটির কায়া সম্ভূত। এ কি মায়া! এ কি বন্ধন!

* * * * *

অপরাহ্ণে লতিকার গৃহে আসিয়া শুনিলেন, তাহার অসুখ করিয়াছে। দাসী মহা-সমাদরে রোগিণীর কক্ষে লইয়া গেল।

পালঙ্কে সুখাসনে লতা শায়িতা। বহুমূল্যের সাদা ফুল-তোলা একখানি চাদরে বুক-অবধি ঢাকিয়া অবসন্নের মত সে পড়িয়াছিল। গোপীনাথকে দেখিয়া মাথা তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বসিতে বলিল।

গোপীনাথ অদূরে চেয়ারে বসিলেন।

লতা মাথাটি ধীরে ধীরে উপাধানে রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া ক্লিষ্টস্বরে বলিল, আঃ!

গোপীনাথ বলিলেন, আপনার বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি?

লতা হাসিতে গেল, পারিল না। যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ! কিন্তু আপনার কতই না ক্ষতি ক'রলাম, ভেবে আমি আরও কষ্ট পাচ্ছি—আজ ত' কোন কাজ হ'লো না!

গোপীনাথ কহিলেন, কাজের তাড়া ত' নেই, আপনি সেরে উঠুন।

ব্যাকুল-দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া লতা বলিল, কিন্তু আপনি চ'লে গেলে আমার এ-কাজ কে ক'রে দেবে? চোখে-মুখে তার গভীর নিরাশা ফুটিয়া উঠিল।

গোপীনাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কাজ শেষ না হ'লে আমি আগ্রা ত্যাগ ক'রবো না।

আনন্দের উত্তেজনায় লতার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মাথা উঁচাইয়া আবেগভরে কহিল—আঃ, আপনি আমায় বাঁচালেন।

গোপীনাথ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, ঈশ্বরের কাজ আমার জীবনের প্রিয়।

গোপীনাথের কুণ্ঠিতস্বর লতার কানে গেল। চক্ষু না চাহিয়া সে উত্তর দিল, ঠিক ব'লেচেন। মানুষ যা দেয়—তা ভগবানেরই ভাণ্ডার থেকে নিয়ে।

একটু থামিয়া পুনরায় সে কহিল, আমি ভগবানের প্রকাশ মানুষেই দেখতে পাই। মানুষকে আমি ভালবাসি—কেন না, সে ভগবানেরই সৃষ্টি।

গোপীনাথ কহিলেন, কিন্তু মানুষের ভালবাসা নিয়ে ভগবানকে সাধনা ক'রতে হয়। সাত্ত্বিক ভাবে, শুদ্ধ চিত্তে মানুষ যা দিতে পারে, তাই হ'লো শ্রেষ্ঠ দান।

লতা কহিল, না-না, ক্ষুদ্রে যদি বৃহৎকে পাই, ত' বৃহতের সাধনায় শূন্যতা নিয়ে কেন হাঁফিয়ে ম'রবো। ভগবান ভগবানই থাকুন, মানুষ সুখে, দুঃখে, পাপে, পুণ্যে, মানুষই থাক।

গোপীনাথ কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন। লতার কথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন উষ্ণতা ছিল, একটা মায়া-রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছিল। মানুষ ভগবানের অংশ—এ-কথা সত্য, কিন্তু অংশকে পূর্ণত্বে লইয়া যাওয়াই না কর্ম্মময় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অংশকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখিয়া যে তৃপ্তি, খণ্ডরূপে ভালবাসিয়া যে সন্তোষ—তাহার মধ্যে ক্ষণিকের নশ্বর সুখই বলবান। পূর্ণতররূপে আত্মার বিকাশে যে সাধনা, তাহাই পরিপূর্ণ শান্তির একমাত্র পথ।

সংসারী সংসারকে ভালবাসুক, আপন ক্ষুদ্র দৃষ্টির প্রসারে তাহার বেদনা দুঃখ-মোচনের প্রয়াস করুক, সে উত্তম। কিন্তু, কেন সে প্রসারিত দৃষ্টির সীমা লঙ্ঘন করিবে না? জগতের বেদনাবোধ আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া অহং জ্ঞানকে নাশ করিতে কেন সে জগদীশ্বরের পায়ে শরণ লইবে না? দীপের আলো

একটি গৃহের অন্ধকার দূর করে, সূর্য্য জগতকে দিন আনিয়া দেয়। দিনের আলো সমগ্র জগতের এবং প্রতি গৃহের জন্য।

লতার শরীর অসুস্থ, কাজেই, গোপীনাথের তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া লতা বলিল, কি ভাবচেন?

গোপীনাথ আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, আজ উঠি।

লতা ব্যগ্রভাবে বলিল, যে ক'দিন না সারি, এক একবার আসবেন ত'?

—আসবো।—বলিয়া গোপীনাথ চিন্তান্বিত মুখে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

দিন দুই পরে।

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। অকালে আসন্ন বর্ষার ভীতি জাগাইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে সেদিন আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল। গর্জ্জন ছিল না, কিন্তু বাহিরের ঘন-কৃষ্ণ অন্ধকারের নিঃশব্দ সমারোহে মনে হইতেছিল, অফুরন্ত বৃষ্টির ধারা এখনই বুঝি ধরণীকে ভাসাইয়া দিবে।

কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। লতার মুখে রোগ-যন্ত্রণার রেখা। শিয়রে টুলের উপর বসিয়া গোপীনাথ ব্যথিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে লতা অস্ফুটস্বরে কহিল, মরণ হ'লেই বাঁচি, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!—বলিয়া মাথাটি সে ধীরে ধীরে উপাধানে এলাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিল।

গোপীনাথ বলিলেন, এ কদিনে একটুও কমে নি?

লতা।—বলিয়া লতা চুপ করিল। তাহার নিমীলিত নয়নের অবরোধ ভাঙ্গিয়া দু'টি ধারা নামিয়া আসিল। ক্লান্তকণ্ঠে সে কহিল, মানুষ যে কত একলা, কত অসহায়, রোগে প'ড়লে তা মনে হয়। লোকে স্বামী, পুত্র, বন্ধু, আত্মীয়-আত্মীয়া কামনা করে শুধু রোগে একটু সেবা পাবে ব'লে—সহানুভূতি পাবে ব'লে। যার এ-সব নেই তার মত হতভাগা আর কে আছে!—একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার টাকা আছে, দাসী চাকরও আছে অনেক। ওষুদ, পথ্য, সেবার অভাব নেই, কিন্তু এ-সকলের মধ্যে দরদ কোথায়? যেমন টাকা দেব তেমনি তারা সেবা-যত্ন ক'রবে। কিন্তু···আবার হু-হু করিয়া অশ্রুর ধারা নামিতে লাগিল।

গোপীনাথের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। আহা! সত্যই অভাগিনী। সর্ব্বস্ব-হারার এ বেদনা মনে সহানুভূতির একটি কোমল পর্দায় আঘাত করে।

শিয়রে তালবৃন্ত পড়িয়াছিল। গোপীনাথ তাহা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন।

লতা ত্রস্ত হইয়া কহিল, ছি! ছি! আপনি কেন আমায় পাপে জড়াচ্ছেন! না, না,—

হাসিয়া গোপীনাথ কহিলেন, রুগ্নকে সেবা করা মানে পাপে জড়ানো নয়—এ আমার ধর্ম্ম। মানুষের মধ্যে ভগবানের বসতি। মানুষ হ'য়ে তাঁকে অশ্রদ্ধা ক'রলে পাপের বৃদ্ধি হয়।

লতা বাধা দিল না। একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, আপনার ধর্ম্ম আপনি জানেন। উঃ—মাথাটা যেন ছিঁড়ে প'ড়চে—

তালবৃন্ত রাখিয়া এক মুহূর্ত্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া গোপীনাথ লতার ললাটে হস্ত স্থাপন করিলেন।

স্মৃতি আসিয়া বাদ সাধিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোগ-শয্যাশায়িত সারদার শিয়রে বসিয়া গোপীনাথ এমনই আগ্রহ পূর্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সারদা হাসিয়া বলিয়াছিল, পুরুষের কি ও-সব সাজে? যাও বোস গিয়ে।

গোপীনাথ অন্যমনস্ত করে কপাল টিপিয়া দিতে দিতে কি উত্তর দিয়াছিলেন, মনে নাই; তাহাতে সারদা হাসিয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক দিনে রোগের যন্ত্রণা কমে নাই। গোপীনাথ বড় ডাক্তার ডাকিবার প্রস্তাব করিতেই সারদা যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখখানি হাসিতে ভরাইয়া উত্তর দিয়াছিল—না, না, আর মিছি-মিছি খরচে কাজ নেই। কাল ঠিক

উঠে ব'সতে পারবো। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু ভালই আছি।

ভাল সে ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া রাখিলেও চোখের অবাধ্য অশ্রু তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। গোপীনাথ সে অশ্রুর পানে চাহিয়া আপন অর্থ অপ্রতুলতার কথা ভাবিয়া গোপনেই একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

সারদা কি বুঝিয়া গোপীনাথের একখানি হাত আপনার বুকের উপর রাখিয়া বলিয়াছিল, তোমার হাত বুকের 'পরে রাখলে আমার কোনো যন্ত্রণাই থাকে না। দু'জনের নয়নেই সুখ-দুঃখের অশ্রু উথলিয়া উঠিয়াছিল।

সহসা গোপীনাথ চমকিয়া উঠিলেন। স্মৃতি মিলাইয়া গেল, স্বপ্নঘোর মিলাইল না।

বাহিরে মেঘ-মেদুর আকাশে তেমনই ঘন-ঘোর অন্ধকার, গৃহের আলোক মৃদু বাতাসে অল্প অল্প কাঁপিতেছে, আর—আর তাঁহার ডান হাতখানি কখন নিঃশব্দে লতার বুকের উপর নামিয়া আসিয়াছে। শিহরিয়া তিনি হাত উঠাইতে গেলেন, লতার দু'টি উষ্ণ করতল মৌন মিনতির ঈষৎ চাপে তাঁহার প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

লতা কহিল, থাক্।

স্বর তাহার বাষ্প গদ্-গদ্।

গোপীনাথের সারা চিত্ত দুলিয়া উঠিল। বুকের মাঝে দুরু-দুরু করিয়া চঞ্চল রক্তস্রোত আছাড় খাইতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া গেল।

লতার পানে চাহিলেন। সে নিমীলিত নয়নে এক ভাবে পড়িয়া আছে। চক্ষে তেমনই দর-বিগলিত ধারা। দু'টি উষ্ণ করতলের অসংযত স্পন্দনে যে চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিতেছিল—তাহাতে সদ্য জাগরিত প্রাণ আসিয়া যেন ক্ষুধিত আগ্রহে চারিদিকে চাহিতেছে! সে ক্ষুধা অসহায় নারীর স্নেহ-প্রত্যাশার এতটুকু যাচ্ঞা-ভরা।

লতা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এমনি একটি স্পর্শ—এমনি একটু দরদ আমি পেতে চাই। আমার সমস্ত ধন-রত্ন, ঐশ্বর্য্য-অট্টালিকা বিলিয়ে দিতে পারি তার বিনিময়ে।

গোপীনাথ বাতায়ন-বাহিরে চাহিলেন; নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র অন্ধকার—এতটুকু আলো নাই। নিজের গৈরিক বসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। মানবসেবা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু ধর্ম্মের অন্তরালে কিসের ভ্রূকুটি?

সজল বাদল-মায়া যে-স্বপ্ন বহিয়া আনিয়াছে, অর্থের হৈমন্তরূপে তাহাকে সার্থক করিবার জন্য মনের গোপন কোণেও কি এতটুকু দীনতা জাগিয়া নাই?

সজোরে মনকে শাসন করিয়া গোপীনাথ হাতখানি টানিয়া লইলেন। লতা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। গোপীনাথ তাহার পানে চাহিতে পারিলেন না। একটা কামার্ত্ত পশু যেন তাঁহার অন্তরের মাঝে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিতেছিল। দাহ-যন্ত্রণায় গোপীনাথ ছুটিয়া পলাইলেন।

বাহিরে প্রবল বেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল।

* * *

সে রাত্রিতে গোপীনাথ ঘুমাইতে পারিলেন না। তন্দ্রার অন্তরালে সারদার মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠে, আবার কখন এক সময়ে সে মূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়া লতা হাসিতে থাকে।

পৃথিবী লতার কাছে পরম শোভাময়। তার অপরিমিত অর্থ আছে; সে অর্থের বিনিময়ে সে প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে চাহে। ছি—ছি! সঙ্কীর্ণ মনের অন্ধকারে এতটুকু কুৎসিত কামনা কোথায় লুকাইয়া ছিল? সুযোগ পাইবামাত্র শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া, সমস্ত আলোক অবরোধ করিয়া এই বাসনা মহীরুহ মনের সকল রন্ধ্র-পথ অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু লতা ত' নির্লজ্জার মত এ যাচ্ঞা করে নাই। —তার স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তর রোগ-যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া দুর্ব্বলা নারীর মতই, সংসারী মানুষের মতই একটি স্নেহ-সুখ-স্পর্শ প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে কি এতই

অপরাধ? লতা ত' সন্ন্যাসিনী নহে! সে সংসারের স্নেহ-ভালবাসার দুর্ব্বলতা যদি অতিক্রম করিতে না পারে ত' কি দোষ তাহার? তার স্বর আনন্দে উদ্বেল হইয়া গাঢ় হইয়াছিল, কর দু'টি হয়ত কাঁপিয়াছিল, বুকে কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল বলা যায় না এবং মুদিত চক্ষুর বিগলিত ধারায়ও হয়ত সে দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।—তথাপি সংসারী লতার কি দোষ?

দোষ গোপীনাথের। কেন তিনি লতার কাছে বসিয়া সারদার স্মৃতিতে বিহ্বল হইয়াছিলেন? কেন গৈরিক বসনের অভ্যন্তরে সংসারী-মন নিয়ত স্মৃতিধ্যানে বিভোর থাকে? অর্থের অভাবে যে সকল সুখ-সাধ বৈরাগ্যের অগ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াছিল, ভোগের আকাঙ্ক্ষায় তাহারাই আজ দগ্ধদেহে উৎকট উল্লাসে নয়ন মেলিতেছে। পুড়িলেও তাহারা মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে গোপীনাথ উঠিয়া বসিলেন। কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, রক্ষা কর প্রভু, আমায় রক্ষা কর। রিপুর দাস আমি, বৃথা অহঙ্কারে সংসার ত্যাগ করিয়াছি। তাহাকে ভালবাসিয়া ত্যাগ করিলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হয়ত হইত না। কিন্তু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, ভোগের ক্ষেত্রে প্রবল আকর্ষণ করিতেছে। আমায় রক্ষা কর, প্রভু—রক্ষা কর।

প্রাতঃকালে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি যে ভদ্রলোকের গৃহে তাঁহার পত্নীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

গোপীনাথ মন স্থির করিয়াছিলেন, আর সংসারীর ত্রি-সীমানায় পদার্পণ করিবেন না।

কহিলেন, তাঁকে বল গে আমি এখনই শহর ছেড়ে যাচ্ছি।

ভৃত্য কাতর কণ্ঠে কহিল, তিনি অনেক ক'রে ব'লে দিয়েচেন। মা-ঠাকরুণ মারা গেছেন, আপনার কাছে কি উপদেশ নেবেন।

গোপীনাথের মন সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইল। শোক-সন্তপ্তকে যদি এতটুকুও সান্ত্বনা দিতে পারেন!—আহা—বড় দুঃখ তাঁর!

তারপর আগ্রা ত্যাগ করিতে কতক্ষণ?

কহিলেন, চল।

* * * *

সেই কক্ষ। অতি যত্নে পরিপাটী করিয়া সাজানো সুখনীড়। যে জিনিষটি যেখানে রাখিলে মানায়, সেটি সেই খানেই সাজানো আছে। সেদিন তাহারা প্রাণপূর্ণ ছিল, আজ বিয়োগ আসিয়া চুপে চুপে এ সকলের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। স্মৃতির বোঝা বহিয়া প্রতি দ্রব্য, প্রতি দ্রব্যের মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কক্ষমধ্যে মেঝের উপর বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে গৃহস্বামী কি চিন্তা করিতেছিলেন।

গোপীনাথকে দেখিয়া তাঁহার চিন্তা টুটিয়া গেল। প্রশান্ত মুখখানি ফিরাইয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিলেন।

গোপীনাথ বসিলেন।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়া গেল। গোপীনাথ শোকাচ্ছন্নের প্রতি চাহিয়া কোনো সান্ত্বনার বাণীই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কালের ওষধি ভিন্ন এ ক্ষতের অমৃত প্রলেপ কি-ই-বা আছে?

বহুক্ষণ পরে ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, তারা, তারা।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

—ভগবানের উক্তি, কি বলেন, সাধু বাবা!

গোপীনাথ তাঁহার আশ্চর্য্য হৃদয় বল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কে বলিবে কয়দিন পূর্ব্বে এই মানুষই স্ত্রীর অসুখে ক্ষুদ্র বালকের মত পুনঃ পুনঃ অধীরতা প্রকাশ



সের আফগানের কবর [শিল্পী—শ্রীহাসিরাশি দেবী



সের আফগানের কবর : [শিল্পী—শ্রীহাসিরাশি দেবী

Blank page (s)

করিয়াছিলেন! শোক কি মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে?

গৃহস্বামী পুনরায় শান্তকণ্ঠে কহিলেন—আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'য়ে গেচেন, সাধুবাবা, আমি কি ক'রে এমন মনের বল পেলাম? কি ক'রে যে পেলাম তা নিজেই জানি না। ম'রবার সময় সে আমায় ব'ললে, কাঁদচ কেন? আমরা হিন্দু, জন্মের পর মৃত্যু আছে, পরলোক মানি। তবে দুঃখ কেন? এ-জীবনে মরণ যে সুখকে আড়াল ক'রে রাখলে, পরজন্মে তা আমাদেরই থাকবে। হ্যাঁ সাধুবাবা, এ-কথা কি সত্য? সে ত' কখনও মিথ্যা ব'লতো না! তাই কি ম'রবার সময় অমন সুন্দর সত্যকে প্রকাশ ক'রে গেল?

গোপীনাথ কহিলেন, জন্মান্তর আছে বৈ কি। কর্ম্মফলে মানুষের ভাবী জন্মের সুখ-দুঃখ সঞ্চিত হ'য়ে ওঠে।

গৃহস্বামীর মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিল। কহিল, ঠিক-ঠিক ব'লেচে সে। আরও কি ব'লেছিল জানেন? মনকে বাসনার বশবর্ত্তী ক'রলেই দুঃখ অনিবার্য্য। আমি ত' মরবো, কিন্তু তোমার কাছে-কাছে, এই ঘরেই থাকবো। তোমার ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, তা হ'লে প্রত্যেক মানুষকে ভালবেসো। তাতে যে তৃপ্তি পাবে—জেনো, সে তৃপ্তি আমারই। এই ঘরে তার ওই কথাগুলো যেন এখনও আমায় অভয় বাণী শোনাচ্চে। তাই তার নাম ধরে আমি চেঁচিয়ে কাঁদতে পারি নি।

বুঝি এমনই হয়! বিপদ আসিবার মুহূর্ত্তে শত ব্যাকুল চিন্তায় চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বিপদ বহিয়া গেলে চিন্তার অবসর থাকে না। অবশ্য প্রাপ্য বলিয়া সে বিপদকে সহ্য করিবার শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়।

গোপীনাথ কহিলেন, ধন্য আপনার হৃদয়-বল।

গৃহস্বামী গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, এ-বল আমার ছিল না, সে দিয়ে গেচে, সাধুবাবা। মনে ক'রেচি, এই গৃহ আর নিজের সুখের জন্য রাখবো না। ভেবেছিলাম এক, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। ভোগের ইচ্ছা থাকলেই ভোগ করা যায় না। আমি পরের সুখের মধ্যে আপনাকে ভোগ ক'রবো। অনাথ-আতুরের সেবার জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে দেবো। আমার মনে হ'চ্চে, এর চেয়ে তৃপ্তি বুঝি আর কিছুতে নেই। সে-দিন দু'জন ভিখারীকে হাত ভ'রে ভিক্ষা দিয়েছিলাম, তাতে তারা আমায় এমন মধুর আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল, যার তৃপ্তি অক্ষয় সঞ্চয় হ'য়ে এখনও আমার বুকে আছে।

তাঁহার মুখের উপর ধীরে ধীরে একটি প্রশান্ত জ্যোতিরেখা ফুটিয়া উঠিল।

গোপীনাথ শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নামাইয়া কহিলেন, আমায় সাধু বলে ডাকবেন না। ভোগের আকাঙ্ক্ষা মনে পুষে রেখে অতৃপ্তি নিয়ে সারা তীর্থ ঘুরে বেড়াচ্চি। মনকে এখনও বশে আনতে পারি নি। আপনি আমায় মহৎ শিক্ষা দিলেন।

গৃহস্বামী তাঁহার চরণ-ধূলা মাথায় তুলিয়া কহিলেন, আমায় অপরাধী ক'রবেন না।

গোপীনাথ হাসিয়া উঠিলেন। শুষ্ক, নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক আর্ত্ত হাসি। কহিলেন, ভেবেছিলাম সাধনার মার্গে উঠে সিদ্ধি করতলগত ক'রবো। একদিন হরিদ্বারে এক সাধু আমায় ব'লেছিলেন, ধাপে-ধাপে না উঠতে পারলে পতনের আশঙ্কা আছে। তখন বুঝি নি, কাল বুঝেছি। আপনাকে প্রথম দিন থেকে পাগল মনে ক'রেছিলাম, সংসারের উপর আপনার টান দেখে কেমন যেন অশ্রদ্ধা হ'য়েছিল। আজ দেখছি সে-টান আপনার আন্তরিক এবং সেই আন্তরিকতাই আজ আপনাকে যেখানে দাঁড় করিয়েচে, আমায় সে-দিকে চাইতে হ'লে মুখ তুলতে হবে। ঠিক ঠিক সোপান বেয়ে আপনি উঠেছেন, আমি অন্ধকারে আজও পথ হাতড়ে মরচি।

গোপীনাথ অস্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

গৃহস্বামী বলিলেন, আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে।

গোপীনাথ কহিলেন, আপনি পথ পেয়েছেন—পরামর্শের দরকার নেই। আমি পথ খুঁজতে চ'ললাম।

গৃহস্বামী বলিলেন, কোথায় যাবেন?

গোপীনাথ বারকয়েক উদ্বেল বক্ষকে দু'টি হাতে নিপীড়িত করিয়া বাতায়ন-বাহিরে অপলক দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতে লাগিলেন। পরে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, ছোট প্রেমকে তুচ্ছ ক'রলে বড় প্রেম মেলে না—এই সত্যই আজ আমার চোখ খুলিয়া দিয়েছে। আমি ঘরেই ফিরে যাব; পারি ত' সোপান শ্রেণীই উপরে উঠবো। না পারি, মানুষ আমি, ছোট ঠাঁইটুকুর মধ্যেই আমার ভালবাসার স্বর্গ রচনা ক'রবো।

গোপীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

(শেষ)

পা-পূজা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভক্ত আধ্যাত্মিক গান গাইলেন—'তব অভয় চরণতলে সদা রাখিও।' এখানে 'চরণ' শব্দটি রূপকে বসিয়াছে বুঝিলাম; কি ভাব বুঝাইবার জন্য চরণ শব্দটি রূপক বসিল, ধরা কঠিন। মানুষ অনুরাগে এক জনকে চোখ দিয়া দেখে, তাহার কথা কান পাতিয়া শোনে, আদর করিয়া হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া নেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পা দিয়া কিন্তু মানুষ কেবল চলে, কাহাকেও আশ্রয় দিতে গিয়া তাহাকে পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে না বা আঁকড়াইয়া রাখে না। তবে কি হিসাবে রূপকে এই 'চরণ' আসিল? তাহার পরে আবার আছে 'চরণতলে'; চরণের তলে পড়িলে ত' চট্‌কানি খাইয়া মরিতে হয়, অভয়স্থান মেলে না। তবুও অস্বাভাবিক কল্পনায় চরণ খাড়া করিয়া পূজা করিবার ঝোঁক কেন?

এই পা-পূজার বহর আরও খানিকটা দেখিয়া নিয়া ইহার উৎপত্তির ইতিহাস দিব। পায়ের রূপ বর্ণনা করিয়া উহাকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আর ভ্রমরেরা যেমন পদ্মে মধু খায়, সেইরূপ সেই পাদপদ্মের মধুপানের কথাও পাই; একটি আধ্যাত্মিক গানে আছে—'তব চরণামৃত পান পিপাসিত।' সত্য-সত্য এরূপ অভিজ্ঞতা ত' মানুষের নাই যে, কাহারও পা চাটিয়া এমন রস পায়, যাহাতে তাহার তৃপ্তি হয়। যে পশু-পক্ষী রাঁধিয়া খাই, তাহাদের রাঁধা ঠেঙ্ চাটিয়া ও কামড়াইয়া তৃপ্তি আছে বটে, তবে সেই রসের অনুভবে কোন ভক্ত রূপকে 'চরণ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বলিতে পারি।

পায়ের গড়ন ভাল হইলে তাহার সুন্দর ছবিকে পদ্মের সঙ্গে হয়ত একটু অস্বাভাবিক রকমে তুলনা করিতে পারি, তবে দেবতার যদি আস্ত সাকার পা না থাকে, সে রূপক ত' চলে না। যৌন আকর্ষণে পায়ের দিকে ঝোঁক পড়িবার যে বিবরণ পাই, তাহার সহিত কিন্তু পূজা ও ভক্তির সম্পর্ক নাই। যৌন আকর্ষণের কবিতায় পাই—'দেহি পদপল্লবমুদারম্', আর হাট-বাজারের হাল্কা গানে পাই—'বৌ, তোর আল্‌তামাখা পা দু'খানি।' আমি এই ধরণের পায়ের কল্পনার কথা বলিতেছি না; উহার ভোগময় বর্ণনা আছে বৈষ্ণবদের 'উজ্জ্বল নীল-মণি'-তে, আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে Havelock Ellis-এর মত পণ্ডিতের বইয়ে।

মানুষকে যে ভাবে আদর করা যায় বা সম্মান করা যায়, সেই ধরণে ঠাকুর-দেবতাদের পূজা হইতে

পারে, বুঝিতে পারি। ঘরে মাননীয় অতিথি আসিলে তাঁহাকে পাদ্য দিতে হয়, অর্ঘ্য দিতে হয় ও আহার দিতে হয়। পাদ্য হইল—পা ধুইবার জল, আর অর্ঘ্য হইল—উত্তমাঙ্গে বা মাথার দিকে মালা দেওয়া, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া, ইত্যাদি। বাঙ্গালার অনেক কবির পা-পূজার ঝোঁকের রচনায় 'চরণে অর্ঘ্য' দেওয়ার কথা পড়িয়া হাসিতে হয়। পাদ্য দেয় পায়ে, কিন্তু অর্ঘ্য কেমন করিয়া পায়ে দেওয়া চলে? ঠাকুরের পায়ে পাগড়ি বাঁধিয়া দেওয়া বা দেবীর পায়ে খোঁপা বাঁধিয়া দেওয়ার মত যে পায়ে অর্ঘ্য দেওয়ার কোন অর্থ হয় না, তাহা আমাদের কবিদের মনে পড়ে না।

ঠাকুর-দেবতাদের পূজার ধ্যানে কোথাও পায়ের বর্ণনা নাই, ধ্যান করিতে হয় ঊর্দ্ধ দিকের অঙ্গের; দেব বা দেবী ত্রিনেত্র বা বরফের মত সাদা অথবা অন্য রূপবিশিষ্ট—এইরূপ বর্ণনাই ধ্যানের মন্ত্রে পাই। কিন্তু কোথাও তাঁহাদের পা পদ্মের মত বা সারা চরণখানি কলাগাছের মত, এরূপ উল্লেখ পাই না। তবুও পা-পূজার কথা ওঠে কেন? বৈষ্ণবদের মধ্যে পা-পূজার খটা খুব অধিক; সেই কথা বলিবার পর পা-পূজার উৎপত্তির ইতিহাস দিব।

তান্ত্রিক পূজার মন্ত্রে দেব-দেবী প্রণামের মন্ত্র আছে; প্রণাম কার্য্যটা হয় মাথা নোয়াইয়া, আর একেবারে পায়ের তলায় ঝুঁকিয়া—ইহা স্বীকার করি; তবে সে মন্ত্রে পা বা চরণের বর্ণনা নাই। প্রণামের নামেই পায়ের কথার ঘন-ঘন উল্লেখ আছে বৈষ্ণবদের বইয়ে, যেমন—'তব চরণে প্রণতাবয়ম্।'

ভক্তি দেখাইবার জন্য যে স্বাভাবিক মাথা নত করা বা প্রণাম করার পদ্ধতি আছে, তাহার সঙ্গে পা-পূজার সম্পর্ক আছে বটে, তবে সে কথা আর একটু পরে বলিতেছি। মানুষ-গুরুর চরণ-পূজার কথাও সেই সময়ে বলিব। এখানে বলিতেছি—বৈষ্ণবদের পা-পূজার বাড়াবাড়ির কথা। যিনি যত বড় সাধু, তিনি তত বেশি পরিমাণে তাঁহাদের নামের গোড়ায় 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দ জোড়েন। ঐ শব্দের অর্থ এমন নয় যে, প্রভু নিজে অচল বা খোঁড়া, আর ভক্ত তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া বহিতেছেন; উহার অর্থ এই যে, ভক্ত বড় হীন,—তিনি ভক্তিতে প্রভুর সেই অঙ্গে একেবারে লাগিয়া আছেন, যে অঙ্গে ধূলা-কাদা ইত্যাদি ঘৃণ্য-পদার্থ প্রভৃতি লাগে। সাধুটি ঐ উক্তিতে বুঝাইতে চায় যে, সে প্রভুর অঙ্গের ভাল দিকটি ছুঁইবার অধিকারী নয়,—সে একটুখানি অধিকারী শরীরের অধম অংশ স্পর্শ করিবার। শরীরের অতি অধম ভাগ বা নীচের দিক্ হইল চরণ বা পা; কাজেই সেই অধম অংশের প্রতি অনুরাগ দেখাইলে ভক্তি ও বিনয় বেশি করিয়া দেখানো হয়।

শরীরের নানা রকমের পরিবর্ত্তনে মানুষের মনের ভাব খানিকটা ধরা যায়, যেমন—দুঃখ হইলে চোখ বুজিয়া আসে, চোখ দিয়া জল পড়ে, শরীর কোঁচকায়, ইত্যাদি। আর কিছু দেখিয়া বিস্ময় হইলে শরীর যেন ফুলিয়া ওঠে, চোখের চাহনি হয় উপরের দিকে, আর মুখে ভাল কথা ফোটে না। সেইরূপ—কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার বা সম্মান দেখাইবার ভাব জাগিলে মাথা একটু নত হয়, আর চোখ একটুখানি বুজিয়া আসে; তবে পায়ের তলায় গড়াইবার বা পা বেড়িয়া ধরিবার স্বাভাবিক ঝোঁক জন্মে না। কাহাকেও আদর করিতে গেলে বুকে টানিয়া ধরিবার ঝোঁক হয় এবং আদরের পাত্র শিশু হইলে ঘাড়ে করিয়া বা হাতে তুলিয়া দোলাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এরূপ কোন অবস্থাতেই পা চাটিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। মানুষের মনে যদি দুঃখের জ্বালা বাড়ে, তবে স্নায়ুর বিকারে সে ধীরভাবে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারে না,—অধীরতার ছট্‌ফটানিতে সে মাটিতে গড়াইতে পারে। এমন হইতে পারে যে, যাহাদের সংযম অল্প, তাহারা দেবতার কৃপায় দুঃখ তাড়াইবার নিবেদনের সময়ে ধূলায় গড়াইতে পারে বা অচেতন হইতে পারে। দুঃখ দেখাইবার ঐরূপ অভিনয় না করিলে যে দেবতা দুঃখের অবস্থা জানিতে পারেন না অথবা দুঃখের প্রতীকার করেন না—এরূপ ধারণা না থাকিলেও

যাহারা অধীর ও চপল, তাহারা মনের বেগে ধূলায় গড়াইতে পারে ; উহাতেও কিন্তু এ-অর্থ হয় না যে, দেবতার চরণতলে পড়িয়া অভয় স্থান পাওয়া যায়।

এখানে এ-কথার উল্লেখের প্রয়োজন যে, রাজাদের কাছে কোন-কোন অবস্থায় বশ্যতা স্বীকার করিবার সময়ে রাজার সম্মুখে ভূঁয়ে লুটাইতে হয় ; তাহার কারণ বলিতেছি। রাজা যদি কোনো সশস্ত্র শত্রুকে বন্দী করেন, তবে সেই শত্রু প্রাণ বাঁচাইবার খাতিরে নানা নিদর্শনে বশ্যতা জানাইতে পারে ; হাতের অস্ত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া স্পষ্ট বুঝাইতে পারে—সে রাজার গায়ে অস্ত্রের আঘাত করিবে না, অথবা উপুড় হইয়া ভূঁয়ে পড়িয়া বুঝাইতে পারে যে, রাজা যদি তাহাকে মারেন বা কাটেন, তবু সে বিরোধী হইবে না। যদি ঠাকুর-দেবতার পূজার সময় ঐ-ভাবে বশ্যতা জানাইতে হয়, আর ক্রুদ্ধ রুদ্র দেবতাকে তোয়াজ করিয়া বলিতে হয়—'রাখ আর মার, যা' ইচ্ছা এখন।'—তবে কোন কথা নাই। মনে এরূপ ভাব থাকিলে চরণতলে বা চরণের সাম্‌নে অভয়স্থান পাইবার প্রার্থনা অস্বাভাবিক হয় না। কিন্তু যাঁহাদের মনের ভাব আধ্যাত্মিক বলিয়া শুনিতে পাই, আর যাঁহারা পূজ্য দেবতাকে নিষ্ঠুর শয়তান ভাবেন না, অথবা স্তুতিতে বশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তাঁহাদের পূজার মন্ত্রে বা গানে চরণ, চরণ-পঙ্কজ, চরণামৃত প্রভৃতি কেন ?

বর্ব্বরযুগে যে-কারণে গুণীজনের অথবা গুরুজনের পা ছুঁইবার প্রথা জন্মিয়াছিল, অতি সংক্ষেপে তাহার একটু ইতিহাস দিতেছি। মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন মনের অবস্থায় পরস্পরের প্রতি যে ব্যবহার করে, সেই ব্যবহারের কোন্‌টাকে যে বলিতে হয় সাধু ব্যবহার, আর কোন্‌টাকে যে বলিতে হয় অসাধু বা পাপের ব্যবহার—বর্ব্বরেরা সে-কথা আদিকালে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত না। তাহারা যখন দেখিত—একজন সাধু, আর অন্যজন পাপিষ্ঠ, তখন ভাবিত—সাধুতা বা পাপ অন্য জড়-পদার্থের মতই এক-একটা আলাদা বস্তু, আর সেই সকল বস্তু ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণে মানুষের শরীর ছাপিয়া বাস করে। তাহারা বিশ্বাস করিত—একজন সে কাপড় পরে, সেই কাপড়ের গায়ে মানুষের মনের টুক্‌রা বা তাহার সাধুতা-অসাধুতার টুক্‌রা লাগিয়া থাকে। এই বুদ্ধিতে কাহাকেও মারণ, উচাটন ও বশীকরণ করিতে হইলে, তাহারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির কাপড়ের টুক্‌রা কাটিয়া নিয়া বা চুলের গোছা কাটিয়া নিয়া তুক্-তাক্ করিত। আবার যদি কোন গুণীজনের কাছে বসিতে পারা যায়, তবে তাহার নিঃশ্বাসে ও গায়ের গন্ধে তাহার গুণ লাভ করা সম্ভব—এ কথাও তাহারা মনে করিত। গুরুর উত্তমাঙ্গ বা উপরের দিকের শরীর ছুঁইবার স্পর্দ্ধা করা গুরু-পরিবারের বাহিরের লোকের পক্ষে সম্ভব হইত না, তবে কোন বিশিষ্ট সেবাদাসী সে অধিকার পাইতে পারিতেন হয়ত। গুরুর যে পা ঘৃণ্য ধূলা-কাদা মাড়াইয়া চলে, তাহা ছুঁইতে পারিলে তাঁহার গুণ লাভ করা শিষ্যের পক্ষে সম্ভব হইত। এই জন্যই পা ছুঁইয়া প্রণাম করার প্রথা বর্ব্বরযুগে প্রচলিত হইয়াছিল, আর সেই প্রথাই ভক্তি ও সম্মান দেখাইবার পক্ষে সনাতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভক্তি দেখাইবার জন্য বর্ব্বরযুগের পা-পূজার প্রথা সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই নিরাকার ঠাকুর-পূজা করিবার সময়েও ভাবের রূপকে চরণ, পাদপদ্ম প্রভৃতি উল্লিখিত হয়।



মর্ম্মর

শ্রীবিমল মিত্র

রাতের শিয়রে প্রদীপ জেলেছি আজ ;
গন্ধ-আতুর বাতাস এখন মন্থর বয়ে' যায়।
এমন সময়ে তুমি যদি আস—
তুমি যদি আস প্রিয়ে…
……তুমি আজ আসিবে কি ?

তুমি যদি আস—পরণে পরিও মেঘ-ডম্বর সাড়ী,
খোঁপায় গাঁথিও কনক-চাঁপার কুঁড়ি—
দু'টি কালো চোখে এঁকে দিও অঞ্জন,
খয়েরের ছোট টিপ্ দিও সখি,
দুইটি ভুরুর মাঝে…

তুমি আর আমি ছায়ার মতন বসে' র'ব মুখোমুখি !
রাত্রির তম গাঢ়তম হবে সেদিনের বাতায়নে—
বাতায়নে আর সারাটি পৃথিবী জুড়ে,
শুধু দু'জনের একটানা স্পন্দন !……
কনক-চাঁপার ডালাখানি লয়ে মূর্চ্ছিত ধরাতল—
নিশীথের দেহ শিহরিবে ক্ষণে ক্ষণে !
তখন আকাশে চাঁদ ডুবে গেছে হায়,
ডুবে গেছে চাঁদ পাতার অন্তরালে—
হেথায় আমার ঘরের প্রদীপ
নিভেছে বাতাস লেগে—
তুমি আর আমি বসে' র'ব মুখোমুখি !…

তরুর পাতার মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনি ;…
স্বপ্নের মতো…ছায়ার মতন…
মায়ার মতন লাগে…
কবরী-বাঁধন শিথিল হয়েছে…
দেহলতা পড়ে খসি'…
চঞ্চল বহে রাত্রির নিঃশ্বাস !

মাটির পৃথিবী ঘুমায়ে স্বপ্ন দেখে—
ফুলের স্বপ্ন—ফলের স্বপ্ন—স্বপ্ন পল্লবের।—
কালের ওপারে কোথায় অনেক দূরে
নিশাচর পাখী ডেকে চলে' যায়
শেষ প্রহরের ডাক—
স্বপ্ন-শেষের মৃদুতম সঙ্কেত !
…তখনো আমরা—তুমি আর আমি—
বসে' রব মুখোমুখি !

দেখিছ কি সখি—
রাতের শিয়রে প্রদীপ জেলেছি আজ ;
গন্ধ-আতুর বাতাস এখন মন্থর বয়ে' যায়—
এমন সময় তুমি যদি আস—
তুমি যদি আস—আহা—
তুমি যদি আস…তুমি আজ আসিবে কি ?



বাংলা কবিতার ছন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

বৈশাখ মাসের 'উদয়ন' ও 'বঙ্গশ্রী'-তে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি কবি ও ছান্দসিক উভয়েরই চিন্তনীয় বহু অপূর্ব্ব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। ভবিষ্যতে যিনিই ছন্দ আলোচনা করবেন তাঁকেই এ দুটি প্রবন্ধের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করতে হবে। বাংলা ছন্দ আলোচনার ইতিহাসে এদের স্থান কায়েমী হ'য়ে রইল। ছন্দ-তত্ত্বের দিক্ থেকে এ প্রবন্ধ-দুটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষা ও ভঙ্গীতে যে আলোচনা করেছেন বোধ করি তার উপর আর কারও কোনো কথাই চল্‌তে পারে না। ভঙ্গীর তরফ থেকে এর চেয়ে সুন্দরতর এবং যুক্তির তরফ থেকে এর চেয়ে অকাট্যতর ছন্দতত্ত্বের ব্যাখা আর কেউ কখনও করেছেন ব'লে মনে হয় না। সুতরাং ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো কথা বল্‌ব না। ছন্দের বিশ্লেষণ ব্যাপারেও উক্ত প্রবন্ধ-দুটিতে বহু চিন্তার উপাদান রয়েছে। এই ছন্দ-বিশ্লেষণ সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তিকে উপলক্ষ্য ক'রে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করব।

১

প্রথমেই বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগের কথা ধরা যাক্। এ বিষয়ে এবার রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন, "বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন কোরে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে—এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন ব'লে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।" (ছন্দ—উদয়ন, বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ১১)। বাংলা ছন্দের এই তিনটি প্রধান শাখার কথা বাংলা দেশের কবি ও ছান্দসিকরা বহুদিন যাবৎ স্বীকার ক'রে এসেছেন। আমিও ছন্দ আলোচনা-প্রসঙ্গে বরাবর এই শ্রেণী-বিভাগটিকে মেনে নিয়েছি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মত জানা গেল এই প্রথম। ছন্দের যে বিভাগকে অবলম্বন ক'রে এতদিন ছন্দ আলোচনা করেছি সেই বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট সমর্থন পেয়ে স্বভাবতই উৎসাহ বোধ করছি। যাহোক্, বাংলা ছন্দের এই তিনটি শাখার নামকরণ বিষয়েও দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা ছন্দের যে শাখাটি আছে 'পুঁথিগত কৃত্রিম (অর্থাৎ সাধু) ভাষাকে অবলম্বন কোরে', রবীন্দ্রনাথ সে শাখাটিকে কোথাও 'সাধু-ছন্দ' বা 'সাধু ভাষার ছন্দ' এবং অন্যত্র পয়ার-জাতীয় বা পয়ার-শ্রেণীয় ব'লে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাংলা ছন্দের এ শাখায় সাধু ভাষার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য্য নয়। এ শাখার ছন্দে চল্‌তি বা প্রাকৃত বাংলাও বেশ সুষ্ঠুরূপেই ব্যবহার করা যায়, রবীন্দ্রনাথই তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যথাস্থানে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। দ্বিতীয়ত' পয়ার যে শুধু এ শাখারই বিশেষত্ব তা নয়। বাংলা ছন্দের তিন শাখাতেই পয়ার রচনা করা যায়। দৃষ্টান্ত —

(১) অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন,
সহসা জাগিয়া দেখি এ শুধু স্বপন।
—রবীন্দ্রনাথ, কল্পনা, আশা।

(২) মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচ্‌তে তারাই জানে।
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, চিঠি।

(৩) আশ্বিনে হাট বসে ভারি ধুম ক'রে
মহাজনী নৌকায় ঘাট যায় ভ'রে।
—রবীন্দ্রনাথ, সহজপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ), পৃঃ ৫০।

এই তিনটিই পয়ার। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত-তিনটি একই ছন্দে রচিত নয়। এই তিনটি দৃষ্টান্ত বাংলা ছন্দের

একেকটি শাখার দৃষ্টান্ত, প্রথমটি রচিত হয়েছে "পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষায়", দ্বিতীয়টি "সচল বাংলা ভাষায়" আর তৃতীয়টি সংস্কৃত পদ্ধতিতে। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি বাংলা ছন্দের তিন শাখাতেই পয়ার রচনা করা যায়। কাজেই প্রথম দৃষ্টান্তটিকেই অর্থাৎ সাধু ভাষার দৃষ্টান্তটিকেই বিশেষভাবে পয়ার বল্‌লে অভিহিত করার কোনো কারণ নেই। তা-ছাড়া উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-তিনটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, 'পয়ার' কোনো ছন্দের নাম নয়, এটি হচ্ছে একটি ছন্দোবন্ধের নাম। অর্থাৎ তিনটি বিভিন্ন ছন্দের পংক্তি-পর্ব্বগুলিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত বা ব্যূহ-বদ্ধ করলে তবে সেই বিন্যাস বা ব্যূহ-বন্ধনকেই পয়ার বলা হয়। কাজেই বাংলা ছন্দের তিনটি শাখার কোনো একটিকে বিশেষভাবে পয়ার নাম দেওয়া যায় না। আর রবীন্দ্রনাথের কথিত প্রথম শাখাটিতেও সাধু ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য্য নয়। সুতরাং এ শাখাটিকে 'সাধু ভাষার ছন্দ' ব'লে অভিহিত করাও সঙ্গত নয়।

তাহ'লে উক্ত প্রথম শাখাটিকে কি নাম দেওয়া যায়? কবিতায় ব্যবহৃত ভাষা অনুসারে ছন্দের নামকরণ না ক'রে ছন্দের 'ধ্বনি-প্রকৃতি ও ধ্বনি-বিন্যাসের পদ্ধতি অনুসারেই নামকরণ করা সমীচীন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে সাধারণত' আমাদের আলোচ্য শাখার ছন্দে প্রতি পংক্তির 'অক্ষর'-সংখ্যা গুণেই এ ছন্দের হিসাব রাখা হয়। যেমন, "কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্"—এ পংক্তিটিতে চোদ্দটি 'অক্ষর' আছে ব'লে ধরা হ'য়ে থাকে। সুতরাং প্রচলিত প্রথা অনুসারে এর ছন্দকে বলা যায় "অক্ষরবৃত্ত"। কিন্তু বাংলায় 'অক্ষর' শব্দের প্রচলিত অর্থ বড়ই অনির্দ্দিষ্ট। এ শব্দে পুরো সিলেবেল্‌কেও বোঝায়, আবার কখনও হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণকেও একেকটি 'অক্ষর' ব'লে গণ্য করা হয়। তাই প্রচলিত প্রথায় 'পুণ্যবান্' শব্দে চারটি অক্ষর গুণ্‌তে বাধে না। কিন্তু স্পষ্টতই এ রকম দ্ব্যর্থক শব্দ অবলম্বন ক'রে ছন্দের নামকরণ করা অযৌক্তিক, অতএব অবৈজ্ঞানিকও বটে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ধ্বনির (প্রধানত' যুগ্মধ্বনির অর্থাৎ closed syllable-এর) সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট এই দ্বিবিধ উচ্চারণ-রূপের যোগে এই ছন্দ উৎপন্ন। তাই আমি এই ছন্দের নাম দিয়েছি "যৌগিক"। এর বিশ্লেষণ-প্রণালীটি লক্ষ্য করলেই এ নামকরণের সার্থকতা বোঝা যাবে।

দিনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, সমাপন।

প্রচলিত প্রথায় বল্‌তে হয় এর প্রথম পংক্তিতে আঠারো এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে আট 'অক্ষর'। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির হিসেবেও প্রথম লাইনে আঠারো অক্ষর পাওয়া যাবে না—পাওয়া যাবে সতেরো অক্ষর। কাজেই এটিকে আঠারো 'অক্ষরের' পয়ার বলা সঙ্গত হবে না। কিন্তু যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণকে এক ব্যষ্টি অর্থাৎ unit এবং বিশ্লিষ্ট উচ্চারণকে দুই ব্যষ্টি ধ'রে হিসেব করলে প্রথম পংক্তিতে মোট আঠারো এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে আট ব্যষ্টি পাওয়া যাবে—কেন না ভৈঃ, মন্, কার্ এবং নায়্,—এই চারটি বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিতে দুটি দুটি ক'রে unit বা ব্যষ্টি ধরতে হবে এবং পক্ষান্তরে "অন্ধকার"-এর 'অন্' এই যুগ্মধ্বনিটির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট ব'লে এটির ওজন মাত্র এক ব্যষ্টি। অতএব এ ছন্দকে পয়ার-জাতীয় ছন্দ না ব'লে যৌগিক (অর্থাৎ Composite) ছন্দ বলাই সমীচীন মনে হয়।

এবার রবীন্দ্রনাথের কথিত দ্বিতীয় শাখার অর্থাৎ সচল বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে কি নাম দেওয়া যায় দেখা যাক্। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দকে 'প্রাকৃত ভাষার ছন্দ' নাম দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ভাষারীতি অনুসারে ছন্দের নামকরণ অসার্থক, কারণ তাতে ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা হয় না। তা-ছাড়া, এ ছন্দে মাঝে মাঝে অ-প্রাকৃত অর্থাৎ সাধু-ভাষার ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যথা—

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব।
—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সেকাল।

এ ছন্দকে কখনও কখনও 'ছড়ার ছন্দ'ও বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ নামেও ছন্দের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয় না, শুধু এর উৎপত্তির ইতিহাসটুকুই ব্যক্ত হয়। এ ছন্দের বিশেষ ধ্বনিরূপটি প্রধানত' এর প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে সন্নিবিষ্ট সিলেব্‌ল্-সংখ্যাকে আশ্রয় ক'রেই আত্ম-প্রকাশ করে এবং প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারেও সিলেব্‌ল্-সংখ্যা গুণেই কবিরা সাধারণত' এর হিসেব রেখে থাকেন। সুতরাং এ ছন্দকে syllabic ব'লে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। আর সিলেব্‌ল্-এর ধর্ম্মই এই যে, প্রতি সিলেব্‌ল্-এ একটি মাত্র যুগ্ম বা অযুগ্ম স্বর অর্থাৎ vowel থাকেই। কাজেই এই syllabic ছন্দকে আমি নাম দিয়েছি 'স্বরবৃত্ত'। কিন্তু এই ছন্দের স্বরূপ এবং মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে এখনও ছান্দসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এ-বিষয়ে কতক-গুলি চিন্তনীয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। এ-সম্বন্ধে অন্য সময়ে আরো কয়েকটি কথা বল্‌ব।

রবীন্দ্রনাথের কথিত তৃতীয় শাখা অর্থাৎ সংস্কৃত পদ্ধতিতে যে-ছন্দের ধ্বনি-পরিমাণের হিসেব রাখা হয় সে-ছন্দকে "মাত্রাবৃত্ত" নামে অভিহিত করতে পারি। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরু-গাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি।

—রবীন্দ্রনাথ, সহজপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ), পৃঃ ৫১।

এটি হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত পয়ার। এর প্রতি-পংক্তিতে আছে চৌদ্দ মাত্রা এবং এর মাত্রা পরিমাণের পদ্ধতি এবং সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি অবিকল এক। কাজেই এ-ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রের নজিরে "মাত্রাবৃত্ত" নাম দেওয়াই সঙ্গত মনে করি।

অতএব রবীন্দ্রনাথের কথিত বাংলা ছন্দের তিনটি শাখাকে যথাক্রমে যৌগিক (composite), মাত্রাবৃত্ত (quantitative) এবং স্বরবৃত্ত (syllabic)—এই তিন নামে অভিহিত করা যায়।

বাংলা ছন্দের এই তিনটি বিভাগের কথা বহুকাল যাবৎ বাংলার কবি এবং ছান্দসিকরা স্বীকার ক'রে আস্‌ছেন। কিন্তু আধুনিক কালে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ-বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন, (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পৃঃ ৩০-৩১)। কিন্তু অমূল্যধন বাবু বাংলা ছন্দে তিনটি ঢঙের অস্তিত্ব স্বীকার করেন (ঐ, পৃঃ ৩১ এবং ৪১)। তিনি যাকে বলেছেন ঢঙ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন শাখা এবং আমিও তাকেই বল্‌ছি ধারা, বিভাগ বা শ্রেণী। অমূল্যধন বাবু এই প্রসঙ্গে 'প্রকার' শব্দ ব্যবহার করতেও দ্বিধা-বোধ করেননি, অর্থাৎ বাংলায় তিন 'প্রকার' ছন্দ প্রচলিত আছে—এ-কথাও তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু শাখা, বিভাগ বা শ্রেণী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি কোথায় বোঝা যায়নি।

২

পয়ার-জাতীয় সাধু-ছন্দের (অর্থাৎ আমার কথিত যৌগিক ছন্দের) বৈশিষ্ট্য কি, সে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি উক্তি করেছেন তাও লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি বলেছেন, "বোঝা সামলিয়ে ধীর-পদক্ষেপে তাদের চাল", "পয়ার-ছন্দের বিশেষ গুণ এই যে, তার বুনোনি ঠাস্ বুনোনি নয়, তাকে বাড়ানো কমানো যায়।...পয়ার-ছন্দ স্থিতিস্থাপক ব'লেই এটা সম্ভব—", "স্থিতিস্থাপকতা ছাড়া পয়ার-জাতীয় ছন্দের আর দুটি মহদ্‌গুণ আছে। এক তার ভারবহনশক্তি, আর তার গাম্ভীর্য্য।...এতটা ভারবৃদ্ধি যে সম্ভব হয় তার কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক।" (উদয়ন—বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৫-৬)। এই উক্তিগুলি থেকে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতে এ-ছন্দের প্রধান গুণ হচ্ছে চারটি—যথা, স্থিতিস্থাপকতা, ভারবহনশক্তি, গতির মন্থরতা এবং গাম্ভীর্য্য। আরও তলিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যাবে এ-ছন্দের আসল গুণ হচ্ছে মূলে দুটি, স্থিতিস্থাপকতা ও মন্থরতা। বাকি দুটি হচ্ছে গৌণ। কেন না, রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এর ভারবহনশক্তি স্থিতিস্থাপকতা গুণ থেকেই উদ্ভূত, আর তার গাম্ভীর্য্যও তার গতির মন্থরতারই ফল।

প্রথমত' এ-ছন্দের গতির মন্থরতা ও তজ্জাত গাম্ভীর্য্যের হেতু কি দেখা যাক্। ছন্দের (বিশেষত' যৌগিক ছন্দের) গতিবেগ প্রধানত' নির্ভর করে তার চালের উপর। প্রত্যেক ছন্দেই তার পর্ব্ব-সমাবেশের ভঙ্গী থেকে একেকটি বিশেষ চালের উদ্ভব হয়। এই পয়ার-জাতীয় সাধু ছন্দে প্রধানত' তিন রকম চাল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও প্রকারান্তরে তার উল্লেখ করেছেন। এই চাল-তিনটিকে যথাক্রমে অর্দ্ধপর্ব্বিক, পূর্ণপর্ব্বিক এবং যুক্তপর্ব্বিক চাল বলা যায়। দৃষ্টান্ত—

(১) কেন | তার | মুখ | ভার | বুক |
ধুক | ধুক
চোখ | লাল | লাজে | গাল | রাঙা |
টুক্ | টুক্।

—রবীন্দ্রনাথ, উদয়ন—বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৫।

এ হচ্ছে অর্দ্ধপর্ব্বিক চাল। কেন না, এখানে প্রতি অর্দ্ধপর্ব্বের অর্থাৎ দুই unit-এর পরেই একটি ক'রে ছেদ রয়েছে। এ-দৃষ্টান্তটিতে একটিও যুক্ত বর্ণ নেই। যুক্ত বর্ণ ব্যবহার ক'রেও এ-চাল রক্ষা করা যায়। যথা—

তর্ক | যুদ্ধে | উগ্র | তেজ | শেষ |
যুক্তি | গালি

—রবীন্দ্রনাথ, পরিচয় — মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩৮৫।

এবার পূর্ণপর্ব্বিক চালের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

(২) সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে।

—রবীন্দ্রনাথ, উদয়ন, ঐ।

বেণীবন্ধ | তরঙ্গিত | কোন্ ছন্দ | নিয়া
স্বর্ণবীণা | গুঞ্জরিছে | তাই সন্ধা- | নিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ, পরিচয়, ঐ, পৃঃ ৩৮৪।

এই দুটি দৃষ্টান্তেরই চাল পূর্ণপর্ব্বিক। অর্থাৎ এর প্রতি পর্ব্বে চার unit। অথচ একটিতে যুক্তবর্ণ একেবারেই নেই, আরেকটিতে বহুল পরিমাণে আছে। এবার যুক্তপর্ব্বিক চালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(৩) নিখিল আকাশ ভরা | আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে | লভিল প্রতিমা।

—রবীন্দ্রনাথ, পরিচয়—মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩৮৩।

নিঃস্বতা-সঙ্কোচে দিন | অবসন্ন হ'লে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা | নেয় তারে কোলে।

—ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৮৫।

একটি দৃষ্টান্ত যুক্তবর্ণহীন, অপরটি যুক্তবর্ণবহুল। কিন্তু ছন্দের চাল উভয়ত্রই যুক্তপর্ব্বিক। অর্থাৎ একেবারে আট unit-এর পর প্রথম ছেদ বা বিরাম।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রতি মনোযোগ দিলে দেখা যাবে যে, সবগুলিতে ছন্দের গতিবেগ সমান নয়। যুক্ত-পর্ব্বিক চালেই ছন্দের গতি সব চেয়ে মন্থর, অতএব সব চেয়ে গম্ভীর। পূর্ণপর্ব্বিক চালের ছন্দে গতি দ্রুততর এবং গাম্ভীর্য্যও অপেক্ষাকৃত কম। আর অর্দ্ধপর্ব্বিক চালে ছন্দের গতি অতি দ্রুত এবং তার গাম্ভীর্য্যও নিঃশেষিত। বস্তুত' রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই অর্দ্ধপর্ব্বিক চালকে "দুল্‌কি চাল" ব'লে অভিহিত করেছেন এবং এই হাল্‌কা ভঙ্গীর দুল্‌কি চালে যে "পয়ারের পদমর্য্যাদার লাঘব হয়"—এ কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। এ-কথা প্রয়োজন যে, একমাত্র চালই নয়, যুগ্মধ্বনির প্রাচুর্য্য এবং অপ্রাচুর্য্যও এ ছন্দের গতিবেগ ও গাম্ভীর্য্যকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। এ স্থলে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহোক্, দেখা গেল যে, মন্থরতা এবং গাম্ভীর্য্য এ ছন্দের অত্যাজ্য লক্ষণ নয়। প্রয়োজন মতো এ ছন্দকে যেমন মন্থর এবং গম্ভীর ক'রে তোলা যায়, তেমনি প্রয়োজন মতো একে চপল এবং চটুল ক'রে তোলাও অসম্ভব নয়। তাই দেখা যায় এই একই ছন্দে ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা রচনা করেছেন পাঁটা ও তপ্‌সী মাছের উপর এবং মধুসূদন রচনা করেছেন মেঘনাদবধের মতো গুরুগম্ভীর মহাকাব্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি চাল ছাড়া এ ছন্দের আরেকটি চাল আছে যাকে বল্‌তে পারি সার্দ্ধপর্ব্বিক চাল। এ চাল সার্দ্ধপর্ব্ব অর্থাৎ ছয় unit-এর পর ছেদ স্থাপিত হয়। যথা—

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী | মানব যাহারা
সেই বংশোদ্ভব | জাতি কি ইহারা ?

—হেমচন্দ্র, কবিতাবলী, ভারত সঙ্গীত।

প্রাচীন কবিরা এই সার্দ্ধপর্ব্বিক চালের ছন্দ বহুল পরিমাণেই ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথের কানেই সর্ব্বপ্রথম যৌগিক ছন্দে এই সার্দ্ধপর্ব্বিক চালের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ল। তদবধি তিনি যৌগিক ছন্দে এই সার্দ্ধ-পর্ব্বিক চালকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রে তার স্থলে যথাত্র-পর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। আর এ বিষয়ে বাংলা দেশের সকল আধুনিক কবিই তাঁর অনুসরণ করেছেন। ফলে আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যৌগিক ছন্দের সার্দ্ধপর্ব্বিক চাল সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হয়েছে। আধুনিক কালে এ ছন্দের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-য়। যথা—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি',
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অমৃদ-
নিনাদে। (শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ চালের ছন্দ প্রসন্নমনে রচনা করেননি। তিনি এই সার্দ্ধপর্ব্বিক চালকে "দায়ে প'ড়ে অত্যাচার" ব'লে বর্ণনা করেছেন। 'অনাথপিণ্ডদ' নামটার খাতিরেই নাকি বাধ্য হ'য়ে তাঁকে যৌগিক অর্থাৎ সাধু পয়ার-জাতীয় ছন্দে এই সার্দ্ধপর্ব্বিক চালের ব্যবহার করতে হয়েছিল (উদয়ন—বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৭-৮)। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের "নিয়ম রদ" না ক'রেও 'অনাথপিণ্ডদ' নামটার মাত্রিক মর্য্যাদা পুরোপুরিই রক্ষা করা যেত, অবশ্য যথাত্রপর্ব্বিক ছন্দে নয়, তিন-চারের সপ্তমাত্রিক ছন্দে। যথা—

বুদ্ধ-প্রভু লাগি ভিক্ষা আমি মাগি,
শোন গো পুরবাসী কে কোথা আছ জাগি',
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অমৃদ-
নিনাদে।

এ কথা বলা আবশ্যক যে, "প্রভু বুদ্ধ লাগি" ইত্যাদি ধরণের ছন্দকে সাধারণ পয়ারের বিশেষ একটি 'চাল' মাত্র মনে না ক'রে পয়ার বা যৌগিক ছন্দের একটি প্রকারভেদ ব'লেও গণ্য করা চলে এবং বোধ করি সে-রকম গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত।

যা হোক্, এবার 'পয়ার-শ্রেণীয়' ছন্দের স্থিতি-স্থাপকতা ও ভারবহনশক্তি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলব। এর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন—

(১) শ্রাবণের কালো ছায়া নেমে আসে
তমালের বনে
যেন দিক্-ললনার গলিত কাজল বরিষণে।

(২) বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হোলো
অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্তচক্ষু দিগ্বধূর গলিত কজ্জলে।

—উদয়ন, বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৬।

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি একটিও নেই। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে শব্দ মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির বাহুল্য এবং এই যুগ্মধ্বনিগুলির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট, আর এদের ধ্বনি-মর্য্যাদাও একেক ব্যষ্টি বা unit মাত্র। অথচ উভয় দৃষ্টান্তেই শব্দান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট আর তাদের মূল্যও দুই unit ক'রে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি এ-ছন্দে শব্দান্ত-বর্ত্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট অথচ শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট। যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট এই দুই উচ্চারণরূপের সংযোগে এই ছন্দ গঠিত ব'লেই একে 'যৌগিক' নাম দিয়েছি। এ-ছন্দে সাধারণত' যে সাধুরীতির ভাষা চলে সেটা কৃত্রিম এবং তাই এ-ছন্দের কোনো স্বাভাবিক তরঙ্গ-ভঙ্গী নেই বল্‌লেই হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় "পয়ারের একটানা চালের মধ্যে" স্বাভাবিক শক্তি নেই। তাই এ 'ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে-পদে ঝঙ্কৃত কোরে' এর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে হয়েছে। কিন্তু এই উপায়টাও কৃত্রিম, তাই "সাধু ভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে" লাগতে হয় (উদয়ন—বৈশাখ, ১৩৪১, পৃঃ ৯)। কেন না, এ ছন্দের ভাষার মধ্যেই স্বভাবত' কোনো জোর নেই। যাহোক্, এই কৃত্রিম উপায়ে যুগ্মধ্বনির আমদানী ক'রে এ-ছন্দে যে শক্তির সঞ্চার করা যায় তা উপেক্ষণীয় নয়। মেঘনাদবধ, বলাকা প্রভৃতি গ্রন্থে এ-ছন্দের যে শক্তি দেখা যায় তা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। আর, এ-ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির বহুল ব্যবহারের আরও একটি ফল হয়। শব্দান্তবর্ত্তী বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি এবং শব্দমধ্যবর্ত্তী সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সংযোগে এ-ছন্দের স্বভাবত' নিস্তরঙ্গ একটানা চালের মধ্যে একটা চমৎকার তরঙ্গায়িত ভঙ্গী এবং অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য দেখা দেয়। তাই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শক্তিশালী কবিরা যুগ্মধ্বনির সুনিপুণ সন্নিবেশের দ্বারা এ-ছন্দে বহু বিভিন্ন প্রকারের সুর ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

[আগামীবারে সমাপ্য]

প্রতিযোগিতার গল্প

[দ্বিতীয় পুরস্কার]

হাটের কথা

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ধূলি-ধূসরিত একখানি গ্রাম্য পথ—একেবারে রুলটানা লাইনের মত সোজা। কত ছোট-ছোট সহর, কত গ্রাম, কত কুঁড়ের গা ঘেঁসে, জলা-বন পেরিয়ে এই রামনাথপুরের বুকের উপর পথটা যেন একভাবে থাকতে না পেরে, একেবারে হাই তুলে আলিস্যিভাঙ্গার মতন বেঁকে পুব মুখো লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে চ'লে গেছে। কতদূর গেছে কেউ জানে না, কিন্তু গ্রামের যারা সহরের বাজারে কিছু বেচতে যায়, তারা বলে—পথটা না কি সুরু হ'য়েছে সহরের কোল থেকে।

রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে ঠিক সেইখানটায় প্রকাণ্ড বটগাছটা পথের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তলাটা দিন-রাত বেশ ছায়া-শীতল ক'রে রাখে। শনিবার ও মঙ্গলবারের হাটটা তাই এই খানটায় বসে।

সমস্ত দিনটা ক্রেতা ও বিক্রেতার অবিরাম ভীড় লেগেই থাকে। বিকি-কিনির একটানা কলরোলের সাথে গাছের কাকগুলোর ডাক হাওয়ায় মিশে ভেসে যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত। ভিনগাঁয়ের লোকেরাও তখন বুঝতে পারে যে, হাট ব'সেছে।

কিছুক্ষণ বাদে রাস্তার পাশের বড় মাঠটার দিকে চেয়ে দেখা যায় একটী একটী ক'রে লোক সার বেঁধে, সরু একফালি পায়ে চলা পথ দিয়ে চলতে সুরু ক'রে দিয়েছে হাট লক্ষ্য ক'রে।

ঘুরে ঘুরে, ধান-ক্ষেতের আল ভেঙে, ছোট ছোট খাদ পার হ'য়ে আসতে তাদের অনেক দেরী হয়। দেখে মনে হয়—তারা বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছে।

মাঠ পেরিয়ে প্রথম যে দলটা হাট ক'রতে হাটে এসে পৌঁছয়, তাদের মধ্যে দু'টী ছেলের ওপর নজর অনেকেরই পড়ে। একজনের চেহারার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু না থাকারই মধ্যে। কিন্তু তবু যেন মন মানতে চায় না, তারপর তার চোখটা দেখে মনে হয়, বাঃ, এইটাই যেন খুঁজছিলাম!

আর একটী মিশ-কালো। যেন একটা কালো পাথরকে কুঁদে তার দেহটী তৈরী হ'য়েছে—এমনই তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। মাথার উপর পারিপাট্যবিহীন কালো চুলে তাকে দেখায় আরও ভাল।

দু'জনের মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে তা তাদের কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা যায়। কালো ছেলেটী একটা বাজরা হাতে ক'রে দোলাতে দোলাতে বন্ধুকে নিয়ে সেই ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়। বট গাছটার ঠিক তলায় যেখানটায় রাশীকৃত পটলের স্তূপ দেখা যায় সেই দিক্‌টা লক্ষ্য ক'রে দু'জনেই ভীড় কাটিয়ে অগ্রসর হয়।

হরিশপুরের নন্দ মোড়ল একজন বড় চাষি। নন্দ মোড়ল একরাশ আলুর সাম্নে থেকে ডেকে বলে—"ও দাসের পো, শোন শোন—শুনে যাও একবার।"

দাসের পো অর্থাৎ সেই কালো ছেলেটী—হাসতে হাসতে একাই ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে, "কি ব'লতেছ গো?"

নন্দ তখন বেশ জোর গলায় বলে, "আলু নিয়ে যাও, বেশ সস্তা ক'রে দেব 'খন।"

দাসের পো হেসে বলে, "আজ আর আলুর হাট ক'রব নি।"

নন্দ বিস্ময়ের সুরে বলে, "কেন গো?"

ছেলেটী বলে, "আলু আর এখন চলে নে, যতটা—"

নন্দ চাষি তার মুখের কথা শেষ করবার অবসর না দিয়েই বলে, "আলু ছাড়া বার মাস চল্ আর কিছু আছে না কি?—আরে নন্দ চাষি তাহ'লে আর আলুর চাষ ক'রতু নি।"—ব'লে বেশ একটা গর্ব্বের ভঙ্গী করে।

ছেলেটী তখন বলে, "না গো না, আমি কি তাই বলতিছি। এখন পটলের মরশুম, পটল বেচলে দু'পয়সা থাকে—পটলের এই উঠতি মুখ কি না।"

নন্দ চাষি বলে, "আরে পটলের আজ আগুন দাম, যাও না দরটা নিলেই বুঝতে পারবে 'খন। কিন্তু আমার কাছে যদি আলু নাও তবে তিন টাকা ক'রেই দোব। বাজারে কিন্তু স-তিন দর।"

ছেলেটীর সঙ্গীটী ততক্ষণ অপেক্ষা করছিল একটু দূরে। এবার সে ডাকে, "হেই, আয় না রে!"

কালো ছেলেটী তার দিকে চেয়ে প্রথমে বলে, "যাই!" তারপর হাতের বাজরাটা তুলে বন্ধুকে নিয়ে পটল-চাষিদের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে।

দু'জনেই সেই রাশীকৃত পটলের সম্মুখে মেয়ে দাঁড়ায়, তারপর কালো ছেলেটী ভীড় ঠেলে নেড়চে জিজ্ঞাসা করে, "কি দর গো?" কে একজন বলে, "আট টাকা!"

ছেলেটী আবার জিজ্ঞাসা করে, "কম-সম কিছু হবে?" তার উত্তর কি যে দেয় তা আর গোলমালে ভাল বোঝা যায় না।

তারা দু'জনে আরও এগিয়ে যায়—একেবারে বটগাছটার মোটা ডালটার যেখানে শেষ।

এখানটায় চাষিরা বসে না। যারা চাষিদের কাছ থেকে কিনে বেচে তারাই এখানটায় বসে—কিন্তু দু'-চারজন মাত্র। একেবারে শেষাশেষি ব'সে আছে একটী মেয়ে—সাম্নে তার পাঁচ-ছটা কুমড়ো বসান। কালো ছেলেটী বন্ধুর গা টিপে মেয়েটীকে দেখিয়ে বলে, "ও রে, এর কথাই ব'লেছিনু!"

সাঙাতটী তার বড় বড় চোখ দু'টী বিস্ফারিত ক'রে দেখে—রূপ তার না থাকলেও শ্যামবর্ণ মুখটায় ছিরি আছে বটে! বয়স আন্দাজ ক'রে মনে মনে সে বলে, "আঠার কি উনিশ হবে ব'লেই মনে হয়।" তারপর মেয়েটার সিঁথি সিন্দুর-শূন্য দেখে, বিস্মিত সুরে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, "ও কি রে!"

ইতিমধ্যে মেয়েটার দৃষ্টি এদের পানে পড়ে যায়। সে ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে কালো ছেলেটীকে কাছে যেতে ডাকে। দু'জনেই ধীরে ধীরে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েটী দু'খানা ইট দেখিয়ে বলে, "বস না ইট দু'টো টেনে।" তারপর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে ছেলেটীর দিকে চায়।

কালো ছেলেটী ব'লে ওঠে, "এ আমার সাঙাত। আমাদের পাশের গাঁয়ে থাকে, মাকে দেখতে এসেছেল।"

মেয়েটী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, "মা তোমার কেমন আছে গা?" মেয়েটার চোখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

মায়ের কথায় বিষাদ-ভারাক্রান্ত স্বরে বলে, "আছে সেই একই রকম। পয়সার অভাবে চিকিচ্ছে হ'চ্ছে না। এমন পয়সা নেই যে, এক বোতল পাঁচন কিনে খাওয়াই। দু'দিন হ'ল জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে।"

মেয়েটী শঙ্কা-ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করে, "কার কাছে রেখে এলে?"

উত্তরে ছেলেটী বলে বাড়ীর পাশে কে এক পিসি আছে তারই জিম্মায় রেখে সে হাটে এসেছে। হাট থেকে কিছু কিনে সে সহরে যাবে বিক্রি ক'রতে—ফিরবে সে সেই কাল। কি-ই বা করে পেট ত' তাকে চালাতেই হবে!

সমবেদনায় মেয়েটীর বুকটা যেন টন টন ক'রে ওঠে, বলে, "আহা!" তারপর সে ধীরে ধীরে বলতে সুরু করে, "মা যে কি জিনিষ তা যার মা নেই সেই জানে।" আট বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। ন' বছর বয়সে সে বিধবা সেজে যখন মার কাছে ফিরেছিল, তখন তার মা না কি এমন কেঁদেছিল যে, সে রকম কান্না কাউকে আর কাঁদতে দেখে নি। মা থাকলে তবু কাঁদবার লোকটা থাকে।

ছেলেটী বলে, "তবে উঠি! আবার হাট শেষ ক'রে সহরে পৌছতে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে।"

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করে, "কি কিনবে?"

উত্তর হয়, "যদি পটল সুবিধে পাই নোব।"

মেয়েটী বলে, "পটল কিনতে যেয়ে থামকা ঘোরা-ঘুরি করবে, পটলের দর আজ আট টাকা। বাবা খানিক আগে ব'লছেল। সে তুমি কিনতে পারবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর না, আমার এই কুমড়োগুলো নে যাও—বেচতে দেরী হবে না। সহরে নে ফেল্লে খপ্ ক'রে বিক্রি হ'য়ে যাবে—আজ রেতেই ঘর ফিরতে পারবে 'খন।"

ছেলেটী বলে, "তোমার এ কুমড়ো খুব ভাল বটে, কিন্তু ও কি আমি কিনতে পারব—আমার অত পয়সা নেই।"

মেয়েটী বলে, "আজ কুমড়োর দর ত' মাটির দর!"

ছেলেটী কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে কথাটার সত্যাসত্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করে আগে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটার কাছ থেকে একটু দূরে স'রে যেয়ে ডাকে, "সাঙাত, শোন!"

সাঙাত তাড়াতাড়ি উঠে এসে ঘাড়টাকে কাত ক'রে, কথাটা শোনবার ভঙ্গীতে বলে, "কি, বল!"

ছেলেটী চুপি-চুপি কি একটা কথা সাঙাতকে বলে। মেয়েটী তা শুনতে না পেয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে কালো ছেলেটীর মুখের পানে। সাঙাতটী ততক্ষণে ভীড়ের দিক লক্ষ্য করে চলতে সুরু করে।

ছেলেটী আবার পূর্ব্বের স্থানটীতে যেয়ে বসে। মেয়েটী এবার চারদিক চকিতে একবার দেখে নেয়, তারপর নিচু গলায় আব্দারের সুরে বলে, "কি ব'লে ওকে, বল না লক্ষীটী!"

মৃদু হেসে ছেলেটী বলে, "এমন কিছু নয়—ওকে একটু হাটটা ঘুরে আসতে বলনু।"

মেয়েটীর বিশ্বাস হয় না। তাই বলে, "কথ্খনো নয়। সত্যি ক'রে বল না, কি বললে চুপি চুপি!"

ছেলেটী অন্য কথা পাড়ে, বলে, "তোমার বাবা কোথায়?"

মেয়েটী উত্তর দেয় না, মুখ গোঁজ ক'রে রাস্তাটা যেদিকে সহরে চ'লে গেছে সেই দিকে চেয়ে থাকে।

ছেলেটী পুনরায় প্রশ্ন করে, "তোমার বাবা কোথায় বল না গো।"

মেয়েটী গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, "ওই অমনে কুমড়ো বেচতিচে।"

ছেলেটী এবার কোমল স্বরে বলে, "রাগ হল বুঝি?"

মাথার উপরকার হোগলার ছাউনির ফাঁক দিয়ে একটু একটু ক'রে রোদ এসে প'ড়ে মেয়েটার মুখটী রাঙা ক'রে তোলে। ছেলেটী দেখতে পেয়ে বলে, "রোদটা থেকে একটু স'রে বোস—"

মেয়েটী চুপ ক'রে ব'সেই থাকে। ছেলেটী তখন উঠে দাঁড়িয়ে সেই ফাঁকটুকুতে হোগলাটা চাপা দিয়ে বন্ধ ক'রে পুনরায় ব'সে পড়ে।

সহসা দেখা যায় পশ্চিম দিক্‌টার আকাশটা মেঘে মেঘে একেবারে কালো হ'য়ে গেছে। মেঘের আগে আগে ছুটে আসছে এক বিষম ঝড় আর ঝড়ের আগে আগে আসছে একরাশ ধূলো আর পাতা। ক্রমশঃ সেই ধূলি-রাশি ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধতর আকাশে ব্যাপ্ত হ'য়ে সম্মুখের মেঘগুলিকে যে রূপ দেয় তা অপরূপ, অনির্ব্বচনীয়!

এক হাট কর্ম্মচঞ্চল লোকের মাঝে আর একটা চঞ্চলতা দেখা যায়, এই ঝড়টাকে উপলক্ষ্য ক'রে। সকলেই বলে, "সামাল! সামাল!"

ছেলেটী তখন আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে কিন্তু আশ্রয় পাবার যে একটী মাত্র খোড়ো চালের ছাউনীটা ছিল তা তৎক্ষণে মনুষ্যে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে। ঝড়ের অগ্রদূতের মতন ঠাণ্ডা ও এলো-মেলো বাতাসগুলো এবার যেন সকলকে সাবধান হ'তে ব'লে ঘোরাঘুরি করে। মেয়েটী তখন আসন্ন ঝড়ের দিকে চেয়ে কি ভাবে কে জানে! আশে পাশের লোকগুলির মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণে বটগাছটার গোড়ায় আশ্রয় নেয়। মেয়েটী হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়, ছেলেটীকে ব্যস্ততার সহিত বলে, "ওঠো, হোগলাটা খুলে খপ ক'রে মাথায় দে বোস।"

ছেলেটী ক্ষিপ্রতার সহিত হোগলাটাকে এমন ভাবে ঢাকা দেয় যে, দু'জনাই তাতে বেশ ঢাকা পড়ে। সমস্ত কোলাহল ডুবে যেয়ে তখন উন্মত্ত বায়ুর জয়ধ্বনি কেবল শোনা যায়। তারপর প্রকৃতির যে প্রলয় নাচন সুরু হয়, তা এই দু'টী ছেলে-মেয়ে জানতে পায় না, এমনি তারা উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্যে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে।

এমন দিনটী তারা পাবে ব'লে বুঝি আশা করে নি। এই অমূল্য সময়টীকে অবলম্বন ক'রে পরস্পরে হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলতে চায় তারা, কিন্তু বেশী পারে না—বুঝি সঙ্কোচ হয়। ছেলেটী হোগলাটার দিকে চেয়ে বলে, "যেন একখানি ঘর!"

এ-কথায় কি আছে জানি না কিন্তু দেখা যায় মেয়েটী মাথাটা নামিয়ে কুমড়োর গাটা নখে ক'রে খুঁটতে থাকে। তারপর ছেলেটী মেয়েটীর পরণের কাপড়টাকে লক্ষ্য ক'রে বলে, "তা যাই বল, তোমায় খান প'রে মোটে মানায় নে।"

মেয়েটীর মুখে ঈষৎ হাসি দেখা যায়—বলে, "কি পরলে মানায়?"

ছেলেটী বলে, "লালপাড় কাপড়।"

মেয়েটীর মুখ নিমেষে করুণ হাসিতে ভ'রে যায়। তারপর বলে, "দূর! আমায় কি পরতে আছে?"

ছেলেটীর মুখ দেখে তখন মনে হয়, সে যেন কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেছে। উভয়ের মধ্যেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। তারপর ছেলেটী কথার মোড় ফিরিয়ে বলে, "আচ্ছা, গেল হাটে তুমি দশ টাকা দরের পটলটা আমায় আট টাকা দরে দিয়ে মিছি-মিছি, খামকা বাপের ঠেঁয়ে ভাল মন্দ গালাগালগুলো কেন খেলে বল দেখি? মেহন্নতের জিনিষ কি অমন ক'রে অপচ করে!"

মেয়েটী বলে, "ভুল ক'রে অমনতর হ'য়েছেল।"

ছেলেটী এবার যেন মরীয়া হ'য়ে বলে, "ভুল কখ্খনো নয়। আমি জানি তুমি ইচ্ছে ক'রে আমার জন্যে অমনতর ক'রেছেলে।"

মেয়েটীর প্রাণ এ-কথার প্রতিবাদ ক'রতে চায় না—তার চোখ মোহে ভ'রে আসে। তবুও ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে মাটির দিকে চেয়ে বলে, "না-না, তা কেন? তুমি আমার কে বল না যে, তোমার তরে অত করব!" ছেলেটী এ-কথায় বেশ যেন দ'মে

যায়, তাই তার মুখ দিয়ে আর কথা ফোটে না। মেয়েটী এই বিশ্রী নীরবতাকে ভঙ্গ ক'রে বলে, "তুমি এই কুমড়োগুলো নে যাও—এ ক'টা দু'আনা দরে দিয়ে দিনু।"

বাইরের ঝড় তখন থেমে গেছে। ছেলেটী তারই দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, তারপর বলে, "কবে থেকে এত সস্তা হ'ল?"

ও-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটী বলে, "খপ ক'রে পয়সা দিয়ে, কুমড়োগুলো তুলে নিয়ে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরিয়ে পড়—পথ তেতে গেলে কিন্তু কষ্ট হবে।"

ছেলেটী বলে, "সাঙাত আগে এসুক।"

মেয়েটী আব্দার ক'রে বলে, "ঝড় থেমে গেছে। তুমি এ ক'টা নিলে পর সকাল সকাল ঘর যেতুম।"

ছেলেটী কি ভেবে কোমর থেকে গেঁজেটা বা'র ক'রে কুমড়োগুলোর দাম হিসেব করে, "চার দু'গুণে আট আর চার দু'গুণে আট, হল গিয়ে পুরুপুরি একটাকা।"—ব'লে গেঁজের পয়সাগুলো হাতের তেলোয় রেখে রেখে গোণে। তারপর বলে, "হলু নি তবে; দু'আনা কম একটাকা র'য়েছে যে।"

মেয়েটী তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, "তা হোক গে, তুমি দু'আনা পরে দিও খন।" তারপর হোগলাটা দেখিয়ে বলে, "ওটা মাচাতনে তুলে বসিয়ে দাও।"

ছেলেটী প্রথমে তাই করে, তারপর গেঁজের পয়সাগুলো হুড় হুড় ক'রে মেয়েটীর সামনে ঢেলে দিয়ে, কুমড়োগুলো বাজরায় সাজিয়ে সাঙাতের অপেক্ষায় ব'সে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় সাঙাত এসে কালো ছেলেটীর পিঠের কাছ ঘেঁসে ব'সে গেছে। কালো ছেলেটী তখন জিজ্ঞেস করে, "কি দর দেখ্‌লি?"

সাঙাত বাজরার কুমোড়গুলো দেখিয়ে বলে, "অমনগুলো চার আনা চোদ্দ পয়সা ক'রে।"

এবার ছেলেটী মেয়েটীর দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, "এই রকম ক'রে তুমি তোমার জিনিষ নোকসান ক'রে বেচবে, আর আমি তাই নোবো! দাও আমার পয়সা ঘুরিয়ে—আমি কুমড়ো কিনবো নি!" মেয়েটী তৎক্ষণে পয়সাগুলো আঁচলের খুঁটটায় বাঁধতে থাকে।

ছেলেটী এবার কি করবে ভেবে না পেয়ে বলে, "আচ্ছা, তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল না কি! যেটার বাজার-দর চার আনা চোদ্দ পয়সা ক'রে, সেটা তুমি দু'আনা ক'রে ত' দিলে; কিন্তু বাপ যখন জিগুসিবে, 'কত ক'রে বেচলি?' তখন কি জবাব দেবে?"

মেয়েটী এবার রসিকতা ক'রে বলে, "ব'লব, অমুক গাঁয়ের একটী ছেলে দাম না দিয়ে সব নে গেছে।"—বলেই হাসতে থাকে। ছেলেটী রুখে বলে, "না, তোমার বকুনী খেয়েও কাজ নেই, আমারও বদনামে কাজ নেই। তোমার কুমড়ো নোব নি, পয়সা ফেরত দাও, নইলে কোন দিন পাঁচটা কথাই হয়ত ব'লে ফেলবে, তোমরা হ'লে গিয়ে মেয়ে-জাত!"

মেয়েটীর মুখ, এই কথাগুলি শুনে প্রথমে গম্ভীর হ'য়ে ওঠে, তারপর সে সহজভাবে, ধীরে ধীরে তার বাপ যেদিকে পটল বেচে সেই দিকে চ'লতে সুরু করে।

ছেলেটীর আজ কি হ'য়েছে কে জানে, সে এবার গো ভরে উঠে যেয়ে মেয়েটীর আঁচলটা টেনে দু'রে বেশ জোরের সহিত বলে, "পয়সা না দিয়ে যেতে দোব নি কখ্খনো। কেন তুমি আমার জন্যে খামকা নোকসান দেবে, আমি তোমার কে? আর তা ছাড়া মেয়ে মানুষে দয়া ক'রে কিছু দেবে, সে আমি নিতে পারবু নি।"

মেয়েটীর চোখ-মুখ প্রথমে লাল হ'য়ে ওঠে, তারপর শেষের দিকের কথাগুলো যেন চাবুকের মত তার বুকে যেয়ে আঘাত করে। হঠাৎ আগুনের মত জ্ব'লে উঠে মেয়েটী চিৎকার ক'রে বলে, "পাজি, নচ্ছার বেটাছেলে কমনে কার, লজ্জা করে না মেয়ে মানুষের কাপড় ধ'রে টানাটানি করতে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েচ?" তারপরেই জোর ক'রে ছেলেটীর হাতের

মুঠো থেকে একটান মেরে কাপড়টা ছাড়িয়ে হন্-হন্ ক'রে তার বাপের কাছে যাবার জন্যে চ'লতে থাকে।

ছেলেটা যেন এ ব্যাপারের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তাই একেবারে মূঢ়ের মতই চেয়ে থাকে মেয়েটার পানে।

দু'-একজন লোকও জ'মে যায় এই ব্যাপারে। কেউ দোষ দেয় ছেলেটার, কেউ কটাক্ষপাত করে মেয়েটার চরিত্রের উপর। ছেলেটার সাঙাত এবার ধীরে ধীরে উঠে আসে, তারপর ছেলেটার হাত ধ'রে বলে, "তুই সহরে যাবি কখন? বেলা যে এক'পর হ'ল রে! নে নে, বাজরা তোল মাথায়!"—এই ব'লে তাকে বাজরার কাছে টেনে নিয়ে, বাজরাটা ধরা-ধরি ক'রে তার মাথায় বসিয়ে দিয়ে দু'জনেই পথ চলতে সুরু ক'রে দেয়।

মেয়েটা বাপের পাশে দাঁড়িয়ে হাটভরা লোকের ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পায়, দু'টা ছেলে সোজা রাস্তাটা ধ'রে পাশাপাশি চ'লেছে, একজনের মাথায় একটা বাজরা। দু'জনের পদক্ষেপে পথের ধুলোটা একটু একটু ক'রে উড়ে ক্রমশঃ হাওয়ায় বিলীন হ'য়ে যায়। এক ঝাঁক হাটের লোক মেয়েটার দৃষ্টি-পথে ব্যবধান সৃষ্টি করে। মেয়েটার বাপ ততক্ষণে একটু ফুরসৎ পায়, বলে, "কি রে, কুমড়ো সব শেষ ক'রে দিয়েচিস?" মেয়েটা ঘাড় নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ।"

বাপ বলে, "কত ক'রে বেচলি? দে, পয়সাগুলো দে।" মেয়েটা এবার ধীরে ধীরে আঁচলটাকে পিঠ থেকে নামিয়ে কাপড়ের গেরোটা খুলতে থাকে।

ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে আবার মেয়েটা দেখতে পায়, খুব দূরে যেখানটায় পাঁচ-ছটা খেজুর গাছ রাস্তার পাশে কোল ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক কাছাকাছি দু'টী ছেলে তখনও পাশাপাশি পথ চলে। হঠাৎ বাপ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, "কাপড়ের গিঠ খুলতে তোর জন্ম কেটে গেল!" মেয়েটা চম্‌কে ওঠে। তারপর পয়সাগুলো তার বাপের হাতে আস্তে আস্তে দেয়। বাপ পয়সাগুলো গুণে চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলে, "আর কই রে?" মেয়েটা চুপ ক'রে থাকে।

এবার তার বাপ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, "মোটে চোদ্দ আনা! আর পয়সা কি করলি?"

এবার মেয়েটা কথা কয়, বলে, "খেয়ে ফেলেছি।"

তার বাপ অপরূপ মুখভঙ্গী ক'রে হাত নেড়ে বলে, "বড্ড কাযটাই করেছ! চোদ্দ আনা পয়সায় চোদ্দ-পুরুষ তোমার একবারে উদ্ধার হ'য়ে যাবে।"

রোদে ব'সে ব'সে বাপের মাথার ঠিক থাকে না, তাই রাগের মাথায় একটু বকাবকি করে। খানিক পরে মেয়েটার জন্য আবার কষ্টও হয়।

মেয়েটা তখন আগেকার বটতলাটার তলায় একটা বাঁশের খুঁটিতে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দূরে—বহুদূরে, পথের যেখানটায় জোড়া তালগাছটা তার উঁচু মাথা দু'টোকে আকাশে ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারই নীচের দু'টী মানুষের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এত দূর থেকে তাদের চেনা যায় না বটে, কিন্তু তাদের ভিতর যে একজন বাজরা মাথায় ক'রে পথ চলে, তা এখনও বোঝা যায়। মেয়েটা এবার দেখতে পায় তাদের একজন পথ ছেড়ে মাঠে নেমে চলতে সুরু ক'রেছে, একদম পথের দিকে পিছন ক'রে। মেয়েটা বুঝতে পারে সে সাঙাত, গ্রামের পথ ধ'রেছে। তারপর দেখা যায় কালো ছেলেটী হাটের দিকে মুখ ফিরিয়ে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ কি দেখে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবার কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ছুটতে সুরু ক'রে দেয়।

যতক্ষণ দেখা যায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখে, তারপর ক্রমশঃ যখন সেই চলমান মূর্ত্তিটী গাছের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে যায়, আর দেখা যায় না—তখন দেখা যায় মেয়েটার সেই অপলক চোখ দু'টী জলে ভ'রে গেছে। তারপর সহসা সেই জল ঝর-ঝর ক'রে দু'টী গাল বেয়ে ঝ'রে পড়ে। বাপ মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে এই দিকটা এসে মেয়েকে দূর থেকে দেখতে পায়। কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বুড়ো জিজ্ঞাসা করে, "রাগ করলি?"

মেয়েটা চম্‌কে দেখে তার বাপ।

চোখে জল দেখতে পেয়ে বাপ আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, "কাঁদছিস কেন?"

মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বলে, "খামকা তুমি আমায় ভালমন্দ কথাগুলো শোনালে কেন?"

বাপ মনে মনে ভাবে, এমন কি-ই বা ব'লেছে তার মেয়েকে, যাতে ক'রে চোখে জল আসতে পারে! তবুও মিষ্টি কথা ব'লে মেয়েকে নিজের পাশটীতে নিয়ে যেয়ে বসায়। একমাত্র বিধবা মেয়ে কি না!

গাজনের সময় এসে পড়ে। লক্ষ্মীকান্তপুরে যে গাজনের মেলাটা বসে তাতে জাঁক-জমক হয় খুব। কত গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে গাজনের সন্ন্যাসীরা এক হাঁটু ধুলো নিয়ে গাজনতলায় একটী একটী ক'রে সমবেত হয়। কত অপরিচিত পরস্পরে পরিচিত হয় এ জায়গায়। কত অপরিচিতের বহুদিন পর মিলন হয় এই স্থানটীতে।

এক সময় দেখা যায় সেই কালো ছেলেটীও গাজনতলায় ঘোরা-ফেরা করে। পরণে তার নক্সাপাড় কাপড় আর মাথায় একটা গামছা জড়ান, হাতও খালি নেই—একটা লাঠি থাকে হাতে।

এদিক ওদিক করতে করতে হঠাৎ সেই মেয়েটীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় পথে। দু'জনেই প্রথমে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর ছেলেটী পাশ কাটিয়ে আবার চলতে সুরু করে। মেয়েটী পিছু থেকে ডেকে বলে, "শুনছ গা?"

দূর থেকেই ছেলেটী বলে, "কি, বল না!"

এবার মেয়েটী একটু হেসে বলে, "কাছে আসতে ভয় করে না কি?"

বিদ্রূপের সুরে গম্ভীরভাবে ছেলেটী উত্তর দেয়, "তা এক্ষুণি হাঁক-ডাক ক'রে কইলেই হ'ল যে, আমার কাপড় ধ'রে টেনেছে!" মেয়েটীর মুখ নিমেষে কালীবর্ণ হ'য়ে যায়, কিন্তু তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তারপর বলে, "তা ব'লে যে খামকা মিথ্যে ক'রেও দোষ দোব তা দোব নি।"

ছেলেটী এবার ওর কথায় অবাক হ'য়ে যায়, বলে, "সেদিন আমি তোমার কাপড় ধ'রেছেলাম সে বুঝি টানাটানি ক'রবার তরে!"

মেয়েটী তখনি উত্তর করে, "আমিও চেঁচামেচি ক'রেছিনু সে কাপড় টানা-টানির তরে নয়।"

এবার ছেলেটী ব্যঙ্গ ক'রে বলে, "তবে কি আমার সুনামের তরে সেদিন একহাট লোকের সামনে গণ্ডগোল সুরু ক'রেছেলে?"

মেয়েটী এবার একটু ক্রুদ্ধ হ'য়েই বলে, "সুনাম তোমার হয় নে, আমারও হয় নে; বরং আমার বদনাম হ'য়েছেল, কেন না আমি বিধবা মেয়ে, আমার দোষটা সবলোক তাই বেশী ক'রে দে'খেছেল।"

ছেলেটী গভীর বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করে, "তবে তুমি সেদিন খামকা অমন ক'রেছেলে কেন?"

তার উত্তরে মেয়েটী বলে, "বিশ্বেস ক'রবে নে সে কথা।"

ছেলেটী বলে, "কি এমন কথা যে বিশ্বেস হবে নে।"

মেয়েটী বলে, "পুরুষ মানুষের যে বিশ্বেস নেই, আর কথায় কথায় তারা যে অবিশ্বেস আগে করে, তা আর জানতে বাকী নেই।"—এই ব'লেই সে নিজের গন্তব্য পথে চলতে সুরু ক'রে দেয়।

ছেলেটী এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়েটীর পথরোধ ক'রে বলে, "কিন্তু কেন সেদিন তুমি আমায় অমন ক'রেছেলে তা তোমাকে ব'লে যেতেই হবে—আর সত্যি ক'রে বলতে হ'বে। মনে থাকে যেন এটা গাজনতলা, এখানে মিথ্যে কইতে নেই!"

মেয়েটী তার প্রশান্ত চোখ দু'টী ছেলেটীর মুখের পানে তুলে ধ'রে বলে, "কেন—জানতে চাও?" তারপর একটু থেমে বলে, "তোমার ভালর তরে।"

কথা শেষ ক'রেই সে ভীড়ের মধ্যে কখন যে মিশিয়ে যায় তা ছেলেটী জানতেও পারে না—মেয়েটীর

কথায় সে এমনই অবাক হ'য়ে যায়। আকাশ-পাতাল ভেবেও সে খুঁজে পায় না কোন্ খানটায় তার ভাল করা হ'য়েছে। ভাবতে ভাবতে সে এত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে যে, পথে যেতে যেতে কত লোকের গায়ে গা লেগে যায়। দু'একজন গালাগালও দেয়, কিন্তু আজ সে তা গায়ে মাখে না। অন্যদিন হ'লে সে তাদের মাথা ফাটিয়ে ছাড়ত। হঠাৎ সামনা সামনি একটী লোক পথ আগলে বলে, "কি গো! দাসের পো যে!" চমক ভেঙে সে দেখে—নন্দ চাষি। নন্দ জিজ্ঞাসা করে, "সন্ত্যেস নিলে নে যে!"

ছেলেটী বলে, "মায়ের তরে মানত্ ক'রেছিনু, তা মা ত' মারা গেছে—তাই আর—" ব'লে ছেলেটী একটু করুণ হাসি হাসে।

নন্দ বলে, "তা ক'হাট ত' আমার ঠেঁয়ে আলু নে গেলে, তা বলি বেচলে কেমন?"

ছেলেটী বলে, "কই আর তেমন কিছু হয় নে—শেষে কম লাভে পাইকারি বেচে ঘরকে ফিরতে হ'ল।"

নন্দ ছেলেটীর তেলে পাকান লাঠিটা দেখিয়ে বলে, "লাঠিটা বেশ বানিয়েছ দেখছি! গুনেচি তুমি না কি ভাল লাঠি খেলতে পার! তা ঘণ্টাখানেক পরে এস না হৈ ও গাবতলাটায়—হোথা আজ খেলা হবে যে।"—ব'লে মাঠের উপরকার বহু দূরের একটা ঝাঁকড়া মাথা গাবগাছ দেখিয়ে দেয়।

ছেলেটী হেসে বলে, "সেই তরেতেই এটাকে নেইছি।"—ব'লে একটু গর্ব্বের সহিত লাঠিটা বার-কতক মাটিতে ঠোকে।

নন্দ চাষি তার পিঠটা চাপড়ে বলে, "বেশ বেশ, ভাল কথা! তা হ'লে চলি—আবার গাবতলায় দেখা হবে।"

ছেলেটী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঝাঁপ দেখতে চ'লে যায়। শত কোলাহলের মধ্যেও সে মেয়েটীর সেদিনকার অদ্ভুত ব্যবহারের কোন ভাল কারণ খুঁজে পায় না—তবুও ভাবে।

দণ্ডী খাটা শেষ হ'য়ে গেলে দেখা যায় গাবতলার মাঠটায় ক্রমে ক্রমে ভীড় বেশ জ'মে ওঠে। কেউ বলে তামাসা হবে, কেউ বলে লাঠিখেলা। শেষ পর্য্যন্ত দু'টোই হয়, কিন্তু লাঠিখেলাটা হয় আগে। দু'চার জন খেলবার পর নন্দ চাষি ডাকে, "দাসের পো, এবার নামো।"

ছেলেটী জিজ্ঞাসা করে, "খেলুড়ী কে?"

নন্দ বলে "ননে বাগ্দী।"

ছেলেটী বুঝি কিছু ভাবতে থাকে, তাই খেলুড়ীর নাম তার কানে যায় না—জিজ্ঞাসা করে, "কি ব'ললে?"

নন্দ ননে বাগ্দীর নাম ফের করে। ছেলেটী বলে, "ননের সঙ্গে খেলে আর করব কি। সেই সেবারের বিষ্টুপুরের মেলায় আমার কাছে হেরে গেল। তিনের বাড়ি শেষ ক'রে চারের বাড়িতেই ননের মাথা লাল ক'রে ছেড়ে দিয়েছিনু।"—ব'লে একটু গর্ব্বের হাসি হাসে।

নন্দ ঘাড় নেড়ে বলে, "না গো না, সে ননে আর নেই, এখন সে রহিম সেখের চেলা!"

ছেলেটী হেসে বলে, "তাই না কি! তবে দেখাই যাক্ এবার।"—ব'লে মালকোছা বেঁধে, কোমরে গামছা জড়াতে জড়াতে লাঠি হাতে ক'রে মাঠের মাঝটা ঘেয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ বাদে ননে বাগ্দীকেও মালকোছা বেঁধে ধীরে ধীরে মাঠে নামতে দেখা যায়। ননের মুখে চোখে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটে ওঠে। দাসের পোর দিকে চেয়ে নন্দ চাষি দেখে সে যেন কেমন মন-মরা, কেমন অন্যমনস্ক!

এই দু'টী নবীন খেলোয়াড়ের নামে গাবতলার মাঠটা মানুষে মানুষে ভর্ত্তি হ'য়ে যায়।

দু'জনেই বিচারকের আদেশের অপেক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

কালো ছেলেটী তখনও মেয়েটীর সেদিনকার ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই ক'রে উঠতে পারে না। সে মনে মনে আশ্চর্য্যবোধ করে এই ব'লে যে, সেদিন

মেয়েটীর চেঁচামেচিতে তার উপকারটা হ'য়েছে কোথায়! অথচ মেয়েটির কথায় সে অবিশ্বাস করতে মোটেই পারে না, কারণ সে তাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে—ভালবাসে। তবুও সে অন্ধের মত কারণ নির্ণয় করতে যায়—কিন্তু হদিস্ মেলে না। বিচারক খেলবার অনুমতি দেবার পরও সে সুন্নমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছেলেটীকে মাথা নীচু ক'রে মাটির দিকে একভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সমবেত দর্শকদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়।

কেউ বলে, "গুরুকে চিন্তা করছে।"

কেউ বলে, "ননেকে অপগেরাজ্জি!"

নন্দ চাষি কিন্তু বুঝতে পারে যে, দু'টোর কোনটাই নয়; তাই সে ভীড় ঠেলে ছেলেটীর কাছে ঘেয়ে পিঠে হাত দিয়ে, ধীরস্বরে বলে, "দাসের পো, একটু সাবধানে খেলো।" ছেলেটী চমক ভেঙে লজ্জিতভাবে একটু হাসে। নন্দ চাষি পুনরায় সাবধান হ'য়ে খেলবার পরামর্শ দিয়ে চ'লে যায়। তারপর উভয়েই আপন গুরু ও লাঠিকে প্রণাম ক'রে খেলতে সুরু করে।

দু'জনে পরস্পরে খেলায় যে কসরৎ দেখায় তা দেখে গাজনতলার লোকেরা তারিফ ক'রে বলে, "হ্যাঁ, অনেক বছর এমনটী দেখি নি বটে!"

খেলা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তের সুযোগ গ্রহণ ক'রে ননে যে আঘাত ছেলেটীর মাথা লক্ষ্য ক'রে করে, ছেলেটী তা প্রতিরোধ করবার সময় পায় না। লাঠির আঘাতটাকে সামলাতে ছেলেটীর একটু সময় যায়, তারপর চেয়ে দেখে তার মাথা বেয়ে যে রক্তটা পড়ছে তা তার পরণের কাপড়টাকে লাল ক'রে দিয়েছে!

পিছন থেকে কে একজন ধ'রে রাখে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সে চিনতে পারে—সে নন্দ মোড়ল। নন্দ অনুযোগের সুরে বলে, "বলনু একটু সাবধানে খেল—তা আমার কথা—" বলে থেমে যায়। ছেলেটী কোনো উত্তর দেয় না। কোমর থেকে গামছাটা খুলে মাথাটা যা-তা ক'রে বাঁধতে বাঁধতে গাজনতলার দিক লক্ষ্য ক'রে চলতে সুরু করে। নন্দ জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় যাবে?"

ছেলেটী বলে, "গাঁয়ের লোকের কাছে।"

নন্দ সঙ্গে যেয়ে পৌছে দিতে চায়। সে অসম্মতি জানিয়ে বলে, সে একা খুব যেতে পারবে।—তারপর চলতে সুরু করে। খানিকটা পথ অতিক্রম ক'রে থেকে থেকে যে তার পা টলতে থাকে তা সে মাথার যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেশ বুঝতে পারে। পথ চলতে চলতে মাথার রক্তস্রাবটা বাড়তেই থাকে। তবুও সে অগ্রাহ্য ক'রেই চলতে থাকে। মাঠটা পার হ'য়ে এসেই তার মনে হয় পা দু'টো বড় অবশ—মাথাটাও যেন ঘুরতে থাকে।

অপরিচিতেরা অবাক হ'য়ে তার রক্তমাখা দেহটার দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে।

গাজনতলার কাছটায় দু'চারখানা কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে চলতে চলতে সে ঘরগুলোর ভিতর দিকটায় দেখে নেয়, যদি কোন গ্রামের লোকের নজরে পড়ে। সে জানে আশপাশের গ্রাম থেকে যারা আসে তারা এই ঘরগুলিতে ঠাঁই নেয়।

অবিরাম রক্তপাতে ক্রমশঃ সে এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে যে, তার আশঙ্কা হয় সে প'ড়ে যাবে। দু'-একখানি ঘর অতিকষ্টে সে পার হয়। তারপর তার মনে হয় ক্রমশঃ যেন ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখটায় রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে। গাজনতলার কল-কোলাহল তার কানে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যায়, তারপর সহসা সে জ্ঞানহারা হ'য়ে যে ঘরটীর সামনে লুটিয়ে পড়ে, সে ঘরটীতে আমাদের সেই মেয়েটী থাকে।

গাজনতলার গোলমালকে ছাপিয়ে ক্ষণেকের জন্য যে গোলমালটা এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে শোনা যায়, তা দু'চার জনের কানেই যায়। মেয়েটী সেই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে শঙ্কিত চিত্তে বাইরে এসে যা দেখে তাতে তার সমস্ত গায়ের লোমগুলো খাড়া হ'য়ে ওঠে।

তিন-চারজন লোকে ধরাধরি ক'রে ছেলেটীকে তুলে মেয়েটীর দাওয়ায় শুইয়ে দেয়। মেয়েটী বারণ ক'রে বলে, "এখানে নয়, ঘরের ভেতর নে চল।"

সাহায্যকারীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কেউ হয় না কি, বাছা?"

মেয়েটী মাথা নেড়ে বলে, "হ্যাঁ।" কিন্তু কে হয় তা বলে না। মেয়েটীর তত্ত্বাবধানে ছেলেটীকে রেখে, দু'-একটী উপদেশ দিয়ে সকলে ধীরে ধীরে বার হ'য়ে যায়। তারপর মেয়েটী যা সেবা-শুশ্রূষা করে তা বুঝি কাউকে সে কোন দিন করে নি।

মেয়েটীর বাপ কার মুখে খবর পেয়ে ছুটে আসে। ছেলেটীকে দেখে বুড়ো ভাবে—যেন চেনা চেনা! মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, "একে তুই চিনিস্?"

মেয়েটী এবার মিথ্যা কথা বলে—বলে, "না।"

তারপর বুড়ো বাপ যখন মাথার ক্ষতটা দেখে বলে, "ইস্! মাথাটা কিসে কাটল রে? বড় বেশী কেটেছে দেখছি।" তখন মেয়েটীর চোখে যে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে, বুড়ো তা মোটেই দেখতে পায় না। বাপ খানিকক্ষণ মাথার ক্ষতটার দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবে, তারপর মেয়েকে বলে, "তুই ওকে দেখ, আমি বন-ধনের পাতা নে আসি।"—ব'লে চ'লে যায়।

মেয়েটীর যত্নে ছেলেটীর জ্ঞান হয়। জায়গাটা দেখে সে কোন রকমেই চিনে উঠতে পারে না। তারপর মাথার শিয়রে মেয়েটীকে দেখে একটী একটী ক'রে সমস্ত কথা তার মনে প'ড়ে যায়। ছেলেটী শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ কত কি ভাবে, তারপর জিজ্ঞাসা করে, "এ কার ঘর?"

মেয়েটী উত্তর দেয়, "আমাদের।" এই অত্যন্ত সাদাসিধে কথাটায় এমন কি যে থাকতে পারে জানি না,—দেখা যায় ছেলেটীর দু'গাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে। মেয়েটী উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করে, "কাঁদছ কেন? কষ্ট হচ্ছে?"

ছেলেটী ঘাড় নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ।"

আবার প্রশ্ন হয়, "কোথায়?"

এবার ছেলেটী মেয়েটীর মুখের পানে জল-ভরা চোখ দু'টী রেখে, মেয়েটীর একখানি হাত বুকের উপর টেনে নিয়ে বুঝিয়ে দেয় তার কোন্ বেদনাটা বড়। মেয়েটী এবার সব বুঝতে পারে তাই মাটির দিকে চেয়ে লজ্জায় একেবারে রাঙা হ'য়ে ওঠে। তখনি সে ধীরে ধীরে নিজের হাতটী ছেলেটীর বুক থেকে সরিয়ে নেয়। ছেলেটীর চোখে জল কিন্তু আর বাঁধ মানে না। সেই আগের মতই চোখ-ভরা জল নিয়ে মেয়েটীকে উদ্দেশ ক'রে বলে, "আমি তোমার কে যে, তুমি আমার জন্য অত করছ? আমি তোমার পর বৈ ত' কিছু নয়! আমার ওপর এত দয়া না করলে মরতুম না নিশ্চয়!" আবেগে তার স্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে। একটু থেমে আবার সে সুরু করে, বলে, "আর মরলেই বা কার কি, কাঁদবার লোক ছিল মা—তাও সে ক'দিন আগে গাঁয়ের শ্মশানে শেষ ক'রে দিয়ে এসেছি। এখন কাকে নিয়েই বা বেঁচে থাকবো!"

রুদ্ধ আবেগে সে আর কোন কথা কইতে পারে না।

এবার মেয়েটী আর সামলাতে পারে না। যে গোপন কথাটী নিজের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে এতদিন সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছিল তা আজ ব্যথার রূপ নিয়ে বাইরে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। মেয়েটী হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নীরবে কাঁদতে থাকে। ছেলেটী প্রথমে বুঝতেই পারে না যে, এ কান্নার অর্থ কি! তাই জিজ্ঞাসা করে, "তোমায় ত' আমি কিছু কই নি, তুমি কাঁদতেছ কেন?" এ কথায় মেয়েটী আর থাকতে পারে না, ফুলে ফুলে আরও কাঁদতে থাকে।

ছেলেটীর চোখে সমস্ত ব্যাপার আলোর মত স্বচ্ছ হ'য়ে পড়ে। সান্ত্বনা দেবার ভাষাও খুঁজে পায় না; বুঝি ইচ্ছেও করে না। কান্নাটাকে এমনি ক'রে দেখতেই যেন সাধ হয়।

মেয়েটী কিন্তু এত শীঘ্র সামলে নেয় যে, আশ্চর্য্য বোধ হয়। উভয়েই ক্ষণকাল নীরবে অতিবাহিত করে। মেয়েটী নিজেকে সামলে ত' নেয়ই এমন কি কথার

মোড়টাকে পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়ে ব্যাপারটাকে সহজ করবার জন্য বলে, "উপরি উপরি ক'হাট হাটে যাও নি কেন?"

ছেলেটী হেসে উত্তর দেয়, "হাটে আমি বরাবর যেতুম, কিন্তু তোমার কাছে যাই নি।"

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করে, "কেন?"

"তোমার কাছে যাবো নি ব'লে দিলেশা গেলেছিল্।"—ব'লে ছেলেটী মৃদু মৃদু হাসে।

মেয়েটী মিনতির সুরে বলে, "এবার কিন্তু যেও। আর আমি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তবে ঘাট মানছি।" ছেলেটীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করে, "যাবে ত'?"

এবার উত্তর হয়, "হ্যাঁ, যাব।"

মেয়েটীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বলে, "মনে থাকে যেন, গাজন তলায় মিথ্যে বলতে নেই।"

ছেলেটী এবার মেয়েটীর হাতটা ছুঁয়ে বলে, "তোমায় ছুঁয়ে বলছি যাব, নিযোস যাব।"

এমন সময় বাইরে মেয়েটীর বাপের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়—বলে, "ওহে নন্দ, শোন, শোন!"

ঘরের ভিতর থেকে বেশ শোনা যায়। নন্দ কাছে এসে বলে, "কি বলতেছ গা?"

বুড়ো বলে, "আমার ঘরে একটা ছেলে মাথা ফেটে বেহুঁস পড়ে আছে, আমিত চিনি না। তা তুমি দেখত চিনতে পার কি না!"

নন্দ ব্যস্তভাবে বলে, "কই? কই?" তারপর দু'জনের পায়ের শব্দ ঘরের দিকে আসতে থাকে। ছেলেটী এবার ঘুমের ভাণ করে, মেয়েটী একটু স'রে বসে। নন্দ চাষি যখন কাছে এসে বলে যে, সে ছেলেটাকে খুব ভাল ক'রেই চেনে, তখন বুড়ো মাথা ফাটবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। নন্দ লাঠি খেলার ইতিহাসটী ব'লতে সুরু ক'রলে ছেলেটী আবার ধীরে ধীরে চোখ খোলে। এবার নন্দ চাষি তাকে ভর্ৎসনা ক'রে বলে, "তুমি বাবু বড় একগুঁয়ে, আমার কথা কিছুতে শুনলে না তখন!" কিছুক্ষণ পরে বন-ধনের পাতাগুলো বেঁটে ছেলেটীর মাথায় বেশ করে বেঁধে দেওয়া হয়। বৈকাল বেলা যখন রোদের তেজ কম হয়, তখন নন্দ চাষি জিজ্ঞাসা করে, "এবার চলতে পারবে?"

ছেলেটী বলে, "খুব!"

নন্দ জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় যাবে?"

উত্তর হয়, "ঘর।"

নন্দ মোড়ল বলে, "চল তোমায় মাঠটা পার ক'রে দিয়ে আসি।" তারপর দু'জনে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটী এবার ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা নিয়ে এগিয়ে ধ'রে বলে, "লাঠিটা!"

ছেলেটী একবার তার মুখপানে চেয়ে দেখে, তারপর লাঠিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে বরাবর বাজারের দিকে চ'লতে সুরু ক'রে দেয়। মেয়েটী ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখে, তারপর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে আসে।

পথে যেতে যেতে খাবারের দোকানগুলি দেখে ছেলেটীর মনে প'ড়ে যায় আজ তার ভাল ক'রে খাওয়া হয় নি। তাই নন্দকে বলে, "মোড়ল, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেয়ে নি?"

মোড়ল বলে, "তা বল না, কি খাবে, কিনতিছি। পয়সা আমিই দোব খন।"

ছেলেটী রহস্য ক'রে বলে, "তা হলে আজ দেখছি বরাত জোর!"

নন্দ চাষি একখানা দোকান থেকে যে আমচুরের তেলে ভাজা খাবার এনে ছেলেটীর হাতে দেয় তা যেমন কদাকার তেমনি অপদার্থ—তা ঐ পল্লীগ্রামের লোকেরা বেশ সানন্দচিত্তে খায়। ছেলেটী হেসে বলে, "মোটে ঐ ক' পয়সার খাবার খাইয়ে নাম কিনতে চাও বুঝি?"

নন্দ মোড়ল বলে, "এই অবেলায় আর কত খেতে পারবে, নইলে খাওয়াতুম।"

ছেলেটী পূর্ব্বের মত হাসতে হাসতে একটা কচুরি

বোঝাই ঝোড়া দেখিয়ে বলে, "ঐটে একেবারে খালি ক'রে দিতে পারি!"

নন্দ মোড়ল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "ইস্! তা হ'লে আর ভাবনা ছেল না।"

স্ফূর্তির বশেই ছেলেটী যেন রুখে বলে, "যদি পারি?"

নন্দ চাষি বলে, "খাওয়া ছাড়া এক টাকা বাজী।"

ছেলেটী সম্মত হ'য়ে সেই এক ঝোড়া কচুরি তরকারী সমেত খেতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

লোক জমে যায় অনেক। কেউ বলে পারবে না, কেউ বলে পারবে। শেষ পর্য্যন্ত পারলে বটে!

নন্দ চাষি অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে, "কি ক'রে খেলে তার ঠিক নেই!" তারপর ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বের ক'রে ছেলেটীর দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বলে, "এই নাও!"

ছেলেটীর মন যেন খুশীতে ভরপুর—বলে, "ও আর তোমায় দিতে হবে না মোড়ল!"

মোড়ল সামান্য আপত্তি ক'রে বলে, "সে কি কথা! তোমায় কথা দিনু!"

ছেলেটী বলে, "তোমার ঘরের ছেলে-মেয়েদের তরে ও দে কিছু কিনে নে যেও, আমার ও দরকার নেই।"

সহসা ছেলেটী অস্তাচল-পথাভিমুখী সূর্য্যের দিকে চেয়ে বলে, "মোড়ল তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, সন্ধ্যের আগে ঘর পৌঁছুতে হবে।" তারপর দু'জনেই পাশাপাশি মাঠের আল ভেঙে চলতে থাকে। আধাআধি পথে ছেলেটী থেমে বলে, "আর তোমায় যেতে হবে নে মোড়ল, আমি ঠিক চ'লে যাব, তুমি ঘর যাও।"

নন্দ চাষি বলে, "আবার তেমন ক'রে ঘুরে পড়লে কি হবে!"

ছেলেটী এবার হেসে বলে, "আর তা হবার যো কি! তুমি যা খাইয়ে দিয়েছ!"

নন্দ বলে, "তা হ'লে আমায় আর যেতে হবে নে ত'?"

উত্তর আসে, "না।" তখন দু'জনেই মাঠের মাঝ থেকে পরস্পরের কাছে বিদায় নেয়। একজন চলে পুব মুখো, একজন পশ্চিমে।

নন্দ চাষি যেতে যেতে শুনতে পায় ছেলেটী মনের স্ফূর্ত্তিতে গান ধ'রেছে—

"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী
উড়ে গেল আর এল না—"

নন্দ মোড়ল মনে মনে হাসে, বলে, "ছেলেটার প্রাণে খুব স্ফূর্ত্তি আছে বটে, সরলও খুব বলতে হবে; নইলে গোটা বাজীর টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেয়! অন্য কেউ হ'লে, বাব্বা!"

ছেলেটী সেই জনবিহীন মাঠের মাঝে অস্তমান সূর্য্যের অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে, এক কল্পনা জগতে বিচরণ করতে করতে তখনও গায়—

"বল সখী কোথা যাব,
কোথা গেলে পাখী পাব—"

নন্দ চাষি আবার পিছন ফিরে দেখে দূরে—বহুদূরে, গাছের মাথায়-মাথায় গ্রীষ্মবেলার অপরাহ্নের শেষ রশ্মিটুকু তখনও এক অপরূপ ছন্দে লীন হ'তে থাকে; আর তারই তালে তালে পা ফেলে তেলে পাকান লাঠিটা কাঁধে তুলে, ছেলেটী হেলে দুলে গাইতে গাইতে যায়—

"পুলিশে কি খবর দেব—"

শেষটা আর শোনা যায় না, কেবল একটা সুরের রেশ হাওয়ায় ভেসে মাঠের কিনারে কিনারে ঘুরতে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে সমস্ত মাঠ, বন পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলে।

যে মারাত্মক ব্যাধিটা ঠিক এই সময় সমস্ত গ্রামে গ্রামে দেখা দেয়—সকলকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তোলে, তার নাম চলতি কথায় বলে 'কলেরা'। সেই রাত্রেই ছেলেটার রোগের লক্ষণ, উপসর্গগুলি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে গ্রামের হাতুড়ে-বদ্যি রোগীর সামনেই যে রোগটার নাম করলে তাও না কি 'কলেরা'। রোগের নাম শুনে কে কে নিরাশ হ'ল বা হ'ল-না, তা বোঝা গেল না, কিন্তু রোগী নিজে

রোগটার নাম শুনে এমন অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হ'য়ে গেল যে, সে অবস্থা থেকে বস্তির বড়ির এমন ক্ষমতা নেই যে, ফিরিয়ে আনে।

রোগীর কাছে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক পাওয়া ভার হয়, এমনই সকলে ও রোগটাকে ভয় করে। দু'-একজন ছেলেটীর সাঙাতকে ডাকতে যায়। সাঙাত যখন এসে পৌঁছয়, তখন রোগীর জীবনের শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নেই। সাঙাতকে দেখে ছেলেটী অস্পষ্টস্বরে কি বলতে চায়, কিন্তু দু'চোখ বেয়ে জল নামে আর বাক-শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে যায়, বলতে পারে না। সাঙাত তার মুখের কাছে কান নিয়ে যেয়ে বলে, "কিছু বলতেছেলে?"

ছেলেটী কি বলতে চায় কিন্তু প্রথমটা একটা ঘড় ঘড় শব্দ হয়, তারপর শেষবারের মত চেষ্টা ক'রে অতি ক্ষীণস্বরে বলে, "হাট! হা—!" তারপরই দু'গাল বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ে। কে একজন জিজ্ঞাসা করে, "কি বলতেছে গা!"

সাঙাত তখন হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে থাকে—কোন উত্তর করে না। কেউ কেউ বলে, "বিকারের ঘোরে যা-তা বলছে।"

ভোরের আলো পুব আকাশটা রাঙা করবার আগে একটী তরুণ প্রাণ বুকভরা ভালবাসা, বুকভরা অতৃপ্তি, অসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোন্ অজানা লোকে যাত্রা করল কে জানে! শ্মশান থেকে দাহ ক'রে বাড়ী ফেরবার পথে ছেলেটীর একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র সুহৃদ সেই সাঙাতের কানে অবিরত বাজতে থাকে—"হাট!"—আর দু'চোখ জলে ভ'রে আসে।

কত বুকভরা আশা নিয়ে একটী মেয়ে সেই হাটটীতে বাজরা সাজিয়ে কার আসবার জন্যে প্রতি হাটে সমস্ত দিনটী অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকে। কত হাট এই রকমে যায় আসে। মেয়েটীকে তবু সেই এক রকম ভাবেই মাঠটার দিকে চেয়ে থাকতে দেখা যায়।

কে যেন তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, সে আসবে, নিশ্চয় আসবে, তাই সে চেয়ে থাকে। চোখে তার স্থির বিশ্বাসের ভাব। বুঝি যার জন্যে সে অপেক্ষা করছে, সে এল ব'লে। ক্রেতা এসে জিজ্ঞাসা করে, "পটল কি দর গো?"

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার মুখের পানে চেয়ে মেয়েটী বলে, "পটল বিক্রী হ'য়ে গেছে।"

লোকটী মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করে, "কে কিনলে?"

মাঠটার দিকে ইসারায় দেখিয়ে সে অন্যমনস্কের মত বলে, "ঐ মাঠ দিয়ে সে আসবে, এল ব'লে।" লোকটা ততক্ষণে চলে গেছে।

এই রকমে কত ক্রেতা যায়-আসে। কেউ প্রশ্নের উত্তর পায়, কেউ পায় না। কেউ আশ্চর্য্য বোধ করে, কেউ ভাবে হবেও বা!

সমস্ত দিনের পর, হাটের শেষে বুড়ো বাপ ঘরে ফেরবার জন্য মেয়ের কাছে এসে দেখে এক বাজরা পটল যেমন সাজান ছিল ঠিক তেম্নিই আছে। বুড়ো আঁৎকে উঠে বলে, "মুখপুড়ি ক'রেছিস কি? কিছু বেচিস নি?" লোকসানের আশঙ্কায় বুড়ো বাপের মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। বাপ আবার জিজ্ঞাসা করে, "খদ্দের আসে নি কেউ?" মেয়েটী ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, "না!" আবার বলে, "হ্যাঁ!" তারপর মাঠটার যেখানটায় একটা শ্যামরেখা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই দিকে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে পাগলের মত বিড় বিড় ক'রে বলে, "একজন ব'লেছেল সে আসবে, নিশ্চয় আসবে। তার জন্যে রেখে দিছি!" বুড়ো বাপ দিনের শেষ আলোটাতে মাঠটার সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে, সত্যি কেউ আসছে কি না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন চারিদিক গাঢ় ক'রে তোলে, দূরের কিছু দেখা যায় না তখন হঠাৎ মেয়েটী সেই জায়গাটীতে ব'সে প'ড়ে ফুলে ফুলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

প্রেম-কম্পন

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

এ কি রে চিত্ত আজিকে ব্যাকুল,
কেঁপে কেঁপে ওঠে হৃদিতল!
এ কি কিশোরের নব প্রণয়ের
অরুণিমা জাগে জলজল!
এ কি শিহরণ, এ কি রে পুলক,
প্রাণে এ কি সুখ-পরশন!
হিয়ার পরতে পরতে যেন রে
ঘটে অপরূপ জাগরণ!
ভুলেছিনু কি রে প্রণয়-বিলাস?
দূরে গিয়েছিল উচ্ছ্বাস?
ভুলেছি প্রণয়-সাগর-হিলোলে
দুলিবার মহা-উল্লাস?

কে দিল রে আজি নব শিহরণ,
কে আনিল প্রেম-সৌরভ;
পূজাহীন বেদীতলে আজি পুন'
পূজিবার প্রীতি-গৌরব?
কে দিল রে আজ উপা'সী হৃদয়ে
অমিয়ার ধারা-সিঞ্চন?
নিদাঘ-দগধা ধরণী উপরে
আষাঢ়ের বারি-নর্ত্তন!
রসহীন তরুমূলে যেন আজ
কুম্ভ উজাড়ি' দিল জল!
বহু দিবসের হারানো মাণিক
এল আজি যেন করতল!

(ওরে) তাই হোক্ আজি, তাই হোক্ তবে—
আসুক স্বপন-দয়িতা,
গোপনে যতনে হৃদয়-গহনে
যে ছিল সে হোক্ উদিতা!

আসুক সে আজ অতুল মোহন
ভরিয়ে জুড়ায়ে দু'নয়ন;
আঁখি-পথ দিয়ে হৃদয়ে নামুক
তারি হেমরূপ অতুলন!
ভ'রে যাক্ আজ ভ'রে যাক্ ওরে,
তারি রূপে মম সারা বুক;
তারি হাসি আর দিঠি সুচপল
রচুক বিপুল মহা সুখ।
এস এস অয়ি বিনত-নয়না,
মঞ্জু-স্বল্প-ভাষিণী,
পূর্ণ-হৃদয়া, জলভরা মেঘ,
অয়ি ধীর-থির-হাসিনী।
চূর্ণ-অলক-শোভিত-কপোলা,
নয়নে স্বপন-জড়িমা,
দু'টি গণ্ডের কোমল শয়নে
শোভে অনুরাগ-ঘনিমা।
গ্রীবাখানি যেন প্রেমের স্বরগ,
যেন মদনের সুখ-ঠাঁই;
গ্রীবা-গরিমায় ডুবে যেতে চাই;
গ্রীবা ধ'রে যেন ম'রে যাই।
দু'টি কর যেন হৃদয়ের প্রেম
উছসিয়া আসি' বাহিরে
ধরেছে পেলব লতিকা-মুরতি
বাঁধিবারে কারে চাহি' রে।
বসনে গোপন বক্ষ-কমল—
কুয়াশায় ঢাকা নলিনী;
তারও আহ্বানে কেঁপে ওঠে বুক,
সে যে দু'নয়ন-মোহিনী।
এই এই মোর অতুলা প্রেয়সী,
এ যে দিল আজি কম্পন;
প্রেম-কম্পনে জেগে উঠি আজ,
জেগে ওঠে সারা প্রাণ-মন।

কালিম্পঙ ও সিক্কিমে কয়েক দিন

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল্

বক্‌রিদের ছুটির সঙ্গে গুড্-ফ্রাইডের ছুটির যোগ হওয়ায় ১০ দিন ছুটি পাওয়া গিয়াছে—এ সুবিধা কদাচ ঘটে। বিশেষতঃ যাঁহাদের ফৌজদারি-কোর্টের সঙ্গে কাজ-কারবার বেশী, তাঁহাদের পূজা ছাড়া একত্রে ১০দিন ছুটি ভোগ করা অভাবনীয়। এই সব নানারূপ ভাবিয়া একেবারে চিঠির কাগজ লইয়া বসিয়া গেলাম। উদ্দেশ্য—কলিকাতায় আমার এক বন্ধুকে সিক্কিম বেড়াইতে যাঁইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা। উত্তর আসিল তাঁর পক্ষে কলিকাতা ছাড়া এ-সময় বড় কঠিন। সুতরাং তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিয়াই যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইল।

১৯২৬ সালের 'সেভ্রোলে' গাড়ী। ভাবিলাম—পাহাড়ে চড়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। বৎসরে ১ বার, ২ বার বরাবরই দূরের পথ সে পাড়ি দিয়া আসিয়াছে—অনেক দিনের অন্তরঙ্গ—দাগা দিবে না। 'সোফার'কে গাড়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া সঙ্গী ঠিক করিয়া ফেলিলাম। আমার ইচ্ছা এক দিনও নষ্ট করা নয়। কিন্তু সঙ্গীরা 'সবুজের' গণ্ডি পার হ'ন নাই—'টেনিস্-ম্যাচ্‌টা' ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহাদের চলে না। শনিবার বৃথাই গেল। রবিবার বৈকালে 'দুর্গানাম' স্মরণ করিয়া ৪টার সময় রওনা হওয়া গেল। ইচ্ছা—কালিম্পঙ্ গিয়া এক বন্ধুর প্রাসাদে দুই-এক দিন বিশ্রাম করিব ও তারপর সিক্কিম-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্যাঙ্‌টক্ যাত্রা করিব।

দিনাজপুর অবস্থিতি-কালে 'ফুটবল' খেলোয়াড় হিসাবে এই বন্ধুর হাতের তৈয়ারী চা অনেকবার খাইয়াছি। সুতরাং মনে হইল তাঁহার টাকায় তৈয়ারী 'অবসাদ' ভবনে থাকার অধিকারও আমাদের জন্মিয়াছে, বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যখন আমাদের সহযাত্রী। সকলের বয়োঃজ্যেষ্ঠ আমি—বাকি তিন জনই কনিষ্ঠবৎ। সুতরাং 'প্রোগ্রাম' ঠিক করার ভার আমার উপরেই পড়িল।

প্রায় রাত্রি ১০টার সময় কিষণগঞ্জে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ইসলামপুর ডাক-বাংলাতে পৌছিলাম। ইচ্ছা ছিল 'টিটালিয়া' ডাক-বাংলাতে রাত্রি যাপন করি, কিন্তু রাস্তায় খবর পাইলাম যে, ভূমিকম্পে ডাক-বাংলাটি বাসোপযোগী নাই, সুতরাং ইসলামপুর ডাক-বাংলাতেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া ৮টার মধ্যে শিলিগুড়ি পৌছান গেল। চা-পান এবং সেই সঙ্গে কিছু জলযোগ করিয়া গাড়ীতে 'পেট্রোল' ভরিয়া 'ষ্টার্ট' দিলাম। ১০।১২ মাইল দূরে



দূর হইতে কালিম্পঙের দৃশ্য

শেভকের জঙ্গল। শিকারীরা না কি এখানে ভাল শিকারের তল্লাসে আসিয়া থাকেন। সহযাত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মজুমদার বন্দুক 'কেস্' হইতে বাহির করিয়া টোটা ভরিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিলেন। আমাদের মধ্যে তিনিই শিকারী। আমরা আর সকলে ও-বিদ্যায় অজ্ঞ। ভাবিলাম—শিকারের আইনে বুঝি এসব কথা লেখে। যাহা হউক বন্দুক চালাইবার সুযোগ আর তাঁহার হইল না। বেলা ১১টার সময় 'কালাঝোড়া' ডাকবাংলাতে পৌছান গেল। 'ষ্টিয়ারিং-হুইল' আমার হাতে, কিন্তু ক্লান্তি ভায়াদের—চায়ের

তৃষ্ণা তাহাদের আকুল করিয়া তুলিল। ডাক-বাংলাতে গিয়া চা, খাবার ইত্যাদির আয়োজনে ভায়ারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুন্দর দৃশ্য, দুই পাশে উন্নত পাহাড়, মাঝ দিয়া তিস্তা নদী বেগে প্রবাহমানা—এরূপ দৃশ্য ভারতবর্ষে অন্য কোথাও আছে কি না জানি না, কিন্তু মনের মধ্যে ছবি আঁকিয়া দেয়। ডাক-বাংলা বন্ধ। 'নোটিস-বোর্ড' পড়িয়া দেখিলাম যে, এখানকার ডাক-বাংলা 'এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়রে'র পূর্ব্ব-সম্মতি ভিন্ন দখল করা যায় না। ভাবিলাম, যে-দেশের লোক দু'বেলা পুরা খাইতে পায় না তাহাদের এহেন সজ্জিত ডাক্ বাংলাতে না থাকিতে পাওয়াই উচিত। শরীর তাজা করিয়া আবার 'ষ্টিয়ারিং'-এ বসিলাম। তিস্তা ব্রিজে আসিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। 'এঞ্জিনিয়ারিং' কুশলতার চরম—একটি খিলানের উপর পুলটি তৈয়ারী। পূর্ব্বে কালিম্পঙ্ আসার সময় সেতু তৈয়ার হইতে দেখিয়াছিলাম, এবার তৈয়ারী পুল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তিস্তা নদীর দুই পাশের শৈল-শ্রেণীকে সেতু দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, আগাগোড়া 'রি-ইনফোরসড্-কন্‌ক্রিটে'র তৈয়ারী। সাদা রং দেওয়াতে শ্বেত-মর্ম্মরের পুল বলিয়া দূর হইতে ভ্রম হয়। ব্রিজের মাঝখানে গিয়া গাড়ী দাঁড় করাইয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। তিস্তার পর হইতেই রাস্তা বড় চড়াই। বরাবর কালিম্পঙ্ পর্য্যন্ত 'সেকেণ্ড গিয়ারে' গাড়ী চালাইতে হয়—দূরত্ব ১০ মাইল। মাঝে ২।৩ জায়গায় এঞ্জিনের জল বদলাইয়া প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টায় কালিমপঙ্ পৌছান গেল। খবর পাইলাম, 'অবসাদ' ভাড়া দেওয়া হইয়াছে—শরীরেও অবসাদ আসিল। 'হিল-ভিউ' হোটেলে স্থান নাই, হোটেল-কর্ত্তা বাঙ্গালী — আমাদের ড্রয়িং-রুমে জায়গা দিতে চাহিলেন। আমরা ৪ জন—দেখিয়া শুনিয়া সেখান হইতে রওনা দিলাম। রাজাস্রের সন্নিকটে 'ফ্রেণ্ডস্-বোর্ডি'-এ আস্তানা লইলাম। এখানকার অধিকারীও বাঙ্গালী—আদর-যত্নের ত্রুটী হইল না।

সোমবার বৈকালে আবাস-স্থান গুছাইয়া বাহির হইলাম, বাজারে ডক্টর দাসগুপ্তর সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হইল। মোটরখানা ডাক্তারবাবুর সৌজন্যে একটা খালি গ্যারেজে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখা গেল। খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ হীরেন্দ্রনাথের বেশী। সাতকড়িবাবু 'পান' লইয়াই ব্যস্ত। সব দোকানের পান খাইয়া ও তাহাদের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া নির্দ্দিষ্ট দোকান হইতে পান লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। মঙ্গলবারে 'হোম্‌স্' দেখিতে যাওয়া গেল। সঙ্গীদের মধ্যে প্রফুল্ল মজুমদার কালিম্পঙ্ পূর্ব্বে আসেন নাই। বহু শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী এইখানে মানুষ হয় এবং মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর ভারতের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সংখ্যা



কলিম্পঙ্ 'হোম্‌স্'-এর কিছু অংশ

বৃদ্ধি করে। 'হোম্‌সে'র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মিঃ গ্রেহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুঝিলাম—তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অসাধারণ। অশীতিবর্ষ বয়সে তাঁহার কাজ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। 'হোম্‌স্'-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নগ্নপদ, প্রত্যেক কাজটি তাহাদের নিজেদের করিয়া লইতে হয়। নিজের ব্যবস্থা নিজে করা—ইহা তাহাদের শিক্ষার একটি অঙ্গ। 'রোপওয়ে' 'কালিম্পঙ্ হোম্‌স্' পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানকার তৈয়ারী জিনিষ-পত্র মায় পাঁউরুটী ও ফুলের তোড়াও পরের দিন কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা দেখিলাম। হোম্‌সের চাকর-বাকর হইতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সকলেই কাজে ব্যস্ত। বুঝিলাম—কাজের একটা শৃঙ্খলা আছে। গোলমাল হয় না বা করার স্পৃহাও কাহারও মনে জাগে না। ছাত্র-

ছাত্রীরা এক ক্লাস হইতে অপর ক্লাসে যাইবার সময়ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যায়। সব কাজের মধ্যে একটা নিয়ম আছে এবং তাহা রক্ষা করার চেষ্টাও আছে। ফিরিবার মুখে বহু তিব্বতীয়কে খচ্চড়ের উপর মাল বোঝাই করিয়া আসিতে দেখিলাম। কালিম্পঙ্ হইয়া তিব্বত যাওয়ার রাস্তাই সুবিধাজনক



কালিম্পঙ্ বাজার

এবং ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ঐ রাস্তার সাহায্যেই চলে। বিশেষ করিয়া তিব্বত হইতে ভেড়ার লোম ও ভেড়ার শুক্‌না মাংস চালান আসে এবং সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া তিব্বতীয়েরা অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভার খরিদ করিয়া লইয়া যায়। মাড়োয়ারি ভায়ারা সেখানেও বিরাজমান, দেখিলাম — লোমের ব্যবসায়টি তাঁহাদেরই হাতে। ডবল নাম-যুক্ত বড় সাইন-বোর্ড-লেখা গুদাম এবং সুপরিচিত চেহারার লোকও বহু দেখিলাম। বাঙ্গালী ডাক্তার, বাঙ্গালী কেরাণি ও বাঙ্গালী স্কুল-মাষ্টার—ডাক-ঘরের কাজ-কর্ম্মেও বাঙ্গালী দেখিলাম।

'হোম্‌স্' দেখার পর ভায়াদের আর কালিম্পঙ্ ভাল লাগিল না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন সেখানে বিশেষ কিছুই দেখিবার নাই অর্থাৎ 'ম্যাল্'ও নাই 'সিনেমা'ও নাই! সুতরাং জায়গাটা পরিত্যাগ করিবার জন্য আমার উপর তাগিদ চলিতে লাগিল। তাহাদের ভরসা দিয়া বৈকালে খবর সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম, রাস্তায় এক তিব্বতী ব্যবসাদারের সঙ্গে দেখা। নিজের দেশের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। ভারতবর্ষের তুলনায় তিব্বত কিছুই নয় এবং সেখানে লোকের কিরূপ অসুবিধা ও শঙ্কার মধ্যে দিন কাটাইতে হয় তাহারই তালিকা শুনিতে শুনিতে ৪।৫ মাইল রাস্তা বেড়াইয়া আসা গেল। সন্ধ্যায় ডাক্তার দাসগুপ্তের 'ডিস্‌পেন্‌সারিতে' আসিয়া খবর পাইলাম যে, জনৈক পাঞ্জাবী 'ট্যাক্সি-ওনার' কয়েকজনকে লইয়া পরের দিন গ্যাঙ্‌টক্ যাইবেন। সকলেরই মত হইল—এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে লইয়া ঠিকাদার সীতারামবাবুর বাড়ী পৌছিলাম। কথা-বার্ত্তায় তাঁহাকে ভাল লোক বলিয়াই মনে হইল। ব্যবস্থা হইল—পরদিন (বুধবার) বেলা ৯টার সময় তিনি আগে গিয়া



গ্যাঙ্‌টক্ হইতে লওয়া দৃশ্য

আমাদের জন্য তিস্তায় অপেক্ষা করিবেন, তার পর আমরা সেখান পৌছিলে গ্যাঙ্‌টক্ অভিমুখে যাত্রা করা হইবে।

বুধবার সকালে উঠিয়া বেলা ৯টার মধ্যে

স্নানাহার সম্পন্ন করা হইল। সেদিন কালিম্পঙের হাট। হাট দেখিতে ও সুবিধা-মত কিছু জিনিষ-পত্র কিনিতে বাহির হইলাম। বৃদ্ধ পূর্ব্বেই গাড়ী ধুইয়া-মুছিয়া, তেল-জল দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। হাটে মাখন বেশ সস্তা। ইচ্ছা হইল, কিছু কিনি। কিন্তু খবর পাইলাম গ্যাঙ্‌টকে না-কি আরও সস্তা। গাড়ীর বোঝা আর না বাড়াইয়া কিছু কমলালেবু, গাছপাড়া নাস্‌পাতি ও কয়েকটা পেঁপে লইয়া বেলা ১০টার মধ্যে কালিম্পঙ্ হইতে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য সাতকড়ি পুরামাত্রায় পান ও চুণ লইতে ভুলে নাই, ঘটিটি ভর্ত্তি দেখিলাম। তিস্তা পৌছিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল, যদিও রাস্তা কেবলই উৎরাই। কিন্তু এত বেশী উৎরাই যে, ক্রমান্বয় ব্রেক ব্যবহার করার ফলে প্রত্যেক ২।৩ মাইল অন্তর ব্রেকে জল ঢালিয়া শীতল করিতে হইয়াছিল। গাড়ী 'টপ্ গিয়ারে' চালানর উপায় নাই, সব সময় 'সেকেণ্ড গিয়ারে' আসিতে হয়। গাড়ী আটকাইবার জন্য সময়ে সময়ে 'ফার্ষ্ট গিয়ার' ও 'ব্রেক' উভয়ই ব্যবহার করিতে হয়। চড়াইয়ের সময় এঞ্জিনের জল ফোটে, উৎরায়ের সময় 'ব্রেক ব্যাণ্ডে' আগুন লাগে।

তিস্তায় আসিয়া পরিচিত সীতারামবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। দোকানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পেঁপে সাজান দেখিয়া আরও গোটা কয়েক মোটর-জাত করিলাম। ভায়ারা নবীন—পেঁপের উপকারিতা বুঝেন না, আমার উপর চটিয়াই লাল; আমি না-কি পাহাড়ে কেবল পেঁপে খাইতেই আসিয়াছি। সীতারামবাবু রাস্তা সম্বন্ধে খুব হুঁসিয়ার করিয়া দিলেন। রাস্তা খুব অপরিসর, কোনক্রমে একখানি গাড়ী যাইতে পারে। তাহার উপর বিপরীত দিক্ হইতে বহু খচ্চরসহ তিব্বতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতেরও সম্ভাবনা। দার্জ্জিলিং ও কালিম্পঙের রাস্তায় বহুবার মোটর চালাইয়াছি। তথাপি রাস্তার বিবরণ শুনিয়া মনের মধ্যে আরও খানিকটা সাহস আনার দরকার বিবেচনা করিলাম। বেলা ১টার সময় ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া মোটরে ষ্টার্ট দিলাম। এখান হইতে গ্যাঙ্‌টক্ পর্য্যন্ত রাস্তা ৩৯ মাইল।

(ক্রমশঃ)

ফাদার মিলঁ

অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ রায়, এম্-এ

বৈশাখ মাস—উজ্জ্বল নীলাকাশ—মেঘের লেশমাত্র নেই। কি রকম যে দুঃসহ গরম, তা ব'লে বোঝান যায় না। খুব সকাল বেলা থালার মত সূর্য্য রক্তিম হাস্যে উঠে আসে ভোরের মিঠে হাওয়ার সঙ্গে। বনানীর শ্যামল শোভা দেখ্‌লে মনে হয়, বসন্তের সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধতা এখনও পৃথিবীর বুক হ'তে মুছে যায় নি। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই এমন অগ্নি-বৃষ্টি সুরু হয় যে, জানালার বাইরে তাকানোই যায় না, তাকালে যেন চোখ পুড়ে যায়। দূরে, দূরে, দূরে—দিগন্তের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত আকাশ উজ্জ্বল, নীল, দীপ্ত, তার কোনোখানেও একটু 'সজল মেঘের কাজল পরশ' নেই। আর সেই রোদে-পুড়ে-যাওয়া আকাশের নীচে নবোদ্গত পত্র-ভূষিত পার্ব্বত্য অরণ্যানী। প্রবাল-বর্ণের পাতার উপর দুঃসহ রৌদ্রের তীক্ষ্ণ দীপ্তি এসে পড়াতে মনে হয়, সারা বন জুড়ে যেন আগুনের শিখা জ্বলছে। চারদিকে ছোট-ছোট পাহাড়, মধ্যে পরিসর তৃণ-শ্যাম সমতল ক্ষেত্র। এই পাহাড়-ঘেরা সমতল ক্ষেত্রে ছোট্ট একখানি গ্রাম, ফ্রান্স দেশের নর্ম্মাদি

প্রদেশে। গ্রাম জুড়ে, ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পঁচিশ-ত্রিশখানি বাড়ীর বেশী হবে না, বাড়ীগুলো সব উঁচু মাথা-ওয়ালা বীচ গাছে ঢাকা। বীচগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে আপেল গাছের সারি উঠেছে। অজস্র কুসুম-সমাচ্ছন্ন গাছগুলোকে দেখে পুষ্প-স্তবক ব'লে ভ্রম হয়। বৈশাখের রৌদ্র-তপ্ত হাওয়ার সঙ্গে মুখন ফুটন্ত আপেল ফুলের সুবাস ভেসে আসে, তখন এই নির্জ্জন গিরি-উপত্যকার শ্যামল গ্রামখানি যেন উপকথার স্বপ্নপুরী হ'য়ে ওঠে।

মধ্যাহ্ন কাল। মঁসিয়ে মিলঁ খেতে বসেছেন, সঙ্গে বসেছেন মাদাম মিলঁ, চারটি খোকা-খুকী, একটি ঝি আর একটি চাকর—পরিবারে আর কেউ নেই। অসহ্য গরমের জন্য ঘরের ভিতর না ব'সে দোরের সাম্‌নে নাসপাতি গাছের ছায়ায় তাঁরা খেতে বসেছিলেন। কারো মুখে কোনো কথাটি নেই। খাবার সকলের পাতে-পাতে পড়েই রইল, মধ্যে-মধ্যে তাঁরা দু'-এক চুমুক আপেল-মদ্য পান কচ্ছিলেন। মঁসিয়ে মিলঁর বয়স হ'বে হয়ত চল্লিশ। দরজার পাশ বেয়ে যে দ্রাক্ষালতাটি সর্পিল গতিতে উঠেছে তার দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ স্ত্রীর দিকে ফিরে তিনি বল্‌লেন—দেখেছ, এ-বছর কেমন সকাল-সকাল কচিপাতা গজিয়েছে? বাবার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়!

মাদাম মিলঁ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, কোনো কথাটি তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না।

ফাদার মিলঁকে যেখানে নির্দ্দয়ভাবে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়, দ্রাক্ষালতাটি ঠিক সেইখানেই রোপণ করা হ'য়েছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৭০ অব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয়ান যুদ্ধের সময়। প্রাশীয়ানেরা সমস্ত দেশ অধিকার ক'রে ফেলেছে, একদল জার্ম্মান সৈন্য এসে ছোট্ট গ্রামখানিতে আস্তানা গেড়েছে। ফাদার মিলঁ সসম্ভ্রমে তাঁর ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিলেন। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে একমাস কেটে গেল। কিন্তু মাইল পাঁচ-সাত দূরে যে ফরাসী সৈন্যদল অপেক্ষা কচ্ছিল, তাদের এগিয়ে আস্‌বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে কিন্তু প্রত্যেক রাত্রিতেই দু'চারজন ক'রে প্রশীয়-সৈন্য নিরুদ্দেশ হ'তে লাগল। 'স্কাউট'-দলের সৈন্যরা যদি দলে পুরু না হয়ে বেরোত, তাহ'লে তারা আর ফির্‌ত না—পরদিন তাদের মৃতদেহ পথের ধারে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বা খানা-ডোবায় পাওয়া যেত। আর তাদের ঘোড়াগুলোও রক্তাক্ত দেহে রাস্তার উপরে লুটিয়ে থাক্‌ত। বিশেষ একটা দলের লোক যে এই সব ক'রে বেড়াচ্ছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের কোনো খোঁজ-খবর কেউ কর্ত্তে পারে নি। প্রাশীয়ানরা ত' প্রতিশোধ নিতে যেয়ে নির্দ্দোষ চাষাভূষোদের উপর অত্যাচার সুরু ক'রে দিলে। অনেকেরই প্রাণ গেল, অনেকেই অপমানিত ও নিগৃহীত হ'ল—কিন্তু এই মৃত্যু-রহস্যের কোনো সমাধান কিছুতেই হ'ল না।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখা গেল, রক্তাক্ত কলেবরে ফাদার মিলঁ তাঁর আস্তাবলের প্রাঙ্গণে প'ড়ে আছেন—তাঁর বাঁ কপোলে গভীর ক্ষতের চিহ্ন। এই সংবাদটা রাষ্ট্র হ'তে-না-হ'তেই আর একটা খবর পাওয়া গেল, গ্রাম হ'তে দু'মাইল দূরে একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। পথের ধূলোয় লুটিয়ে আছে একজন জার্ম্মান অশ্বারোহীর ছিন্ন কবন্ধ—তার মুষ্টিবদ্ধ হাতে তরবারি তখনও রয়েছে। বেচারা নিশ্চয়ই প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে ল'ড়েছিল।

ফাদার মিলঁর সেবা-শুশ্রূষার উদ্যোগ হবার আগেই একদল সশস্ত্র জার্ম্মান সৈন্য এসে তাঁকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। ফাদার মিলঁর বয়স হ'য়েছিল প্রায় সত্তর, মাথা শুভ্রায়িত কেশে ঢাকা, পাতলা ছিপ্ ছিপে গড়নের আকৃতি, হাটবার সময় একটু নুয়ে চলেন—নিরীহ ভাল মানুষ গোছের চেহারা।

কর্ণেল সাহেবের সম্মুখে তাঁকে উপস্থিত করা হ'লে কর্ণেল সাহেব ফরাসী ভাষায় বল্‌লেন—ফাদার মিল্, আমরা যদ্দিন থেকে এ গ্রামে আছি এমন কিছু ঘটে নি যাতে আপনার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বল্‌তে পারি। বরঞ্চ আপনি আমাদের সুখ-সুবিধার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজকে ভয়ানক একটা কথা আমাদের কানে এসেছে। আপনি বলুন ত' আপনার—আপনার মত বৃদ্ধের গায়ে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন কেন?

ফাদার মিল্ নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্ণেল সাহেব বল্‌তে লাগ্‌লেন—বুঝেছি, আপনার নীরবতাই আপনাকে অভিযুক্ত কচ্ছে। আচ্ছা, আপনি জানেন কি, আজ সকাল বেলা জার্ম্মান অশ্বারোহীটিকে কে খুন করেছে?

স্পষ্টাক্ষরে ফাদার উত্তর দিলেন—আমি!

তাঁর এই অনায়াস-উত্তরে কর্ণেল সাহেব কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। তারপর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন—এ পর্য্যন্ত যত জার্ম্মান সৈন্য খুন হয়েছে তাদের হত্যাকারী কে, তাও কি আপনি জানেন?

ধর্ম্ম-যাজকের সাম্‌নে পাপ-স্বীকার কর্‌বার সময় লোকে যেমন ক'রে দাঁড়ায়, ফাদার মিল্ সেইরূপ নতনেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একবার মাত্র তাঁকে একটু বিচলিত হ'তে দেখা গেল, যখন অকস্মাৎ তিনি তাঁর গলার বোতাম ঢিলে ক'রে দিলেন।

কর্ণেল আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কে এই নিষ্ঠুর হত্যাকারী, জানেন?

—জানি, আমি।

—আপনি?

—হ্যাঁ, আমি।

—আপনি একা?

—হ্যাঁ।

—কি ক'রে সম্ভব হলো? আপনার মত দুর্ব্বল বৃদ্ধের পক্ষে এতগুলি জোয়ান ও শক্তিশালী সৈন্যের প্রাণ নেওয়া···

ফাদার মিল্ উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন—পিছন ফিরে দেখলেন তাঁর পরিবারস্থ সকলে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি দ্বিধাবোধ করলেন। পরে অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌লেন—আপনাদের এ গ্রামে আসবার দু'দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ী ফির্‌ছিলাম। ঘাসের বোঝা মাথায় ক'রে একজন লোক আমার পিছনে আস্‌ছিল, বড় ঘাসের বোঝা—দাম আট-দশ আনার কম নয়। কোথা থেকে একজন জার্ম্মান সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বল্‌লে—হেই থাম!

—তারপর দু'টো পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘাসের বোঝাটা নিয়ে চ'লে গেল।

—আর একদিন আমার বাড়ীর পাশের এক অতি দরিদ্র পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব—একটি দুগ্ধবতী গাভী এবং দু'টি ভেড়া ওরা এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল···

—একদিন সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখি—আমার 'গোলাঘরে'র দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে একটা জার্ম্মান সৈন্য নিশ্চিন্ত মনে 'পাইপ' টান্‌ছে। তার এই পরম নিশ্চিন্ত ও বে-পরোয়া ভাব দেখে আমার সারা শরীর জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল—দেয়াল বেয়ে বেয়ে যখন এককোপে আমি তার মুণ্ডচ্ছেদ কর্‌লাম, তখন 'উঃ' শব্দটি কর্‌বার ফুরসতও সে পেল না, তার মৃতদেহ আপনারা 'লেকে' খুঁজে পাবেন···

জার্ম্মান সেনা-নায়কেরা নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে রইলেন। ফাদার মিল্ উত্তেজিতভাবে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন—

—তখন থেকে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। গোপনে দেশের শত্রু হত্যা করতে সুরু ক'রে দিলাম, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে আমি প্রাশীয়ানদের সহিত খুব মিশতে লাগলাম, তাদের সুখ-সুবিধার জন্য দরদ দেখাতে লাগ্‌লাম। দেখ্‌লেই টুপী তুলে অভিবাদন করা, সর্ব্বদা জোড় হাত ক'রে থাকা—এই হ'লো আমার কাজ। সুতরাং ওদের গতিবিধির খবর জানা

আমার পক্ষে আর কঠিন হ'লো না। 'স্কাউটে'র দল কখন বেরোয়, সে-খবর আমার আগেভাগেই কানে আস্‌ত। প্রথমতঃ 'স্কাউট'রা দলবদ্ধ না হ'য়ে, একা একা বেরোত। এক একদিন আমার সঙ্গে দেখা হ'ত পথের মাঝে। পথ পাহাড়ের ধার দিয়ে বেঁকে গিয়েছে নির্জ্জন লোকালয় হ'তে অনেক দূরে, রাত ঘণ্টাখানেক হয়েছে হয়ত। ছোট্ট পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে হঠাৎ চন্দ্রোদয় হ'ল। দেখি একজন জার্ম্মান অশ্বারোহী শিস্ দিতে দিতে আসছে, আমি ঘোড়ার উপর 'ওৎ' পেতে রইলাম। হাত দশেক দূর থেকে তাকে ডেকে 'শুভরাত্রি' জানালাম এবং টুপী তুলে অভিবাদন কর্‌লাম। আমাকে দেখে তার মনে কোনো সন্দেহ হ'ল না, চললাম তার পেছনে পেছনে, তারপর অতর্কিত আঘাতে তার মুণ্ডচ্ছেদ·····

—সেইদিন হ'তে আমার ভারী সুবিধে হ'য়ে গেল, ঐ সৈনিকটার পোষাক খুলে নিয়ে এলাম। সেই পোষাক প'রে সারারাত্রি ঘুরে বেড়াই, সুযোগ পেলে জার্ম্মান রক্তে আমার তরবারির পিপাসা মিটাই।

—আর একদিনের কথা। উচ্চৈঃস্বরে কথা বল্‌তে বল্‌তে মহা-আনন্দে দুইজন জার্ম্মান অশ্বারোহী আসছে। আমি বীচ বনের এপার থেকে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠ্‌লাম। ওরা ভাব্‌ল, ওদেরই বুঝি একজন। কোনো কিছু সন্দেহ না করে, ওরা শব্দ লক্ষ্য করে আস্‌তে লাগ্‌ল, হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলে পড়েছে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে, রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে আসে। আকাশে প্রভাতী তারা জ্বলজ্বল করছে। যেই ওরা বীচের ছায়ায় পা দিয়েছে, অমনি অব্যর্থ লক্ষ্যে দু'-দু'বার পিস্তলের আওয়াজ·····

—এইরূপে মানুষ শিকার ক'রে আমাকে রাত্রির পর রাত্রি কাটাতে হয়েছে·····

··· ··· ··· ···

—যোজনের পর যোজন বন্ধুর পর্ব্বত। সেই পথে আমি উন্মাদ প্রতিহিংসায় ছুটে বেড়িয়েছি—হা-হা-হা। বন্য শার্দ্দূলের মত মানুষের রক্তাস্বাদে পাগল, কানখাড়া ক'রে চলেছি, যদি কোনো দিক্ হ'তে জার্ম্মান অশ্বের পদধ্বনি নৈশ বাতাসে ভেসে আসে!···চমৎকার! কিন্তু শেষ দিন যাকে আক্রমণ করি সে যেন কেন সতর্ক ছিল। মেরেছি তাকে, কিন্তু আমাকেও সে ঘায়েল করেছে···

এই বলে ফাদার মিল্ মাথা উঁচিয়ে জার্ম্মান সেনা-নায়কদের দিকে সদর্পে তাকালেন···

গোঁফ কাম্‌ড়াতে কাম্‌ড়াতে জার্ম্মান সেনা-নায়ক বল্‌লেন—আর আপনার কিছু বল্‌বার আছে?

—না।

—জানেন, আপনার প্রাণদণ্ড হবে!

উদ্ধতভাবে ফাদার বল্‌লেন—আপনি কি মনে করেন আপনাদের কাছে আমি কৃপা ভিক্ষা চাইব?

—আপনি গত জীবনে সৈনিক ছিলেন?

—হ্যাঁ! 'মেলেগনানো'র যুদ্ধের জয়ী আমরা··· যাক্ আজ আমি ঋণমুক্ত। আমার বড় ভাই বার্দ্ধক্যে নুয়ে পড়েছিল, তাকে নির্দ্দয়ভাবে জার্ম্মানরা হত্যা করে। আর আমার বড় ছেলে 'এভারেস্টে'র যুদ্ধের পর মারা যায়। এদের রক্ত-তর্পণ আমি করেছি—অনেকবার যখন হত-জার্ম্মানের কণ্ঠনালী হ'তে রক্ত তীর-বেগে ছুটেছে—তখন অঞ্জলি ভ'রে আমি সেই তপ্ত রক্ত তাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছি···

এই ব'লে এই ক্ষীণকায়, জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ এমন দর্পিত-ভাবে জার্ম্মানদের সাম্‌নে দাঁড়াল যে, তারা মূঢ়ের মত নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল!

জার্ম্মান সেনা-নায়ক—তাঁর ছেলেটি যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাঁর একমাত্র ছেলে। তিনি ব'ললেন—আচ্ছা যদি কোনো উপায়ে আপনার প্রাণ-ভিক্ষা দিতে পারি···

একটা দুর্দ্দম প্রতিহিংসার পৈশাচিক ছবি এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মুখে ফুটে উঠ্‌ল—তিনি মরীয়া হ'য়ে সেনা-নায়কের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ক্ষিপ্তের মত তাঁর গায়ে, মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ কর্‌লেন।

জার্ম্মান সেনানায়কের ইঙ্গিতে ছয় জন সৈন্য ফাদারকে বের ক'রে নিয়ে গেল এবং তাঁর বাড়ীর দোর-গড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে—তারপর ছয়টি বন্দুকের ছয়টি গুলী···

মঁসিয়ে মিল সন্ত-পল্লবিত দ্রাক্ষালতাটি দেখ্‌ছিলেন। অভিভূতের মত বৈশাখের মধ্যাহ্ন কখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে তার ঠিক নেই। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য হেলে পড়েছে —পথ-তরুর ছায়া দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে উঠেছে···

(ফরাসী গল্প হইতে)

রাতের ব্যথা

শ্রীমতী আভা গুপ্তা

১

গভীর রজনী বাতাস ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
চাঁদের আলোতে ভরিয়া উঠিছে পূর্ব্বাকাশ।
দূর হ'তে বাজে বেহাগের সুর বায়ুর বুকে,
এমন রাতেও বঁধুয়া কি মোর ঘুমায়ে সুখে!
তারকার চোখে ইঙ্গিত-ভরা গোপন কথা,
শুষ্ক আঁখিতে ছল ছল কার পুরানো ব্যথা!
ক্লান্ত হৃদয়—সকল অঙ্গ মমতা যাচে,
এমন রাতেও বঁধুয়া কি মোর ঘুমায়ে আছে!

২

চাঁদের আলোয় ছল ছল নদী আত্মহারা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার ঝরে উল্লাস পাগল পারা।
আলো ও আঁধারে লুকোচুরি খেলা সুদূরাকাশে
সুবাস-মত্তা রজনীগন্ধা ঘরের পাশে।
প্রিয়া নাই পাশে—অনুরাগ-ভরা তরল আঁখি,
রজনীর বুঝি অবসান হ'তে অনেক বাকি।
ঘন মৌনতা—তাহারি পাথার দূরে ও কাছে,
এমন রাতেও আমার বঁধুয়া ঘুমায়ে আছে!

৩

কপোল বহিয়া ব্যথায় ব্যাকুল অশ্রুঝরে,
রুদ্ধ বেদনা মিলনের আশে গুমরি মরে।
অধরে অধরে গভীর স্পর্শ—না-বলা বাণী
সঞ্চিত সুধা ঢেলে দিতে চায় পরাণখানি।
নয়নের কোণে আদর ঝুরিছে—আবেশ প্রাণে,
এমন রজনী অবসান হবে বিরহ-গানে!
সম্বিত-হারা—আকাশের পানে চাহিয়া থাকি,
এখনো আমার প্রবাসী বঁধুয়া ঘুমায়ে না কি!

৪

সুদূর হইতে সুদূরে চলেছে সন্তাষণ,
মিলন-রভসে ভরিয়া উঠিছে নীল গগন।
আকাশে বাতাসে কানাকানি চলে হাজারো সুরে,
আমারি বঁধুয়া সুঁরে আছে—শুধু রয়েছে দূরে।
নিদ্‌হীন আঁখি—পথরেখা পানে চাহিয়া থাকি,
ডালে ডালে ঐ শিস দিয়ে যায় ভোরের পাখী।
রজনীর নেশা মিছে হ'লো শুধু আমারি কাছে।
বঁধুয়া ঘুমায়—আমারি নয়ন জাগিয়া আছে।

'জগৎ-মঙ্গল'-এর কবি গদাধর দাস

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌

যাঁহার অমৃত-সমান মহাভারতের কথা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর চিত্তকে সুধারসে অভিষিক্ত করে —'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য-প্রণেতা কবি গদাধর দাস, সেই অমর কবি কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহাভারতের ভণিতার অনেক স্থলে কাশীরাম অনুজ গদাধরের নামোল্লেখ করিয়াছেন —

"মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড় পদরজঃ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥"

মহাভারতের শেষে কাশীরাম যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে 'দেব' উপাধি-ধারী কায়স্থ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল কমলাকান্ত দেব। কাশীরামেরা তিন ভ্রাতা ছিলেন —কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর।

কমলাকান্ত দেবের বংশে কমলার কৃপা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার সন্তানগণের মস্তকের উপর দেবী বীণাপাণির আশীর্ব্বাদ যে শতধারে বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর—এই তিন ভ্রাতাই অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

কৃষ্ণদাসের প্রণীত কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস'—কাশীরামের 'মহাভারতে'র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—আর কবি গদাধর দাসের কাব্যের নাম 'জগৎ-মঙ্গল।'

মহাভারতের মধ্যে কাশীরাম দাস অগ্রজ কৃষ্ণদাস ও অনুজ গদাধরের নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাদের কাব্য-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রণয়নের পর তাঁহার কবি-ভ্রাতৃদ্বয় স্ব-স্ব কাব্য রচনা করেন।

'জগৎ-মঙ্গল' কাব্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদে কবি গদাধর দাস গুরু-বন্দনা প্রসঙ্গে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে সিঙ্গিগ্রামের এই কবি দেব-বংশের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়—

"ভাগীরথী তটে বাটী ইন্দ্রায়ণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি॥
দুবরাজ গুবরাজ তাহার নন্দন।
দুবরাজ পুত্র হৈল মীন কেতন॥
তাহার নন্দন হইল নাম ধনঞ্জয়।
তাহা হৈতে হৈল এই তিনটী তনয়॥
বসুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
বসুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রিয়ঙ্কর, সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু, সুধাকর, মধু শ্রীরাম রাঘব॥
সুধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ।
শ্রীমন্ত, কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস॥
দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড়ে কৈল বাস॥
কমলাকান্তের হল্যো এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎ-মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥"

উদ্ধৃত অংশের —

"অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥"

এই পদটী হইতে জানা যায় যে, কবি গদাধর দাস বৈষ্ণব ছিলেন এবং অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ দেব তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন। কাব্যের বন্দনাংশে কবি অত্যন্ত ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্য দেব ও তৎপার্ষদগণের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

কবি ভ্রাতৃত্রয়ের পিতা কমলাকান্ত দেব বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসী হইয়াছিলেন।

পরম বৈষ্ণব গদাধরও সম্ভবতঃ আবাল্য সংসার বিরাগী ছিলেন। পিতৃপদসেবা ও জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত তিনিও পিতার সহগামী হইয়া ছিলেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

"উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর।
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥
বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি সেই বরস্থান।
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণ॥
শুনিয়া পুরাণ বড় ইচ্ছা হইল মনে।
পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে॥"

সুতরাং কবি যে উৎকলের মাখনপুর নামক পল্লীতে থাকিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রকাশ। "বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি"—এই কথার দ্বারা কবির বৈষ্ণবতা ও সংসার বৈরাগ্যের আভাষ পাওয়া যায়।

দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর পুরাণ পাঠ সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক। সেই হিসাবে ইহার নাম জগন্নাথ-মঙ্গল রাখাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কবি বলিতেছেন—

"জগৎ উজ্জ্বল জগত মঙ্গল
জগতক মল ধ্বংসে।
জগন্নাথ নাম জপি অবিরাম
বাঞ্ছে গদাধর দাসে॥"

এই গ্রন্থের দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া কবি ইহার 'জগৎ-মঙ্গল' নামকরণ করিয়াছিলেন।

"স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া চরিত্র।
কথো ব্রহ্ম পুরাণের প্রস্তাব বিচিত্র॥
না বুঝে পুরাণ মূঢ় ইত্যাদি লোকেতে।
তে কারণে রচিলাঙ পাঁচালীর মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইবে সর্ব্বজন।
ইহ লোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥"

১৫৬৪ শকাব্দে কবি এই কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। তখন উৎকলের রাজা ছিলেন নরসিংহ দেব। নরসিংহ দেব জগন্নাথ দেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সভা-মণ্ডপে কবি গদাধর দাসের 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য সুরতানলয়ে গীত হইয়াছিল কি না, এবং রাজহস্ত-প্রদত্ত পুষ্পমাল্য কবির কণ্ঠের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল কি না, সে সংবাদ অতীতকালের গর্ভে চির অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বিষয়-বাসনাত্যাগী বৈষ্ণব কবি গদাধর দাস ফুলিয়ার কমল-কবি কৃত্তিবাসের ন্যায় রাজ-পণ্ডিত হইবার আশায় বা রাজ-অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইয়া 'পঞ্চ শ্লোক' রচনা করিয়া উৎকলরাজের দ্বারস্থ হন নাই, এবং কখন সুবর্ণ যষ্টিধারী দ্বারী আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিবে, সেই আশায় সতৃষ্ণ-নয়নে পুনঃ পুনঃ পথপানে চাহিয়া থাকেন নাই। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ দেব তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া ছিলেন, ধন-সম্পদ্ বা যশঃ লাভের আশার তিল মাত্র স্থান সেখানে ছিল না। যশোলিপ্সু হইয়া তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই, অভীষ্ট দেবের প্রতি আন্তরিক অনুরাগই তাঁহাকে কাব্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

কবির সমকালে মোগল-সম্রাট সা-জাহান দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে সর্ব্বত্র শান্তি

বিরাজিত ছিল। দামুন্যার কবি মুকুন্দরামের মত ডিহিদারের অত্যাচারে কবিকে প্রপীড়িত হইতে হয় নাই বা সিঙ্গিগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমের পথে বৃন্দাবন হইতে গৌড়গামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তগণের ন্যায় তাঁহাকে দস্যুর অত্যাচারে উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই। গুণগ্রাহী কবি স্বীয় কাব্যে এই প্রজাপালক নৃপতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

"রাজ চক্রবর্ত্তী সাহজাঁহা দিল্লীপতি।
ধর্ম্ম ন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান্ প্রতাপী হয় বৈরীজয়-যশ॥"

জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-সূচক ঘটনাবলীর বিবৃতিতে কবি স্কন্দ ও ব্রহ্ম পুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কুত্রাপি সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মৌলিক কাব্যরচয়িতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহার কাব্য মধ্যে অব্যাহত আছে। সুতরাং কবিত্ব-প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছেন ও তাহার সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন বটে। তাঁহার রচনা-ভঙ্গী তদীয় মধ্যমাগ্রজ মহাকবি কাশীরামের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। ফলতঃ গদাধর দাসের নাম না থাকিয়া 'জগৎ-মঙ্গলে'র ভণিতায় যদি কাশীরামের নাম থাকিত, অতি বড় সাবধানী সমালোচকও বোধ হয় তাহাতে সন্দেহমাত্র প্রকাশের অবকাশ পাইতেন না।

"নীল জীমূত অঙ্গ পঙ্কজ লোচন।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম কনক বরণ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভে হৃদিমাঝে।
দিনকর জিনি দুই কুণ্ডল বিরাজে॥
দুই ভিতে কর জুড়ি লক্ষ্মী সরস্বতী।
শিব চন্দ্র ব্রহ্মা করে করজোড়ে স্তুতি॥
দক্ষিণ ভাগেতে বিরাজিত হলধর।
মস্তকে ধরএ ছত্র সপ্ত বিষধর॥
এক কর্ণে কুণ্ডল শোভিত গণ্ড চণ্ড।
সরিষার বৎ শিরে ক্ষিতি সপ্ত খণ্ড॥
রজত মন্দর আভা জিনি কলেবর।
বারুণী পানেতে চক্ষু ঘূর্ণ নিরন্তর॥
দু'হামধ্যে আছেন সুভদ্রা মহামায়া।
তিন লোক মোহিনী কুঙ্কুম বর্ণ-কায়া॥"

অথবা—

"বিকসিত অরবিন্দে যুগল নয়ন নিন্দে
মকরন্দ পানে সদা ঘূর্ণ।
শ্রবণে কুণ্ডল মণি মিহির মণ্ডল জিনি
এক কর্ণে মণ্ডিত আকর্ণ॥
অধর অরুণ জ্যোতি দোসুতি মাতঙ্গমতি
গলেতে উজ্জ্বল মণি যুত।
কনক মুকুট শিরে ফণি মুণ্ড যার পরে
ললাটে তিলক সিন্ধু সুত॥
ভুজ যুগ করী কর মুষল লাঙ্গল ধর
কলেবর স্বর্ণ বিভূষণ।
বিবিধ পুষ্পের মালা উরোপরি করে খেলা
নীলমণি জিনিয়া বসন॥"

প্রভৃতি রচনা কৃত্তিবাস বা কাশীরাম কাঁহারও অযোগ্য নহে। 'জগৎ-মঙ্গল' ক্ষুদ্র কাব্য। যদি ইহা রামায়ণ বা মহাভারতের ন্যায় বিপুল কলেবর হইত, তবে আমাদের মনে হয়, কবি গদাধর দাসও কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও কাশীরামের ন্যায় বাংলার ঘরে ঘরে নিত্য বিরাজিত থাকিতেন।

'জগৎ-মঙ্গল' কাব্যের যথাযোগ্য প্রচার না হওয়ার অন্যতম কারণ বঙ্গেতর প্রদেশে ইহার রচনা। এই গ্রন্থ যদি কটকের মাখনপুরে রচিত না হইয়া বাংলার সিঙ্গিগ্রামে রচিত হইত, তাহা হইলে বাংলার পাঁচালী গায়কগণের মুখে মুখে ইহা সমগ্র বঙ্গে প্রচারিত হইতে পারিত। জগন্নাথদেব জগতের দেবতা হইলেও বিশেষ করিয়া উৎকলের দেবতা। সুতরাং বাংলার লৌকিক দেবতা বিষহরী বা মঙ্গল-চণ্ডীর ন্যায় তাঁহার মাহাত্ম্য বাঙালীর নিকট বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিতব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর

নাম সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। তামিল ভাষায় মীনাক্ষী দেবীর মাহাত্ম্যসূচক বহু গ্রন্থ আছে। মদ্র-বাসিগণ ঐ সকল গ্রন্থ প্রত্যহ ভক্তিভরে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। মীনাক্ষী দেবী স্বয়ং ভগবতী। কিন্তু কয়জন সাধারণ বাঙালী মীনাক্ষী দেবীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন? তাই বলিতেছিলাম, দেবতার মধ্যেও প্রাদেশিকতা আছে। কবি গদাধর দাস যদি জগন্নাথ-দেবের মাহাত্ম্য না লিখিয়া চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল রচনা করিতেন, তবে তাঁহার কবি-খ্যাতি বাঙালীর নিকট অধিকতর প্রচারিত হইত। ইহা ছাড়া, তাঁহার 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য বিদেশে রচিত হইবার পূর্ব্বেই তদীয় অগ্রজ কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ কথক ও পাঁচালী গায়কগণের প্রমুখাৎ উহা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অমৃতরস পরিবেশন করিতেছিল। এই সুধা-সমুদ্রের মধ্যে 'জগৎ-মঙ্গল'-রূপ মধুকণা স্বতঃই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। মহাভারতরূপ মহীরুহের অন্তরাল হইতে গদাধর দাসের এই ক্ষুদ্র কুসুম তরুটি অনেকেরই দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

বঙ্গদেশে পাঁচালী গানের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধ নহে। পাঁচালী গান যে বঙ্গের লোক-শিক্ষার অন্যতম বাহন—এ কথা অবিসম্বাদী সত্য। পাঁচালী প্রবন্ধে যাঁহারা গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে ভাবাবেগে কবি-প্রতিভার অতি উচ্চস্তরে আরোহণ করিলেও, সম্মুখবর্ত্তী শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য মধ্যে অতি সাধারণ কথার অর্থাৎ নিত্যকার জীবন-যাত্রার কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে, দেবতার কথা ক্ষণেকের জন্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহাদিগকে মানুষের সাংসারিক সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। সংসারবিরাগী কবি গদাধর দাসও প্রাচীন কাব্যের এই চিরাচরিত ভাবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। শিব-নিন্দা ব্যপদেশে কবি মেনকার মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন তাহার কাব্যরস পরম উপাদেয় —

"কনক বরণ তোর শরীরের জ্যোতি।
এ দেহে ভূষণ হয় সদাই বিভূতি॥
চাঁচর চিকুর তোর চামর নিন্দিত।
জটাধর সঙ্গে হয় কেমনে পিরীত॥
বয়ান কমল তোর কোটি চান্দ জিনি।
পাকা দাড়ী দন্তহীন মুখ শূলপাণি॥
মণিমুকুতার হার নিন্দিত তপনে।
হাড়মালা আলিঙ্গন করহ কেমনে॥
মাছি অঙ্গে লাগিলে কস্তুরি দিয়া ধোও।
এবে অঙ্গে সর্পগণ কেমনেতে ছোও॥
অম্লান রতন শেজে নিদ্রা না আইসে।
কেমনে কাঁথার ঘ্রাণে থাক হরপাশে॥
... ...
বুঢ়ার বলদ বুলে হইয়া উদাম।
এ হেতু পড়শী সহ দ্বন্দ্ব অবিরাম॥
অনুক্ষণ পড়ে গিয়া সবাকার ক্ষেতে।
চালাইতে গেলে লোক আইসে মারিতে॥
ধান্য আদি শস্য কিছু ঘরে নাহি রহে।
গণেশের বাহন ইন্দুর সদা বহে॥
সভাকে হইতে ধিক্ তাহার জঞ্জাল।
ঘর দ্বার কাঁথাতে সর্ব্বত্রে কৈল খাল॥
কার্ত্তিকের বাহনের বিপরীত কথা।
ঘর বাহিরেতে ভরাইল সাপের মাথা॥"

কবি একদিকে যেরূপ নিরক্ষর শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুড়া শিবের উদাম বলদের অত্যাচারের কথা শুনাইয়াছেন, অন্যদিকে আবার পণ্ডিতগণের কাছে উপমার 'কেয়ারি' রসাইয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও পণ্ডিতী ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই, নীলগিরির বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

"দেবগণে ইন্দ্র যেন নাগগণে শেষ।
মনুষ্যের রাজা যেন রুদ্রেতে মহেশ॥

প্রজাপতি মধ্যে ব্রহ্মা বেদে যেন সাম।
অক্ষরে ওঁকার যেন শিলা শালগ্রাম॥
তৃণ মধ্যে দুর্ব্বা যেন বৃক্ষেতে অশ্বত্থ।
হয়ে উচ্চৈশ্রবা যেন গজে ঐরাবত॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যেন যক্ষে বৈশ্রবণ।
শীতলেতে চন্দ্র যেন জ্যোতিতে তপন॥
পক্ষীতে গরুড় যেন গাভীতে সুরভি।
হ্রদেতে সমুদ্র যেন নদীতে জাহ্নবী॥
কপি মধ্যে হনুমান মুনিতে নারদ।
রত্নগণ মধ্যে যেন গণি জাম্বুনদ॥
অঙ্গ মধ্যে শির যেন পঞ্চাত্মায় বাত।
অস্ত্র মধ্যে বজ্র যেন ক্ষত্রে ভৃগুনাথ॥
ঔষধেতে ধান্য যেন ইন্দ্রিয় মধ্যে মন।
সমুদ্রে ক্ষীরোদ যেন বর্ণেতে ব্রাহ্মণ॥
হুতাশনে বায় যেন গুণে শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব।
সতীমধ্যে অরুন্ধতী খণ্ডেতে ভারত॥
মেরুতে সুমেরু যেন সিদ্ধেতে কপিল।
সেইরূপ ক্ষেত্রমধ্যে গিরিরাজ নীল॥"

এই সুদীর্ঘ উপমার মালা গাঁথিবার সময় কবি যে গীতার একাদশ অধ্যায় হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শেষ-প্রসিদ্ধ পাঁচালী রচয়িতা দাশরথি রায়ের রচনার মধ্যেও এইরূপ দীর্ঘ উপমার বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

কবি গদাধর দাসের বাল্য বা শেষ জীবনের কোনো সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম দেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তিনি উৎকল ক্ষেত্রেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের সমালোচকগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে, কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারত রচনা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কতকাংশ পর্য্যন্ত রচনা করিবার পর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মহা-ভারতের অবশিষ্টাংশ তদীয় অনুজ গদাধর দাস ও পুত্র নন্দরাম দাস সম্পূর্ণ করেন এবং উহাতে কাশীরাম দাসের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া দেন। এই মত আমরা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। কারণ এই ঘটনা সত্য হইলে গদাধর দাস 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্যের আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন। পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব কবি গদাধর দাস যে সত্য গোপন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

'জগৎ-মঙ্গল' কাব্যের উপসংহারে একান্ত বিনয়ী ও নিরহঙ্কার কবি গদাধর দাস সঙ্কোচের সহিত নিবেদন করিয়াছেন—

"নাহি সন্ধিজ্ঞান না পড়িল ব্যাকরণ।
কেবল মূর্খের মত করিল রচন॥"

কবি সত্য সত্যই কোনো ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহার কাব্য রচনা যে "মূর্খের মত" হয় নাই ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য যিনিই পাঠ করিবেন, এ-কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। বাংলার প্রাচীন কাব্যোদ্যানে কবি গদাধর দাসের 'জগৎ-মঙ্গল' নির্গন্ধ কিংশুক পুষ্প নহে, বেল ও মালতীর মধুর সৌরভে উহা ভরপুর!

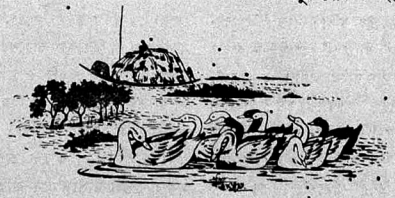

নারীর মন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বড় অধিক দিন নিঃশব্দে কাটিল না, হরিশের ইচ্ছা হইল—প্রবল ইচ্ছাই হইল আর একটি মেয়েকে সে শৃঙ্খলিত করে। সত্যের দিক দিয়া ইহার ভিতরে যেন পর্য্যাপ্ত প্রতিবাদ ছিল। হইলে কি হয়, পুরুষের বাম দিক্‌টায় বোধ করি বিধাতার কোন অভিসম্পাত নাই। তাই শূন্য হইলে মন না মিলুক মেয়ে মিলিতেছে। হরিশেরও মিলিল। সহপাঠী রমেশ একদিন তাহাকে সদলবলে নিজের ভবনে লইয়া গিয়া তাহার এক শিক্ষিতা ভগিনীর সহিত চাদরে আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। রমেশের ভাণ্ডারের লুচিমণ্ডা যুবার দল তাল ঠুকিয়া পরিবেশন করিয়া শেষ করিল। বিবাহটা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শেষ হইল না।

ছাদ্‌নাতলার কাজ শেষ হইলে কনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া হরিশ ঘরে ঢুকিল। দেখিল একটি পরিচ্ছন্ন শয্যার কোল জুড়িয়া নানা ছাদের, নানা বয়সের একদল মেয়ে খোস্‌মেজাজে ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে। কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ডিঙাইয়া চলিতে ব্যস্ত। চোখে-মুখে কৌতূহলের উজ্জ্বল দীপ্তি। ঘোমটা কাহারও নির্ব্বিচারে খোলা; কাহারও বা অল্পটানা। হার, চুড়ী, রতন চূড়ের উপর কাহারও অহঙ্কারের দৃষ্টি; কাহারও বা এ সকলের উপর আদৌ নজর নাই। মাথায় নানা বিচিত্র ধরণের খোপা; কাহারও বা কাল বেণী কাল ভুজঙ্গিনীর মত পৃষ্ঠের উপর দুলিতেছে। যে দলটি সঙ্গে আসিল তাহারাও জায়গা করিয়া লইয়া নূতনে পুরাতনে মিশিয়া মোগলবাহিনীর মত সকলে একত্রে হরিশকে ঘিরিয়া বসিল। ইহারা আজ অসামান্য দক্ষতার সহিত অভ্যাগতটির বিদ্যাবুদ্ধির জড়তা টানিয়া-টানিয়া বাহির করিবে ও লজ্জা দিবে।

পার্শ্বে রক্তবস্ত্রের আড়ালে চঞ্চল বুকের স্পন্দন—মুখখানা আনত, বস্ত্রাবৃত — শুভদৃষ্টির সময় ঘোমটার অন্তরাল হইতে ক্ষণিকের জন্য কি যে প্রদীপ্ত আভা বিস্তার করিয়া ধরিয়াছিল হরিশের ঠিকমত মনে পড়িতেছিল না; কিন্তু বিস্ময় লাগিতেছিল।

এদিকে মেয়েগুলিও তাল সাম্‌লাইতে দিতেছিল না। যে ক'টি ঠাট্টা বিদ্রূপে অধিক অগ্রসর, কেহ চিবুকে, কেহ বা কর্ণে কোমল হস্ত বুলাইয়া দিতেছিল। বিধি-বিধান, শাসন-সংযম ছিল না, যে যে-রকমে পারিতেছিল অত্যাচার করিতেছিল। হরিশ কিন্তু আত্মবিস্মৃত—মুগ্ধ!

এই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মধুর মোহ ভাঙ্গিয়া দিলেন সহসা আসিয়া এক জ্ঞাতি প্রাচীন গোছের খুড়ামহাশয়। তিনি এক 'তারে'র সংবাদ হাতে লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করিবার সোজা কোন রাস্তা না পাইয়া অবশেষে কাগজখানা সকলের মাথা ডিঙাইয়া হরিশের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। হরিশ ব্যস্তভাবে খবরটি পাঠ করিয়া জানিল, পিতা সাংঘাতিক পীড়িত। সে কোন রকমে পথ করিয়া দ্বারের নিকটে চলিয়া আসিল। খুড়ামহাশয় জানাইলেন, আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার দেশে রওনা হওয়া সকলে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন।

হরিশের পিতা কমলকৃষ্ণ মাসাধিককাল রোগে ভুগিতেছিলেন। পুত্রের এ দ্বিতীয়বারের বিবাহে তাঁহার আগ্রহ ছিল না, মতও তিনি দেন নাই; আবার গৃহিনীও পুত্রটির উৎকণ্ঠা দেখিয়া অমতও করেন নাই। অনেকগুলি পুত্র-সন্তান মরিয়া-ছাড়িয়া যাইবার পর হরিশই টিকিয়াছিল। নিস্তারিণী বংশ-রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। আর হরিশ ত' বিবাহের নামে ক্ষেপিয়াই উঠিয়াছিল। কমলকৃষ্ণের মৌন থাকা সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া নিস্তারিণী নিজেই বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করিলেন। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল, কমলকৃষ্ণও রোগে পড়িলেন।

হরিশ পল্লীগ্রামের ছেলে। কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-শুনা করিত। রমেশ ছিল সহপাঠী—সেই সূত্রে বন্ধুত্ব। আর ভগিনীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনই সেই বন্ধুত্বের পরিণতি।

রমেশের পিতা রাধিকাপ্রসাদ ডেপুটিগিরি করিতেন। অধুনা পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। সংসারে তিনটি শিশু-সন্তান আর স্ত্রী মাত্র অবলম্বন ছিল। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একদিনের মধ্যেই সাজান সংসারটিতে যেন ভাঙ্গচুর লাগিয়া গেল। কোথায় ছেলেদের কাপড়-জামা—কোথায় ভোগের সামগ্রী—আর কোথায় তাহাদের কাঁথা-বালিস! স্ত্রী এক এক সময় কঠিন রোগে পড়িয়াছেন, কিন্তু এমনটি কখনও ঘটে নাই। মন তাঁহার ক্রমে উদাস হইয়া উঠিতেছিল। সংসারের এ ঠিকাদারী কাজকর্ম্ম আর ভাল লাগিতেছিল না। কেবল মাতৃহারা শিশু তিনটি যখনই কাছে আসিয়া ডাক দিত—"বাবা?" তখনই ধ্যান-নিমগ্ন চক্ষু দু'টি জাগিয়া উঠিত। সস্নেহে সকলগুলিকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিতেন—"ভাবনা কি? এই যে আমি।" ভাগ্যহীন শিশুদের সান্নিধ্যলাভের আকুলতাকে দুই হাতে তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেন না। আবার ইহারাই তাঁহাকে দুঃসহ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেও দিল না। মাতা যেন তাঁহার স্নেহের স্পর্শটুকু ইঁহারই কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন! তাই তাহারা যখন ক্লিষ্ট চক্ষু ক'টি মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অভয়-ভিক্ষা করিত তখন মনের সকল অসুখ ও অস্বাচ্ছন্দ্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। যেন সমস্ত ভুলাইয়া দিবার কৌশল একমাত্র ইহারাই জানিত। তিনি অন্তরের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সকলকে বক্ষে টানিয়া লইতেন। এইরূপে তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল।

রমেশই একমাত্র ছেলে। মেয়ের মধ্যে প্রতিভা ও হেম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যায় ইতর-বিশেষ না করিয়া সকলকে তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গৃহটি কেমন ফাঁকা হইয়া গিয়াছিল, রমেশ মাথাধরা হইয়া উঠিলে তাহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ কেতকীকে ঘরে আনিলেন। মেয়ে দু'টির জন্যও সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাকে অম্বলের রোগে ধরিল। ডাক্তার-বৈদ্যের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া কত ঔষধই সেবন করিলেন, কিছুতে কিছু হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া ঔষধ-পত্রের ব্যবহার একরূপ ছাড়িয়া দিলেন।

প্রতিভা ও হেম দুই বোনে মিলিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিত। কেতকী বড় কাছে ঘেঁসিত না, অলক্ষ্যে থাকিয়া খিটিমিটি করিত। রাধিকাপ্রসাদ বুঝিতে পারিতেন। রোগের জ্বালার সঙ্গে এ-যন্ত্রণা তাঁহার অন্তরে বাজিত।

ইহার পর হঠাৎ একদিন গৃহে এক সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগের বিবরণ শুনিয়া আশ্বাস দিয়া তিনি ইঁহাকে সুদূর প্রবাসে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং অতি ত্বরায় আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। কিন্তু আজ কাল করিয়া তাঁহার আর ঘরে ফিরিয়া আসা ঘটিয়া উঠিল না। সাধুর মুখের তত্ত্বকথা এবং ধ্যান-ধারণায় আকৃষ্ট হইয়া তদবধি তিনি আশ্রমেই রহিয়া গেলেন। কাজেই প্রতিভা ও হেম রমেশের অপক্ক বুদ্ধির বিধি-ব্যবস্থার উপর সমর্পিত হইল।

পিতা ফিরিয়া আসিলেন না, রোগমুক্ত হইলেন

কি না, সে খবরও জানাইলেন না। কোথায় সে সাধুর আশ্রম, সে খবরও জানা নাই। বয়স্থা ভগিনী দু'টি লইয়া রমেশ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই সময় হরিশের স্ত্রী-বিয়োগের খবর পাইয়া সে প্রতিভার জন্য তাহাকে মনোনীত করিল। সে সহপাঠী—বন্ধু—ভালই হইবে। কিন্তু সে যে বিপত্নীক, আত্মীয়-স্বজন দূরের কথা, প্রতিভাকেও সে-খবর সে জানিতে দিল না।

সে যাহাই হউক বিবাহের সকল অঙ্গ শেষ না হইতে যে এমন একটি বিপত্তি ঘটিবে কে জানিত? গাঁটছড়া খুলিয়া হরিশ যখন সদলবলে যাত্রা করিবে, রমেশ কেমন দিশাহারা হইয়া পড়িল। এ-রকম সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ড বা এ-রকমের দুর্ব্বিপাকের সহিত পিতারই পাকা-রকমের পরিচয় ছিল। সে এই নূতন। হরিশকে সে নিজের ঘরে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া হাত দু'খানা জড়াইয়া ধরিল। বলিল—"সকালবেলা প্রতিভাকে সঙ্গে ল'য়ে একত্রে যাস্, ভাল দেখাবে। এ-রকম খুঁট খুলে চ'লে গেলে মেয়েটির অদৃষ্ট ল'য়ে লোকে তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করবে।"

হরিশ জানাইল—"বাবার এই অসুখ, সে হ'তে পারে না।"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পরেও তাহাকে রাজী করান গেল না।

রমেশ হতাশ হইয়া বলিল—"আমাদের অবস্থাটাও একবার বুঝে দেখা উচিত ছিল। প্রতিভা যে একমাত্র প্রয়োজনেরই বৌ হবে, ভাবি নি। প্রথম পক্ষের স্ত্রী হ'লে এই সামান্য কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা করায় বোধ করি আপত্তি হ'ত না।"

হরিশের অন্তরে আঘাত লাগিল। কিন্তু সে অপেক্ষা করিল না, চলিয়া গেল।

কমলকৃষ্ণের রোগ সারিতে বিলম্ব হইলেও একদিন সারিল। কিন্তু শ্বশুরের গৃহের দিকে হরিশ আর পা বাড়াইল না। বিবাহের রাত্রেই গালে আঙুল ঠেকাইয়া ফিরিতে হইল, সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন, মেয়েটি অপয়া, অলক্ষুণে। হরিশও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি কখনো ইহাকে ঘরে আনিতে হয়, অপরে যাইয়া আনিবে, সে পারিবে না।

হরিশ যখন বিবাহ করিতে যাত্রা করে তখন কমলকৃষ্ণের সামান্য জ্বর। হঠাৎ ইহা এমন বাঁকিয়া দাঁড়াইবে বুঝিতে পারা যায় নাই। পথে নৌকায় বরযাত্রীদের দুইদিন কাটিয়াছিল, ইহারই মধ্যে অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। পাড়া-প্রতিবাসী যাঁহারা বাড়ীতে ছিলেন, হরিশের মাতা নিস্তারিণীর সম্মতি লইয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। হরিশ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিধিমত তদ্বির ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করায় তিনি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বধূ আনিবার প্রসঙ্গ কোনো দিক দিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত আর উঠিল না।

পরে কিছু বেশী দিন হইয়া গেলে নিস্তারিণীই ছেলেকে তাগিদ দিলেন। বলিলেন—"বিয়ের রাত্রেই পালিয়ে এলি—যা, এখন সেখানকার কাজকর্ম্ম সেরে-সুরে বৌমাকে নিয়ে আয়।"

হরিশ বলিল—"আমার এখন ফুরসৎ হবে না, মা!"

মাতা রাগিয়া গেলেন।

হরিশ বলিল—"দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ে—সাতপাক ঘুরেছি—বাকী ভড়ংগুলো নাই-বা হ'ল? কতবার আর আমাকে আলপনার পিঁড়ির উপর চড়াবে? আর কাকেও পাঠাও, নিয়ে আসুক গে।"

নিস্তারিণী বলিতেন—"আমার স্বয়ং লক্ষ্মী বৌ গেল, আমি আর চাই নি, বিয়ের নামে তুই ত' ক্ষেপে গেলি। তোর যেন নিকের বৌ, বৌ ত' তোকে নিকে করে নি! সে যে ক'বার পিঁড়ির উপর চড়ে, তুইও সে ক'বার চড়বি। এতদিন বাদে সেগুলি আর দফে দফে কেহ আদায় করবে না। ভাবনা নেই, তুই আয় একবার।"

ইহাতেও ছেলের মতিগতি কিছু বুঝিতে পারা গেল না। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কর্ত্তাটি ত' এ-সম্বন্ধে কোনো কথা কানে তুলেন না। যেন

বিবাহ দিয়া তিনিই একমাত্র অপরাধী হইয়া পড়িয়াছেন। ভরা সোমত্ত মেয়ে, ছেলেটি এই অধর্ম্ম কুড়াইতেছে,—লোকে, ধর্ম্মে বলিবে কি? তিনি পুত্রকে ডাকিয়া একদিন রাগতস্বরে বলিলেন—"এই দিব্যি করলুম, যদি আর বৌ আনার কথা মুখে বলি! কাকেও পাঠিয়ে আনাতে হয় তুই-ই আনাবি, আমরা পার্ব না।"

হরিশ কিছুদিন বসিয়া বসিয়া মনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করিল। সময় সময় মন যেন এই অজানা-অচেনা জীবনটি উপভোগ করিবার জন্য সুদূরের অভিসারে বাহির হইয়া পড়িত এবং তাহার বিরহ-কাতর ম্লান চক্ষু দু'টি কল্পনা করিয়া নিজেই যেন কেমন নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। অবশেষে সে ভাবিল—এই তুচ্ছ ব্যাপার আর বড় করিয়া তোলা কর্ত্তব্য নয়। সুতরাং কলিকাতায় চলিয়া আসিল। কিন্তু শ্বশুর-বাড়ীতে পদার্পণ না করিয়া এক ছাত্রাবাসে যাইয়া উঠিল। আর কি করিবে-না-করিবে সেইখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন বেলুড়মঠে রমেশের সঙ্গে তাহার হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

দুই পক্ষে আলাপ-আপ্যায়নে বেশ সরসতা জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় রমেশ বলিল—"অসুখ-বিসুখের অজুহাতে দু'-দু'টো বছর কাটিয়ে দিলি, আমাদের আর লোকালয়ে মুখ দেখানোর উপায় নেই। বাবার অবিদ্যমানে বোনটিকে অপাত্রে সঁপে দিয়েছি, এই গালি লোকে এখন আমাকে দিচ্ছে। লেখাপড়া শিখেছে, সেও বা কি মনে করে?"

একটু খোঁচা দিয়া পুনরায় সে বলিল—"ভালমন্দ ইতিবৃত্তের সমস্তটা গোড়ার দিকে তারই জানুবার কথা। লোকে দোজবরের নামে আঁত্‌কে ওঠে, তাই আমি চেপে গেলাম যে, একদিন তুই-ই তাকে মানিয়ে নিবি। তা বেশ করছিস্ এ!"

হরিশ তাহার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিল, বলিল—"আমাকে এবারটির মত মাপ কর্‌তে হবে ভাই! এ-যাত্রায় আমি আর তোমাদের ওখানে যেতে পারছি না। তুমি তাকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার কাছে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে যেও।"

রমেশ ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল। ইহার রকম-সকম দেখিয়া সে গম্ভীর হইয়া উঠিল। এমন অপদার্থ এই ছেলেটি! কলেজে থাকিতে ত' জানিতে পারা যায় নাই। বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"যেতে না পারার কারণ?"

হরিশ বলিল—"কারণ যাই হোক্ আমার মনে কোনো গোলযোগ নেই।"

কিন্তু রমেশের অন্তরের গোলযোগ কাটিল না। তর্ক করিতেও ইচ্ছা হইল না। ইহার এই হীনতায় এবং নিজের কৃতকর্ম্মের তুচ্ছতায় ক্রোধে সে স্ফুটতর হইয়া উঠিল। বলিল—"তুই যদি যেতে না পারিস্ আমিই বা তোর বৌকে গাড়ীর দরজায় এনে ছেড়ে দিয়ে যাব কোন্ পাপে?"

এইরূপে সুরের মাত্রা চড়িয়া উভয়ের মধ্যে আবার কিছু অনৈক্য ঘটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"মা! বৌ কিন্তু মায়াবী।"

নিস্তারিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

"ঘরে পা দিতে না দিতেই বাড়ীশুদ্ধ লোককে বশ ক'রে ফেল্‌লে! বাবা এমন খিট্‌খিটে মানুষ, তিনি পর্য্যন্ত বশীভূত হ'য়ে গেলেন। ধন্যি মেয়ে বটে! এখনো সকল ঘরে পা মাড়ায় নি।"

নিস্তারিণী হাসিলেন। প্রতিভা কাছে বসিয়াছিল, লজ্জা ও সঙ্কোচে সে জড়সড় হইয়া পড়িল।

বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে সে এই প্রথম ঘর করিতে আসিল এবং, বুঝিল, এই যে গুরু-দায়িত্ব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, ইহাই তাহার জীবন-

যাত্রার একমাত্র সহায়। এখানে স্নেহ ঢালিবার সীমা নাই, হিসাব নাই, মাপ নাই। সে যেন আপনাকে এই বিশালতার ভিতরে বিলাইয়া দিতে পারে।

কমলকৃষ্ণ পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিস্তারিণী একাকী ঘর-দ্বার সাম্‌লাইয়া ইঁহার সেবা-শুশ্রূষা রীতিমত করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বৌ আনিবার কথা তিনি সেই হইতে আর মুখে আনেন নাই। এ-দিকে খেজমতের অভাবে স্বামীর খিটিমিটি ভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিনি কন্যাকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। বিমলা চলিয়া আসিল কিন্তু তাহার দ্বারা সংসারের আনুকূল্য বিশেষ কিছু হইল না। ছেলেটি দুরন্ত। তাহার উপর সর্ব্বদা 'সামাল' 'সামাল' চোখ রাখিতে হয়।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া হরিশ এবার রমেশকে পিতার রোগের বৃত্তান্ত জানাইয়া চিঠি লিখিল। লিখিল, একলা প্রাণী না হইলে সে নিজেই যাইত। পিতাকে এ-অবস্থায় রাখিয়া তাহার যাইবার উপায় নাই। সে যেন মনে কোনো তর্ক না তুলিয়া এ-সময় তাহার ভগিনীকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। রমেশও এরূপ দুঃসময়ে সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া ভগিনীকে পাঠাইয়া দিল।

এই দীর্ঘ সময় পিতৃ-গৃহে প্রতিভার সুখে কাটে নাই। কাকমুখে খবরটি নাই, সে বসিয়া-বসিয়া কত কি ভাবিত এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ কল্পনা করিত। দাদার টেবিলের উপরকার চিঠিপত্রগুলি প্রতিদিন সে সুবিধামত নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়া আসিত—কোথাকার চিঠি, কে লিখিল?

এ-দিকে আবার পাড়ার লোকের প্রশ্নবাণেও সুখ-স্বস্তি ছিল না। সঙ্গী-সাথীদের কাছেও এ-রকম পড়িয়া থাকিবার কোনো সঙ্গত কারণ সে উপস্থিত করিতে পারিত না। নিজেকে সে হীন ও অপদার্থ মনে করিত। এইরূপে কত দিন কত নিঃসঙ্গ রাত্রি তাহার জাগরণে কাটিয়া যাইত আর আত্ম-সম্বরণে অসমর্থ হইলে প্রাণ হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিত। হেম কাছে ছিল না যে, তাহাকে লইয়া সে কথঞ্চিৎ ভুলিয়া থাকিবে। পিতাও নিকটে ছিলেন না যে, তিনি সান্ত্বনা দিবেন। তাহার অকথিত বেদনা বুকের মধ্যেই চাপা পড়িয়া থাকিত।

যাহা হউক স্বামী-গৃহে পা দিয়াই রোগের কারণে সর্ব্বপ্রথমে সে ঘনিষ্ঠভাবে শ্বশুরের সংস্রবে আসিয়া পড়িল। তাঁহার খেজমত লইয়াই দিন কাটিত, অন্য কোনদিকে মনোযোগ করিবার সময় হইত না। কিন্তু সংসারে সকল ক'টি লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা সুনিশ্চিত ও সত্য হয়—এই ব্যস্ততায় সর্ব্বদা সে উন্মুখ হইয়া থাকিত।

নূতন বধূ ঘরে আসিলে সংসার ভাঙ্গিবে কি গড়িবে, মেয়েরা ঘাঁটাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্বশুরের ঘরের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া প্রতিভা সেদিন বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। নিস্তারিণী এবং বিমলাও সকালবেলাকার প্রথম পর্ব্বের কাজ সমাধা করিয়া তথায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের ধারণা মেয়েরা লেখা-পড়া শিখিলে অন্তঃপুরিকা-গণের ন্যায় ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় না, স্বাভাবিক লজ্জাশীলতাও হারাইয়া ফেলে, বাহিরের সংসর্গে বিকৃতি-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অল্প কয়েকদিনের সংসর্গে ইহার সলজ্জ স্বভাব ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া ইঁহারা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাই এখন অবসর পাইয়া ইহাকে অজস্র প্রশ্ন করিয়া যাইতে ছিলেন। প্রতিভাও বেশ নম্রভাবে সকল কথার যথাযথ উত্তর করিয়া উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছিল। এমন সময় মতির মা ঝি, বিমলার ছেলে পঞ্চুকে ক্রোড়ে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"গল্প নি'য়ে অষ্টপহর কাটাবে, ছেলেটার খাবার সময় বয়ে গেল যে! পেটটি বাছার প'ড়ে গেছে।"

প্রতিভা উঠিয়া যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইল। মুখে চুমু খাইয়া কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—"সকালে পঞ্চু কি খায়, দিদি?"

বিমলা বলিল—"হালুয়া ক'রে দিয়ে থাকি। বাবার অসুখে সে সকল আর জুটছে না।"

এ সকল তোড়-জোড় কোথায় কি আছে জানিয়া লইয়া সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল এবং পঞ্চুকে কাছে বসাইয়া রাখিয়া হালুয়া তৈয়ারী করিল। শ্বশুরের জন্যও পথ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

তারপর পঞ্চুকে খাওয়াইয়া একবার শ্বশুরের ঘরে তাঁহার দেহের তাপ লইয়া চলিয়া আসিল। বিমলাকে বলিল—"বাবাকে এইবার কিছু পথ্য দিতে হবে।"

বিমলা বলিল—"কিছু আঙুর আর বেদানা ছাড়িয়ে দাও।"

প্রতিভা কহিল—"ডাক্তারে সাবু দিতেও ব'লে গেছেন। পেট ভার রাখে, এরকম কিছু দিতে হবে। সাবু আমি ষ্টোভে ক'রে এসেছি।"

বিমলা হাসিয়া বলিল—"সাবু উনি চোদ্দ পুরুষে কখনও মুখে দেন নি। দিতে গেলে বাটি টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেন। দেখ, তোমার যদি ভাগ্য ভাল হয়।"

প্রতিভা সাহসে ভর করিয়া পথ্য লইয়া হৃষ্টমনে শ্বশুরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"বাবা! পথ্য এনেছি।"

কমলকৃষ্ণ তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন — "কি আন্‌লে?"

"সাবু।"

তিনি মুখ বিকৃত করিলেন।

প্রতিভা বলিল—"অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে জালে চড়িয়ে দানা মেরে ফেলেছি। নুণ আর নেবুর রস দিয়ে টক্ টক্ ক'রে এনেছি। খেতে বেশ ভাল লাগ্‌বে।"

কমলকৃষ্ণ বলিলেন—"দাও।"

খাইতে মন্দ লাগিল না। তিনি 'চোঁ' 'চোঁ' করিয়া বাটিটার সবটুকু খাইয়া ফেলিলেন।

প্রতিভা মুখ-হাত মুছাইয়া দিয়া কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সে ইঁহার ঘরে পা দিতেই লক্ষ্য করিয়াছিল, কমলালেবুর খোসা, বেদানার বিচি, আপেল-নাসপাতির খোসা, পথ্যের এই সকল পরিত্যক্ত অংশ মেঝের উপর বেলা বারটা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিয়া মাছি জড় করে। পরে একবার ঝাঁটা পড়ে — ধোয়া হয় না। মাছির উপদ্রব সমানই থাকিয়া যায়। ঘরের জিনিসপত্র সমস্তই অগোছালো। ঔষধপত্র খাওয়ানর পর্য্যন্ত নিয়মের কোন শৃঙ্খলা নাই। সময় সময় রোগীকে অসহায়ের মত এমনই একলা ফেলিয়া রাখা হয় যে, বাড়ীটার কোথাও যেন কেহ নাই।

সে ইঁহার সেবা-শুশ্রূষায় তনু-মন ঢালিয়া দিল। ঘড়ী ধরিয়া ঔষধ খাওয়ায়, পথ্য দেয়, এটা-সেটা তখনি-তখনি ফেনাইল ঢালিয়া ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলে। শয্যাটি কোন কারণে অপরিষ্কৃত হইলে পাল্‌টাইয়া দিতে কালক্ষেপ করে না। ধূনা-গুগ্‌গুলের গন্ধে কমলকৃষ্ণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠেন 'আঃ'! তা' ছাড়া বাতাস করা, গা-হাত-পা টিপিয়া আরাম দেওয়া, এ সমস্ত দিবারাত্র শয্যার ক্রোড়ে বসিয়া অক্লান্তভাবে সে করিয়া যায়।

প্রতিভা সুশিক্ষিতা, এ-সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। ইহার নিকটে সুনীতির চেয়ে দুর্নীতির আশঙ্কাই তিনি অধিক করিতেছিলেন।' এখন কিন্তু কেমন যেন গোলক-ধাঁধার মত ঠেকিতেছিল।

মেয়েটি বাড়ীতে পা দেওয়া অবধি সর্ব্বক্ষণ কাজকর্ম্ম লইয়া তাঁহার চোখে চোখে ঘুরিতেছে। এত যে খাটুনি, দেহে ক্লান্তি মাত্র নাই। চোখে-মুখে তৃপ্তি যেন লাগিয়াই আছে। ইহার চালচলন, সুরুচি ও সুশৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি আরামের সঙ্গে নিঃসন্দেহ হইতেছিলেন যে, এই অপূর্ব্ব মেয়েটি ঘরের লোক-গুলির প্রত্যেকের পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া নির্লালসায় কর্ত্তৃত্ব করিবে এবং ইহার সংস্পর্শে গৃহখানি ধন্য ও পবিত্র হইবে।

প্রতিভার সেবায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিতে, চাহিয়া দেখিলেন, মেয়েটি একভাবেই বসিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতেছে। বলিলেন—"দেখ ত' মা! জ্বরটা গেল?"

সে থার্মমিটার দিয়া দেখিল জ্বর নাই। বলিল—"জ্বর ছাড়ার পরের একটা ওষুধ আছে, এইবার দি'। আর যে আপনার হাত পা জ্বালা করে, সেজন্যে মিছরির সরবৎ ক'রে রেখেছি। ডাক্তারকে কেহ এঁরা জিজ্ঞাসা করলেন না, আমিও লোকজনের মধ্যে কাকেও দিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে পারি নি। কিন্তু মিছরির সরবতে আপনার উপকার বই অপকার হবে না। কুইনাইনে শরীর আপনার জ্বলে গেছে।"

কমলকৃষ্ণ কিছু বলিলেন না। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া বুঝা গেল, ডাক্তারেরও বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়ত তাঁহার মনে কোনো সময় দ্বিধা আসিতে পারে, কিন্তু ইহার ব্যবহার এতই সরল, অপরের দেহের ক্লেশ খুঁজিয়া বাহির করিতে দরদ এমন প্রচুর এবং দৃষ্টি এমন কল্যাণকর যে, সে যদি মুখে বিষ ঢালিয়া দিয়া ঢোক্ গিলিতে বলে, অমৃত বোধে নিঃসন্দেহে তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

'শেষের কবিতা'

কথা — শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চিত্র — শ্রীহাসিরাশি দেবী

রূপের মায়ের দেওয়া আদুরে নাম নীলমণি, গ্রামের স্কুলে সবাই ডাকতো নীলু-সোনা, কিন্তু কলকাতা এসে কলেজে সে নাম লিখিয়ে ব'সল কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি।

চেহারাটা কুসুমিত লতার মতই বটে, সোজা দাঁড়ালে মনে হয়, তার আশ্রয় চাই, নইলে সে প'ড়ে যাবে। সমস্ত দেহটাই তার সঙ্করণশীল, আঁকড়ি নেই এই যা রক্ষা, থাকলে মুস্কিল হ'তো।

ফার্ষ্ট ইয়ার আর সেকেণ্ড ইয়ার—এই দু'টো বছর কলেজের ছেলেদের ফাঁড়ার সময়, ভারি খারাপ অবস্থা। আজকালকার দিন 'সহ-শিক্ষা' এসে মাথা ওদের বিলকুল্ ঘুলিয়ে দেয়।

দোষটাই বা কি? ছিল স্কুলে, সেখানে 'সহ-শিক্ষা' আজও প্রচলিত হয় নি, কেবল উদ্যোগই চলছে, কিন্তু কলেজে এসে 'সহ-শিক্ষা'র ফলে তারা পাশে দেখতে পায় মেয়েদের, দেখতে দেখতে নীরেট গদ্য প্রকৃতি ছেলের মাথাও পদ্যে ভ'রে ওঠে। সেই জন্যেই দেখা যায়, যে-সব ছেলে স্কুলে থাকতে চৌদ্দ কি ষোল অক্ষরের বাছ-বিচার না ক'রে কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপ না বেছে গড়্-গড় ক'রে পদ্য প'ড়ে যেত, কলেজে এসে তারা রীতিমত বিচার করে—নিজেরাও আবার কবিতা লিখতে বসে।

বর্ত্তমানে সুযোগও বেশ জুটে গেছে, কোনো রকমে গোঁজামিল দিতে পারলেই কবিতা লেখা চলে। সেই সেকালের ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, পয়ার—এ-সব মেনে চলবার, আঙ্গুল গুণবার আর দরকারই নেই। এক লাইনে কুড়িটা কেন, ত্রিশটা অক্ষর থাক, পরের লাইনে চার, ছয় বা আট অক্ষরই থাক, মিলে গেলেই হোল।

কবি আরও সুবিধা ক'রে দিয়েছেন, মিল না থাকার পথ দেখিয়ে। মিলের জন্যে আগে অনেক খাটতে হ'তো, আজকাল সে ভয়ও নেই। লিখে গেলেই হ'ল গোটা-কতক শক্ত কথা বসিয়ে, লোকে যদি তা না বোঝে, মিল নেই ব'লে দোষ দেয় — তাতেই বা কি?

লরেন্স, হুইট্‌ম্যান প্রভৃতি কবির কবিতার ধারা আজকাল বাংলাদেশের তরুণেরা আদর্শ হিসাবে নিয়েছে। আজকাল ভাঙ্গা-গড়ার যুগ এসেছে, আর কি ছন্দ মিলতে সেই আঙ্গুল ধ'রে বর্ণমালা গুণতে হয়?

সুতরাং কলকাতায় এসে, এই আবহাওয়াতে কুসুমিত চ্যাটার্জ্জিও হ'য়ে পড়ল নিভাঁজ নিখুঁত একটি কবি।

চেহারাখানি অতি ক্ষীণ, পাছে স্থূল হ'য়ে যায়, এই ভয়ে কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি না কি পেট ভ'রে খায় না, অন্ততঃপক্ষে সহপাঠীরা তাই বলে।

তবু তারা কবির ভক্ত—যেহেতু কবি সুন্দর কবিতা লেখে।

আশ্চর্য্য শক্তি, যা দেখে তাই নিয়ে সে লিখতে পারে। একদিন একটি তিন-পা বেড়াল কোনো রকমে বোর্ডিং-এ ঢুকেছিল, বেচারা শেষে আর বার হ'তে পারে না। সেদিন বোর্ডিং-এর রান্নাঘরে ও-বেলার জন্যে রাখা কয়েকটা মাছের মুড়ো খুঁজে পাওয়া যায় নি। দুষ্ট চাকর রামতারণ (ছেলেরা তাকে 'অধমতারণ' ব'লে ডাকত) দরজার কাছে পা ছড়িয়ে ব'সে খইনি ডলতে ডলতে বিকৃত মুখ অধিকতর বিকৃত ক'রে বলেছিল—এ কি আর বেরালের কাজ বাবু? ওইটুকু বেরাল—তাতে পুরো চারখানা পা ও ওর নেই, তিনখানা পা নিয়ে ও কি পাঁচ-ছয়টা মাছের মুড়ো খেতে পারে? বামুন ঠাকুর নিশ্চয়ই সরিয়েছে, সে আর বলতে হবে না।

তা হোক, এই তিন-পা বেড়ালটাকে উপলক্ষ্য ক'রে কুসুমিত সুন্দর একটি কবিতা লিখে ফেললে—

শ্রাবণের ঘন মেঘ বিদ্যুৎ ঝলসি
চলে যায়—জানালায় কে এলে গো রূপসি?
চোখে তব বিদ্যুৎ ঘন ঘন ঝলসায়,
আসিবে বলিয়া ঘরে আসিয়াছ জানালায়।
চুপি চুপি আসিয়াছ জানে না কো কেউ আর—
কি নেবে রূপসী তুমি—চাও কেন চারিধার?
তবু যদি থাকিত গো তিন ছাড়া আর ঠ্যাং—
আসিতে সহজে ঘরে দিতে ত' হ'তো না ল্যাং।
বরষার বারি ঝরে, বাহিরে রহে না কেউ—
জানালা বাহিরে ডাক সকাতরে 'মেউ মেউ'।



কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি

কবিতা প'ড়ে সহজেই বোঝা যায় তিন-পেয়েটি জানালার বাইরে মেউ মেউ ক'রে সকাতরে ডাকায় কাতর-হৃদয় কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি দরজা খুলে তাকে বোর্ডিং-এ প্রবেশ করতে দিয়েছিল।

একবার গিয়েছিল সে চণ্ডীদাস দেখতে কিন্তু আশে-পাশে মুখ ফিরিয়ে সে দেখলে আরো অনেক মেয়েকে।

অত্যাধুনিক মেয়েরা অত্যন্ত সাজ ক'রে এসেছে, মুখে রং, চোখে রং, ঠোঁটে রং।

রামীর চেহারা তাকে বেশী মুগ্ধ করলে, না এই আধুনিক মেয়েরা বেশী মুগ্ধ করলে, তা বলা কঠিন। কিন্তু বোর্ডিং-এ ফিরেই সে কবিতা লিখে ফেললে—

বাঁচিয়া থাকিবে তুমি চিরকাল হে কবি চণ্ডীদাস—
অমর তোমার প্রেমের কাহিনী থাকিবে বর্ষ মাস
ওগো রজকিনী রামী,
তোমার শান্ত চরণের তলে শরণ লইনু আমি।

তবু যা' হোক লেখা-পড়া চলছিল। কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি কোনক্রমে ফার্ষ্ট ইয়ার ডিঙ্গিয়ে এসে প'ড়ল সেকেণ্ড ইয়ারের ধাপে।

চোখে উঠেছে তখন চশমা—

ফার্ষ্ট ইয়ারে চোখ দু'টো সবে খারাপ হ'য়ে এসেছে, বাপ জনার্দ্দনকান্তকে চোখের কথা বলতে তিনি প্রথমে ধমক দিলেন বকাটে ছেলে ব'লে। তারপর ভাবলেন—যদি সত্যিই চোখ খারাপ হ'য়ে থাকে! সুতরাং দ্বিধার সঙ্গে বললেন—আচ্ছা। কিন্তু তাঁর মনের ভেতরে খুঁৎ রয়েই গেল। তাঁদের বংশে অত অল্প বয়সে চোখ খারাপ হয়, এ কথা তাঁর মন মানতে চাইল না। ভাবলেন, এ-সব সহরের দোষ! সুতরাং সহরের উপর তিনি চটে গেলেন।

কিন্তু সে যাই হোক্ কুসুমিতের চোখে চশমা উঠ্‌ল।

নতুন চশমা প'রে ছেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা একবার দেখে নিলে।

চোখে চশমা, সামনের চুল টানলে গলা পর্য্যন্তই নামতে পারে বোধ হয়, পেছনের চুল একেবারে চেঁছে ফেলা। কলেজের মেয়েরা এই চেহারা দেখে হাসে, কিন্তু তবু তারা তাকে একটু স্নেহ করে। সে কবিতা লেখে, বড় ঠাণ্ডা মানুষ।

ফার্ষ্ট ইয়ারে যখন সে পড়তে এলো, তখন মেয়েদের দেখে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'তো, চোখ তুলে তাদের পানে তাকিয়ে থাকা ত' দূরের কথা।

কিন্তু কবিতা দেবী ঘাড়ে ভর করার পর হ'তে সে মানুষ হ'য়ে গেছে।



এ কি আর বেরালের কাজ বাবু?…

মেয়েরা বলে এমন অনুগত ভক্ত আর দেখা যায় না। যার যা ফরমাস অসঙ্কোচে ক'রে যায়, আর সে তা পালন ক'রে ধন্য হ'য়ে যায়।

রজকিনী রামীর কথা তবু সে ভুলতে পারে না…

প্রেমের পাত্রী সে খুঁজে পায় না।

তাদের ক্লাসে পড়ে পাঁচটি মেয়ে। যথাক্রমে তাদের নাম রিক্তা রায়, গোধূলী সামন্ত, ব্যথিতা সরকার, পল্লবিনী পাত্র, নৈশা মজুমদার।

রিক্তা রায় বড় গম্ভীর চালে চলে, বড় একটা কাউকে আমল দেয় না। গোধূলী সামন্ত দিন-রাত

দাঁত খিঁচিয়ে থাকে, দিনরাতই সে মহাবিরক্ত, দুনিয়ার কিছুই তার বুঝি ভালো লাগে না। ব্যথিতা সরকার নাচ শিখবার জন্যে মহা ব্যস্ত, কোথায় নাচের ক্লাসে যোগ দিয়েছে, একবার দু'ঘণ্টার জন্যে ক্লাসে এসে স'রে পড়ে। পল্লবিনী পাত্র ও নৈশা মজুমদার প্রফেসারের বাধ্য ছাত্রী, ক্লাসে আসে পেঁচার মত মুখ ক'রে, চোখ



গোধূলী সামন্ত

আর কোনদিকে পড়ে না তাদের একমাত্র প্রফেসারের মুখারবিন্দ ছাড়া।

ছেলেরা বিরক্ত হয়—ক্লাসে বসে ভ্যাংচায়, মাঝে মাঝে জুতোর খস্‌খসানিতে সারা ক্লাস শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে।

এরা হিংসা করে কুসুমিত চ্যাটার্জ্জিকে।

বেচারা কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি! রিক্তা রায় কয়েক দিন আগে মোটর ড্রাইভ ক'রে চলেছিল, পথেই গেল পেট্রোল ফুরিয়ে। রিক্তা রায়ের ব্যাগ একদম খালি!

পথে হঠাৎ দেখা হয় কুসুমিত চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে; বেচারার পকেটে ছিল কলেজের মাইনে, তাই দিয়ে অম্লানমুখে সে পেট্রোলের দাম মিটিয়ে দিলে। শুধু তাই নয়, মোটরের মেসিন ছিল খারাপ, 'ষ্টার্ট' দিলেও ঠেলার দরকার হ'লো। কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি পথের দুই-একজন লোককে পয়সা কবুল ক'রে ডেকে এনে গাড়ী ত' ঠেলালই, নিজেও গলদ-ঘর্ম্ম হয়ে যতটুকু শক্তি ততটুকু গাড়ী ঠেলেছিল। রিক্তা রায় সেদিন তাকে পাশে বসিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে চা পর্য্যন্ত খাইয়েছিল।

কবির জয়-জয়কার!

ব্যথিতা সরকার নাচতে গিয়ে যে দিন পা ভেঙ্গে ফেললে, সেদিন কবি তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলো। এতগুলি মেয়ের মধ্যে ব্যথিতাই তার মনটাকে আকর্ষণ করেছিল বেশী।

চেহারা যাই হোক, নাচে সে নাম করেছে যথেষ্ট।

রং তার কালো, চেহারা লম্বায় তারই মত—হাতের আঙ্গুলগুলো সরু—

কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি সগর্ব্বে বলে—ওই তো আর্ট। আঙ্গুল সরু আর লম্বা পা না হ'লে নাচের ভঙ্গি খুলবে কি করে, মুদ্রাই হবে না যে!

লোকে বলে সে না কি ব্যথিতা সরকারকে ভালো-বেসে ফেলেছে। কবি মুচকি হাসি হাসে, অর্থাৎ কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়।

লোকে বলে একদিন না কি সে ব্যথিতা সরকারের হিল্‌তোলা একপাটি জুতো কাগজে মুড়ে বগলে ক'রে নিয়ে চলেছিল কোথায় মেরামত করতে দিতে। তাতে অবিশ্যি দোষ নেই, কেন না ভালোবেসেছে ব'লে।

একজামিনের রেজাল্ট বার হ'লে দেখা গেল তার কোন বিভাগেই কুসুমিত চ্যাটার্জ্জির নাম নেই।

জনার্দ্দনকান্ত পত্র দিলেন—আর লেখা-পড়া শিখে কাজ নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো বাপু, আর দরকার নেই।

কুসুমিত চ্যাটার্জ্জির মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, সে জানে বাড়ী যাওয়া মানে বিয়ে করা। নোলোক নাকে, পায়ে বাজে তোড়া বাঁ মল—এমনি একটি

মেয়ে হবে তার জীবন-সঙ্গিনী। কোথায় ব্যথিতা সরকার, কোথায় সেই নোলোক নাকে মেয়ে!

মনের দুঃখে কয়টা দিন সে ঘর হ'তে বার হয় না, চট ক'রে একটা কবিতা লিখে ফেলে—

দিব না তোমারে যেতে ওগো মোর সুন্দরী প্রেয়সি,
রাখিব তোমায় বাঁধি অন্তরের অন্তহীন তলে,
ফাগুনের পূর্ণিমাতে মোর চাঁদ পড়িবে কি খসি?
অন্ধকার গুহামাঝে, মোর চোখে অশ্রুধারা গলে—

কবিতাটি লিখে তখনই সে ব্যথিতা সরকারের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তারপর সটান বিছানায় শুয়ে প'ড়ে সে মানস চোখে দেখতে থাকে ব্যথিতা সরকার তার সেই কবিতাটা বুকে চেপে ধ'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—তার চোখের জলে কঠিন মেঝের অনেকটা জায়গা ভেসে গেছে।

ভয় নাই, ভয় নাই প্রিয়তমে ব্যথিতা—কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি বেঁচে রয়েছে। হোক সে লতার মত কমনীয়, নমনীয় তবু তার শক্তি আছে। সে তোমায় তার মন্ত্রের সহস্র আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবে, তোমায় কোথাও স'রে যেতে দেবে না।

ব্যথিতা সরকারের পত্র এলো—প্রিয় কবি, আজ তোমায় একবার আসতেই হবে, বিশেষ দরকার।

কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি লাফিয়ে উঠল! আজ ব্যথিতা সরকার নিশ্চয়ই সে পৌঁছবামাত্র ছুটে আসবে, দুইটি শীর্ণ বাহু-লতা দিয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করবেই; কবিতা প'ড়ে সে নিশ্চয়ই কেঁদেছে।

কুসুমিত ঢুকুল মুগ্ধ মন নিয়ে ব্যথিতার বাড়ীতে।

বর্ষা-ধৌত যুঁই ফুলটির মত স্নিগ্ধ-শান্ত ভাব নিয়ে ছল ছল চোখে ব্যথিতা সরকার তাকে অভ্যর্থনাও করলে—সঙ্গে তার নাচের মাষ্টার নবনীত সাধু।

তারপরেই শীর্ণ হাতখানা কবির হাতের ওপর রেখে ব্যথিতা সরকার বললে—আজই তোমায় একটা বিয়ের কবিতা লিখে দিতে হবে কবি!—কাল বাদে পরশু আমাদের বিয়ে—পার ত' নামটাও দিয়ো। পাত্র—নবনীত সাধু আর পাত্রী—রাক্ষসী—রাক্ষসী—

মেয়েগুলো সত্যি রাক্ষসীর জাত। বেচারা কবি এক পলকে দিশেহারা হ'য়ে পড়ল, মুহূর্ত্তে তার চোখে-



ব্যথিতা সরকার

মুখে জেগে উঠল দারুণ ভয়ের চিহ্ন, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তার 'পরে।

চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। সে গেরুয়া রং দিয়ে এর মধ্যেই কাপড়-

জামা ছুপিয়েছে। সে দিন না-কি বাজারে গিয়ে একটা চিমটে আর একটা কমণ্ডলুও কিনে এনেছে।

অকৃত্রিম বন্ধু রাজ্যেশ্বর দরজার পাশ হ'তে একবার উঁকি দিয়ে দেখে তখনই তার বাপকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে এলো।

ঘরের ভেতর টেবিলের ধারে গেরুয়া বসন পরিহিত যোগী তার 'শেষের কবিতা' লিখছে। দেয়ালের গায়ে ঝুকে ঝুলছে কমণ্ডলু ও চিমটা।

সে লিখছিল—

রে নারি! তোর ছলনাতে আর ত' আমি ভুলব না,
তোর ছলনার দোলায় নারী, আর ত' আমি দুলব না!
হাতে আমার নাড় দিয়ে কর্‌লি আমায় আনমনা,
রইব এবার অনেক দূরে শত ডাকেও আসব না!

ভয়ে ভয়ে রাজ্যেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে—ওটা কি লেখা হ'চ্ছে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কবি উত্তর দিলে—'শেষের কবিতা'। যে দিন আমার 'শেষের কবিতা' প্রকাশ হবে, দেখো তুমি, সবাইকে চোখের জল ফেলতে হবে, এই মেয়েমানুষ জাতটাকে সবাই চিনতে পারবে। উঃ, কি নেমকহারাম পাজি এরা!

রাজ্যেশ্বর বললে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' নামে একখানা বই আছে না?

কবি সগর্ব্বে উত্তর দিলে—রবীন্দ্রনাথের নাম ত' আমি ডুবিয়ে দেব, 'শেষের কবিতা' বলতে লোকে আমারই লেখা বুঝবে। আজই পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে এখানা প্রেসে দিয়ে আসব। যে দিন প্রকাশ হবে, ব্যথিতাকে নিজের হাতে একখানা পাঠিয়ে দিয়ে, একখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আমি অজানা পথে ভেসে চলব। সেই হবে আমার অস্ত্র—আমার মন্ত্র—আমার জপ-তপ-সাধনা।

তার চোখ দিয়ে জল বুঝি উপছিয়ে পড়ে।

কিন্তু এমনি সময় হঠাৎ এসে পড়লেন বাপ



একপাটি জুতো কাগজে মুড়ে বগলে ক'রে নিয়ে…

জনার্দ্দনকান্ত। পিছন হ'তে ছেলের কান চেপে ধ'রে হুঙ্কার ছেড়ে ডাকলেন—নীলে!

সেই পুরানো নাম, পুরানো গলার বাজেখাঁই শব্দ নীলের পেটের পিলে লাফিয়ে উঠল।

মুখ খিঁচিয়ে, দাঁত বার ক'রে জনার্দ্দনকান্ত বললেন—বেটা! আমি রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, মাঠে-মাঠে ধান বুনে খেটে খাই, আর তুই সেই ধানের ভাত খেয়ে এখানে ব'সে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে যাস, আর নিরাশ হয়ে সন্ন্যাসি সাজিস? আমার ক্ষেতের ধানের টাকায় এত বিদ্যে হয় তা ত' জানতুম না!

বাপের হাতটা তখনো কানের উপরে কিন্তু তবু রুদ্র প্রকৃতি জনার্দ্দনকান্তের পানে চেয়ে নীলে ওরফে

কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি ভাবছিল—এ বিশ্বাসঘাতকতা করলে কে, তার বাপকে খবর দিল কে?

কানটাকে যে ছাড়াতে হবে তা' তার খেয়ালও হয় নি।

জনার্দ্দনকান্ত কানে একটা পেঁচ ক'ষে বললেন—চলো বাপু, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে চলো, আর বিস্তের কাজ নেই। ও-সব ব্যথিতা, রিক্তা, গোধূলী তোমার জন্যে তৈরী হয় নি, তোমার জন্যে আছে গাঁয়ের কালী, তারা, খাঁদী, হাঁদি। তাদেরই একটিকে ঘরে এনে সুখ-শান্তিতে বাস করবে, চল।

চোখে জল আসতে আসতে কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি বড় সামলান সামলে নিলে।

কয়েকটা বছর পরে খুলনা জেলার একটা গ্রামে গেলেই দেখা যেত একটা প্রকাণ্ড বড় বাড়ি—ইট খসেছে, চূণ গলছে। বাড়ীটি যেন দাঁত বার করে হাসছে।

সেই বাড়ীর কর্ত্তা বেলা দুপুরে একজোড়া চটি পায়ে, মাথায় একটা বিবর্ণ ছাতা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফেরে—রোজই এক নিয়মে চলে।

অতি কম ক'রে আটটি ছেলে-পুলে তাকে ঘিরে ধ'রে বিকট চীৎকার ক'রে বাড়ী ফাটায়, বলে—বাবা এসেছে, মা, বাবা এসেছে।

গৃহিণী বারান্দায় মাদুরে শুয়ে থাকেন, বিপুল দেহ-ভার অতিকষ্টে তুলতে তুলতে বাঁ হাতে বড় নথটাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে নাকি-সুরে বলেন—এসেছে তা' স্বর্গে যাব না কি? খানিকটে বসুক, জিরিয়ে চান ক'রে এসে জল-দেওয়া ভাত আছে খাক।

ওই শীর্ণ লতার মত চেহারাটাই মাত্র প্রমাণ দেয়, সে কবি কুসুমিত চ্যাটার্জ্জি; কয়েক বছর আগে যে 'শেষের কবিতা' লিখতে চেয়েছিল।

ছাতাটা মুড়ে সে বারাণ্ডায় ব'সে পড়ে—শ্রান্ত কণ্ঠে ডাকে—পদি, এক ছিলিম তামাক সাজতো, মা।

তামাক খেতে খেতে সে ভাবে কোন্ জমিটায় কতখানি সার দেওয়া দরকার, কার সঙ্গে মামলা করতে হবে।

কান্তে-লাঙ্গলের বহর দেখে কাগজ-কলমের কাব্য-দেবী অনেক আগেই পলায়ন করেছেন।

'উদয়নে'র
আশ্বিন (পূজা) সংখ্যা
চিত্রে, গল্পে, প্রবন্ধে ও বিবিধ
বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনব হইবে।
বিস্ময়ের খনি!! অপরূপ বৈচিত্র্য!!
অপূর্ব্ব সম্পদ!!
পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন

রাত্রি ও পৃথিবী

শ্রীকরুণাময় বসু

গোধূলী উড়েছে চঞ্চল ডানা মেলি
ধূসর ক্ষেতের পারে,
বনে বনে ফেরে হারানো বালিকা কোন্?
শুধু ভেসে আসে দেহের গন্ধ তার
বিজন অন্ধকারে,
খুঁজে খুঁজে মোর ক্লান্ত হয়েছে মন।
শুধু দেখিয়াছি আকুল কেশের ভার
শ্রাবণের মেঘে কীর্ণ হয়েছে তার।
বালুতে আঙুলে আপনারে ভুলে কী লিখে যায়!
বিলের কিনারে সাদা বক ওড়ে লঘু পাখায়।

মনে হয় যেন দুপহর রাতে কার
কানা-কানি ভেসে আসে,
শূন্য মাঠের বায়ুরে আঘাত করি';
দূরে নিভে গ্যাছে ক্লান্ত প্রদীপ শিখা
কাহার দীর্ঘশ্বাসে,
আঁধারে তারকা উঠিয়াছে মর্ম্মরি'।
মেঘেরা হারায় লঘু পালকের পাঁতি,
এলো চুলে তাই খুঁজেছে বালিকা-রাতি।
স্তব্ধ আকাশে পায়ের শব্দ শোনা কি যায়?
সাগরের জল ব্যাকুল হয়েছে সাদা ফেনায়।

জীবন উড়েছে যৌবন-পাখা মেলি'
সুদূর সাগর তরে,
ফিরে একাকিনী না-জানি সে কোন্ মেয়ে!
ভুলে যাওয়া কোন্ স্বপ্ন-রাতের দীপ
আঁচলে এনেছে ঘিরে,
কাছে আসে মোর সন্ধ্যার সিঁড়ি বেয়ে।
বুনো ঝাউগাছ কাঁপিছে বনের ধারে,
আলেয়ার আলো খুঁজিয়া মরিছে কারে?
অচেনা মেয়েটি চুল এলো করি' কাঁদিছে ওই,
ছল ছল চাঁদ ইচ্ছামতীর জল অথই।

ভাবিবার কথা

স্ত্রীশিক্ষার ভবিষ্যৎ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ

চৈত্র সংখ্যার 'উদয়নে' সম্পাদক মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীর একসঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে 'সাময়িকী'তে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়াছেন। 'ছেলেরা এবং মেয়েরা যে বয়সে স্কুল কলেজে পড়ে সেইটেই সব চেয়ে মানুষের পক্ষে সঙ্গিন বয়স!.....এ বয়সে বিচার-বুদ্ধিকে আমল না দেওয়াই হয়ে দাঁড়ায় মানুষের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি। সুতরাং নর-নারীর এক সঙ্গে বসে শিক্ষা করার ভিতরে যে একটা বড় রকমের বিপদ আছে, তাতে সন্দেহ নেই।'

এই সহশিক্ষা-পদ্ধতি লইয়া দৈনিক পত্রগুলিতে প্রায়ই আলোচনা দেখিতে পাই। এই পথে বিপদ আছে, এই বিষয়ে সম্ভবতঃ মতভেদ নাই। কিন্তু এই বিপদ বরণ করিয়া লইয়া 'যা থাকে কপালে' বলিয়া এই পথেই অগ্রসর হইয়া চলা উচিত কি না, মতভেদ তাহাই লইয়া। সমাজ স্বাভাবিক গতিবশে এই পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—আশঙ্কাবাদিগণের আশঙ্কায় কেহই বড় কর্ণপাত করিতেছে না। এ অবস্থায় কি কারণে কি ঘটিতেছে, তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরূপে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

বর্ত্তমান লেখকের পরিচিত কোন মধ্যবিত্ত ভদ্র-সন্তানের শুভ-পরিণয় কার্য্যটা প্রায় ২৫ বছর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। বরের বয়স ছিল ২১, কন্যার বয়স ১২। বর সদ্য বি-এ পাশ করিয়া কলেজে এম্-এ পড়িতে চলিয়াছেন, এমন সময়ের বিবাহ। অভিভাবক উপার্জ্জনশীল খুড়াই আগ্রহ করিয়া বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন,—কলেজ জীবন-সমাপ্তি এবং চাকুরি-জীবনে প্রবেশ ইহার তিন বৎসর পরে সঙ্ঘটিত হয়। এই জীবন-কাহিনী অবতারণার উদ্দেশ্য—২৫ বছর পূর্ব্বের একটা মাপ-স্থাপন। তখন ২১।২২ বছরের ছেলে ১২।১৩ বছরের মেয়ে বিবাহ করিত। সকলেই যে ঠিক ঐ বয়সে ঐ বয়সের মেয়েকেই বিবাহ করিত, তাহা নহে। তবে বরের বয়স ২১।২২ এবং কন্যার বয়স ১২।১৩—ইহাকে শিক্ষিত ভদ্র-পরিবারে ২৫ বছর পূর্ব্বে প্রচলিত মাপ বলিয়া ধরা যায়। ঐ আমলে লেখা-পড়া শিখিয়া কাহারও বড় বসিয়া থাকিতে হইত না। অন্ততঃপক্ষে স্কুলমাষ্টারী একটা জুটিতই। কাজেই 'ঘরে বৌ আনিয়া কি খাওয়াইব'—এই চিন্তায় শিক্ষিত শ্রীমানগণ বড় বেশী বিব্রত বোধ করিতেন না। ১৯১২ সনে এম্-এ পাশ করিয়া উক্ত ভদ্রলোক তিনটি হাইস্কুলে হেডমাষ্টারির জন্য দরখাস্ত করেন—তিন স্থান হইতেই নিয়োগপত্র আসে।

এই ২৫ বছরে দেশের অবস্থা প্রভূত পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে। এম্-এ পাশ করিয়া দরখাস্ত করিলেই আর চাকুরি জোটে না। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে ১২০০ হাইস্কুল আছে। প্রত্যেক স্কুলে গড়পরতা ৩ জন করিয়া বি-এ ও এম্-এ আছে ধরিলে, স্কুলগুলিতে মাত্র ৩৬০০ বি-এ, এম্-এ স্থান পাইয়াছে। সরকারী চাকুরি এবং আফিস-আদালতের প্রয়োজন মিটাইয়াও বহু বি-এ, এম্-এ বেকার বসিয়া আছে। ইহার উপর প্রত্যেক বছর ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪।৫ শত বি-এ, এম্-এ নূতন বাহির হইয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। নূতন চাকুরির কোন পন্থা তো খুলিতেছে না-ই, পুরাতন পন্থাগুলির মধ্যে স্কুল-মাষ্টারির রাস্তা সঙ্কীর্ণ হইতে চলিল। বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে বড় বেশী হাইস্কুল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাদের সংখ্যা কমাইবার উপায় চিন্তা করিতেছেন। ইহা ছাড়া আফিসে, আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, রেলে, ষ্টীমারে সর্ব্বত্র রিট্রেঞ্চমেণ্ট অর্থাৎ ছাঁটাই। দেশের এই বিষম অবস্থায় বাঙ্গালী যুবকগণ কি করিবে, কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। চাকুরি না জুটিলে চাষ-বাস করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সে শিক্ষা, উদ্যম, মনের গতি, মূলধন—বাঙ্গালী যুবকের নাই। লবণ তৈয়ারী করা, চামড়া পাকা করা, সিগারেট বানান, কাপড়ের কল, চিনির কল, চটের কল—কোথাও বাঙ্গালী যুবক লব্ধপ্রবেশ হয় নাই, চট্ করিয়া হইয়া পড়িবে, এমন আশাও নাই। এমত অবস্থায় ইহারা যে বিবাহ-বিমুখ হইয়া দাঁড়াইবে—'বৌ ঘরে আনিয়া কি খাওয়াইব'—এই চিন্তাটাই যে এ-ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইবে—ইহা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। এই গেল বরপক্ষের কথা।

এইবার কন্যাপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ২০।২৫ বছর পূর্ব্বেও যখন জীবিকা সংস্থান-সমস্যা এমন তীব্র হইয়া উঠে নাই, তখন যৌবনাগমের পূর্ব্বেই, অথবা যৌবনাগম মাত্রই (অর্থাৎ ১১।১২।১৩ বছর বয়সে) কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য সকল গৃহস্থই সচেষ্ট হইতেন, পাত্রস্থা করিতে সফলকামও প্রায়শঃই হইতেন। এই যুগে গৌরীদান করিয়া পুণ্য লাভের জন্য বড় বেশী কেহ (আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়ের কথাই বলিতেছি) লোভাতুর হইয়া উঠিতেন না—আবার ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে যাহাতে মেয়েটি পাত্রস্থা হয়, সেইদিকেও সকলের সজাগ দৃষ্টি ছিল। কন্যার বয়স এই সীমা ছাড়াইয়া গেলে কন্যার পিতাকে সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হইত।

ইহার পরেই আসিল ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধ। এই মহা দাবানলে ইয়ুরোপকে তো দগ্ধ করিয়াছেই, বহু দূরে থাকিয়াও উহার দারুণ তাপ হইতে আমরা অব্যাহতি পাই নাই। যুদ্ধের ফলে আসিল ভারত-শাসন-সংস্কার এবং তাহার সঙ্গে অনেক কিছু, যাহার ফলে হিন্দু যুবকগণের জীবিকা সংস্থান প্রত্যহই কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহার উপর জগৎ-ব্যাপী দারিদ্র্য বাঙ্গালার, তথা ভারতের মধ্যবিত্ত ভদ্র-সম্প্রদায়ের উপর আসিয়া পড়িল বজ্রাগ্নির মত। বহুলোক চাকুরিচ্যুত হইয়া অসহায় হইয়া পড়িলেন। লোন আফিসে গচ্ছিত টাকার বারো আনাই মারা গেল। সুদে খাটান টাকাও ঐ পথেই গেল। প্রজা-দের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানা এক পয়সাও আদায় হইল না। মধ্যবিত্তগণের আর্থিক অবস্থা যখন এই রকম শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল তখন কন্যা পাত্রস্থা করিবার চেষ্টায় স্বভাবতঃই শৈথিল্য আসিয়া গেল। ঠিক এই সময় 'সরদা-আইন' পাশ হইল—১৪ বছর পূর্ণ না হইতে কোন কন্যাকে পাত্রস্থা করা আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। 'সরদা-আইন' যাঁহারা পাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের মঙ্গলের জন্যই এই আইন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থ-নৈতিক সঙ্কট বশতঃ যখন কন্যা পাত্রস্থা করিবার চেষ্টায় মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ে স্বভাবতঃই শৈথিল্য আসিতেছিল, এমনি সময়ে এই আইনের প্রবর্ত্তন হওয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্বে একটা দারুণ পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে কন্যাদায় অপেক্ষা অন্য কোন দায় বা প্রয়োজনই বড় বলিয়া স্বীকৃত হইত না। এই আইনের প্রবর্ত্তনের ফলে মনের সেই ভাব আর নাই। বাঙ্গালী ঘরের অধিকাংশ মেয়েরই ১১।১২ বছরে স্তনোদ্গমাদি হয়, ১৩।১৪ বছরে মেয়ে প্রায়ই পূর্ণ যুবতী হইয়া দাঁড়ায়। আইন দ্বারা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া যাঁহারা চোখের উপরে কন্যার এই শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া যান তাঁহারা প্রায়ই —'যাহাতক ১৪, তাহাতক ১৫'; এবং 'যাহাতক ১৫, তাহাতক ১৬'—এই ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহার উপরে আর্থিক অস্বাচ্ছল্য; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ কারণে উপযুক্ত বরের দুষ্প্রাপ্যতা যোগ দিয়াছে। ফলে ঘরে ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বয়স

১৪ ছাড়াইয়া ১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২-এ যাইয়া পৌঁছিতেছে। ফলে যাহা হইতেছে, তাহাও নিতান্তই স্বাভাবিক।

সহরে অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরের তো কথাই নাই, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ঘরেও আজকাল প্রত্যেক বালিকাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ৭।৮ বছর বয়স হইলেই মেয়েরা স্কুলে যাইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে ১২।১৩ বছর বয়সে, অর্থাৎ মেয়ে যখন ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে পড়িত, তখন প্রায়ই তাহার বিবাহ হইয়া যাইত। এখন বিবাহের তাগিদ ১৪ বছর পূর্ণ না হইতে তো নাই-ই, তাহার পরেও যে মেয়েদের বর জুটান হইয়া উঠে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলে বয়সও বাড়িয়া চলে, পড়াও চলিতে থাকে। ১৬।১৭-তে মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। বর হয়ত তখনও জুটে না। কতক মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ বা ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দেয়; যাহাদের পিতাদের সামর্থ্য আছে, ইচ্ছা আছে, তাহারা কলেজে পড়িতে যায়—বিবাহের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হইয়াই চলে। এইরূপে ১৮।১৯ বছরে আই-এ এবং ২০।২১ বছরে মেয়ে বি-এ পাশ করিয়া ফেলে। বিবাহাভাবাৎ গতির বেগেই কেহ কেহ ২২।২৩-এ এম্-এ পাশও করে। অতি অল্প সংখ্যক মেয়ে প্রকৃত বিদ্যানুরাগের বশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করে। তাহার পরে বি-এ, এম্-এ পাশ মেয়ের চাকরী হয়ত একটা জুটে কিন্তু বর জুটা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা দেশে ব্যাপক ভাবে উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সহরগুলিতে স্ত্রী-শিক্ষার চাহিদা আশ্চর্য্য রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। এক ঢাকার কথাই ধরুন—কয়েক বছর আগে তথায় সরকারী 'ইডেন হাইস্কুল' বালিকাদের জন্য একমাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। প্রতিভাশালিনী শ্রীযুক্তা লীলা নাগের উদ্যোগে বছর দশেক আগে এক দানশীলা মুসলমান মহিলার দানের সাহায্যে 'কমরুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। বছর দুই হয় এই বিদ্যালয়ে কলেজ-ক্লাসও খোলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দাঁড়াইয়া গেলে শ্রীযুক্তা নাগের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মত-ভেদ হয়। শ্রীযুক্তা নাগ 'কমরুন্নিসা বিদ্যালয়' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং ঐ পাড়ায়ই 'নারী-শিক্ষা-মন্দির' নাম দিয়া বালিকাদের জন্য আর একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়া দেন। বর্ত্তমানে সরকারী সন্দেহের ফলে শ্রীযুক্তা নাগ অন্তরীণ হইয়া আছেন কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুইটি বিদ্যালয়ই পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। ইহার পরে আমেরিকা-প্রত্যাগতা শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবীর উদ্যোগে ঢাকার আর এক পাড়ায় বালিকাদের জন্য আর একটি উচ্চ ইংরেজী আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই আনন্দাশ্রম-বিদ্যালয়ও বেশ ভালই চলিতেছে—লেখাপড়ার সঙ্গে বালিকারা এই বিদ্যালয়ে রান্নাবান্না শিক্ষা; গৃহস্থালি পরিচালনা শিক্ষা; দিয়েশলাই, গালিচা ইত্যাদি নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতেছে। বছর দুই হয় ঢাকার আর এক পাড়ায় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে 'আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়' নামে আর একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুই বছরের মধ্যেই ইহা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর পাড়ায় পাড়ায় বালিকাদের জন্য সম্ভবতঃ ৮।১০টি (ঠিক সংখ্যা বলিতে পারি না) মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে। এই পাঁচটি উচ্চ ও গুটি দশেক মধ্য বিদ্যালয়ে মোট (৪০০×৫+১০০×১০) প্রায় ৩০০০ বালিকা পড়িতেছে বলিয়া ধরা যায়। ঢাকার লোক সংখ্যা ১,৩৮,৫১৮ জন! ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ৫৯,১৫৩। স্ত্রীলোকের মধ্যে ৮ হইতে ১৬ বছর বয়স্ক মেয়ে প্রায় ১০,০০০ আছে ধরিলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষাযোগ্য বয়সের মেয়েদের মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে।

বড় সহরে, যেখানে বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় আছে, তথায় বালকদের সহ বালিকাদের একত্র শিক্ষা পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। ঢাকায় এবং কলিকাতায়

বালিকাদের জন্য পৃথক কলেজও আছে, কাজেই তথায় কলেজের শিক্ষা-ব্যাপারেও সহশিক্ষার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু বালিকাদের জন্য প্রথম শ্রেণীর কলেজ কম, ঢাকায় একটিও নাই, কলিকাতায় গুটি দুই আছে। কাজেই আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতে হইলেই ছাত্র ও ছাত্রীদের একত্র অধ্যয়ন ভিন্ন অধিকাংশ স্থলেই গত্যন্তর নাই। রাজসাহী, কুমিল্লা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি মফঃস্বল সহরগুলিতে আই-এ পড়িতে হইলেও বালক-বালিকার সহশিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এদিকে গ্রামগুলির অবস্থা একবার চিন্তা করা আবশ্যক। যে কারণে সহরে স্ত্রী-শিক্ষার চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে, গ্রামেও ঠিক সেই কারণেই স্ত্রী-শিক্ষার চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলায় দেখিতে পাই, প্রায় প্রত্যেক ভদ্র ও উন্নতিশীল গ্রামেই একটি করিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে আমার বাসগ্রামের আশপাশে প্রত্যেক গ্রামেই হাইস্কুল আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১ মাইল বা ২ মাইল ব্যবধানেই হাইস্কুল আছে বলিলে সমগ্র বিক্রমপুরের অবস্থাই সঠিক বর্ণিত হয়। এই সকল গ্রামে বালিকাদের জন্য হাইস্কুল একটিও নাই—অথচ প্রত্যেক গ্রামেই স্ত্রী-শিক্ষার জন্য চাহিদা প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিবামাত্র এই সকল স্কুলের এক তৃতীয়াংশ যে বালিকাদ্বারা ভর্ত্তি হইয়া যাইবে, এই বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বালিকাদের জন্য নানা কারণে গ্রামে পৃথক হাইস্কুল করা প্রায় অসম্ভব। বিক্রমপুরের স্কুলগুলি অধিকাংশই গ্রামস্থ উদ্যোগী ও দানশীল ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যমে স্থাপিত। ইহাদের কতকগুলি সরকারী সাহায্য পায় বটে, কিন্তু সরকারী-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, একমাত্র ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া থাকা, ইহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে সে কথা খাটে না। বালকদিগকে বাড়ী বাড়ী হইতে কুড়াইয়া আনিতে হয় না, তাহারা আপনা-আপনিই স্কুলে যায় আসে। বালিকাদের জন্য নিখাবান্* (নিখাবতী?) আবশ্যক। আবার যে পরিমাণ স্থান হইতে বালক কুড়াইয়া একটি হাইস্কুলের পত্তন করা সম্ভব হয়, সেই স্থান হইতে (অন্ততঃপক্ষে আগামী ২০।২৫ বছরের মধ্যেও) বেতন দিয়া পড়িতে ইচ্ছুক এমন যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রী পাওয়া যাইবে না, যাহাদের দ্বারা একটি হাইস্কুল চলিতে পারে। কাজেই গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার চাহিদা মিটাইতে হইলে গ্রামের হাইস্কুলগুলিতে সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক। মফঃস্বল সহরের কলেজগুলিতেও প্রায় একই কারণে সহশিক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে স্ত্রী-শিক্ষা চাহিতেছি তাহাতে (১) গ্রামের হাইস্কুলগুলিতে, (২) মফঃস্বল সহরের কলেজগুলিতে (৩) প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলির বি-এ এবং—পরবর্ত্তী ক্লাশগুলিতে সহশিক্ষা প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণের, এই রকম অবস্থায়, সহশিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যর্থ চীৎকারে সময় নষ্ট না করিয়া সহশিক্ষায় যাহাতে সামাজিক বিপ্লব আসিতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থাই করা উচিত। বিবেচ্য এই যে, এই রকম ব্যবস্থা সম্ভবপর কি না? এই বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য্য, আমি কেবল আমার মতটাই বলিতে পারি। বিরুদ্ধ মতের লোকেরও অভাব হইবে না, তবে সপক্ষের লোক ও দুর্লভ হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সহশিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় জন্মাবধিই বি-এ ও এম্-এ ক্লাশগুলিতে প্রচলিত আছে। কাজেই এখানে অন্ততঃ ৭।৮ বছর ধরিয়া এই পদ্ধতির ভাল-মন্দ বিচার করিবার সুযোগ আমাদের মিলিয়াছে।

* Escort অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিলাম — সম্ভবতঃ পারসী মূলের শব্দ। পূর্ব্ববঙ্গে এই অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার আছে।

এখানে মেয়েদের জন্য পৃথক বোর্ডিং আছে। ক্লাশে মেয়েরা ভিন্ন বেঞ্চে বসে। ক্লাশ ছাড়া অন্য সময়ের জন্য মেয়েদের বসিবার ও পড়িবার ঘরও স্বতন্ত্র। অধ্যাপকগণ নিজেরা যাইয়া বসিবার ঘর হইতে মেয়েদের ক্লাসে লইয়া আসেন এবং ঘণ্টাশেষে আবার বসিবার ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসেন। এই সকল সতর্ক ব্যবস্থার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা পদ্ধতি এক রকম নির্ব্বিবাদে ও নিরুপদ্রবেই চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আমাদের মত বাহিরের লোকের ধারণা। ছাত্রদের বিশেষ কোন দুর্নাম, দুরন্তপনা বা দুর্ব্ব্যবহারের বিবরণ, এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বরং দুই-একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনা গিয়াছে। কিন্তু তাহাও উপেক্ষার যোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করি।

এই বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, সহশিক্ষায় বিশেষ কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, যদি ক্লাশের বাহিরে ছাত্র-ছাত্রীর সাহচর্য্যের সুযোগ না থাকে। সাহচর্য্যের সুযোগে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং এই বিষয়ে যে দেশবাসিগণ সম্পূর্ণ সজাগ, তাহা দুই-একটি ঘটনা হইতেই বেশ বুঝা গিয়াছে। কলিকাতার কোন কলেজের কয়েক-জন ছাত্র-ছাত্রীর সাহচর্য্যে পুরী অভিযানের বিবরণে দেশময় যে একটা মার মার রব উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, বিপদ কোন্ দিকে দেশবাসিগণ তাহা বেশ বোঝেন। বেথুন কলেজের অধ্যাপক মদীয় এক বন্ধু একবার গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে লইয়া চড়িভাতি করিতে যাইয়া কয়েকটি ছাত্রী একবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সবিশেষ তিরস্কৃত হইয়াছিল। এই কর্ত্তৃপক্ষগণের সুবিবেচনার প্রশংসা না করিয়া পারি না। চল্লিশের এধার বা ওধারের অধ্যাপকগণকেও যিনি নিরাপত্তিতে যুবতী-সংস্রবে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন, তাঁহার সারল্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতেই পারি, তাঁহার মানবচরিত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না।

যে সতর্ক ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্তবপর হইয়াছে, তাহা অন্যত্রও হইতে পারে। যেখানে সহশিক্ষা ভিন্ন শিক্ষার চাহিদা মিটান অসম্ভব, সেখানেই এই শ্রেণীর সতর্ক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া সহশিক্ষায় অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলে কি বিপদ একেবারেই হইবে না! বিপদ হইবে বই কি! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া নাড়াচাড়ার কারবারে মধ্যে মধ্যে অগ্নিকাণ্ড অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কারবার যখন না করিয়া উপায় নাই, তখন এইরূপ সবিরাম আকস্মিক ক্ষতি মানিয়া লইয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বসন্তের টীকা লইয়াও অনেক লোক বসন্তে মারা যায়। তাহা বলিয়া টীকা লইবার প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করা চলে না।

অবাধ সাহচর্য্যের ফল কি, বারান্তরে আমেরিকার ছাত্রী-জীবন হইতে দুই-চারিটি চিত্র আঁকিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।



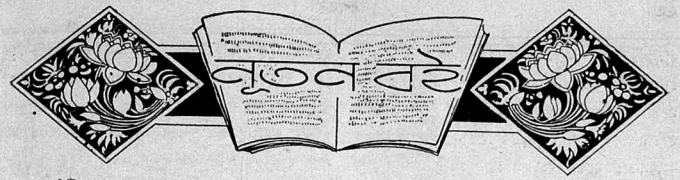

['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরুমন্দির—উপনিষদ্‌রহস্য কার্য্যালয়, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া। প্রথম অধ্যায়। পৃঃ ১১+১০৪। মূল্য—বার আনা।

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনপ্রিয় কোন গ্রন্থের নাম করিতে হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ভাষাতেই গীতার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনী ও অনুবাদ সহ গীতার যে কত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করাও অনায়াস-সাধ্য নহে।

বেদান্তের তিনটি প্রস্থান—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। শ্রুতি-প্রস্থান—উপনিষদাবলী, স্মৃতি-প্রস্থান—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও ন্যায়-প্রস্থান — বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্র। এই প্রস্থানত্রয়ের উপর যিনি ভাষ্য রচনা করিতেন, প্রাচীনকালে তিনিই বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আধুনিক যুগেও এ প্রাচীন প্রথার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমানে যে সকল হিন্দু মনীষী ধর্ম্ম বা কর্ম্মজীবনে কিছু অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই গীতার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার নিজ নিজ বিশ্বাস ও প্রবৃত্তি অনুসারে গীতার বিভিন্ন মৌলিক ব্যাখ্যাও প্রচার করিয়াছেন। তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তিগণের গীতা-ভাষ্য রচনার প্রচেষ্টা আমাদের এই উক্তির সম্পূর্ণ পোষকতা করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও গীতার অনুশীলন বড় অল্প করেন নাই। কিন্তু অন্তরঙ্গ আলোচনা অপেক্ষা বহিরঙ্গ আলোচনাতেই তাঁহাদের আগ্রহ সমধিক দৃষ্ট হয়।

গীতার মূল ভাবটি কি—তাহা লইয়া প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। কেহ বলেন গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য জ্ঞান, কেহ বলেন যোগ, কেহ বলেন ভক্তি, কেহ বলেন নিষ্কাম কর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু ইহা গীতার দোহাই দিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত মতবাদ প্রচারের নামান্তর মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ব্যাখ্যা-নাংশ সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ নহে। শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে, সর্ব্বধর্ম্মের—সকল মতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয়-স্বরূপ এই গীতা সকল সাম্প্রদায়িকতাকে বিধিবৎ পরিহার করিবার উপদেশই দিয়াছে। তাই সাধারণের নিকট গ্রন্থখানি "গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" নামে পরিচিত হইলেও 'যোগ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন গ্রন্থকার ইহার নামান্তর প্রদান করিয়াছেন—"উপনিষদ্‌রহস্য"।

বস্তুতঃ, গীতা সকল উপনিষদের সারভূত—অতি নিগূঢ় অধ্যাত্মযোগবিজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র। পাছে 'যোগ' বলিতে আমরা হঠযোগাদিমাত্রকেই বুঝি, সেই জন্য পুষ্পিকামধ্যে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলা হইয়াছে—ইহা ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্র ("ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে")।

গ্রন্থকার গীতাকে "আধ্যাত্মিক যোগবিজ্ঞান"

বলিলেও গীতার পটভূমিকা যে ঐতিহাসিক সত্যে নিহিত, ইহা তিনি অস্বীকার করেন না। মীমাংসকগণের মতে গীতার আদ্যোপান্তই স্বার্থে প্রামাণ্যহীন স্তুতিনিন্দাফলক অর্থবাদমাত্র। কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতার মতেও ইহা ঐতিহাসিকতার লেশমাত্রশূন্য নিছক রূপকমাত্র। গ্রন্থকার এই সকল মত গ্রহণ করেন নাই। প্রকৃত বৈদান্তিক সাধকের মতই তিনি গীতার ঐতিহাসিক অংশটুকুকে 'ভূতার্থবাদ বলিয়া উল্লেখ' করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উক্তি হইতে দুই-চারি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"গীতা ঐতিহাসিক আদর্শ ধর্ম্মভাবযুক্ত ঘটনা—ইহাও সত্য। গীতা আধ্যাত্মিক যোগবিজ্ঞান—ইহাও সত্য।..... বিরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে এমন একটি অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহা প্রত্যেক পরমাণুতে ব্যষ্টিভাবে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টিভাবে অভিনীত হইতেছে। জীব ধীরে ধীরে যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সাধকপ্রবর অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্ররূপ আদর্শ রণাঙ্গনে আদর্শ পুরুষ তাহারই একখানি আদর্শ ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন।"

প্রথম খণ্ডে গীতার প্রথম অধ্যায়টি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা-(ব্রহ্মখণ্ড)-মধ্যে গীতার মর্ম্মটুকু আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর গ্রন্থারম্ভ। প্রথমেই মূল শ্লোক ও তাহার পর সংস্কৃত অন্বয় প্রদত্ত হইয়াছে। কি কারণে বুঝা যায় না, প্রথম দুইটি শ্লোকের সংস্কৃত অন্বয় দেওয়া হয় নাই অনন্তর, সরল বঙ্গভাষায় প্রত্যেক শ্লোকের সাধারণ ব্যাবহারিক অর্থ ও সর্ব্বশেষে গূঢ় যৌগিক অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এই যৌগিক অর্থই বর্ত্তমান সংস্করণের নিজস্ব বস্তু। স্বয়ং আস্বাদন না করিলে সুধী পাঠকবর্গ ইহার রস পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

তবে অতি সুন্দর শরীরেও অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র-চিহ্ন যেরূপ বিড়ম্বনার কারণ হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থমধ্যে দুই-চারিটি দোষ আমাদের বড়ই দৃষ্টি-কটু বোধ হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ আমরা এক-আধটির উল্লেখ করিলাম। প্রথমেই 'আহ্বান'—মধ্যে "জ্যোতিঃ-মণ্ডিত" পদটি কেমন কেমন ঠেকিল। হয় উহাকে সাদা বাঙ্‌লায় 'জ্যোতিমণ্ডিত,' অথবা পুরা সংস্কৃতে 'জ্যোতির্ম্মণ্ডিত' লেখা উচিত ছিল। তাহার পর "সারথী" (পৃঃ ২, ২৩ ইত্যাদি) পদটির বানানে বহুবার একই ভুল ছাপা হইয়াছে। সর্ব্বত্র 'সারথি' হইলেই শোভন হইত। "ব্যবহারিক" (পৃঃ ৪২, ৪৪, ৫০, ৫২, ৫৫ ইত্যাদি) পদটি ব্যাকরণদুষ্ট। শুদ্ধ পদ—'ব্যাবহারিক'—আকারযুক্ত, আকারহীন নহে। আশা করি, পরবর্ত্তী খণ্ডে ও পরবর্ত্তী সংস্করণে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ-ত্রুটি থাকিবে না। মোটের উপর, আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ

অভিনেতার পত্নী — লেখক শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্র। শ্রীনফরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১২নং খুরুট রোড, হাওড়া 'বিজয় প্রেস' হইতে মুদ্রিত। মূল্য—একটাকা মাত্র।

আধুনিক যুগের নারী-প্রগতিকে কেন্দ্র করিয়া লেখক তাহার শোচনীয় পরিণাম এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈদেশিক আদর্শের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান যুগে বাংলার নারী যে ভাবে তালে তালে পা ঠুকিয়া জাতীয় সমাজ-সংস্কারকে পদদলিত করিয়া চলিয়াছে, তাহা লেখকের মতে 'নৈরেকারী' ভাবধারা। সে যাহাই হউক না কেন, কি ভাবে যে একজন ষড়বিংশবর্ষীয়া অনূঢ়া শিক্ষিতা নারী সমাজের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, পিতার যুক্তি-তর্ককে অগ্রাহ্য করিয়া আর একজন শিক্ষিত পুরুষের সংস্পর্শে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহারই একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত লেখক বেশ নিপুণতার সহিত সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই গ্রন্থের আর একটি চরিত্র লতা। অভিনেতা

রমেনের স্ত্রীরূপে প্রেম, স্নেহ, মমতা পাইবার আশা করিয়া সে তাহার অশিক্ষিতা দিদি ও তাহার স্বামী দেবতাটিকে এক কথায় গেঁও, অশিক্ষিত ভূত নামে অভিহিত করিয়া অবজ্ঞা করে। কিন্তু এই লতাই অদৃষ্টের পরিহাসে স্বামী-কর্ত্তৃক প্রহৃতা হইয়া পরে যখন সেই গাঁওয়ালিদের নির্ম্মল, প্রেমময়, পবিত্র ভালবাসার সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিল, তখনই সে জীবনের সমস্ত ভুল বুঝিয়াছিল। শিক্ষিতা নারীর এই পরিবর্ত্তনের ছবি শক্তিশালী লেখক বেশ ভাল করিয়াই আঁকিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া বারবার এই কথাই আমাদের মনে হইয়াছে যে, শিক্ষিতা নারী মাত্রেরই বইখানা আগ্রহ সহকারে পাঠ করা উচিত। ভুলের বোঝা লইয়া যাঁহারা গর্ব্বভরে বৈদেশিক শিক্ষার মোহে বিভোর, পুস্তকখানি যে তাঁহাদের কিছু কাজে লাগিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভাষার দৈন্য কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পুস্তকের ছাপা বেশ ঝরঝরে। বাঁধাইও ভাল। আমরা পুস্তক খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

জাতিস্মর (গল্পের বই)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। দাম—দেড় টাকা।

লেখক তিনটী গল্প পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'জাতিস্মর'। লেখকের মতে এই শ্রেণীর গল্প বাংলা ভাষায় নূতন হইলেও লেখক এমন কতকগুলি অপ্রচলিত পুরাতন বাক্য-সমষ্টির সাহায্য লইয়া যে ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের কাছে সহজে বোধগম্য নহে। 'অমিতাভ' ও 'রুমাহরণ' গল্প দুইটীতে লেখক যথাযথ ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে না পারিলেও গল্প দুইটি সুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে।

প্রকৃত শিল্পীর হাতে যেমন ছবির সত্যকার রূপ প্রকাশ পায়, তেমনি শক্তিবান্ লেখকের হাতে পড়িয়া নীরস ঘটনাবলী সরস হইয়া ওঠে, কিন্তু এস্থলে লেখক যদি আর একটু দৃষ্টি রাখিতেন তাহা হইলে গল্পগুলি আরও সুন্দর হইত। গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'মৃৎপ্রদীপ' পড়িয়া আমরা লেখকের কল্পনা-শক্তির প্রশংসা করি এবং সোমদত্তার চরিত্র গঠনে লেখকের শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাই। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীনিধিরাজ হালদার

লীলামুকুল — শ্রীঅমলেশ সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান — বরেন্দ্র লাইব্রেরী — কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—পাঁচ সিকা।

এখানি গল্পের বই। প্রথম গল্পটি লীলামুকুল। তাহারই নামে বইখানির নাম-করণ হইয়াছে। এই প্রথম গল্পটি বেশ বড়। ইহাই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। গল্পটির যা উপাখ্যান ভাগ তা উপন্যাসের মতোই। সুতরাং বড় হওয়ায় রসের দিক দিয়া কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। উপাখ্যান-ভাগ চিত্তাকর্ষক। নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া চমৎকার ফুটিয়াছে। একান্ত আধুনিক কতকগুলি সমস্যারও অবতারণা করিয়াছেন গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থের ভিতরে এবং এই গল্পটির ভিতরেও। সমস্যাগুলি ঠিক সমস্যার রূপ লইয়া গল্পের ভিতরে শিং তুলিয়া জাগিয়া নাই। সেগুলি গল্পের অংশেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে দিক দিয়াও গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রচনা-ভঙ্গি সহজ ও সাবলীল। এই লীলামুকুল গল্পটি ছাড়াও গ্রন্থখানির ভিতরে আছে আরো কতকগুলি গল্প বা গ্রন্থকারের মতে বর্ত্তমান গ্রামের ছবি। বাংলার গ্রামগুলি ধ্বংসের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া নয়, নৈতিক দিক দিয়াও তাহার অধঃপতনের পানপাত্র একেবারে পরিপূর্ণ। এই অধঃপতনের ছবিই গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন তাঁহার গ্রামের গল্পগুলিতে। কিন্তু ছবি অধঃপতনের হইলেও এই অধঃপতনের রূপ লইয়া গ্রন্থকার নিষ্ঠুর পরিহাস করেন নাই। গ্রামের বুকের উপর দিয়া

তিনি নির্ম্মম ভাবে ছুরী টানিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে ছুরী খুনের নয়, সে ছুরী ডাক্তারের। এ ছবিগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের দরদ ও সহানুভূতির ছাপও ধরা পড়িয়াছে।

গ্রন্থকার সাহিত্যের আসরে নূতন আগন্তুক এবং সম্ভবতঃ 'লীলামুকুল'ই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু এ গ্রন্থেও তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার আসিবার যে অধিকার আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ গল্প-সাহিত্যের যাহা প্রধান উপকরণ তিনি তাহা ভালো ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ জীবনের গতির ধারা তিনি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা।

লীলামুকুলের গল্পগুলি নির্দ্দোষ নয়। ত্রুটি অনেক আছে। কিন্তু ইহার ভিতর অন্য যে সব গুণ আছে তাহারই খাতিরে ইহার দোষগুলিকে অনায়াসেই উপেক্ষা করা চলে।

শ্রীকনক গুপ্ত

রুবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী—৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

সতীশচন্দ্রের 'ওমরখৈয়াম' যখন পেয়েছিলাম তখন আমি অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে রোগ-শয্যায় শায়িত ছিলাম। তারই মধ্যে বইখানি একবার ওল্টাতে গেলাম যে, দেখি তো কেমন হয়েছে। প্রথম শ্লোকটি প'ড়েই ছন্দের আনন্দে আর সুমিষ্ট ভাষার প্রবাহের টানে একে একে সব কয়টি শ্লোকই প'ড়ে শেষ করলাম। অত্যন্ত প্রীত হয়েছি এ-বইখানি প'ড়ে। লেখককে আমার আনন্দ, প্রীতি ও শুভ কামনা জানাচ্ছি। এ মামুলি প্রশংসা নয়, বাস্তবিকই আমি অন্তরের কথাই বল্‌ছি।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেধরা—(সচিত্র ছোটদের উপন্যাস) শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত। প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-মন্দির। ৫৪।৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—আট আনা।

'ছেলেধরা' আদ্যোপান্ত পড়্‌লুম। বইখানির সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, পড়্‌তে বস্‌লে শেষ না ক'রে ওঠা যায় না। শিশু-সাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে বড় গুণ আর নেই। শিশুরা চায় গতি; তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সজীব, সাবলীল, গতিশীল। তাদের মন এবং কল্পনাও তাদের দুরন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চল্‌তে চায়। তাই তাদের সাহিত্যও হওয়া চাই সচল, গতিশীল, দুরন্ত। বইখানির বিচিত্র ঘটনা পরম্পরা দুরন্ত শিশুর অকারণ, অবারণ দুষ্টামির মতই বিচিত্র, চঞ্চল, অস্থির। এই বই প'ড়ে ছেলেরা মেয়েরা যে আনন্দলাভ করবে, সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম—শ্রীকান্তপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত ও শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা (বিদ্যাভূষণ) কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী কর্ত্তৃক ৪০নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা; বাঁধাই—পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকখানিতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের সার কথা সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা অনায়াসে শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শনের মর্ম্ম অবগত হইতে চাহেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে—সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানিতে উপনিষদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থেরও অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল বৈষ্ণবেরা নহেন, যাঁহারা সনাতন বৈদিক-ধর্ম্মের মর্ম্ম-কথা জানিতে চাহেন, এ বইখানা পড়িয়া তাঁহারাও অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীবিনয় দত্ত



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪৩ বৎসর আগে এই শ্রাবণেরই একটি দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং সে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর আগের কথা। এই অর্দ্ধ-শতাব্দী কালের ভিতরে এত বড় ভারতে এমন একজন লোক জন্মগ্রহণ করলেন না, যিনি বিদ্যা-সাগরের স্থান নিতে পারেন। সুতরাং তাঁর নাম আজ আমরা বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

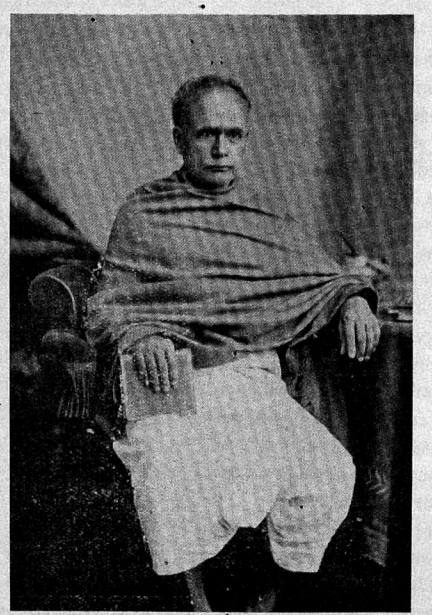

৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের স্থান কেউ নিতে না পারলেও, তাঁর শিক্ষা, তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় নি। জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক্, তাঁর জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি আদর্শকেই বাংলা সমাজ দেখাতে শিখেছে, গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে। বাল-বিধবাদের দুঃখ ছিল বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলার সবচেয়ে বড় অভিশাপ। তাই এ-দুঃখের জন্যে তিনি শুধু অশ্রু ফেলেন নি, শুধু শাস্ত্র-পুরাণ ঘেঁটে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন নি, নিজে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ হ'য়েও নিজের ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন বিধবা মেয়ের সঙ্গে। বাংলা দেশ আজ তাঁর বিধবা-বিবাহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবে গ্রহণ না করলেও—এ-সমস্যাটাকে যে সে আর অবহেলা করে না, তার প্রমাণ প্রতিদিনই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ আত্ম-মর্য্যাদায় ছিলেন স্থাণুর মত স্থির। তাই লাট-বেলাটের কাছেও নিজের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তিনি কখন মাথা নোয়ান নি। তাঁর এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত তেজস্বিতা নানাভাবে

আত্ম-প্রকাশ করতে সুরু করেছে আজ দেশের ভিতরে। বাংলা ফিরে পেয়েছে তার মর্য্যাদা-বোধ। যে যুগে ভোগ-বিলাস ও আচার-ব্যবহারের ভিতর দিয়ে পরানুকরণই হ'য়ে উঠেছিল বাঙালীর মর্য্যাদা-বোধের নিরিখ, সে যুগেও পায়ে তালতলার একজোড়া জীর্ণ চটি ও একখানা মোটা চাদরই ছিল তাঁর পরিচ্ছদ। বাঙালী যাতে বাঙালীই থাকতে পারে তার জন্য সারা বাংলার মনই আজ সচেতন হ'য়ে উঠেছে।

পরের দুঃখে, পরের বিপদে বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর। পরের জন্য নিজেকে রিক্ত করতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁর এই আর্ত্ত ও বিপন্নের সেবাও দেশ আজ নিয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে বরণ ক'রে। তাঁর সেবার অনুভূতি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রুগ্নের জন্য সেবার ব্যবস্থা প্রভৃতির ভিতর দিয়েই সারা দেশে আজ উঠেছে মূর্ত্ত হ'য়ে।

বিদ্যাসাগর ভাষার এমন একটা বাহনের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা বাঙালী মনের ভাবকে সহজে বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে সকলের কাছে। তাই তিনি সৃষ্টি করেন বাংলা গদ্যের। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সব লোককে শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্যে। তাই প্রকাণ্ড পণ্ডিত হ'য়েও তিনি রচনা ক'রে গিয়েছেন 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগ। বাংলা গদ্য আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেগবান ভাষাগুলির সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলবার সামর্থ্য লাভ করেছে। শিক্ষার ধারা ব'য়ে চলেছে আজ বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভিতরে, ছোট-বড় সব সম্প্রদায়ের ভিতরে।

এমনি ভাবে যদি বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, এই বিরাট পুরুষের সাধনা সারা বাংলার ভিতর দিয়ে সার্থক হ'য়ে চলেছে আজ নানা ভাবে, নানা রকমে। অর্থাৎ তাঁর তপস্যা যে শক্তির সৃষ্টি করেছে, তার দীপ্তি এই দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের ব্যবধানেও হারিয়ে যায় নি দেশের ভিতর হ'তে। যাঁরা বিরাট পুরুষ তাঁদের জ্ঞান, মনুষ্যত্ব, ত্যাগ, শক্তি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের চিরদিনের সম্পদ হ'য়ে থাকেই। কিন্তু বিরাট পুরুষের সাধনা লোকের কাজের ভিতর দিয়ে যে সিদ্ধ হ'য়ে উঠেই, তার প্রমাণ সব সময়ে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের সাধনা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় নি, সে সাধনা চারিয়ে গেছে নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে দেশের মনে। আজও তা বাংলাকে অনুপ্রাণিত করছে হয় ত' তার অজ্ঞাতসারেই। তাঁর মৃত্যু-তিথিতে তাই তাঁকে আজ আবার আমরা নূতন ক'রে স্মরণ করছি। বার বার তাঁকে প্রণাম করছি এবং তাঁর আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করছি।

লোকমান্য তিলক

গত ১লা আগষ্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যু-তিথির স্মৃতি-বার্ষিকীর উদ্বোধন হ'য়ে গিয়েছে। ভারতের এ-যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে লোকমান্য তিলক



লোকমান্য তিলক

এমন একজন লোক, যাঁর নাম ভারতবাসীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। এই তিলকের সম্পর্কেই মাননীয় স্বর্গীয় গোখ্‌লে তাঁর কোন একজন ইংরেজ বন্ধুকে লিখেছিলেন—"১২০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করলে

তিলকের পক্ষে একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব ছিল না।" তিলকের দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দূরদৃষ্টি, জ্ঞান, জন-সাধারণের উপর তাঁর প্রভাব—এগুলোর দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায়, তবে গোখ্‌লে যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি, তা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

তিলকের চরিত্রের দিকে তাকালে সকলের আগে চোখে পড়ে তাঁর অদ্ভুত তেজস্বিতার দীপ্তি। যাঁরা কারও কাছে কখন মাথা নোয়ান না, তিলক ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক। মাথার উপরে বিপদের বজ্র উদ্যত হ'য়ে উঠেছে, তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। রাজ-রোষ তিন-তিনবার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে, কিন্তু তাঁর পণকে টলাতে পারে নি। দেহ ভেঙে পড়েছে কিন্তু মন অটল। তিনি ভারতের আমলা-তন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—কিন্তু তাঁর বিরোধ ছিল নির্ভীক বীরের বিরোধ। তাঁর ভিতরে ক্ষুদ্রতা ছিল না, গ্লানি ছিল না, গোপনতা ছিল না। সেইজন্য আমলা-তন্ত্র তাঁকে দণ্ড দিয়েছেন, কিন্তু কখন তাঁর উপরে শ্রদ্ধা হারান নি।

আজ এ দেশের নেতারা গণকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন, দেশের সর্ব্ববিধ মুক্তির জন্য। কিন্তু এর ঢের আগে সে চেষ্টা সুরু করেছিলেন লোকমান্য তিলক। তাঁর দেশ-সেবার গোড়াকার কথাই গণ-সেবা। এই গণ-সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রবর্ত্তন করেছিলেন 'গণপতি উৎসবে'র। তিনি জানতেন গণের জাগরণ ছাড়া জাতির মুক্তি অসম্ভব। তাই তাঁর জীবনের বহু সময় তিনি ব্যয় ক'রে গেছেন এই গণ-সেবায়।

তিলকের ভিতর হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি খানিকটা হয়ত ছিল। কিন্তু সে গোঁড়ামি তাঁর বিরাট স্বাদেশিকতারই একটি অভিব্যক্তি মাত্র। সেই দুর্দ্দিনে যখন পশ্চিমের হাওয়ায় ভারতের সব রকমের বৈশিষ্ট্য ভেসে যাওয়ার উপক্রম হ'য়েছিল, ভারতকে বিলেত ক'রে তুলতে না পারলে তার মুক্তি নেই—এই রকমের একটা বিশ্বাস ভারতের বড় বড় মনীষীদের মনেও যখন দোলা জাগাতে সুরু করেছে, তখন তারই বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তিলকের গোঁড়ামি। দেশের সব রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়ে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, সেই স্রোতের মুখে দেশের ভেসে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে। তখনকার দিনে এই উগ্র রকমের একটা স্বাদেশিকতার প্রয়োজনও হ'য়ে পড়েছিল জাতিকে বাঁচাবার জন্যই। কিন্তু তাঁর এই গোঁড়ামির ভিতর কোন রকমের সঙ্কীর্ণতা ছিল না, গণকে ঘৃণা করার ভাবও কিছু ছিল না। তিলকের চরিত্রকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে যিনি চেষ্টা করবেন, এ-কথা তাঁকেই স্বীকার করতে হবে।

বালগঙ্গাধর তিলক অমর হ'য়ে আছেন নব্য ভারতের জন-গণের কাছে। কিন্তু তাঁর এ অমরত্ব লাভের ভিতর ফাঁকি নেই—ভেজাল নেই। এর প্রতি ধাপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আত্মত্যাগের, আত্ম-বিলোপের কাহিনী। তিলকের মনীষা এত বড় ছিল যে, জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে জয়ের মাল্য, প্রতিষ্ঠার মাল্য তিনি অনায়াসে অর্জ্জন করতে পারতেন। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য তিনি বর্জ্জন করেছিলেন সব রকম সুখের, সব রকম গৌরবের কল্পনা। জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর প্রতিভা যে কত বড়, তার পরিচয় তাঁর রচিত যে-কোন গ্রন্থের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়। অথচ এই জ্ঞান-সাধনার আনন্দ হ'তেও তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন দেশের জন্য। দেশের কাজে পাছে সব সময় অর্পণ করতে না পারেন এই ভয়ে, মুক্তির সময় তিনি গ্রন্থ-রচনার আনন্দও উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি তাই রচিত হয়েছে তাঁর কারাগারের ভিতরে। অর্থের লোভ বা যশের লোভ ত্যাগ করা বড় মনের পক্ষে খুব কঠিন নয়, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞান-সাধনার পথ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। দেশের জন্য লোকমান্য এই জ্ঞান-সাধনার পথ হ'তেও আপনাকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন—এমনি ছিল তাঁর দেশ-প্রেমের গভীরতা। তিলককে

এ-যুগের দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলা যায় এবং সে কথা বলায় বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথ

কে সেই রাষ্ট্র-গুরু যে ভারতবর্ষের মনে প্রথম রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়েছিল, এ-প্রশ্ন যদি করা যায় তবে সম্ভবতঃ সমগ্র ভারত হ'তে একটা নামই পাওয়া যাবে এবং সে নাম সুরেন্দ্রনাথের। রাজনৈতিক চিন্তার ধারা আজ হয় ত' দেশের বদলে গেছে। নানা দল গ'ড়ে উঠেছে আজ নানা ভাবে দেশ-সেবার হরেক রকমের পদ্ধতি নিয়ে। নরম দল, গরম দল, আধা-নরম, আধা-গরম দল—এমনি বহু দলের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই বিভিন্ন দলের ভিতরেও এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেন না, তাঁকে ভারতের প্রথম রাষ্ট্র-গুরুর পদ দিতে যাঁর আপত্তি বা দ্বিধা আছে। বিশেষভাবে সুরেন্দ্রনাথের সাধনাই ভারতের অন্য প্রদেশের একজন বিখ্যাত জন-নায়কের মুখ থেকে বার করিয়েছিল—"বাংলা আজ যে কথা ভাবে, কাল সেই ভাবনায় সমগ্র ভারত অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে।"

বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনের ভিতর দিয়েই বাংলার মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগবার সব চেয়ে বড় সুযোগ হয়। এই সুযোগকে অবলম্বন ক'রে বাংলাকে যিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন, তিনিই সুরেন্দ্রনাথ। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ সারা বাংলার রাষ্ট্র-গুরু। যে কংগ্রেস আজ সারা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার অভিব্যক্তির সব চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান, সুরেন্দ্রনাথই তারও প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তিনি সারা ভারতের রাষ্ট্র-গুরু। গত ৬ই আগষ্ট ভারতের এই প্রথম রাষ্ট্র-গুরুর নবম শ্রাদ্ধ-বার্ষিকী তিথি ছিল। বাঙালী সেদিন তাঁকে আবার নূতন ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে, অন্তরের সঙ্গে প্রণাম করেছে। বাংলার রাষ্ট্র-তরণী আজ কর্ণধার-হীন। তাঁর আদর্শ আমাদের রাষ্ট্র-নায়কগণকে ঠিক পথে পরিচালিত করুক—তাঁদের মনে শুভবুদ্ধি দান করুক।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

গত ৬ই শ্রাবণ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান হ'য়ে গিয়েছে। কলিকাতার জনসাধারণ এই দেশ-ভক্ত জন-নায়কের স্মৃতির উদ্দেশে ব্যথার অঞ্জলি দিয়েছে শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশিয়ে। দেশপ্রিয়ের মৃত্যু আকস্মিক, তাঁর মৃত্যু অসাময়িক। তাঁর মৃত্যু বাংলার পক্ষে দুর্ভাগ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত কার্য্যভার যিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন তিনিই যতীন্দ্রমোহন। সে কার্য্যভার ছিল বিরাট। কিন্তু বিরাট কাজের ভার বহন করবার সত্যিকারের শক্তি ছিল যতীন্দ্রমোহনের। যতীন্দ্রমোহন নির্ভীক ছিলেন। এই নির্ভীকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর দেশের প্রতি অগাধ মমত্ববোধ ও ভালবাসা। যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অনেকের মতের মিল না হ'তে পারে, তাঁর কার্য্য-ধারাকে অনেকে পছন্দ করতে না-ও পারেন—কিন্তু তাঁর দেশ-ভক্তি সম্বন্ধে, দেশের কাজে তাঁর নিষ্ঠার সম্বন্ধে কারও সংশয় নেই। যতীন্দ্রমোহন দেশের জন্য যে ত্যাগ করেছেন, যে সেবা তিনি দিয়েছেন দেশকে, তাই তাঁকে চিরদিন বাঙালীর কাছে স্মরণীয় ক'রে রাখ্‌বে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক সম্মিলনের আগামী অধিবেশনের সাফল্যের জন্য সমস্ত বাঙালীর সাহায্য যাচ্‌ঞা ক'রে একখানা আবেদন পত্র প্রকাশ করেছেন। সম্মিলনের অধিবেশন হবে এবার কলিকাতায়।

বাংলার বাইরে যে সব বাঙালী ছড়িয়ে পড়ে আছেন তাঁদের সংখ্যা সামান্য নয়। এই বিপুল জন-সঙ্ঘের সঙ্গে বাংলার যোগ বাঁচিয়ে রেখেছে প্রধানতঃ বাংলা-সাহিত্য এবং অতিদূর ভবিষ্যতেও যদি কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে তবে তাও রাখবে এই বাংলা সাহিত্যই। সুতরাং এরূপ সম্মিলনের যে প্রয়োজন আছে তা' বলাই বাহুল্য।

বার বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয় কাশীধামে। সে অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তার পর থেকে উত্তর ভারতের কোন-না-কোন সহরে এই অধিবেশন হয়ে আসছে প্রায় প্রতি বৎসরেই। প্রতিবার বাংলা নিমন্ত্রিত হয়েছে। এবার বাংলা নিমন্ত্রণ করেছে তার প্রবাসী ভাইদের কলিকাতায় এই সম্মিলনের উপলক্ষ্যে।

বাংলার যাঁরা অতিথি হ'য়ে আস্‌বেন তাঁদের যথা-যোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবার জন্য সমিতি সাহায্য চেয়েছেন কলিকাতার প্রত্যেক বাঙালীর কাছে, বাংলার প্রত্যেক জেলার সাহিত্যানুরাগীদের কাছে। তাঁরা নিজেরা অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হ'য়ে, সাহিত্য-রসিক বন্ধু-বান্ধবকে সভ্য ক'রে দিয়ে, সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠিয়ে সত্যিকারের সাহায্য করতে পারেন এই সম্মিলনকে। বাঙালী সাহিত্যানুরাগীদের কাছে এ সাহায্য দাবী করবার অধিকার তাঁর আছে এবং বাঙালী সাহিত্যানুরাগীদেরও দায়িত্ব আছে তাঁর দাবী পূর্ণ করবার। জাতির যে সব একান্ত আত্মীয় প্রবাসে প'ড়ে আছেন, তাঁদের অভ্যর্থনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবে বাংলা, এ আশা অনায়াসেই করা যায়। কারণ আমরা সকলেই জানি, বাংলার আত্মীয়-প্রীতি অসামান্য, বিশেষতঃ প্রবাসী আত্মীয় যাঁরা তাঁদের প্রতি। এ সম্পর্কে তার মমত্ব-বোধ কোন সীমার রেখাকেই মেনে চলে না।

ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গ

মানুষের মৃত্যুকে যদি নক্ষত্র-পাতের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, জার্ম্মানীর আকাশ থেকে একটা খুব বড় জ্যোতিষ্ক খ'সে পড়েছে হিণ্ডেন্‌বার্গের মৃত্যুতে। ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গের খ্যাতি কেবল জার্ম্মানীতে নিবদ্ধ ছিল না, সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত পৃথিবীর উপরে এবং সে খ্যাতি তিনি অর্জ্জন করেছিলেন যে প্রতিভার বলে, তা লোকত্তর প্রতিভা। কোটি কোটি লোকের ভিতরে যুগ-যুগান্তের পরে সে রকমের প্রতিভার অধিকারী ক্বচিৎ দু'-একজনে হ'য়ে থাকেন।

ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গ খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর অপূর্ব্ব যুদ্ধ-কৌশল রাশিয়ার হাত থেকে জার্ম্মানীকে রক্ষা করেছিল। রাশিয়ার হাতে জার্ম্মানীর পরাজয় যখন নিশ্চিত তখনই তাঁর অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল ট্যানেন্‌বার্গের যুদ্ধে বিরাট রুশবাহিনীকে পরাজয় ক'রে জার্ম্মানীকে রক্ষা করে। এই পরাজয়ের অপমান সহ্য



ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গ

করতে না পেরে রুশ সেনা-নায়ক স্যামসেল্‌ফ্ আত্মহত্যা করেছিলেন।

জার্ম্মানীর যে উন্নতি বিস্‌মার্কের সময় সুরু হয়, হিণ্ডেন্‌বার্গের প্রতিভা তাকেই দান করেছিল সম্পূর্ণতা। কিন্তু যুদ্ধে যেমন জয়লাভ তিনি করেছেন তেমনি প্রকাণ্ড পরাজয়ও তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে। গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মানীর পরাজয়ের সময় তিনিই ছিলেন জার্ম্মান-সৈন্যবাহিনীর কর্ণধার। কিন্তু সে পরাজয় তাঁর গৌরবে কলঙ্কলেপন করতে পারে নি। যা

অসম্ভব তার সঙ্গে লড়াই ক'রে কেউ কখন জয়যুক্ত হ'তে পারে না।

ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গ যে শুধু এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন তাই নয়, তিনি খুব বড় রাজনৈতিকও ছিলেন। তাঁর রাজনীতির গোড়াকার কথা ছিল জার্ম্মানীর কল্যাণ। দেশকে তিনি তার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভাল বাসতেন। দেশের জন্য তিনি কোনও বিপদকেই বিপদ ব'লে মনে করেন নি—কোন দুঃখকেই দুঃখ ব'লে মনে করেন নি।

এই দেশাত্মবোধই দিয়েছিল তাঁকে জনসাধারণের মনের উপর অধিকার। তারা যে তাঁকে কত ভাল বাসত তা হিট্‌লারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়েই পাওয়া গেছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্টের পদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন স্বয়ং হিট্‌লার। কিন্তু এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয় ঘটে হিট্‌লারেরই।

মৃত্যুর সময় ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গের বয়স ৮০ বৎসর পার হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও দেশ-সেবায় ছিল তাঁর যৌবনের উদ্যম, সাহস ও দৃঢ়তা। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ান, তিনি বলেছিলেন—"যদি আমি পুনরায় নির্ব্বাচিত হই, তবে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দেশের সেবা করব।"

শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েই তিনি দেশের সেবা ক'রে গেছেন। তাঁর কথার ভিতরে যে মিথ্যা-আড়ম্বর ছিল না—তাঁর দেশ তার নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর সময়েও।

শ্রীমতী অমৃত কাউর

শ্রীমতী অমৃত কাউর শিখ মহিলা। আসামের বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের দুর্দ্দশা দূর করার জন্য তিনি বোম্বাই থেকে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর আবেদনে বিশেষ কেউ কর্ণপাত করে না। দেশের লোকের এই নিদারুণ দুর্দ্দশায় দেশের লোকের নির্লিপ্ততা তাঁকে আঘাত করে গভীর ভাবে। তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়—সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও সকলকে জানিয়ে রাখেন যে, মৃত্যুর পর যেন তাঁর দেহের সৎকার করা না হয়—তাঁর মৃত দেহটাকে যেন ফেলে দেওয়া হয় ভাগাড়ে সেখানে কাক, শকুনি, কুকুর প্রভৃতির আহার্য্য হবার জন্যে।

বন্যার হাতে যারা খেয়ে যারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, আসামে তাদের সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেই হতভাগ্যদের সঙ্গে নিজেকে সমান অবস্থায় স্থাপন করার জন্যই তিনি জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁর এই উভয় অভিপ্রায়। অনশন ব্রতের দ্বারা মৃত্যুবরণের পণ—এবং মৃত্যুর পর দেহের সৎকারের অনিচ্ছা এই দুটো ব্যাপারের ভিতর দিয়েই ফুটে উঠেছে শ্রীমতী অমৃত কাউরের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব এবং অসামান্য মানবপ্রীতি ও সহৃদয়তার ছবি। এই ছবিই বিচলিত ক'রে তুলেছে বোম্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজকে। তাঁরা শ্রীমতী কাউরকে মারা যেতে দেন নি। বিপুল চেষ্টার দ্বারা আসামের জন্য অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ ক'রে তাঁরা তাঁকে অনশন ত্যাগ করিয়েছেন। দুঃস্থ মানবের দুঃখ দূরের জন্য এই ধরণের আত্মোৎসর্গের কল্পনাই মানুষকে অমর করে। শ্রীমতী অমৃত কাউর তাঁর নাম সার্থক করেছেন।

মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ২৯৪।৩ নং আপার সার্কুলার রোডে 'বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন আশ্রমে' একটি মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হবে। এই প্রদর্শনীতে মহিলাদের তৈরী নানা রকমের শিল্প-দ্রব্য দেখান'র ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে। শিল্প-পণ্য পাঠানর জন্য এর কর্ত্তৃপক্ষ নারী-শিল্পীদের সকলকেই অনুরোধও জানিয়েছেন। লেডি অবলা বসু এই 'নারী-শিক্ষা-সমিতি'র সম্পাদিকা। 'মহিলা-শিল্প প্রদর্শনী'র সম্পাদিকা মনোনীত হয়েছেন শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী এবং সহকারী সম্পাদিকা মনোনীত হয়েছেন শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন ও শ্রীযুক্তা শোভনা গুপ্তা। মহিলাদের কারু-শিল্পে উৎসাহদান করাই এ-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। এ-উদ্দেশ্য যে অত্যন্ত সাধু ও সময়োপযোগী তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। এর যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁদের কর্ম্ম-শক্তি ও নিষ্ঠার প্রতিও আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির ভিতর যাঁদের শিল্প-রচনা উৎকৃষ্ট হবে তাঁদের পুরস্কৃত করবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্তোষের



শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী—সম্পাদিকা

রাজা মাননীয় স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী তাঁর পত্নী রাণী সাহেবার নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হস্ত-নির্ম্মিত শিল্পের জন্য একটি সোনার মেডেল দান করবেন। বালিকা বিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে যাঁর কাজ উৎকৃষ্ট হবে তাঁকে অনারেবল নবাব ফারোকী সাহেব দেবেন কাপ। আমরা প্রদর্শনীটির পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

শোচনীয় দুর্ঘটনা

'বেঙ্গল অটোমোবাইল এসোসিয়েসনে'র উদ্যোগে যে মোটর দৌড়ের ব্যবস্থা হয় তার 'ট্রায়েলে'র সময় এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে। এই দুর্ঘটনায় কুমার

গোপেন্দ্র মল্লিক এবং তাঁর বন্ধু এম্, এ, মহম্মদ নিহত হয়েছেন ও মিঃ মহম্মদের পত্নী ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। ৩০খানা গাড়ী নিয়ে যাত্রা সুরু হয়। এরই একখানাতে ছিলেন কুমার গোপেন্দ্র মল্লিক এবং তাঁর বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী। কুমার নিজেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন গাড়ী। বনগাঁও-এর কাছাকাছি একটি যায়গায় এসে আগের একখানা গাড়ীকে অতিক্রম্ করতে গিয়ে গাছের সঙ্গে লাগে তাঁর গাড়ীর ধাক্কা। ফলে গাড়ীর সামনের অংশটা একেবারে ভেঙ্গে যায় এবং ষ্টিয়ারিং হুইলের 'রড' আঘাত লেগে কুমারের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। ২৫ মিনিট পরেই কুমারের মৃত্যু হয়।

কুমার গোপেন্দ্র মল্লিক ৺রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রপৌত্র। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৯ বৎসর। তাঁর বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও তিনটি পুত্র বিদ্যমান। এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের ভিতরে শোকের যে দুঃসহ জ্বালা জেগে উঠেছে তা সহ্য করা কঠিন। আমরা অন্তরের সঙ্গে কামনা করি, এই অভাবনীয় দুঃখ সহ্য করবার শক্তি ভগবান দান করুন এই পরিবারকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত আত্মার পারলৌকিক কল্যাণও আমরা কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-পদ্ধতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন—এ-পদ লাভের যোগ্যতা শ্যামাপ্রসাদের কতখানি। এ-কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। এ-জন্য মনীষা ত' দরকারই, অসাধারণ পরিশ্রমও করতে হয়। গত কয়েক বৎসরের সিনেট ও সিণ্ডি-কেটের কাজের ভিতর দিয়েই পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের কর্ম্ম-শক্তির ও মনীষার। যদিও তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন না, তবু তাঁর শক্তি ও

প্রতিভা সমস্ত ব্যাপারেই অনুভূত হয়েছে বাংলার এই দু'টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে। সুতরাং যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হ'তে দেখে, আমরা সত্য সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে বাঙালী এর আগে আর কখন প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায় নি। সে জন্যও শ্যামাপ্রসাদ সারা বাংলার অভিনন্দন লাভের যোগ্য। স্যর আশুতোষের লোকোত্তর প্রতিভা 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'কে যে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব দিয়েছে পুত্র শ্যামাপ্রসাদের হাতে তা অক্ষুণ্ণ থাকবে—এ ভরসা আমরা করি। এত অল্প বয়সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ভিতর দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ যে শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, এ-ভরসা করবার হেতু তার ভিতরেই পাওয়া যায়। আমরা এই তরুণ ভাইস্-চ্যান্সেলারকে, মহত্তম পিতার এই শক্তিমান পুত্রকে আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দিত করছি।

দেশী প্রসাধন দ্রব্য

প্রসাধন দ্রব্যের জন্য বাংলার অনেকগুলি টাকা বিদেশে যায়। সুতরাং এই জিনিষগুলি দেশে তৈরী করার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বাঙালীর দৃষ্টিও পড়েছে এ দিকে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়েও উঠেছে এই সব জিনিষ তৈরীর জন্য। বাংলায় সাবান, স্নো প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। 'ন্যাশনাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস'র এই ধরণের জিনিষগুলি সম্প্রতি ব্যবহার করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তাঁদের অজন্তা সাবান, অজন্তা এসেন্স, অজন্তা স্নো প্রভৃতি ব্যবহারে আমরা সত্যসত্যই আনন্দলাভ করেছি। গন্ধে এবং গুণে এ-গুলি বিলেতী দামী প্রসাধন দ্রব্যের চেয়ে কিছু মাত্র খারাপ হয় নি, অথচ দাম এদের বিলাতী জিনিষের চেয়ে ঢের কম। বাংলার প্রয়োজনের জিনিষগুলো বাংলাতে যাতে তৈরী হয়, তাই আমরা চাই। কিন্তু তার জন্য কেবল জিনিষ তৈরী নয়, তৈরী জিনিষগুলি বিক্রয় হওয়াও দরকার। অর্থাৎ বাংলার তৈরী জিনিষের উপর বাংলার জন-সাধারণের একটা দরদ থাকা আবশ্যক।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল বেনিফিট সোসাইটী

কলিকাতার 'ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল বেনিফিট সোসাইটী'র তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব-নিকাশ দেখে আমরা বিশেষ সুখী হয়েছি। রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে ২,৬৪৭।০ আনা মৃত্যু-দাবী দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃত পত্র দেখলেই বোঝা যায় যে, দাবী অতি সত্বর মিটান হয়েছে। কারণ মাত্র ৩৫৯৲ টাকা বর্ষ-শেষে মৃত্যুদাবী দেয় দেখা যাচ্ছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ এই প্রকার সাহায্যে যে বিশেষ উপকৃত হন তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জন সাধারণের জ্ঞাতার্থে সোসাইটী মৃত্যু-দাবীর পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন।

উদ্ধৃত পত্রে দেখা যায় যে, বর্ষের প্রথমে যে ফণ্ড ১,৭২৫।০ আনা ছিল তা' বর্ষশেষে ৫,৯২২।০ আনায় পরিণত হয়েছে। সোসাইটীর উক্ত ফণ্ডের ৫,৪১২॥০ আনা ক্যাস সার্টিফিকেট প্রভৃতিতে গচ্ছিত আছে এবং ১,০২৩৸০ আনা ব্যাঙ্ক ও হেড অফিসে ও ব্রাঞ্চ অফিসে নগদ মজুদ আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সোসাইটীর ফণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষাও স্থিতির পরিমাণ বেশী। সোসাইটীর হিসাব-পরীক্ষক সোসাইটীর তহবিলের আমানত পরীক্ষা করে নির্ভুল ব'লে সাক্ষ্য দিয়েছেন।



আশ্বিন ১৩৪১

উদয়ন

দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

মূলতানের সুরে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস —
তোমার চোখে দেখেছিলেম
আমার সর্ব্বনাশ।

এ সংসারের নিত্যখেলায়
প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের
হাস্য পরিহাস —
মাঝখানে তার তোমার চোখে
আমার সর্ব্বনাশ।

আমের বনে দোলা লাগে
মুকুল পড়ে ঝ'রে —
চিরকালের চেনাগন্ধ
হাওয়ায় ওঠে ভ'রে।

মঞ্জরিত শাখায় শাখায়
মৌমাছিদের পাখায় পাখায়
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন
ফেলেছে নিঃশ্বাস —
মাঝখানে তার তোমার চোখে
আমার সর্ব্বনাশ ॥

দুর্গামূর্ত্তি-পরিচয়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

সন্তানমাত্রই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করে। হিন্দু যে জগৎজননী দুর্গার মূর্ত্তি দেখিতে চাহিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আবৃত থাকে—সহস্র জন্মের অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশির সংস্কাররূপ অজ্ঞানান্ধকারে আমরা নিমগ্ন থাকি। তাই জগৎজননীর জ্যোতির্ম্ময়রূপ আমরা দেখিতে পাই না। পরমকারুণিক ঋষি জগৎজননীর মূর্ত্তির পরিচয় দিয়া আমাদের সন্তান-জীবন ধন্য করিয়াছেন।

চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে দুর্গামূর্ত্তির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুরের নেতৃত্বে অসুরগণ দেবসৈন্য পরাজিত করিয়াছে। ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের প্রবৃত্তিই অসুরবর্গ। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিই দেবগণ। সুখভোগের প্রবৃত্তিই আমাদের স্বভাবতঃ প্রবল, শুভ-কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। এজন্য দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদেরই জয় হয়। দেবগণ ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য না পাইলে অসুরগণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হ'ন না। ঈশ্বরের কৃপালাভ করিলেই আমরা স্বাভাবিক সুখভোগস্পৃহা সংযত করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হই। চণ্ডীতে উল্লেখ আছে যে, অসুরগণের নিকট দেবগণের পরাভব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ও মহেশ্বর কোপ প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের বদন হইতে তেজ নির্গত হইল। ব্রহ্মার বদন হইতে এবং অপর দেবগণের শরীর হইতেও তেজ বহির্গত হইল। এই সকল তেজ একত্র সমবেত হইয়া জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইল এবং ক্ষণপরে নারীদেহ ধারণ করিল—ইহাই দুর্গার মূর্ত্তি। মহাদেবের তেজ হইতে মুখ হইল, বিষ্ণুর তেজ হইতে বাহু হইল,



দুর্গামূর্ত্তি

[উড়িষ্যার ভাস্কর-শিল্প অবলম্বনে গঠিত] [শিল্পী-শ্রীনিতাই পাল ।

Blank page (s)

ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয় হইল, অপরাপর দেবতার তেজ হইতে কেশ, স্তন, জঙ্ঘা, উরু, নিতম্ব প্রভৃতি দেবীর বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্ট হইল।

ঈশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের রূপ ধারণ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। দেবগণ ঈশ্বরের আদেশ-অনুসারে নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করিয়া জগতের বিবিধ শুভকর্ম্ম সম্পাদন করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং যাবতীয় দেবগণের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া জগন্মাতার মূর্ত্তি গঠিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, জগতের যাবতীয় শুভ-শক্তির একত্র সমাবেশ হইতেই জগজ্জননীর আবির্ভাব। অসুরগণকে ধ্বংস করাই তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

জননীই সন্তানের সকল প্রকার মঙ্গল সম্পাদন করেন এবং নিজ হস্তে সকল অনিষ্ট দূর করেন। অসুর-বিনাশের জন্য জগৎজননীর দেহ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সুশোভিত। এজন্যই মহাদেব তাঁহার হাতে শূল দিয়াছেন, বিষ্ণু চক্র দিয়াছেন, ইন্দ্র বজ্র দিয়াছেন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু দিয়াছেন (কমণ্ডলুর পবিত্র জল-স্পর্শে অশুভ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়), সূর্য্য জগৎজননীর সমস্ত রোমকূপ নিজ কিরণমালায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন (সে আলোকের প্রকাশ হইলে আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয়, আর অন্যায় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি থাকে না), সমুদ্র অম্লান-পঙ্কজের মালা দ্বারা মায়ের শির এবং বক্ষ সাজাইয়া দিয়াছেন (সে সৌন্দর্য্য একবার মাত্র নয়ন-পথে উদিত হইলে জগতের তুচ্ছ সৌন্দর্য্যে আর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না)।

এই প্রকারে সর্ব্ব আভরণ এবং সর্ব্ব প্রহরণ-ভূষিতা হইয়া জগৎজননী মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিয়া উচ্চনাদ করিলেন। সে ধ্বনি শুনিয়া সকল লোক ক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র কম্পিত হইল, পৃথিবী ও পর্ব্বতরাশি বিচলিত হইল। তাহার পর অসুরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরগণের কর্ত্তিত হস্ত-পদ-মুণ্ডে যুদ্ধ-ক্ষেত্র পূর্ণ হইল, তাহাদের শোণিত-স্রোতে রণভূমি প্লাবিত হইল। জগৎজননী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অসুর সংহার করিতে লাগিলেন। সন্তানের অনিষ্টকারী শক্তি ধ্বংস করিয়া মায়ের যেরূপ আনন্দ হয়, আর কিসে সেরূপ আনন্দ হয়? তাই ঋষি সেই সংগ্রামকে 'যুদ্ধ মহোৎসব' বলিয়াছেন।

মহিষাসুরের সকল সেনাপতি নিহত হইলে মহিষাসুর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহার পরাক্রমে দেবীর সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ হইল। দেবী তাহাকে জালদ্বারা আবদ্ধ করিলেন, সে সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী সিংহের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, সে পুরুষরূপ ধারণ করিল। দেবী পুরুষকে কাটিয়া ফেলিলেন, সে হস্তীরূপ ধারণ করিল। আমাদের অশুভ প্রবৃত্তিকে নির্ম্মূল করা অতিশয় কঠিন, সে প্রবৃত্তি মরিয়াও মরে না, নানা রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে মন্দ কর্ম্ম করায়। অবশেষে অসুররাজ পুনরায় মহিষরূপ ধারণ করিল। দেবী মধুপান করিয়া (অর্থাৎ অসুরবধ-জনিত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া) লম্ফ দ্বারা মহিষাসুরের উপর আরোহণ করিলেন, তাহার কণ্ঠ পদদ্বারা পীড়ন করিলেন, শূলের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন অসুর নিজ মুখ হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করিল, দেবীর শক্তিতে তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় অসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তরবারিদ্বারা তাহার শির কাটিয়া ফেলিলেন। দৈত্য-সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, দেবগণ পরম আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং স্খলিত স্বরে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ভাব-সম্পদে এবং ভাষার গৌরবে সে স্তব অতুলনীয়।

দুর্গা অসুরসৈন্যের উপর চরম জয়লাভ করিয়াছেন, ঠিক সেই অবস্থার মূর্ত্তি গঠন করিয়া বাঙ্গালী জগন্মাতার পূজা করে। ঐশ্বরিক শুভ শক্তির নিকট, অশুভ দানব-শক্তি পরাজিত। তাই দুর্গাপূজায় সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না। বাঙ্গালীর পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে সে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে আনন্দে উৎফুল্ল। বর্ষাবারিপুষ্ট শ্যামল বৃক্ষপত্রাবলির উপর শরতের সুবর্ণ রৌদ্রধারা

পতিত হইয়াছে; উজ্জ্বল নীল আকাশ সৌরকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে; নদীর জল নির্ম্মল হইয়াছে; পুষ্করিণী আলোকিত করিয়া পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় সাধকের আনন্দ জল-স্থল-বায়ু পরিপূর্ণ করিয়াছে। বালক-বালিকা নূতন বস্ত্র পাইয়াছে। দরিদ্র তৃপ্তিকর ভোজন পাইয়াছে। প্রবাসী গৃহে ফিরিয়াছে। সানাইয়ের মধুর রাগিণী সকলের হৃদয়ের অন্তস্তল পুলকিত করিতেছে।

চণ্ডী-বর্ণিত দুর্গামূর্ত্তির উপর বাঙ্গালী কিছু নিজস্ব সাধনা-সম্পদ যোগ করিয়াছে। তাই বাঙ্গালী যে দুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাঁহার দক্ষিণে লক্ষ্মী ও গণেশ, বামে সরস্বতী ও কার্ত্তিক। ইঁহারা সকলে মায়েরই পুত্র-কন্যা। যেদিন মা আমাদের ঘরে আসেন সেদিন ইঁহারাও সঙ্গে আসেন। জগৎজননীকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, ঐশ্বর্য্য ও সফলতা, বিদ্যা ও শৌর্য্য সকলই লাভ করা যায়। লক্ষ্মী ও সরস্বতী ঊর্দ্ধে, কার্ত্তিক ও গণেশ নীচে। রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিন্দু-সভ্যতার বিশেষত্ব। লক্ষ্মী ও গণেশ দক্ষিণে, সরস্বতী ও কার্ত্তিক বামে। ইহার কারণ ঐশ্বর্য্য ও সফলতাই শ্রেষ্ঠ; বিদ্যা এবং শৌর্য্য ঐশ্বর্য্য ও সফলতা লাভের উপায় মাত্র।

বাঙ্গালী আর একটি কাহিনী দ্বারা দুর্গাপূজা মধুর ও সরস করিয়াছে। দুর্গা পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা। তিনি চিরকাল পতিগৃহেই বাস করেন। কিছুকালের জন্যও মাতা মেনকা কন্যাকে কাছে রাখিতে পারেন না। কেবল দুর্গাপূজার সময় মাত্র চারিদিনের জন্য মেনকা কন্যাকে আপনার নিকট রাখিতে পান। কন্যা আসিবে বলিয়া মা দিন গণিতে থাকেন; অবশেষে কন্যা আসেন, চারিদিনের আনন্দ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, বিজয়ার দিন মাকে আবার কাঁদাইয়া দুর্গা পতিগৃহে চলিয়া যান। যশোদার বাৎসল্য-স্নেহে আমরা দেখিতে পাই, পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহকে হিন্দু-প্রতিভা ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনারূপে পরিণত করিয়াছে; মেনকার বাৎসল্য-রসে দেখিতে পাই, বিবাহিতা কন্যার জন্য মায়ের স্নেহকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সাধনরূপে পরিণত করা হইয়াছে।

দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র এবং ভাস্কর্য্য দেখিয়াছি কিন্তু নিরক্ষর বাঙ্গালী শিল্পী জগৎ-জননীর মুখে যে পবিত্র সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে, তাহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। সন্তানের চক্ষে মায়ের মূর্ত্তি যেরূপ মনোহর, বুঝি আর কিছুই সেরূপ নহে।



রাজতন্ত্র বনাম প্রজাতন্ত্র

রাজরত্ন শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

আমরা হিন্দু, আমাদের কাছে রাজা নামে একটা বড়ই মোহ রাছে, রাজা নাম আমাদের কাছে বড়ই প্রিয়, বড়ই শ্রুতিমধুর। প্রজারা রাজার নিকট হইতে যাহা পায় বা পাইবার আশা করে, তাহা অপর কোনরূপ শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে পায় না। রাজতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাসনতন্ত্র প্রায়ই যন্ত্রের মত চালিত, কতকগুলি নিয়ম-কানুন বাঁধা আছে, সকলকে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। যিনি শাসক তাঁহাকেও মানিতে হইবে, আবার যাঁহারা শাসিত হইতেছেন—তাঁহাদেরও মানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বাঁধা-ধরা যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত চলায় নানা প্রকার বিঘ্ন আছে, তাহাতে প্রজাদের মন উঠে না, তাহারা অসন্তুষ্ট হয় ও চঞ্চল হয়, এবং এই চাঞ্চল্যের জন্য রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়।

এইরূপ যন্ত্রের মত কাজ করা ছাড়াও রাজার অন্যান্য পালনীয় অনেক জিনিষ আছে, যাহা অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্রে দেখা যায় না। সেকালে হিন্দুদের নিকট রাজা —"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" আবার হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় সৃষ্টি, রক্ষণ ও ধ্বংসের একমাত্র অধিকারী। রাজার বাস্তবিক যে কি কাজ, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মালাকারের সহিত তুলনা করিয়া তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই শুনি —

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতান্
চিন্বন্ লঘূন্ বর্দ্ধয়ন্
অত্যুচ্চান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্
বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
ক্রূরান্ কণ্টকিনান্ বহির্নিরসয়ন্
ম্লানান্ পুনঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রপঞ্চচতুরো
রাজা চিরং নন্দতি॥

"রাজা মালাকালের মত নানাপ্রকার কার্য্যপ্রপঞ্চ দেখাইয়া থাকেন। যদি কেহ উৎখাত হইয়া থাকে, তাহাকে তিনি পুনরায় রোপণ করেন; যদি কেহ কুসুমিত হইয়া থাকে, তাহার নিকট হইতে পুষ্প-চয়ন করেন; যদি কেহ ছোট অবস্থায় থাকে, অবস্থানুযায়ী তাহাকে বড় করিয়া দেন; যদি কেহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, তাহাকে তিনি নামাইয়া দেন; যদি কেহ অবনত হইয়া যায়, তিনি তাহার অভ্যুদয় সাধন করেন; যদি অনেকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন করেন; অত্যন্ত ক্রূর ও কণ্টকিদিগকে দূরে নিক্ষেপ করেন; এবং পরিম্লানিত ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল আশা-বারি সেচনে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।

এইরূপ রাজাই আমাদের আদর্শ রাজা, রাজা আবার সকলেই সমান ন'ন, কিন্তু সে সকল রাজাদের কথা এখানে বলিতেছি না। উদ্দেশ্য এই যে, রাজার এই সকল প্রকারের কার্য্যপ্রপঞ্চ, অপর কোনরূপ যন্ত্রচালিত শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে পাওয়া যায় না, এবং পাওয়া যাইতে পারে না, তাহাই দেখানো।

উৎকট প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবে আমাদের প্রাচীন আদর্শ যে রাজতন্ত্র তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। তাই পুরাতন সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে রাজতন্ত্র ও অন্যান্য প্রকার শাসনতন্ত্রের পার্থক্য একবার দেখাইবার চেষ্টা করিব। তবে গোড়াতে এ-কথা বলিয়া রাখার দরকার যে, কি রাজতন্ত্র, কি প্রজাতন্ত্র, কি অন্যপ্রকার শাসনতন্ত্র—কোনোটাই একেবারে দোষবর্জ্জিত নহে। এবং এ-বিষয়ে এমন কোনো শাসন-ব্যবস্থা থাকিতেই পারে না, যাহা সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত হইবে। কারণ পৃথিবীতে কোন জিনিষই আদর্শরূপে দেখা যায় না, তবে আমাদের বুদ্ধিশক্তিতে আমরা

একটা আদর্শ কল্পনায় আনিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি না। কারণ, এই অনিত্য সংসারের ইহাই আসল স্বরূপ।

পাটনার বিখ্যাত বিদ্বান এবং কৌসুলী মিঃ কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল সাহেব হিন্দু রাজনীতি শাস্ত্রের উপর একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক হইতে দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতে নানা প্রকার শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ সকল প্রকার শাসনতন্ত্রকেই এক একবার চালাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল শাসন-প্রথা নানা নামে পরিচিত ছিল। কাহাকেও বলিত ভৌজ্য, কাহাকেও বলিত স্বারাজ্য, কাহাকেও বা বৈরাজ্য, রাষ্ট্রিক, দ্বৈরাজ্য, উগ্র, আয়ুধজীবি বা রাজন্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করিত। তাহাতে দেখি, রাজ-প্রধান, আমলা-প্রধান ও কুলীন-প্রধান এবং অন্যান্য সকল প্রকার শাসন প্রথাই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এক রাজপ্রধান তন্ত্র ছাড়া আর কোনটিই চলে নাই, এবং কোন দিগ্বিজয়ী রাজনীতি শাস্ত্রকার তাহা চালাইতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় রাজপ্রধানতন্ত্রে যে সকল দোষ ছিল তাহা অপেক্ষা অন্যগুলিতে বেশী দোষ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই শেষোক্ত তন্ত্রগুলি বেশীদিন আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে নাই। নহিলে এইগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিবার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল শাসনতন্ত্র পৃথিবীতে অব্যবহার্য্য বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং যাহা কালবশে আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই দুই-একটি বর্ত্তমানযুগে চালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে; বিলাতে তাহা চলিতেছে এবং আমাদের দেশেও যাহাতে এই সকল অব্যবহার্য্য প্রথা চলিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বত্র একটি ধূয়া উঠিয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা সম্পূর্ণ ভবিষ্যতের গর্ভে, এখন শেষ কথা কাহারও বলিবার অধিকার নাই এবং ভবিষ্যতে এই সকল প্রথানুযায়ী শাসনতন্ত্র চালাইলে দরিদ্র প্রজাদের যে কি হইবে, সুখ হইবে কি তাহারা দুঃখের অতল জলে ডুবিবে, তাহা একমাত্র পরমাত্মাই বলিতে পারেন। তবে ইতিহাস যদি দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, ধূয়া দেশে নানা প্রকার উঠে কিন্তু বাজে জিনিষ কখনই টিকে না।

প্রাচীন নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা রাজতন্ত্র ছাড়া অপর সকল প্রকার শাসন-প্রথাকেই অবজ্ঞা করিয়াছেন। গরুড়পুরাণোক্ত—নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—

অরাজকে ন বস্তব্যং তথা চ বহুনায়কে।
স্ত্রীরাজকে ন বস্তব্যং তথা চ শিশুনায়কে॥
(অধ্যায় ১৫১, শ্লোক ৬২)

"যে রাজ্যে রাজা নাই সেখানে বাস করিবে না; যেখানে বহুলোক কর্ত্তা, সেখানেও না; যেখানে স্ত্রীলোক বা শিশু কর্ত্তা সেখানেও বাস করিবে না।"

যেখানে রাজা না থাকে সে রাষ্ট্রের নানারূপ বিপত্তি হইয়া থাকে। অরাজতন্ত্রে প্রজাদের যে কিরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা মহাভারত হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লেখে—

অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু ধর্ম্মো ন ব্যবতিষ্ঠতে।
পরস্পরং চ খাদন্তি সর্ব্বথা ধিগরাজকম্॥
(অধ্যায় ৬৮, শ্লোক ৩)

"যে রাজ্যে রাজা নাই তথায় লোকে নিজের নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বথা অরাজক তন্ত্রকে ধিক্।"

নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ত্ততে।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূণ্ বিষহতে যুধি॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৪)

"যে জনপদে রাজা নাই সেখানে শাসনের শৃঙ্খলা থাকে না এবং সেরূপ রাজ্যের সেনা যুদ্ধে শত্রুদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না।"

বিপালাশ্চ যথা গাবো যথা চাতৃণকং বনম্।
অজলাশ্চ যথা নদ্যস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৯)

"যে রাষ্ট্রে রাজা থাকে না সেখানকার প্রজাদের অবস্থা পালকবিহীন গাভীর ন্যায়, তৃণহীন বনের ন্যায়, অথবা জলহীন নদীর ন্যায় হইয়া থাকে।"

হরেয়ুর্বলবন্তোঽপি দুর্ব্বলানাং পরিগ্রহান্।
হন্যুর্ব্যাযচ্ছমানাংশ্চ যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৪)

"যেখানে রাজার দ্বারা প্রজারা পালিত না হয়, সেখানে যাহারা বলশালী তাহারা দুর্ব্বলের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া থাকে, এবং যদি সে বাধা দেয় তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।"

যানং বস্ত্রমলঙ্কারান্ রত্নানি বিবিধানি চ।
হরেয়ুঃ সহসা পাপা যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৬)

"যেখানে রাজা প্রতিপালন না করেন, সেখানে দুষ্ট লোকে অপরের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং বিবিধ রত্নাদি জোর করিয়া অপহরণ করিয়া থাকে।"

পতেয়ুস্তবিধং শস্ত্রং বহুধা ধর্ম্মচারিষু।
অধর্ম্মঃ প্রগৃহীতঃ স্যাদ্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৭)

"যদি রাজা পালন না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মচারী লোকের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রাদি বর্ষিত হয় এবং চারিদিকে অধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে।"

বধবন্ধপরিক্লেশো নিত্যমর্থবতাং ভবেৎ।
মমত্বঞ্চ ন বিদ্যেয়ুর্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ১৯)

"যদি রাজা পালন না করেন তাহা হইলে ধনী ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই বধ ও বন্ধনাদি দ্বারা পীড়িত হন এবং আমার বলিতে তাঁহাদের কিছুই থাকে না।"

ন যোনিদোষো বর্ত্তেত ন কৃষির্ন বণিক্পথাঃ।
মজ্জেদ্ধর্ম্মস্ত্রয়ী ন স্যাদ্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২১)

"যদি রাজা না পালন করেন তাহা হইলে জন্মগত পার্থক্য উঠিয়া যায়, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়, ধর্ম্ম ডুবিয়া যায় এবং ত্রয়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

ন লভেদ্ধর্ম্মসংশ্লেষং হতবিপ্রহতো জনঃ।
হর্ত্তা সুস্থেন্দ্রিয়ো গচ্ছেদ্যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৭)

"যদি রাজা পালন না করেন, প্রজাদের মধ্যে যাহারা হত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহারা বিন্দুমাত্র ন্যায় বিচার পায় না; যে আঘাত করে সে বিনা শাস্তিতে সুস্থ ইন্দ্রিয়ে পলায়ন করে।"

অনয়াঃ সংপ্রবর্ত্তেরন্ ভবেদ্বৈ বর্ণসঙ্করঃ।
দুর্ভিক্ষমাবিশেদ্রাষ্ট্রং যদি রাজা ন পালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ২৯)

"রাজা পালন না করিলে চতুর্দ্দিকে অনীতির প্রবর্ত্তন হয়, বর্ণ-সঙ্করের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ প্রবেশলাভ করে।"

উপরে লিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, রাজহীন রাষ্ট্র বাসের একেবারে অযোগ্য এবং সেরূপ জনপদে প্রজাদের বিপদ লাগিয়াই থাকে। অতএব যেখানে রাজা নাই সে রাজ্যে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও নাই, কোনরূপ, সমাজবন্ধন নাই এবং শৃঙ্খলাও নাই। প্রজাতন্ত্র একপ্রকার রাজহীন শাসনতন্ত্র এবং তাহাতেও বিপদের সম্ভাবনা ঠিক যেরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ। কারণ, মহাভারতে দেখিতে পাই প্রথমে পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু যখন দেখা গেল প্রজাতন্ত্র সাধারণ লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে অক্ষম তখন রাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল। রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে বর্ণিত বিবরণ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

নিয়তস্ত্বং নরব্যাঘ্র শৃণু সর্ব্বমশেষতঃ।
যথা রাজ্যং সমুৎপন্নমাদৌ কৃতযুগেঽভবৎ॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৩)

"হে নরব্যাঘ্র! পূর্ব্বে কৃতযুগে কিরূপে রাজতন্ত্র

প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।"

নৈব রাজ্যম্ন রাজাসীন্ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
ধর্ম্মেণৈব প্রজাঃ সর্ব্বা রক্ষান্তি স্ম পরস্পরম্॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৪)

"তখন রাজ্য ছিল না, রাজা ছিল না, দণ্ড ছিল না এবং দণ্ড বিধাতা কেহ ছিল না। প্রজারা সকলে পরস্পরে নিয়মবদ্ধ হইয়া পরস্পরের রক্ষাবিধান করিত।"

পাল্যমানাস্তথাত্যোহন্যং নরা ধর্ম্মেণ ভারত।
দৈন্যং পরমুপাজগ্মুঃ তত্তস্তান্ মোহ আবিশৎ॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৫)

"হে ভরত বংশোদ্ভব! এইরূপ ভাবে পরস্পরের পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে বিপত্তি দেখা দিল এবং তাহারা মূঢ়তার পরিচয় দিতে লাগিল।"

তে মোহবশমাপন্না মনুজা মনুজর্ষভ।
প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্ম্মস্তেষামনীনশৎ॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ১৬)

"হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তাহারা এইরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করার জন্য এবং তাহাদের নিয়মের প্রতি অশ্রদ্ধ হওয়ায় তাহাদের নিয়মাবলী নষ্ট হইয়া গেল।"

অগম্যাগমনং চৈব বাচ্যাবাচ্যং তথৈব চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং চ রাজেন্দ্র দোষাদোষং চ নাভ্যজন্॥
(অধ্যায় ৫৮, শ্লোক ২০)

"তাহারা অগম্যাগমন, রূঢ়ভাষণ, অভক্ষ্যভক্ষণ এবং নানাপ্রকার অপরাধ হইতে বিরত থাকিতে পারিল না, (এবং তাহাদের সমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল)।"

শান্তিপর্ব্বের আর একটি জায়গায় এই বিবরণ একটু অন্যভাবে দেওয়া আছে। তাহাতেও দেখা যায়, সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রই প্রচলিত ছিল এবং প্রজারা কিরূপে আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত, কিরূপে তাহাদের মধ্যে প্রথম আইন তৈয়ারী হইল, এবং কিরূপে পরে আইনগুলি লোকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার জন্য নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হইল, এই সকল বৃত্তান্ত কয়েকটি শ্লোকে অতি বিশদভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রজাতন্ত্র কিরূপে সমাজ-রক্ষণে অসমর্থ হইয়াছিল তাহা শান্তিপর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অন্য কোন জায়গায় পাওয়া যায় না। প্রজাতন্ত্রের অবসানে প্রজাপতি ব্রহ্মা কিরূপে রাজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্তও শান্তিপর্ব্বে উল্লেখ করা আছে। অতি প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি নিম্নে বিবৃত হইল—

অরাজকাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃশান্॥
(অধ্যায় ৬৬, শ্লোক ১৭)

"আমরা শুনিয়াছি কিরূপে রাজহীন প্রজারা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়াছিল এবং কিরূপে তাহারা জলে বড় মাছ যেমন ছোট মাছ খাইয়া ফেলে, সেইরূপ আপনাদের মধ্যে একে অপরের ধ্বংস-বিধান করিয়াছিল।"

সমেত্য তাস্ততশ্চক্রুঃ সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্।
বাক্‌শূরো দণ্ডপরুষো যশ্চ স্যাৎপারদারিকঃ।
যশ্চ নঃ সময়ং ভিন্দ্যাৎ ত্যাজ্যা নস্তাদৃশা ইতি॥
(অধ্যায় ৬৬, শ্লোক ১৮-১৯)

"আমরা শুনিয়াছি তাহারা একত্র মিলিত হইয়া কয়েকটি নিয়ম তৈয়ারী করিয়াছিল; অর্থাৎ, যাহারা পরুষভাষী, যাহারা আঘাতকারী, যাহারা পরদারাসক্ত এবং যাহারা তাহাদের নিয়মভঙ্গ করিবে তাহাদের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

বিশ্বাসার্থং চ সর্ব্বেষাং বর্ণানামবিশেষতঃ।
তাস্তথা সময়ং কৃত্বা সময়েনাবতস্থিরে॥
(অধ্যায় ৬৬, শ্লোক ১৯)

"চারিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মনে প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য তাহারা এইরূপ নিয়ম তৈয়ারী করিয়া পরে সেইরূপ নিয়ম অনুযায়ী চলিতে লাগিল।"

সহিতাস্তাস্ততো জগ্মুরসুখার্ত্তাঃ পিতামহম্।
অনীশ্বরা বিনশ্যামো ভগবন্নীশ্বরং দিশ।
যং পূজয়েম সম্ভূয় যশ্চ নঃ প্রতিপালয়েৎ॥
(অধ্যায় ৬৬, শ্লোক ২০-২১)

"পরে (যখন নিয়মভঙ্গ হওয়ায় অশান্তি হইতে লাগিল) তাহারা বিশেষ অসুখী হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমরা রাজা-বিহীন হইয়া বিনষ্ট হইতেছি, অতএব আপনি আমাদের একজন প্রভু দিন। তাঁহাকে আমরা সকলে মিলিয়া পূজা করিব এবং তিনি আমাদের প্রতিপালন করিবেন।"

উপরি লিখিত বিবরণটি চুম্বকভাবে মনুসংহিতাতেও পাওয়া যায় এবং ইহা হইতেই রাজার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। মনুতে আছে—

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য লোকস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
(অধ্যায় ৭, শ্লোক ৩)

"যখন পৃথিবীতে রাজা থাকে না তখন সকলে আতঙ্কে অস্থির হয়। ভগবান সেইজন্য সকলের রক্ষার্থে রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বেশ ভালভাবে তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রজাতন্ত্রে এরূপ একটি বিশেষ দোষ আছে যাহা রাজতন্ত্রে পাওয়া যায় না। এবং এই একটি দোষ এতই সাঙ্ঘাতিক যে, সেই একটি কারণের জন্য প্রজাতন্ত্রের সাফল্য-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। সেটি মন্ত্রগুপ্তির অভাব। এই মন্ত্রগুপ্তির অভাব প্রজাতন্ত্রে যেরূপ বিশদভাবে প্রকাশ পায়, রাজতন্ত্রে সেইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। রাজ্যের যাহা কিছু কার্য্য, যাহা কিছু করণীয়, যেমন যুদ্ধযাত্রাদি, প্রথমে বিশেষ গোপনে রাখিতে হয়। যদি তাহা অসময়ে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রাজ্যের সমূহ বিপদ এবং প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে। রাজ্যের যাহা কিছু গোপনীয় কার্য্য তাহাকেই মন্ত্র বলিয়া থাকে। যাহাদের হাতে মন্ত্র সুরক্ষিত থাকে তাহাদিগকে মন্ত্রী বলে, মন্ত্রগোপ্তাও বলে। তাহারা মন্ত্ররক্ষণ করে এবং গোপন রাখে বলিয়াই মন্ত্রী বা মন্ত্রগোপ্তা তাঁহাদের বলা হয়। প্রজাতন্ত্রে গুপ্তি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না, কারণ প্রজাতন্ত্রে প্রজারাই কর্ত্তা, তাহাদের অনুমতি ভিন্ন কোন বড় কার্য্য তাহাদের প্রতিনিধিরাও করিতে পারেন না। কাজেই যখন যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হয়, তাহা প্রতিনিধি-সভায় উত্থাপন না করিলে উপায় নাই; সেইজন্য এই সকল গুরুতর ব্যাপার গোপন থাকে না এবং শত্রুতে সেই সকল খবর পাইয়া বিপদ আনয়ন করে এবং রাজ্যের ভিতরও প্রতিবাদীর দল ক্ষেপিয়া উঠে। ইহাতে শৃঙ্খলার সমূহ ক্ষতি হয়, সেনানাশ ও অর্থনাশও সেজন্য প্রচুর পরিমাণে ঘটিতে পারে। এই সম্বন্ধে শুটিকতক শাস্ত্র হইতে প্রমাণ নীচে উদ্ধৃত করিব। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে নীতিবিদেরা মন্ত্রভেদকে কিরূপ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন এবং মন্ত্রভেদে দেশের কি ভয়াবহ ক্ষতি হইতে পারে।

মন্ত্রমূলমিদং রাজ্যমতো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাত্তথাহন্য ন বিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ॥
(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, আচারাধ্যায়, শ্লোক ৩৪৪)

"রাজ্যের মূল মন্ত্রে নিহিত, অতএব মন্ত্র এরূপভাবে সুরক্ষিত করিয়া রাখিবে যে, যতদিন তাহা না ফলীভূত হয় ততদিন যেন কেহ জানিতে না পারে।"

মন্ত্রমূলং সদা রাজ্যং তস্মান্মন্ত্রঃ সুরক্ষিতঃ।
কর্ত্তব্যঃ পৃথিবীপালৈর্ম্মন্ত্রভেদভয়াৎ সদা॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, খণ্ড ২, অধ্যায় ৬৫, শ্লোক ৩৫)

"সদাই রাজ্য মন্ত্রমূল; সেইজন্য রাজারা মন্ত্র সুরক্ষিত করিয়া রাখিবেন এবং দেখিবেন যেন মন্ত্রের প্রচার অসময়ে না হয়।"

মন্ত্রবৎসাধিতো মন্ত্রঃ সজ্ঞাতানাং সুখাবহঃ।
মন্ত্রস্খলেন বিনষ্টা বহবঃ পৃথিবীক্ষিতঃ॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, খণ্ড ২, অধ্যায় ৬৫, শ্লোক ৩৬)

"যে মন্ত্র ঠিক মন্ত্রের ন্যায় সাধিত হয়, তাহা জনসমূহের হিতজনক হইয়া থাকে। দুর্ম্মন্ত্রের সাধনা করিয়া অনেক রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন।"

অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রাণি বহবঃ পণ্ডবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্‌ভ্যাদক্ষমিচ্ছন্তি মন্ত্রেষভ্যন্তরীকৃতাঃ।

মন্ত্রিরূপা হি রিপবঃ সন্তাব্যাস্তে বিচক্ষণৈঃ ॥

(রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, অধ্যায় ৬৩, শ্লোক ১৪)

"যদি একবারও পরামর্শ লওয়া হয়, শাস্ত্র না জানিয়া অনেক পশুবুদ্ধির মানব প্রগল্‌ভতা বশতঃ রাজকার্য্যসম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিচক্ষণেরা তাঁহাদিগকে মন্ত্রিরূপে দেশের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবেন।"

ন চ মূর্খৈর্ন চানাপ্তৈস্তথা নাধার্মিকৈর্নৃপঃ।

মন্ত্রং তু স্বদিতং কুর্য্যান্নৈষ রাষ্ট্রে ন বাধতে ॥

(বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, খণ্ড ২, অধ্যায় ১৫১, শ্লোক ২১)

"রাজা কখনও মূর্খকে, অবিশ্বাস্য ব্যক্তিকে, অধার্ম্মিককে মন্ত্রের আস্বাদন দিবেন না। এইরূপ অযোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ না করিলে সে মন্ত্র রাষ্ট্রের অজ্ঞাত থাকে।"

রাজ্ঞাং বিনাশমূলন্তু কথিতো মন্ত্রবিভ্রমঃ।

নাশহেতুর্ভবেন্মন্ত্রঃ কুপ্রযুক্তস্তু মন্ত্রবৎ ॥

(বিষ্ণুধর্মোত্তর, খণ্ড ২, অধ্যায় ১৫১, শ্লোক ২২)

"মন্ত্র-বিষয়ক প্রমাদই রাজাদের বিনাশের মূলীভূত কারণ। যদি মন্ত্র কুপ্রযুক্ত হয় তাহা হইলে দুষ্ট মন্ত্রজপের ন্যায় তাঁহাদের নাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।"

মন্ত্র বিষয়ে এই কয়েকটি শ্লোকের উপর টীকা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রজাতন্ত্রে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং অতি গোপনীয় কার্য্য তাহা অতি প্রকাশ্য সভায় বিবেচিত হইয়া থাকে, কারণ, তাহাতে প্রতিনিধিদের মত থাকা চাই। কোন দরকারী এবং ভাল কার্য্যও প্রতিনিধিরা কোন কারণে সমর্থন না করিলে, করিবার যো নাই। তাহা ছাড়া মতানৈক্য ত' আছেই, দল বাঁধা-বাঁধিও আছে। কার্য্য যে দলের মনোমত হইল না, তাঁহারা চটিয়া রহিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন, এবং প্রায়ই পূর্ব্ব প্রতিনিধি যাহা করিয়াছেন তাহা উল্টাইতে লাগিলেন। ইহাতে রাজ্যের প্রগতি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কয়েকজন লোকের হাতে শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে এবং তাহাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়; তাহাদিগকে নীচে নামাইবার কোন লোক থাকে না। যদি কেহ তাহাদের কুনজরে পড়ে তাহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতে হয়।

রাজতন্ত্র সেই হিসাবে অনেক ভাল। রাজা তাঁহার রাজপ্রাসাদে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দেশ ও অভিজ্ঞতা অনুসারে রাজপ্রাসাদের গভীর নির্জনতায় রাজারই ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিও প্রজার ন্যায় ক্ষুদ্র না হইয়া রাজারই ন্যায় বিশাল হয়, সেইরূপ হৃদয়ও বিশাল হয়। ভোগে ও ব্যায়ামে তাঁহার শরীর শক্ত ও কর্ম্মঠ হয়; রাজশক্তি ও উৎসাহশক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং তাহা প্রজার কল্যাণের কার্য্যেই সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়। তাঁহার নিকট সকল প্রজাই সমান, কেহ ছোট, কেহ বড় নহে। তাঁহার একমাত্র চিন্তা কিসে রাজ্য বিস্তৃত হয়, কিসে রাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিসে প্রজারা সুখী হয় ও শান্তিতে থাকে। তাঁহার কল্পনা রাজারই ন্যায় বড়, তাঁহার কার্য্য বিশাল, তাঁহার হাতে শক্তি ও সামর্থ্য কার্য্যের অনুরূপে বিশাল এবং সেইজন্য তাঁহার কার্য্য ফলীভূতও হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রজা যদি রাজার সিংহাসনে বসে, তাহা হইলে রাজ্যের বিশাল কার্য্য তাহার নগণ্য ক্ষুদ্র মন দিয়া করিবার যোগ্যতা কোথা হইতে আসিবে ?

তবে একটা কথা, রাজতন্ত্রে রাজা যদি ভাল হ'ন তাহা হইলেই প্রজার সুখ। রাজা যদি অত্যাচারী ও উৎপীড়ক হ'ন তাহাতে প্রজাদের অশেষ দুঃখ। এই জন্য প্রাচীন রাজনীতিবিদেরা অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং কি করিয়া রাজার অপ্রতিহত রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। রাজার প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের একটা বিধান ছিল; তিনি যাহাতে অধর্ম্ম না করেন, অত্যাচার না করেন, সেই জন্য নানারূপ নিয়ম

বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং যাহাতে মন্ত্রি-পরিষদের হাত দিয়া রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এককালে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র ভারতবাসীদের সুখ ও শান্তি দিয়াছিল এবং তাহার সাফল্যে জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল।

রাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা দরকার, রাজা মন্ত্রি-পরিষদকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন কি-না এবং মন্ত্রি-পরিষদ রাজাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন কি-না, অর্থাৎ কোন একটি অন্যায় হুকুম করিতে রাজা ভীত হ'ন কি-না, কিংবা কোন অন্যায় হুকুম প্রতিপালন করিতে মন্ত্রি-পরিষদ বাধা দিতে পারেন কি-না। যদি রাজা অন্যায় হুকুম দিতে ভীত হ'ন এবং মন্ত্রি-পরিষদের সভ্যেরা অন্যায় হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করেন, তখনই বুঝা দরকার যে, সেই শাসনতন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শুনা যায়, অশোক রাজার মন্ত্রী রবিগুপ্ত রাজার কয়েকটি বৌদ্ধবিহারে দেওয়া অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জুনাগড়ের রাজা রুদ্রদামনের মন্ত্রি-সভা সুদর্শন সরোবরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার মেরামতের টাকা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন নিজের পকেট হইতে বিস্তর টাকা খরচ করিয়া সেই সরোবর মেরামৎ করাইয়া দেন। ইহাকেই বলে রাজতন্ত্র অথবা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র। প্রাচীন রাজনীতিবিশারদেরা কখনও রাজার উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করেন নাই, বরং তাঁহার শক্তি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত প্রণালী ধরিয়া সাফল্য লাভে সমর্থ হয় তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিভিন্ন দেশের সমাধির কথা

শ্রীকনক রায়

মৃত্যুর হাত এড়াবার সামর্থ্য আমাদের কারো নেই। তাই এই অপরিহার্য্য জিনিসটা নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনারও অন্ত নেই। কোনো জিনিসের একটা সীমা-রেখা টান্‌তে মানুষ সহজে রাজি হয় না। যে জীবনকে ঘিরে পৃথিবীর সব রকমের সুখ-দুঃখের ছন্দ লীলায়িত হ'য়ে ওঠে মৃত্যুর পর তার আর কিছুই থাক্‌বে না—এ কল্পনাও মানুষের কাছে অসহ্য। তাই মৃত্যুর পরেও একটা কাল্পনিক জীবনের জের টেনে চল্‌বার ধারণা গ'ড়ে উঠেছে প্রায় সব দেশেই, সব সমাজেই এবং এই পারলৌকিক জীবনের কল্পনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবতঃ বিভিন্ন রকমের সমাধি-প্রথার।

তা ছাড়া এই প্রথাগুলোর সঙ্গে হয়তো স্থানীয় আবহাওয়ারও খানিকটে সম্বন্ধ আছে। যে জল-হাওয়ায় মৃতদেহের যে রকমের ব্যবস্থা কর্‌লে দেশের স্বাস্থ্যের হানি না হয়, হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সেইদিকে লক্ষ্য গিয়েছে মানুষের মনের এবং সংস্কার-ব্যবস্থাটাও গ'ড়ে উঠেছে কতকটা সেই অনুসারেই। মিশরে মৃতদেহকে মমি ক'রে রাখা হয়। এ পদ্ধতির মূলেও এই রকমেরই একটি হেতু আছে ব'লে অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন। মিশরের মরুভূমির শুষ্ক আবহাওয়ায় মৃতদেহ সহজে নষ্ট হয় না—এই সহজে নষ্ট-না-হওয়া থেকেই, নষ্ট যাতে কিছুতেই না হ'তে পারে তারই পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টার উদ্ভব। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের ভিতর দিয়েই তারপরে উদ্ভব হয়েছে হয়তো এই ধারণার যে, সব মানুষেরই যখন দেহের উপরে সত্যিকারের একটা লোভ আছে, তখন তার

আত্মারও দেহের উপর লোভ থাকা অসম্ভব নয় এবং দেহের উপর যখন আত্মার লোভ আছে তখন যদি কবরের ভিতরে দেহটাকে ধ্বংসের হাত হ'তে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে আত্মাও এসে আবার সেই দেহের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

পেরুর জল-হাওয়ার অবস্থা মিশরের জল-হাওয়ারই অনুরূপ। তাই সেখানেও গ'ড়ে উঠেছে মিশরের মতো মৃতদেহ দিয়ে মমি কর্‌বার প্রথা। এই ভাবে পেরুতে মমির ভিতর দিয়ে মৃত দেহের ধ্বংস যখন বন্ধ হ'লো, তখন আবার সুরু হ'লো সেই মমি নিয়ে

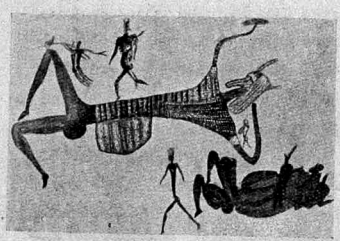

দক্ষিণ রোডেসিয়ার কোনো পাহাড়ে অঙ্কিত মমির চিত্র। [চিত্রটি প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের। এই চিত্র হ'তে প্রমাণ হয়, সেই প্রাচীনতম যুগেও রোডেসিয়াতে মমি কর্‌বার প্রথা বিদ্যমান ছিল। মাঝের বড় মূর্ত্তিটি একজন রাজার। জানোয়ারের চর্ম্মে দেহটি ঢাকা—মাথায় সিংওয়ালা মুখোস। নীচের মূর্ত্তিটি তাঁর রাণীর।]

উৎসবের ব্যবস্থা। পেরুর অনেক পরিবারে উৎসবের সময় তাই পূর্ব্বপুরুষের মৃত দেহটা বা'র ক'রে আনা হয় এবং কখনো কখনো তা নিয়ে তারা শোভা-যাত্রাও ক'রে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মৃতদেহকে যারা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তারা বাঁচিয়ে রাখে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একান্ত মমতাবশতই। মানুষের দেইটাই মানুষের কাছে তার জীবনের প্রতীক। আর সেইজন্যই জীবনশূন্য দেহটার মায়াও মানুষ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। ফোটো তৈরী ক'রে তাই প্রিয়জনের চেহারাটা সে চোখের সাম্‌নে ধ'রে রাখ্‌তে চায়, মৃতদেহকে আরক প্রভৃতির সাহায্যে যদি টিকিয়ে রাখা যায় তারও চেষ্টার সে কসুর করে না।

প্রিয়জনের সমগ্র দেহের উপরে মানুষের এই যে মোহ তার অর্থ সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু দেহ থেকে একটা অঙ্গকে ছিনিয়ে নিয়ে তার উপরে ঝোঁক দেওয়ার ভিতরে যে রহস্য আছে, তার অর্থ অত সহজে বোঝা যায় না। অথচ এ রকমের ব্যাপারও ঘটে থাকে অনেক দেশে। কতকগুলো দেশে মৃতদেহের এক একটা অঙ্গের প্রতি অতিরিক্ত রকমের মমতা দেখানো হ'য়ে থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিরা (Maori) তাদের দলপতির মৃত্যুর পর তার মাথাটা কেটে রেখে দেয়। বড় বড় উৎসবের সময় এই মাথাটা তারা বা'র ক'রে আনে—এবং তখন একদফা চলে আবার তাদের শোকের সমারোহ। অষ্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অতি প্রাচীন অসভ্যদের ভিতরেও কতকটা এরই অনুরূপ একটা প্রথা বর্ত্তমান আছে। সেখানে মা তার মৃত শিশু-পুত্রের অঙ্গের কোনো একটা অংশ নিজের সঙ্গে রেখে দেন। আন্দামানের অধিবাসীদের প্রথা আরো বিচিত্র। তারা মৃত আত্মীয়-স্বজনের হাড় দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরে। বর্ত্তমান সভ্যজাতিদের ভিতরেও, ঠিক এতখানি না হোক্, কতকটা এই ধরণের একটা প্রথা আছে। মৃত প্রিয়জনের চুলের একটা গুচ্ছ কেটে নিয়ে অনেকে 'লকেটের' ভিতর পুরে দেহের সঙ্গে ধারণ করেন।

পূর্ব্ব আফ্রিকার কতকগুলি জাতির ধারণা যে, কেবল রাজ-রাজড়ারাই মৃত্যুর পরেও জীবনের জের টেনে চলে। সেইজন্যে যারা সাধারণ লোক তারা আর কোনো রকম সৎকারের সৌভাগ্য লাভ করে না—তাদের দেহ ঝোপে-জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়, পশু-পক্ষীদের আহার হবার জন্য। অধিকাংশ

আদিম জাতিরই বিশ্বাস যে, মানুষের মৃত্যুর পরের জীবনও ঠিক এইখানকার জীবনের মতোই, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও রাজ-রাজড়া যাঁরা, তাঁরা রাজ-রাজড়াই থাকেন এবং সাধারণ লোক যারা, তারা থাকে সাধারণ লোকের মতো। এই ধারণার ফলে আদিম যুগের কোনো কোনো জাতির ভিতর রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাণী ও অনুচরবর্গকেও তাঁর সঙ্গেই মৃত্যুকে বরণ কর্‌তে হ'তো। পরলোকে রাজার সেবা-শুশ্রূষার ভোগ-বিলাসের যাতে অসুবিধা না হয়, সেই জন্য তাঁর মৃতদেহের সঙ্গেই সমাহিত করা হ'তো এদের মৃতদেহও। প্রাচীন জাপানেও এই প্রথাটার প্রচলন ছিল। মিকাডোর মৃত্যুর পর তাঁর অনুচরগণকে জোর ক'রে সমাহিত করা হ'তো তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পৃথিবীতে সভ্যতার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থার বীভৎসতাও ধরা পড়্‌ল তাদের কাছে। তাই পরবর্ত্তী যুগে দেখা যায়, সত্যিকারের জীবন্ত মানুষকে জোর ক'রে সমাহিত করার পরিবর্ত্তে মাটি দিয়ে মানুষের মূর্ত্তি গ'ড়ে তাই সমাহিত করা হচ্ছে রাজার সমাধিতে তাঁর মৃত দেহের সঙ্গে।

মৃত দেহের সহিত জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমাহিত করার প্রথাও দুনিয়ার বহু আদিম জাতির ভিতরে লক্ষিত হয়। মিশরে এই প্রথাটা একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তুতানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দেখা যায়—জীবন-যাত্রার-চেয়ে ঢের বেশী আড়ম্বরের সঙ্গে তিনি করেছিলেন তাঁর মরণ-যাত্রা। পোষাক-পরিচ্ছদ, যান-বাহন, খাট-পালঙ্ক, আহার-বিহারের অজস্র উপকরণে তাঁর সমাধি কক্ষটা ভরপুর হ'য়ে ছিল। মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মার উপভোগের জন্য এই সব জিনিসের প্রয়োজন—এই কল্পনা থেকেই যে এসব জিনিস মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো জাতি আবার মৃতদেহের সঙ্গে দামী জিনিসপত্র সব ভেঙে ভেঙে সমাহিত করে। নিউগিনিতে কবরের ভিতর এই ধরণের ভাঙা জিনিসপত্র রক্ষিত হবার বহু নিশানা পাওয়া যায়। জিনিসপত্রগুলো ভেঙে দেওয়া হয় কেন তা একটা সমস্যার বিষয়। সম্ভবত প্রথাটার উদ্ভব হয়েছে এই ধারণা হ'তে যে, মৃত আত্মার ব্যবহারে লাগ্‌বার যোগ্যতা যে সব বস্তু আস্ত এবং অবিকৃত আছে তাদের নেই। সুতরাং মৃত আত্মার সেবার জন্য জিনিস-পত্রগুলিকে ভেঙে ফেলে তাদের আত্মাকেও মুক্ত ক'রে দেওয়া দরকার।

এঙ্গোলা পর্ত্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার একটা স্থান। সেখানে কোনো বড় লোকের মৃত্যু হ'লে তাঁর কবরের চার ধারে চারটি ছাতা খোলা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। তা ছাড়া বাসন-পত্র ভেঙে কবরে ছড়িয়ে দেওয়ার রেওয়াজ সেখানেও আছে। ভাঙার উদ্দেশ্য



ওরামাঙ্গারা গাছের উপরে মৃতদেহের সমাধি দিচ্ছে।



উই-এর ঢিপিতে মৃত ওরামাঙ্গের হাড়ের সমাধি।

ও কবরের ভিতরে রাখার উদ্দেশ্য সেই একই—মৃত আত্মার কাজে লাগার উপযোগী ক'রে তোলা।

প্রাচীন চীনে মৃতদেহের সম্মান কর্‌বার একটি অদ্ভুত প্রথা ছিল। বাপ-মার মৃত্যুর পর ছেলে অজস্র অর্থ পুড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাত। প্রথাটা এখনও লোপ পায় নি। তবে এখন আর সত্যিকারের অর্থ পোড়ানো হয় না, কতকগুলো মেকি নোট পুড়িয়ে এই নিয়ম পালন করা হ'য়ে থাকে। বাপ-মা পরলোকে যাতে কষ্ট না পান, সেজন্য তাদের সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়াই হয়তো এর মূলের উদ্দেশ্য। সুতরাং

পরলোকের সুখও টাকা দিয়ে কিন্‌তে পারা যায়—এ রকমের একটা ধারণাও হয়তো ছিল প্রাচীন চীনাদের মনে।

অষ্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অসভ্য জাতির ভিতরে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা আরো অদ্ভুত। স্বাভাবিক মৃত্যুকেই তারা মনে করে যাদুর কারসাজি। সুতরাং যখন ওরামাঙ্গাদের (warramunga) কোনো লোক এই ভাবে মারা যায় তখন প্রথমতঃ গাছের মাথায় সমাধিস্থান তৈরী ক'রে সেইখানে তারা তাকে সমাহিত করে। গাছে উঠে তার আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে আসে মৃতদেহটার। কোনো পাখী বা জন্তু তাকে আহার ক'রে যায় কি-না তার দিকেও লক্ষ্য রাখে। যে পাখী বা জানোয়ারকে তারা দেখে

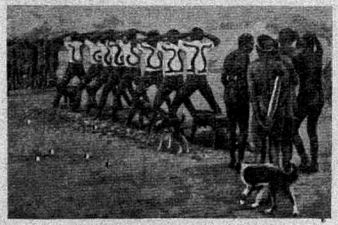

ওরামাঙ্গারা হাড় নিয়ে শোভা-যাত্রা কর্‌ছে।

শব-দেহটাকে আহার কর্‌তে সেই জানোয়ার বা পাখীকেই তারা মনে করে তার ছদ্মবেশী হত্যাকারী। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যখন শবদেহের ভিতর হ'তে মাংস ও চাম্‌ড়া নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, হাড়গুলোই শুধু অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই হাড়গুলোকে নামিয়ে এনে উই-এর ঢিপির ভিতরে তারা দ্বিতীয়বার তার সমাধি দেয়। কেবল একখানা হাড় তারা নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এই হাড় নিয়ে করে তারা আত্মার মানবদেহে প্রত্যাবর্ত্তনের উৎসব। তারা বিশ্বাস করে—এই ধরণের উৎসবের ফলে মৃত আত্মা আবার ফিরে আসে—কেবল পুরুষ যারা তারা হ'য়ে আসে নারী, আর নারী যারা তারা হ'য়ে আসে পুরুষ।

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি—তারা সভ্যই হোক্ আর অসভ্যই হোক্—মৃতদেহের সম্পর্কে সাধারণতঃ দুটি প্রথা অবলম্বন ক'রে থাকে—হয় তাকে পুড়িয়ে ফেলে, না হয় কবর দেয়। যারা মৃতদেহকে কবর দেয় তাদের দেহের প্রতি একটা গভীর মায়া আছে—তাই আগুনে পুড়িয়ে তারা তাকে ধ্বংস কর্‌তে পারে না। যারা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, অনেকে বলেন—তাদের সে প্রথার মূলে আছে ভূতের ভয়। মৃত আত্মা পাছে কোনো অনিষ্ট ক'রে—এই ভয়ে দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলে তারা নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। মতটি যে আংশিক সত্য তাতে হয়তো ভুল নেই। কিন্তু এ মত যে সর্ব্বত্র সত্য নয় তাতেও সন্দেহ নেই। হিন্দুদের শবদেহ পুড়িয়ে ফেলার ভিতরে ভূতের ভয় ততটা নেই যতখানি রয়েছে আত্মাহীন দেহের প্রতি তার মোহশূন্যতার ভাব। আত্মাই যদি চ'লে গিয়ে থাকে তবে সে দেহটার কোনো দামই নেই, তাকে যত্ন ক'রে রেখে দেবার কোনো সার্থকতাই নেই—এই ধারণা থেকেই হিন্দুরা শবদেহ পুড়িয়ে ফেলে। তা ছাড়া মৃত আত্মার কল্যাণের জন্যও তারা দাহ করে তাদের মৃতদেহকে। আত্মা দীর্ঘদিন যে দেহটার ভিতরে থাকে, হিন্দুরা মনে করে তার উপরেও আত্মার একটা টান থেকে যায়। তাই মৃতদেহটার চারপাশে আত্মা ঘুরতে থাকে মৃত্যুর পরেও। আত্মাকে এই মিথ্যা মোহের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও হিন্দুরা তাড়াতাড়ি মৃতদেহটা পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে ফেলে।

অপঘাতে যাদের মৃত্যু হয় তাদের মৃতদেহের সম্পর্কে প্রায় সব দেশেই নানারকমের কুসংস্কার আছে। আত্মহত্যা ক'রে যারা মরেছে, যারা খুন হয়েছে, অথবা যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের দেহটা যে-কোনো রকমে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলার রীতি অধিকাংশ দেশে প্রচলিত থাক্‌তে দেখা যায়। কিছুকাল আগেও আত্মহত্যাকারীকে ইউরোপে তেমাথা

বা চৌমাথার ধারে কবর দেওয়া হতো। আত্মহত্যাকারীর আত্মা ক্রূর ও মানুষের পক্ষে অহিতকারী এই ধারণা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল এই প্রথাটার। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আত্মা পথ হারিয়ে ফেল্‌বে—যাদের সে হানি



হিন্দু-শবদেহের সৎকার।

কর্‌তে চায় তাদের বাড়ীর সন্ধান পাবে না—এর মূলে ছিল এমনি ধরণের একটা বিশ্বাস।

ব্রহ্মদেশে একটা কথা আছে—মানুষ মরে এবং ফুঙ্গিরা নির্ব্বাণ-লোক প্রাপ্ত হয়। তাই ফুঙ্গিদের শেষযাত্রা জয়যুক্ত কর্‌বার জন্য হাজার হাজার টাকা তারা ব্যয় করে। গন্ধ-দ্রব্যে তার দেহকে সিক্ত ক'রে রখে তুলে' দেওয়া হয়। রথের এই ব্যবহার তার জয়-যাত্রারই প্রতীক। তারপর সেই রথ এসে থামে মৃতদেহ রক্ষার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত একটা মন্দিরের কাছে। সৎকারের জন্য একটা দিন স্থির করা হয় এবং সেই দিনটি না-আসা পর্য্যন্ত এই মন্দিরের ভিতরেই থাকে ফুঙ্গির শবদেহ। প্রকাণ্ড তোরণ গড়া হয়। তারপর সৎকারের দিন উপস্থিত হ'লে মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির, তোরণ সমস্তই পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করা হয়।

শ্যামদেশের সমাধি-ব্যবস্থাটাও একটু বিচিত্র ধরণের; বিশেষত সেখানকার বড় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের। এই বিচিত্র পদ্ধতিটার পরিচয় পাওয়া যাবে কয়েক বছর পূর্ব্বে রাজা ষষ্ঠ রামের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যে সব রীতি-নিয়ম প্রতিপালিত হয়েছিল তার দিকে তাকালেই। একটি তাম্রাধারে কাঠের কফিনের ভিতরে সৎকারের পূর্ব্বে চারমাস এই মৃতদেহটি পুরে রাখা হয়েছিল। একটি লম্বা রেশমের তারের এক প্রান্ত রাজার মাথার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়, আর এক প্রান্ত থাকে সমাধি-মঞ্চের পাদদেশে একটি সুবর্ণ আধারের ভিতরে। পারলৌকিক-ক্রিয়ার সময় এই আধারে অবস্থিত তারের প্রান্তটি পুরোহিত গ্রহণ করেন নিজের হাতের ভিতরে।

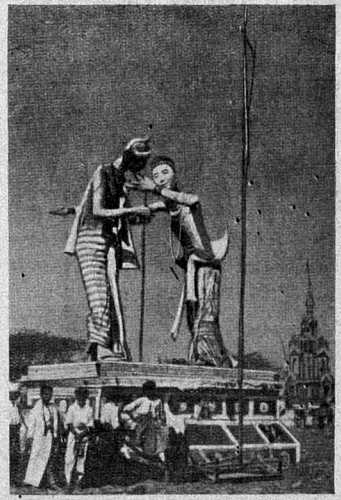

নির্ব্বাণ পথ-যাত্রী ফুঙ্গির রথ ও সমাধি-ব্যবস্থা।

শ্যাম-বাসীদের বিশ্বাস এইভাবে পুরোহিতের সঙ্গে তারের দ্বারা সংযুক্ত থাকায় উপাসনার প্রভাব সঞ্চারিত হয় মৃতদেহের ভিতরে।

দুনিয়ায় দূর-দূরন্তরের বহু জাতির সম্মিলন হ'য়েছে মানুষের জয়-যাত্রার স্পৃহার ভিতর দিয়ে। একদেশের লোক এসে জয় করেছে অন্যদেশের লোককে, তারপর সেখানে তারা আড্ডা গেড়ে বসেছে। এমনিভাবে মিশ্রণের ভিতর দিয়ে অনেক দেশে উদ্ভব হ'য়েছে একাধিক সমাধি-পদ্ধতির। ভারতবর্ষে তাই মৃতদেহকে কবরও দেওয়া হয়, দাহও করা হয়। এই ভাবেই মেক্সিকোর আজটেক (Aztec) সাম্রাজ্যেও দু'রকমের সমাধি-পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছিল। আজটেকরা ছিল সামরিক জাতি, সুতরাং মৃগয়ার দেবতা ছিলেন, তাদের দেবতা এবং তারা যাদের জয় করেছিল তারা ছিল কৃষি-প্রধান জাতি। তাদের দেবতা ছিলেন জলের যিনি অধিপতি অর্থাৎ বরুণ। বিজেতারা পোড়াত তাদের মৃতদেহ এবং বিজিত যারা তারা দিত কবর তাদের মৃতদেহের। এমনি ভাবে সেখানে গ'ড়ে উঠ্‌ল দু'টো স্বর্গও — একটা তাদের জন্য যারা শবদেহ পোড়ায়। এই স্বর্গের নাম হ'লো সূর্য্যলোক। আর একটা স্বর্গ গ'ড়ে উঠ্‌ল তাদের জন্য, যারা ডুবে মারা যেত অথবা পেটের মতো কোনো ব্যাধিতে ভুগে মারা যেত। এদের স্বর্গ হ'লো বৃষ্টি-দেবতার এলাকাভুক্ত। প্রাচীন রীতি অনুসারেই তারা কবরে সমাহিত করত তাদের মৃতদেহ।

মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান-সম্বন্ধে নানা দেশে নানা রকমের কল্পনা জট পাকিয়ে চলেছে মানুষের মনে। আর এই কল্পনার গতিকে মুক্তি দেবার জন্যই বিভিন্ন দেশে গ'ড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সৎকারের পদ্ধতি। কোনো কোনো স্থানে এ-সব পদ্ধতি এত বিচিত্র যে, তা মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কেবল তাই নয়, মৃতের প্রতি যে মায়ার পরিচয় এইসব পদ্ধতির ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় — তা জগতকে দুর্লভ শিল্প-সম্পদেও সমৃদ্ধ করেছে। প্রিয়জনের কবর বা ভস্ম-স্তূপের উপরে চিরযুগের বিস্ময়ের বস্তু বহু সমাধি-স্তম্ভ গ'ড়ে উঠেছে। এইসব সমাধি-স্তম্ভের ভিতর দিয়েও এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, যে-অনশ্বর আত্মা স্বর্গে চ'লে যায় তার চেয়ে কম প্রিয় নয় মানুষের কাছে তার নশ্বর মৃতদেহটা। স্থূল মাটির মানুষ, স্থূল দেহটার মায়া কোনো যুগেই যে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি এবং কোনো যুগেই যে পারবে না, বিভিন্ন দেশের সমাধি-প্রথা ও সমাধি-স্তম্ভগুলি তারই মূর্ত্ত প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কার্ত্তিকের 'উদয়ন' ৺ পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।
কার্ত্তিকের সংখ্যা গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় এবং চিত্রে
বিচিত্র ও মনোরম হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতারা ত্বরান্বিত হউন

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৯

তারপর পুজোর ছুটিতে যখন সে ক'লকাতা গেল, তখন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে' গেল।

'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে ব'সে সে প'ড়ছিল আর নোট ক'র্‌ছিল।

যখন শেষ ক'রে সে মুখ তুলে চাইলে তখন সে দেখতে পেল যে, তার সামনে ব'সে একটি মহিলা ঠিক তারই মত কতকগুলি বই নিয়ে প'ড়ছেন — ইকনমিক্সেরই সে সব বই।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে সে চাইলে। বোধ হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে তাঁর—মাথার সামনের চুলগুলো পেকে গেছে। খুব শীর্ণ মুখ। মহিলাটি চোখ তুলে একবার চাইলেন—তাঁর চোখ দেখে মনে হ'ল চেনা-চেনা।

ট্রামে উঠতে গিয়ে রবীন দেখে, মহিলাটি এবং তার সঙ্গী একটি পুরুষ সেই ট্রামেই উঠলেন।

এতক্ষণে একটা কথা খেয়াল হ'ল তার—সেই মহিলা যেখানে নেমে গেলেন রবীন সেখানে তাঁর পিছন পিছন নামলে। তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ব'ললে, "একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারি ম'শায়?"

লোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ফিরে চাইলে, ভাবলে, রবীন মাষ্টার এখনি ব'লবে যে, সম্প্রতি তার চাকরি গেছে, কিম্বা দেশে ফিরে যাবার পয়সা নেই, কিম্বা তিন দিন অনাহারে আছে, যেমন ক'লকাতায় প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় এমনি চেহারার লোকেদের কাছে।

রবীন যখন সে কথা না জিজ্ঞেস ক'রে, জিজ্ঞেস ক'রলে, "আপনার সঙ্গের মহিলাটির নাম জানতে পারি কি?" তখন যদিও ভদ্রলোকটির একটা উদ্বেগ কাটলো তবু এ প্রশ্নের স্পর্দ্ধায় সে অবাক হ'য়ে উগ্রস্বরে ব'ললে, "তাতে তোমার কি দরকার?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে রবীন মাষ্টার নিতান্ত কাঁচুমাচু হ'য়ে ব'ললে, "ঠিক, বড্ড অপরাধ হ'য়ে গেছে, মাপ ক'রবেন—আমি ভেবেছিলাম, আমি একটি মেয়েকে চিনতাম উনি বুঝি—"

মহিলাটি এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে শুনছিল, এখন সে হঠাৎ ব'লে উঠলো, "আপনি কি রবিবাবু?"

রবীন মাষ্টার হেসে ব'ললে, "হ্যাঁ, তা হ'লে আপনিই তড়িৎ!"

মহিলাটি এগিয়ে এসে রবীন মাষ্টারের হাত ধ'রে উৎফুল্ল নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, "কি সৌভাগ্য! আপনি এখানে কোথায় আছেন? কতদিন আছেন?"

রবীন উত্তরে হড়বড় ক'রে অনেক কথা ব'ললে, তার রক্তে তখন নাচন লেগেছে।

তড়িতের স্বামী তখন ব'ললে, "আমার বেয়াদবীর জন্যে আমায় মাপ ক'রবেন। আমি চিনতে পারি নি।"

রবীন হো-হো ক'রে হেসে ব'ললে, "এ আর বেয়াদবী কি? কথা নেই, বার্ত্তা নেই রাস্তার একটা লোক আপনার স্ত্রীর নাম জানতে চাইলে, আপনি তাকে একটা চড় মেরে ব'সলেও কেউ দোষ দিতে পারতো না আপনাকে। আর আপনি চিনবেনই বা কি ক'রে? আমার সঙ্গে তো দেখা হয় নি আপনার কোনো দিন!"

হেসে সুকেশ ব'ললে, "দেখা হয় নি বটে, কিন্তু

আমি আপনাকে বড্ড বেশী চিনি। ওঁর কাছে মুখে মুখে আপনার কথা এত বেশী শুনেছি যে, চোখে দেখে আপনার ভিতর নূতন কিছু পাব ব'লে আশা ক'রছি নে—শুধু চেহারা ছাড়া।"

তারা রবীন মাষ্টারকে টেনে নিয়ে গেল তাদের বাসায়। খাইয়ে দাইয়ে গল্পগুজোব ক'রে রাত বারোটায় যখন তড়িৎ নেমে এসে তাকে সদর দরজা থেকে বিদায় দিলে, সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হ'ল তখন তাদের। শেষে তড়িৎ ব'ললে, "কাল সকালেই আসবেন, কিন্তু বাক্স-বিছানা নিয়ে। মাত্র তো আর পোনেরোটা দিন থাকবেন—এর ভিতর এক দণ্ডও আপনাকে ছাড়ছি নে।"

আনন্দে রবীন মাষ্টারের মাথাটা যেন ঘুরপাক খেতে লাগলো। যে পথ দিয়ে সে চ'লতে লাগলো সেটা ক'লকাতার, না দিল্লীর, না লণ্ডনের, জিজ্ঞেস ক'রলে তা সে ব'লতে পারতো না। কেন না তার মনটা চ'লছিল যে পথে তার চারদিকে সুধুই ছিল তড়িৎ—আর কিছুই ছিল না।

সুধু পথ বা বাড়ী ঘর নয়, অনেক কিছুই তার মনের ভিতর থেকে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তার বয়স যে বাহান্ন, আর তড়িতের ছেচল্লিশ, তার যে একটি স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা আছে এবং তড়িতের একটি স্বামী এবং পুত্র-কন্যা আছে—সে সব পুঁছে গেল মন থেকে। তার মনে নাচতে লাগলো সুধু এই কথা যে, সে আর তড়িৎ আবার মিলেছে—তড়িৎ তাকে মহা সমাদর ক'রেছে। সেই ধ্যানে একেবারে মশগুল হ'য়ে সে হাওয়ার উপর চ'লতে লাগলো।

তড়িৎ তাকে বলেছিল যে, সে এবং তার স্বামী দু'জনেই দিল্লীতে চাকরি করে। সুকেশ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে কাজ করে। তড়িৎ সেখানকার মেয়েদের কলেজের অধ্যাপক। তারা কয়েকমাসের ছুটি নিয়ে ক'লকাতায় এসেছে। বড় ছেলে সঙ্গে আছে আর সব ছেলে-পিলেরা দেশে গেছে তড়িতের বাপ-মার সঙ্গে।

তড়িৎ পড়ায় ইকনমিক্স। শুনে রবীন মাষ্টার ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—সে ব'ললে, "আশ্চর্য্য তো, আপনিও ইকনমিক্স চর্চ্চা করেন আমারই মত!"

তড়িৎ সে কথার উত্তরে যা ব'লেছিল তা অনেক দিন পর্য্যন্ত রবীন মাষ্টারের মনে কিন্নরের সঙ্গীতের মত মধুরস্বরে ঝঙ্কারিত হ'য়েছিল। তড়িৎ হেসে ব'লেছিল, "আমার মনের গতি যে আপনার মতই হবে সে আর এত আশ্চর্য্য কি? আমার মনের সুর যে আপনিই বেঁধে দিয়েছিলেন। তার পর যেই সে যন্ত্র বাজাক্ তাতে ফুটবে আপনারই সুর!"

ওঃ! এত আদর কি সহ্য করা যায়?

পরের দিন রবীন তল্পী-তল্পা নিয়ে তড়িতের অতিথি হ'ল। সেদিন কথায় কথায় যুদ্ধের পর থেকে জগতে যে অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে সে কথা উঠেছিল। আলোচনাটা আরম্ভ হ'ল সুকেশের একটা কথায়। রবীন তাতে কথায় কথায় এমন গোটা কয়েক কথা ব'ললে তাতে বোঝা গেল যে, এ সম্বন্ধে আধুনিক যত আলোচনা হ'য়েছে রবীন তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। তারপর সেই সব আলোচনা ক'রতে ক'রতে রবীন তার নিজের আইডিয়া অনেকখানি ব'লে ফেললে। Planned Economy-র একটা আভাস দিলে। আর সে তার গ্রামের ভিতর ছোট-খাট ক'রে নিয়ত ধন-সৃষ্টির যে একটা স্কীম ক'রেছিল তার পরিচয় দিয়ে গেল।

তার কথা শুনে সুকেশ বুঝলে রবীন পণ্ডিত এবং তার পাণ্ডিত্য সব ধার করা নয়, নিজে ভাববার এবং নূতন সৃষ্টি ক'রবার শক্তি তার আছে। আর তড়িৎ যেন আনন্দে, গর্ব্বে একেবারে ফেটে প'ড়তে লাগলো।

তড়িৎ ব'ললে, "বলি নি আমি তোমায় যে, ওঁর মত পরিষ্কার মাথা আমি কারও দেখি নি? আপনি ঠিক সেই আছেন—wonderful!"

মনোজ্ঞ লজ্জায় রবীন অধোবদন হ'য়ে গেল।

সুকেশ ব'ললে, "আপনি ক'রছেন এই স্কীম অনুসারে কাজ? কেমন কাজ হ'চ্ছে?"

মুখ অন্ধকার ক'রে রবীন ব'ললে, "কাজ কিছুই

ক'রতে পারি নি। বরং গ্রামের লোকে সবাই আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছিল।"

সুকেশ হো হো ক'রে হেসে উঠল, কিন্তু তড়িৎ করুণ সহৃদয়তার সহিত ব'ললে, "আহা! আপনার বড্ড দুঃখ হ'য়েছিল নিশ্চয়।"

ম্লান হাসি হেসে রবীন উত্তর ক'রলে, "ও সব আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।"

তড়িৎ একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে, "আপনি তবু কেন ঐ এঁদো গাঁয়ে প'ড়ে থাকেন মিছে?"

রবীন ব'ললে, "কোথায় যাব? ক'লকাতায় একটা চাকরির চেষ্টা ক'রেছিলাম। কিন্তু এখানে আমার মত বি-এ ফেলের অন্ন জোটা ভার।"

সুকেশ ব'ললে, "ঠিক আপনার মত বি-এ ফেল আছে কি কোথাও? আমার তো মনে হয় না।"

তড়িৎ ব'ললে, "তা ছাড়া কেমন ক'রে আসবেন আপনি? আপনার স্কুল আছে সেখানে! সে স্কুল যে আপনার প্রাণ! এখন কেমন চ'লছে সে স্কুল?"

আর একটা বড় ব্যথার জায়গায় ঘা প'ড়লো রবীনের। তড়িতের কাছে সে-কালে রবীন যে চিঠি লিখতো তার ভিতর স্কুলের কথা বোঝাই থাকতো। কেমন ক'রে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল, কত কষ্ট ক'রে তোড়-জোড় সংগ্রহ হ'ল, কবে কত ছেলে এলো; কি আদর্শ, কি স্বপ্ন তখন রবীনের মাথায় খেলতো স্কুল সম্বন্ধে, শিক্ষার নূতন নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে, রবীন কবে কি ক'রেছে—এ সব কথা তড়িৎ তন্ন তন্ন ক'রে জানতে পেরেছিল রবীনের চিঠি থেকে। তাই তড়িৎ জানতো যে, রবীনের এ স্কুল সাধারণ স্কুলের মত নয়। রবীন বড় বড় আদর্শ নিয়ে নূতন প্রণালীতে তার গাঁয়ে গ'ড়ে তুলবে এক নতুন Rugby, টমাস আর্ণল্ডের মত। সে সব আদর্শ যে কোথায় উড়ে গেছে, সে স্কুল যে আর এখন রবীনের স্কুল মোটেই নয়, সে শুধু তার থার্ড মাষ্টার—হিষ্টরী আর হাইজিন পড়ায়—সে সব কথা মুখ ফুটে ব'লতে রবীনের লজ্জা হ'ল।

সে ব'ললে, "বেশ চ'লছে।"

"এখন কত ছেলে আছে সেখানে?"

"তিন শোর উপর?"

"আচ্ছা—নীচু ক্লাসে এখন কোন্ প্রণালীতে পড়াচ্ছেন? Dalton plan-এ না আপনার ফ্রেবেলের সেই সাবেক প্রণালীতে?"

সুকেশ ব'ললে, "তোমরা ব'সে গল্প কর, আমি একবার শ্যামবাজার ঘুরে আসি।"—ব'লে সে চ'লে গেল।

সুকেশ চ'লে যাওয়ায় রবীনের সঙ্কোচটা একটু ক'মে গেল। সে তখন মলিন মুখে ব'ললে, "ফ্রেবেলও নয়, মণ্টেসরীও নয়, ডালটন তো নয়ই। আমাদের প্রণালীটি একটি অদ্ভুত খিঁচুড়ী—আমাদের ইনস্পেক্টার প্রভুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি!"

তড়িৎ অবাক্ হ'য়ে গেল। রবীনের আদর্শ থেকে এতটা পতনের কথা শুনে সে এতগুলো প্রশ্ন ক'রে গেল যে, শেষ পর্য্যন্ত রবীনের প্রকাশ ক'রতেই হ'ল যে, স্কুলের কার্য্য-প্রণালীর উপর তার কোনও হাত নেই, সে সুধু পড়িয়ে যায় যথাদিষ্ট।

কথাটা তড়িতের বুকে শেলের মত বাজলো। তার কাছে রবীন প্রাণ খুলে তার সব স্বপ্নের কথা, সব আশা-ভরসার কথা লিখেছিল। এই স্কুলটাকে কেন্দ্র ক'রে কত স্বপ্ন যে রবীনের মনে ছিল তা সে জানতো, আর জানতো যে, সেই সব স্বপ্নের সঙ্গে রবীনের সুখ-দুঃখ কত নিবিড়ভাবে জড়িত! তাই সে এ সংবাদ শুনে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কোনও কথা ব'লতে তার সাহস হ'ল না। সে অন্য কথা পাড়লো।

বেলা হ'ল দেখে তড়িৎ রবীনকে স্নান ক'রতে ব'লে, ব'ললে, "আপনার ব্যাগের চাবীটা আমায় দিন।"

রবীন ব'ললে, "চাবী তো নেই ব্যাগের।"

"তাই না কি!"—ব'লে তড়িৎ ব্যাগটা খুলতে গেল।

মহা আপত্তি ক'রে রবীন তাকে বাধা দিতে গেল।

তড়িৎ ব'ললে, "সক্কন ব'লছি, নইলে ভাল হবে না কিন্তু।"

ব্যাগ খুলে তড়িৎ দেখলে তাতে আছে কয়েকখানা পুরোনো বই—এগুলো রবীন কিনেছে, আর তার কয়েকটা নোটের খাতা, আর—একখানি ময়লা কাপড় ও একটা ফরসা জামা।

রবীনের দিকে চেয়ে সে ব'ললে, "এই না কি আপনার সব কাপড়-চোপড়!"

রবীন লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো।

রবীনের খলি খুলে তড়িৎ দু'টো টাকা বের ক'রে নিয়ে তক্ষণি বড় ছেলেকে ডেকে তার হাতে লুকিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে বাইরে পাঠালে। ছেলে বাইকে চ'ড়ে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরোর ভিতর সে একজোড়া ধোয়া মিলের ধুতি, একজোড়া তোয়ালে, একজোড়া গেঞ্জি আরও সব জিনিষ নিয়ে এলো। সেই কাপড় ও গেঞ্জি এবং ব্যাগের ভিতরকার সেই ফরসা জামাটা নিয়ে তড়িৎ রবীনকে বাথরুমের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এবং নিজে সেখানে সেই জামা কাপড় রেখে এলো।

এর পর তড়িৎ রবীনকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। নাপিত ডেকে সে তার চুল কাটালে; দাড়ি ছাঁটালে; চেয়েছিল একেবারে কামিয়ে ফেলতে, কিন্তু ভেবে দেখলে অতটা হয়তো সইবে না। স্নানের পর চিরুণী-বুরুশ এনে তাকে সে দেয় চুল আঁচড়াতে। রবীন অমনি যেমন তেমন ক'রে আঁচড়ে রাখে দেখে, একদিন সে নিজেই তার চুল-দাড়ি আঁচড়ে রীতিমত সুসভ্য চেহারা ক'রে দিলে। এতে রবীন এতই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিল যে, তার পর, পাছে আবার তড়িৎ এসে আঁচড়াতে বসে, তাই সে নিজেই ভাল ক'রে আঁচড়াতে লাগলো।

দরজির দোকানে তাগাদা অর্ডার দিয়ে তৈরী হ'ল রবীনের ছ'টা পাঞ্জাবী, আর এল একজোড়া ধুতি। তার দাম তড়িৎ বের ক'রে দিলে রবীনের মণিব্যাগ থেকেই কিন্তু তার সঙ্গে তড়িতের যে কতটাকা গেল তা রবীন জানলো না। তাতে সে ব্যাগের গর্ভ এত ক্ষীণ হ'য়ে উঠলো যে, রবীনের বুক কেঁপে উঠলো। চল্লিশটে টাকা সে বহু কষ্টে সঞ্চয় ক'রে এনেছিল। এসেছিল সে থার্ড ক্লাশে, থাকতো একটা হোটেলে যেখানে দিন ছ'আনায় চলে। বাকী টাকা সে রেখেছিল বই কিনবে ব'লে। এই সব অপব্যয়ের ফলে সে বুঝতে পারলে যে, বই কেনা আর হবে না।

তাতে বুক কাঁপলো বটে রবীনের, কিন্তু অপূর্ব্ব কৃতার্থতায় ভ'রে উঠলো তার চিত্ত। তড়িতের এই সেবা পেয়ে তার বার বারই মনে হ'ল নিস্তারিণীর কথা। নিস্তারিণী না হ'য়ে তড়িৎ যদি তার স্ত্রী হ'ত, তবে তার জীবন কি না হ'তে পারতো!

দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে তড়িৎ তাকে নিয়ে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে যেতো। রবীন সঙ্গে যায় দেখে, সুকেশ আর তড়িতের সঙ্গে যায় না। তার যেতে হ'ত শুধু তড়িৎ একলা বেরুতে পারে না ব'লে। লাইব্রেরীতে সারাদিন কাজ ক'রে তারা বাড়ী ফিরবার বেলায় ঘুরে-ফিরে আসতো। রবীন তড়িৎকে দীক্ষিত ক'রে ফেললে পুরোনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটার মন্ত্রে। সেখানে অনেক সময় এত ভাল ভাল বই এত সস্তায় পাওয়া যায় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল তড়িৎ। অনেকগুলো বই কিনে ফেললে সে, নতুন বইও কতক কিনলে।

বাড়ী ফিরে তড়িৎ নিজে রান্না করে। তার পর ব'সে গল্প-গুজোব করে। রাত্রে খাওয়ার পর অনেক রাত পর্য্যন্ত তাদের গল্প-সল্প হয়।

রবীনের অন্তর যেন আনন্দে লাফাতে লাগলো। জীবনে যে এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত আরাম, এত আনন্দ সম্ভব তা সে কোন দিনও জানতো না।

একটি একটি ক'রে তার এ-কয় বৎসরের জীবনের সবগুলি কথা রবীন প্রকাশ ক'রে ফেললে তড়িতের কাছে।

একদিন গভীর রাত্রে রবীনের দুঃখের জীবনের

কাহিনী শুনতে শুনতে তড়িতের চোখ ভ'রে গেল জলে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে ব'ললে, "এ সবের জন্যে দায়ী আপনি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রবীন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তড়িৎ তিরস্কার ক'রে ব'ললে, "আমি তো আপনার কাছে কোনো কথা লুকোই নি কোনো দিন, মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে কিছুই বাকী রাখি নি। শেষে বি-এ পাশ ক'রবার পর যে চিঠি লিখেছিলাম মনে আছে? সে চিঠির কি জবাব দিয়েছিলেন আপনি?"

কি জবাব সে দিয়েছিল সে-কথা রবীনের খুব মনে ছিল। এ-কয়দিন ব'সে ব'সে সে শুধু সেই কথাই ভাবছিল। যদি সে সেই জবাব না দিয়ে অন্য জবাব লিখতো! যদি লিখতো 'আমি তোমাকে বিয়ে ক'রতে চাই।' তবে, তার জীবন কি ধন্যই হ'য়ে যেতো!

আমতা আমতা ক'রে রবীন ব'ললে, "আর কি জবাব দেব?"

বেশ তীব্রতার সহিত তড়িৎ ব'ললে, "কি জবাব দেব? আপনি সত্যি বুঝতে পারেন নি যে, আমি কি জবাবের আশা ক'রেছিলাম, বোঝেন নি আমি ভাবছিলাম—কাকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে?"

রবীন ব'ললে, "হ্যাঁ, তা না, ঠিক বুঝি নি—কিন্তু ভেবেছিলাম তাই।"

"তবে? তবে, ঐ উত্তর দিলেন আপনি—আপনি কোন্ প্রাণে? জানেন, আপনার সেই চিঠি প'ড়ে আমি সাত দিন ধ'রে কেঁদেছিলাম!"

রবীন মাষ্টারের মনে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন ক'রে গেল।

সে শুধু ব'ললে, "আমার অদৃষ্ট!" তার পর ব'ললে, "সত্যি কথা ব'লবো? আপনার বি-এ পাশ ক'রবার আগে অনেকবার ভেবেছিলাম আপনার কথা..... বিয়ে ক'রবার সঙ্গতি তখন আমার ছিল না, কিন্তু ভেবেছিলাম যদি সঙ্গতি হয় তবে আপনাকে সে-কথা লিখবো। আপনি বি-এ পাশ ক'রবার পর ভাবলাম, এটা আমার পক্ষে ভয়ানক স্পর্দ্ধার কথা হয়!"

চোখের উপর রুমাল চেপে ধ'রে তড়িৎ উঠে শুতে গেল।

রবীন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো এই সব কথা। দুঃখ তার হ'ল খুবই, কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হ'ল যে, আজ এতদিন পরেও তড়িৎ তাকে ভালবাসে, আর সে কথা সে যত স্পষ্ট ক'রে পারে প্রকাশ ক'রেছে।

কোনও লাভ নেই তাতে। তাদের কারও জীবন এতে চেলে সাজা যাবে না। এখন তারা তাদের জীবনের দু'দিকে যত বন্ধন আছে সব ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়ে এ ভালবাসা সম্ভোগ ক'রতে পারবে না—সে সম্ভোগের কল্পনা মাত্রও রবীনের মনে এলো না, তবু একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি, একটা লোকাতীত আনন্দে তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল এ অনুভূতিতে। রবীন ভাবলে এই সত্যি ভালবাসা। অথচ সমাজের ইতিহাসে এই ভালবাসাটাকে একেবারে বাতিল ক'রে দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে—বিবাহ!

পরের দিন রবীনের ফিরবার কথা। দু'দিন বাদে ভাই ফোঁটা, ভাই ফোঁটার পরের দিন স্কুল খুলবে। তাই ভাই ফোঁটার আগের দিন যেতেই হয়ন যেতে তার মন স'রতে চাইলো না, কিন্তু যেতে যে হবেই!

তড়িৎ কিন্তু বাগড়া দিলে যে, ভাই ফোঁটার আগে তার কিছুতেই যাওয়া হবে না। সে ব'ললে, "একদিন ছুটি নিন।"

এ কথা ভাবতে রবীনের ভয় হ'ল। একটি দিন ছুটি চাইলেও যে হেড মাষ্টার তাকে কি নাকাল ক'রবেন তার ভয়ে সে অস্থির হ'য়ে উঠলো।

তারপর তড়িৎ ব'সলো টাইম-টেবল' নিয়ে হিসেব ক'রতে। হিসেবে দেখা গেল যে, ভাই ফোঁটার দিন

বিকেলের দিকে একটা ট্রেণে গিয়ে তিন জায়গায় চেঞ্জ ক'রে বাকী রাস্তাটা মোটরে গেলে রবীন গিয়ে বাড়ী পৌঁছুতে পারে, টায়টোয় স্কুলের টাইমের এক ঘণ্টা আগে।

এর পর আর আপত্তি চ'ললো না।

মহা আড়ম্বর ক'রে তড়িৎ রবীনকে ভাই ফোঁটা দিলে। আর ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে দিলে দু'জোড়া ধুতি, দু'টো পাঞ্জাবী, আর দু'খানা চাদর।

খাওয়া-দাওয়ার পর যখন রওনা হবে তখন রবীন ব'লল, "এইবার আমার ব্যাগটা—"

তড়িৎ ব'ললে, "সেটা পাবেন না। ওটা থাকবে আমার কাছে। রবীন দেখতে পেলো যে, তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠছে ঝক্‌ঝকে চামড়ার নূতন দু'টো স্যুটকেশ। একখানার ভিতর আছে তার কাপড়-চোপড় এবং একখানার ভিতর, তার স্ত্রী ও ছেলেপিলের জন্য কাপড়-চোপড়, আর এতদিন তড়িৎ তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে যত বই কিনেছিল—সে সব বই।

দেখে রবীনের চোখের জল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

তড়িৎ তাকে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে কেবলি চোখের জল মুছতে লাগলো।

খুব মৃদুস্বরে সে ব'ললে, "কোনও দিন ভাবি নি যে, আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে এত দুঃখ পাব। এত দুঃখে আছেন আপনি স্বপ্নেও ভাবি নি—ভাবতে বুক ফেটে যায় আমার।"

চোখ মুছতে মুছতে রবীন গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

নারী যার কেশে মেঘের থর

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সাত সমুদ্র তের নদী তেপান্তরের পর,
বসত করে সেই নারী যার কেশে মেঘের থর।
ডান পাশে তার সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি বাঁয়ে,
রূপ ঝ'রে তার আলো ছড়ায় অন্ধকারের গায়ে—
কান্না তারি জ'মে হ'লো মৌক্তিক সুন্দর!

দূর বিদেশের রাজার কুমার কোথায় তুমি থাকো?
তোমার চুমোর একটি রেখা তার ললাটে রাখো!
চোখে তাহার দাও বুলিয়ে নীল-কমলের লেখা,
বুকের মাঝে দাও দুলিয়ে ঘন ঢেউ-এর রেখা!
পক্ষীরাজ ঘোড়া তোমার শূন্যে মেলে ডানা,
সেই ঘোড়াতে চ'ড়ে তুমি তার কাছে দাও হানা।
জাগিয়ে তোলো মুগ্ধ প্রিয়ার মূর্চ্ছিত অন্তর!

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

৪

'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখক অনন্যপূর্ব্ব গভীরতা ও কৌশল দেখাইয়াছেন। 'নৌকাডুবি'র সরল-সহজ একটানা প্রবাহের সহিত তুলনায় এখানে পদে পদে সংঘাত ও গভীর ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃজন হইয়াছে। আকস্মিকতার স্থানে সুদৃঢ় অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সমস্ত পরিবর্ত্তনের স্রোত চরিত্রগত গভীর উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী ও আশা—এই চারিজনে মিলিয়া তাহাদের চারিদিকে যে প্রবল ঘূর্ণীবায়ুর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেকেরই চরিত্র-গত বিশেষত্ব একটী বিশেষ রকমের গতিবেগ আনিয়া দিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটী অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল এবং সেইজন্য সমস্ত অবস্থাটীর ব্যাপক পর্য্যালোচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর গূঢ় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলাই এই ঘূর্ণীবায়ুর কেন্দ্রস্থ শক্তি; কিন্তু ইহার মধ্যে বিহারী ও আশাও তাহাদের সবল ও দুর্ব্বল প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নূতন জটিলতার সঞ্চার করিয়াছে। বিহারীর সবল একনিষ্ঠ চিত্ত বিনোদিনীকে আকর্ষণ করিয়াছে; ও তাহার অবজ্ঞাসূচক কঠোর প্রত্যাখ্যান এই আকর্ষণকে অনিবার্য্য বেগ ও ব্যাকুলতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার বিহারীর মনের নিভৃততম কোণে আশার প্রতি যে গোপন অনুরাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল তাহাই বিনোদিনীর ঈর্ষ্যায়িতে নূতন ইন্ধন দিয়া তাহাকে আশা ও মহেন্দ্রের সর্ব্বনাশ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছে। আশার সরল বিশ্বাস ও স্বভাব-সিদ্ধ শিথিলতা মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে অবসর ও সুযোগ প্রদান করিয়া বিপদকে ঘনীভূত করিয়াছে; ও বিহারীর প্রতি তাহার বিবেচনাহীন প্রবল বিরাগ বিহারীকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিয়া মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমাভিনয়কে একেবারে বাধা-মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আশার প্রতি বিহারীর প্রেম মহেন্দ্রের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ও বিহারীর কল্যাণ-কামী মধ্যস্থতাকে প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা করিতে মহেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়াছে। এইরূপে এই চারি জনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি খুব সূক্ষ্ম ও জটিল শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়া একটী চমৎকার ঐক্য ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

এমন কি রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণাও এই গ্রন্থি-সঙ্কুলতার মধ্যে নূতন ফাঁস যোজনা করিতে সাহায্য করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থপরতা মহেন্দ্রের স্বার্থপরতার স্ত্রী-সংস্করণ মাত্র। মাতা-পুত্র উভয়েই এক ছাঁচে ঢালা—মাতার পুত্র-সর্ব্বস্বতাই পুত্রের নির্লজ্জ অসংযত ভোগ-লিপ্সার মূল উৎস। রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে বিনোদিনীর মন্তব্য তাহার চরিত্রের উপর একটী অপ্রত্যাশিত, শিহরণ-কারী আলোকপাত করে—বধূর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া মাতা বিনোদিনীর দ্বারা পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্দ্দম-অভিমান-প্রবণ রাজলক্ষ্মীই তাঁহার গৃহাঙ্গনে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সদা-জাগ্রত সূক্ষ্ম অনুভূতি যে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ক্রম-বর্দ্ধমান অনুচিত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে নাই—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বধূর প্রভাব স্বহস্তে খর্ব্ব করিয়া যখন তিনি সেই দুর্ব্বল শৃঙ্খলের দ্বারা পুত্রের দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তিকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন সেই চেষ্টার মধ্যে একটা করুণ দিক্ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মোটের উপর তাহা পাঠকের মনে সহানুভূতি অপেক্ষা তীব্র ব্যঙ্গভাবই উদ্রেক করে। অন্নপূর্ণার অবস্থা-সঙ্কটও এই জটিলতার

সূত্র পাকাইতে সহায়তা করিয়াছে। অন্নপূর্ণা আশার মাসী বলিয়াই রাজলক্ষ্মীর অভিমান-জ্বালা বেশীর ভাগ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইয়াছে—অপক্ষপাত বিচার করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। মহেন্দ্রের লঘু অপরাধে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিনি সংসার হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কাশীবাসের দ্বারাই মহেন্দ্রের গুরু অপরাধের দ্বার প্রশস্ততর করিয়া দিয়াছেন।

মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলাই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক্ হইতে উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। আশার প্রতি সর্ব্বগ্রাসী, আত্মবিস্মৃতিকর প্রেমে মহেন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বিনোদিনীর অস্তিত্বকেই আমল দেয় নাই—তাহার সহিত সহজ ভদ্রতার সম্ভাষণটুকু করিতেও বিরত ছিল। আশাকে মহেন্দ্রের বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণু প্রণয়ের নিকট কতকটা দুষ্প্রাপ্য করিয়াই প্রথম বিনোদিনী বিরক্তিকরভাবে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তারপর আশার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ও চতুরা বিনোদিনীর স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতায় মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রথম পরিচয়ের আরম্ভ হইল। ইহার পর বিনোদিনীর কঠোর আত্ম-শাসনের নিকট মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিল, সে প্রেম নহে, কতকটা আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই বিনোদিনীর সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিতে উদ্যোগী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিনোদিনী তরুণ দম্পতির প্রিয় সখী হইয়া উঠিল, তাহার হাস্তরস-পরিহাস, মনোরঞ্জন-শক্তি ও সেবা-কুশলতার দ্বারা উহাদের প্রণয়ের অবসাদ ঘুচাইয়া তাহাকে নবীন-সঞ্জীবন-রসে ভরপুর করিয়া তুলিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের মনে বিনোদিনীর প্রতি কোনরূপ অনুচিত আকর্ষণের সঞ্চার হয় নাই—সে এখনও তাহাকে আশার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী করিয়াই দেখিয়াছে। কিন্তু এই সময় বিহারীর তীক্ষ্ণ সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি একটু গোলযোগের সূত্রপাত করিল। সকলের, বিশেষতঃ মহেন্দ্রের মনে একটা অপ্রার্থিত কদর্য্য সম্ভাবনার কথা জাগাইয়া দিয়া তাহার আত্মপ্রসাদের স্বচ্ছ প্রবাহ কতকটা পঙ্কিল করিয়া তুলিল। বিনোদিনীর কয়েক ফোঁটা অশ্রু-জলের কৌশলময় অভিনয়ের দ্বারাই এই সন্দেহের প্রথম কলঙ্কস্পর্শ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

ইহার পর মহেন্দ্রের সচেষ্টতার পালা—তাহার ঔদাসীন্য বিনোদিনীর সচেষ্ট অনুসরণে রূপান্তরিত হইয়াছে। দমদমে চড়ুইভাতির আয়োজন এই নব-পরিবর্ত্তনের প্রতীক্। এই দিনটী মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও বিহারীর জীবনেতিহাসে একটী স্মরণীয় দিবস। এই দিনের ঘটনাবলীর ফলে বিহারীর মূল্য বিনোদিনীর চক্ষে শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—বাল্য-স্মৃতির দূরদিগন্তের মায়াময়, শীতল প্রলেপে তাহার ঈর্ষ্যা-কলুষিত খর-জ্বালাতপ্ত প্রণয়-বিকার কাটিয়া গিয়া প্রেমের স্বভাব-স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই নবজাগ্রত প্রেমের স্থির অনুদ্‌ভ্রান্ত আলোকে সে বিহারীকেই নিজ জীবনের পরম আশ্রয়-স্থল বলিয়া চিনিয়াছে।

এইবার মহেন্দ্র নিজ হৃদয়-তন্ত্রীতে সত্যকার টান অনুভব করিয়াছে, কিন্তু ইহাও ঠিক প্রণয় নহে, বিহারীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিহারীর নিকট পরাজয়ের ধিক্কারই তাহার সমস্ত শক্তিকে বিনোদিনীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—বিনোদিনীকে ভালবাসিয়া নহে, তাহার উপর নিজ দখলী-স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য। আশার প্রণয়-মোহ ছিন্ন হইয়া তাহার ত্রুটি-অপূর্ণতার দিকে মহেন্দ্র প্রথম সজাগ হইয়াছে ও বিরক্তি-মিশ্রিত ভর্ৎসনা মুগ্ধপ্রেমের একসুরা কপোত-কূজনের মধ্যে একটু তীব্র বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। শেষে মহেন্দ্র পলায়নে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করিয়াছে। এই ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদের মধ্যে আশার বেনামী বিনোদিনীর তিনখানি সুধা-হলাহল-মিশ্র প্রেমনিবেদন-লিপি মহেন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মধ্যে বিষদিগ্ধ বাণের মতই বিঁধিয়াছে। মহেন্দ্র এক অজ্ঞাত-শঙ্কা-উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া বিনোদিনীর সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়াছে। এইবার

মহেন্দ্র একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া বিনোদিনীর নিকট প্রথম প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু এ ভ্রান্তি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা মাত্র। প্রণয়-ভিক্ষার পর মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—তাহার ব্যাকুল-নিবেদনাত্মক কথা কয়টী প্রত্যাহার করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে ও বিহারীর নিকট তাহার আসন্ন পদস্খলনের সম্বন্ধে আবেগময় স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজ অনুতাপের গভীরতা প্রমাণ করিয়াছে। বিহারীও আশার কল্যাণের জন্য বিনোদিনীর নিকট উচ্ছ্বসিত অনুনয়ের দ্বারা তাহার সুপ্ত মহত্বের ক্ষণিক উদ্বোধন করিয়াছে। বিনোদিনীর অশ্রু-গাঢ় আলিঙ্গন ও মহেন্দ্রের অস্বাভাবিক বেগে উৎসারিত-সোহাগ-নির্ঝর যুগপৎ আশার উপর বর্ষিত হইয়া তাহাকে উভয়ের মধ্যে এক নিগূঢ় ঐক্য-রহস্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে এবং এই সম্মিলিত শক্তির স্নেহাতিশয্যের ছদ্মবেশধারী বিরুদ্ধতার ক্ষীণ আভাস তাহার হৃদয়-মনে এক অজ্ঞাত ভয়ের শিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছে।

তারপর মহেন্দ্রের দ্বিতীয় বার পলায়ন—এ পলায়ন ঠিক কাপুরুষের পৃষ্ঠপ্রদর্শন নহে, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য তীর্থযাত্রা। কাশীতে অন্নপূর্ণার অখণ্ড ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীরব কল্যাণ-কামনার উৎস হইতে প্রলোভন-জয়ের শক্তি আহরণের জন্যই এবার মহেন্দ্র গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছে। আশার প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রেম ও অবিচলিত বিশ্বস্ততার আশ্বাস লইয়াই সে ফিরিয়াছে। কিন্তু এইখানে সে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছে। যে ঔষধ তাহার নিজের বিকার-গ্রস্ত মনের নিকট এত উপকারের হেতু হইয়াছে, সুস্থ আশাকেও সেই ঔষধের আস্বাদ দিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে জাগিয়াছে। আশাকে কাশী পাঠাইবার প্রস্তাবে, তাহার ও বিহারীর মধ্যে ব্যবধানের এক নিষ্ঠুর, অতলস্পর্শ গহ্বর মুখ-ব্যাদান করিয়াছে। বিহারী আশাকে ভালবাসে ও সে বিনোদিনীকে ভালবাসে না—এই দুইটী সুস্পষ্ট উক্তি তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ককে আবার প্রবলভাবে আলোড়ন করিয়াছে—ইহার মধ্যে যতটুকু অন্তরাল ও অপরিচয়ের স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিল নগ্ন সত্যের প্রখর আলোকে সেটুকুকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া তাহাদের চারিজনকে অনাবৃত বিরোধের এক ছায়া-লেশহীন উষর মরুভূমির মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

আশার অনুপস্থিতির রন্ধ্রপথ দিয়াই মহেন্দ্রের জীবনে শনি প্রবেশ করিয়াছে। বিনোদিনীর অপরিমিত যত্ন ও আশ্চর্য্য সেবাকুশলতার ভিতর দিয়া তাহার অনুক্ষণ সাহচর্য্য মহেন্দ্রের কষ্ট-নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে অনিবার্য্য বেগে উদ্দীপিত করিয়াছে। তথাপি সে প্রাণপণ শক্তিতে আত্ম-সংবরণের চেষ্টা করিয়াছে, প্রলোভনের মুখের উপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহার মনের দ্বারে আত্মসংযমের অর্গল নাই, তাহার শয়ন-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর একবার শেষ চেষ্টার পর মহেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। বিনোদিনীও আত্ম-সমর্পণের শেষ সীমায় পা বাড়াইয়াই বিহারী-সম্বন্ধীয় কুৎসিত শ্লেষবিদ্ধ হইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার উন্মুখতাকে প্রত্যাহার ও সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে—ক্রোধের অগ্নি প্রেমের সজল বিদ্যুৎকে গ্রাস করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তটী মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কে একটী চরম পরিণতির মুহূর্ত্ত (crisis)। এখন হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ ও বিমুখতা বিনোদিনীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার জন্য প্রেমাভিনয়ের ছলনাও সে বর্জ্জন করিয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বিহারীর আবির্ভাব ও তৎকর্ত্তৃক বিনোদিনীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান তাহাকে মহেন্দ্রের প্রেম-নিবেদনে সম্মত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সম্মতির মধ্যে একফোঁটা প্রেম নাই, আছে শুধু যে সামাজিক ও নৈতিক শাসন বিহারীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে তিরস্কারের স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছিল, সেই স্পর্দ্ধিত তিরস্কারের প্রতি ক্রুদ্ধ উপেক্ষা ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ-ঘোষণা।

ইহার পর মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের মধ্যে অপ্রত্যাশিতত্বের স্পর্শ মিলাইয়া গিয়াছে। আরও দুই-এক অধ্যায় বিনোদিনী মহেন্দ্রের অসংবৃত, লজ্জা-

সঙ্কোচহীন প্রণয়-নিবেদন সহ্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার হৃদয় ইহাতে কোন সাড়াই দেয় নাই। মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের সময় সে রাজলক্ষ্মীকে শরীর-রক্ষীরূপে সঙ্গে লইয়াছে, মহেন্দ্রের উন্মত্ত আবেগকে নির্জ্জনতার কোন অবসর দান করে নাই। এখন হইতে সে মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপেই বিহারী-লাভের উপায় মাত্র রূপে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে ভারবাহী গর্দ্দভের দুরবস্থা অনুভব করাইয়াছে। লোক-নিন্দা, সমাজ-গঞ্জনা সে স্পর্দ্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত বরণ করিয়াছে, কিন্তু বেচারা মহেন্দ্র লোক-চক্ষে অপরাধী হইলেও তাহার প্রকৃত প্রণয়ভাজনের সংবাদ বহির্জগতের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বিহারী কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান তাহার প্রেমকে রক্ত-মাংসের স্থূল বাস্তবতা হইতে এক উদ্ভ্রান্ত-বিহ্বল, ধ্যানগম্য আদর্শলোকে লইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের কায়িক অনুবর্ত্তনের ছদ্মবেশে তাহার মন বিহারীর অভিমুখে প্রণয়-অভিসারের অতীন্দ্রিয় পথ ধরিয়া উধাও হইয়াছে। এই যাত্রা-পথের চরমতীর্থ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে এলাহাবাদের যমুনাতীরস্থ কুঞ্জবনে। এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে মহেন্দ্র ও বিহারীর সহিত বিনোদিনীর মুহুর্মুহু-পরিবর্ত্তনশীল, অনুরাগ-বিরাগ-পঙ্কিল, ঘাত-প্রতিঘাত-নিষ্ঠুর, প্রত্যাখ্যান-নিবেদনের বিপরীত স্রোতে ঘূর্ণাবর্ত্ত-সঙ্কুল সম্বন্ধের একটা শেষ মীমাংসা ও সমাধান সংঘটিত হইয়াছে। মহেন্দ্র তাহার সুদীর্ঘ মোহনিদ্রা অবসানে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ক্ষমা-স্নিগ্ধ মাতৃদৃষ্টির তলে আশার পার্শ্বে নিজ সঙ্কুচিত স্থান গ্রহণ করিয়াছে; বিনোদিনী নিজ উদ্দীপ্ত কামনার উপর বৈরাগ্যের ধূসর ছাই ছড়াইয়াছে ও রোমান্সের নায়িকার ন্যায় প্রেমের সহস্র-ঝাড় রঙীন বাতি নিবাইয়া সেবার ম্লান-স্তিমিত ঘৃত-প্রদীপ হস্তে, এক চির-গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন রোগ-কক্ষের অভিমুখে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া মহেন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রের সমস্ত পরিবর্ত্তনগুলি এক আতিশয্য ও অসংযমের ঐক্য-বন্ধনে গাঁথা। তাহার অপরিমিত মাতৃভক্তি ও পত্নীপ্রেম, বিনোদিনীর সহিত সম্পর্কে তাহার নির্লজ্জ আতিশয্যেরই পূর্ব্বসূচনা। তাহার পত্নীপ্রেম ও পর-নারী-আসক্তি—উভয়েরই মূলে আছে এক প্রবল আত্মাভিমান। ঈর্ষ্যা বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ প্রণয়েই তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। আশার ব্যাপারে বিহারীকে এত সহজে হঠাইতে পারিয়াছিল বলিয়াই বিনোদিনীর হৃদয়-আকর্ষণ চেষ্টায় তাহার অবলম্বিত উপায় এত ভ্রান্তি-সঙ্কুল ও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষাই তাহার প্রেমের সিংহাসন-লাভের সোপান হইত, কিন্তু মূঢ় মহেন্দ্র নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ ধরিতে পারে নাই। ঈর্ষ্যার দমকা বাতাস বারবার তাহার প্রণয়-দীপটীকে কাঁপাইয়া গিয়াছে, তথাপি সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই। বিনোদিনীর সহিত পরিচয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে মহেন্দ্র চাহিবা-মাত্র পাইয়াছে—একমাত্র বিনোদিনীর ব্যাপারেই তাহাকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইয়াছে এবং এই পরীক্ষায় সে সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য্য হইয়াছে। সে যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত চিত্ত-জয়ের চেষ্টা না করিয়াছে তাহা নহে এবং বিনোদিনী যে অনিবার্য্য বেগের সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়—কিন্তু বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনামাত্রই তাহার সমস্ত আত্মদমন-চেষ্টাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। 'আত্মাভিমান-মূঢ়তা' কথাটী মহেন্দ্রের সমস্ত চরিত্র ও ব্যবহারের উপর বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিনোদিনীর চরিত্রে স্থূল বাস্তবতা ও উচ্চ আদর্শবাদ—এই দুইটী বিপরীত ধারার সংযোগ হইয়াছে। অবশ্য এই সংযোগ আর্টের অনুমোদিত সমন্বয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। পিশাচী হইতে দেবীতে অতর্কিত পরিবর্ত্তন রোমান্টিক উপন্যাসে অতি সাধারণ ব্যাপার। এখানে বিনোদিনীর

পরিবর্ত্তন খুব অতর্কিত হয় নাই, মহেন্দ্রের প্রতি বিরাগ ও বিহারীর প্রতি উন্মুখতা তাহার চরিত্রে ধীরে ধীরে, অথচ নিতান্ত অনিবার্য্যভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছে। একটা প্রচণ্ড-জ্বালাময় ঈর্ষ্যা তাহাকে মহেন্দ্রের সহিত প্রেমাভিনয় করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহার সেবাকুশলতা মহেন্দ্রের ঔদাসীন্যকে পরাজয় করিবার অস্ত্রমাত্র; মহেন্দ্রের প্রতি তাহার হিতেচ্ছা-প্রণোদিত কঠোর শাসন প্রেমের বাজার-দর উঁচু রাখিবার কৌশলময় প্রয়াস। তথাপি যদি সে মহেন্দ্রের চরিত্রে তাহার একান্ত-প্রার্থিত অটল নির্ভর ও বিশ্বস্ততা পাইত, তাহা হইলে তাহার চিত্ত-দুর্গে জয়-পতাকা উড়াইয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিত, বিজয়িনীর গর্ব্ব প্রণয়িণীর অন্তরের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে হঠাইয়া দিত। কিন্তু মহেন্দ্রের অন্তঃকরণে দৃঢ় ভিত্তির পরিবর্ত্তে চোরাবালির আবিষ্কার করিয়া, তাহার একান্ত কৃতঘ্নতা ও অস্থিরমতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার মন মহেন্দ্রের উপর ক্ষণস্থায়ী বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিহারীর শত-ঝঞ্ঝাবাতে অক্ষুব্ধ চিরস্থির হৃদয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে। বিহারীকে আহরণ-যোগ্য মণি বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে মহেন্দ্রকে খেলার পুতুলের মত ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য তাহার এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের কাহিনী বাস্তব বিশ্লেষণ অপেক্ষা কবি-কল্পনামূলক সহানুভূতি দ্বারাই পাঠকের মনে প্রবেশ করান হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ দিক দিয়া বিনোদিনী কল্পলোকের অধিবাসিনী—সে বাস্তব-বিশ্লেষণের পরিধি ছাড়াইয়া উদার অসীম ভাব-রাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় আরোহণ করিয়াছে। তাহার জীবনের শেষ সঙ্কল্পও রোমান্সের রঙীন বাতাসে অঙ্কুরিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রেমের সহিত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রেমের তুলনা করিলেই রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ও বিশ্লেষণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুভূত হইবে। কুন্দের প্রেম অতি সলজ্জ ও সঙ্কোচ-জড়িত-আবির্ভাব-অনভিজ্ঞ হৃদয়ের মুগ্ধ, আত্ম-বিস্মৃত সরলতাই ইহার প্রধান উপাদান। ইহার বর্ণনাও গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ, ইহার দৈনন্দিন ইতিহাস ও পরিণতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ নহে। বিনোদিনীর প্রেম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির—ইহা অতি সুচতুর কৌশল-জালময় মায়া-বিস্তার। কুন্দ অনেকটা অজ্ঞাতসারে অগাধজলে ঝাঁপ দিয়াছে—বিনোদিনীর প্রত্যেক পদক্ষেপ সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। কুন্দের অন্ধ, মূঢ় আবেগের সহিত বিনোদিনীর সূক্ষ্ম পরিমাণ-বোধ ও ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতেরও ফলাফল সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার, আবেশজড়িমারহিত অনুভূতি তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাল-বিধবার প্রথম প্রণয়-সঞ্চার কবিত্বময় আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া নব-বধূর লজ্জারক্তিম আভায় চিত্রিত করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ পূর্ণবয়স্কা যুবতীর ঈর্ষ্যাদিগ্ধ লোলুপতার, তাহার যত্ন-রচিত মায়া-নাগপাশের প্রত্যেকটী গ্রন্থির, প্রত্যেকটী ফাঁসের, সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। 'চোখের বালি'র পর হইতে বিধবা প্রেমের এক নূতন অভিনয়ে ব্রতী হইয়াছে। বিনোদিনী হীরা ও রোহিণীর মনোরাজ্য-বহির্ভূত এক উচ্চতর, বিচিত্রতর মঞ্চ অধিকার করিয়াছে; সে অভয়া, কিরণময়ী ও কমলের পূর্ব্ব-বর্ত্তিনী ও পথ-প্রদর্শিকা।

বিহারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াছে অত্যন্ত বিলম্বে। গ্রন্থের প্রথম হইতে সে কেবল মহেন্দ্রের অনুচর ও উপগ্রহরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার বন্ধুপ্রীতি এত প্রবল যে, তাহার খাতিরে সে তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ পর্য্যন্ত বন্ধুকে তুলিয়া দিয়াছে। তাহার চরিত্র ও ব্যবহারের সর্ব্বত্রই প্রায় বিয়োগ-চিহ্নাঙ্কিত (negative)। মহেন্দ্রের ত্রুটি-অপূর্ণতা, ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিহারীর চরিত্রে তদ্বিপরীত গুণগুলি আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ রাহু-গ্রস্ত জীবন প্রায়ই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে অনুকূল হয় না। কেবল-মাত্র এক বিনোদিনীই বিহারীকে মহেন্দ্র হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিয়াছে, তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আকর্ষণের দ্বারা বাহিরে আনিয়াছে। বিনোদিনী-সম্পর্কেও

বিহারী নিজ হৃদয়-ভাবকে আমল দেয় নাই, মহেন্দ্রের হিতৈষী বন্ধু হিসাবেই তাহার কার্য্যাবলীর বিচার করিয়াছে। কেবলমাত্র তাহার নির্জ্জন কক্ষ-মধ্যে বিনোদিনীর নিশীথ-অভিসারই তাহার প্রসুপ্ত যৌবনকে জাগরিত করিয়াছে, সে মহেন্দ্রের আনুচর্য্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন জীবন-যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমের সুরা-পাত্র সে ওষ্ঠে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু তাহার তীব্র গন্ধ তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্তকে উতলা ও মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। এই অতর্কিত যৌবনোন্মেষই তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ — বিনোদিনীকে বিবাহ-প্রস্তাব তাহার স্বাধীন সত্তার একমাত্র কার্য্য। তাহার চির-প্রবীণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সদ্যো-জাগ্রত তারুণ্যের মধ্যে যে বিরোধ তাহার সমাধান নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। বিহারীর অর্দ্ধোন্মেষিত ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়-সমস্তার সুলভ ও আকস্মিক সমাধান তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত কতকটা অস্পষ্ট ও ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে।

আশার সম্বন্ধেও অনেকটা এই মন্তব্যই প্রযোজ্য। মহেন্দ্রের দুর্জ্জয় বন্যা-প্লাবনের ন্যায় অসঙ্গত হৃদয়বেগ ও বিনোদিনীর চক্ষুর্ঝলাকারী তীব্র রূপ-শিখার সম্মুখীন হইয়া সে অনেকটা ম্লান ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র-বিহারীর সম্পর্ক আমাদের একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের সঙ্কীর্ণ পারিবারিক জগতে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় অপেক্ষা বন্ধুত্বই সাধারণতঃ অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের রুদ্ধদ্বার-সবাক্ষ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এক বন্ধুত্বের ছিদ্রপথ দিয়া বাহ্য বিপ্লব বাঙ্গালী পরিবারে প্রবেশলাভ করিতে পারে। এক বন্ধুত্ব বা সহপাঠিত্বের দাবীতেই আমরা পরের অন্তঃপুরের অন্তর্গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া ভিন্ন পরিবারের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারি। এখানে স্ত্রী-পুরুষের অসঙ্কোচ মেলা-মেশার সুযোগ যতই সঙ্কীর্ণ, বন্ধুত্বের প্রসার ও সম্ভাবনা ততই সুপ্রচুর। সেইজন্য বাঙ্গালা উপন্যাসে বন্ধুত্বের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিলতা, বন্ধুত্বের স্নেহ-শীতল অথচ প্রতিযোগিতা-তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই উদ্ভূত। 'গোরা'তে গোরা ও বিনয়, 'ঘরে-বাইরে' নিখিলেশ ও সন্দীপ, 'গৃহদাহে' মহিম ও সুরেশ, 'দিদি'তে অমর ও দেরেন — এই উদাহরণ কয়েকটীই বাঙ্গালা উপন্যাসে বন্ধুত্বের উচ্চ দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

'চোখের বালি'কে উপন্যাস-সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণই ইহাতে প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে যে প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমাজ-নীতির দিক হইতে বিগর্হিত—কিন্তু এই প্রেমের বিচারে কোন নীতিকথার আড়ম্বর নাই, আছে কেবল ইহার ক্রমপরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। এই প্রেম বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে কোন নৈতিক অনুশাসনে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত শোভনতা-বোধ ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা। আবার বিহারী-বিনোদিনীর প্রেমে প্রেমের সনাতন সৌন্দর্য্য ও মহিমা সগৌরবে বিঘোষিত হইয়াছে। লেখক প্রেমের প্রতি পুরাতন মনোভাব একেবারে বর্জ্জন না করিয়া নূতন মনোভাবের স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। 'চোখের বালি' এই নূতন-পুরাতনের সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া এক হাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অপর হাতে শরৎচন্দ্রের যুগকে এক নিবিড় ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বনলতিকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সেই তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত বনলতা সত্যসত্যই একটা কথাও কহে নাই। বস্তুতঃপক্ষে আহারাদির পর সেই যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল, মাত্র ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে উঠিয়াছে। তারপরে মেয়েদের বাহিরে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে প্রসাধন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। ঘণ্টাখানেকের অধিকাংশ তো তাহাতেই কাটিয়াছে। গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে সংবাদ পাইয়া এইমাত্র নীচে নামিয়া আসিল। সকালবেলা তাহার সঙ্গে একটাও ভালো কথা কহি নাই। কেবল আঘাতই করিয়াছি। সে কথা ভাবিয়া সমস্ত দ্বিপ্রহরের মধ্যে একবারও চোখের পাতা বুজিতে পারি নাই। আপনাকে আপনি বারম্বার তিরস্কার করিয়াছি, কাজটা ভালো হয় নাই। হাজার হউক অতিথি। স্থির করিয়াছিলাম, নামিয়া আসিলে তরল পরিহাসে সে অপরাধ ধুইয়া ফেলিব। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলাম। বিষণ্ণ নয়। ক্রোধ, ক্ষোভ অথবা দুঃখের চিহ্নমাত্রও ছিল না। আসন্ন যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বে মানুষের মুখ যেমন কঠিন হইয়া ওঠে, এ তেমনি।

একখানি টক্‌টকে লাল রঙের শাড়ী পরিয়া বনলতা উপর হইতে তর্-তর্ করিয়া নামিয়া আসিল। ললাটে সিন্দূর-বিন্দু জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। আমার ছেলে-মেয়ে কয়টী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের একটা কথাও বলিল না। কটাক্ষে চাহিয়া একটুখানি হাসিল না পর্য্যন্ত। কিন্তু সে না হয় না-ই করিল — আমি জানি, ছোট ছেলে-মেয়ের উপর কোনোদিনই তাহার স্নেহ নাই—কিন্তু আমার স্ত্রীকে একটা বিদায়-সম্ভাষণ জানানোও তো উচিত ছিল। বেচারা সমস্ত কাজ ফেলিয়া এই জন্যই ছুটিয়া আসিয়াছিল। বনলতা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিল না পর্য্যন্ত। শুধু আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল — চলো।

প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিরীহ মেষ-শাবকের মতো নিঃশব্দে তাহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে বসিলাম।

মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে আমার শোফারটা একটা বুড়া লোককে চাপা দিয়া পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া ফিরিয়াছে। সেই থেকে তাহার সঙ্গে মোটর চড়িতে ভরসা পাই না। তবু তাহাকে ছাড়াইতে পারি নাই। একবার যে রাজদ্বারে দণ্ড দিয়া আসিয়াছে তাহাকে নূতন করিয়া দণ্ড দিতে কুণ্ঠা হয়। তা-ছাড়া মোটর-চালনায় কুশলী না হইলেও লোকটা একেবারে অপদার্থ নয়। এমন চমৎকার রান্না অতি অল্পই খাইয়াছি। কিন্তু রান্নার কাজ সে কিছুতে গ্রহণ করিবে না। মোটর চালাইবে।

গাড়ীতে উঠিয়া মনে মনে হাসিলাম। সামনে আনাড়ী শোফার, যে কোনো মুহূর্ত্তে, কিছু না হইলে, একটা ল্যাম্প-পোষ্টের সঙ্গেই ধাক্কা দিয়া বসিবে। পাশে বনলতা, রূপের আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই দগ্ধ হইয়া যাইতে পারি। যোগাযোগ মন্দ হয় নাই। কেবল ভাবিয়া দেখিলাম, এই একটিমাত্র ভরসা আছে যে, বনলতা কথা কহিবে না। মেয়েদের সঙ্গে গাড়ীতে যাইতে হইলেই ভয় পাই। সমস্তক্ষণ বকিয়া বকিয়া কানের পোকা আর রাখে না।

কিন্তু আমার সেই একটিমাত্র ভরসাও এক

মিনিটের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। গাড়ীখানা আমার বাড়ী ছাড়াইয়া প্রথম মোড়টা বেঁকিতেই বনলতা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা, নার্সদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয় আছে?

— আমার? না, ও-কাজটা কখনো করি নি।

বনলতা হাসিয়া ফেলিল। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন থম্‌থমে আকাশ এক মুহূর্ত্তে কোজাগরী রাত্রির মতো ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। আর আমি? কিন্তু আমার কথা থাক্। কোনোদিকে ভরসা করিবার মতো কিছু রাখিয়া তো বাহির হই নাই।

বলিল — সে কথা জিজ্ঞেস করি নি। বল্‌ছি, ওদের সম্বন্ধে কিছু জানো তুমি?

বলিলাম — জানি। ওরা আছে বলেই হাস-পাতালে বিনা-পয়সার ডাক্তারের অত ভিড়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অজুহাতটা নিতান্তই গৌণ। এমন কি আমার নিজেরই মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, এম্-এ না প'ড়ে ডাক্তারী পড়লেই ভালো করতাম।

কৌতুকে বনলতার ভ্রূ দু'খানি ফুলধনুর মতো নাচিয়া উঠিল। কহিল — তা হোক গে। সে ভয় করি না। ডাক্তার আর তোমাদের চেয়ে বেশী কি বিরক্ত করবে? —

বলিয়া আমার বাঁ-হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল। তাহাতে মৃদু চাপ দিয়া বলিল — মনে পড়ে না সে সব কথা?

— ক্রমাগত।

বনলতা অন্যদিকে চাহিয়া কি যেন স্মরণ করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তারপরে আমার দিকে ফিরিয়া একবার হাসিল।

বলিলাম — হাসছ যে?

কোনো উত্তর না দিয়া ছোট মেয়ের মতো বনলতা আমার হাতখানিকে তাহার দুই হাতের মধ্যে নাচাইতে লাগিল। অবশেষে হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল — জানো, নার্সগিরি আমার মোটে ভালো লাগে না।

কথাটা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি বলিলাম — তাই তো বটে! তোমার নিজেরই যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নার্সগিরি ভালো লাগে না কেন?

— বড্ড একঘেয়ে জীবন। যেমন বাঁধাবাঁধি, তেমনি একঘেয়ে। বিশেষ···বিশেষ···

বনলতা হাসিয়া ফেলিল। কহিল —ওই ডাক্তার-গুলো অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। চিঠিতে, চিঠিতে··

আমি চুপ্‌টি করিয়া বলিলাম — তাতে আর ক্ষতিটা হ'য়েছে কি?

বনলতা তাড়াতাড়ি আমার কথায় সায় দিয়া বলিল — না, সে অবশ্য তেমন বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু এতো বানান ভুল করে! — বলিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া একেবারে আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিল। নিজের গাড়ীতে বসিয়া এত হাসাহাসি করিতে আমার ভালো লাগিতেছিল না। কয়দিনই আমার নজরে পড়িয়াছে শোফারটা আমাদের ঝিয়ের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন গভীর গবেষণা করিতেছে। যদি এই হাসা-হাসির ব্যাপারটা কোনো-ক্রমে ঝিয়ের মারফৎ গৃহিনীর কর্ণগোচর হয়, আমার আর রক্ষা থাকিবে না।

প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনের জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম — দিনে তোমার ঘুম হ'য়েছিল তো?

— ভালো হয় নি। কেন বলো তো? — বলিয়া বনলতা বিস্মিত-ভাবে আমার দিকে চাহিল।

হাসিয়া বলিলাম — সেই রকমই অনুমান করে-ছিলাম। তোমার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সমস্তক্ষণ কি যেন একটা গভীর বিষয় ভাবছিলে। যখন নেমে এলে তখনও, গাড়ীতে বস্‌লে তখনও, অথচ তোমার চোখ দেখে···

বনলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া-ছিল। বাধা দিয়া বলিল—না, না, আমার চোখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। দু'চার রাত্রি জাগলে আমার কিছু হয় না। রাত তো প্রায়ই জাগতে হয় কি না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি অত ভাবছিলে?

হাসিয়া বলিল—সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না।

— বলতে আপত্তি থাকে তো থাক।

ক্লান্তস্বরে বনলতা বলিল — শুনে কি হবে? ভালোবাসার কথা নয়।

বনলতার কথা এবং কথার সুরে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম। মনে হইল, তাহার ধারণা, তাহার সুবঙ্কিম হাসি, সুমধুর কথা, সুললিত গতি—শুধু এই সকলেরই সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। আমরা যেন তাহার কাছে শুধু ভালোবাসার কথাই শুনিতে চাই। সকল মেয়ের সঙ্গে সকল পুরুষের সম্পর্কই যেন এই। পুরুষে যেন মেয়েদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার সঙ্গে কোনো যোগই রাখিতে চায় না।

দুঃখিতভাবে বলিলাম—যা বলতে চাও না বনলতা, তা শোনবার আগ্রহও দমন করলাম। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কেন যে এমন অবিচার করছ তা বুঝলাম না।

আমার কথায় বোধ করি কিছু আন্তরিকতা ছিল, যা হয়তো বনলতা আশা করে নাই। বড় বড় চোখ মেলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

সে দৃষ্টির উত্তরে একটু কটু কণ্ঠেই কহিলাম — মিথ্যে চেয়ে আছ, বনলতা, আমি অভিনয় করতে পারি না।

বনলতা লজ্জিতভাবে চোখ নামাইয়া লইল।

তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, তা দেখছি না। আজকে, কেন জানি না, তোমাকে বড্ড ভালো লাগছে—সেই প্রথম দিনের মতো। তাই দুঃখের কাহিনী শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কি আবার ভাবব? কিছুই ভাবি নি। ভাবছিলাম, যদি নার্সগিরি ভালো না লাগে? কি করব তখন? এ আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে ভাবি। আবার তখনি ভুলে যাই। এই যে এসে পড়েছি। থামো থামো।

বনলতা দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। যাওয়ার সময় বলিয়া গেল—এখুনি পালিও না যেন আমাকে মাঝ দরিয়ায় নামিয়ে দিয়ে। আগে দেখে আসি এখানে হালে পানি পাওয়া যাবে কি-না। ফিরতে যদি একটু দেরীও হয়, তবু থেকো। বুঝলে?

আমি একা বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। বনলতা যে বাড়ীর মেয়ে তাহাদের ঐশ্বর্য্যের কথা কলিকাতা সহরে লোকের মুখে মুখে ফেরে। জীবনে দুঃখের মুখ দেখে নাই। কিন্তু আজ আর সেখানে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। তাহারা বনলতার মুখদর্শনও করিবে না। তাহার প্রথম স্বামীর গৃহেই বা কোন্ অধিকারে ফিরিবে? সর্ব্বশেষে, তাহার দ্বিতীয় স্বামী,—কিন্তু সেখানকার দ্বারও সে নিজের হাতে রুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াছে। বনলতাকে আমি যতদূর জানি, চরম দুর্দ্দিনেও সে কিছুতে সে-পথ মাড়াইবে না।

কিন্তু করিবেই বা কি? যতদিন দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয় নাই, ততদিন দুই মুষ্টি অন্নের কথা ভাবিয়া কোনো প্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণও ঘটে নাই। ঘটিয়াছে এখন। মানুষকে যে কখনও কখনও সত্য-সত্যই দিনের পর দিন উপবাস করিবার মতো অবস্থায়ও পড়িতে হয়, এখন হয়তো সে বিশ্বাসও হইয়াছে। এখন আর তাই দুশ্চিন্তারও শেষ নাই। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকাও আর চলিল না। দারোয়ানটি ঘন ঘন খৈনি টিপিতেছে আর আড়চোখে আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। বনলতাকে সে এই গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছে। আমি যে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি তাহা বুঝিয়া লোকটার মন বেশ রসস্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই অসময়ে হাসপাতালের সামনে গাড়ী দাঁড় করাইয়া অপেক্ষা করিয়া আছি, রাস্তার পথচারীরা পর্য্যন্ত যেন তাহা টের পাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘড়ি দেখিলাম, প্রায় পনেরো মিনিট হইয়া গিয়াছে। অস্থির হইয়া ভাবিতে ছিলাম, গাড়ী রাখিয়া খানিকটা রাস্তায় ঘুরিয়া আসিব কি না,

এমন সময় বনলতার রাঙা শাড়ীর একটি প্রান্ত নজরে পড়িল।

হ্যাঁ, বনলতাই বটে। এমন সুন্দর চলার ভঙ্গি আর কাহারও হইতে পারে না। চাপা হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়াই হুকুম দিল—গড়ের মাঠ।—গাড়ী চলিতেই মুখে আঁচল চাপা দিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

—কি হ'ল?

বনলতার মনের কথা দেবতারাও জানেন না। শুধু বলিল—কিছুই নয়।—এবং সমস্ত রাস্তা অনর্গল বকিতে লাগিল। শব্দের পর শব্দ নর্ত্তকীর নূপুরের মতো বাজিতে লাগিল। অথচ কথা বলিবার জন্য এতটুকু প্রয়াস নাই। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, রসে টুলটুলে রাঙা-রাঙা দু'খানি ঠোঁট ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যায়, আর অজস্র বাক্য রঙীন বুদ্বুদের মতো অফুরন্ত স্রোতে অনায়াসে বাহির হইয়া আসে। এই ভয়ই করিতেছিলাম। একটু আগে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার যে সকল কথা বলিতেছিল তাহার আর চিহ্নমাত্রই নাই।

এক সময় বলিল—তোমাকে আজ আমার বড্ড ভালো লাগছে। এমন ভালো কোনো দিন লাগে নি।

এতক্ষণ পরে একটা কথা কহিবার ফাঁক পাইলাম। কহিলাম—কেন, আজকে আমার অপরাধ?

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু হাসিয়া বনলতা বলিল—অপরাধ কোথাও আছে নিশ্চয়। ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো আমারই অপরাধ, কিম্বা এই চমৎকার অপরাহ্ণের। সে যাই হোক, তুমি ডায়েরী রাখো তো?

—রাখি।

বনলতা এক হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—তাহ'লে তাতে লিখে রাখতে পারো, আজকে ১১ই জুলাই অপরাহ্ণে, অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যেও বনলতা তোমাকে ভালোবেসেছিল। লিখে রাখতে পারো।

বনলতার কাছে জয়ের গর্ব্ব করিবার কখনও অবকাশ ঘটে নাই। আজও সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম। তাহার মুখের একটা কথায় আমার চারিপাশের পৃথিবী বিপুল জনতা ও কল-কোলাহল লইয়া কোথায় ডুবিয়া গেল! চক্ষের পলকে দেহের শিরায় শিরায় কি যেন কি ঘটিয়া গেল, আমি বাম হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ডান হাতে তাহার মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া ধরিলাম। বনলতা এতটুকু বাধা দিল না। চোখ বন্ধ করিয়া শুধু একবার বলিল—না, না।

হঠাৎ গাড়ীখানা একটা মোড়ের মাথায় ঘস্ করিয়া থামিল। জন-কোলাহলময়ী কদর্য্য পৃথিবী আবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমি বনলতাকে ত্রস্তে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসিলাম। ললাটে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিলাম।

কথা কহিবার শক্তি ছিল না। দারুণ পরিশ্রমের পর প্রত্যেকটি স্নায়ু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। এক সময় চাহিয়া দেখি, ও-প্রান্তে বনলতার সুকুমার তনুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। হুডের কোণে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া গেল, কি জাগিয়া আছে, বোঝা গেল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে কি ঝড় বহিতেছিল, সে আমিই জানি। তাহার অপরিসীম শ্রান্তি দেখিয়াও ক্ষমা করিতে পারিলাম না।

কঠোর কণ্ঠে কহিলাম—আমরা এত দুর্ব্বল ব'লেই কি তুমি আমাদের নিয়ে যখন-তখন এমনিধারা খেলা কর?

—খেলা!

বনলতা যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। শুধু মুখ ফিরাইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। যেন এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিল। আমার কথা শুনিতেই পায় নাই। দেখিলাম, তাহার দুই চোখের কোণ বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গালের উপর আসিয়া জমিয়াছে।

মুখে একটা আশ্চর্য্য মালিন্য আসিয়াছে। আমার চোখে, আমার মস্তিষ্কে তখনও যেটুকু স্বপ্ন ছিল, সে মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশেষে উবিয়া গেল। বনলতা ঠিকই বলিয়াছিল, আমরা তাহার চোখের জল চাহি না, চাই ঠোঁটের হাসি। জীবনে এই প্রথম তাহাকে নিজের চেয়ে ছোট মনে হইল। তাহার জন্য দুঃখে ও করুণায় মন ভরিয়া উঠিল।

বনলতা আবার জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলে? খেলা? খেলা কি?

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম—খেলাই তো কর। কিন্তু যাক্ গে সে সব কথা।

গাড়ীখানা তখন ইডেন-গার্ডেনের ফটকের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। শোফারকে থামিতে বলিয়া দু'জনে নামিয়া পড়িলাম।

তখনও অফিসগুলির ছুটি হয় নাই। বাগানে ভিড়, বলিতে গেলে, মোটেই জমে নাই। কয়েকটি হিন্দুস্থানী বালক এক টুকরা খোলা মাঠের মধ্যে খেলা করিতেছিল। দুইটি কি তিনটি চানাচুরওয়ালা কেবল আগুন জালিয়া ডালা সাজাইয়া বসিয়াছে। আর গাছের ছায়ায় বেঞ্চে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া একা বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে।

আমরা একটি ছোট কুঞ্জের মধ্যে একখানি বেঞ্চে পাশাপাশি বসিলাম। নিঃশব্দে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কাঁদছিলে কেন?

ভীত চোখ মেলিয়া বনলতা বলিল—গাড়ীখানা হঠাৎ কেমন বিশ্রী থামলো দেখলে না? বুকের ভেতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। কেমন ভয় পেয়ে গেলাম।

—তুমি ভয় পাও তাহ'লে?

বনলতা হাসিল। বলিল—পেলাম তো।

—এই প্রথম বোধ হয়?

—কি জানি। না, আর একদিন পেয়েছিলাম। আমার প্রথম স্বামী পিঠের ওপর চাবুকের পর চাবুক মেরেও ভয় খাওয়াতে পারে নি। কোনো দিন কেউ পারে নি। কেবল সেই একদিন পেয়েছিলাম। অনেকটা এই রকম। জীবনের দ্বিতীয় ফুল-শয্যার রাত্রে। (বনলতা হাসিল) আমি একটা সোফায় ব'সে ছিলাম, তোমার বন্ধু একগাছা মালা নিয়ে আমার একান্ত সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাত তুলে মালাগাছি আমার গলায় পরিয়ে দিতে যাবেন, ঠিক এমন সময় বাইরে দিয়ে কে যাচ্ছিল তার হাত থেকে একরাশ চায়ের পেয়ালা-প্লেট ঝন্-ঝন্ ক'রে পড়ে গেল। আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। এমন অশুভ বিশ্রী আওয়াজ জীবনে কখনও শুনি নি।

বনলতা এইখানে বসিয়াই শিহরিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—শুধু তুমি ভয় পেয়েছিলে? আর মোহন? সে ভয় পায় নি?

বনলতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল—দেখ, তোমার এই বন্ধুটি আশ্চর্য্য মানুষ! ওঁর কথা জিজ্ঞেস ক'রো না। তোমাদের সকলকে, আমি চিনি, জানি, বুঝি। কিন্তু স্পষ্ট স্বীকার করছি, ওঁকে আমি একবিন্দুও বুঝতে পারি নি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, উনি যেন রক্ত-মাংসের মানুষই নন। সুখ-দুঃখ ব'লে যেন কিছুই নেই। সামান্য হাসি, সামান্য কথা, আস্তে চলা—সকাল থেকে সকাল পর্য্যন্ত সেই একই অব্যয়, অক্ষয় রূপ দেখে দেখে আমি পাগল হ'য়ে উঠেছিলাম। পালিয়ে তবে বাঁচি!

আমি বলিলাম—তবে অত তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে করতেই বা গেলে কেন? ভালোই যখন লাগে নি…

বনলতা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—লাগে নি? আশ্চর্য্য লেগেছিল! শুধু ওঁকে বোঝবার জন্যে আমি বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত প্রিয়জন, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছিলাম। কারও সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করি নি। সে তো তুমি জানোই।

— জানি। তবে কেন ছেড়ে এলে?

বনলতা বিষণ্ণভাবে বলিল — ওই তো বললাম, নইলে পাগল হ'য়ে যেতাম। আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, শরৎ—পাথরের দেবতা নিয়ে কি করব বলো?

বলিবার কিছুই ছিল না। বনলতা খরস্রোতা। কূটিল আবর্ত্তে এবং উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে দুই কূল ভাঙিয়া বহিয়া চলিতে চায়। সে কি পারে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বেগ সংহত করিয়া ধ্যানমৌন নিস্তব্ধ পাহাড়ের পাদমূলে দিনের পর দিন মৃদু স্তব-গুঞ্জন গাহিয়া চলিতে? তাহারই বা দোষ কি? ভগবান তাহাকে এমনি করিয়াই তো সৃষ্টি করিয়াছেন।

সত্যই তো। এ মেয়ে পাথরের দেবতা লইয়া করিবে কি? মোহনকে তো আমি ছেলেবেলা হইতেই জানি। সে কখনও হাসে নাই, খেলে নাই, ছুটাছুটি, মারামারি করে নাই, জীবনে কাহাকেও একটা কটু কথা কহে নাই, পরিহাস করিয়াও একটা মিথ্যা কথা বলে নাই। কেবল রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া রাজ্যের বই পড়িয়া জ্ঞান-সঞ্চয় করিয়াছে, আর পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইয়াছে। সে পড়ার এখনও শেষ হইল না। আমি তো ভাবিয়াই অবাক হইয়া যাই, বনলতার খরস্রোতে সে আসিয়া পড়িলই বা কখন? এই স্রোতে আমি এবং আমারই মতো আরও কত হতভাগ্য যখন কূটার মতো ভাসিতেছিলাম, সে তখন কাছেই কোথাও ছিল নিশ্চয়। নজর করিয়া দেখি নাই। দেখিবার মতো দৃষ্টিও তখন ছিল না। অকস্মাৎ সংবাদ পাইলাম, বনলতার সঙ্গে তাহার বিবাহ। সংবাদ নয়, একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র! তৎপূর্ব্বে কোনো দিন তাহার মুখে বনলতার কথা, অথবা বনলতার মুখে তাহার কথা শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না।

দুইজনেই আমার কাছে সমান রহস্যময়। যেমন মোহন, তেমনি বনলতা। এতদিনে কাহাকেও বুঝিতে পারিলাম না। একজন কথাই কহে না। আর একজন এত কথা কহে যে, কোন্‌টা তাহার মুখের কথা, কোন্‌টা মনের কথা বুঝিবার উপায় নাই। বেশ মনে পড়ে, তাহাদের বিবাহের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, বার-বার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছিলাম এবং মোহনকে অজস্র গালি দিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, চিরদিন আমাদের সকলকে ডিঙাইয়া যে 'প্রাইজ' লইয়া গিয়াছে সে এখনও সঙ্গ ছাড়িল না!

বনলতা বলিতে লাগিল — দু'টি বৎসর কি ক'রে যে কেটেছে সে আমিই জানি। এক মুহূর্ত্ত নিজেকে বিশ্রাম দিই নি। ভগবানকে জানবার জন্যে মানুষ যে রকম কৃচ্ছসাধন করে, তাই করেছি। তুমি বুঝে দেখ না, আমার মতো মেয়ে — বহু লোকের সঙ্গ, বহু কণ্ঠের কলরব, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যা-হোক-একটা-কিছু করার উত্তেজনা ছাড়া যার এক মিনিটও কাটে না—সে নিজেকে দু'টি বৎসর অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখেছিল। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে তাকে আরাম এবং আনন্দ দেবার জন্যে কী করি নি? দারুণ গ্রীষ্মেও প্রত্যহ নিজের হাতে তার জন্যে বিশেষ একটা কিছু রান্না রেঁধেছি — কোনো দিন মুখে দিয়েছে, কোনো দিন দেয় নি। তার পড়ার ঘরখানি দিন-রাত্রি ঠাকুর-ঘরের মতো সাজিয়ে রেখেছি—একদিন চেয়ে দেখেছে? সন্ধ্যা হ'লে নিজেকে কত রকমে সাজিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বই থেকে মুখও তোলে নি। একটিবারের তরে একটুখানি স্নিগ্ধ দৃষ্টির প্রসাদ পাবার জন্যে কী ক'রেছি, আর কী না ক'রেছি, শরৎ, ভাবতেও লজ্জায় মরে যাই।

বনলতা চুপ করিল।

আমি একটু থামিয়া বলিলাম — তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হ'ত না?

— ঝগড়া? ওর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় ভেবেছ? ওর সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না, ভাব করা যায় না, কিছু করা যায় না। কেবল নিষ্কাম সেবায় হাত পাকানো চলে।

বনলতা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। কণ্ঠস্বর

একটু সংযত করিয়া বলিল — ঝগড়া! ঝগড়া করলে তো বেঁচে যেতাম। ও যে কিছুই করে না, কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে ব'সে ব'সে বই পড়ে। আমি তাই পালিয়ে বেঁচেছি। অন্য মেয়ে হ'লে আত্মহত্যা ক'রত।

একটি দুইটি করিয়া বাগানে ক্রমেই ভিড় জমিতেছিল। কৌতূহলী পথচারীর দৃষ্টি আমাদের বিদ্ধ করিতে লাগিল। আসিবার সময় যে মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে একাকী বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সে দেখি ইহারই মধ্যে কখন উৎসাহিত হইয়া আমাদের পিছনে এমন একটি জায়গায় বসিয়াছে যেখান হইতে আমাদের দুইজনকে স্পষ্ট দেখা যায়। কথা কহিতে কহিতে বনলতা কখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পায়ের কাছে হ্রদের জলে কয়েকটি পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। কোটি কোটি পরাগকণা ঢেউ-এর তালে তালে দুলিতেছিল। বনলতা সেই দিকে চাহিয়া আপনার মনে কি যেন ভাবিতেছিল।

বলিলাম—ফুলের ওপর লোভ তোমার এখনও যায় নি দেখছি।

বনলতা ঘাড় ফিরাইয়া একটুখানি হাসিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। বলিল—ফেরার পথে নিউ-মার্কেট থেকে কতকগুলো ফুল কেনা যাবে, কেমন?

বনলতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

বুঝিতেছিলাম অতীত দিনের স্মৃতির ভারে তাহার মন ভারী হইয়া উঠিতেছে। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। তবু আর কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া গেলাম।

অনেকক্ষণ হইতে একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল। কিন্তু এখনই তাহা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হইবে কি না, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে সেই প্রশ্নই করিয়া বসিলাম।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম— অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের মাঝে তুমি যেমন ক'রে বড় হ'য়েছ সে আমি জানি। আর আজ এমনই অবস্থায় এসে পৌঁছেচ যে, একটি দিন না খাটলে সে দিনের অন্নসংস্থান হবে না। আমার এই কৌতূহল মেটাবে বনলতা, সমস্ত ঐশ্বর্য্য হেলায় পরিত্যাগ ক'রে এই দুঃখ বরণ ক'রেছ কিসের লোভে? কী সে বস্তু?

আমার প্রশ্নে সে চমকিয়া উঠিল। বলিল — আশ্চর্য্য! ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম। কিসের লোভে বলো তো?

আমি হাসিয়া বলিলাম—সে কি আমার জানবার কথা?

সে আবার হ্রদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল—আমিও জানি না। কিসের আবার লোভে! এই আমার প্রকৃতি। খুব সম্ভব, এই উচ্ছৃঙ্খলতা বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। এ আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে।

বনলতা দম লইবার জন্য একটু থামিল। আবার বলিতে লাগিল—কিছুরই লোভে নয়। এমনি ছেড়ে দেওয়া। অকারণে ছেড়ে চলে আসা। জোঁকের মতো আগেরটাকে ধ'রে পরেরটাকে ছেড়ে দেওয়া নয়। হাতেরটাকে ছেড়ে দিয়ে স্রেফ হাওয়ার ওপর ভাসা। ভালো লাগে না। ব্যস্! ছেড়ে দাও। এমনি একটার পর একটা ছেড়ে দেওয়া। কোনো কারণ নেই। কেবল ভালো লাগে না।

গভীর উত্তেজনায় তাহার সমস্ত দেহ অত্যন্ত দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। কিন্তু এ অবস্থায় সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা জানিয়া চুপ করিয়া গেলাম। এই কুঞ্জের মধ্যে যে এতক্ষণ কাটিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। চাহিয়া দেখি অপরাহ্ণের সূর্য্য গোধূলির প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সন্ধ্যা হয়-হয়।

হঠাৎ কোথা হইতে এক ঝলক হাওয়া আসিয়া আমাদের লতা-মণ্ডপকে নাড়া দিয়া গেল। কতকগুলা শুক্‌না পাতা সর্ব্বাঙ্গের উপর ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমি অতি সন্তর্পণে বনলতার দেহ

হইতে ঝরা পাতাগুলি ফেলিয়া দিতেছিলাম। কয়েকটি পাতা মাথার চুলে এমন ভাবে আটকাইয়া গিয়াছে যে, সহজে তোলা যায় না। সে কয়টি ফেলিয়া দিবার জন্য তাহার মাথাটি একটুখানি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেই পিছনে কে চেঁচাইয়া উঠিল, হায় হায়!

চমকিয়া চাহিয়া দেখি, সেই মাড়োয়ারীটা। মাড়োয়ারী ছাড়া এমন আর কে করিতে পারে! লোকটা এখনও ঠায় তেমনি করিয়া বসিয়া আছে, এবং সম্প্রতি উপরের নীচের দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাস্য করিতেছে। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বর্ব্বরটাকে শাস্তি দিবার জন্য উঠিতে যাইব, বনলতা হাত চাপিয়া ধরিল। দেখি এই রসিকতায় সে বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মাড়োয়ারীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তরলকণ্ঠে বলিল, —কেয়া বাবুজি, মিজাজ ঠিক হো গিয়া?

আনন্দে লোকটা উত্তর দিতে পারিল না। শুধু দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ঘাড় হেলাইয়া সেলাম জানাইল। ভাবটা, আপহিঁকো মেহেরবাণী!

আমার ভালো লাগিতেছিল না। বিরক্তকণ্ঠে কহিলাম—চলো, চলো, এইবার ওঠা যাক্।

—হ্যাঁ, চলো।—বলিয়া বনলতা আমার পিছন পিছন বাহির হইয়া আসিল। মাড়োয়ারীটার পাশ দিয়া আসিবার সময় একটা চঞ্চল কটাক্ষ হানিয়া বলিল—রাম-রাম বাবুজি। আব্ ঘর চলা যাইয়ে।

উত্তরে লোকটা কি বলিয়াছিল শুনিতে পাই নাই। হয়তো কথা বলিবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, বনলতার সম্বন্ধে তাহার ভালো ধারণা হয় নাই। এমন কি তাহার ঠিকানাটা না লওয়ার জন্য বাড়ী গিয়া অনুতাপও করিতে পারে। চাহিয়া দেখিলাম, বনলতার মুখে কয়েক মিনিট পূর্ব্বেকার দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নাই। ঘন মেঘভার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিস্মিত এবং বিরক্তকণ্ঠে বলিলাম—ছিঃ বনলতা, তুমি কী!

বনলতা বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হইল না। লঘুকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—তুমি যা ভেবেছিলে তা নই। দেখলে তো!

ভৎর্সনা করিবার মতো উপযুক্ত বাক্য খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলাম—আশ্চর্য্য!

বনলতা যেন একটু শান্ত হইল। বলিল—তা না হয় হ'লাম। কিন্তু তুমি কী বল তো! এত jealous!

—Jealous! ওই লোকটা···

—হ্যাঁ, ওই লোকটা। কি ক'রেছে ওই লোকটা?

—কি ক'রেছে? একজন ভদ্রমহিলার সামনে···

—ভদ্র মহিলার!

বনলতা খোলা প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। এত জোরে যে, একটি কলেজের ছেলে দ্রুত ভ্রমণের মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া দেখিল। বাঁ-দিকের খোলা জায়গায় দুইজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত দার্শনিকভাবে হাসিয়া যেমন পায়চারী করিতেছিলেন তেমনি করিতে লাগিলেন। আমি তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে আনিয়া বসাইলাম।

—ভদ্র মহিলার সামনে!—বনলতা বলিতে লাগিল—'ভদ্র মহিলা'র মানে কি মশাই? Lady-র বাংলা তর্জ্জমা তো? আমরা ভদ্রলোকের স্ত্রী বা কন্যাকে বিলিতি কেতায় বলি 'ভদ্রমহিলা'। আগে এদেশে প্রত্যেক মেয়েকেই 'ভদ্রে' ব'লে সম্বোধন করার প্রথা ছিল। পুরুষের কাছে যে-কোনো মেয়েই ভদ্রমহিলা। সেও বাজে কথা। আসলে নারী নারী, পুরুষ পুরুষ। এবং তাদের মধ্যে একটিমাত্র সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ চিরকালের এবং যা হওয়া উচিত। তা না, যত বাজে কথা! ভদ্রমহিলা!

বনলতা আমার কথাকে পরিহাসভরে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়াইয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বিস্ময়ে ও বিতৃষ্ণায় হতবাক্ হইয়া গেলাম। বনলতাকে চিনিতে আমার বাকী নাই। কিন্তু তাহার আজিকার পরিচয় অতীতের সকল পরিচয়কে অতিক্রম করিয়া গেল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বনলতা আপন মনেই বলিতে লাগিল—কবিতা ক'রে, আর বিশুদ্ধ বাংলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে পরিষ্কার ক'রে মনের কথা বলতে গিয়ে আজ বিকেলটাই মাটি ক'রে ফেলিছিলাম! ভাগ্যিস্ আমার 'বাবুজি' ছিল! বেশ লোক! খাসা লোক! একেবারে আদিম বর্ব্বর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল···পরিষ্কার' মাটির গন্ধ···কি ব'লে চেঁচিয়ে উঠল?···হায় হায়!···না-কি? বলো না?

বলিয়া আবার কৌতুকভরে হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কাছে, দূরে, আরো দূরে নীলাভ-কৃষ্ণ মাঠের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে আলোকমালা জ্বলিতেছে। প্রচুর আলো বহন করিয়া মাঝে মাঝে ট্রাম ছুটিতেছে। গঙ্গার জল কোথাও নিকষ কালো, কোথাও আলোয় ঝলমল করিতেছে।

আমার হাতে একটা ঠেলা দিয়া বনলতা বলিল—এ আবার কোথায় চলেছ?

শোফারকে কোনো গন্তব্যের নির্দ্দেশ দিই নাই। বলিলাম—জানি না।

—বাঃ! বেশ তো! নিউমার্কেটে যাবে না? ফুল কিনবে ব'লেছিলে যে! ভুলে গেছ?

শোফারকে নিউমার্কেটের দিকে যাইতে বলিলাম। বনলতা আমার দিকে সুমুখ ফিরিয়া বসিল। আমার পাঞ্জাবীর বোতাম নাড়া-চাড়া করিতে করিতে বলিল—কি ফুল কিনে দেবে জানো? পদ্ম। একটিমাত্র পদ্মফুল। মৃণালশুদ্ধ পদ্ম বুকের ওপর রেখে ঘুমুতে এত ভালো লাগে! সমস্ত মন, সমস্ত চিন্তা, আমার স্বপ্ন পর্য্যন্ত যেন সুরভিত হ'য়ে ওঠে! হাসছ যে!

বলিলাম—না না, হাসি নি। তোমার কবিতা শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম, একমিনিট আগে কবিতা করার কত নিন্দা তুমি নিজেই করছিলে!

বনলতা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তাই না-কি? কি করব? অভ্যেস হ'য়ে গেছে। সভ্যতা আর ভদ্রতার কাছ থেকে এই তো পেয়েছি। সুযোগ পেলে আর ছাড়তে পারি না।

হঠাৎ এক সময় আবার বলিল—আচ্ছা, তোমার শ্রীকুমারকে মনে পড়ে? কবি শ্রীকুমার?

—পড়ে। সে কোথায় আছে বলো তো?

মাথা নাড়িয়া সে বলিল—জানি না। হঠাৎ তার কথা মনে প'ড়ে গেল। একদিন আমি তার কবিতার সুখ্যাতি করছিলাম। শ্রীকুমার হেসে বললে, এ আর কি কবিতা বনলতা দেবী, নিজেকে তো আর সর্ব্বদা দেখতে পাচ্ছেন না, তা হ'লে বুঝতে পারতেন ভগবানের লেখা আসল কবিতা কাকে বলে। বেশ ব'লেছিল, না?

আমি হাসিয়া বলিলাম—চমৎকার ব'লেছিল।

—আচ্ছা, ও কি সত্যি কথাই ব'লেছিল, না ফাঁকা কবিতা?

—সত্যি কথা। তামা-তুলসী নিয়ে শপথ করতে পারি।

—যাও! যত সব···বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একবার নিজেই নিজেকে যতদূর সম্ভব দেখিয়া লইল।

বলিলাম—কেমন? বিশ্বাস হ'ল তো?

বনলতা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া আমাকে ঠেলিয়া দিল। একটু পরে ম্লানকণ্ঠে কহিল—কিন্তু সে কেমন ক'রে হবে? আমি তো তেমন ভালো নই!

নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না সে ভালো নয়, সে পবিত্র নয়। বলিলাম—কেন? মন্দই বা কি?

বনলতা নিজেই বোধ হয় নিজের কথার প্রতিবাদ খুঁজিতেছিল। আমার মুখের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে লুফিয়া লইয়া বাঁ হাত দিয়া সমস্ত তর্ক হেলায় উড়াইয়া দিবার ভঙ্গিতে বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ! কিসের মন্দ! তুমিও যেমন! ভালো আর মন্দ! মানুষ কখনও মন্দ হয়?

মার্কেটে তাহাকে একটি ফুল কিনিয়া দিলাম।

মস্ত বড় পদ্মফুল। গাড়ীতে উঠিয়া সেটিকে লইয়া সে যে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একবার মাথায় রাখে, একবার বুকে চাপিয়া ধরে, একবার গালে ছোঁয়ায়, একবার অধরে স্পর্শ করে। মৃণালটি বার বার বহু ভঙ্গিতে গলায় জড়ায়। ফুল পাইয়া বনলতা ছোট মেয়ের মতো আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

বলিল—চমৎকার ফুলটি, না?

আবার বলিল—কতকাল যে পদ্মফুল দেখি নি তার ঠিক নেই। তিন বছরের বেশী।

—কেন?

—লক্ষ্ণৌতে পদ্মফুল হয় কি না জানি না। চোখে তো পড়ে নি। আর, তার আগে তোমার বন্ধুর কারাগারে। আমিও সেধে চাই নি, উনিও কোনো দিন দেওয়ার কথা ভাবেন নি। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

সে ফুলটি দিয়া আমার গালে আঘাত করিল। হাসিয়া বলিল—কেমন? খুব মিষ্টি, না?

—খুব মিষ্টি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বনলতা বলিল—সুন্দর ফুলের আঘাতও মিষ্টি, বুঝলে?

হাসিয়া বলিলাম—তাই তো দেখছি।

পরম স্নেহভরে ফুলটিকে সে আবার বুকে চাপিয়া ধরিল—চমৎকার ফুল, না? Splendid! অনেক দিনের পরে দেখা, আমি একেবারে এর প্রেমে প'ড়ে গেছি, heels over head।

বনলতা ফুলটিকে একটি সুদীর্ঘ চুম্বন দিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—Glorious! আজ নিশ্চয় তোমাকে স্বপ্ন দেখব। খুব চমৎকার একটি স্বপ্ন। কাল এসো, বলব কি স্বপ্ন দেখলাম। আসবে তো?

আমারও কেমন নেশা জমিয়া আসিতেছিল। বলিলাম—দেখব!

—না, দেখব নয়। নিশ্চয় আসবে। নিশ্চয়। আমি তোমার পথ চেয়ে ব'সে থাকব, সেই চাতকিনী না-কি বলে তারই মতন। তুমি নিশ্চয় আসবে। তোমার গাড়ীখানা নিয়ে। কালকে পাঁচটায় সময়, বুঝলে?

সে একটি করিয়া কথা বলে, আর ফুলটি দিয়া এক একবার করিয়া আঘাত করে। আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া যায়। গাড়ীখানা তাহাদের হাসপাতালের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বনলতা হঠাৎ আমার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—শোনো। তোমার কাছে টাকা আছে?

—কত?

—যা পারো। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ···আমার হাত একেবারে খালি হ'য়ে গিয়েছে।

নোট-কেসটা হইতে কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া গণিয়া দিতেছিলাম। বলিল—থাক, আর গুণতে হবে না। ওতেই হবে।

বনলতা ছোঁ দিয়া নোটগুলি তুলিয়া লইল। সেই মুহূর্তে গাড়ীখানা হাসপাতালের ফটকের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে নামিয়া পড়িল। ত্বরিত পদে চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় আর একবার বলিয়া গেল—কাল এসো কিন্তু।

মোটর বাড়ীর দিকে ফিরাইতে বলিয়া এক কোণে ঠেস দিয়া বসিলাম। আজ সমস্ত দিন একটা স্বপ্নের মতো কাটিয়া গেল। দুই পাশের চলমান্ বিপুল জনতা এবং কলিকাতার কদর্য্যতা দেখিয়া ভাবিতেই পারিতেছিলাম না যে, মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বনলতা আমার পাশে বসিয়াছিল। তাহাকে যতই দেখিতেছি ততই বিস্ময় বাড়িতেছে। আপনার রূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বসময় এমন সচেতন মেয়ে আমি দেখি নাই। এ কেবলই নিজের কথা ভাবে—নিজের অপরূপ রূপের কথা। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও কুণ্ঠা নাই। জানে, তাহার পায়ে মাথা না নোয়াইয়া কাহারও উপায় নাই। রূপ-সম্বন্ধে এই বিশ্বাস যে-দিন ভাঙিবে সেই দিনই ও মরিবে—তার আগে নয়। তার আগে ও এমনি করিয়াই ফিরিবে। স্রোতের শৈবালের মতো—কোনো ঘাটেই ভিড়িবে না। তৈমুরলঙ্গের মতো। কেবল জয়ের পর জয়ই করিবে। কোথাও সে বিজয়-গৌরব উপভোগ করিবার জন্য দুই দণ্ডের বেশী অপেক্ষা করিবে না। বলে, ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না।

কিন্তু বনলতার সম্বন্ধেও বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন আমার স্নায়ুর উপর ভীষণ টান গিয়াছে। সে দ্বন্দ্বে আমি ভিতরে ভিতরে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম। মোটরের এককোণে মাথা রাখিয়া নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিলাম।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্

গত বৈশাখ সংখ্যার 'উদয়নে'র প্রবন্ধে ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত জর্জ্জর-পূজা-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেবভাষার আদি দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

ব্রহ্মার আদেশে দেবলোকে দুর্ভেদ্য নব নাট্যগৃহ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিলেন। পিতামহের সামপ্রয়োগে দেব ও দৈত্যগণের বিবাদ আপোষে মিটিয়া গেল। তাহার পর ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে বিঘ্নশান্তির উদ্দেশ্যে নবনির্ম্মিত নাট্যমণ্ডপে যথাবিধি রঙ্গদেবতাগণের ও জর্জ্জরের পূজা সম্পাদিত হইল। অনন্তর মহর্ষি ভরত পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব! আদেশ করুন, কোন্ দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ করিব?" ব্রহ্মা 'অমৃতমন্থন' নামক 'সমবকারে'র অভিনয় করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এ-অভিনয় এতই স্বাভাবিক ও মনোরম হইয়াছিল যে, দেবাসুরগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইয়া একত্রে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই অমৃতমন্থন সমবকারকেই দেবভাষার আদি দৃশ্যকাব্য বলা চলে। ইহার রচয়িতা পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভরতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"অদ্য দেবাধিদেব মহাদেবকে নাট্য-প্রয়োগ দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব, তুমি প্রস্তুত হইয়া লও।" ইহার পর ব্রহ্মা, অমরবৃন্দ ও ভরত সদলে মহাদেবের আবাসে গমন করিলেন। তথায় ত্রিলোচনের পূজাপূর্ব্বক পিতামহ অভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন। উমাপতি সানন্দে অভিনয়-দর্শনে সম্মত হইলেন। তদনুসারে হিমাচল-পৃষ্ঠে অমৃতমন্থন সমবকারের পুনরভিনয়ের আয়োজন হইল। সমবকারের সহিত 'ত্রিপুরদাহ' নামক একখানি 'ডিম'ও অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই ত্রিপুরদাহ ডিমখানিও পিতামহের রচনা। অভিনয়-দর্শনে মহাদেব ও ভূতগণ পরম প্রীত হইয়াছিলেন। মহর্ষি ভরত নাট্যমধ্যে ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তির নিবেশ সম্যগ্‌রূপেই করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেবাধিদেবের নৃত্তদর্শনে কৈশিকী প্রয়োগের ইচ্ছাও ভরতের মনে জন্মিয়াছিল। আর সেই উদ্দেশ্যে কৈশিকীপ্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ প্রার্থনা করায় পিতামহ নিজ মন হইতে নাট্যালঙ্কার-চতুরা অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু সম্যগ্ উপদেশের অভাবে ভরত নাট্যমধ্যে সুশ্লিষ্টভাবে কৈশিকীপ্রয়োগ করিতে পারেন নাই। ভরতের এই ত্রুটিটুকু দেখিয়া দেবাধিদেব কৃপা-পরবশ হইয়া পিতামহকে বলিলেন—"হে মহামতি! আপনার

(১) ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা, উদয়ন—শ্রাবণ, ১৩৪০, পৃঃ ৩৭৮।

সৃষ্ট নাট্যাভিনয় অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা যশস্য, পবিত্র, মঙ্গলকর ও বুদ্ধিবর্দ্ধক। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমিও সন্ধ্যাসময়ে অঙ্গবিক্ষেপ করিতে করিতে নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছি (২)। এই নৃত্য নানাবিধ করণসংযুক্ত অঙ্গহারসমূহের দ্বারা বিভূষিত। অতএব, পূর্ব্বরঙ্গমধ্যে আপনি ইহা নিবেশিত করিয়া দিন। এখন যে পূর্ব্বরঙ্গ প্রযুক্ত হইতেছে, ইহা বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় "শুদ্ধ পূর্ব্বরঙ্গ" নামে প্রচলিত আছে। নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা "চিত্র পূর্ব্বরঙ্গ" নামে বিখ্যাত হইবে (৩)।

(২) মূলে আছে—"ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা" (৪।১৩)। ইহার অর্থ—মহাদেব নৃত্যকলার স্মর্ত্তা মাত্র, কর্ত্তা নহেন। নৃত্য অনাদি। মূলে 'নৃত্য' এই পাঠ থাকিলেও অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকায় 'নৃত্ত' এই পাঠ ধরিয়াছেন। উভয়ের প্রভেদ—উদয়ন—শ্রাবণ, পৃঃ ৩৭৮ ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৯৬১ দ্রষ্টব্য।

(৩) নাট্য—রসাশ্রয়; নৃত্য—ভাবাশ্রয়; নৃত্ত—তাললয়াশ্রয়—দশরূপক মতে ইহাই সংক্ষিপ্ত ভেদ করণ—নৃত্তক্রিয়া, গাত্রসমূহের হস্তপাদ সমাযোগ। করণে স্থিতি ও গতি এ উভয়ই নিষ্পাদ্য। স্থিতিকালে—বিভিন্ন স্থান, পূর্ব্বকায়ে পতাকাদি, আর গতিকালে—চারী, পূর্ব্বকায়ে বিভিন্ন নৃত্যহস্ত, দৃষ্টি প্রভৃতি করণের অন্তর্ভুক্ত। দুইটি নৃত্তকরণে এক নৃত্তমাতৃকা নিষ্পাদিত হয়। দুই, তিন বা চারি মাতৃকায় একটি অঙ্গহারের উৎপত্তি। অঙ্গহার—অঙ্গগণের অক্রটিতভাবে সমুচিত স্থান প্রাপণ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে ১০৮ করণ ও ৩২ অঙ্গহারের লক্ষণ দেওয়া আছে। পূর্ব্বরঙ্গ—রঙ্গে যাহা পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় তাহারই নাম পূর্ব্বরঙ্গ। সভাপতি, সভ্য, গায়ক, বাদক, নটী, নট প্রভৃতি যাহাতে পরস্পরের অনুরঞ্জন দ্বারা আনন্দলাভ করেন তাহাই রঙ্গ।

এই রঙ্গ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় বলিয়া পূর্ব্বরঙ্গ নামে খ্যাত—ইহাই ভাব-প্রকাশনকার শারদাতনয়ের মত। সাহিত্যদর্পণের মতে—নাট্যবস্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে রঙ্গবিঘ্ন শান্তির জন্য কুশীলবগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই পূর্ব্বরঙ্গ। অভিনবগুপ্ত সমাস ভাঙ্গিয়াছেন "পূর্ব্বো রঙ্গে"। নাট্যশাস্ত্রের মতে পূর্ব্বরঙ্গের ঊনবিংশতিটি অঙ্গ। উহার মধ্যে নয়টি যবনিকার অন্তরালে প্রযোজ্য—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত। দশটি যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য—গীতক, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত, প্ররোচনা। শারদাতনয় ২২টি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণ, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘট্টনা, মার্গাসারিত, শুষ্কাপকৃষ্টক, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, প্ররোচনা, ত্রিগত, আসারিত, গীত, ধ্রুবা, ত্রিসাম, রঙ্গদ্বার, বর্দ্ধমানক, চারি, মহাচারি। মোটের উপর প্রকৃত অভিনয়ের পূর্ব্বে নাট্যের অঙ্গভূত—গীত, তাল, বাদ্য, নৃত্ত, পাঠ্য প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমস্তভাবে যে প্রয়োগ করা হয় উহারই নাম পূর্ব্বরঙ্গ। এই পূর্ব্বরঙ্গ চারি প্রকার—চতুরস্র, ত্র্যস্র, চিত্র ও শুদ্ধ। মতান্তরে (কোহলাদির মতে) ইহা ত্রিবিধ—শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র। পূর্ব্বরঙ্গের গীতক বলিয়া যে অঙ্গটি আছে, উহা এক প্রকার গীতবিধি মাত্র। উহার বিষয় দেবতাগণের স্তুতিকীর্ত্তন। এই গীতক যদি অঙ্গচালন ব্যতীত প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে শুদ্ধ পূর্ব্বরঙ্গের প্রয়োগ হইতেছে বুঝিতে হইবে। আর উহাতে যদি নৃত্তের সংমিশ্রণ থাকে, তবে উহা হইবে চিত্র পূর্ব্বরঙ্গ। উদ্ধত পূর্ব্বরঙ্গে মহাদেবের আবিষ্কৃত করণাঙ্গহারের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আর সুকুমার পূর্ব্বরঙ্গে মহাদেবীর আবিষ্কৃত অনুদ্ধত অঙ্গহার যোজনীয়। অভিনবগুপ্ত স্পষ্টভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পার্ব্বতী যে সুকুমার প্রয়োগকর্ত্রী তাহা নাট্যশাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে (৪।২৫৭)। দশরূপককার বলেন যে, ভাবাশ্রয় নৃত্যে পদার্থাভিনয় বর্ত্তমান। উহা 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ। আর তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম 'দেশী'। নৃত্য ও নৃত্ত উভয়ই আবার দ্বিবিধ—মধুর ও উদ্ধত। মধুর প্রয়োগের নাম 'লাস্য' ও উদ্ধতের নাম 'তাণ্ডব'। শারদাতনয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। যাহা রসাত্মক তাহাই বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। যাহা ভাবাশ্রয় তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য ভাবাশ্রয়, নৃত্ত রসাশ্রয়। এ উভয়ই নাট্যের উপকারক।

শারদাতনয়ের মতে দৃশ্যকাব্য ত্রিশ প্রকার। তন্মধ্যে নাটকাদি দশটি রূপক রসাশ্রিত ও বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। অবশিষ্ট ডোম্বী প্রভৃতি বিংশতি রূপক ভাবাত্মক ও পদার্থাভিনয়প্রধান। অবশ্য

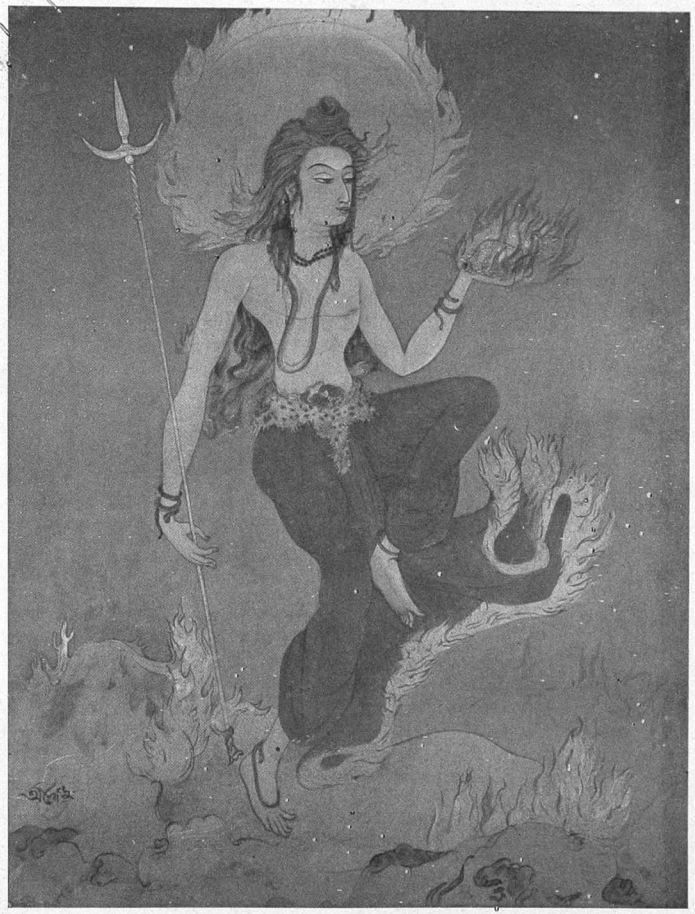

রাগ—দীপক

শিল্পী — শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দে



রাগ—দীপক

শিল্পী — শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দে

Blank page (s)

মহাদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হে দেবাধিদেব! অঙ্গহারের প্রয়োগ আপনিই শিক্ষা দিন।" তখন মহেশ্বর তণ্ডু (অর্থাৎ নন্দীকে) সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তুমি ভরতকে অঙ্গহারপ্রয়োগ শিক্ষা দাও।" তদনুসারে তণ্ডু ভরতমুনিকে নৃত্যশিক্ষা দিলেন। তণ্ডুর নিকট ভরত শিক্ষালাভ করিয়া পূর্ব্ব-রঙ্গের অঙ্গরূপে করণ-অঙ্গহার-রেচক-পিণ্ডীবন্ধসযুক্ত অপূর্ব্ব তাণ্ডব নৃত্য যোগ করিয়া দিলেন। তণ্ডু প্রথম এই নৃত্যের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া নটরাজের আবিষ্কৃত নৃত্যের নাম হইল 'তাণ্ডব' নৃত্য (৪); পরে ইহাতে ভগবতীর আবিষ্কৃত সুকুমার অঙ্গহার-সম্পন্ন 'লাস্য' নৃত্যও সংযোজিত হইয়াছিল। এইরূপে নৃত্ত, নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সংযোগে দেবলোকের অভিনয় ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল।

সমবকার ও ডিম—শব্দ দুইটি একটু অপরিচিত ঠেকিতে পারে। উহাদিগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ দৃশ্যকাব্যকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) রূপক, (২) উপরূপক। রূপক আবার দশবিধ—(১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) অঙ্ক (উৎসৃষ্টিকাঙ্ক), (৪) ব্যায়োগ, (৫) ভাণ, (৬) সমবকার, (৭) বীথী, (৮) প্রহসন, (৯) ডিম, (১০) ঈহামৃগ (৫)।

উপরূপক আবার অষ্টাদশ প্রকার। অবশ্য এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। এইটুকু মাত্র বক্তব্যই পর্য্যাপ্ত যে, সমবকার ও ডিম—দুই প্রকার দৃশ্যকাব্যমাত্র। ইহাদিগের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এখানে দেওয়া গেল।

এই সংখ্যাভেদ লইয়া মতান্তর আছে। কিন্তু শারদাতনয় স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত মত পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নটের কর্ম্ম নাট্য, আর নর্ত্তককর্ম্ম পদার্থাভিনয়। নটকর্ম্ম ও নর্ত্তককর্ম্ম—এ উভয়ই আবার নৃত্ত-নৃত্যভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় (নৃত্য) 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ ও তদ্রহিত (নৃত্ত) 'দেশী'। ডোম্বী, শ্রীগদিত প্রভৃতিতে পদার্থাভিনয়ের প্রাধান্য বলিয়া ঐ বিংশতি রূপককে 'নৃত্যে'র প্রকারভেদ বলা হইয়াছে। এই 'নৃত্যে'র স্বরূপ — গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গসমূহদ্বারা পদার্থাভিনয়। নাটকাদি রূপকসমূহে যে 'নৃত্ত' প্রযুক্ত হয় তাহার স্বরূপ—লয়তাল-সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপমাত্র। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপশূন্য যে অভিনয় তাহাই 'নাট্য'। মোটের উপর নৃত্ত নাট্যাশ্রিত, রসপ্রধান ব্যাপার; আর নৃত্য ভাবাভিনেয় ও নর্ত্তকাশ্রিত। নৃত্ত ও নৃত্য—উভয়ই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দ্বিবিধ। মধুর 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব' উদ্ধত। নট ও নর্ত্তক মিলিয়া রসভাব সমাযুক্ত যে অঙ্গচালন করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত, অঙ্গহার ও লয়গুলি যাহাতে ললিতভাবযুক্ত ও কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির যাহাতে প্রাধান্য—তাহাই লাস্য। আর যাহার করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত, বৃত্তি আরভটী—তাহাই তাণ্ডব। পূর্ব্বরঙ্গে এ উভয়েরই প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আবার অন্যত্র বলিতেছেন—নৃত্তই তাণ্ডব ও নৃত্য লাস্য। তালমান-লয়যুক্ত, উদ্ধত অঙ্গহারসহ যে অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র তাহাই তাণ্ডবনৃত্ত। আর অনুদ্ধত অঙ্গহারের নাম লাস্যনৃত্য। লাস্য চতুর্ব্বিধ—শৃঙ্খলা, লতা, পিণ্ডী, ভেণ্ডক। তাণ্ডব ত্রিবিধ—চণ্ড, প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড।

(৪) কোন কোন স্থলে 'তাণ্ড'-বা 'তাণ্ডিন্' পাঠ আছে। অভিনবগুপ্ত বলেন যে, 'তণ্ডু' শব্দই ঠিক। 'তণ্ডু' হইতেই তাণ্ডব শব্দের ব্যুৎপত্তি অনায়াসলভ্য (নাঃ শাঃ ৪।২৬৭-৮)

(৫) ইহা নাট্যশাস্ত্রের মত। দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতিও এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। গুণচন্দ্র ও রামচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণের মতে দ্বাদশরূপক—উক্ত দশ রূপক ব্যতীত নাটিকা ও প্রকরণীকেও তিনি রূপক মধ্যে গণনা করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য নাটিকার লক্ষণও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা নাটক ও প্রকরণের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ সংখ্যা ধরা হয় নাই। দশরূপকেও ইহারই অনুসরণ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা কেহই পৃথক্ উপরূপকের উল্লেখ করেন নাই। শারদাতনয় মোট ত্রিশ প্রকার রূপকের নাম করিয়াছেন। উপরূপক সংজ্ঞাটি তিনি ব্যবহার করেন নাই।

সমবকার — নানাবিধ বিষয় চারিদিকে ইতস্ততঃ সমবকীর্ণ হয় বলিয়া এই শ্রেণীর রূপকের নাম হইয়াছে 'সমবকার'। ইহা দশরূপকের টীকাকার ধনিকের মত। নাট্যদর্পণের মতে — সঙ্গত ও অবকীর্ণ অর্থ (প্রসিদ্ধ ত্রিবর্গোপায়) দ্বারা গ্রথিত দৃশ্যকাব্যই সমবকার (৬)। ইহার বস্তুভাগ অতি প্রসিদ্ধ দেবাসুর-যুদ্ধবীজমূলক হওয়া প্রয়োজন। নাটকাদি রূপকের মত ইহাতেও আমুখ (অর্থাৎ প্রস্তাবনা—prologue) সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও নির্বহণ—এই চারিটি সন্ধি ইহাতে থাকিবে কিন্তু বিমর্শ সন্ধি থাকিবে না (৭)। প্রখ্যাত উদাত্ত চরিত্র নায়ক দেব ও দানব মিলিয়া দ্বাদশটি (৮)। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ফললাভের উল্লেখ থাকিবে (যেমন, সমুদ্রমন্থনে নারায়ণের লক্ষ্মীলাভ, ইন্দ্রের ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রাপ্তি ইত্যাদি)। সমগ্র গ্রন্থখানির বিষয় অষ্টাদশ নাড়িকা পরিমিত সময়-নিষ্পাদ্য হওয়া উচিত (৯)। অঙ্ক মোট তিনটি। প্রথমাঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধিদ্বয় থাকিবে, ও উহা দ্বাদশনাড়ী পরিমিত হইবে। দ্বিতীয়াঙ্কে গর্ভ সন্ধি — উহা চারি নাড়িকা পরিমিত। তৃতীয়াঙ্কে নির্বহণ সন্ধি (উপসংহার)—উহার স্থিতিকাল দুই নাড়ী। ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তি যথাযোগ্য নিবেশিত হইবে; কিন্তু কৈশিকী বৃত্তির উপন্যাস থাকিবে খুব অল্প। বীররস হইবে অঙ্গী (প্রধান); রৌদ্ররসও প্রচুর পরিমাণে থাকিবে। অন্য রসগুলি অঙ্গরূপে অবস্থিতি করিবে। প্রতি অঙ্ক প্রহসনময় হওয়া প্রয়োজন। বীথী নামক রূপকের নৃত্যগীতবহুল ত্রয়োদশটি অঙ্গ আবশ্যকমত উপন্যস্ত হইবে। বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে না (১০)। সমবকারের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে গায়ত্রী, উষ্ণিক্ প্রভৃতি সাধারণতঃ

(৬) অর্থ — ত্রিবর্গোপায়। ত্রিবর্গ — ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(৭) প্রস্তাবনা, আমুখ — নাট্যশাস্ত্রমতে ইহা দ্বারা কাব্য প্রখ্যাপন হইয়া থাকে। নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক রূপকের যে অংশে সূত্রধারের (অর্থাৎ তৎসদৃশ গুণ ও আকৃতিবিশিষ্ট কাব্যস্থাপকের) সহিত আলাপ করিতে থাকেন, ও নিজ কার্য্যের বর্ণনাচ্ছলে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা প্রকৃত বস্তুসূচনা করিয়া দেন, তাহাই প্রস্তাবনা বা আমুখ। সন্ধি — Junctures of the plot—এক (পরম) প্রয়োজনে অন্বিত ভিন্ন ভিন্ন কথাংশের অবান্তর এক প্রয়োজনসম্বন্ধই সন্ধি। সন্ধি মোট পাঁচটি।

(৮) উদাত্ত—মানবের তুলনায় দেব ও দৈত্যগণ স্বভাবতঃ ধীরোদ্ধত হইলেও স্বজাতি মধ্যে যাঁহারা ধীরোদাত্ত তাঁহারাই নায়ক হইবার যোগ্য। দ্বাদশ—তিন অঙ্কে দ্বাদশ নায়ক; অতএব, প্রতি অঙ্কে চারজন নায়ক। তন্মধ্যে একজন মুখ্য নায়ক, একজন প্রতিনায়ক, আর দুইজন দুই নায়ক-প্রতিনায়কের সহায়।

(৯) নাড়ী, নাড়িকা, নালিকা — ইহার পরিমাণ লইয়া বহু মতভেদ আছে। নাট্যশাস্ত্রে একস্থানে পাওয়া যায় — নাড়িকা = মুহূর্ত্ত (২০।৬৮); আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, নাড়িকা = অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত (২০।৭২)। দশরূপকমতে — নাড়িকা = দুই ঘটিকা। সাহিত্যদর্পণেরও সেই মত। নাট্যদর্পণের মতে মুহূর্ত্ত = দুই ঘটিকা। ইহাতে 'নাড়িকা' শব্দের উল্লেখ নাই। তবে প্রথমাঙ্ক ছয় মুহূর্ত্ত, দ্বিতীয় দুই মুহূর্ত্ত ও তৃতীয় অঙ্ক এক মুহূর্ত্ত পরিমিত করার উপদেশ আছে। ইহাতে বোধ হয়, নাড়িকা = ঘটিকা = অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত। শারদাতনয়ের মতে নাড়িকা = এক মুহূর্ত্তের চতুর্থাংশ—"মুহূর্ত্তস্তু তুরীয়াংশো নাড়িকা ঘটিকাদ্বয়ম্" (পৃঃ ২৪৯)। প্রতাপরুদ্রের মতে—অঙ্কত্রয় যথাক্রমে তিন যাম, এক যাম ও অর্দ্ধ যাম পরিমিত। এ-সকল বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য। সাধারণ হিসাবে — এক যাম = এক প্রহর = তিন ঘণ্টা = সাড়ে সাত দণ্ড। এক মুহূর্ত্ত = ৪৮ মিনিট। এক দণ্ড = এক ঘটিকা = চব্বিশ মিনিট। এক নাড়িকা (যদি মুহূর্ত্তার্দ্ধ হয়) = চব্বিশ মিনিট।

(১০) রস — শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, (মতান্তরে) শান্ত ও বৎসল। প্রহসন শব্দটি এ-স্থলে স্বনাম প্রসিদ্ধ রূপককে বুঝাইতেছে না। ইহার অর্থ — হাস্যোদ্রেককর ঘটনা। বীথী — একাঙ্করূপক। পাত্র একটি অথবা দুইটি। নায়ক উত্তম, মধ্যম বা অধম প্রকৃতি-বিশিষ্ট। মুখ-নির্বহণ সন্ধি। শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য কিন্তু অপর সকল রসই থাকিবে। পাঁচটি অর্থপ্রকৃতিই ইহাতে থাকা উচিত। ইহার নৃত্যগীতবহুল ত্রয়োদশটি অঙ্গ — উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, অবস্যন্দিত বা অবস্পন্দিত,

অপ্রচলিত কুটিল ছন্দের বহুল প্রয়োগ থাকিবে। মতান্তরে — স্রগ্ধরা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বৃহদ্বক্ষর ছন্দের সন্নিবেশ কর্ত্তব্য; গায়ত্রী প্রভৃতির নহে। গায়ত্রী প্রভৃতির প্রয়োগ থাকিবে কি না — এ-সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাঠান্তর নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন্ পাঠটি গ্রহণীয়, তাহা বলা বড় কঠিন। আর থাকিবে তিন প্রকারের শৃঙ্গার, বিদ্রব ও কপট। এ স্থলে একটি প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কামোপভোগবহুলা কৈশিকী বৃত্তির স্থান সমবকারে প্রায় নাই বলিলেও চলে। অথচ এ স্থলে বলা হইতেছে যে, উহাতে ত্রিবিধ শৃঙ্গার থাকিবে। এ পূর্ব্বাপর-বিরোধের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? নাট্যদর্পণে ইহার অতি সুন্দর সমাধান দেওয়া হইয়াছে। শৃঙ্গার বলিলে মাত্র কামকেই শুধু বুঝায় না। শৃঙ্গারের অর্থ বিলাসোৎকর্ষ। 'বিলাস' শব্দের মোটামুটি অর্থ শোভা। অবস্থিতি, উপবেশন, গমন, হস্তভ্রূনেত্রাদি কর্ম্মের বিশেষ ভাবের নাম বিলাস। ইহা নায়িকার স্বভাবজ অলঙ্কার। অথবা ধীরা দৃষ্টি, বিচিত্রা গতি ও সস্মিত বাক্যের নাম বিলাস। ইহা সাত্ত্বিক নায়কের গুণ। অতএব, সমবকারে শৃঙ্গার থাকিলেও কৈশিকী বৃত্তি অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান। ত্রি শৃঙ্গার, ত্রিবিদ্রব ও ত্রিকপট—শব্দগুলি পারিভাষিক। ইহাদিগের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ত্রি-শৃঙ্গার—(১) ধর্ম্মশৃঙ্গার, (২) অর্থশৃঙ্গার, (৩) কামশৃঙ্গার। ধর্ম্মশৃঙ্গার—ধর্ম্মই ইহার হেতু ও ফল। যে স্থলে অভিলাষের মূল ধর্ম্মে পর্য্যবসিত, যাহার দ্বারা সংসারের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়, অর্থাৎ যে স্থলে কাম ব্রত-নিয়ম-তপস্যার দ্বারা সংযত, গুণবান্ অপত্যোৎপাদন যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ও' ইন্দ্রিয়সুখ যে স্থলে আনুষঙ্গিক ফল, তাহাই ধর্ম্মশৃঙ্গার মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। ধর্ম্মপত্নী-সংযোগই এ স্থলে শৃঙ্গার শব্দের অর্থ। এই রূপ মনোমত ধর্ম্মপত্নীলাভের হেতু দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠান। পরদারবর্জ্জন-রূপ ধর্ম্ম ইহার ফল। শারদাতনয় ধর্ম্মশৃঙ্গারের পাঠান্তর ধরিয়াছেন—ভোগ-শৃঙ্গার। অর্থ-শৃঙ্গার—অর্থই ইহার হেতু ও ফল। যে স্থলে অর্থের ইচ্ছাবশে বহুপ্রকারে কামোপভোগ সম্ভব হয়, অর্থাৎ যে স্থলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফলে রাজ্য, সুবর্ণাদি ধন, শস্য, বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ বিভবভোগ-সুখের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাই অর্থ-শৃঙ্গার। বেশ্যাদিতে বিটাদি পুরুষগণ যে আসক্ত থাকে, অর্থই তাহার হেতু। সাধারণতঃ পণ্যাঙ্গনাগণ যে পুরুষানুরক্ত হয় তাহার ফল অর্থপ্রাপ্তি। অর্থ বলিতে প্রার্থনীয় পরোপকার প্রতিজ্ঞাপালন প্রভৃতি—এরূপ অর্থও নাট্যদর্পণে দৃষ্ট হয়। পরোপকারার্থ বিবাহাদি অর্থ-শৃঙ্গার মধ্যে গণ্য। কামশৃঙ্গার—"শৃঙ্গার" ও "কাম" শব্দের অর্থ (১) রতি ও (২) তদ্ধেতুক স্ত্রী-পুরুষাদি। কামই যাহার হেতু ও ফল তাহাই কামশৃঙ্গার। রতিরূপ কাম স্ত্রী-পুরুষাদির রূপ শৃঙ্গারের হেতু। আবার স্ত্রী-পুরুষাদিরূপ কাম রতিরূপ শৃঙ্গারের হেতু। এ স্থলে পরকীয়া বা কন্যা

অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, নালিকা, বাক্কেলি, অধিবল, ছল, ব্যাহার, মৃদব, ত্রিগত ও গণ্ড। অর্থপ্রকৃতি = প্রয়োজন-সিদ্ধিহেতু। সংখ্যায় পাঁচটি — বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য। বিন্দু — কাব্য সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যদি অবান্তর বিষয়ের (digression) দ্বারা প্রয়োজনের বিচ্ছেদ হয়, তবে বিন্দুই পুনরায় উহার অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করে। প্রবেশক — একপ্রকার অর্থোপক্ষেপক। অর্থোপক্ষেপক পাঁচটি — বিষ্কম্ভ, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ। বিষ্কম্ভ — অতীত ও ভবিষ্যৎ কথাংশের সংযোজক রূপকের অংশবিশেষ। নীরস অথচ সপ্রয়োজন ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রথমাঙ্কের আদিতে অথবা অঙ্কদ্বয় মধ্যে উপন্যস্ত হইয়া থাকে। একটি মধ্যমপাত্র বা মধ্যমপাত্রদ্বয় কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে ইহা শুদ্ধরূপে পরিগণিত হয়, আর নীচ ও মধ্যম পাত্রদ্বারা প্রযুক্ত হইলে সঙ্কীর্ণ আখ্যা লাভ করে। প্রবেশক — interlude ইহাও অনেকটা বিষ্কম্ভকের মত। কেবল অঙ্কের আদিতে প্রযোজ্য নহে। অঙ্কদ্বয় মধ্যে ইহার নিবেশ কর্ত্তব্য। কেবল নীচপাত্র দ্বারাই ইহা প্রযুক্ত হয়। অতএব, প্রাকৃত ভাষাতেই প্রবেশক নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

নায়িকা; বেশ্যা বা ধর্ম্মপত্নী নহে। অবৈধ অভিরতি, কন্যাবিলোভন, দ্যূত, সুরাপান, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসন কামশৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যদর্পণে 'কামশৃঙ্গার' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে প্রহসন-শৃঙ্গার। এ অর্থ নাট্যশাস্ত্রাদিতে উক্ত হয় নাই। নাট্যদর্পণে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ইন্দ্র ও অহল্যা সংবাদ। তবে এই প্রসঙ্গে প্রহসন (হাস্যোদ্রেককর ব্যাপার) সন্নিবেশ করিবার রীতি সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে। এক একটি শৃঙ্গার এক এক অঙ্কে নিবেশনীয়। সাহিত্যদর্পণ ও নাট্যদর্পণের মতে কামশৃঙ্গার প্রথমাঙ্কেই প্রদর্শনীয়। অবশিষ্ট দুইটির সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

ত্রিবিদ্রব—বিদ্রব শব্দের অর্থ অনর্থ। যাহা হইতে ভয় পাইয়া লোক বিদ্রুত হয় (অর্থাৎ পলায়ন করে) তাহাই বিদ্রব। বিদ্রব নামে গর্ভ সন্ধির একটি অঙ্গ আছে। শঙ্কা-ভয়-ত্রাসকৃত সম্ভ্রমই বিদ্রব। দশরূপক ও ভাবপ্রকাশন উহা বিমর্শ সন্ধির অঙ্গ বলিয়া ধরিয়াছেন। বন্ধন, বধ প্রভৃতি এই বিদ্রবের স্বরূপ। নাট্যশাস্ত্রের মতে ত্রিবিধ বিদ্রব—(১) যুদ্ধজল-সম্ভূত, (২) বায়ু, অগ্নি, গজেন্দ্র প্রভৃতি সম্ভূত, (৩) নগরোপরোধজনিত। দশরূপকেও অনেকটা এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—নগরোপরোধ, যুদ্ধ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিদ্রব মধ্যে গণ্য। শারদাতনয় নাট্যশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। নাট্যদর্পণের মতে ত্রিবিদ্রব, যথা—(১) জীবজ (যেমন হস্তী প্রভৃতি হইতে), (২) অজীবজ (যেমন শস্ত্রাদি হইতে), (৩) জীবাজীবজ (যেমন নগরোপরোধ হইতে)। নগরোপরোধ প্রভৃতিতে চেতন ও অচেতন উভয়কৃত বিদ্রবই বর্ত্তমান। সাহিত্যদর্পণে ত্রিবিদ্রব লক্ষণ এইরূপই প্রদত্ত হইয়াছে—(১) অচেতন কৃত, (২) চেতনকৃত, (৩) চেতনাচেতন কৃত। কেবল চেতনাচেতনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—গঙ্গাদি। অবশ্য চেতনাচেতনের ব্যাখ্যা নাট্যদর্পণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা সাহিত্যদর্পণের বিবরণ অপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এই ত্রিবিধ বিদ্রবের মধ্যে এক এক প্রকার বিদ্রব এক একটি অঙ্কে প্রদর্শনীয়।

ত্রিকপট—শারদাতনয়ের মতে কপটের স্বরূপ মোহাত্মক ভ্রম। নাট্যদর্পণে ইহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। যাহা মিথ্যাকল্পিত, অথচ আপাতদৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় তাহাই কপট। নাট্যশাস্ত্রের মতে ত্রিকপট, যথা—(১) গতিক্রমবিহিত (অর্থাৎ বস্তুর স্বভাবজনিত), (২) দৈববিহিত, (৩) শক্রকৃত। কপটের দ্বারা সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দশরূপক মতে ত্রিকপট, যথা—(১) বস্তুস্বভাব কপট—ক্রূরপ্রকৃতির প্রাণী হইতে ইহার উৎপত্তি, (২) দৈবিক কপট—অগ্নি, বৃষ্টি, বাত্যা প্রভৃতি সম্ভূত, (৩) শক্রজ—সংগ্রামাদিজনিত। শারদাতনয়ও ঐরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। তবে তিনি এ সম্বন্ধে মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের মতে ত্রিকপট, যথা—(১) স্বাভাবিক, (২) কৃত্রিম, (৩) দৈবজ। নাট্যদর্পণে ত্রিকপটের একটু নূতন ধরণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। (১) বঞ্চাসম্ভূত কপট—যাহাকে বঞ্চনা করা হইতেছে তাহার যদি অপরাধ থাকে, তবে বঞ্চ্যোথ কপট হইবে; (২) বঞ্চকসম্ভূত—যদি বঞ্চনীয় ব্যক্তি নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে বঞ্চকোথ কপট হইয়া থাকে; (৩) দৈবসম্ভূত—যে স্থলে বঞ্চিত ও বঞ্চক উভয়েই নিরপরাধ, কেবল কাকতালীয়-ন্যায়ে একপক্ষ বঞ্চিত ও অপরপক্ষ বঞ্চকরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই দৈবোথ কপট।

বিদ্রব ও কপটের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কপটের দ্বারা জীবিত অবস্থায় বন্দীকরণ বা মোহ (প্রতারণা) সম্ভব হয়; আর বিদ্রব হইতেছে বন্দী বা প্রতারিত হইবার ভয়ে পলায়ন।

ত্রিশৃঙ্গার, ত্রিবিদ্রব ও ত্রিকপটের তিন তিনটি ভেদের এক একটি ভেদ এক এক অঙ্কে নিবেশনীয়—ইহা ত' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে কপট হইতেছে উপায়; বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই বিদ্রব বা পলায়ন; আর শৃঙ্গার হইল ফল।

অতএব, সমবকারে সংক্ষিপ্ত সহায্য ত্রিবিধ শৃঙ্গার, বিদ্রব, কপট থাকা প্রয়োজন। দেবাসুর-শক্রতাজনিত

যুদ্ধই ইহার মূল বস্তুভাগ। অলৌকিক নানাবিধ ঘটনার দ্বারা এই মূল বস্তুর পরিপুষ্টি-সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলেই রূপকখানি সদ্বদয় দর্শকসমাজের সন্তোষজননে সমর্থ হইয়া থাকে। নাট্যশাস্ত্রে ও ভাবপ্রকাশনে ইহার উদাহরণ স্বরূপ 'অমৃতমন্থনে'র নাম করা হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার 'সমুদ্রমথন' বলিতে বোধ হয় ইহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

সমবকারের ন্যায় ডিমও একপ্রকার রূপক। ইহার বর্ণনীয় বস্তু বা ইতিবৃত্ত অতি প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, মহোরগ, অসুর, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সকল জাতীয় পুরুষই ইহার নায়ক। নায়কের সংখ্যা ইহাতে ন্যূনাধিক ষোড়শ—সকলেই প্রখ্যাত ও উদাত্তচরিত্র—মতান্তরে ধীরোদ্ধত (অর্থাৎ মানুষ অপেক্ষা ইঁহারা উদ্ধত হইলেও স্বজাতির তুলনায় উদাত্তই বটেন)। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গাররসবর্জ্জিত। নাট্যদর্পণের মতে করুণ রসও ইহাতে বর্জ্জনীয়। রৌদ্র রসই অঙ্গী; অপর রসগুলি অঙ্গ হইলেও বেশ দীপ্তভাবেই থাকিবে। অঙ্ক চারিটি। সন্ধিও চারিটি। বিমর্শ সন্ধি ইহাতে নাই। শারদাতনয়ের মতে ইহাতে বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকিবে। সাহিত্যদর্পণের মতে থাকিবে না। নাট্যদর্পণের মতে ইহাতে চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ নামক তিনটি অর্থোপক্ষেপকের নিবেশ করিতে হইবে (১১)। নির্ঘাত, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, উল্কাপাত, বাহু ও অস্ত্রযুদ্ধ, বাহ্বাস্ফোট, মায়া, ইন্দ্রজাল, উদ্ভ্রান্ত চেষ্টা, বহু পুরুষের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা ইহাতে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব, রচনামধ্যে সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তির বাহুল্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতী বৃত্তির প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শৃঙ্গাররসবর্জ্জিত বলিয়া ডিমে কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহার নাই (১২)।

"অমৃতমন্থন সমবকার" ও "ত্রিপুরদাহ ডিম"—এই দুইখানি রূপকই স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মার রচনা—ইহা নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানির একখানিও বর্ত্তমানে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। শারদাতনয় আর দুইখানি ডিমের নাম করিয়াছেন—"বৃত্রোদ্ধরণ" ও "তারকোদ্ধরণ"। এই দুইখানির রচয়িতা কে, তাহার উল্লেখ শারদাতনয় করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, দুইখানি ডিমই অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(১১) যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্র কর্ত্তৃক বিষয়ের সূচনার নাম চূলিকা। যে স্থলে রঙ্গমঞ্চে কেহ উপস্থিত থাকে না, কেবল নেপথ্যস্থিত পাত্রের দ্বারা অভিনেয় বিষয়ের সূচনা করা হয়, তাহারই নাম চূলিকা (চূড়া); ইহা অভিনেয় অর্থের শিখাস্থানীয়। একটি অঙ্কের শেষে সেই অঙ্কের কথাংশবিচ্ছেদ না করিয়া যদি নূতন অঙ্ক আরম্ভ করা যায়, তবে তাহাকে অঙ্কাবতার বলে। সমাপ্ত অঙ্ক ও আরম্ভনীয় অঙ্কের মধ্যে বিষয়গত ব্যবধান থাকিলেই বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের দ্বারা অঙ্কদ্বয়ের সংযোগ করা প্রয়োজন হয়। অঙ্কাবতারে বিষ্কম্ভক বা প্রবেশকের দ্বারা অর্থ-সূচনার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে পূর্ব্বাঙ্কের পাত্রগুলি দ্বারাই পরবর্ত্তী অঙ্কের প্রারম্ভ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পূর্ব্বাঙ্কের অবসানোক্ত কথাংশ ও পরবর্ত্তী অঙ্কের প্রারম্ভস্থিত কথাংশ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। (মতান্তরে) যে অঙ্কে অঙ্গ অঙ্কের বীজভূত অর্থের অবতারণা করা হয় তাহাই অঙ্কাবতার। অঙ্কের বিশ্লিষ্টমুখ পূর্ব্ব হইতেই যথায় সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে তাহাই অঙ্কমুখ। ইহা নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণ। সাহিত্যদর্পণের মতে—যদি একটি অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে নানা অঙ্কের ও ভাবী ভূমিকাগুলির সূচনা করা হয়, তবে, তাহাই বীজার্থব্যাপক অঙ্কমুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দশরূপকাদিতে অঙ্কাস্য নামে একটি অর্থোপক্ষেপকের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বাঙ্কের অন্তে পাত্রপ্রবেশ করায় কথার্থবিচ্ছেদ হইলে যদি উত্তরাঙ্কের সূচনা ঐ নবপ্রবিষ্ট পাত্রের দ্বারা করা হয়, তাহা হইলে অঙ্কাস্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

(১২) বৃত্তিসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। উদয়ন—শ্রাবণ, ১৩৪০, পৃঃ ৩৭৭ ও অগ্রহায়ণ, ১৩৪০, পৃঃ ৯৬০-৯৬১ দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমানে মহাকবি ভাসের (যিনি কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী) রচিত একখানি অতি সুপাঠ্য সমবকার পাওয়া গিয়াছে উহার নাম "পঞ্চরাত্র"। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বীয় উত্তরগোগৃহের ঘটনা অবলম্বনে উহা রচিত। কিন্তু মহাকবি রূপকমধ্যে বহু নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৎসরাজ নামে একজন কবি "অমৃতমন্থন" নামে একখানি সমবকার ও "ত্রিপুরদাহ" নামে একখানি ডিম নূতন করিয়া রচনা করিয়াছেন। পিতামহরচিত রূপক দুইখানির সহিত এই অভিনব রূপক দুইখানির নামের মিল আছে। কবি বৎসরাজ ছিলেন কলিঞ্জরপতি পরমর্দ্দিদেবের (খ্রীঃ দ্বাদশশতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত) অমাত্য। গ্রন্থ দুইখানি সম্প্রতি বরোদার "গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সংস্কৃত গ্রন্থমালায়" "রূপক-ষট্‌কম্" (৮নং) নামক গ্রন্থমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। ভাসের পঞ্চরাত্রও ত্রিবান্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন।

আগমনী

শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য, এম্-এ

ভুবন ভরিয়া গেল, বনানী ভরিয়া গেল গানে,
কে এলোরে, কে এলোরে, কে অতিথি এলো আজ ঘরে।
শরতের শুক্লা রাতে যৌবন নেমেছে আজ স্নানে—
সিক্তকেশে মুক্তা-দ্যুতি শিহরিছে কৌতুকের ভরে!
পাদস্পর্শে প্রস্ফুটিত গৃহাঙ্গনে শত শতদল,
সায়রে নাচিল নীর, নীল ঢেউ করে টলমল,
তট-তনু রোমাঞ্চিত, তৃণে তৃণে লাগে শিহরণ,
গগনে পবনে ঝরে উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত প্লাবন।
আকাশ ভরিয়া গেল, নীলিমা ভরিয়া গেল স্রোতে—
আলোকের নির্ঝরের অপরূপ অমৃত বরণে;
সুধা-ধারা ঝ'রে পড়ে সৌন্দর্য্যের উৎসমুখ হ'তে,
কবি-প্রাণ স্নিগ্ধ হ'ল নীল মেঘে প্রশান্ত গগনে।

আকাশের বুক বেয়ে লঘুপক্ষ মেঘের ভেলায়
এলো কি শারদ-লক্ষ্মী, আনন্দিতা, অনিন্দ্য-লীলায়!



বাড় ও বৃষ্টি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ

গঙ্গার একেবারে ধার হইতে চারতলা বাড়ী উঠিয়াছে, পশ্চিমের পাথরের কাজ।

চারতলার যে ঘর, তারই চারিদিকের জানালা খুলিয়া দিয়া নিশীথ আজ বর্ষা-উৎসব করিতে বসিয়াছে। নিশীথের কয়েকটী বন্ধু আসিয়াছে, বারকোশ-জাতীয় একটা বৃহৎ থালায় তেল-নুণ-মাখা মুড়ি আসিয়াছে, চিঁড়েভাজা, বেগুনী, পেঁয়াজী, কাঁচালঙ্কা আসিয়াছে—আয়োজনের ত্রুটি নাই।

আকাশ ঘিরিয়া সজল কাজল মেঘ, বর্ষার গঙ্গা কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত, ওপারে সারা বৎসর যে চড়া জাগিয়া থাকে আজ তার চিহ্ন নাই, খেয়া নৌকারও দেখা মিলিতেছে না, বজরার শ্রেণী, জনারের শ্রেণী ছাপাইয়া জল চলিয়া গেছে, আরো দূরে গ্রামের আভাষ দেখা যায়, তারও ওধারে অরণ্য—তারপর পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পাহাড় ধরিত্রীর তরঙ্গমালার মত।

অনাথের ছোট মেয়ে যখন গান ধরিয়াছে—

বাদল রুমুঝুমু
মাদল বাজে—

তখন আবার বৃষ্টি সুরু হইয়াছে—গঙ্গার গৈরিক বুকে, ওপারে শ্যাম-বন-প্রান্তরে। ঢেউখেলানো পাহাড় তখন আর দেখা যায় না, ছোট গ্রামখানিও আর চোখে পড়ে না।

তাকিয়াটাকে কাছে টানিয়া নিশীথ সুরু করিল—আমার ভালো লাগে—আজ ব'লে নয়, যখন কিছুই বুঝতাম না,—সেই খুব ছোট বেলা থেকে,—কি বলছি তোরা বুঝতে পাচ্ছিস্ ত'? এই বৃষ্টি-ধারার ছন্দ—

রম ঝম্ রম ঝম্
ঝম্ রম রম ঝম্—

এ যেন মানুষের গলায় সকল গানের চেয়েও মধুর—এ যেন indescribable!

সুহৃৎ বলিল, যখন বাঙ্‌লা বলছিস্ বাঙ্‌লাই বল্ না, বর্ষা-বর্ণনার মাঝখানে আবার বিদেশী বুকনীর কি দরকার?

নিশীথ বলিল, ঠিক বলেছিস্, I withdraw। কিন্তু ঠিক ক'রে বল দেখি, এদেশে নতুন বর্ষা এলে আমাদের কি সুদূর বাঙ্‌লা দেশের কথা মনে পড়ে না, যেখানে বর্ষা আরো মনোরম আরো মনোহর—

অনাথ বলিল—কাদা প্যাচ-প্যাচ্‌টা বাদ দিয়ে এবং কলকাতা সহরের কেরাণীদের আফিস-যাত্রা-সমস্যা বাদ দিয়ে—certainly।

নিশীথ কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল—নাঃ, তোরা নেহাৎ অ কবি—আমার কিন্তু আজ নাচতে ইচ্ছে করছে—তা তা থৈ থৈ—শিব-তাণ্ডব নৃত্য—

বৃন্দাবন চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল, হঠাৎ ভয় পাইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, রক্ষে করো দাদা, ঐ মোটা দেহ নিয়ে—আগে আমরা নেবে যাই আর তুমি life insure ক'রে এসো—

তার কথায় ও ভঙ্গীতে ছোট মেয়ে অমলা অবধি না হাসিয়া পারিল না।

এই সময়ে বারান্দায় ছর্‌র্ ছর্‌র্ আওয়াজ পাইয়া সকলেই বাহিরে আসিয়া দেখিল নিশীথের ময়ূরটা তার বিচিত্র পেখম্ মেলিয়া দিয়া আকাশের দিকে যেন তার আনন্দ-নিবেদন পাঠাইয়া দিতেছে, সেই ছর্‌র্ ছর্‌র্ শব্দ যেন কয়েকটা নূপুরের ধ্বনি, সেই নীল শ্যামলের বাহার যেন কালিদাসের একটুকরা কাব্য। সকলেই মুগ্ধ চোখে দেখিতে লাগিল।

গঙ্গার স্রোত তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, মেঘের পরে মেঘ জমিয়া আসিতেছে।

সুহৃৎ সুর তুলিল—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয়—

বৃন্দাবন তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া ফরাসে বসাইয়া দিয়া বলিল, কান গেল রে তোর বেসুরো চীৎকারে—নাঃ, আজ দেখছি শেষ পর্য্যন্ত নিশীথের বাড়ীর খিচুড়ীটা খাওয়া কপালে নেই!

হাসি-উচ্ছ্বাস গল্প-গুজবে অন্ধকার সকালটা বেশ কাটিয়া গেল। বাড়ীর নীচে গঙ্গায় স্নান সারিয়া দ্বিতলের বড়-ঘরে সকলে খাইতে বসিল। নিশীথের স্ত্রী মুকুল নিজে রান্না করিয়াছে ঠাকুর থাকিতেও, এবং নিজেই পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইল।

দিনটা সুন্দর সুরু হইয়াছিল, কিন্তু সুন্দর শেষ হইল না।

সকলে চলিয়া গেছে। বর্ষণ-ক্লান্ত দীর্ঘ দিবসের শেষে পশ্চিমের আকাশের অন্তরাগের ঝলমল শোভা, জলচিক্কণ দূরপল্লবচ্ছায়ায় নূতনের দীপ্তি আনিয়াছে, ধ্যানমৌন দৃষ্টি মেলিয়া নিশীথ যখন তাই দেখিতেছিল, হঠাৎ তার স্ত্রীর করুণ আর্ত্তনাদ কানে গিয়া বাজিল। ছুটিয়া নীচে আসিয়া দেখিল পিছল উঠানে চলিতে গিয়া সে পড়িয়াছে এবং রীতিমত আহত হইয়াছে।

বর্ষার জলস্রোত সারাদিন ধরিয়া এইখান দিয়া বহিয়া গেছে।

তখন প্রকৃতির উপরে রাগ করিবার সময় নাই, ভাবিবারও সময় নাই, মুকুলকে তুলিয়া ধরিয়া সে উপরে লইয়া গেল এবং ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিতে ছুটিল।

বাঁ-পাটা বিষম মচ্‌কাইয়া গেছে।

সাতদিনের চিকিৎসায়ও কোনো ফল হইল না, ব্যথা ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল।

অগত্যা নিশীথ একদিন এক টাঙ্গা ভাড়া করিয়া সহরের বাহিরে যে জেনানা হাসপাতাল আছে, সেখানে মুকুলকে দেখাইতে চলিল।

আউটডোরে দেখিয়াই মেয়ে-ডাক্তার মত প্রকাশ করিল case serious, হাসপাতালে রাখতেই হবে, free ward-এই রাখো, cabin নিয়েই থাকো।

অগত্যা পর্দ্দা-ওয়ার্ডে রাখাই ঠিক হইল। চারিধারে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল, অসূর্য্যম্পশ্যা মেয়েরাই patient, সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। ডাক্তারকে অনেক বলিয়া-কহিয়া নিশীথ একটা সম্পূর্ণ আলাদা কটেজ ভাড়া লইল, যেখানে সে-ও থাকিতে পারে, তবে নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া সে বাহিরে আসিতে পারিবে না। দিনে মাত্র দু'বার, যখন চারিদিকের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন প্রয়োজন হইলে সে কটেজ হইতে বাহির হইয়া হস্পিট্যালের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

কড়া ব্যবস্থা। তার ওয়ার্ডের নম্বর চার।

রাণীগঞ্জের টালি ঢাকা প্রকাণ্ড একটা ঘর, দু'খানা স্প্রীং-এর খাট, একটা আল্‌না, একটা টেবিল, দু'খানা চেয়ার, একটা দেয়াল-আলমারী ও আয়না—এই আসবাব।

ঐ ঘরেরই সঙ্গে সংযুক্ত বাথরুম।

ঘরের সামনে খানিকটা বারান্দা, তার পর ছোট্ট একটুখানি প্রাঙ্গণ শ্যামল ঘাসে ঢাকা, কোণে রান্নাঘর।

বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি জিনিসপত্রে চারিধার আচ্ছন্ন করিয়া নিশীথ যেন নূতন সংসার পাতিয়া বসিল।

সুভদ্রা বলিয়া একটি উড়িয়া মেয়েকে রান্নার কাজের জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল, সে তোলা-উনুনে কয়লা চাপাইয়া ধরাইতে বসিল।

দু'টি নার্স আসিয়া বিছানা করিয়া দিয়া গেল, মেট্রন—সে ইয়োরোপীয়ান, আবশ্যকীয় কি কি দিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেল।

ঠিক আটটার সময় ডক্টর তারাবাঈ, মারাঠী মহিলা — নিজে আসিয়া রোগী দেখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, ভয়ের কিছু নাই।

তারাবাঈ-এর বয়স হইয়াছে, বিলাত-প্রত্যাগতা—তাঁর কোয়ার্টার্স একেবারে ওধারে। মোটা মাহিনা পান।

হিন্দীতে অত্যন্ত মিষ্টি করিয়া patient-এর সঙ্গে কথা বলিলেন। আর বলিলেন—তুমারী আদ্‌মি যব হিঁয়াপর হ্যায়, তব তো শোচনেকা ঔর কুচ্ নেহি হ্যায়—অর্থাৎ তোমার স্বামী কাছে আছে, ভাবনা কি?

সারাদিন ধরিয়া নার্সদের খবরদারী, ওষুধ খাওয়ানো, মাসাজিং, মালিশ···রুবি, জেন, শেলি, সোফিয়া, মিনেসিস্, পিয়ারা, কমলা প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কুড়িটি নার্স। বয়স সকলকারই কম, বেশী হইয়া গেলে অন্যত্র বদ্‌লি করিয়া দেওয়া হয় এবং হয় ত' সৌন্দর্য্য না হোক লালিত্য ও শ্রী দেখিয়া নির্ব্বাচন করা হয়, যেন তাহাদের দেখিয়া রোগিনীদের মন প্রসন্নতায় ভরিয়া ওঠে।

সহানুভূতিতে ভরা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, মারাঠিদের মত আঁটসাঁট কাপড় পরিবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী, সাম্‌নে অ্যাপ্রন ঝুলাইয়া মাথায় একটা রুমাল বাঁধিয়া অনাবৃত দুই বাহু মেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার সহজ প্রবৃত্তি, সব কিছু মিলিয়া শুশ্রূষা যেন মূর্ত্তিমতী!

—আপ্ ক্যায়সা হ্যায়, বলিয়া বিছানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন দিনের মধ্যে অসংখ্য বার, মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, পাশে বসিয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে গল্প বলা,— প্রথম দিন হইতেই সুরু হইল।

পিছনের জান্‌লা দিয়া দেখা যায় যে প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বটগাছ, তার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় অসংখ্য পাখীর ডাক, তার ওপারে ধোবী ও জমাদারদের ঘর,— একটা সুস্থ জগতের সাড়া পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলায় এদিকটা কেহ নাই, খালি গায়ে নিশীথ তার বিছানায় শুইয়াছিল। মুকুলও চুপ করিয়া শুইয়া কি ভাবিতেছে, টেবিল-ফ্যানটার একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, সুভদ্রা রান্নাঘরে রুটি বেলিতে ব্যস্ত—এমনি সময় সুইচ্ টিপিয়া মেট্রন বলিল, গুড ইভ্‌নিং মিষ্টার ভট্টাচারিয়া।

উজ্জ্বল আলোকে এক মেমের সাম্‌নে আপনার অর্দ্ধ-নগ্নতায় নিশীথ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল এবং বিছানার চাদরটা খপ্ করিয়া তুলিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, ইয়েস্—গুড ইভনিং।

মেট্রন বলিল, You don't feel any inconvenience, I suppose।

নিশীথ জোর দিয়া বলিল — না-থিং।

তারপর মেট্রন মুকুলের কপালের উপর হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ক্যায়সা হ্যায়!

— আচ্ছা ত' মালুম্ হোতা হ্যায়, লেকিন্ গোড়কা দরদ্ ত' ঐসি হ্যায়—

— কম্ হো যায়গা— মচ্ছড় লাগ্‌তা হ্যায়?

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের দিকে ফিরিয়া বলিল — I say I may arrange for a mosquito-curtain if you feel the necessity for it.

ইতিমধ্যেই মশার ভণ্‌ভনানি সুরু হইয়াছে, পাখার বাতাসের জন্য সুবিধা করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু মশারী খাটাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া নিশীথ ও-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। এরা আবার বলিয়াছে ঘরে পেরেক মারা যাইবে না।

কাজেই জানিতে চাহিল, মশারী ত' তাহারও আছে, টাঙাইবার বন্দোবস্ত কি করা যায়। মেট্রন বলিল সেজন্য ভাবিবার দরকার নাই। 'সিতারা, সিতারা বলিয়া ডাক দিতে একটি ঝি আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে বলিয়া দিল আটটা বাঁশ আনিতে আর সুধাকে ডাকিয়া দিতে।

সুধা এবং মেট্রন এবং ঝি তিনজনে মিলিয়া X-এর মত করিয়া বাঁশ লাগাইয়া সুন্দর মশারী খাটাইয়া দিল, না হইল দড়ির দরকার না পেরেকের।

শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া মেট্রন চলিয়া গেল। সুধা একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, রাত্তের ডিউটি তার।

সুধা—সুধা নামটি বাঙ্গালীজনোচিত, চেহারা যেন ভাটিয়া মেয়েদের মত।

মুকুল বলিল, সমুচা রাত আপকী ডিউটি?

সুধা জবাব দিল—হ্যাঁ, সারা রাত, আর বলেন কেন, এ সপ্তাহটা এমনি যাবে তারপর ডে-ডিউটি।

নিশীথ বলিল—আপনি ত' বেশ বাংলা বলেন!

কলহাস্য করিয়া সুধা জবাব দিল—আমি যে বাঙ্গালীর মেয়ে, মাতৃভাষা বলব তাতে ..... আপনি কি ভেবেছিলেন?

—আমি ভেবেছিলাম সবাই যেখানে অ-বাঙালী—

বাধা দিয়া সুধা বলিল—হ্যাঁ, আমি একলাই শুধু বাঙালী আছি এখানে।

তারপর মুকুলের বিছানার একপাশে বসিয়া সে অনেক কথাই বলিল, কোথায় কতদূর শীতললক্ষ্যার ধারে তার দেশ, পয়সার জন্য কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তার বাপ-মা, ভাই-বোন সকলে আছে অথচ...

হয়ত একটু প্রেমের কাহিনী প্রচ্ছন্ন ছিল,—নিশীথের সন্দেহ হয়।

থুল্লামা—মাদ্রাজী নার্স—আসিয়া সুধাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, একজন রোগীর না-কি কি হইয়াছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত একটু বেশী হইয়াছে, বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ, নিশীথ অনুচ্চকণ্ঠে মুকুলের সঙ্গে গল্প করিতেছিল,—সুধা দরজার কাছে আসিয়া আদেশের স্বরে বলিল, ওঁকে এবার ঘুমোতে দিন্—অসুস্থ শরীর—

অপ্রস্তুত হইয়া নিশীথ চুপ করিল।

সকালবেলা সিতারা আসিয়া গল্প সুরু করিল—যেৎনাহি মরিজ্ লোক হিঁয়াপর আতী হ্যায়, সবকোই ভারী ভারী বক্‌শিশ্ দে যাতী, কোই বহুৎসা কিমৎকা লুঙ্গা—কোই খানেকা লিয়ে পাঁচদশ রুপিয়া—কোই...

মুখ ধুইবার সরঞ্জাম লইয়া আসিয়া হেলেন বলিল—আবি ভাগো, ফজিরমে আকে দিক্ করতা হ্যায় কোন্ কব বক্‌শিশ্ দে গিয়া.....পহেলে মর্জ্জ আরাম হোনে দেও, আখিরমে উসব বাত.....

ততক্ষণে সিতারা পলাইয়াছে।

সেদিন ডক্টর তারাবাঈ মুকুলের পা পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন অস্ত্র করা ছাড়া আর উপায় নাই। পরের দিন অপারেশন হইবে স্থির হইল, ক্যাষ্টর অয়েল দু'ডোজ লিখিয়া দিয়া গেলেন। নার্সরা সকলে মিলিয়া আসিয়া অভয় দিয়া গেল, ভয় নাই এমন অপারেশন এখানে কত হইতেছে।

৬নং কটেজে থাকেন যে মোটা গিন্নী, তিনিও তাঁর বিপুল দেহ দোলাইয়া আসিয়া বলিয়া গেলেন, এই ত' আমার মেয়ের নির্ম্মলারও অপারেশন হ'ল, বুকে—কি ভয়? কিছু ভয় নেই। নির্ম্মলা এখন সেরে গেছে, আয়ত মা নির্ম্মলা, লজ্জা কি —

তাঁর আর এক মেয়ে মিনা তখন দরজার সামনে আসিয়া গেছে।

নিশীথ বলিল, আপনাকে দেখলে আমার বৌদি'র কথা মনে পড়ে, অবিকল সেই রকম চেহারা আপনার। বলুন না বৌদি মেয়েকে আসতে—এসো মা, এসো, লজ্জা কিসের—

অল্প বয়স হইলেও নিশীথ খুব মা-মা করিতে পারে। নির্ম্মলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নিশীথ বলিল, বসো ঐ চেয়ারে, তুমি রুগী মানুষ, বসুন বৌদি আপনি ওটাতে, আর খুকি তোমার নাম কি? মীনা? বসো তুমি আমার পাশে—

হাসি-গল্পে সহজেই আলাপটা জমিয়া উঠিল। বৌদি গল্প করিতে লাগিলেন—ছেলেবেলায় তিনি সিমলে পাহাড়ে মানুষ, জন্ম তাঁর নৈনিতালে, পেশোয়ারে অনেক বড় বয়স অবধি ছিলেন, বাপ তাঁর সৈন্য-বিভাগে কাজ করতেন —

—বলব কি ঠাকুর-পো, আঙুর যে লোকে খায় তা আমরা জানতুম না, এমনি ক'রে আমরা নষ্ট করতুম, দু'-এক মুঠো খেয়ে—আপেল, মনক্কা, মস্কট্, ফিগ্‌মিস, আখরোট, আমরা যা খেয়েছি তোমরা বোধ হয় তা চোখেও দেখ নি—মোটা-গিন্নীর কথাগুলি যাকে বলে খুব 'পষ্টপষ্ট'!

দীনা আসিয়া মুকুলের চুল আঁচড়াইয়া দুইগাছা বিনুনী করিয়া দিয়া গেল। আর একবার হেলেন একডোজ ওষুধ খাওয়াইয়া দিয়া গেল।

দুপুরবেলাটা একদম চুপচাপ।

একবার কটেজ হইতে বাহির হইয়া সামনের বাগানে দাঁড়াইয়া নিশীথ দেখে, যে সকল রোগিনী অপেক্ষাকৃত সুস্থ তাহারা লম্বা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে।

উত্তর ভারতের পর্দ্দানশীন্ মেয়েরাই অধিকাংশ। হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় বুঝি কোন্ বাদশাহের হারেমে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সুন্দরীরা কেহ বিশেষ লজ্জা করিল না, যে যেমন দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া ছিল, রহিল। ভাবটা যেন এই পর্দ্দা-ওয়ার্ডের মধ্যে যে পুরুষকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া পর্দ্দা টানিবার প্রয়োজন নাই।

আকাশ নির্ম্মেঘ, কাঁচাসোনার মত রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, শুধু বিকালে দেখা-করিবার-সময় যখন শেষ হইয়া যায়, তখন বুড়ো দরোয়ান ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ওয়ার্ড হইতে ওয়ার্ডে যাইবার মুখে এ-ধার হইয়া যায়—অনেকক্ষণ ধরিয়া তার ঢঙ্গাঢঙ্গ ঢন্‌ঢন্-ধ্বনি রহিয়া রহিয়া বাজে।

অপারেশন-রুমের কাঁচ-ঘেরা ষ্ট্রীন-টাঙানো টেবিলের উপর যখন মুকুলকে শোয়ানো হইল, তখন নিশীথকে সে-ধারে যাইতে দেওয়া হইল না। সে একলা-ঘরে বসিয়া একখানা হাত-দেখা-শিক্ষা লইয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অন্যমনস্ক কি হওয়া যায় তার, যার স্ত্রীর পায়ে অপারেশন হইতে চলিয়াছে!

চারিটি ধাই যখন ষ্ট্রেচারে করিয়া মূর্চ্ছিতা মুকুলকে ৪ নং ঘরে লইয়া আসিল তখন নিশীথের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন প্রাণ নাই। তবে কি?—

অপারেশন successful but the patient—

না-না।

নার্সরা ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া পাশে বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে একটু বমি-ভাব হইতেই মুখের কাছে জেন্ পট্‌টা আগাইয়া দিল।

মেট্রন আসিয়া খোঁজ করিল।

ডক্টর তারাবাঈ একটু পরে আসিলেন।

পনেরোদিন হইয়া গেল, পা কমিয়া আসিতেছে কিন্তু পিঠের শির-দাঁড়ায় যে ব্যথাটা অল্প-অল্প হইয়াছিল সেটা বাড়িতে লাগিল।

প্রথমে মনে করা গিয়াছিল, শুইবার দোষে হইয়াছে, কিন্তু শেষে একদিন তারাবাঈ অন্য সন্দেহ করিয়া বসিলেন।

X-Ray লইয়া নিশীথকে বাইরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—মেরুদণ্ডে ক্ষয়রোগ হয়েছে। প্ল্যাষ্টার অফ প্যারিসের বেল্ট ক'রে কোমরে বেঁধে রাখতে হবে, ঐ একমাত্র চিকিৎসা—

নিশীথ চারিদিক অন্ধকার দেখিল। বলিল—সারে ত'?

তারাবাঈ বলিলেন—সারবে না কেন, কত সারছে। তবে সময় লাগে।

নিশীথ ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল—কতদিন?

অচঞ্চলকণ্ঠে ডাক্তার জবাব দিলেন—বছর আড়াই ত' এ-রকম থাকতে হবে। তারপর খুলে দেখে—ভয় নেই এ-case তেমন serious নয়, আমরা কত দেখছি!

নিশীথ ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এই পুষ্পিত-যৌবন, নিত্যমুক্ত কল্পনায় ভরা সুস্থ মন, এই লইয়া সুদীর্ঘ দিন সুদীর্ঘ রাত্রি অহল্যা-পাষাণীর মত কাটাইতে হইবে? কাজে যার বিশ্রাম ছিল না, তাঁকে হইতে হইবে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী! এ-কি বিধাতার নিষ্ঠুর অবিচার! শাস্তি দিবার আর কি লোক মিলিল না, এই ফুলের মত কোমল প্রাণের প্রয়োজন হইল!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

মুকুল জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার কি বললে গো?

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিশীথ বলিল—বললে, কোমরের ব্যথার জন্যে একটা কোমর-বন্ধ পরতে হবে—

—কি, প্যারিস প্ল্যাষ্টারের?

—হ্যাঁ। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

মুকুল বলিল, তবে কি আমার থাইসিস্ হয়েছে পিঠে? নিশ্চয়। কি বললে বলো, কি রোগ?

—না-না, থাইসিস্ কেন? নিশীথ চাপিতে চেষ্টা করিল।

মুকুল বলিল, তুমি জানো না, আমি জানি, আমাদের পাড়ার হরিধন কাকার মেয়ের হয়েছিল। বাবাঃ, সে ত' তিন বচ্ছর পাথর হয়ে থাকতে হবে—

নিশীথ বলিল, সে সেরেছিল ত'?

—সারল ত' কিন্তু কতদিন পরে বলো। আমি অতদিন থাকতে পারব না, আমার কান্না পায়—কি যেন সব।

নিশীথ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে বসিল—কেন ছেলে-মানুষী করছ মুকুল, তোমার ততদিন থাকবার দরকার না-ও হতে পারে! প্রথমেই রোগ ধরা পড়েছে, মুকুল ছাখো—

না, মুকুল দেখিবে না। তার ব্যথা কোথায়, সে কি নিশীথ জানে! সে যে স্বামীর কোনো কাজেই লাগিবে না, তাঁহার বুকের মধ্যে আশ্রয় লওয়াও যে তার হইবে না, পূর্ণিমারাত্রি আসিবে যাইবে, গঙ্গার বুকে বরষা ঝরিবে, দুঃসহ শীতের সন্ধ্যা কুয়াসা লইয়া নামিয়া আসিবে—তার শবরীর প্রতীক্ষা করে শেষ হইবে? আজ ত' সবে সুরু। সে ভাবিতে পারে না।

এমনি সময়ে মোটা-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, কাবুলের আসল খোবানী তোমরা খাওনি—

নিশীথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। মুকুল ঠিক হইয়া শুইল।

বিকালে দুই নম্বর কটেজে আসিয়াছে একটি মেয়ে আসন্ন-প্রসবা।

ছেলে না-কি বুকের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, এমনি অবস্থায় ছত্রিশ মাইল রাস্তা লরিতে চড়িয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সিসেরিয়ান অপারেশন করিতে হইবে, চার্জ্জ পঞ্চাশ টাকার কম নয়, তার স্বামী ও শ্বশুর মেট্রনের সঙ্গে দর-দস্তুর করিতেছে, কুড়ি টাকায় করিয়া দিতে হইবে।

তবু free ward-এ থাকিবে না, ইজ্জত যাইবে, জমীদার-পুত্রবধূর ইজ্জত!

মেট্রন তিরিশে রফা করিয়া টাকাটা আগাম দিতে বলিল, শক্তভোজীর দল জবাব দিল, আগে অপারেশন হোক্, ছেলে না হোক্ অন্ততঃ রোগী না বাঁচিলে কি হইবে?

সেই অপারেশনের তোড়জোড় চলিতেছে, সেই ধারে সমস্ত নার্স চলিয়া গেছে।

মুকুলের ঘরে শুধু একলা আছে সুধা, কাল কোমর-বন্ধনী দেওয়া হইয়াছে। মুকুলের কিছুই ভালো লাগিতেছে না। জানালার ওধারের বটগাছের পল্লবের ফাঁক দিয়া নির্ম্মেঘ আকাশের যেটুকু দেখা যায়, সে যেন নিস্তরঙ্গ একটি হ্রদের ছবি—অপরাহ্ণের মিলাইয়া-আসা আলোয় তার জীবনীশক্তিও যেন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। এ কী জীবন?

প্রমীলারাজ্যের মত নার্স পরিবেষ্টিত কটেজে নিশীথের দিন মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলে।

তাহাদের ঘরে যায়, মাছ ভাজিয়া পাঠাইয়া দেয়, মাংসের কোর্ম্মা রাঁধিয়া খাওয়ায়।

নিত্য নূতন রং-এর শাড়ী পরিয়া যে এসিষ্ট্যাণ্ট লেডি ডাক্তারটি আসে তার ইংরাজী চমৎকার, নিশীথের সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গেছে, কোনোদিন তারও ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ থাকে।

ওদিকে আপিসের ছুটিও শেষ হইয়া আসে।

মুকুলকে বাড়ী লইয়া গিয়া কে দেখিবে, কে নার্স করিবে এখন এই তার ভাবনা।

কয়দিন হইল মুকুল একটু গম্ভীর হইয়া গেছে।

সেদিন বিকাল বেলা হেলেন আসিয়া ম্যাজিক দেখাইয়া অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিল। কতকগুলো তাসের ম্যাজিক দেশলাইয়ের ম্যাজিক দেখাইয়া অবাক্ করিয়া দিল। তারপর একটা রুমালের ফাঁসের ম্যাজিক দেখাইল যাহাতে যত শক্ত করিয়াই হাত বাঁধা হোক্, অনায়াসে খুলিয়া ফেলা যায়। সেইটা সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য।

মিনেসিস্ ও রুবি মিলিয়া কিন্তু আর এক কাণ্ড করিল, একটা রুমাল লইয়া এমন করিয়া গেরো দিয়া দিল যে, হেলেন কিছুতেই খুলিতে পারিল না।

মুকুল তাড়াতাড়ি সেই রকম গেরো দিবার পদ্ধতি দেখিয়া লইল, ট্রেনে যারা চুরী করে তারা না-কি পিছন হইতে আসিয়া এই রকম করিয়া গলায় রুমাল বাঁধিয়া দেয়, যাহা হাজার চেষ্টা করিয়াও খোলা যায় না, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া লোকে মারা পড়ে, একটু শব্দও করিতে পারে না।

তাসের ম্যাজিকও কিছু শিখিল, কিন্তু দেশলাইয়ের ম্যাজিক হেলেন কিছুতেই শিখাইল না। ও বড় আশ্চর্য্য ম্যাজিক, রুমালের মধ্যে একটা চিহ্নিত দেশলাইয়ের কাঠি রাখিয়া উপর হইতে মচ্‌কাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দাও, পরে আস্ত কাঠিটা বাহির হইয়া পড়িবে।

একবারের জায়গায় দশবার দেখাইল, তবু কেহই ধরিতে পারিল না। অবাক্ কাণ্ড!

এমনি সময় মেট্রন আসিয়া খবর দিল, দুই নম্বরের ঘরের যে পেশাণ্টটর পেট কাটিয়া ছেলে বাহির করা হইয়াছে সেই ছেলে ও প্রসূতি দু'জনেই সুস্থ আছে কিন্তু তাহাদের পুরুষরা এখন ডাক্তারের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, দশটাকার বেশী কিছুতেই দিতে পারিবে না, 'মাইবাপকে' মাফ করিতে হইবে।

নিশীথ শুনিয়াছিল ত্রিশ টাকায় রফা হইয়াছিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মেট্রন বলিল এ বিষয়ে বাঙালী বাবুরা খুব ভালো, যেমন মিষ্টার ভট্টাচারিয়া—পেমেণ্টে কোনো গোলমাল নাই।

নিশীথ শুধু বলিল—Thank you so much for your kind compliments!

নিশীথ নার্সদের সঙ্গে ইদানীং অত্যন্ত হৈ-হৈ করে।

দিনরাত ঘরে বসিয়া আছে, খালি তাহাদের সহিত ফষ্টিনষ্টি। ঠাট্টা করিতে করিতে ছুটাছুটি, হাত-কাড়াকাড়ি, গায়ে পড়া—ওসব মুকুলের ভালো লাগে না। কিছু বলিতেও পারে না, কোনো কালে বলে নাই। চিরদিন সে ঠাণ্ডা স্বভাবের। তা-ছাড়া নিশীথেরও প্রকৃতি এ রকম ছিল না। মেয়েদের কাছ হইতে সে সব সময়েই দূরে দূরে থাকিত। মেয়ে-মহলে কোনো দিনই তাহাকে দেখা যাইত না।

আজ পুরুষ-বর্জ্জিত নারী-রাজ্যে এতগুলি তরুণীর মাঝখানে পড়িয়া তাহার কি ত্রিস্তবৈলক্ষণ্য ঘটিল? সচ্চরিত্রতায় যে আদর্শ ছিল, আজ কি তাহার সংযমের বাঁধ ভাঙিবার কারণ দেখা গেল?

আর মেয়েগুলাও ত' কম বাচাল নয়!

নার্সদের চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ ভাল ধারণা কোনো দিনই মুকুলের ছিল না, আজ যেন তার মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ইচ্ছা হইল, মেট্রনকে সব খুলিয়া বলে, নার্সদের সৎ আচরণের তদারক করার ভার ত' তাহারই উপরে। কিন্তু পারিল না, নিশীথ যদি রাগ করে। একে ত' সে নিজে চিরদিনই ভীরু, আজ একেবারে অসহায়, পরমুখাপেক্ষী।

নিশীথও বুঝিতে পারিতেছে তাহার নিজের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। স্ত্রীকে ভয় করিবার তাহার কখনো প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু যাহাতে সে আঘাত পায় এমন কাজ করিবার প্রবৃত্তিও ইহার আগে তাহার হয় নাই।

আজ বুঝিতেছে সে সুস্থ সবল স্ত্রীকে সম্ভ্রম করিয়া চলিত, শিশুর মত দুর্ব্বল রুগ্ন স্ত্রীর প্রতি সে সমীহ-ভাব তাহার নাই। মনের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সে অনুকম্পা করিতে সুরু করিয়াছে। মুকুলের রাগ-অভিমানে হয়ত এখন তাহার আসিয়া যাইবে না।

নহিলে সন্ধ্যা হইতেই সুধা আসিতেই সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বিছানায় বসাইতে পারে, তাও মুকুলের সামনে?

এমন ঘটনা-সংস্থান কোনোদিন সে কল্পনা করিতে পারিত? সে কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছে দুরারোগ্য-রোগ-শয্যায় শায়িত তাহার সামনে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মুকুলের এমনি আচরণে তাহার মনের অবস্থা কি হইত?—যখন সে পঙ্গু, সেবা ও শুশ্রূষা, অর্থ ও সামর্থ্য—প্রতিটি সাহায্যের জন্য পরের মুখ চাহিয়া মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটাইতে হইতেছে, দেহ-মনের সেই চরম অসুস্থতার দিনে তাহার স্ত্রী তাহারই চোখের উপর অন্য এক পুরুষকে টানিয়া বিছানায় বসাইতেছে, অন্য অনেক পুরুষের সহিত খেলা-ধূলায় গল্প-আমোদে মত্ত, তখন নিজের হৃদয়ের সেই বিপরীত ভাব সে কি অনুমানে, অনুভূতিতে আনিতে পারে?

সে ভাবিবার তাহার সময় নাই, এরকম বাছা-বাছা তরুণী-সম্মিলন—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নিরলস প্রেমাভিনয় এবং সকলের চেয়ে বড় কথা—যেখানে সকলেই কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে অনায়াসলভ্য—সেখানে বিবেকের সংযমের বুলি আওড়াইয়া লাভ নাই।

সুধাকে ধরিয়া বসাইতেই বসিয়াছে এবং গা-ঘেঁসিয়াই বসিয়াছে, লজ্জায় তাহার কাণ অবধি রাঙা হইয়া যায় নাই, আর একটি মেয়ে যে ঘরে শুইয়া আছে তাহার অস্তিত্ব অবধি যেন সে লক্ষ্য করে নাই।

নিশীথ তার এলো খোঁপাটা টান মারিয়া খুলিয়া দিল, দুই হাত দিয়া খোঁপাটা ফিরিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সে বলিল—কি করেন?

নিশীথকে এ কি পৈশাচিক আনন্দ পাইয়া বসিল, সে কি মোম বাতির ক্ষীণ আলোকে দুর্ভাগিনী মুকুলের চোখ দেখিতে পাইতেছে না, যা একবার জ্বলিয়া উঠিয়া জলে ভরিয়া গেল? সে একটি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু নিশীথ কি শয়তান না উন্মাদ?

ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ—জানালা দরজা কাঁপাইয়া ঝড় উঠিল। হিমস্পর্শ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে মাতা-মাতি করিতে লাগিল, সুধা উঠিয়া অন্য পেশাণ্টদের দেখিতে গেল।

নিশীথ মুকুলকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, জানলাটা বন্ধ ক'রে দোব?

মুকুল জবাব দিল না।

— অসুখ কর্চ্ছে কিছু?

এবারেও কোন উত্তর দিল না।

না দিক্। অত খোসামোদ করিবার প্রবৃত্তি নিশীথের নাই। মাস-মাস এতগুলা টাকা খরচ করিতে হইতেছে এবং হইবে, তাই কি যথেষ্ট নয়? নিশীথের সন্দেহ হইল, বাড়াবাড়িটা হয়ত মুকুলের চোখে ভালো লাগে নাই। না-ই লাগুক। তাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

ও যদি আজ মরিয়াই যায়, একটা ছেলে একটা মেয়ে, তারা ত' দিদিমার কাছে আছে, সে আবার

বিবাহ করিবে। হাঁ, এবারে একটু দেখিয়া শুনিয়া করিবে, একটু অন্য রকমের।

মুকুলের মত নিখুঁত সুন্দরী খুব কম মেলে, মুকুলের মত গুণবতীও দুর্লভ, দীর্ঘদিনের সংসার-যাত্রা—দুই সন্তানের জননী, তাহার সম্বন্ধে এমন নিষ্ঠুর কল্পনা করা কিছুদিন পূর্ব্বেও নিশীথের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

রাত্রে মুকুল কিছু খাইল না, খাইতে ইচ্ছা নাই। কেহ জোর করিল না। একবার ডাক্তার আসিয়াছিলেন। মুকুল বলিল—একটু সর্দ্দিভাব হয়েছে। রুমালে খানিকটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ দিয়া শুঁকিতে বলিলেন—direct draught-টা যেন না লাগে।

রাত্রের খাওয়া সারিয়া নিশীথ শুইয়া পড়িল, বারান্দায় ক্যাম্বিসের পর্দ্দা নামাইয়া সুভদ্রা যেমন শোয়, শুইল।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ক্ষীণ তার আলো, ঝড়-জল, বটগাছের শাখাপ্রশাখার আন্দোলন, চারিধারের বাগানের অসংখ্য গাছপালার সোঁ সোঁ শব্দ—দুর্য্যোগময়ী রজনী, অথচ কি এক মায়ায় মদির—এমন রাত্রেই অভিসারিকার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে ভালো লাগে, গুরু-গুরু আওয়াজের সঙ্গে বুকের দুরু-দুরু কম্পন, যে জগৎ চোখের সামনে হইতে মুছিয়া গেছে তাহাকে বিস্মরণের মোহে চঞ্চল হইয়া ওঠার স্বপ্ন—নিশীথকে ঠেলিয়া যেন বিছানা হইতে তুলিয়া দিল।

মুকুল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টাইম্‌পিস্‌টার টিক্-টিক্ শব্দ, দূরে কোন ঘরে নবজাত শিশুর কান্না··· ঝড়ের ঝাপ্‌টা, বৃষ্টির ছাঁট্—রহস্যময়ী রাত্রি।

আকাশে বাতাসে রিম্‌ঝিম্ রম্‌ঝম্ সুর—নিশীথ আজ ঘুমাইতে পারিবে না।

নিঃশব্দপদে সুধা আসিয়া দাঁড়াইল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, উনি ঘুমিয়েছেন?

তাহার সেই অতি আস্তে বলা কথা নিশীথের কানে প্রেমের গুঞ্জরণের মত মনে হইল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি অনুচ্চস্বরে বলিল, হ্যাঁ ঘুমিয়েছে। তুমি বোস।

আজ নিশীথের সকল সঙ্কোচ, সকল ভয় নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গেছে। সুধা বসিল, তাহার ভয়ও নাই, সঙ্কোচও নাই।

দেয়ালে টাঙানো দু'-গাছি যুঁইফুলের মালা—যা সে আজ গোধূলি বেলায় চৌক্ হইতে কিনিয়া আনিয়াছে—নামাইয়া আনিয়া সুধার খোঁপায় নিশীথ জড়াইয়া দিয়া পাশে বসিয়া পড়িল।

মৃদু অথচ উগ্র সুরভি দেহকে মাতাল না করুক মনকে করে।

ঝোড়ো হাওয়া এলোমেলো ভাবে বহিতে লাগিল, মুকুলের মশারি হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল, মোমবাতিটার ক্ষীণ শিখা নিভিতে নিভিতে জ্বলিয়া উঠিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে নিভিয়া গেল।

তখন প্রবল বর্ষণ সুরু হইয়াছে।

একটা তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্যুতের আলোক-রেখায় দেখা গেল সুধার দুইটা হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া নিশীথ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

সুধা ছুটিয়া দরজার দিকে গেল, তাহার আঁচলটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিশীথ টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সুইচ্ টিপিবার শব্দ হইল এবং আলো জ্বলিয়া উঠিল।

রুবি আসিয়াছিল, ব্যাপারটা দেখিয়াই আলো নিভাইয়া দিয়া পাশে আসিয়া বলিল—৩ নম্বর কটেজমে চলিয়ে, উ ত' খালি হ্যায়। যেন তাহার কাছে ব্যাপারটা কিছুই নূতন নয়।

তাহার পরণে স্কার্ট এবং পায়ে হিল-উঁচু জুতা, সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

ঝড়ের মাতামাতিকে ছাপাইয়া তিনটি প্রাণীর

মাতামাতি রুক্ষভাবে হস্পিট্যাল কটেজের চিরন্তন প্রশান্তিকে আহত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

বৃষ্টি পড়িতেছে। ছাতা লইবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া রুবি দেখিল বাতির আলো নিভিয়া গেছে।

এ সময়ে একবার রোগীকে দেখিয়া যাওয়া উচিত ভাবিয়া রুবি electric light জ্বালিয়া দিল।

মশারি তুলিয়া দেখে patient ঘুমাইতেছে।

তাহার গলায় একটা রুমাল বাঁধা,—এ কি? এ যে সেই সর্ব্বনাশা গ্রন্থি! সে নিজ-হাতে যা শিখাইয়াছে!

গায়ে হাত দিয়া দেখে ঠাণ্ডা। pulse নাই।

সে 'Oh God' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে নিশীথ ও সুধা দু'জনেই বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপার?

রুবি শুধু বলিল — Dead.

শত বজ্রের ধ্বনির মত শুনাইল — DEAD.

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভূলিয়া নিশীথ শুধু ভাবিতে লাগিল—সব শেষ, এত দ্রুত এবং এত অকস্মাৎ!

নিশীথ এতক্ষণে বুঝিল কি ঝড় মুকুলের বুকে বহিতেছিল, বাহিরে প্রকৃতির ঝঞ্ঝার সঙ্গে হয় ত' তাহার তুলনাই হয় না।

রোগে মৃত্যু হইলে আফশোষ থাকিত না, এ যেন চিরজীবন ধরিয়া আফশোষ করিয়া জ্বলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

একদিন মূর্চ্ছিতা তাহাকে যে ভাবে ষ্ট্রেচারে করিয়া এই ঘরে আনা হইয়াছিল সেই ভাবে চারপাই করিয়া আজ ঘর হইতে বাহির করা হইল। নিশীথ শুধু দেখিল।

দুইজনে আসিয়াছিল, দুইজনে হাঁসপাতালের ফটক পার হইয়া যাইবার কথা, তা হইল না। তাহার ক্ষণিকের সাজানো সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া, ক্ষণিকের অস্থায়ী প্রেমের অভিনয়ের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া একাকী নিশীথ গঙ্গার ঘাটের দিকে বাহির হইয়া গেল।

তখনো সকালের আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে। সমৃদ্ধনগরীর অগণিত সৌধমালা গঙ্গার তীরতটে জলস্নাত হইতেছে।

যে বর্ষাকে নিশীথ চিরদিন ভালোবাসে আজ শোকের দিনে, দুঃখের দিনে তাহারো সুর যেন হাহাকারে ভরা, তাহারো রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ যেন বুকফাটা কান্নারই প্রতিধ্বনি।

চার নম্বর ঘর একেবারে খালি হইয়া গেছে!

সকালবেলা গয়লানী দুধ দিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল। মোটা-গিন্নী আলু-বোখরার গল্প বলিতে আসিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

ফিনাইল ঢালিয়া আবার নূতন রোগীর জন্য ঘর পরিষ্কার করা হইতে লাগিল।

নার্সদের আজ কাজে মন নাই, সুধা ঘরে গিয়া খিল দিয়াছে। পর্দ্দা-ওয়ার্ড চার নম্বরের সামনে দাঁড়াইয়া মেট্রন শুধু বলিয়া উঠিল—Poor Soul!



বাংলা কবিতার ছন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় সাধু ছন্দের ওই 'স্থিতিস্থাপকতা' গুণের ফলেই কবিরা প্রয়োজনমতো যথেষ্ট যুগ্মধ্বনির আমদানী করতে পারেন। সাধু ছন্দের এই স্থিতিস্থাপকতা ও ভারবহনশক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র 'শোষণশক্তি' ব'লে বর্ণনা করেছেন। কেন-না এ-ছন্দ আপন প্রকৃতিটিকে বজায় রেখেও বহুল পরিমাণে ব্যঞ্জনধ্বনি শোষণ ক'রে নিতে পারে। যাহোক্, এ-ছন্দের এই শক্তিটিকে স্থিতিস্থাপকতাই বলি আর ভারবহনশক্তি বা শোষণশক্তিই বলি, এর একটা সীমা কোথাও আছে অবশ্যই। এই সীমা কোথায় তার বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তির লীলা দেখাবার উদ্দেশ্যে যে দৃষ্টান্তগুলি রচনা করেছেন তাই উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

(১) পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে
(২) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে
(৩) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে
(৪) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে
(৫) সঙ্গীত তরঙ্গি' উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে
(৬) সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস
(৭) দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি একটিও নেই। তারপর ক্রমে ক্রমে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি একটি একটি ক'রে বাড়ানো হয়েছে। সপ্তম দৃষ্টান্তটিতে সর্ব্বসুদ্ধ ও-রকম যুগ্মধ্বনি আছে ন'টি। তার পর তিনি আর দৃষ্টান্ত রচনা করেননি। এর থেকে স্বভাবতই অনুমান হয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে একটি পয়ার-পঙ্‌ক্তিতে ন'টির বেশি শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি সমাবেশ করা সম্ভব নয়। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, একটি সাধারণ পয়ারের পঙ্‌ক্তিতে ন'টির বেশি শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির সমাবেশ করা সম্ভবপর হ'লেও তা পাঠকের দন্ত এবং শ্রোতার কর্ণ কোনোটার পক্ষেই নিরাপদ্ হবে না। শুধু তাই নয়, উদ্ধৃত সপ্তম দৃষ্টান্তটিকেও উক্ত প্রত্যঙ্গ-দ্বয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ বলা যায় না। অন্তত এ-কথা বলা চলে যে, ব্যঙ্গ-কবিতায় এ-রকম ন'টি শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি-ওয়ালা পংক্তি ব্যবহার করা চললেও সাধারণ কবিতায় বোধ করি চলে না। যাহোক, উপরের সপ্তম দৃষ্টান্তটিকে আশ্রয় ক'রে অমূল্যধনবাবু যে সিদ্ধান্ত করেছেন সে-বিষয়ে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই ব'লে রাখ্‌ছি আমার বিবেচনায় তাঁর এই সিদ্ধান্তটিও 'দুঃসাধ্য' ব'লেই মনে হয়। তিনি খুব জোরের সহিত সূত্র তৈরী ক'রে বিধান দিয়েছেন, "হ্রস্বীকরণের একটা সীমা আছে। একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি মাত্র দুইটি যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি পর পর তিনটি যৌগিক অক্ষর থাকে তবে তাহাদের মধ্যে একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—১৮ নং সূত্র, পৃঃ ৯ এবং ৩৪ দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখা যাক্ তাঁর এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসহ কি না।—

(১) তারি অন্তরালে
রহিয়া 'অসূর্য্যম্পশ্য', নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্য রূপে
জীবনে যৌবনে।
—রবীন্দ্রনাথ, মানসী, অহল্যার প্রতি।

(২) আবর্ত্তিয়া তৃণপর্ণ, 'ঘূর্ণ্যচ্ছন্দে' শূন্যে
আলোড়িয়া,
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
—ঐ, কল্পনা, বৈশাখ।

(৩) তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান,
চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব 'নৃত্যচ্ছন্দের'
সন্ধানে।
* * *
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী
তব জটা হ'তে
উত্তারি' আনিতে পারে নির্ঝরিত
রস-সুধা স্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বুকে 'নৃত্যচ্ছন্দ'-মন্দাকিনী
ধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায়
প্রাণহারা।
—ঐ, নটরাজ (বনবাণী), উদ্বোধন।

(৪) বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি' শুধু কাহিনীর
'বাক্যপ্রান্তে' আছে ছায়া-প্রায়। কত জাতি
'কীর্ত্তিস্তম্ভ' রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা।
—ঐ, পরিশেষ, বিস্ময়।

(৫) বীর-'কীর্ত্তিস্তম্ভ' হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানব-কঙ্কাল-স্তূপে।
—ঐ, বিচিত্রিতা, যাত্রা।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। আশা করি অসূর্য্যম্পশ্য, ঘূর্ণ্যচ্ছন্দ, নৃত্যচ্ছন্দ, বাক্যপ্রান্ত, কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি শব্দে "পর পর তিনটি হ্রস্ব যৌগিক অক্ষরের" ব্যবহার দেখে অমূল্যধনবাবু বুঝতে পারবেন যে, তাঁর সিদ্ধান্তটি সুসাধ্য নয় এবং তাঁর এই মূলসূত্রটির কিছুমাত্র মূল নেই। কেন-না উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-ক'টিতে ছন্দ ভুল হয়েছে, এ-কথা বলবার সাহস বোধ করি কারও নেই। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে 'বাক্যপ্রান্ত' ও 'কীর্ত্তিস্তম্ভ' সম্বন্ধে এই আপত্তি হ'তে পারে যে, এই শব্দ-দু'টির মধ্যে পর পর তিনটি যুগ্মধ্বনি বা যৌগিক অক্ষর নেই, এদের আসল রূপ হচ্ছে বাক্য-প্রান্ত, কীর্ত্তি-স্তম্ভ। অর্থাৎ এই শব্দ-দুটি সমাসের দ্বারা যুক্ত হ'লেও উচ্চারণে এরা বিযুক্ত। ইন্দ্রপ্রস্থ, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, বঙ্গপ্রান্ত (শিবাজী উৎসব, পুরবী) প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও এরকম আপত্তি হ'তে পারে। কিন্তু আমার উচ্চারণে কীর্ত্তিস্তম্ভ, বাক্যপ্রান্ত শব্দে পর পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি থাকে এবং তাতে আমি আবৃত্তিকালে কোনো অসুবিধা বোধ করি নে। আর, আমার বিশ্বাস কবিগুরুও এ-সব শব্দগুলিকে বিযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করেন না। যদি করতেন তাহ'লে এই সব শব্দের মধ্যে অতি অনায়াসেই একটি ক'রে বিভাগ-সূচক হাইফেন-চিহ্ন বসাতে পারতেন। তা ছাড়া, ঘূর্ণ্য-ছন্দ ও নৃত্য-ছন্দ না লিখে তিনি যে এ-সব স্থলে সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করেছেন তাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উচ্চারণে পর পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি থাকতে কোনো বাধা নেই। আর, 'অসূর্য্যম্পশ্য' শব্দটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমূল্যবাবুর এই সূত্রটি একেবারেই মূল্যহীন। তাঁর এই সূত্রটির যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তা'হলে বাংলা যৌগিক বা পয়ারজাতীয় ছন্দ থেকে আত্মোৎসর্গ, যুদ্ধোন্মত্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, মন্দাক্রান্তা, অত্যাশ্চর্য্য, হর্ষোৎফুল্ল, বিদ্যুদ্বহ্নি প্রভৃতি শব্দকে একেবারেই বাতিল ক'রে দিতে হয়। কিন্তু বাংলা দেশের কবিরা তাতে রাজি হবেন কি? আমি যদি সাহস ক'রে লিখি—

আঁকি দিল বিদ্যুদ্বহ্নি যুগান্তের দিগ্-দিগন্তরে
মহামন্ত্র শিখা।

কিংবা—

তোমার সে আত্মোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন, ইত্যাদি

তাহ'লে অমূল্যধনবাবু কিংবা বাংলার কবি-সমাজ কি আমাকে ছন্দঃপাতন দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন?

বাংলা ছন্দে "যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণের" সীমা অর্থাৎ আমার পরিভাষায় সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সমাবেশের সীমার প্রসঙ্গটা যখন উঠেই পড়েছে তখন এই বিষয়ে আরেকটু অগ্রসর হওয়া যাক্। দেখা গেল যে, যৌগিক বা পয়ার-জাতীয় ছন্দে পর পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সমাবেশ করতে কোনো বাধা নেই। অবশ্য এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাংলায় সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সচরাচর একাকীই থাকে; দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-ধ্বনির একত্র সমাবেশ বিরলতর এবং তিনটির সমাবেশ আরও বিরল কিন্তু অপ্রাপ্য নয়। এইটেই বোধ করি অমূল্যধনবাবুর কথিত হ্রস্বীকরণের সীমা। কারণ যৌগিক ছন্দে তিনের অধিক সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির একত্র সমাবেশ সম্ভব ব'লে মনে হয় না।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ব'লে গণ্য করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং এ ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-ধ্বনির প্রশ্ন আসে না। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট। এ কথা অমূল্যধনবাবুও স্বীকার করেন। এখন দেখা যাক্ এ ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি-সমাবেশের সীমা কোথায়। প্রথমেই দেখতে পাই যে, যৌগিকের ন্যায় স্বরবৃত্তেও সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সচরাচর একাকী থাকে এবং এইটিই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। কিন্তু যৌগিক (অর্থাৎ সাধু পয়ার-জাতীয়) ছন্দে পর পর দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি যেমন বহুল পরিমাণে ও সুষ্ঠুরূপে ব্যবহৃত হয়, স্বরবৃত্ত ছন্দে তেমন হয় না। কিন্তু তা ব'লে স্বরবৃত্ত ছন্দে যে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব আছে তা নয়। যথা—

(১) দৈবে হতেম | 'দশম রত্ন' | 'নব রত্নের' |
মালে
(২) 'নব রত্নের' | সভার মাঝে | 'রৈতাম একটি' |
টেরে
—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সেকাল।

(৩) 'শেষ বসন্তের' | সন্ধ্যা হাওয়া | শস্যশূন্য | মাঠে
উঠ্‌ল হা হা | করি।
—ঐ, ঐ, পরামর্শ।

(৪) 'জান্তাম নাক' | 'চিন্তাম নাক' | তোমায়
আমি | প্রিয়তমে
* * *
হঠাৎ তুমি | 'পূর্ব্বাঙ্গনে' | উদয় হলে | 'শরচ্চন্দ্র'
শান্ত গরি- | মায়।
—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, অষ্টাদশ চিত্র।

(৫) 'সাম্রাজ্যেরি' | স্বর্গ-সিঁড়ি | গড়্‌ছ তখন |
অতন্দ্র
—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।

(৬) যাদের লাগি | 'ধনুর্ভঙ্গ' | যাদের লাগি |
লক্ষ্যবেধ
—ঐ, ঐ, মৃত্যু-স্বয়ম্বর।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে এগারোটি পর্ব্বে পর-পর দুটি ক'রে সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি আছে। আরও তলিয়ে দেখ্‌লে এদের মধ্যেও একটু পার্থক্য টের পাওয়া যাবে;—কতকগুলিতে (যেমন দশম রত্ন, শরচ্চন্দ্র, ধনুর্ভঙ্গ) যুগ্মধ্বনিগুলি পর-পর স্থাপিত হ'লেও এদের দুই পর্ব্বার্দ্ধে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু আর কতকগুলিতে (যেমন, নবরত্নের, শেষ বসন্তের, পূর্ব্বাঙ্গনে, সাম্রাজ্যেরি) যুগ্মধ্বনি-দুটি একই পর্ব্বার্দ্ধে অবস্থিত। যৌগিক ছন্দে পর-পর দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি ছন্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির সহায়তাই করে। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে উপর্য্যুপরি দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি বিশেষ সুখশ্রাব্য হয় না, বিশেষত' যদি এদুটি একই পর্ব্বার্দ্ধে স্থাপিত হয়।

পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে, অমূল্যধনবাবুর নিষেধ-বিধি থাকা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যের যৌগিক ছন্দে একই পর্ব্বে পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এখন আমরা দেখ্‌ব বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেও পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতেই এর নিদর্শন আছে—যথা, রৈতাম একটি। এ দৃষ্টান্তটি হয়তো খুব সন্তোষ-জনক নয়। কারণ ছন্দ-সন্ধি বা metrical **liaison**-র নিয়ম অনুসারে এ পর্ব্বটিকে 'রৈতামেকটি' ব'লেও গণ্য করা যেতে পারে। ছন্দ-সন্ধি সম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহোক্, রবীন্দ্রনাথের 'সেকাল' (ক্ষণিকা) কবিতাটি থেকেই অন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

জীবন-তরী | ব'হে যেত | মন্দাক্রান্তা | তালে

এখানে 'মন্দাক্রান্তা' শব্দে পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি আছে। তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, এ শব্দটিকে দু-ভাগে বিচ্ছিন্ন ক'রে মন্দা-ক্রান্তা এ ভাবে উচ্চারণ করতে হবে। অতএব অন্য দৃষ্টান্তের সন্ধান দেওয়া যাক্।—

(১) রোগের ঋণের | শেষ রাখ না | 'কলঙ্কের শেষ' | রাখ্‌বে কি ?

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, মৃত্যু-স্বয়ম্বর।

(২) যাহার কাছে | 'কইতাম নিত্য' | গৃহ আঁধার | কোরে চোলে গিয়ে- | ছে সে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, পঞ্চম চিত্র।

এখানে 'কলঙ্কের শেষ' এবং 'কইতাম নিত্য' এ দুটি পর্ব্বে স্পষ্টই পর-পর তিনটি হ্রস্ব যৌগিক অক্ষর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি রয়েছে, একটিকেও দীর্ঘ ধরতে হয় না। অতএব এখানেও অমূল্যধনবাবুর মূল সূত্রটি খাটছে না। শুধু তাই নয়। স্বরবৃত্ত ছন্দে একই পর্ব্বে পর-পর চারটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্তও আছে। যথা—

(১) সে যদি তোর | থাক্‌তো, খানিক | 'আব্দার কর্ত্তিস্' | শোধার আগে দাবী কর্ত্তিস্ | চুমা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, ষষ্ঠ চিত্র।

(২) অনেক বাক্য' | হানাহানি 'গৃর্জ্জন বর্ষণ' | অনেকখানি।

—ঐ, ঐ, সপ্তম চিত্র।

অতএব দেখ্‌তে পাচ্ছি যৌগিক ছন্দে পর-পর তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে এরূপ যুগ্মধ্বনি পর-পর চারটে পর্য্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। কাজেই এই উভয় প্রকার ছন্দেই অমূল্যধনবাবুর বিধান টেকে না। তাঁর আরেকটি নিয়ম হচ্ছে এই। "স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষরটি সেই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে নিত্য-হ্রস্ব হওয়া দরকার।" (বাংলা ছন্দের মূল-সূত্র, পৃঃ ৪০)। উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর এই নিয়মটিও সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নয়। যাহোক্, একথা বলা দরকার যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে এক পর্ব্বে চারটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির সমাবেশ সুশ্রাব্য নয় এবং তাই এ রকম দৃষ্টান্তও খুব বিরল; আর চার সিলেব্‌ল্ বজায় রেখে (পর-পর কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে) তিনটি যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বেশি নয়; তা-ছাড়া এ ছন্দে একই পর্ব্বে, বিশেষত' একই পর্ব্বার্দ্ধে, উপর্য্যুপরি দুটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনির দৃষ্টান্তও অপেক্ষাকৃত কম—কেন-না এ রকম সমাবেশ খুব শ্রুতি-সুখকর হয় না।

৪

এবার আমাদের মূল প্রসঙ্গে অর্থাৎ যৌগিক বা পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে ছয়েকটি কবিতায় সাধারণ পয়ার ছন্দে "যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে" একটি নবতন ছন্দ-রীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করেছিলেন। অর্থাৎ 'মানসী'র ওই ছয়েকটি কবিতাতেই আধুনিক কালে "মাত্রাবৃত্ত পয়ার" রচনার প্রথম প্রয়াস হয়েছে। "নিষ্ফল উপহার" ও "কবির প্রতি নিবেদন", এই দুটি কবিতার মাত্রারীতির প্রতি লক্ষ্য করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। "নিষ্ফল উপহার" কবিতাটির প্রথম দুটি লাইন হচ্ছে এই—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
ঊর্দ্ধে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।

(মাত্রিক পয়ার)

কিন্তু এই 'মাত্রিক পয়ার' নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের কানকে প্রসন্ন করতে পারেনি। তাই দেখতে পাই তিনি পরবর্ত্তী কালে এই কবিতাটিকেই মাত্রিক ছন্দ থেকে যৌগিক ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন। যথা—

নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে যমুনার জল।
দুই তীরে গিরি-তট, উচ্চ শিলাতল॥

(যৌগিক পয়ার)

—কথা ও কাহিনী।

মাত্রিক পদ্ধতির পয়ার রবীন্দ্রনাথের কানকে কেন প্রসন্ন করতে পারেনি এবং কেন তিনি এই কবিতাটির মাত্রিক পয়ারকে যৌগিক পয়ারে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমি অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি (প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৮, পৃঃ ৭৭৯-৮১)। সুতরাং এ-স্থলে ও-বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গত বৈশাখের "উদয়নে" রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অনতিকাল পরেই বোঝা গেল পয়ারের উপর এ আইন (যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা গণ্য করার) চালাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। বিনা বাধায় লেখা যেতে পারে—

উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্ত্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল।"

(যৌগিক পয়ার)

তাঁর এ-উক্তি থেকে মনে হ'তে পারে পয়ারে "যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব" দেবার অর্থাৎ মাত্রিক পয়ার রচনা করার "কোনোই প্রয়োজন নেই।" কিন্তু এ-রকম ধারণা যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। 'মানসী'র পর বহুকাল রবীন্দ্রনাথও মাত্রিক পয়ার রচনা করেননি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে তিনি মাত্রিক পয়ার ছন্দে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটিতে আমি বহু দৃষ্টান্ত যোগে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছি। সুতরাং এ-স্থলে একটিমাত্র নিদর্শন দেখিয়েই ক্ষান্ত হব। যথা—

শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদ-গীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণ-রিক্ত
নিঃশেষ বিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুক-বীথিকা।

—নটরাজ (বনবাণী), শেষ মিনতি।

শিশুপাঠ্য "সহজপাঠ" (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকখানিতেও 'মাত্রিক পয়ারের' অতি চমৎকার দুটি দৃষ্টান্ত আছে। একটু নমুনা দেখাচ্ছি—

(১) আমাদের ইস্কুল ছোটে হন্ হন্,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ঘণ্টা কেবলি দোলে চঙ্ চঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক্ তবু থামে না যে।

(২) সাতকড়ি ভঙ্গের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যূষে গান।
'হরি হরি' রব উঠে অঙ্গন মাঝে
ঝন্‌ঝনি ঝন্‌ঝনি খঞ্জনি বাজে।

অতএব দেখতে পাচ্ছি পয়ার ছন্দে 'যুক্তধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব' দেবার 'কোনোই প্রয়োজন নেই', এ-কথা বলা যায় না। বরং প্রয়োজন মতো পয়ারে যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার গৌরব দিয়ে অতি চমৎকার ছন্দ রচনা করা যায়। অর্থাৎ দরকার মতো যৌগিক পয়ার ও মাত্রিক পয়ার দুটোই চলে, কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। দ্বৌ কর্ত্তব্যৌ।

এই যৌগিক পয়ার ও মাত্রিক পয়ার ছাড়া আমাদের কাব্য-সাহিত্যে আরেক রকম পয়ারের প্রচলন আছে, তাকে রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলতে পারি 'প্রাকৃত পয়ার'। এই প্রাকৃত পয়ারকেই আমার পরিভাষায় বলি স্বরবৃত্ত পয়ার। গত বৈশাখ মাসের 'বঙ্গশ্রী'-তে (পৃঃ ৪২৬-২৭) রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র

ছন্দের ন্যায় 'পলাতকা'র ছন্দকেও 'বেড়া-ভাঙা পয়ার' ব'লে অভিহিত করেছেন। আর একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, 'বলাকা'য় হচ্ছে যৌগিক বা সাধু ছন্দের পয়ার আর 'পলাতকা'য় স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছন্দের পয়ার। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথও বাংলা ছন্দের তিন শাখার এই তিন প্রকার পয়ারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রবন্ধের গোড়াতেই এই ত্রিবিধ পয়ারের বিষয় আলোচনা করেছি। সুতরাং এ স্থলে এই ত্রিবিধ পয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।—

(১) নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণ তট শ্যাম শিলাতল॥
(মাত্রিক পয়ার)

(২) উন্মত্ত যমুনা বহে, আবর্ত্তিত জল
দুর্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল॥
(যৌগিক বা সাধু পয়ার)

(৩) নীচের পানে বয় যমুনা, স্বচ্ছ শীতল জল
দুর্গম ওই শৈল-তটে উদ্দাম উচ্ছল॥
(স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত পয়ার)

'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দের প্রসঙ্গ যখন উঠেই পড়েছে তখন প্রয়োজন-বোধে এস্থলে একটি কথা ব'লে রাখ্‌তে চাই। "বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান" নামক পুস্তিকায় (পৃঃ ২৩-২৪) আমি লিখেছি, "ছন্দের ধারা যখন অক্ষরসংখ্যা ও পংক্তির অন্তস্থিত বিরামের তীরকে অতিক্রম ক'রে পংক্তির পর পংক্তিকে প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হ'তে থাকে, তখনও প্রতি ছত্রকে একটি নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে রাখার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। এ তত্ত্বটি অনুভব ক'রেই রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দে পংক্তি-নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার গণ্ডি দৃঢ়হস্তে ভেঙে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।...'বলাকা'য় যে মুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই তাতে এই কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে।" আমার এই উক্তির উপর অমূল্যধনবাবু মন্তব্য করেছেন, "অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যে run-on ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, সেখানে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পংক্তি রচনা করিয়া কেবলমাত্র একটা কৃত্রিম নিরর্থক রীতির দাসত্ব করিয়াছেন। এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।" (বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৩৯, পৃঃ ৮৬)। তৎপর তিনি আমার নানা প্রকার গুরুতর 'ভ্রম' প্রদর্শন ক'রে দেখিয়েছেন যে, 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দে পংক্তি-বন্ধনের মুক্তি ঘটেনি। এস্থলে এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ বিষয়ে কি বলেন, শুধু তাই দেখিয়েই আজ ক্ষান্ত হব। আমি যাকে বলি প্রবহমান (বা enjambed) ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দ, আর অমূল্যধনবাবু তাকেই বলেছেন run-on ছন্দ। এই পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ গত বৈশাখ মাসের 'বঙ্গশ্রী'-তে লিখেছেন, "অমিত্রাক্ষর ছন্দে সব প্রথমে পাল্কির দরজা গেছে খুলে, তার ঘেরাটোপ হয়েচে বর্জ্জিত। তবুও পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চল্‌তে সুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পর্ব্বশেষ-রূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে র'য়ে গেচে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দর-মহল, তার দেয়ালগুলো সরানো হয়নি কিন্তু আধুনিক কালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার ক'রে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করচে। অবশেষে হাল আমলের তৈরী ইমারতে সেই দেয়ালগুলো বাদ দেওয়া সুরু হয়েচে। চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডি-ভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম 'নিষ্ফল প্রয়াস'! অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য়, 'পলাতকা'য়।" আমার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লেই এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাক্‌বে না যে, 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র মুক্ত ছন্দ সম্বন্ধে আমার কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথার কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। আমি যাকে বলেছি চোদ্দ বা আঠারো

অক্ষরের পংক্তির গণ্ডি-ভাঙা ছন্দ, তিনিও তাকে গণ্ডি-ভাঙা বা বেড়া-ভাঙা পয়ার ব'লে অভিহিত করেছেন। অমূল্যধনবাবু কিন্তু 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র ছন্দকে চোদ্দ বা আঠারো অক্ষরের পংক্তিতে সাজাতেই উৎসুক। কিন্তু তাও তিনি সর্ব্বত্র পারেননি। যেখানে যেখানে পেরেছেন সেখানেও ব্যাপারটা কতকটা আকস্মিক এবং কতকটা তাঁর কষ্টপ্রয়াস-প্রসূত। যাহোক্, 'মানসী'র গণ্ডি-ভাঙা পয়ার ছন্দের কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিষ্ফল প্রয়াস'। সম্ভবত অনবধানতা-বশতই তাঁর একটু ভুল হয়েছে, কেন-না 'মানসী'র 'নিষ্ফল প্রয়াস' নামক কবিতাটির ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের বেড়া-ভাঙা পয়ার নয়। বেড়া-ভাঙা পয়ারে লিখিত কবিতাটির নাম হচ্ছে 'নিষ্ফল কামনা'। এই কবিতাটি সম্বন্ধেই আমি আমার পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকায় লিখেছি, "এ কবিতাটিকে বলাকার যুগের স-মিল মুক্তক ছন্দের অগ্রদূত মনে করা যেতে পারে।" (পৃঃ ২৬)। ইদানীং "পরিশেষ" গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথ অ-মিল মুক্তক ছন্দে আরও অনেকগুলি সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আগন্তুক', 'জরতী', 'প্রাণ' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করতে পারি। এ সকল অ-মিল মুক্তক ছন্দের কবিতাকে মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতার সমশ্রেণী-ভুক্ত ব'লে গণ্য করা যায়। এ সকল কবিতায় অক্ষর বা পংক্তির বন্ধনের ন্যায় মিলের বন্ধনও ঘুচে গেছে। ধ্বনিগত ছন্দের মুক্তি এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হ'তে পারে না। অতঃপর কবিতার মুক্তি ঘটেছে পুরোপুরি ভাবগত গদ্যছন্দের মধ্যে, 'পুনশ্চ' গ্রন্থে।

যাহোক্, আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'পরিশেষে'র অ-মিল মুক্তক ছন্দের কবিতাগুলিতে শুধু যে পংক্তি-দৈর্ঘ্য ও মিলের বন্ধন থেকেই ছন্দের মুক্তি ঘটেছে তা নয়, সাধু ভাষার বন্ধন থেকেও ছন্দের মুক্তি ঘটেছে। দৃষ্টান্ত দিলেই এই ভাষাগত বন্ধন-মুক্তির অর্থ টা পরিষ্কার হবে।

সে না হ'লে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠ্‌ত না শঙ্খধ্বনি,
মিল্‌ত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হ'য়ে
রইত নীরব।
—পরিশেষ, প্রাণ।

এখানে উঠ্‌ত, মিল্‌ত, রইত প্রভৃতি হসন্ত-মধ্য প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির ছন্দের ঠাট হচ্ছে সাধু, কিন্তু ভাষার ঠাট হচ্ছে প্রাকৃত। এ ভাবে সাধু-ছন্দের ঠাটের মধ্যে প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল এই 'পরিশেষ' কাব্য গ্রন্থখানিতে। এইটেও পরিশেষের অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। যাহোক্, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবিতায় ব্যবহৃত ভাষার ঠাট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। এ উপলক্ষ্যে "বিচিত্রা" (পৌষ, ১৩৩৮, পৃঃ ৭১৫) এবং "পরিচয়ে" (মাঘ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩৮৯) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যথাসময়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। যাহোক্, 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির ছন্দ অমিল মুক্তক বটে, কিন্তু ভাষা সাধু; আর 'পরিশেষে'র অমিল মুক্তক ছন্দের কবিতাগুলির ভাষার ঠাট প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাকৃত। এ পার্থক্যটুকু স্মরণীয়। অবশ্য 'পরিশেষে' অমিল মুক্তক ছন্দে রচিত কবিতায় সাধু ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'জরতী'-নামক কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। সুতরাং 'নিষ্ফল কামনা' ও 'জরতী'র মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই তা শুধু ছন্দোগত নয়, ভাষাগতও বটে।

(শেষ)

চিত্র-লেখা

শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ

অপরূপ রূপ রচনার লাগি বিধাতা নিজের ধ্যানের যোগে,
সৃজিলা যে নারী চির মনোরমা ভুলাতে এ তিন ভুবন-লোকে,
ঋষি দিল তারে পুণ্যের ফল, কবি দিল পায়ে পূজার ফুল,
অনুরাগময়ী ছবি অতুল।
তারই আলেখ্য লিখেছে শিল্পী তুলি-সম্পাতে টানিয়া রেখা,
বহুভাবময়ী রস-কদম্ব, রূপবালা নাম—'চিত্র-লেখা'।
নিটোলা গৌরী, মুকুতা-দশনা, পক্কবিম্ব অধর পুটে,
ঘন কুঞ্চিত কাজল চিকুর এলায়ে কপোল বেলায় লুটে,
শশীকলা সম বিমল ললাট নীচে তার বাঁকা ভুরুর পাঁতি,
আনত নয়নে রোমরাজি দুলে কমল যেন বা ভ্রমর-সাথী!
অতুল রাতুল কপোল দু'টি!
আলোকে ঝলকে কানে দু'টি দুল, পুলক পাথর পড়িছে লুটি!
বেগুনীফুলের রঙ শাড়ীখানি, ধারে পুষ্পিত বনজলতা,
বক্ষে আঙুলে প্রকোষ্ঠ ঘিরে রতন ভূষণ জড়িত তথা।
দক্ষিণ করে লীলা-বিহঙ্গ; পয়োধর-মূলে চাপিয়া ধ'রে,
বাম কর দিয়া চঞ্চুতে রাণী আহার যোগায় আদর ক'রে।
অধরে, গ্রীবায়, কণ্ঠে, চিবুকে, কটিতট বেড়ি' কক্ষে তারি,
নব বসন্ত ছানি' কি মাধুরী জড়ায়ে ছড়ায়ে বলিতে নারি!
নয়নে যেন বা কুমুদী-বিভা!
কে জানে চোখের আড়ালে—নিভৃতে, আরো সে মোহিনী রয়েছে কিবা!

* * * * *

যতবার চাই মুখপানে তার, কত কথা কহে চিত্র-লেখা,
নয়নের কোলে নবনী উথলে কপোলে জাগায়ে রক্ত-রেখা!
বলে বিরহিণী, 'রে বুল্ বুল্!
বল্ দেখি কবে আসিবে সেজনা? ত্রিভুবনে যার নাহিক তুল্?'
বেদনা-হরষ ছাপিয়া যায়,
জল ঢলঢল আঁখির কোণায়, শ্বাস নিতে ভুল হয় বা হায়!
চোখ পালটিতে মনে হয় যেন প্রিয় সমাগমে বরষ পরে,
হাসিরাশি এই ফাটিয়া পড়ে!

মাণিক-ঝরানো ওষ্ঠ-অধরে থর থর করে দুইটি বাণী,
'এতদিন পরে এলে প্রিয়তম? মনে কি পড়িল তোমার রাণী?'
এ কি দেখি? প্রেম লীলাভিনয়?
'ভালোবাসি কি না জানি না, জানি না।' তবু সে কথা কি গোপন রয়?

* * * * *

হায় কোন্ জনা হেন সুভাগ্য, তোমার মনে যে বেঁধেছে বাসা?
অমৃত পশরা বহো কার তরে? কোন্ তাপসের পুরাবে আশা!
বলিবারে বাধে, সে-জনা কি...? ওই দিকে দিকে ছুটে রক্ত-রেখা,
নবনী বদন শত হ'য়ে নামে, স্তবকাবনত চিত্র-লেখা।
'মুখ তুলে চাও, এদিকে তাকাও; ওগো ভালো ক'রে নয়ন মেলো,
অমিয় সাগর তীরে বসি হায়, পিপাসায় যে গো পরাণ গেলো।'
পাষাণ প্রতিমা! শুধু সেই হাসি মেরু-প্রভা সম অধরে ফুটে,
নভোনীল, ধরা, অনল, অনিল, দুটি চরণের ছায়ায় লুটে!
মহাভাবময়ী রহস্য-লতা! বিদায়-ব্যথা কি বাজিছে মনে?
'মোরে ছেড়ে কেন চলে যাবে প্রিয়?'—
এই ভাষা জাগে নয়ন কোণে!

* * * * *

ওগো কবি আমি, কেহ কোথা নাই, মুক যবনিকা বারেক তোলো,
কবি-শিল্পীর মানস দুহিতা, কি তুমি? কে তুমি? অধর খোলো।

* * * * *

'আমি সেই নারী, অনাদি নূতন; রামধনু-রাঙা তোরণ বেয়ে
স্বরগ হইতে ঝরিয়া পড়েছি, ধরণীর ধূলা রেখেছি ছেয়ে।
দেহের কলসে রূপের মদিরা, আঁখিতে আমার প্রহেলি-আলো,
নিখিল-চিত্তে কুহক লাগাতে অজানিতে তারে বেসেছি ভালো।
প্রহেলিকা আমি! তবুও বুঝি না আপন মনেরই কেমন ধারা,
বিজয়িনী আমি, সর্ব্বহারা!
মেঘের বিজুরী বন্দী করেছে কনক-বলয়ে মাটির গেহ,
বারে বারে তাই ফিরে ফিরে চাই, মানুষের প্রেমে বিকাই দেহ।
বাহুপাশে মোর মিলন যখন বিরহ তখন নয়নে ভায়,
মোর জীবনের চির ইতিহাস—রৌদ্র মেঘের খেলা সে হায়!'

সংস্কার ?

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

হঠাৎ চোখে চোখ পড়িয়া গেল ; দু'জনেই দু'জনকে নয়ন ভরিয়া, বুঝি বা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল ; নয়নে সুপ্রকাশ গভীর বিস্ময় অপসৃত হইয়া আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের বিস্মিত দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে যবনিকা উঠিয়া, অত্যুজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ প্রকাশ পাইল। দু'জনের কালো চোখে আনন্দের আলোক ফুটিয়া উঠিল। হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া, অসিত কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, আপনি, কোত্থেকে ? কোথায় যাবেন ?

নীলা নমস্কার করিতে, অসিত অপ্রস্তুত হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল। নীলা বলিল, আসছি লক্ষ্ণৌ থেকে, যাবো কলকাতায়। আপনি কোথা থেকে, কোথায় যাবেন ? কেন, আপনি কি জান্তেন না, আমরা এখন লক্ষ্ণৌ-এ থাকি ?

—জানি, বলিয়া অসিত ওয়েটিংরুমের বেহারাকে দু'খানা চেয়ার আনিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসিল, সঙ্গে কে ? সেন আছেন ?

—না, ছোট দেওর আছে। কলকাতায় বড়দার অসুখের খবর পেয়ে ছুটছিলাম, পথে এই বিপদ ! তিনি ছুটী পেলেন না। আপনি কি কোন খবর পেলেন, ট্রেন চল্‌বে কি-না ?

—৪৮-ঘণ্টার আগে ত' নয়ই ; তবে চেষ্টা চল্‌ছে, যত তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন সারাতে পারা যায়।

বেহারা দু'খানা চেয়ার আনিয়া প্ল্যাটফর্মে পাতিয়া দিল। অসিত নীলার দিকে একখানা অগ্রসর করিয়া দিয়া অনুরোধ করিল, বসুন ! তারপর কহিল, আমারও বিপদ দেখুন-না, কাল রাত্রে কলকাতায় বিশেষ একটা জরুরী কাজ পড়েছে, অথচ যাবার উপায় নেই। লাইন ভাঙ্‌বার আর সময় হ'ল না।

নীলা কিছুক্ষণ কথা কহিল না, তারপর ক্ষুব্ধ-করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি হয়ত দাদাকে আমার শেষ দেখাও দেখতে পাব না। দাদা কি আর আছেন !

নীলা বলিতে লাগিল, খুব বেশী অসুখ। কাল রাত্রে একখানা, আজ সকালে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। শেষখানা ভীষণ—"কোন আশাই নাই, তবু এসো।"—আর্দ্রকণ্ঠে কথাগুলো বলিয়া নীলা কোলের উপরে রক্ষিত ছোট্ট ব্যাগটি খুলিয়া একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিল। ভাঁজ খুলিয়া একবার পড়িয়া অসিতের প্রসারিত হস্তে দিল।

অসিত বলিল, তাইত !

নীলা বলিতে লাগিল, পাঁচ ভায়ের এক বোন, আর সকলের ছোট, দাদা আমাকে কি ভালই বাসতেন ! সুখে দুঃখে আমাকে না হোলে দাদার আমার একটি দিনও চল্‌তো না। সেই দাদাকে একবার, শেষবার চোখের দেখাও হয় ত' দেখতে পাব না।—তাহার কণ্ঠস্বরে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছিল।

অসিত টেলিগ্রামখানা ভাঁজ করিতে করিতে বলিল, দেখবো কোনও উপায় করতে পারি কি-না ?

—কি করে পারবেন ? ট্রেন ত' চল্‌ছে না।

—আপনি একটু বসুন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। কিন্তু, দেওরটি কোথা ?

—সে গেছে ষ্টেশন মাষ্টারের খোঁজে।

—আমি আসছি বলিয়া অসিত উঠিল। বিদায় লইবার পূর্ব্বে সেই চোখ দু'টিতে আবার চোখ পড়িল। বর্ষার স্বচ্ছমেঘের আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ যেন ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মৃদুমন্দ ধারা ঢালিয়া দিতেছে। এই

চোখ দু'টি, কত কাল, কত দীর্ঘকাল অসিতের অন্তরে স্বপ্ন সৃজন করিয়াছে, তাহা শুধু অসিতই জানে ! নীলাও বোধ হয় জানিত ; কিন্তু প্রকাশ নাই। অসিত চলিয়া গেল, কৃতজ্ঞতায় করুণ দু'টি চক্ষু তাহাকে দূর—অতি দূর, যতদূর দেখা যায়, অনুসরণ করিয়া চলিল।

নীলার দেবর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, না বৌদি, কালকে রাত্রের আগে কোন আশা নেই। 'ব্রিচ'টা খুব বেশী হয়েছে, বুঝলে না, আর এক জায়গায় নয়, দু' জায়গায়। এদিকে মোগলসরাই ষ্টেশনের থার্ডক্লাশ যাত্রীঘরে যাত্রী আর ধরছে না। ষ্টেশন মাষ্টার তাদের যে কোথায় বসায়, কি করে, তা ঠিক করতেই পাচ্ছে না।

এ সবের কোন খবরের জন্য নীলার কোনই আগ্রহ ছিল না। সে নয়ন দুইটি পথে পাতিয়া সেই লোকটির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবর বলিতে লাগিল, ঘণ্টা দুই পরে-পরে লক্ষ্ণৌ-এর দিকে দু'খানা গাড়ী ছাড়বে বৌদি, ইচ্ছে করলে আমরা এখন ফিরতেও পারি। আমি বলছি কি, এখানে দু'দিন দু'রাত্রি পড়ে থাকার চেয়ে ফিরেই যাই চল।

নীলা নীরবে পথের পানে চাহিয়া রহিল। প্ল্যাট-ফর্ম্মেও অসাধারণ ভিড় জমিয়া গিয়াছে, দশহাত দূরের লোককেও দেখা যাইতেছে না।

দেবর বলিল, চা আনতে বলবো বৌদি ?

যত্নপরায়ণ দেবরটির আগ্রহাতিশয্যে বাধা দিতে নীলার কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু যে লোকটি গিয়াছে সে যতক্ষণ না ফিরে, কিছুতে মন দিতেও সে পারিতেছিল না ; বলিল, একটু পরে ঠাকুরপো।

বলিতে বলিতেই, অসিত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাস্য-ফুল্ল মুখ দেখিয়া নীলার অন্তরে আশা ও আনন্দ যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অসিত বলিল, উপায় হয়েছে। এইটি দেবর বুঝি ?

—হ্যাঁ। কি উপায় হোল ?

—একখানা মোটর আছে। এখন ছাড়লে, কাল বিকেল নাগাদ পৌঁছোন যায়। কিন্তু প্রায় সাত'শ মাইল মোটরে দৌড়োতে কি আপনি পারবেন ?

—পারবো।

যুবাবয়স্ক দেবর কৌতূহল-অধীর হইয়া কহিল, মোটরে কলকাতা ? ভাড়া মোটর ? কত ভাড়া লাগবে ?

—ভাড়া মোটর নয়।—নীলাকে বলিল, কিন্তু দেরী করলে হবে না। চা খাওয়া হয় নি বোধ হয়, আমারও না। ওরে পরমা, কেল্‌নারে খবর দে, তিনটে কেক্, রুটী-মাখন, চা—চট্ ক'রে।

নীলা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের ভার যেন বহিতে পারিতেছিল না ; মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, মোটর এসে গেছে ?

—মোটর বাইরেই আছে। কাশীর রাজার গাড়ী, আমি ঐ গাড়ীতেই এসেছি, আমার জিনিষপত্র গাড়ীতেই রয়েছে। রাজাকে একখানা 'তার' করে দিয়ে জানিয়ে এলুম শুধু। সে সব ঠিক আছে, তার জন্যে নয়, আমি ভাবছি, মোটর কাঁকানির কষ্ট আপনার সইবে কি ? যে শরীর আপনার !

নীলার মুখে হাসি ফুটিল, চোখে বুঝি খানিক দুষ্টামিও দেখা দিল ; বলিল, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই। কি হয়েছে আমার শরীরে ! আমি খুব শক্ত, তা জানেন না বুঝি ? দেখতে রোগা, কিন্তু কখনও আমার অসুখ হয়েছে শুনেছেন কি ?

অসিত সস্নেহ-দৃষ্টিতে সেই কৃশঋজু স্নিগ্ধকোমল দেহটিকে দেখিয়া লইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, অসুখ না হওয়াই ত' ভাল। আমাকে দু'মিনিট মাপ করুন, মুখ হাতগুলো ধুয়ে ফেলি, চা আসছে।

সে চলিয়া যাইতে, দেবর জিজ্ঞাসিল, উনি কে বৌদি ?

নীলা একটু অন্যমনস্ক ছিল, শুনিতে পায় নাই। দেবর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতে, ভাবমধুরস্বরে কহিল—বিশেষ বন্ধু।

দেবর বলিল, মোটরেই যাবে না-কি বৌদি ?

নীলা বলিল, ওমা, যাব না আবার ! অমন সুবিধে কেউ ছাড়ে ! তুমি কি করবে, ঠাকুরপো, যাবে, না ফিরবে ?

—তুমি যা বলবে?

—ফিরেই যাও তুমি, কি হবে মিছে কলেজ কামাই করে?

দেবর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, কি বলবো দাদাকে, ওঁর নামটা ত' বল্লে না?

নীলা বলিল, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, চিঠি দিলেই হবে। ওঁর নাম অসিতবাবু।

দেবর সম্ভবতঃ প্রসন্ন হইল না। তরুণ যুবকটি সুন্দরী বউদিদির পরম অনুরাগী, ভক্ত। সুন্দরী বৌদিদির দেবররা তাহাই হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাইল-পোষ্ট দেখিয়া ঘড়ি, কাগজ-কলম লইয়া হিসাব করিতে করিতে স্থির হইল, রাত্রি এগারটা আন্দাজ গয়া পৌঁছান যাইবে। রাত্রিটুকু সেখানকার ডাক্ বাঙলোয় নৈশ আহার সারিয়া বিশ্রাম লইয়া শেষ রাত্রে আবার ষ্টার্ট দিলে, বাকি চারশত মাইল আট ঘণ্টায় অতিক্রম করা যাইতে পারিবে। পাঁচ ঘণ্টা হয় নাই, তিন'শ মাইল পার হওয়া গিয়াছে, গয়া পৌঁছিতে বড় জোর দুই ঘণ্টা দেরী। রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে, আকাশের এক কোণে ছোট্ট একখানি চাঁদ হাসিতেছে। শান্ত প্রকৃতির চক্ষুতে যেন তন্দ্রা নামিয়াছে। নীলা যত জোরেই প্রতিবাদ করুক, যতই অস্বীকার করুক, শ্রান্তি ও ক্লান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে; চক্ষু চাহিতেও আর পারিতেছে না। অসিত থার্ম্মো ভরিয়া চা আনিয়াছিল, একবার তাহাও খাওয়া হইয়াছে, তবুও ক্লান্তি দূর হইতেছে না। মনের জোর না-কি নীলার কম ছিল না, তাই সে এখনও বসিয়া থাকিতে পারিয়াছে, অন্য কেহ হইলে, পারিত না। বারবার অনুরোধ করিয়া বিফল হইয়াও অসিত আবার অনুরোধ করিল, তুমি একটু শোও নীলা, পা দু'টো জুড়ে ছড়ের ওপর রেখে, আমার এইখানে মাথা রেখে একটু শুয়ে পড়।

—না, না, কিছু দরকার নেই, আমি বেশ আছি। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

অসিত তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া আদরের স্বরে বলিল, তুমি বেশ বল্লেই হবে! শোও বলছি।—বলিয়া অসিত হাত ছাড়িয়া, তাহার মাথাটি ধরিয়া নমিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নীলা পুলক-ঝঙ্কৃত বীণাধ্বনির মত বলিল, সত্যি আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

অসিত এবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, না-হচ্ছে ভালই, তবু তোমায় শুতে হবে। লক্ষ্মীটি, একটুখানি শুয়ে পড়।

অগত্যা নীলা জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিল। চাঁদের আলোর রূপণতা ছিল না, অবিরল ধারায় নামিয়া মুখখানিকে স্নান করাইতে লাগিল। অসিত দুইহাতে তাহার বিক্ষিপ্ত কেশগুলিকে সরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল, নীলা?

নীলা আবেশভরে কহিল, কি?

—রাগ করছ?

—কেন? রাগ করবো কেন?—সে যে রাগ করে নাই সেইটুকু বুঝাইবার জন্যই, অসিতের কোলে মাথাটার চাপ দিল।—'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলছি, তাতে রাগ করছ না ত'?

—না। ও ত' আমার ভালই লাগে। কেউ আপনি বল্লেই আমার বরং রাগ হয়। মনে হয় আমি মস্ত একটা ভারিক্কে লোক হয়ে পড়েছি।

অসিত আস্তে আস্তে নীলার শুভ্র কপালটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, নীলা আমি আজ যেন একটা স্বপ্ন দেখছি।

নীলা মৃদু মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিসের স্বপ্ন?

অসিত বলিল, আমার বহুকালের স্বপ্ন, বহুদিনের সাধনা আজ যেন সত্য হতে চলেছে, নীলা! তোমাকে যে কোনদিন আমার এত কাছে পাবো, তা ত' আমি ভাবতেও পারতুম না। সত্যি নীলা, তুমি এত কাছে,

আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছ, আমার মনে হচ্ছে, এ যেন সত্য নয়, স্বপ্ন!

নীলা উঠিবার চেষ্টা করিতে, অসিত মাথাটিকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না, উঠতে পাবে না।

নীলা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

অসিত বলিল, মুখে বলবার সুযোগ কোনও দিন হয় নি—হবার সম্ভাবনাও ছিল না—দৈব আজ আমার সহায়। আজ বলতে ইচ্ছে করছে, তোমায় জানাতে ইচ্ছে করছে নীলা, আজ কতকাল, কতকাল ধরে আমার মন তোমাকেই চেয়েছে। কোনদিন কোন সাড়া পায় নি, তবু আমার মন তোমাকেই চেয়েছে। তখন তোমার বিয়ে হয় নি, তোমাদের স্কুলের পথে দেখা হোত—মনে আছে?

—আছে।

—তারপর তোমার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি আমারই এক বন্ধুর ঘর আলো করতে গেলে। তুমি অন্যের স্ত্রী, আমার কেউ নও, কোনও সম্পর্ক নেই, সবই ত' জান্তুম নীলা—তবু প্রতিদিন, প্রতি রাত্রি আমার মন তোমাকে কামনা করতো।

নীলা জিজ্ঞাসিল, কত বাজলো?

অসিত হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল, সাড়ে ন'টা। কিন্তু, তোমার কাছে এ সব কথা ব'লে কি অন্যায় করছি, নীলা? তা যদি হয়, আর বলবো না। তুমি বিরক্ত হলে, নীলা?

নীলার স্বর পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ, মধুর, বলিল—না, বিরক্ত হই নি ত'।

নীলার বিরক্তি-সম্ভাবনায় অসিতের ভাব-ধারা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে কহিল—একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব, নীলা?

—কি?—স্বর বড় উদাসীনতায় ভরা।

ক্ষুব্ধ অসিত নীলার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি কোনদিন বুঝতে পারতে না, নীলা?—নীলাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল, আমার মুখ কোনও দিন সে কথা বলতে সাহস পায় নি, কিন্তু আমার চোখ কি সে কথা বলে নি তোমাকে? আমার মনের ভাষা, আমার অন্তরের কথা কি কোনদিন তুমি বুঝতে পার নি, নীলা?—নীলা তথাপি কথা বলিল না; অসিত ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—বলবে না, নীলা? বল। বলবে না? বলবে না?—নীলার কোমল করপুট দু'টি টানিয়া লইয়া তাহার হাতের মধ্যে চাপিতে চাপিতে আবার বলিল—বলবে না, নীলা? বেশ, ব'লো না।

নীলা বলিল, কি বলবো?

—আমার ভালবাসা কি কোনদিন তোমার মনকে স্পর্শ করে নি, নীলা?

নীলা বলিল, আপনি কি সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি পারি নে কেন?

—জানি নে। কিন্তু, আমার কথার উত্তর কই?

—আমি উঠে বসি,—বলিয়া নীলা উঠিয়া বসিল।

অসিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। চাঁদ মাথার আরও উপরে উঠিয়াছে, দূরে অন্ধকার-শির পর্ব্বতমালা আকাশের প্রান্ত চুম্বন করিয়া আছে, গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে। উভয়েই নীরব। কিন্তু অসিত নীরবতার মধ্যে স্বস্তি পাইতেছিল না। আজ তাহাকে প্রলাপে পাইয়া বসিয়াছে। নীলার কোলের উপর হইতে তাহার একখানি হাত টানিয়া বলিল—নীলা, চিরদিনই কি আমায় তুমি বাইরে ফেলে রাখ্‌বে? মনের কোণে একটুখানি স্থানও কি তুমি আমায় দেবে না?

নীলা সাগ্রহে কহিল, বন্ধুর স্থান ত' মনের মধ্যেই।

অসিত বলিল, শুধুই বন্ধু?

নীলা ভাবগদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিল, আমার বন্ধু বলতে একমাত্র আপনিই আছেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে আলাপ পরিচয় অনেকের সঙ্গেই হয়েছে, বিয়ের পরও যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু বন্ধুর আসন চিরদিন আপনার। আর সে আজ নয়, বিয়ের অনেক আগে, বন্ধুর প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসা আমি মনে মনে আপনাকেই দিয়েছি।

—কিন্তু ঐ-টুকুমাত্র? আমি যে অনেক বেশী আশা করি, নীলা।

—তার বেশী যে আমার দেবার নেই, অসিতবাবু।—বলিয়া অসিতের মুঠার মধ্য হইতে হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া রুমাল দিয়া চোখ দু'টা, অথবা মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। মুখে মাথায় ধূলাবালির কি অন্ত ছিল!

অসিতের বুকখানায় কে যেন হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আকাশ-ভুবন, নদ-নদী, স্থাবর-জঙ্গম তাহার নয়নে ও মনে যেন খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সে যে আর কোনো দিন মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে, কোনো কালে কথা বলিতে পারিবে, এমন ভরসা তাহার রহিল না।

নীলা পথের ধারের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-করুণ দৃশ্যাবলীতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ রহিল, তারপরে আর যেন পারিল না, কণ্ঠস্বরে বিশ্বের মধু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া বলিল, দেবতার কাছে মানুষ যেমন তার সব উজাড় ক'রে দেয়, আমিও যে সেই ভাবে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে ফেলেছি, আমার বলতে যে আমার আর কিছু নেই!

অসিত বলিল—কিছুই দিতে পার না, নীলা?

নীলা নতমুখে, নতআননে নম্র-মধুর অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল, কিছু কি আর আছে আমার? কতই বা বয়স তখন? কি-বা জান্‌তুম পৃথিবীর? তখন যতটুকু পেয়েছিলুম, তাইতেই বিভোর হ'য়ে গেছলুম। মনে হয়েছিল, তার বেশী পাওয়ার আর কি থাকতে পারে? তাই ভেবে, সবই না দিয়ে ফেলেছিলুম! সারা জীবন দিয়েই গেছি, বিনিময়ে কি পেয়েছি-না-পেয়েছি, কি পাব-না-পাব, সে ভাবনা কি কোনো দিন করেছিলুম। জানি, দিতে হয়; প্রাণ-মন বলত, দিতে হয়; সংস্কার ব'লে দিত, দিতে হয়; শিক্ষা দিত, দিতে হয়—দিয়েই চলেছি। নিজেকে নিঃস্ব, রিক্ত ক'রে দিয়েই চলেছি।

অসিতের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে নীলার মুখের পানে চাহিয়াছিল। নীলা কথা শেষ করিয়া, বুকফাটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যখন চুপ করিল, অসিত এই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল যে, কেন সে মরুভূমিতে তৃষ্ণা-নিবারণ করিবার ব্যর্থ-চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছিল? এক নিমেষে নিষ্ঠাবতী এই নারীর নিষ্ঠার তলে সে যে তৃণাদপি তুচ্ছ হইয়া গেল, ইহা মনে করিয়া তাহার কাছে সমস্তই বিস্বাদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অসিত নিজের মনে বলিল, আর না! যা হইবার হইয়াছে, তপস্বিনীর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করা হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হঠাৎ নানারকম শব্দ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হাওয়া ছাড়িয়া মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেল। অসিত ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইল না। চালক নামিয়া, বনেট খুলিয়া, নানাভাবে ইঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিল, সম্ভবতঃ পেট্রোল আসিতেছে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অনেক চেষ্টা করিয়াও গাড়ী চালান গেল না। নীলা কোলের উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অসিত নিজে নামিতে পারিতেছে না। এমন বিড়ম্বনায় আর কেহ কোনো দিন পড়িয়াছে কি? যাহার ভালবাসাই তাহার কাম্য, সে ভালবাসে না জানিয়াও, তাহার সুষুপ্ত দেহখানির উপরে এত মায়া, এত মমতা, এত যত্ন, এত স্নেহও যে হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিতে পারে, এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

নীলা হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, গয়া এসে গেছি বুঝি?

—না। গয়া এখনও প্রায় বাইশ মাইল দূর। রাস্তায় গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে।

নীলা সভয়ে বলিল, উপায়?

অসিত কহিল, নিরুপায়! মনে হচ্ছে সকাল পর্য্যন্ত এই তেপান্তরের মাঠেই পড়ে থাকতে হবে।

নীলা সভয়কণ্ঠে কহিল, সে-কি! এই মাঠের মধ্যে? একলা একলা? এই অন্ধকারে!—তখন চন্দ্র ডুবিয়া গিয়াছে, আকাশে যেন মেঘও জমিয়াছে।

—একলা কৈ? চার চারটে প্রাণী রয়েছি, ভয় কি, নীলা?

নীলা কোন কথা না বলিয়া মুখটি বিষণ্ণ করিয়া রহিল; অসিত ম্লানকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমার আর কোন ভয় নেই, নীলা। সে অভয় তোমাকে আমি দিয়ে রাখছি।

নীলা হাসিয়া বলিল, আপনাকে ভয়? বন্ধুকে ভয়? আপনি বুঝি ভাবেন, ইংরিজি 'ফ্রেণ্ড' শব্দটার বাঙ্গলা তর্জ্জমা ক'রে 'বন্ধু' বলি আপনাকে? তা কিন্তু নয়; শ্মশানে, মশানে, রাজদ্বারে, সম্পদে, বিপদে যাকে বিশ্বাস করা যায়, সে-ই বন্ধু। আপনি আমার সেই বন্ধু।

অসিত আবার সংযম হারাইতে বসিল; আবার নীলার একখানা হাত টানিয়া লইয়া, হাতের মধ্যে চাপিতে চাপিতে বলিল, ঐ-কি শেষ কথা, নীলা? যা বলেছো, তার পরে আর কিছুই কি তুমি বলবে না? একটি শব্দ, একটি কথা, তা কি বলবে না?

নীলা কথা কহিল না। অসিত হৃদয়হীন নয়। যে ভালবাসিতে জানে, ভালবাসিতে পারে, সে কখনই হৃদয়হীন হয় না। নীলার অন্তরের দ্বন্দ্বের সুর যেন তাহার অন্তরেও ধ্বনিত হইতেছিল, তাই সে বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলিল, সে-কি একান্তই অসাধ্য, নীলা?

নীলা কথা বলিল না, অন্ধকারেও দেখা গেল, মাথাটি নীচু করিয়া নীলা ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে শুধু জানাইল, অসম্ভব। নীলার শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস অসিতের হাতের উপরে ঝরিয়া পড়িল।

ড্রাইভার জানাইল, গাড়ীর ব্যাধি গুরুতর, রাত্রে সারাইবার সম্ভাবনা নাই। অসিত কাছে কোনো গ্রাম-ট্রাম আছে কি-না সন্ধান করিবার জন্য দ্বারবান ও ড্রাইভারকে পাঠাইয়া দিল। নীলা নির্ব্বিকারচিত্তে অন্ধকার দেখিতেছে, অসিত বলিতে লাগিল, ফার্ষ্ট ইয়ারে পড় তখন, একদিন চৌরঙ্গীর মোড়ে কলেজের গাড়ী ভেঙ্গে গেছল, মনে আছে, নীলা?

—তা আবার নেই! আপনি সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাদের তিনজনকে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সুলতা, নন্দিনী, আমি।

—তোমায় সকলের শেষে পৌঁছে দিই, না?

নীলা উদাসীনের মত বলিল, তা হবে!

হতাশাক্ষুব্ধস্বরে অসিত বলিল, 'তা হবে!' তার মানে,—মনে নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, যে ক'টি কথা তুমি বলেছ, আমি মুখস্থ বলতে পারি। বোটানিক্সে তোমরা কলেজের মেয়েরা পিক্‌নিক্ করছিলে, সেই রাস্তাটায় কতবার আমার মোটর পাক্ খেয়েছিল, তা আমি আজও বলতে পারি, নীলা! শেষকালে তুমি অকস্মাৎ চেয়ে দেখলে, আমি গাড়ী থামিয়ে নেমে প'ড়ে, তোমাদের তুলে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইলুম। তুমি আর একটি মেয়ে উঠ্‌লে।

—হ্যাঁ, সে মীনু।

—সেদিন কি বলেছিলে, বলবু? বলেছিলে, আপনার সঙ্গে বেড়াতে বড় ভাল লাগে।

—সে-কথা আজও বলতে পারি, সেটা সত্যি কথা। বিয়ের পরে হয় নি বটে, কিন্তু আগে! কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, কত ছলে, কতদিন ত' বেড়িয়ে নিয়েছি।—হঠাৎ গম্ভীর হইয়া নীলা একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যে যা চায়, সে বোধ হয় তা পায় না। দেখুন না, আমার বোহিমিয়ান লাইফ ভাল লাগে, তাই আমি চাই, আমার অদৃষ্টে জুটল ঠিক তার উল্টো।

অসিত বলিতে লাগিল, আমি এককালে কবিতা লিখতুম, লোকে বলে, ভাল লিখতুম…

—আমিও বলি। আপনার অনেক কবিতা আমি মুখস্থ বলতে পারি। একটা শুনবেন?

অসিত সাগ্রহে কহিল, বল শুনি।

"নারী কহে, 'নর, তুমি বড়ই সুন্দর।'
" 'তুমিই সুন্দরী নারী' কহিতেছে নর।
" 'কেহই সুন্দর নহে' কহে প্রেম ধীরে,
" 'আমি যদি বাসা নাহি বাঁধি বক্ষঃনীড়ে।' "

অসিত বলিল, ও-কথা তুমি বিশ্বাস কর?

—কোন্ কথা?—স্বরে আগ্রহের একান্ত অভাব।

সে-যে প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইতে চায়, তাহা বুঝিয়া অসিত বলিল, থাক্।

নীলাও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। আবার উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ-চাপ। অসিত বলিল, তোমার কত কষ্ট হচ্ছে, নীলা, না হ'ল খাওয়া, না পেলে একটু বিশ্রাম করতে! খাওয়া যা জুটবে সে ত' জানাই আছে, একটু ঘুমোবে?

—না, বলিয়া সে একসঙ্গে গোটা কত হাই তুলিল। অসিত বলিল, আমি ড্রাইভারের সীটে বসি গে, তুমি পা দু'টো ছড়িয়ে একটু শুয়ে পড়। বলিয়াই অসিত দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। নীলা বলিল, আপনিও একটু শুন্ না।

—সে কি হয়? এই অজানা জায়গা, অন্ধকার রাত্রি, দু'জনে ঘুমোন ঠিক হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে ব'সে থাকি!

নীলা হাসিয়া বলিল, দেখবেন, পাগল হয়ে যাবেন না যেন! বিজ্ঞেরা বলেন, চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে মানুষ চন্দ্রাহত বা পাগল হয়। আমার মুখ যেমনই হোক্, নারীর মুখের তুলনাই হচ্ছে চন্দ্র, কবি লোককে তা ত' আর বলতে হবে না। সেই জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি।—বলিয়া সে শুইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ অধরে দাহ অনুভব করিয়া নীলা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া চারদিকে চাহিতে লাগিল। অসিত পা-দানে বসিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। নীলা আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, যা বলেছি ঠিক তাই হ'ল ত'? Moon struck?

অসিত নীলার কোলের উপরে মাথা গুঁজিয়া বলিতে লাগিল, জানি না, জানি না, জানি না। শুধু জানি, তোমাকে আমার চাই-ই চাই।

অসিতের চোখের পানে চাহিয়া নীলা মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও মুখে মৃদু হাসি আনিয়া বলিল, আপনি উঠে বসুন।—বলিয়া সে নিজে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া আবার বলিল, পায়ের কাছে বস্‌তে নেই, উঠে আসুন।—নীলা অসিতের মাথাটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ছিঃ, উঠুন।

অসিত উঠিয়া বসিল। কিয়দ্দূর হইতে কতকগুলি লোকের কথা শুনা যাইতেছিল। নীলা বলিল, বোধ হয় ওরা ফিরছে।

অসিত কোনো কথা বলিল না।

নীলা জিজ্ঞাসা করিল, কত বাজল?

—দু'টো।

—মোটে?—তাহার স্বর অসীম নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

অসিত বলিল, তোমার বড় কষ্ট হল, না নীলা?

—না, কষ্ট আর এমন কি!

—তুমি আর একটু ঘুমুবে?

—ঘুম হয় কৈ?

—কেন, এতক্ষণ ত' হচ্ছিল।

—আমি বুঝি ঘুমিয়েছি? আমি ত' চুপ ক'রে মট্‌কা মেরে পড়েছিলুম।—বলিয়া হাসিতে লাগিল। অসিত কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। ড্রাইভার, দ্বারবান গ্রামের দুইজন লোকের মাথায় মুড়ি, মুড়কী, লাড্ডু, জলের কলস প্রভৃতি চাপাইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাদ্যে রুচি কাহারও ছিল না, দুই-এক গ্লাস করিয়া জল খাইয়াই ইহারা নৈশ-ভোজন সমাধা করিয়া লইল। মাইল-খানেক দূরে পুলিশের দফাদারের কোঠাবাড়ীতে সাহেব ও মেমসাহেবের জন্য শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে জানা গেলেও আর নড়াচড়া করিতে ইচ্ছা বা আগ্রহ তাহাদের হইল না। দুই ঘণ্টা রাত্রি বাকী আছে, এইখানেই কাটাইয়া দিতে পারা যাইবে, শেষ পর্য্যন্ত

তাহাই নির্দ্ধারিত হইল। দ্বারবান ও ড্রাইভার দূরবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে মুরাঠা (পাগড়ী) মাথায় দিয়া শুইতে গেল।

নীলা অসিতকে বলিল, এইবার আপনি একটু শুয়ে পড়ুন।

অসিত বলিল, না।

নীলা বলিল, শরীর খারাপ হবে যে।

—হোক্। শরীর ত' কারণে অকারণে সকলেরই খারাপ হয়, না-হয় আমারও হবে। আজকের রাত্রি আমি শুয়ে নষ্ট করতে পারব না।

—তবে গল্প বলুন।

—তুমি বল, আমি শুনি।

—আমি! আমি কি বলব? কি-ই বা জানি, বলুন।

আমি বেতাল পঞ্চবিংশতিও শুনতে চাই নি, হোমারের ইলিয়াড শোনার ইচ্ছেও আমার নেই, তোমার নিজের গল্প বল।

নীলা হাসিয়া বলিল, আমার নিজের গল্প?

—হ্যাঁ। বিয়ের পরের গল্প। বল!

নীলা বলিল, বিয়ের পরের গল্প। ক'বছর কলকাতায় ছিলুম, সে ত' আপনি জানেন। তারপর লক্ষ্ণৌ এলুম। সেইখানেই থাকি, ঘর-সংসার করি। খিদে পেলে খাই, ঘুম পেলে ঘুমুই! কথা কইবার লোক পেলে কথা কই, না-পেলেও, নিজের মনেই বক্-বক্ করি। তারপর, দাদার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতা যাচ্ছিলুম—সে ত' দেখলেনই। আর ত' কিছু নেই, বলবার। তার চেয়ে আপনি বলুন, আপনার গিন্নীর কথা, ঘর-সংসারের কথা।—বলুন। আচ্ছা, আপনি আপনার স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন? তিনি যা চান্, তাই দেন, যেখানে যেতে চান্, নিয়ে যান্, না?

অসিত আস্তে আস্তে বলিল, হ্যাঁ।

নীলা জিজ্ঞাসিল, আর তিনি?

—তাঁর কথা তিনি জানেন, আমি জানি নে।

নীলা হাসিয়া বলিল, বুঝতে পারেন না বুঝি?

অসিত বলিল, চেষ্টা করি নি। বোঝবার সময় পাই নি।

নীলা সহাস্যে বলিল, দশ বছরের মধ্যে সময় পেলেন না?

—সময় চাই নি, তাই পাই নি। সময় চাইবারও সময় আমার ছিল না, নীলা। আমি এই দীর্ঘ সময় আর একজনের সুন্দর মুখখানি, স্বপ্নমাখা চোখ দু'টি, তুলিতে আঁকা ভ্রূ দু'খানি, মধুঢালা হাসিটি, পদ্মের পাতার মত পা দু'খানি ভেবেই কাটিয়েছি; আর ভেবেছি, আমার অগাধ ভালবাসার খবর সে জানে, জানে, বোঝে। কে সে লোক, জান, নীলা?

নীলা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ঘাড় নাড়িয়া মৃদু শব্দ করিল, উঁ-হু।

—সে তুমি। তুমি, তুমি, তুমি! নীলা, তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার ভালবাসা।

নীলা আকাশের পানে চাহিয়া, সচকিতে বলিয়া উঠিল, আজকের রাত কি আর শেষ হবে না?

অসিত অন্ধকারেও একবার অন্তরভেদী দৃষ্টি ফেলিয়া নীলাকে দেখিতে চেষ্টা করিল, তারপর মাথাটা নীচু করিয়া অতি ধীর সংযতকণ্ঠে কহিল, এই রাত্রি বিফলে যাবে, নীলা?

নীলা বলিল, কি করবো?

—একটি কথা বল, একটি কথা। এই রাত্রি মধুময়ী হবে নীলা, অন্ধকারে ঢাকা আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, একটি কথা, একটিবার, বল নীলা। বলবে না?

নীলা কথা কহিল না।

অসিত বলিতে লাগিল, যদি কখনও একবিন্দু ভালবেসে থাক, নীলা, একবিন্দু করুণা তোমার মনে থাকে, একটিবার বল।

—কি বলবো?

অসিত কাকুতিভরা কণ্ঠে কহিল, একটিবার বল, ভালবাসি। একটিবার, শুধু একটিবার।

নীলা বলিল, আমি ত' বলেছি আপনাকে, আমার দেবার কিছুই নেই। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। আমার কিছুই নেই।

অসিত বলিল, তবে কি আমার এতকালের ধারণা সবই ভুল? কোনদিন কি একটুও ভালবাস নি? আই-এ পাস্ ক'রে তুমি বন্ধু-বান্ধবদের নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছিলে, মনে আছে?

অতীতকালের স্মৃতি কতই মধুর! বিগত দিনের কথায় নীলার অন্তরদেশ সহসা মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল; বলিল, আছে বৈ কি! আমার কলেজের মেয়েরা আর আপনি!

অসিত বলিল, একখানি নীল রঙের সিল্কের রুমাল উপহার দিয়েছিলে, মনে আছে?

—আছে।

সে রুমাল আমার আজও আছে। তার কোণের 'ন' অক্ষরটি আজও স্পষ্ট আছে। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা সেই রুমালখানির উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু তাকে নষ্ট করতে পারে নি।

নীলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অসিত হঠাৎ নিজেকে সম্বৃত করিয়া কহিল, হয়ত আমারই ভুল। মিষ্ট ব্যবহার, স্নিগ্ধ হাস্য, সযত্ন আতিথেয়তা, কিন্তু সে সবও কি ভুল? সে সবও কি মিথ্যা?

নীলা সতেজে বলিল, না-না, সে কেন মিথ্যা হবে? নারী-জন্ম নিয়েই যখন জন্মেছি, মিষ্ট ব্যবহার ছাড়া নারীর আর কি আছে? হাসি? ও আমার রোগ। না হেসে আমি পারি নে। আতিথেয়তা? বাঙ্গালা দেশের কোন্ মেয়ে না অতিথিকে যত্ন করে, বলুন তো?

অসিত আপনার মনে বলিতে লাগিল, তাই কি! এ সবের মধ্যে হৃদয় ছিল না? কি জানি!

নীলা কথাগুলা শুনিয়াছিল, দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল, হৃদয় আপনারা কাকে বলেন জানি নে; হৃদয় কি শ্রদ্ধা করে না? হৃদয় কি ভক্তি করে না? হৃদয় কি যত্ন করতে চায় না? আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, বুঝি না। কিন্তু এটুকু বুঝি, নারী যাকে একবার শ্রদ্ধা করেছে, ভক্তি করেছে, কোনদিন তাকে অশ্রদ্ধা বা অভক্তি করতে পারে না। কিছুতেই না। ভালবাসার কথা আলাদা। ভাল, নারী একজনকে, আর একটিবারই, বাসতে পারে। ফিরে পাক্-না-পাক্, প্রতিদানের আশা থাক্-না-থাক্, একবারই, একজনকেই সে ভালবাসে।

পূর্ব্বাকাশে বর্ণ-বৈচিত্র্য-বিকাশ দেখা যাইতেছিল, অসিত সেই দিকে চাহিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল। হঠাৎ বীণাধ্বনি স্তব্ধ হইল, অসিতেরও যেন মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। নীলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, নীলার শান্ত করুণ মুখের উপরে আকাশের বর্ণনাহীন বর্ণচ্ছটা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার করুণ নয়ন দু'টি আকাশ ভেদ করিয়া ঐ আলোকের উৎস দেখিতে গিয়াছে। আকাশ আরও পরিষ্কার, পৃথিবী আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অসিত বলিল, নীলা, কালরাত্রি প্রভাত হয়েছে, সুপ্রভাত বলতে পারি কি?

—সুপ্রভাত ত' বটেই! বলিয়া সে যুগ্ম কর উচ্চ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, প্রভাতে বন্ধুর মুখ দর্শন, তাও যদি সুপ্রভাত না হয়, কবে হবে আর?

অসিত অপরাধীর মত বলিল, আমায় ক্ষমা করতে পারবে কি?

নীলা হাসিয়া বলিল, আমি ত' রাগ করি নি যে ক্ষমা করতে হবে।

অসিত ভাবিয়া পাইল না, নারী-চরিত্রের রহস্য তাহার কাছে অজ্ঞাত থাকিয়াই গেল। এ ভালবাসে না, ভালবাসা লইতেও চায় না, অথচ তাহার নারীত্বের, সতীত্বের অবমাননাকারীর উপর ক্রোধও তাহার নাই!

প্রভাত হইবামাত্র গাড়ীও চলিল। জলের পাইপের ছিপিটি কোন্ ফাঁকানিতে খুলিয়া গিয়া জল নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় গাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সহজেই দোষ ধরা পড়িয়া গেল।

বেলা হইলে পথের ধারে একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামাইয়া প্রাতঃরাশ খাওয়া হইল। বেহারের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পাহাড়, মাঠ, ঘাট, জল, পথ, ছাদ, মাটি, বালি সব তাতিয়া উঠিয়াছে। সারা রাত্রির অনিদ্রা, নীলা গাড়ীর ছাদের দেওয়ালে মাথা রাখিয়া নির্জ্জীবের মত বসিয়াছিল, অসিত জিজ্ঞাসিল, কি ভাবছ নীলা?

—কৈ! কিছু ভাবি নি ত'!

—না, তুমি ভাবছ? কি ভাবছ, কাল রাত্রের কথা?

—না, না,—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি প্রভাত-বেলার সূর্য্যের রশ্মির মত উজ্জ্বল, মধুর, পার্ব্বত্য-নির্ঝরিণীর মত স্নিগ্ধ শব্দবর্ষী।

পরমুহূর্ত্তে বলিল, দাদাকে দেখে ফিরতে ত' হবেই ক'দিন পরে, তখন কি আপনার সময় হবে আমায় লক্ষ্ণৌ পৌছে দেবার?

অসিত তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, এর পরেও, তুমি আমার সঙ্গে একলা যেতে পারবে, নীলা?

উচ্ছ্বসিত হাস্যে নীলা বলিল, বা রে! তা কেন পারবো না? বন্ধুর সঙ্গে যাবো, তাতে ভয়টা কিসের?

অসিত কথা বলিল না। গাড়ী ছুটিতে লাগিল। ড্রাইভার এক সময়ে একটা মন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখাইয়া সহর্ষে কহিল, হুজুর বুধ-গয়া!

নীলা বলিল, এইবার হিসাব ক'রে দেখুন না, কখন্ কলকাতা পৌছোব?

—দেখি।— বলিয়া অসিত টাইম-টেবল, খাতা-পেন্সিলের সন্ধান করিতে লাগিল।

নীলা বলিল, গয়া পৌছে আগে আপনি স্নান ক'রে নেবেন, বুঝলেন? মুখ-চোখ আপনার যা শুকিয়ে গেছে! সারারাত না-খাওয়া, না-শোওয়া, কম কষ্ট গেছে আপনার!

অসিত মুখ ফিরাইয়া কথাগুলা যে বলিতেছে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। সে মুখ অসীম স্নেহে, অপরিসীম আত্মীয়তার রসে সঞ্জীবিত, উদ্ভাসিত।



ভারতের রূপ-মূর্চ্ছিত কন্দর

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কাল্পনিক আখ্যানে যাদুকরের মায়া সুগুপ্ত গুহা-গহ্বরকে উন্মুক্ত ক'রে অগণিত ঐশ্বর্য্য দেখিয়েছে। কখনও বা কোন দুর্ভাগা তার ভিতর বন্দী হ'য়ে ঢুকে বেরিয়ে আসবার মায়ামন্ত্র ভুলে গেছে। ভূগর্ভের বিভীষিকা এমনি ক'রে মানুষের চিত্তকে আচ্ছন্ন জড়িত হ'য়ে গেছে পিরামিডের অন্তরালের রচনাদি। সেই শ্রেণীর রূপ-সৃষ্টি মৃত্যুভয়ে জর্জ্জরিত মিশর নিজের ভীতি-রোমাঞ্চের চিহ্ন রেখে গেছে মাত্র—আনন্দ-স্বপ্নের নয়। আনন্দের মূর্চ্ছনা দেখতে হ'লে এ সব ক্ষেত্রে ভারতের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। ভারতের



এলিফেণ্টা-গুহা — ত্রিমূর্ত্তি ও অর্দ্ধনারী

করেছে। খ্রীষ্টীয় সভ্যতাও মাটির ভিতর গুহা রচনা করেছে ভীরু অন্তরকে আক্রমণ হ'তে রক্ষা করতে। অন্তরের সৌন্দর্য্য-স্বপ্নকে সুনির্ম্মিত গুহাভ্যন্তরে আনন্দের রূপ দেওয়া জগতে খুব কম সভ্যতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। মিশরীয় সভ্যতায় পরলোক-কল্পনার সহিত শিল্পী-মনের সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি মর্ম্মর-রূপ ধারণ করেছে—ভারতের গুহা-স্থাপত্যে। এ শ্রেণীর রচনা জগতে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বস্তুতঃ ভারতের রচনাই এ ক্ষেত্রে অপরাজেয় স্থান গ্রহণ করেছে। এলোরার কৈলাস-সম্বন্ধে কোন

ইউরোপীয় লেখক বলেন —"Kailash is probably the finest and grandest monolithic excavation in the world. No written description can adequately portray the stupendous work entailed in this temple."

Burgess সাহেবও স্বীকার করেছেন—"Kailash which is certainly the most magnificent rock-cut temple in India." বলা বাহুল্য 'India' কথাটির পরিবর্ত্তে 'World' শব্দটি প্রয়োগ করলে উক্তিটি আরও সুশোভন হ'ত।

বস্তুতঃ ইউরোপে রোমক বা গ্রীক্ মন্দির বা মধ্য-যুগের গির্জ্জাগুলি সমগ্র বা অংশের দিক্ থেকেও এ সমস্ত অন্তরাত্ম সৌধ-স্বপ্নের সাধনা ও সমাপ্তির ব্যাপক চেষ্টার সহিত তুলনীয় হ'তে পারে না। স্তম্ভের বৈচিত্র্য, মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য ও অবয়বের পারিপাট্য—সকল বিষয়েই নিভৃত কন্দরে নিহিত এ সমস্ত রূপ-স্বপ্ন অদ্বিতীয়।

পাথরের পাহাড় কেটে রূপের সুপ্ত মূর্ত্ত করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়—মহামানবের পক্ষেই এ শ্রেণীর চেষ্টা সুফল প্রসব করতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত পশ্চিমের সমগ্র স্থাপত্য-কৌশলও

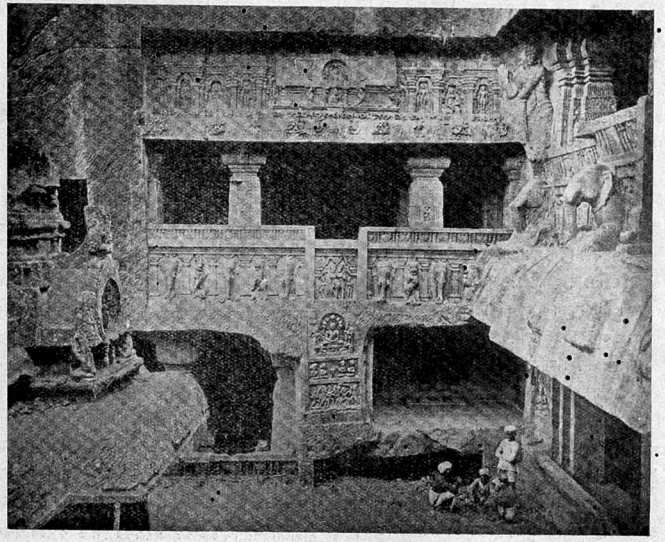

এলোরা গুহা — ইন্দ্রসভা

এ রকমের একটা সৃষ্টিকে পাহাড় কেটে বের করতে সক্ষম হবে কি-না জানি না। আদ্যোপান্ত একটা পাথরের পাহাড়কে সুনিপুণ হাতে কেটে মোমের মত গ'ড়ে তুলতে হয়—তাতে মন্দিরের অসংখ্য অবয়ব গ'ড়ে তোলা ও মূর্ত্তির সীমাহীন ব্যঞ্জনা প্রতিফলিত করাও দরকার। এ যুগের বা কোন যুগের ভারতেতর সাধনা তা সম্ভব করতে পারে নি।

দু'-একটা মর্ম্মর-গর্ভ মন্দির রচনায় ভারতীয় সাধনা পর্য্যবসিত হয় নি। বিহারের লোমশঋষির গুহা, উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি, কাথিওয়ারের অনন্ত-গুহা, জুনাগড়, ধান্‌ক্, তলাজ গুহা, সুবিখ্যাত কার্‌লি গুহা, ভজের গুহা, বেদস-গুহা, জুনারের গুহা, নাসিকের গুহা প্রভৃতি অসংখ্য গুহাভ্যন্তরের কীর্ত্তি-সমূহ সকলের চিত্ত হরণ করে ও বিস্ময় জন্মায়। এ সমস্তের অলঙ্করণ, খিলান ও স্তম্ভাদি এমনি সুন্দর ও মৌলিক যে, একালে এ সব গ'ড়ে তোলার ধৈর্য্য বা সাধ্য কারও নেই। এর ভিতর সাধারণতঃ এলোরা, এলিফেণ্টা, কার্‌লি ও অজান্তা জগদ্‌বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছে।

সময়-বিচারের দিক্ থেকে আলোচনা করলেও বিস্মিত হ'তে হয়। রাজগীর ও বরাবরের গুহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০ শতকের রচনা। জুনাগড় প্রভৃতির কাল তারই পরবর্ত্তী। বোম্বাইর পূর্ব্বাঞ্চলের ভাজ, বেদ্‌সা ও কার্‌লী গুহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। মহাকাল ও এলিফেণ্টার সময়, এর কিছু পরে। বাগগুহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কাল হচ্ছে খ্রীষ্টাব্দ ৩০০। অজান্তার অনির্ব্বচনীয় সম্ভারের রচনাকাল হচ্ছে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিম্বা আরও কিছু বেশী। এলোরার সৃষ্টির সময় হচ্ছে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০ শতক হ'তে খ্রীষ্টাব্দ ৮০০ পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বছরের একটা অলৌকিক সৃষ্টিধারা ভারতবর্ষ চ'লে এসেছে এ সমস্তের নির্ম্মাণ-বিধিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। এমনি ক'রে সহস্র বর্ষের এ শ্রেণীর রূপমরীচিকা ভারতীয় রসবোধকে চরিতার্থ ক'রে এসেছে — এ গৌরব সামান্য নয়।

যে দেশে তপোবনের নিভৃত নিঃশব্দতা ও কোলাহলহীনতা ধ্যানের অনুকূল ব'লে বিবেচিত হ'ত— অরণ্যের নীরব অঙ্কে যে সাধনা গভীর তত্ত্বজ্ঞানকে জন্মদান করেছে — সে দেশে ধরিত্রী-বক্ষের নিভৃত অন্তরাল যে একটা মাদকতা সৃষ্টি করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। শত্রুর আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার জন্য এ সব সৃষ্ট হয় নি। কাজেই কোন সুগুপ্ত বিভীষিকা হ'তে এ সমস্ত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি জন্মলাভ করে নি। পার্থিব বন্ধন ও লৌকিক আবেষ্টন হ'তে এ-সমস্ত সৃষ্টি সুদূরে রক্ষিত হয়েছে; অপার্থিব রূপ-সম্ভারেই এ-সমস্ত রচনা মণ্ডিত। এ-সমস্ত গুহায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এ-তিনটি প্রধান সাধনা নিজেদের অসীম উৎসাহ, অন্তহীন চেষ্টা ও সিদ্ধির পরিচয় রেখে গেছে।

কার্‌লীর গুহা বোম্বাই-পুনা রাজপথের দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত। G. I. P. রেলওয়ের Malavli ষ্টেশন হ'চ্ছে সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী। এই চৈত্যটি কারও মতে হ'চ্ছে — "the largest and finest, as well as, the best preserved of its class"। এটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০ শতকের রচনা। কার্‌লি-গুহার অভ্যন্তর ভক্তদের নিবিড় শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। প্রথম গুহার চৈত্যটি সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও বিপুলতায় এক আশ্চর্য্য-সৃষ্টি। বাইর হ'তে আলো সঞ্চারের কায়দাও অতি মৌলিক। ছাদের শুধু একটা জায়গা দিয়ে আলো এসে সমস্ত ঘরকে প্লাবিত ক'রে দেয়—সারি সারি সুগঠিত স্তম্ভ ও ধনুকাকারে তৈরী শীর্ষভাগ, তাতে এক অপরূপ শ্রীতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে। চৈত্যটির ছাদের কাঠের পাঁজরা-গুলি অতি প্রাচীন। এতকাল পর্য্যন্ত এ-সব কি ক'রে সুরক্ষিত আছে তা বর্ত্তমানে হেঁয়ালি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনুবীক্ষণ ও রাসায়নিক যন্ত্রাদি-সাহায্যে পরীক্ষিত হয়েও এ-শ্রেণীর দুর্লভ কাঠের স্বরূপ ভালরকমে বোঝা যায় নি। প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের রাসায়নিক লিখেছেন—"I have examined the bits of wood under the microscope and have noticed that a black shining deposit fills the cavities between the grains. Moreover the wood appears to have been scorched by fire ..... The tarry matter has evidently became oxidized and therefore resists the action of solvents ... I might also mention that wooden objects 5000 years old have also been found..."।

ভারতের প্রাচীন যে কোন সৃষ্টির ভিতরই এমন এক-একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার পাওয়া যায় যা অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। পাঁচ হাজার বছর প্রাচীন কাঠের খবর কোন চৈত্যের অভ্যন্তরে পাওয়া একটা সামান্য ব্যাপার নয়।

বৈচিত্র্য দেখে ক্ষুব্ধ হয় না, তাদের মতে ত্রিমূর্ত্তি হচ্ছে— "a perfect specimen of art"। গৌরব, গাম্ভীর্য্য ও বিরাটত্বের এরূপ সংহত নমুনা জগতের কোথাও আছে কি-না সন্দেহ। অর্দ্ধনারী মূর্ত্তিও অতি সুগঠিত ও সুসম্পন্ন। ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব শুধু দেবী রচনায় যে শিল্পীদের উৎসাহিত করেছে তা নয়—যুগ্ম-রূপ রচনার নানা মৌলিক উপায়ও নির্দ্দেশ করেছে।



রামেশ্বরের মন্দির — এলোরা

বোম্বাই বন্দরের এলিফেণ্টা-গুহা মর্ম্মরগর্ভ মন্দিরের একটা সুপরিচিত নমুনা। ভারতবর্ষে প্রবেশের পথে অবস্থিত ব'লে এ-গুহার আলোচনা ইউরোপীয় দর্শক-গণের বড়ই প্রীতিকর। এলিফেণ্টা গুহার 'ত্রিমূর্ত্তি' ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটা মুকুটমণি এবং তারই সংলগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি-সঞ্চয় সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। যারা ভারতীয় দেবতার বহু অঙ্গ-সংযোগের শুধু অদ্বৈত মূর্ত্তি নয় বা দ্বৈত মূর্ত্তিও নয় — দ্বৈতাদ্বৈত মূর্ত্তি রচনার একটা চরম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শিল্প-লীলা এ-মূর্ত্তিটিতে হর-পার্ব্বতীর এমন এক অনির্ব্বচনীয় রস উদ্‌ঘাটিত করেছে, তা জগতের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বহুকাল পর্য্যন্ত স্থূলদৃষ্টি বৈদেশিকগণ এ-মূর্ত্তিকে amazon সংজ্ঞা দিয়ে তৃপ্তিলাভ করেছে; বস্তুতঃ এরূপ

দুর্ব্ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ভারতীয় সৃষ্টিই পীড়িত। এলিফেণ্টা মন্দিরের স্তম্ভগুলি অতি নিপুণভাবে খোদিত। মন্দিরের তিনটি প্রবেশদ্বার আছে। ভিতরে ঢুকেই সেকালে ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ চমকিত হ'ত; সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হ'ত মন্দিরের অদ্ভুত দেবতা দু'টি। কারণ ইউরোপীয় ব্যবহার-বিধিতে এ-শ্রেণীর দু'টি দেবতাই জগতে অপরিজ্ঞাত এবং আশ্চর্য্য। তিনটি মস্তকযুক্ত দেবতা বা অর্দ্ধ-শরীর-যুক্ত দেবতা ইউরোপের মতে শরীর ও গণিত শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করেই রচিত হয়েছে। ওদের নিকট দু'টিই দুর্ব্বোধ্য ছিল। এ-যুগেও বহুশীর্ষ দেব-দেবীকে ইউরোপ অনুকূল চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু সমস্ত মন্দিরটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রকাণ্ড স্তম্ভগুলির বিচিত্র শ্রেণী প্রভৃতি সকলের চোখেই নিদাঘ রজনীর স্বপ্নের মতই মনে হ'ত। সন্ধ্যার পরে অনেকেই মশাল হাতে নিয়ে এ-গুহাটিতে উপস্থিত হ'ত—তাতে রক্তিম আলো প'ড়ে ত্রিমূর্ত্তির চারিদিকে একটা বিপুল মরীচিকার সৃষ্টি হ'ত। সুসভ্য বর্ত্তমান যুগে বোম্বাই বন্দরের অনতিদূরে এই মর্ম্মর-গর্ভ দেবমন্দির, গন্ধ-প্রাণ সমগ্র পাশ্চাত্য সৌধ-বিদ্যাকে পরিহাস ক'রে দণ্ডায়মান। রহস্য, স্বপ্ন ও কল্পনায় অনুপ্রাণিত দেব-পরম্পরা কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এলিফেণ্টা-গুহা ভারতের প্রান্ত হ'তেই সংগ্রাম ঘোষণা করেছে যান্ত্রিক সভ্যতার ইতর-বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে। ফেরো-কন্‌ক্রিটের লঘু বাহবা ও লৌহপঞ্জরের অলীক আশ্রয় অন্তঃসারহীন এ-যুগের নগরকে এলিফেণ্টার অদূরেই রচনা করেছে। সব যখন মুছে যাবে, বোম্বাইর রথচক্রঘর্ঘর-কোলাহল যখন ধূলি-লুণ্ঠিত হবে তখনও এলিফেণ্টা হ'তে রূপলোকের বাণী ধ্বনিত হ'বে অস্তমিত আধুনিকতার শ্মশানের উপর! ভারতবর্ষ নেপথ্যে তাই সযত্নে রক্ষা করেছে কয়েকটা দীপশিখা নিজের মর্ম্ম-কন্দরে—সকল যুগের ও দেশের মূর্চ্ছিত সৌন্দর্য্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে।

মর্ম্মর-মুখর এলোরা জগতের একটা বিস্ময়ের বস্তু। সমগ্রভাবে এই সমস্ত মর্ম্মর-কন্দরে কৃতিত্ব উদ্ঘাটন করা এ সামান্য পরিসরে সম্ভব নয়। অসাধারণ মনীষা, কালজয়ী নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অভগ্ন ধৈর্য্য—এই সাধন চতুষ্টয়ের সঙ্গমে শৈলগর্ভে এই ঐন্দ্রজালিকসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে কৈলাস মন্দিরকে ইউরোপীয়েরা জগতের "the finest and grandest monolithic excavation" ব'লে থাকে। এ প্রশংসা সামান্য নয়। কোন ইউরোপীয় ভাবুক বলেন—

"All commentary grows pale before the magnificent ruins of the temples of Elura, which more than any other ruins confuse the human imagination. At the sight of these astounding edifices the development of the plastic arts and of public religious luxury amongst the Hindus, receives the most striking attestation in the magnificence of these temples in the infinite diversity of their details and the minute variety of the carvings."

মানবের কল্পনাশক্তিকেও বিমূঢ় করতে পারে এমন সৃষ্টির মূলে আছে এক অলৌকিক প্রেরণা, যা ভারতীয় সাধনাকে সার্থক ক'রে তোলে। এই শ্রেণীর সৃষ্টির ভিতর শুধু অজান্তাই একটা সমুচ্চ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু অজান্তাতে আছে শুধু বৌদ্ধ নিদর্শন—এলোরায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন—ভারতীয় সভ্যতার স্বচ্ছ স্ফটিকের এই তিনটি ফলকই উন্মুক্ত। হাজার বছরের ঐতিহাসিক সৃষ্টি যখন অজান্তায় পরিসমাপ্ত হয়, প্রায় সে সময়ই এলোরার মন্দির-সৃষ্টির ঝঙ্কার উঠে। এ-আন্দোলনে ভারতীয় চিত্তের সকল দিকে সাড়া পড়ে। হিন্দু-দেব-দেবীর বিচিত্র রূপলীলা, বৌদ্ধ-সাধনার মূর্ত্ত পরিণাম, জৈন-ধর্ম্মের মহার্হতম আদর্শ মর্ম্মরিত হয়ে উঠল এলোরার রূপ-সাধনায়। এলোরা এল ভারতের আকাশে রূপসী অপ্সরীর মত—হাতে নিয়ে অলৌকিক রূপার্ঘ্য—ত্রিশ কোটি ভারতবাসী তা গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়ে গেল।

অজান্তা, বরভূধর, সাঁচি, ভারহুট ও নেপালে

বহুশীর্ষ নাগের যে প্রভা-তোরণ দেখতে পাওয়া যায়, এলোরার বৌদ্ধ-রচনায় তা নেই। অপরদিকে তন্ত্রোক্ত শক্তিদেবীদের এক নূতন প্রেরণা দেখে বিস্মিত নেপালেই এ-শ্রেণীর রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বলা প্রয়োজন হীনযানের বিশুষ্ক তত্ত্ব উত্তর ভারতে ক্রমশঃ মহাযানবাদের সমন্বয়ী (Synthetic) আবর্ত্তে প'ড়ে



অজান্তা গুহা—ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শ্রী

হ'তে হয়। তান্ত্রিক যোগাচার্য্যদের প্রাধান্য এককালে ভারতে কিরূপ বলিষ্ঠভাবে বর্ত্তমান ছিল এলোরার ভাস্কর্য্য হ'তে তা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইদানীং শুধু লুপ্ত হয়ে যায়; তাতে ক'রে অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কল্পনা হয়। নব্য তন্ত্রবাদের প্ররোচনায় সৃষ্টি হয় অসংখ্য দেবদেবী; বোধিসত্ত্ব-কল্পনায় সে-সব

দেবী অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। এরূপে রূপসৃষ্টির চক্রবাল ক্রমশঃই বিরাট হয়ে উঠে। ভারতবর্ষে এলোরাতেই এই ভাবচক্র অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া যায়। এলোরা এ-তিনটি ধর্ম্মসাধনের সহায়ক হওয়াতে এখানে একটা বিশিষ্ট রূপচক্র-সৃষ্টির উত্তম ফলপ্রসূ হয়েছিল। ক্রমশঃ হিন্দু দেব-সংগ্রহের প্রাচুর্য্য, বৌদ্ধ দেব-জগতের বৈচিত্র্য ও জৈন তীর্থঙ্করদের দেশকালজয়ী রূপ-সম্পদ এলোরার মর্ম্মর-চিত্রশালায় ভারতীয় সভ্যতার প্রতিভূ রূপে ফলিত হয়ে উঠেছে।

এলোরা নিজামরাজ্যে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম —আরঙ্গাবাদ হ'তে চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত। এক সময় জায়গাটি তীর্থস্থান ছিল। এলোরা-গুহাগুলি এই গ্রাম হ'তে আধমাইল দূরে উত্তর হ'তে দক্ষিণে বিস্তৃত। গুহাগুলি প্রায় এক মাইলের অধিক দীর্ঘ জায়গাকে বেষ্টন করে আছে। উত্তরদিকের গুহা-গুলি জৈনদের, দক্ষিণদিকের বৌদ্ধদের —এ-দু'টির মাঝখানে হিন্দু-গুহাগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে। বৌদ্ধগুহার সময় হচ্ছে খ্রীঃ ৪৫০ হতে খ্রীঃ ৭০০ পর্য্যন্ত। এর ভিতর বারোটি পৃথক অংশ আছে—তাদের নানা নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ-গুহাগুলির ভিতর বিশ্বকর্ম্মা গুহা, হিন্দু-গুহার মাঝে কৈলাস এবং জৈন-গুহার ভিতর ইন্দ্রসভার কিছু আলোচনা করলেই এলোরার অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য উদ্ঘাটিত করা হবে।

বৌদ্ধ-সৃষ্টির ভিতর বিশ্বকর্ম্মাগুহাকে শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। ইহার ভিতরকার চৈত্যটির আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮৫ ফিট এবং ব্যাপ্তিতে প্রায় ৪৫ ফিট। অবলোকিতেশ্বরের একটি সুবৃহৎ মূর্ত্তির দু'দিকে আছে দু'টি সুগঠিত অপরূপ মূর্ত্তি।

হিন্দু গুহাগুলির ভিতর কৈলাস মন্দিরই সব চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। Burgess সাহেবের মতে—"It is by far the most extensive and elaborate rock-temple in India." মন্দিরের পশ্চাতে যে বারান্দা আছে তা প্রায় ১২০ ফিট দীর্ঘ; দক্ষিণ দিকের পূর্ব্বাংশ ১১৪ ফিট দীর্ঘ—তাতে অনেক-গুলি মূর্ত্তি আছে—যেমন দুর্গা, বিষ্ণু, বরাহ, ত্রিবিক্রম, নরসিংহ, শিব, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি। পূর্ব্ব দিকের বারান্দা ১৮৯ ফিট দীর্ঘ—তাতে শিবের নানা মূর্ত্তি আছে যেমন নটরাজ শিব, শিবধূর্জ্জটি, ভৈরব, বিষ্ণু, শিব-পার্ব্বতী প্রভৃতি—উত্তর দিকের বারান্দায় শিবের বহু মূর্ত্তি এ মন্দিরের কৈলাস নাম সার্থক করেছে। কৈলাস মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে জমাট পাথর কেটে রচনা করা হয়েছে। প্রাঙ্গণটি ২৭৬ ফিট দীর্ঘ ১৫৪ ফিট বিস্তৃত। কৈলাস মন্দির রচনায় শতাধিক বর্ষের প্রয়োজন হয়েছে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে মিউজিয়ামে মূর্ত্তি বা মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ রাখবার ব্যবস্থা ছিল না—বস্তুতঃ এ রকম এক একটি মন্দিরই বিরাট চিত্র ও মূর্ত্তিশালা স্থানীয় হ'য়ে থাকত। হাজার হাজার দর্শক সমবেত হ'য়ে সৌন্দর্য্যের এই নন্দনরাজ্যে রসাস্বাদে চরিতার্থ হ'ত। অধ্যাত্ম-সাধনের শ্রেষ্ঠস্থানের সহিত সঙ্গম হ'ত সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার চরম ক্ষেত্র।

এলোরার জৈন-গুহার ভিতর ইন্দ্রসভার নাম সুপরিচিত। ইন্দ্রসভার বামভাগে খচিত হাতীগুলি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অতি চমৎকার নিদর্শন। কালের নিষ্ঠুর আক্রমণে গলিত ও ভগ্ন হলেও এখনও গুহাটির অপরূপ শ্রী চিত্তহরণ করে। প্রায় এক মাইল ব্যাপী এই বিস্তীর্ণ গুহাশ্রেণী ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সংহত রূপেতিহাস রেখে গেছে, যা নিঃশব্দে অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম ক'রে দর্শকগণ মনে করে—বাস্তবিকই একটা বিরাট তীর্থসঙ্গম হ'ল। আধুনিক কালে সমগ্র পৃথিবীর দর্শকগণ এসে ভারতের প্রাচীন সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস মন্দিরের বিরাট খোদিত মর্ম্মর-রচনায় পেলব কিংখাবের শ্রী আছে। অসাধারণ ভাস্কর্য্য পরিচয়ে কারও মনে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না যে, একাজ যারা করেছে তাদের ইচ্ছাশক্তি অটুট ও অটল ছিল এবং তারা সমস্ত ধনরত্নের বিনিময়েও কালজয়ী সৌন্দর্য্যলোকের বার্ত্তা উদ্ঘাটিত করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। যে গুহা শুধু সাধকের একাকিত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে—সে গুহার

ভিতর জনতার বিরাট স্রোত সঞ্চারিত ক'রে সার্থক ও পূত করা হয়েছে ভাগবতী করুণার নিকট বহুমুখী মানবচিত্তের নিবেদন। পাষাণীও অহল্যারূপ ধারণ করেছিল ভগবানের পাদস্পর্শে। এলোরার ক্রোড়েও কোন মাহেন্দ্রক্ষণে নিঃশব্দে সে পাদস্পর্শের সঞ্চার লালিত্য নিয়ে। ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসের

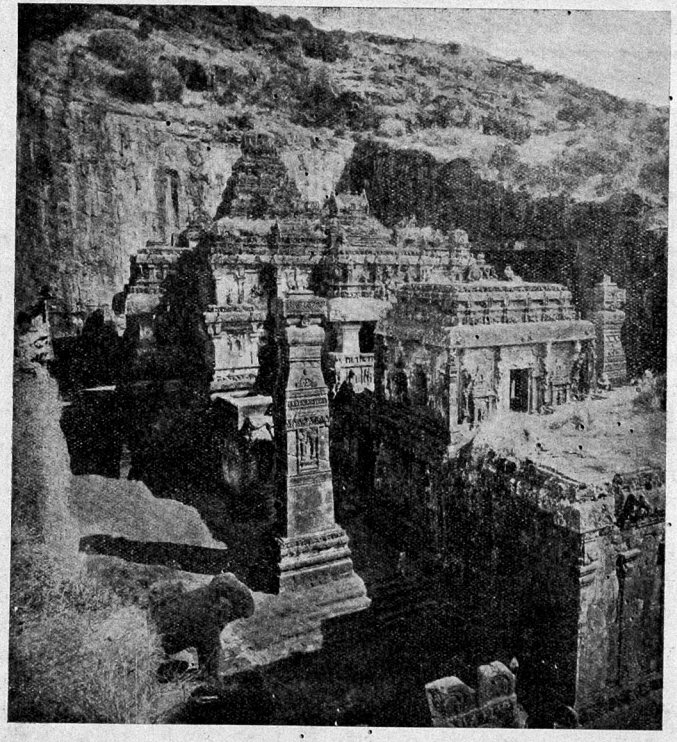

কৈলাস মন্দির — এলোরা

হয়েছিল তাতে ক'রে শতবর্ষের সাধনা মুহূর্ত্তে সফল হ'য়ে জন্মদান করেছিল এই পাষাণী সুন্দরীকে— রুক্ষ স্তূপের আস্তরণ ভেদ ক'রে অক্ষররণে শিল্পিত

ক্রোড়ে এমনিভাবে নব নব সৌন্দর্য্য-সঙ্গমে চিত্ত অভিভূত হয়ে পড়ে। "যোগঃ ভোগায়তে মোক্ষায়তে চ সংসারঃ"—কুশাগ্রবুদ্ধি-তন্ত্রের এ উক্তি সার্থক হয়ে উঠে সৌন্দর্য্যের এই অপরূপ রূপ-তীর্থে। শুধু যোগীমাত্র নয় ভোগীও একান্ত সন্তর্পণে দেবলীলার অশ্রান্ত মর্ম্মর অভিনয় দেখে তৃপ্ত হয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যও এ শ্রেণীর মর্ম্মরগর্ভ সৃষ্টি হ'তে বঞ্চিত হয় নি। বাঘ-গুহা ইতিমধ্যেই সুদর্শন চিত্রাবলির জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। অজান্তা, বাঘ, শ্রীগৃহ প্রভৃতি জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নমুনা পর্য্যাপ্তভাবে পাওয়া গেছে। গোয়ালিয়র রাজ্য বহু ব্যয়ে বাঘ-গুহার চিত্রাবলি প্রকাশ ক'রে ভারতীয় সৌন্দর্য্য-রস-পিপাসুদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছে। গুহাটি Malwa হ'তে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে; বাঘ নদীর উপর শুধু এই পাহাড়টিই দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চতায় পাহাড়টি ১৫০ ফিট—মোটরযানের সাহায্যে খুব কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি গোয়ালিয়র গবর্ণমেণ্ট এই গুহাটির সৌষ্ঠবের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন।

এ প্রসঙ্গে উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উল্লেখ না করলে এ শ্রেণীর দেব ও দেবায়তনের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে। এ সমস্ত গুহা অতি প্রাচীন। অনন্ত-গুহা ভারহুটের সমসাময়িক বলে মনে হয়। হাতী-গুম্ফার সামনের উৎকীর্ণ লিপি ফার্গুসনের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০ শতকের। এ প্রসঙ্গে ফার্গুসনের একটা উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি—

"The important lessons, we are taught by the peculiarities of the Hathi Gumpha, are the same that can be gathered from the examination of the caves in Bihar. It is that all the caves used by the Buddhists or held sacred by them anterior to the age of Asoka are mere natural caverns unimproved by art. With his reign the fashion of chiselling cells out of the living rock commenced and was continued with continually increasing magnificence and elaboration for nearly 1000 years after his time."

উদয়গিরির রাণী-প্রাসাদ (রাণী-কা-সুর), গণেশ-গুম্ফা ও হাতী-গুম্ফা সুপ্রসিদ্ধ। ভারতীয় শিল্পী যে চমৎকার ও স্বাভাবিক হাতী খোদাই ক'রতে পারে গণেশ-গুম্ফা তার দৃষ্টান্তস্থল। রাণী-প্রাসাদের সুদীর্ঘ মূর্ত্তিফলক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জয়বিজয়-গুহা ও স্বর্গপুর-গুহার উল্লেখ না করলে উদয়গিরির প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে।

ভারতে বহু বিচিত্র মর্ম্মরগর্ভ মন্দির থাকলেও নানাকারণে অজান্তা যেরূপ সকলের মন হরণ করেছে এমন কোন সৃষ্টিই করতে পারে নি। অজান্তাও নিজামরাজ্যে অবস্থিত — হায়দ্রাবাদের অধিপতি এ-হিসেবে অতি ভাগ্যবান্। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির তিনিই প্রভু। অজান্তা, আরঙ্গাবাদ হ'তে ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং Bhusaval-এর ৩৫ মাইল দক্ষিণে।

প্রায় ২৫০ ফিট উঁচু অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সন্নিবিষ্ট দীর্ঘ মর্ম্মর-শৈলকে উৎকীর্ণ ক'রে অজান্তার স্বপ্ন-জগৎ রচিত হয়েছিল। ফরাসী রাষ্ট্রপতি Clemençeau অজান্তা দেখে অবাক্ হয়ে যান এবং অল্পকাল পূর্ব্বে নর্ত্তকী প্যাভলোভা অজান্তার রূপ-চাঞ্চল্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। গুহাগুলি প্রায় ৬০০ গজ বিস্তৃত — চারিদিকের আবেষ্টনীর ভিতর এই বঙ্কিম মর্ম্মর-বিধান সমগ্র ভারতের ললাটে তিলক-স্থানীয় হ'য়ে আছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব সংহতিতে অজান্তার রূপ-বার্ত্তা জগতের নিকট অভূতপূর্ব্বভাবে প্রকট হয়েছে।

অজান্তা-গুহাগুলিকে নম্বর দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে—এ শ্রেণী প্রাচীনত্বের দিক্ হতে করা হয় নি। নবম ও দশম গুহাদ্বয় অতি প্রাচীন, ১০০ খ্রীষ্টাব্দ এ-দু'টির রচনাকাল—প্রথম ও দ্বিতীয় গুহা পরবর্ত্তী কালের (৬২৭ খ্রীঃ—৬২৮খ্রীঃ) সৃষ্টি। এ দু'টি কালের ভিতরেই অজান্তার উনত্রিশটি গুহা রচিত।

নালন্দা প্রভৃতির ন্যায় অজান্তাও একটা শিক্ষা ও শিল্প-কেন্দ্র ছিল। বস্তুতঃ সেকালের অধ্যয়ন ও ধ্যান-গৌরব পারিপার্শ্বিক অনুকূল আবেষ্টনের ভিতরই প্রদীপ্ত হ'ত।

অজান্তা-গুহার উনবিংশতি গুহার সম্মুখভাগ হ'তে অজান্তার মূর্ত্তিকলা ও স্থাপত্য-প্রতিভার একটা ধারণা করা যায়। নবম ও দশম গুহার চিত্রাবলিই হ'চ্ছে প্রাচীনতম। ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যকে এতটা তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে এবং হচ্ছে যে, এ প্রসঙ্গে বিদেশী আলোচকের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করলেই মনে হবে, কোন বিশিষ্ট রূপালোচক এ সমস্তের প্রতি পক্ষপাত দেখায় নি। অজান্তার নবম ও দশম গুহার প্রাচীনতম আলেখ্য সম্বন্ধেই একজন ইউরোপীয় সমজ্‌দারের উক্তি উদ্ধৃত করছি। বলা প্রয়োজন, ইউরোপের রিনেশাঁস যুগ তখনও কালের গর্ভে অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল এবং খ্রীষ্টীয় কলার প্রাথমিক যুগের উদ্ভট রচনার সবেমাত্র সূত্রপাতটুকু হয়েছিল। ইউরোপীয় রসিক বলেন—"Taken as a whole.....the art, even at this early age, had reached an advanced state of development exhibiting perfected execution and draftsmanship. The oldest paintings of Ajanta represents an art of maturity not the first efforts of individuals groping in the darkness of inexperience but the finished work of a school of artists trained in a high art, manifesting great and ancient tradition."

অন্ততঃ আর দু'চার শ' বছরের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিপক্ক অভিজ্ঞতা না থাকলে এ রকম চিত্রকলা সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ নানাদিক হ'তে অজান্তার চিত্রাঙ্কন অপরাজেয়। চৈনিক, পারসিক ও অন্যান্য চিত্র-সম্পদ অজান্তার লীলা-তুলিকার ছন্দ-গৌরবে মলিন হয়ে যায়। শুধু দেব-দেবীর ছবি নয় সামাজিক জীবনের অসংখ্য প্রতিবিম্ব, শোভাযাত্রা, নৃত্য, দেবসেবা, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অসংখ্য রচনার দৃষ্টান্তে বিস্মিত হ'তে হয়। প্রত্যেকটি রচনার শ্রী ও শালীনতা সকলকে মুগ্ধ ক'রে দেয়।

অজান্তার রূপ-জালে বাস্তবতার ছায়াপাতও সকলকে আকর্ষণ করে। আর একটি অনুরক্ত মহিলার উক্তি (Lady Herringham) উদ্ধৃত করতে হয়। তিনি অজান্তার রূপেঙ্গিতকে চৈনিক ও জাপানী চেষ্টার অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত বলে মনে করেন—"The outline is in its final state firm but modulated and realistic and not often like the calligraphic sweeping curves of the Chinese and Japanese. The drawing is on the whole like the medieval Italian drawing. The artists have a complete command of postures. Their knowledge of the types and positions, gestures and beauties of hands is amazing."

এ সব প্রশংসা সামান্য নয়। লেডি হেরিঙ্গাম ইউরোপীয় সভ্যতায় দীক্ষিতা, তিনি শুধু বাইরের দিক্ হ'তে বিচার ক'রে এতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ভিতরের দিক্ হ'তে অজান্তার চিত্রকলার বিচার অতি যৎসামান্যই হয়েছে। বস্তুতঃ অজান্তার চিত্রকলার রীতি অতি সুনিবদ্ধ ও সমন্বয়ী—চৈনিক চাতুর্য্য বা জাপানী লঘুতার মত কোন চেষ্টা দ্বারা এ বিরাট মহাকাব্য কোথাও আহত হয় নি। বর্ণ, রেখা ও বর্ত্তনার অসামান্য সংযোগে ভারতীয় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এক অপরূপ লাবণ্য লাভ করেছে। বস্তুতঃ আধুনিক চিত্রকরগণও সুকৌশলে অজান্তার রূপ-প্রপাত হ'তে প্রেরণা লাভ করতে উৎসাহিত হয়েছে।

এ সমস্ত মর্ম্মর-স্মৃতিতে লৌকিক রূপ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অলৌকিকেরও একটা সর্ব্বাভিভাবী ব্যঞ্জনা হয়েছিল, যা জগতের ইতিহাসে এখনও অপরাজেয় হ'য়ে আছে। অজান্তা-গুহার রূপমূর্চ্ছিত মন্দিরের এ আখ্যান বিবৃত না হ'লে ভারতীয় সংস্কৃতির ভূয়িষ্টদানের কথাই বলা হয় না। অজান্তার কারুণ্যে বিকশিত ভগবান্ তথাগত এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি—জগতের কোন চিত্রসৃষ্টিই রূপায়িত এ বুদ্ধের সহিত তুলিত হ'তে পারে না। অজান্তার মা ও মেয়ের পেলব-সৌকুমার্য্য এ শ্রেণীর সকল চিত্র-চেষ্টাকে হতশ্রী ক'রে দেয়। মাতৃত্বের কমনীয়তার সহিত সঙ্গত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের

চরণতলে অযাচিত আত্মসমর্পণের মাধুর্য্য। এমনি ভাবে এই অমর গুহার রচনা একটা অনির্ব্বচনীয় মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে সকলের তৃপ্তিবিধান করেছে।

অজান্তার মুকুরহস্তে রাণীর প্রসাধন দৃশ্য, রাজকীয় শোভাযাত্রা প্রভৃতি এক একটা অসীম মানবেতিহাসের বাহন হ'য়ে একাল পর্য্যন্ত সত্যিকারের রসবিস্তার ক'রে সকলের চিত্তরঞ্জন করছে। তাই অজান্তার হৃদ্‌স্পন্দনের সহিত বিশ্বের চিত্ত-বেপথু সহজেই সমতান হ'য়ে উঠে। বস্তুতঃ একটা ক্ষুদ্র গুহার পরিসরে মানব হৃদয়ের যে ব্যথা, অনুরাগ, ত্যাগ ও ভোগের দীপশিখাচয় প্রজ্জলিত রাখা হয়েছে, তা কোন বিশিষ্ট স্থান ও কালের নয়—তা অগণিত জনতার অসীম জীবনযাত্রারই অঙ্গস্থানীয় এবং নিরবধি কালের হিল্লোলিত প্রগতিরই দ্যোতক।

অজান্তার ভাস্কর্য্য, সৌকুমার্য্য ও পারিপাট্য অনবদ্য মাধুর্য্যে মণ্ডিত। নাগরাজ ও মহিষীর সুরচিত দৃশ্যে যে দুর্লভ মুখশ্রী বিকশিত করা হয়েছে তা যে কোন মূর্ত্তিকলার পক্ষে গৌরবস্থানীয়। অতি সহজ ও সরল অঙ্গ-ভঙ্গীকে এমনি নিপুণ কলা-কৌশলে উপস্থিত করা হয়েছে যে, অনেক সময় সত্যিকার ব্যাপার ব'লে ভুল হয়—অথচ সে সব পশ্চিমের মত model রেখে নকল করার উৎসাহ হ'তে রচিত হয় নি। অজান্তায় সাপের ফণা দিয়ে রচিত প্রভা-তোরণ সৌন্দর্য্যে রত্নখচিত প্রভা-তোরণকেও হার মানিয়ে দেয়।

এমনি ক'রে নিভৃত কন্দরে ভারতবর্ষ রেখে গেছে এক অদ্ভুত মর্ম্মরের আল্‌পনা—যার প্রতি রেখাবর্ত্তে আদিকালের ভারতের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা যেতে পারে। ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত এই সমস্ত মর্ম্মরগর্ভ-সৃষ্টি কোন ইতর দম্ভ বা বাহবার অপেক্ষা করে নি। একান্তভাবে মানুষের অন্তর-গুহায় ভাবাবেগে যে জগৎ উত্থিত হ'য়ে বার বার লীন হয়, যা সকল চক্ষুর দৃষ্টি হতে দূরে থেকে সুগুপ্তভাবে ক্রীড়া করে সে গুহারই প্রতিরূপক হয়েছে এ সমস্ত মর্ম্মর গুহা। ভারতের মর্ম্মর-বক্ষে উঠেছে এ সমস্ত ভাবের ঝড়—অন্তরের গভীরতর নীড়ে রচিত হয়েছে এ সমস্ত মর্ম্মকথা। লোকচক্ষুর অন্তরালেই ফুল ফোটে, সমুদ্রে প্লাবনবেগ উপস্থিত হয়—ভারতীয় সৃষ্টির বিচিত্র প্রেরণা ভারতীয় সভ্যতার অন্তরতম প্রকোষ্ঠেই প্রাণবান্ হয়ে উঠেছে। কাজেই এ সমস্ত মর্ম্মর মন্দির, মর্ম্মর দেবমূর্ত্তি এবং লীলায়িত বর্ণ-ব্যঞ্জনা অন্তরলোকের বার্ত্তাই বহন ক'রে এনেছে। ভারতবর্ষকে অধ্যয়ন করতে হ'লে এ সমস্ত মর্ম্মর-পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে হবে। পশ্চিমের হাতে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না।

বস্তুতঃ এ সমস্ত মর্ম্মর-রূপকে আছে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস যা একাল পর্য্যন্ত আলেয়ার মত সকলের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক'রে এসেছে। ভারতীয় কন্দর ভারতের অন্তর্মুখীন সভ্যতার চরম দান—এ দানকে বহির্মুখীন পশ্চিমের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে যাওয়া বৃথা—ভারতবর্ষের বিরাট সৌন্দর্য্য-সম্ভার পরিক্রমার পদে পদে একথা মনে হয়।

বলা বাহুল্য, ভারতের রূপমূর্চ্ছিত-কন্দর-মন্দির দুষ্মন্তের অঙ্গুরীয়কের মত বার বার সমগ্র বিস্মৃতির অতল জলধিগর্ভে একটা নূতন অভিজ্ঞানের প্রতীক্ষায় আছে। সে অভিজ্ঞানে ভারতীয় তত্ত্ব ও সংস্কৃতি একটা নূতন রূপে প্রদীপ্ত হবে। ইউরোপের ক্ষণভঙ্গুর বহির্মুখীন রূপসঞ্চয় তখন ভারতীয় রূপাধারী প্রতিভার সাহায্যে প্রাত্যহিক মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার পাবে। দিন দিন নূতনের সন্ধান ও প্রত্যাখ্যান—নেতি নেতি ব'লে প্রতি যুগের চিন্তাস্রোতকে বিসর্জ্জনের উৎসাহ তখন মন্দীভূত হ'য়ে আসবে; এ সংস্পর্শে প্রাচীনই নবীন হয়ে উঠবে প্রতিমুহূর্ত্তে—নূতন ফ্যাসান ও হাবভাবের জন্য হা-হুতাশ করতে হবে না এবং অতীতের জন্য প্রাত্যহিক শ্মশান-সৃষ্টি করারও প্রয়োজন হবে না। সে শুভ-মুহূর্ত্তেই ভারতবর্ষের রূপলক্ষ্মী ভুবনেশ্বরীরূপে উদ্ভাসিত হবেন।

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে দুইটী নায়িকা সর্ব্বজন-পরিচিত, বাঙ্গালার যে দুইটী নায়িকার অপরূপ-চিত্র গাথায় ও গানে বাঙ্গালীর চিত্তপট অধিকার করিয়া আছে—তাহার একটী গৌরী, অন্যটী রাধা। উভয়েই রাজকন্যা, রাজ-ঐশ্বর্য্যের মাঝে সুখের কোলে লালিতা, কিন্তু প্রেমের জন্য ইঁহাদের যে তপস্যা, যে ত্যাগ, যে দুঃখবরণ—সত্যই তাহা অতুলনীয়। পুরাণে, মঙ্গল-কাব্যে, গ্রাম্য-গীতি-গাথায় এই দুইটী নায়িকার মহনীয় চরিত্রের যে বর্ণন-বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন ধারার বিভিন্ন প্রবাহের যে সাবলীল ভঙ্গিমা, কালে কালে কবি-হৃদয়ের সেই কল্পনা-বিলাস, সেই মানসোল্লাসের রহস্য-বিকাশ আজিও আলোচিত হয় নাই। হয়তো ভাষায় ইহার অভিব্যক্তি হয় না, অন্ততঃ আমাদের তাহা সাধ্যাতীত। তথাপি এই যে প্রয়াস ইহা জিজ্ঞাসার সূচনা মাত্র, সিদ্ধান্ত-স্থাপনা নহে। চণ্ডীদাসকে চিনিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। রাধার কথা জানিতে হইলে গৌরীকে উপেক্ষা করা চলিবে না।

বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনায় পশ্চিম-বঙ্গের তথা রাঢ়ের দান উল্লেখ-যোগ্য। অতীতের রাঢ়ীয়-সাহিত্যই প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য। বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদিম-অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। একদিকে চর্য্যা-পদ, অন্যদিকে শ্রীগীত-গোবিন্দ—এই দুইটী ধারায় ইহার যে সংস্কৃত রূপের পরিচয় পাই, তাহা হইতে বিশেষ কিছু অনুমান করা চলে না। চর্য্যা-পদ এবং শ্রীগীত-গোবিন্দের পরেই মঙ্গল-সাহিত্যের যুগ। এই মঙ্গল-সাহিত্যে গৌরী একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পুরাণের হরগৌরী কথাই শিবায়ন বা চণ্ডী-মঙ্গলের অন্যতম উপজীব্য।

গঙ্গাশিষ্ট-সানু হিমাচলের উপকণ্ঠে সতীহারা শিব তপস্যার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। পর্ব্বতরাজ পার্ব্বত্য প্রথায় আতিথ্য দান-পূর্ব্বক উনয়া পার্ব্বতীকে তাঁহার পরিচর্য্যায় পাঠাইয়াছেন। কিশোরী গৌরী মনে মনে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া কায়মনো-বাক্যে অতিথির প্রসন্নতালাভে প্রয়াস পাইতেছেন। ভোলানাথ কিন্তু অটল অচল, উমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার সমাধি-ভঙ্গে সমর্থ হইল না। অপর্ণা আপনাকে ধিক্কার দিয়া তপশ্চরণে মনঃ সংযোগ করিলেন, রাজকন্যা যোগিনী সাজিলেন। যোগীরাজ তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া অবশেষে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ধরণী ধন্যা হইল, পুরুষ-প্রকৃতির শুভ-সম্মিলনে বিধাতার সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিল। পুরাণের হর-গৌরী-কথার ইহাই সংক্ষিপ্ত চিত্র।

শ্মশান যাঁহার আবাসভূমি, ভস্ম যাঁহার অঙ্গ-ভূষণ, নর-করোটী কণ্ঠহার, পর্ব্বতরাজ-নন্দিনী সেই গরলাশন স্মরারিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। দাম্পত্য প্রেমের এই মহনীয়-মাধুর্য্যে মহাকবি কালিদাসও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কল্পলোক-বিজয়িনী কল্পনা যেন ইহার মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কবি যেন নিতান্ত অতৃপ্তির সঙ্গেই বলিতেছেন—

"এবমিন্দ্রিয়সুখস্য বর্ত্ম নঃ সেবনাদসুগৃহীত মন্মথঃ।
শৈলরাজভবনে সহোময়া মাসমাত্র মবসদ বৃষধ্বজঃ॥"

কিন্তু কবির লেখনী কল্যাণপ্রাণা, কল্যাসুখে সুখিনী জননী মেনকার আশ্বস্তচিত্তের একটী পরিতৃপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—

"নীলকণ্ঠ পরিভূক্ত যৌবনাং তাং বিলোক্য
জননী সমাশ্বসৎ।
ভর্ত্তৃধনভতয়া হি মানসীং মাতুরস্যতি গুচং বধূজনঃ॥"

কুমারসম্ভবে কুমার-জননীর এ আলেখ্য আত্ম-সার্থকতায় সমুজ্জ্বল।

পুরাণকারগণ ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়াছেন।

উমার তপস্যা এবং ত্যাগের মহিমা তাঁহাদের নিকট এতই বিরাট-রূপে প্রতিভাত হইয়াছে যে, তাহার তুলনায় মহাদেবের মহত্ত্ব যেন একান্তই অকিঞ্চিৎকর। পৌরাণিক—শঙ্করীর জন্য স্বর্ণ-কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অম্বিকা সেখানে ত্রিলোক-পালিকা, অখিলের অন্নদাত্রী, অন্নপূর্ণা। বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বরীর সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি বিশ্বেশ্বরীর নিকট বিশ্বের জন্য অন্ন-ভিক্ষা করিতেছেন।

কালিদাসের রচনা এবং পুরাণের বর্ণনায় তুলনা চলে না। তথাপি সংক্ষেপতঃ এ-কথা বলা চলে যে, কবি যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে রূপ দিয়াছেন, পুরাণ-কার তাহাকেই জীবনে বরণ করিবার সাধনার সন্ধান দান করিয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের কবি কিন্তু অন্যদিক্ দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। মঙ্গল-কাব্যের হরগৌরী দেবতা হইয়াও মানব-মানবী অথবা সে-কালের বাঙ্গালার গৃহস্থ-দম্পতীর ছদ্মবেশধারী দেবতা। দরিদ্রের সংসার, সন্তান-সন্ততি লইয়া স্বামী-স্ত্রীর একরূপ স্বচ্ছন্দেই দিন চলিয়া যায়। ভালবাসা আছে, কিন্তু ভাঁবা নাই। দশবার ভালবাসি বলিয়া প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও নাই। অসচ্ছলতা আছে, মাঝে মাঝে অসাচ্ছন্দ্যও দেখা দেয়, অনুযোগ-অভিযোগে দাঁড়ায়, মান হয় তো অভিমানের কঠোরতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু প্রভাতের মেঘ, অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। গর্জ্জন করে প্রচুর, সময়ে অসময়ে বর্ষণেও কার্পণ্য করে না, কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব্বাহ্নের তরুণ-আলোকে সমস্ত সংসার ঝলমল করিয়া উঠে। সেই আলোকানুবিদ্ধ বৃষ্টিকণায়, হাস্যোজ্জ্বল অশ্রুবিন্দুতে একখানি মুখ বড় অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দেয়। আপন আইয়তীর চিহ্নস্বরূপ দুইগাছি শঙ্খের জন্য কত গৃহ-লক্ষ্মীর কত নিশীথে নৈশ উপাধান সিক্ত হইয়াছে, বিশ্বেশ্বরী আপনার বক্ষে অসংখ্য নারীর সেই পুঞ্জীভূত বেদনা বহন করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছেন। নারী যেখানে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, আপনভোলা স্বামীকে লইয়া সে সংসারে তাহার দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দ, যে গৌরব, 'হরগৌরীর কোন্দলে', 'দুর্গার শাঁখা পরা' প্রভৃতি প্রাচীন গাথায় তাহারই একটি আভাস পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের দৃপ্ত-মর্য্যাদাবোধ যেদিন বিলাসকে ঘৃণা করিত, অভাবকে অগ্রাহ্য করিতে জানিত, ইহা সেইদিনেরই প্রতিচ্ছবি। স্বামী-গৌরবে গরবিণী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরণী যে-দিন রাজ-রাণীর গৌরব স্পর্দ্ধা করিত, ইহা সেইদিনেরই বিলুপ্ত-প্রায় চিত্র। কাব্য এবং জীবনের ইহাই হর-গৌরী মিলন।

একটা উদাহরণ দিই। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক গানে ও গাথায় মহাদেবকে আমরা কৃষকরূপে দেখিতে পাই। শূন্য-পুরাণে ইহার একটী অতীত চিত্রের লুপ্তাবশেষ রহিয়া গিয়াছে। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যগুলিতে শিবের চাষের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি-না জানি না, এবং মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার তেমন সামঞ্জস্যও দেখিতে পাই না। অথচ পল্লী-সাহিত্যে ইহা একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বহুদিন পূর্ব্বে রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ইহার একটী ব্যাখ্যা পড়িয়া-ছিলাম। রায়বাহাদুর না-কি কোন দুইজন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে শিবের চাষের অনুবাদ শুনাইয়াছিলেন। অনুবাদ শুনিয়া তাঁহারা প্রায় কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন। একজন এমনও বলিয়াছিলেন যে, "ভক্ত এখানে নিজের জন্য কিছু চাহিতেছেন না। নিজের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া আরাধ্যের সুখে দুঃখে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া-ছেন।" যে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, যে দেশে দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগের নামই যজ্ঞ, সেই দেশের ভক্ত যদি নিজে খাটিয়া-খুটিয়া উপার্জ্জন করিয়া আরাধ্যকে না খাওয়াইয়া জোয়ালে যুতিয়া দেয়, চাষ করিয়া খাইতে বলে, তবে তাহাতে হৃষ্ট-রোমা ও বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কি আছে, বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয় পুরাণের সঙ্গে পল্লীগাথার শিবের কৃষিকার্য্যের

একটী সঙ্গতি আছে। পুরাণের শিব অন্নপূর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা করিতেছেন। ভিক্ষা নিজের জন্য নহে, বিশ্বের জন্য। অন্নপূর্ণার হাত হইতে অন্ন লইয়া, সেই অন্ন বিশ্বে বিলাইবার ভার লইয়াছেন ভিক্ষুক শঙ্কর। দেবতা নিজ-হস্তে দুয়ারে দুয়ারে দান করিয়া ফিরিতেছেন, পুরাণে এমন কল্পনা ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতার যাহা দেয়, তিনি তাহা যজ্ঞের মধ্য দিয়াই দান করিয়া থাকেন। দেবতা-মানবে আদান-প্রদানের সেতুই হইল যজ্ঞ। এককালে কৃষিও যজ্ঞরূপে পরিগণিত ছিল। যে-কালে বাঙ্গালী যাভা, বালি, সুমাত্রায় বাণিজ্য-যাত্রা করিত, সে-কালেও পল্লীবাসী স্পর্দ্ধা করিয়া বলিত, 'লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা'। মঙ্গলকাব্যের কবি শিবের অন্ন বিলাইবার উপায়-স্বরূপ কৃষিকর্ম্মের কল্পনা করিয়া-ছিলেন। তাই পুরাণের শিব মঙ্গলকাব্যের শাশ্বত কৃষক। মঙ্গলকাব্যের শিব কৃষিকর্ম্ম করিয়াছেন, বাঙ্গালায় কৃষির প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশ্বেশ্বর এইরূপেই বিশ্বে অন্ন বিলাইয়া বিশ্বের কৃষক-কুলকে ধন্য করিয়াছেন। পুরাণে এবং মঙ্গল-কাব্যে এই যে পার্থক্য, ইহাই মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণতঃ মঙ্গলকাব্যের দুইটী ধারা। একটী ধারায় দেবতা আপনার বিরুদ্ধ-ভক্তকে নানা উপায়ে বশীভূত করিয়াছেন, যেমন চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর, মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর। অপর ধারায় দেবতা বিরুদ্ধ-ভক্তের বিনাশ-সাধন করিয়া স্বীয় ভক্তকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, যেমন ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ। শিবায়নের তৃতীয়-পন্থা। শিব গৌরীর পরামর্শে চাষ করিয়াছেন, গৌরী শাঁখা পরিতে চাহিলে শাঁখারীর ছদ্মবেশে ছলনা করিয়াছেন। গৌরী তাঁহাকে বাগ্‌দিনী বেশে ছলনা করিলে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, পরন্তু বাগ্‌দিনীর সৌন্দর্য্যে ও বাক্ বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় হস্তের অঙ্গুরী দান করিয়াছেন। ইহা হর-গৌরীর দাম্পত্য লীলারই একতর চিত্র। মাঝখানে বাগ্‌দিনীকে লইয়া একটু পরকীয়া প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে।

শিবায়নে এবং গ্রাম্য-গাথায় মেনকার চিত্রও ভিন্ন রূপ। ভিখারীর করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মেনকার উদ্বেগের অবধি নাই। তিনি উমাকে আনিবার জন্য হিমাচলের নিকট নিত্য অনুযোগ করেন। বাঙ্গালায় 'পূজা' বলিতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালীর সেই সার্ব্বজনীন উৎসব—'দুর্গোৎসব' উমার পিত্রালয়ে আগমন। 'আগমনী' গান বাঙ্গালী কবিরই সৃষ্টি, তাহার কোন পৌরাণিক মূল পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যের ভিত্তিতে কবির আসরে ইহার সূচনা, কবিওয়ালাগণ ইহার রচয়িতা। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হরগৌরী কথার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথারও কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন ধারা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-কথার সর্ব্বপ্রধান আধার হইলেও তাহাতে রাধার নাম নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের মত বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি প্রধানা গোপিকা—যাঁহার নাম গান্ধর্ব্বিকা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্ম-পুরাণে তিনিই শ্রীরাধা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী, তাঁহার প্রতিপক্ষা নায়িকার নাম বিরজা। পদ্ম-পুরাণে রাধা এবং চন্দ্রাবলী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকা, দুই প্রধানা যূথেশ্বরী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শারদ-রাসের কোন প্রসঙ্গ নাই, হেমন্তে কাত্যায়নী পূজার পর বাসন্ত-রাসের উল্লেখ আছে। পদ্ম-পুরাণ শরত ও বসন্ত দুই কালেই রাসের বর্ণনা করিয়াছেন এবং বাসন্ত-রাসের কারণ ও বৎসরের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত দুইটি পৃথক ধারায় সন্ধান পাইতেছি এবং পদ্ম-পুরাণে এই দুই ধারার সামঞ্জস্যের প্রয়াস দেখিতেছি।

তন্ত্রেও রাধাকৃষ্ণের কথা আছে। রাধা-তন্ত্রে বাসুদেবের ত্রিপুরাসুন্দরী সাধনের কথা পাওয়া যায়। গোপী-লীলার প্রধানা সাহায্যকারিণী রূপে পদ্ম-পুরাণ, এই ত্রিপুরাসুন্দরীর বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা করিতেন। শ্রীখণ্ডের কবি কবিরঞ্জনের একটি পদে

এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায় — "ত্রিপুরা চরণ কমল-মধুপান, সরস-সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥" রাধা-তন্ত্রে পরস্পর প্রতিপক্ষারূপে রাধা ও চন্দ্রাবলীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই তন্ত্রে জটীলা, কুটীলা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়। রাধা-তন্ত্রে বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মহামায়ার অংশ স্বরূপিণী পদ্মিনী রাধিকার সাহচর্য্যে মহাবিদ্যা-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

কবি জয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বিশেষ ঐক্য লক্ষিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যে বাসন্ত-রাসের কথা পাই, শ্রীগীত-গোবিন্দের তাহাই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অনেকে শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রথম-শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ছায়া দেখিতে পান। কিন্তু আর একটী দিক্ দিয়া বিচার করিলে মনে হয় পদ্ম-পুরাণ বা রাধাতন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির সঙ্গেও শ্রীগীত-গোবিন্দের একটা সম্বন্ধ আছে। জয়দেব বলিতেছেন— "• • • শ্রীবাসুদেব রতি-কেলি কথা সমেতমেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্॥" কাব্যে তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলা কথা বর্ণন করিতেছেন, কিন্তু মুখ-বন্ধে বলিতেছেন —"শ্রীবাসুদেব রতি-কেলি"। যাহা হউক শ্রীগীত-গোবিন্দে আমরা রাধাকৃষ্ণ-লীলার যে ধারার সন্ধান পাই, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তাহারই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের সময় আজিও নির্ণীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং তাঁহার মতানুসারে অপর কেহ কেহ চণ্ডীদাসকে রাজা গণেশের সম-সাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কবি কৃত্তিবাসকে লইয়া গণেশের রাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয়ের অনুকূলে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরও কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় পিছাইয়া দিয়াছেন। মাঘ মাস পুণ্য কি পূর্ণ জানি না, কিন্তু কৃত্তিবাসকে গণেশের সভায় আসন দিলে চণ্ডীদাসকে লইয়া একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে যদি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে ধ্রুবানন্দের কারিকায় বোধ হয় তাঁহার স্থান হইবে না, কিন্তু কারিকায় তিনি ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমরা এখন কোন্‌টী সত্য ধরিব? পূর্ণ মাঘ মাস, না ধ্রুবানন্দ? বড়ু চণ্ডীদাসকে কৃত্তিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ একই সময়ে একদেশে সেকালের দিনে রামায়ণ ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত হওয়া অসম্ভব ছিল। কেন তাহা বলিতেছি।

সে সময় দেশে মঙ্গলকাব্যের যুগ চলিতেছিল। ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং শিবায়ন রচিত হইয়া গিয়াছে, দেশের কবিগণ পরের পর গতানুগতিক ভাবে একই ধারা অনুসরণের চেষ্টা করিতেছেন। পল্লীতে পল্লীতে সেই সমস্ত মঙ্গলগীতি গীত হইতেছে, এমনই দিনে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। তখনও পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা লইয়া কোন মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নাই। সে সময় মঙ্গল-গানের মত লোকগীতিরূপে আর এক ধরণের গান বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, ঝুমুর গান। চণ্ডীদাস এই ঝুমুরের ধারায় মঙ্গল কাব্যের অনুসরণে এক অভিনব কৃষ্ণ-মঙ্গল রচনা করিলেন— (সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত) তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু তিনি শ্রীরাধার প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল। শ্রীরাধার মানুষী লীলা, রাধা জানেন না যে, তিনি কৃষ্ণের চিরন্তনী প্রিয়া, যেন মঙ্গলকাব্যের বিদ্রোহী ভক্ত। কিন্তু কৃষ্ণের তাঁহাকে না হইলে চলিবে না, তাই তিনি তাঁহার মনোহরণের জন্য, তাঁহার ভালবাসার জন্য লালায়িত। শিবায়নের শিব দেবতা, পার্ব্বতী দেবী, তাঁহারা লীলার জন্য মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছেন। শিব বাগ্‌দিনীর ছদ্মবেশে পার্ব্বতীকে চিনিতে পারেন নাই, বাগ্‌দিনী কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা-কৃষ্ণ ছদ্মবেশধারী নহেন, তাঁহারা মানুষ হইয়া মানুষের মধ্যেই জন্মিয়াছেন এবং কৃষ্ণ তাহা জানেন, রাধিকা

ভুলিয়াছেন। একদিকে মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন এবং অন্যদিকে ঝুমুর গানের সম্পর্ক পাতাইয়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ, উত্তর-প্রতিউত্তর। সম-সাময়িক সমগ্র ভাবধারা এবং রচনাভঙ্গী আয়ত্তে আনিয়া এই যে রাধা-কৃষ্ণ লীলার অভিনব সৃষ্টি, এই যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড প্রভৃতি ইঁহাই চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য, আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই চণ্ডীদাস মহাকবি। দানখণ্ড হইতে রাধা-বিরহ পর্য্যন্ত এই যে লীলাবিলাসের ক্রম-পারম্পর্য্য, এই যে সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিণতি, এই যে বিপ্রলম্ভ রসের পূর্ব্বরাগ, মান, করুণ ও প্রবাসের লীলা-বৈচিত্র্য, সেকালের সাহিত্যে বাস্তবিকই ইহা অনন্য-সাধারণ, অপূর্ব্ব, অনিন্দ্যসুন্দর।

কৃত্তিবাসের মৌলিক রচনার শক্তি ছিল না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত না হইলে তাঁহার পক্ষে রাম-মঙ্গলের ধারণা করা কঠিন হইত। তিনি বাল্মীকির অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু রামকে মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালিয়াছেন, ভক্তের ভগবানরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মাঝে মাঝে নিজের কল্পনার সঙ্গতি রক্ষার জন্য দুই-একটী উপাখ্যান রচিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। তথাপি একথা সত্য যে গতানুগতিক হইলেও কৃত্তিবাস সে কালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য দানী সাজিয়াছেন, নাবিকের কার্য্য করিয়াছেন, অবশেষে মথুরার হাটের পথে দধি-দুগ্ধের ভার বহিয়াছেন। শিব কৃষক, তাই কবি তাঁহাকে দিয়া বাগ্‌দিনীর আদেশে জল সেচন করাইয়াছেন। ভারখণ্ড লীলা তাহা অপেক্ষাও মধুরতর। দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—"আপন অঙ্গের লখিমী হইয়া তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী।" ভারখণ্ডে বলিতেছেন—"তিন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী। বাছিয়া সে পালি রাধা আহ্মাকে ভারী॥ • • • • কংস বধিবারে মোএ কৈলো অবতার। এবে কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার॥" কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ভার কাহ্নে করিতে হইয়াছে।

"লড়িলা জনার্দ্দন কাহ্নে লয়া ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগণ খলখলি হাসে লো
ভাবে মজিলা দেবরাজে॥"

শ্রীকৃষ্ণ জানেন তিনি কে, দেবগণ জানেন তাঁহার স্বরূপ কি, তথাপি তিনি প্রেমের দায়ে ভক্তের জন্য ভার বহিয়াছেন। এইরূপ মানুষী লীলার রচনা-মাধুর্য্যেই চণ্ডীদাস মহাপ্রভুকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা॥"

দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের কথা সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভোষণী টীকায় পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কৃষ্ণ-মঙ্গল প্রণেতৃগণ এবং বৈষ্ণব-কবিগণ দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের পালা রচনা করিয়াছেন। 'প্রেমামৃত' নামক একখানি সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী অথবা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে 'বসনচোর্য্য', 'ভারকাণ্ড', 'নৌকাকাণ্ড', ও 'দানখণ্ড' লীলার উল্লেখ পাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলার ভারকাণ্ড বা ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড লীলা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। 'প্রেমামৃত' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পরবর্ত্তীকালে রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার কোন পৌরাণিক মূল পাওয়া যায় না। দুই-একটী ভণিতাহীন পদেও ভারখণ্ড লীলার উল্লেখ পাইয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৫নং পুঁথির ১০ (খ) পৃষ্ঠায় এই ভণিতাহীন পদটী পাওয়া গিয়াছে—

"রাধার পিরীতে মন মজাইতে নিজ কাহ্নে লয়া ভার।
মথুরা যাইতে দুস্তর তরীতে নায়্যা হয়্যা করি পার॥
এত লঘু কাজ করি ব্রজমাঝ কিছুই না ভাবি দুখ।
মোরে রসবতী ভালবাস অতি এই মনে বড় সুখ॥"

মাধবাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস প্রণীত একখানি 'কৃষ্ণ-মঙ্গল' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কৃষ্ণদাস সুস্পষ্টরূপে ভারখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।

এত বিড়ম্বন তুমি কৈলে গোপীকার।
অখন চলহ বিকে কান্ধে করি ভার॥
গোপীর বচনে কৃষ্ণ ভার কান্ধে করি।
বাহু নাড়া দিঞা যত চলিল সুন্দরী॥
বিচিত্র বাহুক তাহে রঙ্গিলের শিখা।
কৃষ্ণ কান্ধে দিঞা ভার চলিলা রাধিকা॥

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন কৃষ্ণমঙ্গলের আলোচনা পারম্পর্য্যে চণ্ডীদাসের পরই 'গুণরাজ খানের' শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নাম করিতে হয়। তাহার পর মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। মাধবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃব্য-পুত্র। তাঁহার 'কবি-বল্লভ' উপাধি ছিল, শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোস্বামী-পাদগণের নিকট হইতেই তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতকাল যাহা বিদ্যাপতির নামে চলিয়া আসিতেছে সেই সুপ্রসিদ্ধ—"সই কি পুছসি অনুভব মোয়, সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিল তিলে নূতন হোয়॥" পদটী মাধবাচার্য্যের রচিত। কৃষ্ণমঙ্গলে 'মাধবাচার্য্য' ভণিতা আছে, কিন্তু এই পদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে কবিবল্লভ উপাধি পাওয়ার পরে লেখা। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের সঙ্গে "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবগত ঐক্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের সঙ্গে চণ্ডীদাসের ঐক্য আরো সুস্পষ্ট। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনেক স্থলে রাধা নিজেকে 'এগার বরিষের বালী' বলিয়াছেন। আট-চারি বরষের কথাও আছে। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের দানখণ্ডে রাধা বলিতেছেন—

দ্বাদশ বৎসর বয় এই মোর হয় নয়
বারো বৃৎসরের চাহ দান।
কি আর করহ হঠ কুবোল বলিলে শঠ
সভা মাঝে পাবে অপমান॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা কৃষ্ণকে ভাগিনেয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'হরিবংশ' রচয়িতা 'ভবানন্দ' ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণব কবি দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের পদে বা অন্যত্র এই সম্বন্ধ গ্রহণ করেন নাই। মাধবাচার্য্যের রাধা বলিতেছেন—

আপনার অপযশ করহ আপনি।
তুমি যশোদার পুত্র আমি মাতুলানী॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

নৌকাখণ্ডে মাধবাচার্য্য মাঝ-যমুনায় বিহার বর্ণনা করিয়াছেন, রাধার সঙ্গে চন্দ্রাবলীও আছেন, অবশ্য সেখানে দুইজন পৃথক যূথেশ্বরী।

মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলে রাসের পূর্ব্বে—

এই সব রূপে হরি লইয়া গোপীগণ।
দেখায়ে দেখায়ে ভ্রমে সব বৃন্দাবন॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবন খণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মাধব চিরকুমার ছিলেন। কিন্তু তৎপ্রণীত রাসে গোপীগণের কাকুতি, নবোঢ়ার সঙ্কোচ এবং বিহার, কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে তুল্যরূপ। মাধবের রাধা গোপীগণ সঙ্গে মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আমলকী আদি কিনিয়া আনিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই গ্রন্থখানি অনুমোদন করিয়াছিলেন, মাধব পুরীধামে গিয়া এই গ্রন্থ মহাপ্রভুকে অর্পণ করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ সনাতনাদির যে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভাণিকা দানকেলী-কৌমুদী গ্রন্থে দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের কথা নাই। সে গ্রন্থে ভাণ্ডীরী মুনির যজ্ঞে কৃষ্ণ-বলরামের মঙ্গল কামনায় মুনিগণের ঘোষণামত ঘৃত দেওয়া হইয়াছিল মাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই অবসরেই দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রূপানুগ গোস্বামীগণ—যেমন রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের কথা অনভিজ্ঞের উক্তি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন।

রাধাতন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। এই সংস্কৃত গ্রন্থে নৌকাবিলাস লীলায় চন্দ্রাবলী, বিশেষ করিয়া রাধা যে ভাষায় কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা তাহা হইতে এতটুকু আপত্তিজনক

নহে। কৌতূহলী পাঠক রাধাতন্ত্রের ২৪।২৫।২৬ পটল পাঠ করিয়া দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ক্রয়ে বিক্রয়ণে চৈব গমনাগমনে তথা।
যমুনা জল পানেচ পারে বা রোহণে তথা॥
অহং দানী সদা ভদ্রে যৌবনস্থ তথা প্রিয়ে॥

যমুনা জলপানে দান গ্রহণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যমুনা-খণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামে কাশীমিশ্র ভবনে গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় এই দুইজন অন্তরঙ্গ-ভক্তের সঙ্গে দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময় চণ্ডী-দাসের পদ আস্বাদন করিতেন। খেতরীতে ঠাকুর নরোত্তমের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উৎসবে খ্রীষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে বাঙ্গালার প্রথম-বৈষ্ণব-সম্মিলনে চণ্ডীদাসের পদাবলী গীত হইয়াছিল। তাহার পরও খেতরীতে বিগ্রহের সম্মুখে—

বৎসর ভরি সংকীর্ত্তন হয় অনিবার।
দেখিয়া পাষণ্ডীর মনে লাগে চমৎকার॥
(প্রেমবিলাস, ১৯ বিলাস)

প্রেম-বিলাস রচয়িতা স্বচক্ষে সেই উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন এবং অন্য সময়েও খেতরী গিয়া এই সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কাহার কাহার রচিত গ্রন্থ বা পদ গীত হইত, প্রেমবিলাসে তাহার বর্ণনা আছে। নিত্যানন্দ দাস বলিতেছেন—

সঙ্কীর্ত্তনের কথা কহিব বা কত।
শুনিয়া পাষণ্ডীগণের দ্রবি গেল চিত॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্য মঙ্গল।
তার পর হয় গান শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥
পরে হয় গোবিন্দের গৌর কৃষ্ণ লীলা গান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় পরাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাস রচিত এবং কৃষ্ণমঙ্গল মাধবাচার্য্য প্রণীত। ইহা হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকেও চণ্ডীদাসের গান বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত শ্রীখণ্ডের কবি গোপাল দাসের রসকল্পবল্লীর অধুনা প্রচলিত সকল হস্ত-লিখিত পুঁথিতে কিন্তু চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম ও পদ আছে। কিন্তু ঢাকার যাদুঘরের পুঁথিতে ও শ্রীখণ্ডের পুঁথিতে (চণ্ডীদাসের (?) ভণিতাহীন পদ আছে,—) নাম নাই। তাহার পরে সঙ্কলিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদা-গীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ বা নাম পাওয়া যায় না। পদামৃত-সমুদ্রে চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যা সাতটী, অথচ বৈষ্ণবদাসের পদ-কল্প-তরুতে এই পদের সংখ্যা প্রায় তিনশত, আজিও এসব সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। বাঙ্গালার দুইটী বিশ্ব-বিদ্যালয়, এবং সাহিত্য-পরিষদ ও তাহার শাখাসমূহ আরো অধিক পুঁথি সংগ্রহের দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন। তরুণ সাহিত্যিকগণও ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সমবেত অনুসন্ধানে ইহার কোন কিনারা করিতে পারেন।

চণ্ডীদাস যে দুইজন ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, বুঝিবা আরও একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কতকগুলি পদ যে অন্যের রচিত, সেগুলি গোলমালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের মনে হয়, অন্য কবিও কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াই চণ্ডীদাস নাম দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনজন চণ্ডীদাস থাকিলে, অপর দুইজনের মত তাঁহারও কোন সন্ধান পাওয়া যাইত। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে দুইজনেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তিন রকমের তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহার এতটুকু রসবোধ আছে তিনিই বলিবেন যে, ইহা কখনই একজনের রচনা হইতে পারে না। তিনটী পদে তিনজন কবির রচনা সুস্পষ্ট। সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটী পদাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বড়াই গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বলি ঝাঁপ দিল সে মোর শুকাইল লো
মুই নারী বড় অভাগিনী॥

বড়ু চণ্ডীদাস, কৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহ, ৩৪৪ পৃঃ

(১) প্রচলিত পদাবলীর পদ, ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস নাম নাই, কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ—বিরহ॥

ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এহি সে লিখিল।
সুধার সায়র মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরীতি অনল তাপে পাষাণ যে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরু-লতা-বনে।
জলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিএ যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাঁহি জান॥
পিরীতি অমিয়া রসে বধএ পরাণ॥

(সাহিত্য পরিষদের নূতন সংস্করণের পাঠ)

(২) দীন চণ্ডীদাসের পদ, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা আছে—বিরহ।

হায় রে দারুণ বিধি। ছাড়াইলে গুণনিধি॥
যে এত দিল তাপ। তারে ধরু বহু পাপ॥
এত কি সহিতে পারি। বিরহে এ তনু মরি॥
তিলেক দিবার সাধ। এ-সুখে দিলে কি বাদ॥
কবে পাপ তার মেলি। পুন সে করব রস কেলি॥
আর কি হেরব মুখচন্দ্র। ভাঙ্গব সকল দ্বন্দ্ব॥
পুন হরি মিলব মোর। পিয়ায়ে করব নিজ কোড়॥
পুন কি করব রাস কেলি। নব নব গোপী হব মেলি॥
বাঁশী কি শুনব কানে। যার বৃন্দাবন পানে॥
ঘষিয়া চন্দন মালা। কারে দিব আর গলা॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয়। তিলেক না কর ভয়॥

(বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত জীবনী ও প্রতিভা বিশ্লেষণী-সহ সমগ্র সটীক পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মহাকবি চণ্ডীদাস পদাবলী।)

বসুমতী সংস্করণে এই পদটী আসল চণ্ডীদাসের বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। আশা করি পাঠক পদটীর ভাষা, ভাব, ছন্দ একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবেন।

(৩) বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত—কিন্তু ভাবে, ভাষায় কোনোরূপ মিল নাই। এই পদে বিশেষ দ্রষ্টব্য 'কপোত নামেতে পাখী'। যদুনাথ দাসের 'সংগ্রহ-তোষণী' গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবনের কেলী-কুঞ্জের কপোতের কথা আছে। এই কপোত একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তারূপে জন্মিয়াছিলেন। 'সংগ্রহ-তোষণী'তে তাহার সাধন-সঙ্গিনীর কথাও পাওয়া যায়। এটীও মাথুর বিরহের পদ।

সখি কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিয়া হাসে॥
কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্ব-তলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়ে॥
বৃন্দাবন আছে সাথী।
যদি মনে লয় আর এক আছে
কপোত নামেতে পাখী॥
বোল নিঠুরের আগে।
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ কাহারে লাগে॥
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে।
যাহার লাগিয়া যে জনা কাঁদয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥

(সাহিত্য পরিষদের নব প্রকাশিত সংস্করণ)

বলিতে ভুলিয়াছি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও চন্দ্রাবলী রাধারই অপর নাম। শ্রীগীত-গোবিন্দের তো কয়েকটী পদের অনুবাদই রহিয়াছে।

কঠোর

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

১

সন্ধ্যা হইতেই উমার আবার জ্বর আসিল।

তাড়াতাড়ি হাতের দু'-একটা কাজ সারিয়া আসিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া পড়িয়া গায়ে বেশ নিবিড় করিয়া কাঁথাটী টানিয়া দিল। তবুও শীত ভাঙ্গিতে চায় না!·· পুরান ম্যালেরিয়া জ্বর—আবার যখন চাপিয়া ধরিয়াছে, সহজে ছাড়িবে বলিয়া তো মনে হয় না।··· কাঁপুনীও কম নয়! পা-দু'খানি বুকের কাছে গুটাইয়া নিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। জ্বরের ঝোঁকে দুই চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

হরিহর বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিবার পর দরজাটা ঠেলিতেই হঠাৎ খুলিয়া গেল দেখিয়া একটু চটিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ রে, উমি! ভর সন্ধ্যে বেলা দরজা খুলে রেখে দিয়েচিস্? হতভাগীর যদি কোন আক্কেল আছে! যাক্, নিয়ে যাক্—যা দু'-একটা ঘটি-বাটি আছে!

কিন্তু চেঁচামেচির পরেও যখন উমার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন হরিহর একটু বিস্মিত হইল।

পা ধুইয়া দাওয়ায় উঠিয়া পড়িয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল উমা বিছানায় জ্বরে কাতরাইতেছে। একবার তাহার মাথায় হাত দিয়া উষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আপনমনে সে একবার বলিল—মেয়েটার আবার জ্বর হোলো!

তখনই টিনের চালাটীর উপর ছড়্-ছড়্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। হরিহর এটাকে কিন্তু ভালভাবে লইল না। অপ্রসন্ন মুখে সে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া লইয়া বলিল—আশ্বিন মাস শেষ হ'তে গেল, এখনো খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি! দূর হ'!···

তার পর হঠাৎ সে চুপ করিয়া গেল। পুরান স্মৃতি আবার মনে পড়িল বুঝি! তাহার মনে পড়িল সেই রাত্রের কথা—হ্যাঁ, সে বছরটাও ঠিক এমনি বর্ষা! আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি তাহার স্ত্রী কমলা, তখন কোলের দু'টী মেয়ে শশী আর উমাকে রাখিয়া মারা গেল। বাড়ীতে অন্য কেহ ছিল না। চাকরের কাছে ছোট মেয়ে দু'টীকে রাখিয়া সে আর তাহার বড় ছেলে বিপিন দুই ক্রোশ দূরে পোড়া-দহের শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। মাত্র দু'জন লোক তাহারা—অত বড় একটী প্রাপ্ত-বয়স্কা নারীর মৃতদেহ কি দু'জনে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? পথে যে কতবার শবাধার নামাইয়া জিরাইয়া লইতে হইয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই! অনেক কষ্টে যদিও তাহারা শ্মশানঘাটে পৌঁছাইয়াছিল কিন্তু শবদেহ চিতায় চড়াইয়া দিবার পর এমনিতর অকস্মাৎ বৃষ্টি আসিয়াছিল। তাহারা বাপ্-বেটায় চিতা হইতে জল ছেঁচিয়া ছেঁচিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে বৃষ্টি থামিলে পরের দিন দ্বিপ্রহরে তাহারা শব দাহ করিয়া ফিরিয়াছিল।

···আজিকার বর্ষার সহিত এই কাহিনীটী আবার তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিল—কিন্তু বিপিন এখন কোথায়?

হরিহর মাথাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। পুরানো কথা ভাবিয়া আর সে নিজেকে দুর্ব্বল করিবে না।

ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—হ্যাঁ রে, উমি, একটু

সাবু তৈরী করে আনবো? সাবু ঘরে আছে তো?

উমা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—না, বাবা! কিছু খাব না। তুমি আর একখানা কাঁথা আমার গায়ে দিয়ে চেপে ধরো না। বড্ড শীত! উঁ-হুঁ ··

হরিহর তাহার গায়ে কাঁথাখানি বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল।···

২

কয়েকদিন কাটিয়া গেল কিন্তু তবুও উমার জ্বর ছাড়িল না। ছাড়িবে না যে, তাহা হরিহর জানিত। এমনি ভাবের পোড়া জ্বরে তো ওর মাও একদিন গিয়াছে, হয়তো ওকেও যাইতে হইবে!···

দুপুর বেলা হরিহর রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাত রাঁধিতেছিল। সে আজ নিজের হাতে যে কাজ করিতেছে, পনেরো বৎসর পূর্ব্বে যদি সে তাহা স্বপ্নে দেখিত, তাহা হইলেও বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু সমস্তই ভাগ্যের বিপর্য্যয়! একদিন যখন একটী একটী করিয়া তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সবাই মারা গেল তখন সে চাকরি-বাকরি ছাড়িয়া এই উমাকে বুকে চাপিয়াই সেই মর্ম্মান্তিক শোক ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। উমার উপরে হরিহরের আর একটী মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল শশী। ভাহার অপঘাত মৃত্যুর কথা এখনও মনে পড়িলে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মেয়েটীর বয়স ছিল তখন বছর সাত-আটেক। বেশ মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটী। দিঘীর জলে স্নান করিতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া গিয়া বাঁধানো ঘাটটীর শেষ-ধাপটীর তলায় গিয়া পড়িল। জলে ডুবিতে ডুবিতে মেয়েটী চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—"বাবা! বাবা গো! ডুবে গেলুম!" হরিহর ঘাটের পাশে ঝোপটীতে বসিয়া বাঁশ চাঁচিয়া চাঁচাড়ি তৈয়ারী করিতেছিল। হঠাৎ তাহার চিৎকার শুনিয়া যখনি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে তুলিতে যাইবে, ঠিক তখনি ঘাটের উপর ধড়াস্ করিয়া সে নিজে পড়িয়া গেল। পড়িয়াছিল ভীষণভাবে। তাহার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া উঠিতে উঠিতে মেয়েটী জলে ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এ-ধার ও-ধার খুঁজিল—কিন্তু তাহাকে আর পাইল না। শেষে জাল ফেলিয়া যখন তাহাকে তুলিল, তখন তাহার আর সাড় ছিল না!

রাঁধিতে রাঁধিতে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হয়তো এই সমস্ত কথা হরিহরের মনে পড়িয়া তাহার দুপুরটা মাটি হইয়া যাইত। কিন্তু যাক, সে বাঁচিয়া গেল! তাহার ভাগিনেয় আশু উঠানে আসিয়া বলিল—হ্যাঁ গা, মামা, উমার না-কি আবার অসুখ?

হরিহর বলিল—হ্যাঁ, তুই জানলি কি ক'রে? তা এত বেলায় এলি! খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হয়? দাঁড়া তোর জন্যেও আরও দুমুঠো ফুটিয়ে নিই।

হরিহর আর দু'টী চাল ধুইয়া হাঁড়িতে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—তাই তো রে, মামার বাড়ী এলি, শুধু ভাত খেয়ে যাবি! দাঁড়া আর একটা তরকারি করি।

এই কথা বলিয়া সে রান্না-ঘরের দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া উঠানের মাচাটী হইতে একটী লাউ পাড়িয়া আনিতে গেল। কিন্তু লাউ পাড়িতে গিয়া হঠাৎ আবার কোমরের পুরাতন বেদনাটা বুঝি কেমন খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল। হরিহর বলিল—ও রে, আশু, দে বাবা দে, লাউটা পেড়ে দে! আবার কোমরের বেদনাটা এল বুঝি। এটা কবে প্রথম হয় জানিস্? তোদের মনে নেই সেই যেবার শশী জলে ডুবে গেল—সেবার সেই ঘাটে প'ড়ে গিয়ে···

লাউ পাড়িয়া আনিতে আনিতে পাড়ার আরও দু'টী ছেলে আসিয়া উঠানের ভিতরে দাঁড়াইল। ইহারা প্রায়ই দুপুরে আসিয়া হরিহরের সহিত গল্প করিয়া যায়। সে তাহাদের তাহার নিজের গত জীবনের কত কাহিনী শুনায়। তাহারা এই লোকটীর জীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা মুগ্ধ-বিস্ময়ে শুনিয়া যায়। মনে মনে তাহারা ভাবিতে থাকে এই লোকটীর জীবন

এতখানি বিয়োগান্ত হইয়াও তাহার গতি-পথে বিবাগী-স্রোতধারার বন্যা আসিল না কেন? সে কি বাঁধের জলের মত আপনার কুহকে পড়িয়া আপনিই আবদ্ধ রহিয়াছে!

লাউ কুটিতে কুটিতে এই রকমেরই একটা কথা উঠিতে হরিহর বলিল—শুধু ঐ মেয়েটার জন্যেই ত' বাড়ীতে থাকা। তা নইলে এতদিন কবে বেরিয়ে পড়তুম।

তারপর বুকের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিল—জান্‌লি আমার এখানটা কতো শক্ত! শোন তবে—যেবার বিপিন মোলো—তাও কোথায় গিয়ে মোলো শোন, ফরাসডাঙ্গায়—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে। হতভাগা ছেলে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গিয়ে শ্বশুরবাড়ী প'ড়েছিলো। হঠাৎ একদিন রাত্রে হার্টফেল ক'রে মরেচে খবর পেলুম। আপনি গিয়ে সৎকার ক'রে এলুম। কিন্তু যাক্, তারপর আবার কি হোলো শোন। দু'-চার দিন যেতে-না-যেতেই একদিন দেখি আমার অনেকদিনের পোষা কুকুরটাকে সাপে কামড়েচে। বিষে তার গা একেবারে নীলবর্ণ হ'য়ে উঠেচে! আমি কি করলুম জানিস? আর কোনো কথাবার্ত্তা না ব'লে পা-র খড়মটা না তুলে খটাখট্ তার মাথায় মারতে লাগলুম। ঘা দু'-তিন দেবার পর কুকুরটা এমন কেঁউ কেঁউ ক'রে মুখখানা করলে যে, আর মারতে মায়া লাগ্‌ছিল। কিন্তু আর দু'ঘণ্টা বাঁচলেই তো কুকুরটারই যন্ত্রণা! তাই একেবারে চোখ বুজিয়ে ফেলে খটাখট্ খড়ম চালাতে লাগলুম। কেঁউ কেঁউ করতে করতে অত দিনের পোষা প্রভু-ভক্ত কুকুরটা আমারই হাতে মারা গেল। তোরা এ-কাজ পারতিস্? হেঁ-হেঁ, হেঁ-হেঁ·····

কথাটা বলিয়া হরিহর অসভ্যের মত হাসিতে লাগিল। কিন্তু এ-হাসি তীরের ফলার তীক্ষ্ণতা লইয়া ঐ ছেলেগুলির বুকে বিঁধিতে লাগিল।

আশ্চর্য্য লোকটীর বুকের বাঁধন!

৩

উমার বিবাহ হইয়াছিল নয় বছরে এবং বিধবা হইয়াছিল বারো বছরে। তারপর আজ ছয় বৎসর সে পিতার নিকট আছে।

হরিহর তারপর উমাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠায় নাই।

সে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইত—ছোটলোক! শালারা ছোটলোক! তা নইলে ছেলেটার অমন ভেতরে ভেতরে ব্যামো আমাদের কাছে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল! আমরা ভাল মানুষের মত মেয়ে দিলুম। আর তিনটী বছর যেতে-না-যেতেই বিধবা হোলো!

তা হইবে। উমার শ্বশুররা ছোটলোক হইবে হয়তো। কিন্তু হরিহর অতখানি ভদ্রলোক হইয়াও মেয়েটীকে কেন ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেছে না—সেই কথাই সবাই পরিতাপের সহিত গল্প করিয়া থাকে।

উমার অসুখটা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। পেটটি প্লীহায় ভরিয়া গিয়াছিল। জ্বর ছাড়িবার নাম নাই।

উমা সেদিন হরিহরকে বলিল—হ্যাঁ, বাবা, ওষুধটা যে অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে। আর একটা আনো না!

হরিহর বলিল—হ্যাঁ, কি, ঐ কুইনিনটা? ওতে জ্বর আর সারলো না যখন, তখন আর কিনে কি হ'বে?

সে বলিল—না সারুক, দু'একদিনের জন্যে জ্বরটা একবার ছেড়ে গিয়েছিলো তো?

হরিহর বলিল—গিয়েছিলো?, তা এবারও যে সেরে যাবে তার কি মানে আছে? তার চেয়ে তুই এক কাজ কর, তুলসী পাতার রস মধু দিয়ে খা। আমাদের দেশী ওষুধ। এর থেকে ভাল ওষুধ আর নেই। সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি।

এই কথা বলিয়া হরিহর হঠাৎ তুলসী পাতার খোঁজেই হয়তো বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে পাড়ার অনেকের সহিত তাহার দেখা হয়। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে — হ্যাঁ, খুড়ো, উমা কেমন আছে?

উমার অবস্থার কথা সে সবিস্তারে বলিয়া শেষে বলিল—অসহ্য যন্ত্রণা! তোরা তা চোখে দেখতে পারবি নে। আমি বলি, নারায়ণ যদি ওকে এই বেলা কোলে তুলে নেন তো ও বেঁচে যায়!

কথাটা বলিয়া সে একটু হাসিয়া মনকে হাল্কা করিতে চায়। কিন্তু হাসিতে গিয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল —কিন্তু আমার কি হবে বলতো? ও তো ড্যাং-ড্যাং ক'রে চলে যাবে—আমি কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকবো?

তারপর আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হন হন করিয়া সে আপনার পথে চলিয়া যায়।

সেদিন আশু দেখিল তাহার মামা কোথা হইতে দুই-তিনটা বাঁশ আনিয়া উঠানের একধারে রাখিয়া দিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হরিহর তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল — চুপ্, চুপ্, জানিস্ না বুঝি? উমার যে কাল থেকে হাত পর্য্যন্ত ফুলেচে। হাত ফুললে আর বাঁচে না, বুঝ্‌তে পারচিস্? রাত-বিরেতে কখন দরকার পড়বে — তখন তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে কষ্ট হ'বে। ও-রি ওপর-চ্যাটাই বিছিয়ে দু'জন কি চারজনে কাঁধে নিয়ে যাবার মত ক'রে নেবো 'খন। জানিস্ তো রাত্তির বেলা যদি কেউ আসতে না চায়? তুই আর আমি ছাড়া আর ত' কেউ নেই!

আশু তাহার মামার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

৪

হরিহর ঠিকই বলিয়াছিল। ইহারই চার-পাঁচ দিন পরে একদিন সন্ধ্যায়……যে অপরিহার্য্য মুহূর্ত্তের জন্য অত তোড়জোড়, অতখানি উদ্বেগ, সেই মুহূর্ত্তই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাশিতে কাশিতে উমা চোখ কপালে তুলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিল।

শোকে বিহ্বলভাবে হরিহর বসিয়া রহিল। আশু গিয়া পাড়া হইতে তিন-চারজন ছেলে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আসিয়া বাঁশ বাঁধিয়া চ্যাটাই বিছাইয়া বেশ একটী শবাধার তৈয়ারী করিয়া লইল। তাহার পর বিছানা-সুদ্ধ শবদেহ আনিয়া তাহার উপর শোয়াইয়া দিল।

মুহ্যমান শোকে, ব্যাকুল কণ্ঠে হরিহর বলিল— দাঁড়া বাবা! দাঁড়া, তোরা একটু। আমিও কাঁধ দেব। সবাইকে কাঁধে করে দিয়ে এসেচি, আমার মাকেও কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব…

এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল। কিন্তু তখনই 'উঃ' করিয়া বসিয়া পড়িল, আবার কোমরের পুরাতন বেদনাটা বুঝি চাপিয়া ধরিল। সে বহু চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিল না। অশেষ চেষ্টার পর সে মাটিতে বসিয়াই বলিল— নিয়ে যা, বাবা! আমার মাকে তোরাই নিয়ে যা, আমার আর যাওয়া হোল না…

ছেলেরা সবাই শবদেহ কাঁধে করিয়া 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

হরিহর ঠায় মাটিতে বসিয়া রহিল। শেষকালে তাহার এ কি দুর্ব্বলতা আসিল? কিন্তু দূরে নিস্তব্ধ রাত্রে যতই 'হরিবোল'-ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল, ততই তাহার কোমরের ব্যথাটা বুঝি বুকে আসিয়া তাহার পাঁজরাগুলিকে মোচড়াইয়া ধরিতে লাগিল। সে মূঢ়ের মত তার বেদনা-বিহ্বল বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই খানেই মাটির উপর ঢলিয়া পড়িল।

"জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ"

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্

আজ এই সভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা স্নেহান্ধ হইয়া আমাকে আজ আহ্বান করিয়া অযোগ্যকে যোগ্যতার মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন— ইহাতে আর কিছু না হউক, একথা সপ্রমাণ হইল যে, স্নেহের অসাধ্য কিছুই নাই।

বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের যোগ-সিদ্ধ পুরুষ শরৎচন্দ্র যে সংবর্দ্ধনার কর্ণধার, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের সব্যসাচী রায়বাহাদুর জলধর সেন যে সংবর্দ্ধনার পাত্র, সেই সংবর্দ্ধনা শুধু আজ এখানে সমবেত আমাদের নহে— সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সংবর্দ্ধনা।

চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাঁহারা শুধু সেবার আনন্দের জন্যই বঙ্গ-ভারতীর সেবা করেন, প্রফুল্ল-হৃদয়ে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করিয়া লয়েন, তাঁহারা যে বাঙ্গালীর কত আদরের পাত্র, কত শ্রদ্ধার পাত্র, কত গৌরবের পাত্র, তাহা ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নাই। রায়বাহাদুর জলধর সেন আমাদের সেই আদরের, সেই গৌরবের বস্তু—তাঁহাকে আমি অন্তরের অভিবাদন জানাইতেছি।

তাঁহার অর্দ্ধ শত বৎসরের সাধনা বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় সুবর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। 'সোমপ্রকাশ', 'গ্রামবার্ত্তা', তথা 'হিতবাদী', 'বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার প্রথম যৌবন ও পরিণত বয়সের অক্লান্ত সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন চিরদিন ধারণ করিয়া রহিবে। তাঁহার সরস সুখ-পাঠ্য উপন্যাস-গুলি, বিশেষতঃ তাঁহার 'হিমালয়-ভ্রমণ' — সহজ ও প্রাণস্পর্শী রচনা-শক্তির পরিচয় বহন করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে চির আদৃত থাকিবে। তাঁহার ভাষা, তাঁহার বর্ণনার প্রাঞ্জলতা, বিশেষতঃ তাঁহার লিখিবার নিজস্ব ভঙ্গি — বাঙ্গালার নরনারী-সমাজে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আজ এই আনন্দ-যজ্ঞে আপনাদের উপস্থিতিতে সত্যই আমি আনন্দে অভিভূত ও আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে— কিন্তু আশার সীমা নাই; আশা চায় বিশ্বকে গ্রাস করিতে, জগৎকে করতলগত করিতে। আমিও সেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমার আনন্দ—আমাদের বাঙ্গালা ভাষা একদিন বিশ্ব জয় করিবে—করিবেই করিবে। কেন এমন আশা, তাহা নিবেদন করিতেছি।

আমার পিতৃদেবের জীবন-ব্যাপী আশা ও চেষ্টা এত দিনে সফল হইতে চলিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে—আমাদের বাঙ্গালার বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের আর অনুবাদ করিয়া মাকে ডাকিতে হইবে না, মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে স্বীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে কিন্তু ইহাতে আনন্দ যতটা, চিন্তা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক। শুধু ম্যাট্রিকুলেশনে ইহার পরিসমাপ্তি নয়, হওয়া উচিতও নহে। এমন দিন আসিবে—আমাদের জীবদ্দশাতেই আসিবে— যখন ক্রমে অন্যান্য উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষা-পদ্ধতিতেও বঙ্গভাষাকে আপন সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইব। কিন্তু, বন্ধুগণ, কোথায় সে রাজ-সিংহাসন? কোথায় সেই সিংহাসনের বিশ্বকর্ম্মার দল? এক জনের কাজ নহে, অসংখ্য বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন। সে রাজ-সিংহাসন গঠনে বহু শিল্পীর আবশ্যক। আমি আজ তাঁহাদের সাদরে ও সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতেছি। আমাদের এখন গ্রন্থের প্রয়োজন। মনস্বী সাহিত্য-সেবীদিগকে এখন অন্যদিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। শুধু পরীক্ষার নিমিত্ত নহে, বিশ্বের শিক্ষনীয় সকল

বিষয়েই নানাবিধ পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থের অভাব আমরা বোধ করি। সর্ব্বসাধারণের গ্রহণ-যোগ্য নানা বিষয়-সম্ভারে বঙ্গভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক না থাকিলে শুধু শিক্ষার নিয়ম-পুস্তকে বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিয়া রাখিলে ভাষার উন্নতি-সাধন হইবে না।

ইউরোপীয় ভাষায় যেমন আছে—ইংরাজিতে যেমন Every Man's Library Series অথবা Benn's Series আছে—সেইরূপ বঙ্গভাষাতেও নানারূপ সুলভ 'সিরিজ' পুস্তক-প্রণয়নের সময় আসিয়াছে। যাঁহার যতটা ক্ষুধা, তাঁহাকে তদনুসারে খাদ্য জোগাইতে হইবে। ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে মাতৃ-মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বের দরবারে শুধু কবিতার বা প্রণয়-গীতিকার অথবা উপন্যাস ও গল্পলহরীর অলঙ্কারে মাকে সাজাইলে চলিবে না। জননী ভারতীর একটি বিশেষণ ঋষিরা দিয়াছিলেন, 'সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা' — একথা ভুলিলে চলিবে কেন? সর্ব্ববিধ আভরণে—ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্যের অলঙ্কারে মাকে সাজাইতে হইবে। সাজাইয়া তুলিবার দৃঢ়-সঙ্কল্পে হৃদয়-মনকে বলিষ্ঠ করিয়া একাগ্রমনে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার পিতৃদেব বলিতেন—"সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না—মানুষ ত' কোন্ ছার।" সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পুনর্গঠন-কার্য্য দুষ্কর বা অসাধ্য ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর নিকট দুষ্কর বা অসাধ্য বলিয়া কোন কাজ কোন দিন পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—বঙ্গের সাহিত্যিকবৃন্দ, বাঙ্গালার তরুণ-প্রবীণ লেখকবৃন্দ, কিছু দিনের জন্য বঙ্গের সারস্বত-সৌধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হউন। শুধু সুকোমল কুসুমাস্তৃত নিষ্কণ্টক পথ ধরিলে চলিবে না, এখন আমাদিগকে কিছু কাল মায়ের সেবার জন্য কঠিন, বন্ধুর, দুর্গম পথে বিচরণ করিতে হইবে। শুধু ভিত্তি, শুধু ছাদ বা শুধু সোপানে সৌধ হয় না—এই সকলের সমবায়ে সৌধ নির্ম্মিত হয়। সেইরূপ শুধু কবিতা, শুধু গল্প, আপাত-মধুর রসাল বিষয়ের বর্ণন বা উপন্যাসেই একটি সুসম্পন্ন সাহিত্যের সৌধ গঠিত হয় না। সর্ব্ববিষয়ের সমবায় আবশ্যক। আপনাদিগকে সেই দিকে অবহিত হইতে প্রার্থনা করি। আসুন, আমরা সকলে সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনা করি —

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে —
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

'জলধর-সম্বর্দ্ধনা'য় পঠিত।

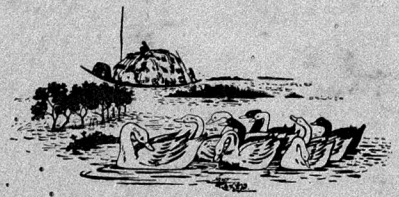

মাণিকমালা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বলার ছিল অনেক কথা, হ'ল না কিছু বলা,
খুঁজিতে পথ হারানু দিশা, বন্ধ হ'ল চলা।
আকাশ হ'তে আলোরে বৃথা' রাখিতে চাই ঘরে,
বনের মৃগ লুকায় বনে, কেমনে রাখি ধ'রে?
নয়ন-মন রঙীন করে' ইন্দ্রধনু ওঠে—
দখিনা বায় কখন হায় কনক-চাঁপা ফোটে,
কখন আসে, কখন যায়—না পাই কোনো দিশা,
শাঙন-ঘন গগন-তলে জাগিয়া থাকে তৃষা।
পথের ধারে বসিয়া থাকি, আঁচল ভরা ফুল
সন্ধ্যাতারা খসিয়া পড়ে—বুঝিতে পারি ভুল!

সে দিন কথা বিনায়ে মালা গাঁথিব আশা করি'
প্রভাত হ'তে নাহি হ'তে চলিনু পথ ধরি'—
কোথায় ফোটে কুঞ্জবনে মনের কথাগুলি
স্নিগ্ধ বায় কোথায় হায় উঠিছে শাখা দুলি',
হৃদে পাখী কোথায় না-কি বেঁধেছে তার বাসা,
দুপুর হ'লে—খেলার ছলে শুনিব তারই ভাষা।
তুলিতে ফুল করিব ভুল, ফুটিবে হাতে কাঁটা
চোখের জলে মিলন হ'লে ভুলিব বেদনাটা।
চয়ন-দুখ ভাগ্য-লেখা, নয়ন-সুখ ভালো,
ফুলের রঙ দেখিতে চাও, হৃদয়-ঝারি ঢালো।
পূর্ণ চাঁদ পাতুক ফাঁদ মেঘের অবসরে
লীলা-কমল উঠুক ফুটে মানস-সরোবরে।

গোপনে বীজ বপন করি' যতনে আঙিনায়
কুসুম-শোভা দেখিব ব'লে যে-জন থাকে হায়,
হয়ত কভু মনের আশা সফল করি' তার
একটি দু'টি কুসুম ফোটে—নয়ত বারেবার।

সকাল-সাঁঝে আমি যে চাহি নানাম ফুলের মেলা,
ফুলের পানে চাহিয়া থাকি পড়িয়া আসে বেলা।
সন্ধ্যা হ'লে সন্ধ্যামণি, রাতের সখী হেনা
বাসর-ঘরে আমারে কভু ডাকিতে ভুলিবে না;
আমার সাথে আসিবে কেবা কথা-বলার সাথী
তেপান্তরের মাঠ পেরোতে পোহায়ে যাবে রাতি।
পথের শেষে ঘুমতী নদী, বহিয়া গেছে বামে,
সাত-মহলা রঙ্‌মহলের সোপান সেথা নামে।
রাজ-কন্যা নাইতে নামেন—সঙ্গে অনেক সখী,
তেপান্তরে ডাকছে চখা—ঘুমতী তীরে চখী।
কুচ-বরণ রাজকন্যার মেঘ-বরণ কেশ
ঝিঁঝির সুরে সাপ-খেলান বাঁশীর সুরাবেশ।
মেঘ-ডমুরী শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়ে ভুঁয়ে
কমল ফোটে কঠিন শিলায় কোমল চরণ ছুঁয়ে।
তরুলতায় রঙ ধ'রে যায় ডাইনে বাঁমে তার
ততক্ষণে ঘুমতী নদী একলা হ'লাম পার।'

রাজকন্যা অবাক হ'য়ে মুখ চেয়ে কি ভাবে
মিষ্টি হেসে শুধায়—"হ্যাঁ গা, কোথায় তুমি যাবে?"
আমি বলি,—"অ—নে—ক দূরে;—আসল কথা বলি'
মনের কথায় ফুল ফোটাতে একলা পথে চলি।
কুঁড়ির মাঝে মৌন রহে—কত গোপন কথা,
হাওয়ায় চলে কানাকানি, সেই ত' ফুলের ব্যথা।
গন্ধ-মধুর কদর রেখে, আদর করে' ফুলে
হে রাজবালা, গাঁথ্‌বে মালা, আপন হাতে তুলে?"
রাজবালা কয়—"কথার মত কইতে পারে কথা—
মানুষ হয়ে বুঝতে পারে' ফুলের ব্যাকুলতা,
জানে কুঁড়ির চঞ্চলতা, বোঝে ফুলের হাসি
এমন যে-জন তার দরশন নিত্য অভিলাষী।"

রাজ-কন্যা শিলাসনে, কমলাফুলের দল
অন্যমনে কাটেন নখে, নয়ন ছলছল,
কি যেন তার হারিয়েছিল—সাবেক কালের কথা,
আজকে হঠাৎ পড়ল মনে, কোথায় কিসের ব্যথা!
কি যেন সে কুড়িয়ে পেল' তেপান্তরের মাঠে
খেলতে এসে হারিয়ে গেল—ঘুম্‌তী নদীর ঘাটে।
হঠাৎ শুনে আমার কথা, চমক ভেঙ্গে চায়,
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয়-রতন কুড়িয়ে বুঝি পায়!

রাজার বালা মাণিকমালা, হাতের রতনচুর
কণ্ঠশোভা রত্নমালা করলে না-মঞ্জুর।
সখীর হাতের ফুল-গহনায় সাজিয়ে দেহলতা,
সঞ্চারিণী পল্লবিণী, কইলে আবার কথা,—

"আমি রাজার ফুলগরবী, ফুলসোহাগী মেয়ে—
কুঞ্জবনে আপন মনে বেড়াই নেচে গেয়ে।"

ফুলের ব্যথা গোপন ছিল কুঁড়ির মাঝে কবে,
ভেবেই আকুল সুগন্ধ ধন কে-ই বা তাহার ল'বে,
কখন বা তা'র দল ঝ'রে যায় তাইত ফোটাফুল
গোপন সুখে রঙীন হয়েও শঙ্কা-সমাকুল।
ফোটার সময় কখন আসে, কখন চ'লে যায়,
স্বপন দেখে মাণিকমালা ফুলের বেদনায়।
রাজার বালা ফুল বাগিচায় ফুলের ফসল তোলে
জানে না সে দখিন হাওয়া কখন কুঁড়ি খোলে,
মাণিকমালার গলায় দোলে তাজা ফুলের মালা
স্বপন কখন সত্য হ'ল জানে না রাজবালা।



উড-কাট] পুষ্প [শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায়

নারীর মন

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক একটি প্রয়োজনীয় মোকর্দ্দমার কারণে হরিশকে সহরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, প্রতিভা আসিয়াছে।

বিবাহের সময় ক্ষণিকের ত্রস্ত-দৃষ্টিটায় সে একটুখানি যাহা পাইয়াছিল তাহা স্বপ্নের মত, এখন চাহিয়া দেখিল প্রতিভার দেহের উপর দিয়া যেন রূপের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। ডাগর চক্ষু'টি যখন ভাবাবেশে মুদিত থাকে তখন উৎকণ্ঠার আর সীমা থাকে না। যখন খুলিয়া যায়, মনে হয় সকলই মিলিল। মিলিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। এ ছাড়া পিতার পরিচর্য্যার স্থলে প্রতিভার কর্ম্মকুশল হাত-দু'খানি যেন মধুর ছন্দে লীলা করিয়া চলিয়াছে। হরিশ শ্রদ্ধার চক্ষে এই সকল লক্ষ্য করিতেছিল আর সঙ্গ-লাভের লালসায় জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছিল।

কমলকৃষ্ণ নিজে জানিতেন, ডাক্তারও বলিয়া গেল, ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষার গুণেই তাঁহার দেহের পীড়া সহসা তাড়ান সম্ভব হইল। আজ তিন দিন তাঁহার বেশ ভালই যাইতেছে। জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলতা ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গও দেখা যায় না। প্রতিভার এখন আর সে ঘরে বসিয়া বসিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটাইবার প্রয়োজন নাই। বিমলাকে দিয়া নিস্তারিণী হরিশের ঘরে পুত্রবধূর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রতিভা আহত হইল। এই সেবার কার্য্যে সে বেশ আনন্দ পাইতেছিল। মনে করিল, হয়ত রাত্রির বেলা সময়মত ঔষধ পড়িবে না। হয়ত যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হইবে শাশুড়ী তখন ঘুমাইয়া পড়িবেন। কিন্তু সে নূতন মানুষ, লজ্জায় কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

মাতার অনুমতিক্রমে বিমলা ইহাদের শয়টি সাজাইয়া-গুছাইয়া শয্যা-রচনা করিয়া রাখিয়া আসিল।

আজ আবার অনেকদিন পরে যুগ্ম-শয্যার উপর যাইয়া উঠিয়া বসিতে হরিশের সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী লতিকার ছড়িয়ে-পড়া এলোচুলগুলির কথা মনে পড়িল। হরিশ তুলনা করিয়া দেখিত, জুড়ী মিলিত না। আজ আবার সে সকল কথাই ধীরে ধীরে তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রতিভার খাওয়া শেষ হইলে বিমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। এ ঘরে সে এই প্রথম পা দিল। শ্বশুরের রোগের জন্যে সময় এত অল্প ছিল যে, সকল ঘরগুলির সহিত তখনও পর্য্যন্ত সে পরিচয় করিয়া লইতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, টেবিলের উপর আলোটি প্রদীপ্তভাবে জ্বলিতেছে। স্বামী শুইয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রা যান নাই। দ্বারের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া এক একবার চমকাইয়া উঠিতেছেন। শয্যার দিকে আগাইয়া যাইতে তাহার লজ্জা হইল।

দেওয়ালে অনেকগুলি সুবৃহৎ তৈল-চিত্র টাঙান ছিল। সে কৌতূহলবশে পায়-পায় সরিয়া একে একে সেইগুলি দেখিতে লাগিল। নিস্তারিণীর চিত্রটির কাছে আসিয়া থামিয়া যাইতে, হরিশ শয্যা হইতে নামিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এঁদের সকলকে চিনতে পারছ প্রতিভা?"

প্রতিভা সলজ্জমুখে নিম্নস্বরে কহিল, "এখানা চিনেছি, মায়ের চেহারা। এ চেহারা এখন আর নাই। স্বাস্থ্য অনেক খারাপ হয়ে পড়েছে।"

তারপর আর একটু সরিয়া গিয়া আর একখানা চিত্রের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এখানাও চিনেছি—কিন্তু চিনতে পারা যায় না। আহা! রোগে প'ড়ে বাবার কি শরীরই হয়েছে!"

হরিশ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। বলিল, "আমার বিয়ের সময় সেই যে টেলিগ্রাম পেয়ে চ'লে এলাম, মনে পড়ে? সেই রোগেই ওঁকে জখম করেছে। এখন আর দু'টি দিন ভাল যায় না।"

প্রতিভা কহিল, "কিন্তু দেহে তেজের উচ্ছ্বাস বেশ আছে। বিশ্রাম আর খাওয়া-দাওয়ার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে পারলেই ওঁর স্বাস্থ্য আবার ফিরে আস্‌বে।"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "এবার গজ-কাঠির মাপে প'ড়ে গেছেন — কিছু কমতিও নেই, বাড়তিও নেই — এবার যদি সেরে উঠ্‌তে পারেন।"

প্রতিভা লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

তারপর ঘুরিয়া গিয়া অন্য দেওয়ালে বিমলার ছবিখানাও চিনিল। বিমলার স্বামীর খানা এবং আরও কয়েকখানা চিনাইয়া লইল। পরিশেষে একখানা যুক্ত-চিত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে চক্ষু দু'টি অপলক হইয়া গেল। ইহার একটি হরিশের—অপরটি এক অপরিচিতার। হরিশ দাঁড়াইয়া — আর তাহার পদপ্রান্তে এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নারী হাঁটু গাড়িয়া যুক্ত করে বসিয়া—রূপে, রেখায়, ছন্দে দু'টি হৃদয় যেন এক করিতেছে। সে শঙ্কিতভাবে আঙুল উঁচাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?"

পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব এ-খানা। উভয়ের মধ্যে আজ পারাপারের ব্যবধান। পরিবর্ত্তন অনেকই ঘটিয়াছে। কিন্তু সে-দিনের সেই বসিবার ভঙ্গীটি — প্রীতি-শ্রদ্ধা ঢালিবার হেলিয়া-পড়া মনটি—প্রাণে প্রাণে নিঃশ্বসিত হইবার অন্তরতম প্রার্থনাটি—প্রতিবিম্বে ঠিকমতই বিধৃত হইয়া আছে। তাহার আর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখন আবার অপর এক অনুসন্ধিৎসু নারীর সম্মুখেও সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়া ঠিক সে সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াই রহিল। চোখে, মুখে অন্তরের ঠিক সেই উদ্বেলিত আবেদনই জাগ্রত করিয়া রাখিল—

"তুমি আমি এক দোঁহে
নিখিল বিশ্বেতে আজ
মিথ্যা আর সবি।"

জীবন উৎসর্গ করিবার ইহার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপটি প্রতিভার বেশ ভাল লাগিল। সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কে ইনি, বললে না ত'?"

হরিশ এবার কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "উনি সম্পর্কে তোমার দিদি হ'ন।"

"বয়স ত' খুবই কম। দিব্য শান্ত-শিষ্ট ভাল মানুষটি। চেহারা দেখেই বুঝেছি, অন্তরে কোন গুণেরই অভাব নেই—সৌভাগ্যেরও সীমা নেই ওঁর।"

বাস্তবিকই চিত্রটির প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে সে এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, আলেখ্যখানা যে আত্ম-নিবেদনের ছবি, সে বিস্মৃত হইল। বলিল, "মুখখানা দেখলে মনে হয় অত্যন্ত সহজ মানুষ, মনে কোন খুঁৎই নেই। স্বামীর কাছে থাকেন বুঝি?"

হরিশ কথা বলিল না।

প্রতিভা বলিল, "এ যাত্রা আমার বেশী দিন থাকা হবে না। অম্বলের অসুখের জন্য বাবা সেই যে এক সাধুর সঙ্গে কোথায় চ'লে গেলেন, এ পর্য্যন্ত কোন খবরই দিলেন না। এবার শুনা যাচ্ছে হিমালয়ের সন্নিকটে না-কি সাধুর সেই আশ্রম। দাদাকে ত' ব'লে এসেছি, নিজেই চলে যেতে। আমি না গেলে কি তাঁর উষ্‌যুগ হবে?"

হরিশ এ সংবাদ জানিত। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রতিভা বলিয়া চলিল, "বাবার জন্যে মনে আদৌ শান্তি পাই না। মায়ের অভাব তিনি কোনদিন আমাদের জানতে দেন নি। তারপর বিয়ে না হ'তে

হেমের কপালটি গেল পুড়ে, এখন বাড়ীতে থাকাই দায়!" তারপর তৈল-চিত্রটির দিকে দৃষ্টি দিয়া সে কহিল, "এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে একবার আনাও না ওঁকে। কি শান্ত আর সরল চক্ষু দু'টি! আমার দেখ্‌তে ভারি ইচ্ছা হ'চ্ছে।"

মিনিট দু'য়েক বিষণ্ণমুখে হরিশ যেন তন্দ্রামগ্ন হইয়া রহিল। তারপর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "উনি এখন আনা-নেওয়ার বাহিরে। শুধু পটখানায় আমাদের কাছে সর্ব্বস্ব হয়ে আছেন।"

এ বন্ধন-মুক্তির সংবাদে প্রতিভা কেমন হতাশ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে মাটির উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বারম্বার মাথা নোওয়াইয়া এই ধ্যান-মগ্না কিশোরীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিশ তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিতে গেল।

ঊর্দ্ধস্থ ছবিখানার দিকে আর একবার মুখ তুলিয়া চাহিতে, এবার কিন্তু প্রতিভার দৃষ্টি হরিশের দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটির দিকে সহসা খুলিয়া গেল। বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে সে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। বলিল, "তোমারই ত' পায়ের নীচে ব'সে—" আর কিছু মুখের বাহির হইল না। ওষ্ঠ দু'খানা নড়িয়া উঠিল মাত্র।

হরিশ বলিল, "পায়ের নীচে এ ভাবে আর কে ব'সে থাকতে পারে, প্রতিভা? তুমি কি এখানে এসেও কিছু শোন নি?"

প্রতিভা এবার বেশ সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন টলমল করিয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

হরিশ হতবুদ্ধি হইয়া ব্যস্তভাবে তাহার কম্পিত দেহ বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া ফেলিল। ক্ষণিকের মধ্যে মনে কত প্রশ্নই জাগিল। মুখে শুধু বলিল — "এত কাঁপছ কেন, প্রতিভা?"

"জগতে দুঃখ আছে — দ্বন্দ্ব আছে; গ্রহ-নক্ষত্রের খেলাও আছে—কিন্তু তাহা যে এমন আকস্মিক আর এমন অচিন্তিত, প্রতিভার জানা ছিল না। আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সে বিরক্তির স্বরে কহিল, "আমাকে ছুঁয়ো না তুমি।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যে ঘটিয়া গেল, হরিশ বিস্মিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রতিভা এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আর এমন শিষ্ট-শান্ত বিবেচক মেয়েটি কেন যে এমন করিতেছে, ইহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হরিশের প্রাণ উড়িয়া গেল।

প্রতিভা দেখিল, যেখানকার ভূমি আশ্রয় করিয়া ধরিতে তাহার ভ্রাতা রমেশ বেশ গুছাইয়া পাঠাইয়া দিল, সে স্থানে অপর এক নারীর অধিকার বিস্তীর্ণ। যে দাবী লইয়া সে উপস্থিত হইল, তাহা ধ্রুব নয়—সত্য নয়। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মাথা উন্নত করিয়া আর একবার ছবিখানার দিকে সে চাহিল। দেখিল, চক্ষু দু'টি তেমনই স্নিগ্ধ—অন্তরটি তেমনই প্রার্থনারত। যুগ যুগ ধরিয়া এই মহা খেলা-ঘরে অভেদাত্মারূপে খেলিয়া যাইবারই প্রার্থনা। ইহাকে নিরাশ করিবার দাবী উঠাইতে গেলে সমস্ত যুক্তিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

কিন্তু একটু আগে সে যেন শুনিয়াছে, ইনি এখন অদৃশ্য কোন্ জগতের। তা তিনি যে জগতেরই হউন না কেন, ছবিটি দেখিলে কে বলিবে ইহা শরীরী নয়? কে বলিবে ইহার প্রতি শিরাটিতে রক্তের স্রোত প্রবহমান নাই? এত রঙ, এত রূপ, এত রস যাহাকে আশ্রয় করিয়া ধরিয়া আছে, তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, কে ভাবিতে পারে? ঘৃণাভরে হরিশের দিকে ঘাড় ফিরাইতে তাহার বেদনাতুর চক্ষু দু'টি সম্মুখবর্ত্তী খাটের উপর গিয়া পড়িল। দেখিল, পরিচ্ছন্ন শয্যার উপর দুই প্রস্থ বালিস। ফুলদানীতে দুই পার্শ্বে দু'টি ফুলের তোড়া। আতর-গোলাপের মৃদু গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে। সম্মুখের ওই প্রার্থনারত পতিপ্রাণা নারীর কেশের কত সুগন্ধি—চোখের কত

প্রেমাশ্রু— মান-অভিমানের কত কি নিদর্শন শয্যার প্রতি অঙ্গে বোধ করি এ পর্য্যন্ত জড়াইয়া আছে। সেই শয্যার উপরে আর ওই দুই উৎকণ্ঠিত চক্ষুর সম্মুখে নির্দ্দয় পুরুষটি অপর এক নারীর সঙ্গে আজ আবার না-জানি কত কি বিচিত্র অভিনয়ই করিবে! বোধকরি এমন একদিন গিয়াছে যেদিন সত্যই এই মানুষটি এই শয্যারই উপর বসিয়া স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা তুলিয়া অবাধে জানাইয়া দিয়াছিল যে, এ প্রেম অপর কাহাকেও দিবার নয়, এ প্রণয় শিথিল হইবার নয়— আর ইহার কিশোর-চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ আবার অপর এক নারীর সঙ্গে সেই অভিনয়ই চলিবে। বিমলা যে তাহাকে পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিল, কানে চুণীর দু'টি দুল পরাইয়া দিল, এই বেশ আর এই মন লইয়া ঘরে ঢুকিবার প্রাক্কালে জল-স্থল, অন্তরীক্ষ কেন কাঁপিয়া উঠিল না? পৃথিবী কেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল না? আর যিনি পটখানায় যে লোকটির নিকট সর্ব্বস্ব হইয়া আছেন, এ দৃশ্যে তাঁহারও বা কেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল না? চারিদিককার এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে কেন বা তিনি এমন রসের ডুবারিরূপে আত্মস্থ হইয়া রহিলেন? কণ্ঠাগত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে হঠাৎ সে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, ইহার ঋজু গতির দিকে তাকাইয়া এবং যখন আর দেখা গেল না, সেই বিরাট শূন্যতার দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া হরিশ অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্বশুরের দ্বারের নিকট যাইয়া সে দেখিল, ভিতর হইতে কবাট বন্ধ। অপর ঘরগুলিও তাই। সকলে যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। পুরী নিঃশব্দ— মৃত। শুধু সুদূরব্যাপী গাঢ় অন্ধকার জীবন পাইয়া নির্লিপ্ত বৈরাগীর মত ধ্যানস্থ। তখন পা টলিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। বুকের মধ্যে সংঘাত বাজিয়া রক্ত যেন নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। দেহ রক্ষা করিবার মত একটু স্থান অবিলম্বে না মিলিলে হয়ত সে চলিয়া পড়িবে। অথবা গভীর সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরে কেহ যদি তাহার দিকে ছুটিয়া না আসে, হয়ত সে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। সে রেলিং আশ্রয় করিয়া দূর আকাশে নক্ষত্রালোকের দিকে শুষ্ক চক্ষু দু'টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। কিন্তু এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে হাত দু'টি যুক্ত করিতে আগ্রহ হইল না। লজ্জা ও খর্ব্বতায় মাথা কেমন হেঁট হইয়া পড়িল। পরের দেওয়া দুর্গতি ও অপমানের জ্বালা এমন তীব্র যেন পঞ্জর চিরিয়া বসিতেছিল।

হরিশ যখন বাহিরে আসিল, পূর্ব্বদিকে শুকতারা জ্বলিতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিল প্রতিভা ভূতাবিষ্টের ন্যায় বারাণ্ডার রেলিং-এ ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। তাহার গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চতুর্দ্দিকের ঘন-অন্ধকারও যেন ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দু'টি মহাসমুদ্রের মত অস্থির, উদ্বেল। রক্ত-ওষ্ঠ কাঁপিতেছে। সামান্য একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য লইয়া এতদিনের সাগ্রহ প্রতীক্ষাকে এমন ধূলির সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিতেছে, তাহার মতো শিক্ষিতা মেয়ের মনের এ শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া হরিশের দুঃখ হইল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া মৃদুস্বরে আহ্বান করিল, "ঘরে এস, প্রতিভা! কোন্ দিক দিয়ে কে দেখে ফেলবেন, আমাকে আর লজ্জা দিও না।"

সে কথা বলিল না। ফিরিয়াও চাহিল না। সজল-দৃষ্টি ভূপৃষ্ঠে নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হরিশ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছু রক্তমাংসের দেহ নয়, দেওয়ালের একখানা পট, তাহার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি? কাগজের উপর তূলির আঁচড় সহিতে পারিতেছে না, এ কেমন মেয়ে? বাহিরের ভঙ্গীটি ত' বেশ! যেন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম-পিপাসা ইহার বুকে! অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম-ভক্তি বণ্টন করিয়া যাওয়া ইহার

নিত্যকালের ধর্ম্ম! ক্রোধ চাপিয়া সে আরও বারকয়েক সাধ্যসাধনা করিল। অবশেষে অপারগ হইয়া নিজের ঘরে সে ফিরিয়া চলিয়া গেল এবং দরজা খোলা রাখিয়া বালিস বুকে চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

প্রতিভার গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। কেমন অসহ্য বেদনাও বোধ হইতেছিল, কে যেন হৃদপিণ্ডটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়াছে, ছাড়িতে চাহিতেছে না। এমন একটি ব্যাপার নিরুপদ্রবে দুই পক্ষের যোগ-সহযোগে বেশ হাসিমুখেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে! পিতার প্রতি তাহার অভিমান হইল। তিনি গৃহে থাকিলে এমন হইতে পারিত না। ভ্রাতার উপর ক্রোধ জন্মিল। আর যে লোকটি ছাদনাতলায় আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মিলনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া লইবার অধিকারে রাত্রির এই ঘনান্ধকারে নিজের ঘরে আহ্বান করিয়া গেল, তাহার উপর সমস্ত চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

পিতার কাছে শিশুকাল হইতে সত্যকে সে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। কর্ণে মন্ত্র পাইয়া আসিয়াছে— স্বামী শুধু ইহকালের নয় — পরকালেরও সেই একমাত্র দেবতা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ-বন্ধন ছিন্ন হয় না। একই পতি কালে কালে তাহারা পাইয়া থাকে। স্ত্রী যদি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী — পবিত্র সংযোগের যে যুগ্ম-চিত্র এইমাত্র সে টাঙান দেখিয়া আসিল, সে কি তাহাতে যোগ দিয়া ইহাকে দশমিকে আঁকার দিবে? তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সেই মুহূর্ত্তে পিতার নিকট ছুটিয়া যায়। যাইয়া জিজ্ঞাসা করে—এ-সকল মিথ্যা-সংস্কার রক্তের মধ্যে কেন গাঁথিয়া দিয়াছিলে? তুমি দেবতা — বল, আমাকে বাঁচাও।

সংসারের এ অত্যাচার, এ অভিনয়, কিছু নূতন নয় —নিত্যই চোখে পড়িতেছে, বেদনাও দিতেছে। কিন্তু নিজের জীবনে আজি তাহার এই বেদনা অতি আশ্চর্য্যরূপে সচেতন হইয়া উঠিল।

সমস্ত রাত্রি বারাণ্ডায় বসিয়া কাটাইবার পর উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া পা টলিতে লাগিল। দেহে যেন রক্তের কণিকামাত্র নাই। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া স্খলিত দেহে সম্মার্জ্জনী লইয়া বাহিরের বারাণ্ডা-গুলি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে সে লাগিয়া পড়িল। রাত্রের ঘোর তখনও কাটে নাই।

সর্ব্বপ্রথমে নিস্তারিণী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। এই অবসরে সে তাড়াতাড়ি শ্বশুরের ঘরের মধ্যে যাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। কমলকৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেহ সুস্থ হইলে তিনি এতক্ষণ উঠিয়া পড়িতেন। সে করিল, "রাত্রে বেশ ঘুমুতে পেরেছেন, বাবা?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, মা! বেশ ঘুম হয়েছে, কোন কষ্টই হয় নি।"

সে-ঘরটিও সে ধুইয়া মুছিয়া জিনিষপত্র গোছাল করিয়া চারিদিকে বেশ চেতনা সঞ্চার করিয়া দিল। শ্বশুরের শয্যাটি পাল্টাইয়া দিয়া বাসি বিছানার কতক বা কাচিয়া কতক এমনই রৌদ্রে শুকাইতে দিল। তারপর তেল মাখায় দিয়া স্নান করিতে গেল।

বিমলার উঠিতে বেলা হইয়াছিল। ছেলেটির খেজমত খাটিয়া এতক্ষণে সে একবার পিতার নিকটে আসিল এবং মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া ছেলেকে লইয়া আদর করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রতিভা রান্নাঘর হইতে জল গরম করিয়া লইয়া উপরে আসিল। ঘোমটা অল্প টানা, বস্ত্রের আড়াল হইতে ভিজা চুলের আগার দিক্‌টা দেখা যাইতেছিল। হাতে জলের বালতি, বামহস্তের বাহুর উপর একখানা তোয়ালে। বিমলা তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া গেল। দেখিল, ইহার জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখে জটিল বেদনার চিহ্ন। মুখের সে নিত্যকার হাসি ফুটি ফুটি করিয়া যেন মধ্যপথে হারাইয়া যাইতেছে। সে বলিল, "এ কি বৌ! এক রাত্তিরে শরীর অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে,' চোখের পাতায় কালি পড়েছে, এ কি চেহারা ক'রেছ?"

কমলকৃষ্ণ ব্যস্তভাবে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন। সত্যই ত' দেহখানা অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছে! সবেমাত্র স্নান

সারিয়া আসিলেও চক্ষু দু'টি দিয়া যে অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে এমন একটা স্থির বেদনার লক্ষণ ধরা পড়ে।

এ বাড়ীর সকলেই জানে গতরাত্রি স্বামীর সঙ্গে তাহার এক বিছানায় কাটিয়াছে। হয়ত জাগিয়াই কাটিয়াছে — বিমলার কথায় লজ্জায় সে মাথা হেঁট করিল।

কমলকৃষ্ণ এ সঙ্কোচ-ভাব লক্ষ্য করিলেন। আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "শরীরের আর অপরাধ কি? এসে অবধি মায়ের ত' হাত, পা, চোখের — কোনটারই বিশ্রাম নেই।"

খাটের রেলিং-এর গায়ে একটি বালিস উঁচু করিয়া দিয়া প্রতিভা বলিল —"জল জুড়িয়ে গেল, বালিসটায় একটু ঠেস দিয়ে বসতে পারবেন, বাবা? গা'টা পুঁছে দিতাম।"

কিন্তু ইহার মুখখানা গতকালও ত' এমন শুষ্ক, এমন ব্যথায় ভরা ছিল না। তাঁহার এই শুশ্রূষা ছাড়া কি অপর আরও একটি ক্লান্তির দিক্ আছে, যে পথে দেহের রক্ত-মাংস অতি শীঘ্র এবং গোপনে এমন জল হইয়া চলিতেছে? সংশয়ে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বালিস ঠেস্ দিয়া বসিলেন। গরম জলে তোয়ালে ডুবাইয়া নিঙড়াইয়া প্রতিভা তাঁহার গা-হাত-পা, বেশ করিয়া মুছাইয়া দিল এবং বস্ত্র ত্যাগ করিতে একখানা কাপড় কোঁচাইয়া হাতের কাছে ধরিয়া দিল। কমলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সেবার ব্যবস্থা কি করেছ, সাবু?"

প্রতিভা অল্প হাসিয়া কহিল, "ডাক্তার এখনি আসবেন। দেখা যাক্, কি বলেন।"

ডাক্তার আসিয়া দুধ-পাঁউরুটির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রতিভা অধিকন্তু তাহাতে কিস্‌মিস্ ছড়াইয়া দিয়া পথ্য করাইল। উচ্ছিষ্ট থালা-বাটি লইয়া বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, হরিশ জামা-জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল। বাসন ক'খানা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিয়া এই অবসরে সে একবার তাহার ঘরে ঢুকিল এবং সেই চিত্রটির সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কিছুই বদ্‌লায় নাই। বসিবার সেই সে ভঙ্গী—অপরের পাদমূলে বাঁচিয়া থাকিবার সেই সে প্রার্থনা! কি সংশয়হীন নির্ভরতা! বলিল, ধন্য তুমি দিদি! প্রার্থনা করি তোমার এ সাধনা সার্থক হউক! কিন্তু নিজের দেহ-মন, বিবেক-বুদ্ধি, জন্ম-জন্মান্তরের স্থিতিতে অপরের সঙ্গে একীভূত করিয়া দিবার যে একমাত্র সত্যকথা—প্রত্যেক নারীই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া শেষ-বিদায় লইতেছে, তাহা কি সামান্য? যদি সামান্যই হয়, যেরূপ দূরে তুমি সরিয়া গিয়াছ মন-প্রাণও সেইরূপ সরাইয়া লও। কি লুব্ধ আশ্বাসে আর পায়ের তলায় বসিয়া কাটাইবে? হাত খুলিয়া লও, তোমার শান্তি আসুক! ইহকাল-পরকাল জড়াইয়া এই রহস্যময় মায়ার অনন্ত কৌতুকে ধ্যানস্থ ইন্দ্রিয়সকল একাগ্র করিয়া রাখিয়াছ, তাই শুনিতে পাও নাই বিসর্জ্জনের করুণ-রাগিনী কোন্ সময় কানের কাছে বাজিয়া গিয়াছে। ইহার পরেও যদি তুমি এমনি যুক্ত-করে ইঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া অমূল্য সময় অযথা কাটাইয়া দাও, তোমার অমর্য্যাদা হইবে।

সে ভূমিতলে মাথা নত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল — আমার অপরাধ নিও না, ভাই! নিজের স্বার্থের জন্য এ কথা বলি নাই। সংসারে নারীর যাহা অমূল্য সম্পদ — সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিত্ত তোমার কাড়িয়া লইব না। নারী আমি—নারীর মনের খবর আমি ত' বুঝি? অন্তর্য্যামীর উপরে যাঁহাকে আসন দিয়াছ—যাঁহার প্রাণের যোগ লইয়া চোখের পলক হারাইয়াছ — সেই সত্য যিনি এড়াইয়া চলিলেন, তোমার পবিত্র মূর্ত্তি দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়া অপমান করিবার কি অধিকার তাঁহার আছে? দিদি! ভগবান তোমাকে নিরাপদ করুন—নির্ব্বিঘ্ন করুন। তোমার পবিত্র শয্যাটির উপর আমি জানিয়া-শুনিয়া লোভ করি নাই—তোমার নির্জ্জন আলয়ে আমি জানিয়া-শুনিয়া প্রবেশ করি নাই। আমাকে ক্ষমা কর।

সে পুনর্ব্বার ইহার পদ-প্রান্তে মাথা নত করিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া বিমলা কিন্তু একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া এ সকল দেখিতেছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "অত মাথা কুট্‌ছ কার পায়ে? আমাদের রাধা-গোবিন্দের পায়েও ত' অমন ক'রে মাথা ঠুক্‌তে কাকেও দেখি না! তুলির আঁচড় দেখেই ভুলে গেলে? আচ্ছা সতীন-ভক্ত মেয়ে ত' তুমি?"

প্রতিভা লজ্জায় ঘাড় নত করিল। বলিল, "সত্যি দিদি! ওঁর পায়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া ওঁর কাছে একটা গুরুতর অপরাধও আমার আছে।"

শেষের কথাটি বলিয়া ফেলিয়া সে কিছু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং কি দিয়া ইহাকে আড়াল করিবে, ভাবিতে লাগিল।

বিমলার কিন্তু সুর বদলাইয়া গেল। সে বলিল, "আমি সকালবেলা দু'জনার চোখ-মুখের কালি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। সকল ছেড়ে সুদূর স্বর্গে যে চ'লে গেল, তার সম্বন্ধে আর কথা কি! সতীন এমনি জিনিষ বটে! কিন্তু ওই মানুষটিকে যদি জীবন্ত কাছে পেতে, পাশাপাশি কাজ-কর্ম্ম ক'রে যেতেও আটকাত না। কি বৌ যে গেছে আমাদের, সাতখানা গাঁ খুজলেও অমনটি আর মিলবে না। এত শীঘ্র চলে যাবে জানতে পেরেই বোধ করি সমস্ত বাড়ীটায় সে আপনাকে এমন ক'রে ছড়িয়ে রেখে গেছে।"

এই বলিয়া সে হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া মৃতা বধূটির হাতের নিদর্শন ঘরে ঘরে দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙান কার্পেটের উপর কত রকমের লেখা। একটির উপর প্রতিভার মন আকৃষ্ট হইল। লেখা ছিল—

"ত্বং জীবিতং, ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"

প্রতিভা ভাবিল—ইহাই তাঁহার অন্তরের কথা। সমস্ত নারী-জাতির মনের কথাই এই।

বিমলা তারপর দেখাইল, কার্পেটের উপর অঙ্কিত কত রকমের পাখী, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। তারপর দেখাইল, পুঁতির ঝাঁপি, পুঁতির বাক্স, পুঁতির কলম-দানি, কড়ির খেলনা। ভেলভেটের বরাসন, ভেলভেটের তাকিয়া—কত কারুকার্য্য তাতে খচিত রয়েছে। মাটির ছাঁচ, বাক্সের খেরোটোর, বালিসের ওয়াড়, ঝালর, আরও কত কি—যাহা চোখে পড়িতেছিল, দেখাইয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল দেখান শেষ হইলে তাহারা আবার পূর্ব্বের স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল। বিমলা বলিল, "হতভাগী চ'লে গেল! বেঁচে থাক্‌লে হয়ত তোমার আসার কোন প্রয়োজনই হ'ত না। যদি বা আসতে—চোখের কোণে এমন কালি পড়্‌ত না।"

প্রতিভার বুকে স্বভাবতঃ একটা আঘাত লাগিতে পারিত। কিন্তু তাহার এই অভিশপ্ত বিফল জীবনটি অতঃপর যে কতজনের চক্ষে, কত রকমে দেখা দিবে তাহার বোধকরি সীমা-পরিসীমা নাই। তাই সে উপেক্ষা করিয়া গেল। বিমলার ছেলে পঞ্চু দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, খোকনকে জিজ্ঞাসা করি, ওর মনেত কোনও পাপ নেই। বলত খোকনমণি! এক দিনের ঈর্ষ্যায় কি চোখের পাতায় কালি পড়ে?"

পঞ্চু বলিল, "মা আমাকে কাজল পরিয়ে দেয় নি।"

"তা দেবেন কেন? ছেলের আদর-যত্ন করতে তোমার মা কতই জানেন! চল, আমি তোমাকে কাজল পরিয়ে দোব।"

পঞ্চুকে ক্রোড়ে লইয়া সে বিমলার ঘরে চলিয়া গেল এবং গামছা দিয়া হাত-পা মুছাইয়া কাজল পরাইতে বসিল।

(ক্রমশঃ)

জর্জ্জ বার্ণাড শ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একদা একটি অভিনয়ের আসরে বার্ণাড শ-কে বক্তৃতা দিতে বলা হয়। অনুরোধ অনুসারে যবনিকার পরদা সরিয়ে তিনি দর্শকদের সুমুখে উপস্থিত হ'তেই সমগ্র জনতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো। কয়েক মিনিট পরে কলরোল শেষ হ'লে সহসা শোনা গেল পিছনের গ্যালারি থেকে একটি দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে, মুখের অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে, বার্ণাড শ-কে বিদ্রূপ করছে!

জনতা ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু বার্ণাড শ নির্ব্বিকার। মৃদু হেসে তাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন—My friend! I quite agree with you; but what are we two against so many?

এমনি ধরণের সরস ও সপ্রতিভ উক্তির জন্য বার্ণাড শ পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। শুধু সরস উক্তিই নয়, মাঝে মাঝে তিনি আচম্বিতে এমন কঠিন কথা বলেন, যা নিয়ে সারা জগতে রীতিমতো আন্দোলন প'ড়ে যায়—Every man above forty is a scoundrel—তাঁর এই কথাটি নিয়ে বহুদিন পৃথিবীময় তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল। এমনি ধরণের আরও অনেক বচনই তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হয়েছে।

একবার এক সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা নটী তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"যদি আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'ত, তা'হলে আমার দেহ-সৌষ্ঠব এবং আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে যে ছেলে জন্মাতো সে হ'ত পৃথিবীর আদর্শ।"

উত্তরে বার্ণাড শ লিখেছিলেন—"কিন্তু তা তো না-ও হ'তে পারতো! সে-ছেলে যদি আমার দৈহিক সৌষ্ঠব এবং তোমার মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মাতো, তা'হলে সে কি হ'ত?

রূঢ় সত্যভাষণে এবং প্রচলিত সমাজ-বিধির ক্ষমাহীন সমালোচনায় জর্জ্জ বার্ণাড শ-র লেখনী বা জিহ্বা কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নি।

অনেকের ধারণা বার্ণাড শ পুরোপুরি আইরীশ, তা নয়। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ স্কটল্যাণ্ডে বাস করতেন। তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে তাঁরা আয়ারল্যাণ্ডে গমন করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ জুলাই ডাব্‌লিন শহরে বার্ণাড শ ভূমিষ্ঠ হ'ন।

তিনি তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যারপরনাই অলস ও অপদার্থ (তাঁর নিজের কথা)। পনেরো বছর বয়সে তাঁকে এক অফিসে কেরাণীর কাজে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়; কিন্তু সে কাজে তিনি মোটেই মনোযোগ অর্পণ করতেন না। তাঁর দিনমানের বেশীর ভাগ সময় তখন ডাব্‌লিন্ জাতীয় চিত্রাগার কিম্বা সাধারণ গ্রন্থালয়ে অতিবাহিত হ'ত। তখন তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—"কেমন ক'রে আমি মিকালেঞ্জেলোর মতো ছবি আঁকতে পারবো।"

পাঁচ বছর পরে তিনি লণ্ডনে তাঁর মায়ের কাছে চ'লে আসেন। শিল্পে ও সঙ্গীতে তাঁর মা ছিলেন একজন মনস্বিনী মহিলা; বার্ণাড শ বলেন যে, তাঁর মায়ের কাছ থেকেই তিনি শিল্প-জ্ঞান এবং মানসিক শক্তি লাভ করেছেন।

লণ্ডনে এসে তিনি লিখতে সুরু করলেন। কুড়ি বছর মাত্র বয়স, মুখে দাড়ি-গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে (তখন থেকেই তিনি স্থির করেছিলেন যে, গণ্ডদেশে তিনি কখনো ক্ষুর চালনা করবেন না), অপরিচিত, অনভিজ্ঞ এবং জীবন-সম্বন্ধে নিরতিশয় কৌতূহলী লেখক তখন থেকেই প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, প্রায় সকল বিষয়েই চলিত মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই; কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হলেন না, সদম্ভে বিশ্বাস করলেন, তাঁর মতই সত্য, অন্য সকলে ভ্রান্ত।

এতখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বোধ করি আর কোন সাহিত্যিকই তাঁর লেখক-জীবন আরম্ভ করেন নি। বার্ণাড শ-র বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর মধ্যে প্রতিভার দীপ্তি আছে, সাধারণের অনেক উর্দ্ধে তিনি, এবং সে-কথা, আজ না হোক, দু'দিন পরে পৃথিবীর লোক নিশ্চয় উপলব্ধি করবে।

নাট্যকার বার্ণাড শ-কে জানতে হ'লে তার আগে সংস্কারক বার্ণাড শ-কে জানা দরকার; কারণ, সংস্কারকের ভিতর দিয়েই নাট্যকার বিকাশ লাভ করেছে। অনেকের মতে, বার্ণাড শ প্রথমে প্রচারক, পরে নাট্যকার,—কথাটি ভিত্তিহীন নয়।

ইতিমধ্যে কয়েক বছরে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেছিলেন কিন্তু কোন প্রকাশকই তাদের প্রকাশ করতে রাজী হয় নি। ন-বছর ধ'রে লেখকের কাজ ক'রে তিনি উপার্জ্জন করেছিলেন—নব্বই টাকা! অনেকে তাঁকে লেখা-সম্বন্ধে নানা রকম অমূল্য উপদেশ দিলে, কিন্তু সে-সব কথায় কর্ণপাত না ক'রে তিনি একভাবেই তাঁর কলম চালিয়ে চললেন।

এই সময় তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এলো। 'কারিংটন ষ্ট্রীট মেমোরিয়্যাল হল্'-এ আমেরিকান প্রচারক হেন্‌রি জর্জ্জ বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"প্রগতি ও দারিদ্র্য"। বার্ণাড শ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাটিই বোধ করি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ব-বিশিষ্ট ঘটনা; সেই দিনই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর এতদিনের ঘুমন্ত "সামাজিক চেতনা" সেদিন পরিপূর্ণ-রূপে জাগ্রত হয়েছে; এতদিন তিনি শুধু নিজের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, সেদিন দেখতে পেলেন মানব-সমাজের অখণ্ড রূপটি, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম প্রতিভাত হ'ল—সেই সমাজের অসংখ্য দোষ-ত্রুটি, অগণিত অনৌচিত্য।

তিনি তখন নিজে সংস্কারক ও প্রচারক হবার সঙ্কল্প করলেন; আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর অদৃষ্টে মহানগরী লণ্ডনকে শিক্ষিত করবার ভার পড়েছে; (তাঁর নিজের কথা); সুতরাং, সেই দিন থেকে তিনি প্রত্যেক সভায় যোগদান করতে লাগলেন এবং মনের ভীরু লাজুকতা সত্ত্বেও শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাঁর তীব্র মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

সময় সময় বক্তৃতা দিতে উঠে তাঁর পা টলতে থাকতো, বুক কাঁপতো—মনে হ'ত যেন এখুনি প'ড়ে যাবেন; বক্তৃতার কথা যেতেন ভুলে, প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুতেই মনে আসতো না। কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও তিনি যা বলতেন শ্রোতারা সে গুলি বিশেষ উপভোগ করতো। কিছুদিনের মধ্যে, শুধু জনসভায় নয়, পথ-প্রান্তে এবং পার্কগুলির ভিতরেও তিনি শ্রোতৃবর্গের কাছে একজন পরিচিত শক্তিমান্ বক্তারূপে সমাদৃত হ'তে লাগলেন।

বক্তৃতার দ্বারা প্রচার-কার্য্যের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। একদা এক বর্ষণ-সিক্ত রবিবারের অপরাহ্ণে তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য 'হাইড পার্কে' উপস্থিত হলেন। কেউ তার বক্তৃতা শোনবার জন্য সমবেত হ'ল না, শুধু দু'জন পাহারাওয়ালা তাঁর আশে-পাশে ঘুরতে লাগলো,—তাদের প্রতি এই হুকুম ছিল যে, যদি সেই কুখ্যাত বক্তা আইনের গণ্ডি পেরিয়ে কোন কথা বলে, তা'হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ভীত বা দমিত না হ'য়ে বার্ণাড শ তাদের কাছেই বক্তৃতা সুরু ক'রে তাদের সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

এই সব বক্তৃতা তিনি দিতেন—জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে; তাঁর মতের সঙ্গে তাদের

মতের মিল না হোক, কিন্তু তারা সেই সকল মতামত নিয়ে আলোচনা করুক, তারা ভাবতে শিখুক, তাদের চৈতন্য জাগ্রত হোক্—এই ছিল বার্ণাড শ-র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যে তিনি অনেক পরিমাণে সফলকাম হয়েছিলেন।

১৮৮৪ সালে বার্ণাড শ ফেবিয়ান সমিতিতে যোগদান করেন; কয়েকজন সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র ও চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি এই সঙ্ঘটি গঠন করেছিলেন। বার্ণাড শ এই সমিতিতে প্রবেশ ক'রে অতি শীঘ্রই তাকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। এই সমিতি থেকে প্রকাশিত বক্তৃতাবলী ও পুস্তিকাগুলি দেশের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এঁদের দ্বারা প্রচারিত কয়েকটি সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আইনের দ্বারা বলবৎ করা হয়েছিল।

জন-সাধারণের এবং সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করবার পর বার্ণাড শ উপন্যাস রচনা পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সাহিত্য-চর্চ্চা ব্যাহত হল না,—সাংবাদিক ও সমালোচক হিসাবে তাঁর নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই সময়, তাঁর নামের প্রসার দেখে যে প্রকাশকেরা একদিন তাঁর রচনা অমনোনীত করেছিল, তারাই এসে সেগুলির জন্যে তাঁর দরজায় ধর্ণা দিতে লাগলো।

রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন্ তখন খ্যাতির চরম শিখরে; তিনি বার্ণাড শ-র উপন্যাস "Cashel Byron's Profession" সম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতূকাবহ মত প্রকাশ করেছিলেন; অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল—

"A combination of struggling, overlaid, original talent and blooming gaseous folly ..."

পরে ষ্টিভেন্‌সন্ রীতিমতো বার্ণাড শ-র ভক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বার্ণাড শ-র সমালোচক-জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় সময় হচ্ছে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ; সেই সময় Saturday Review-র পাতায় তিনি নিয়মিতভাবে তদানিন্তন-কালের কৃত্রিম, প্রাণহীন এবং অপদার্থ নাটকগুলির উপরে তাঁর বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। প্রচার করতে লাগলেন যে, ঐ-সকল হাস্যকর উদ্ভট ও অস্বাভাবিক নাটক নিয়ে আনন্দে নেচে ওঠা ইংরাজ দর্শকের পক্ষে নিরতিশয় লজ্জাকর অজ্ঞানতা; নাটকের মধ্যে ইবসেন যে বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাকে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে, এবং সেই সঙ্গে এসেছে দোষে গুণে তৈরী মানুষকে সমবেদনা-সহকারে বোঝবার দিন।

বার্ণাড শ তাঁর প্রথম নাটক রচনা করেন একা ও স্বাধীনভাবে নয়—আর একজনের সহযোগিতায়। তাঁর নাম উইলিয়াম আর্চার—তখনকারদিনের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সমালোচক।

কথা ছিল আর্চার সরবরাহ করবেন গল্পাংশ এবং শ রচনা করবেন সংলাপ। প্রথমে কাজ বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হয়েছিল এবং শ নাটকের দুই তিন অঙ্ক সমাপন করেছিলেন; পরে, কি কারণে জানা নেই, আর্চার আর গল্পাংশ দিয়ে শ-কে সাহায্য করতে রাজী হলেন না এবং শ-ও তাঁর অসমাপ্ত নাটক বাক্স-বন্দী ক'রে রাখলেন।

উক্ত ঘটনার সাত বছর পরে ইন্‌ডিপেনডেণ্ট থিয়েটারের সত্বাধিকারী বার্ণাড শ-কে একটি নূতন ধরণের নাটক লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন—ঐ থিয়েটারে, প্রচলিত সাধারণ শ্রেণীর নাটকের চেয়ে অপ্রচলিত ও অসাধারণ শ্রেণীর নাটকের চাহিদা ছিল বেশী। কাজেই বার্ণাড শ-কে তাঁরা নাট্যকার হিসাবে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করলেন এবং বার্ণাড শ-ও তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। নাটক সৃষ্টি হ'ল—Widowers' Houses!

যথাসময়ে নাটকখানি পাদ-প্রদীপের শুভ-দৃষ্টি লাভ করলে। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল সমালোচনার রোল উঠ্‌লো, বেশীর ভাগই বিরুদ্ধ সমালোচনা। অনেকেই নাটকখানি দেখে ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত হ'ল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও ক্ষুব্ধ হলেন আর্চার; তিনি দেখলেন যে, বার্ণাড শ-কে তিনি যে সুখাদ্য প্রণয়-কাহিনীর গল্পাংশ যুগিয়েছিলেন সেই গল্পাংশটিই এই নাটকে বিকৃত ও বীভৎস রূপে দেখা দিয়েছে; তার মধ্যে তাঁর কল্পিত সেই সুচারু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির লেশমাত্র নেই, আছে নাগরিক-সভ্যতার আবরণহীন তীক্ষ্ণ সমালোচনা, আছে বাড়ীওয়ালীদের প্রতি কটাক্ষ—আছে বাস্তবতার ভিক্ত-রুক্ষ রসে পরিপূর্ণ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার এক নীরস চিত্র!

সেই নাটকের পর সমালোচক ও সংস্কারক বার্ণাড শ-র লেখনী বাধা-বন্ধহীন উন্মুক্ত-আবেগে ছুটে চ'লল; তাঁর কলমের সেই তীব্র হলাহল সাধারণ দর্শকরা গলাধঃকরণ করতে সক্ষম হ'ল না। কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই; আরও দু'খানি "unpleasant plays" রচিত হ'ল—The Philanderer (১৮৯৩) এবং Mrs. Warren's Profession (১৮৯৩)! শেষোক্ত নাটকখানিকে শুধু জনসাধারণ নয়, সরকার পর্য্যন্ত বরদাস্ত করলে না; সেন্সর কর্ত্তৃক তার অভিনয় বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। নিউ ইয়র্কে একদল অভিনেতৃ-সঙ্ঘ ঐ নাটকখানি অভিনয় করেছিল ব'লে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়েছিল। ১৯২৪ সালে নাটকখানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রয়েল কোর্ট থিয়েটারে Man and Superman প্রথম অভিনীত হয়; নাটকখানি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—"the most ambitious effort of Shaw during that period!" এই নাটকের প্রাণ-চঞ্চল গতি, রসাল ব্যঙ্গোক্তি এবং সর্ব্বোপরি মানব-সমাজের প্রতি নাট্যকারের সুগভীর ও সুতীব্র মতামতগুলি জনসাধারণের কাছে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। Man and Superman কিছুদিন পর্য্যন্ত সারা সভ্য-জগতে বিপুল চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল। ঐ নাটকখানিকে এখনো পর্য্যন্ত বার্ণাড শ-র "the most characteristic of his many dramas" ব'লে অভিহিত করা হয়।

একমাত্র কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীবদ্দশায় কোন সাহিত্যিকই এতখানি যশ ও সম্মান লাভ করতে পারেন নি এবং জীবিতাবস্থায় অন্য কোন লেখকই বোধকরি এতখানি সমালোচনা ও আলোচনার পাত্র হ'য়ে ওঠেন নি।

প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে জগতের লোক বার্ণাড শ-র কাছ থেকে বহু প্রকারের উদ্দীপনাশীল উক্তি শুনে তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরণের মতামত প্রচার করেছে। জগতের কাছে তিনি এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ ব'লে পরিচিত। তাঁর মানসিক বিশেষত্বের কথা আমরা তাঁর লেখার মধ্যে পাই; ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি নিরামিষাশী, ধূমপান-বিরোধী, মাদকদ্রব্য-স্পর্শ-দ্রোহী এবং তিনি অনেক সময়ে ট্রেণে বা বাসে ভ্রমণকালে তাঁর নাটক লিখে থাকেন। হার্ড-ফোর্ডশায়ারে তাঁর "দেশের বাড়ী"; সহরের বাস-ভবনের ঠিকানা হচ্ছে Adelphi Terrace, London। বার্ণাড শ বিবাহিত; তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি নিঃসন্তান।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বার্ণাড শ-র মতো এত বয়স পর্য্যন্ত এতখানি মানসিক সক্রিয়তা সচরাচর দেখা যায় না। আজো তাঁর লেখনী অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে, আজো নব নব ভাব এবং রস-সৃষ্টির ক্ষমতায় তাঁর শক্তি অব্যাহত ও অতুলনীয়।

বার্ণাড শ-র রচনা সম্বন্ধে একটি সমালোচনা কিছুদিন পর্য্যন্ত শোনা গিয়েছিল—মানুষকে তিনি না-কি প্রীতির চোখে দেখেন না; মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা নেই, নেই সহানুভূতির স্পর্শ। কিন্তু তাঁর Saint Joan নাটকখানি সেই সমালোচনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। "সেণ্ট জোয়ান"-এর মধ্যে তিনি যে সত্য প্রচার করেছেন, সে সত্য সীমা ও কালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয়—সে সত্য শাশ্বত। মানুষের প্রতি

অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসার দীপ্তিতে "সেণ্ট জোয়ানে"র প্রতিটি ছত্র উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

তাঁর মতের সঙ্গে অনেকেরই মিল হয় না বটে, কিন্তু তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভান্বিত ব্যক্তি, এ-কথা বোধ করি কেউই অমান্য করতে পারে না। তাঁর দুর্লভ রচনা-শক্তি এবং অলোকসামান্য প্রতিভা স্পর্দ্ধিত মহিমার সঙ্গেই যেন সারা বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জ্জন করেছে।

সমাজ-সাম্যবাদের অগ্র-নায়ক রূপে বার্ণাড শ তাঁর লেখনীর সাহায্যে সারা জগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলেন তিনি হচ্ছেন—Propagandist first ; dramatist afterwards !

বর্ত্তমান সমাজ-সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য তীব্র এবং চিন্তা-গভীর বাণী প্রচার করেছেন এবং যে নাটকখানির মধ্যে তাঁর লেখনীর এই দিক্‌টি স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সব চেয়ে তীব্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে, সে নাটকখানির নাম—Man and Superman।

বার্ণাড শ-কে যাঁরা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে এ নাটকখানি অপরিহার্য্য।

এই নাটকখানির মধ্যে নাট্যকার এক অসাধারণ সমাজ-বিদ্রোহীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তেজের দীপ্তিতে, ভাবের অভিনবত্বে এবং বাচনের ওজস্বিতায় সে সৃষ্টি যেমন দুর্নমনীয়, তেমনি বিস্ময়কর। তাঁর নাম জন ট্যানার। সে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন মানে না। সে বলে, "The first duty of manhood and womanhood is a Declaration of Independence ; the man, who pleads his father's authority, is no man; the woman, who pleads her mother's authority, is unfit to bear citizens to a free people..."।

জন ট্যানার বিদ্রোহী ; তার লক্ষ্য ধ্বংস ; "I shatter creeds and demolish idols"; তার মত হচ্ছে, "Construction cumbers the ground with institutions made by busy bodies : Destruction clears it and gives us breathing space and liberty !" কিন্তু তাই ব'লে নির্ম্মাণ এবং ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি এবং হত্যাকে যেন এক করা না হয় ; জন ট্যানার সৃষ্টিকে সম্মান করে ; হত্যাকে করে ঘৃণা। জন ট্যানার-কে ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে, The Revolutionist's Hand-Book and Pocket Companion নামে সে যে বইখানি লিখেছে এবং যেখানি নাটকের শেষে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেখানি পড়া দরকার। তার মধ্যে Maxims for Revolutionists ব'লে একটি অধ্যায় আছে। সেই অধ্যায় থেকে কয়েকটি মতবাদ তুলে দিলাম। এদের দ্বারা ট্যানারকে কতকটা বুঝতে পারা যাবে—

The Art of Government is the Organisation of Idolatry.

A fool's brain digests philosophy into folly, science into superstition and art into pedantry. Hence University education.

The vilest abortionist is he who attempts to mould a child's character.

He who can, does. He who cannot, teaches.

Marriage is popular because it combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity.

When a man wants to murder a tiger, he calls it sport ; when the tiger wants to murder him, he calls it ferocity. The distinction between Crime and Justice is no greater.

Property, said Proudhon, is theft. This is the only perfect truism that has been uttered on the subject.

Beware of the man whose God is in the skies.

কিন্তু এই বিদ্রোহী-বীর শেষ-পর্য্যন্ত রমণীর জীবনী-শক্তি এবং নারীত্বকে উপেক্ষা করতে পারলে না ; শেষ পর্য্যন্ত নারীর দুর্ণিবার্য্য আকর্ষণের কাছে তাকে ধরা দিতে হ'ল। বিবাহ যার কাছে ছিল "apostasy, profanation of the sanctuary of my soul, violation of my manhood, sale of my birthright, shameful surrender,....." — সেই

বিদ্রোহীকে শেষ পর্য্যন্ত নারী জয় করলে! সমস্ত নাটকখানির মধ্যে নর-নারীর অন্তর্লোকের এই চিরন্তন সংগ্রামের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

যে মেয়েটি মনে মনে ট্যানারকে বিবাহ করবার সঙ্কল্প করেছিল, তার নাম য়্যান্। অক্টেভিয়াস্ নামে একটি যুবক য়্যানকে পূজা করত, কিন্তু য়্যান তাতে তৃপ্তি পেতো না—তার মন ছিল ট্যানারের দিকে। ট্যানার য়্যানের মনোভাবকে প্রশ্রয় তো দিতই না, বরং সময়-অসময়ে কটু-কথার দ্বারা তাকে আহত করত এবং শেষে একদিন তার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে দেশান্তরে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত য়্যানই জয়লাভ করল ; ট্যানার সখেদে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো —The Life Force. I am in the grip of the Life Force !

তারপর ট্যানার শেষবারের মতো চেষ্টা ক'রে ব'ললে—য়্যান, তুমি কেন অক্টেভিয়াসকে বিবাহ কর না! সে তো তোমায় ভালোবাসে!

য়্যান বল্লে—অক্টেভিয়াস বিবাহ করবে না। Man like that never marries! তারা যোগ্যও নয়।

অবশেষে ট্যানার আর নিজেকে নিরুদ্ধ ক'রে রাখতে পারলে না ; য়্যানের দু'হাত ধরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে ব'ললে—What have you grasped in me? Is there a father's heart as well as a mother's ?

য়্যান সে উত্তেজনা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলে না ; সে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ল। অন্যান্য লোকজন এসে পড়বার পর তার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'লে সে ব'ললে—I have promised to marry Jack !

সকলে তখন ট্যানারকে অভিনন্দন জানাতে লাগ্‌লো ; ট্যানার দু'-একবার ব'ললে বটে, সে এর জন্য মোটেই দায়ী নয়, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে ; কিন্তু তার অন্যান্য প্রলাপের মতো এ-কথাতেও কেউ কর্ণপাত করলে না। সে সুখী হয়েছে বলে সবাই আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। তখন ট্যানার য়্যানের হাত ধ'রে গম্ভীর ভাবে ব'ললে—"আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, আমি সুখী হই নি। য়্যানকে সুখী দেখাচ্ছে, কারণ সে জয়লাভ করেছে। এ তার জয়ের আনন্দ। কিন্তু আসলে আজ অপরাহ্নে আমরা যে কাজ করেছি তার দ্বারা আমরা সুখকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, মুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, জীবনের শান্তিকে বিসর্জ্জন দিয়েছি এবং সর্ব্বোপরি বিসর্জ্জন দিয়েছি অজ্ঞাত ভবিষ্যতের স্বপ্নময় সম্ভাবনা! আমি ইচ্ছে করি না যে, এই সুযোগে আমার খরচে মদ্যপান ক'রে আমার 'বন্ধুরা' অসংলগ্ন এবং অসার কথার দ্বারা আনন্দ জ্ঞাপন করতে থাকুক।"

এই বলে সে কেমন ক'রে তাদের বিবাহিত জীবন যাপন করবে, কি ভাবে তাদের বাড়ী-ঘর সাজাবে, বন্ধুদের উপহারগুলি বিক্রি ক'রে তার অর্থ দিয়ে কি পদ্ধতিতে তার পুস্তক প্রচার করবে, বিবাহ-সভায় কে কে উপস্থিত থাকবে এবং তখন 'বরের-সাজ' না পরিধান ক'রে সে কি রকম সাধারণ পোষাক পরিধান করবে—এই সকল বিষয়ের সুদীর্ঘ বিবরণ দিতে লাগ্‌লো।

বলা বাহুল্য, তার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে হেসে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ল।



প্রতিযোগিতার গল্প

[তৃতীয় পুরস্কার]

বুদ্বুদ

শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে বসিয়া ঘরের বধূটী সেলাই করে। অনেকক্ষণ হয় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দু'জনের সংসার—সামান্য কাজ, সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়। অতঃপর তার প্রচুর অবসর। স্বামী কোথায় গিয়াছে, ঠিকানা নাই। বাড়ীতে আর কোন লোক নাই। সহরতলীর এই অংশ এখন নির্জ্জন হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পাশের বাড়ীর পাতানো-দিদির সু-উচ্চ হাসি মাঝে মাঝে কানে ভাসিয়া আসে।

জানালার কাছে ডালিম গাছটায় অসংখ্য লাল ফুল ফুটিয়াছে। বাহিরেও জ্যোৎস্নার আর অন্ত নাই। কেবল্ গৃহের মধ্যে এই কেরোসিনের আলোটা প্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিয়া অপ্রচুর আলো বিকীর্ণ করিতেছে।

তারপর রাত্রি আরও গভীর হইবে……স্বামী আসিবে। নিঃশব্দে উঠিয়া সে তাহাকে ভাত বাড়িয়া দিবে। আহারান্তে তামাক দিয়া হয়ত তাহারই শয্যার একান্তে বসিয়া চাহিয়া থাকিবে। কেহই তাহার সহিত কথা কহিবে না। স্বামীর সে অবসর নাই, যাত্রার 'প্রোগ্রাম' চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে, না-হয় ক্লাবে চলিয়া যাইবে।·· মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া বধূ শয়ন করিবে, দেখিবে, জ্যোৎস্না কমিয়া আসিতেছে আর ডালিম গাছের ফুলগুলি সেই স্বল্পালোকে স্বপ্ন-পুরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরী-কন্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে।

পাশের বাড়ীর দিদি ডাকে, "চারু!"

"যাই দিদি।"

দোর খুলিয়া সে আসিয়া দাঁড়ায়, "কি দিদি?"

"এখনও ফিরে আসে নি?"

চারু বুঝিতে পারে না, বলে—"কে?"

"কে আবার, নেকী! তোর স্বামী, নগেন!"

চারু বলে, "না।"

এ ত' তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার! রান্না-বান্না শেষ করিয়া দীপ জ্বালিয়া স্বামীর অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকা, সে ত' অনেক দিন হয় আরম্ভ হইয়াছে।

দিদি বলে, "তোদের কাণ্ডই ঐ!···মায়া নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই। আমাদের বাপু সে হবার উপায় নেই, আপিসের ছুটী হ'ল কি সটান বাড়ী চ'লে এলেন।"

চারু নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে। কি-ই বা বলিবার আছে? দিনের পর দিন অবহেলা-অবজ্ঞা কুড়াইয়া কুড়াইয়া সে যে তাহারই ভারে পীড়িত হইয়া পড়িল। আর তাহারই পাশে দিদির প্রেম-পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দ-জীবন, সে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে।

দিদি বলে, "যা, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে থাক্ গে, চারু! কোথায় কোন্ আড্ডায় গাঁজা-গুলি খেয়ে প'ড়ে আছে, না-হয় যাত্রা ক'রতে গেছে, হয়ত আসবেই না!"

ইহাও সত্য। কতদিন সে সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অবশেষে রাত্রি যখন প্রভাত-প্রায়, সে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, স্বামী আসে নাই।···

চারু চলিয়া আসে। সে ভাবিয়া পায় না, কেন এমন হয়। একজন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, আর একজন···

অথচ একদিন ছিল·· প্রথম যখন বিবাহ হয়। চারু ত' তখন ছোট্ট বধূটী। শয্যায় আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িত। নগেন কত গল্প করিত—সম্ভব-অসম্ভব দেশ-বিদেশের কত গল্প! শুনিতে শুনিতে চারুর ঘুম চলিয়া যাইত—রাত্রি গভীর হইত।···বালিকা স্বামীর কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া দুই-একটা অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া বসিত। নগেন হাসিত, চারু হাসিত—আর ঘরের আলোটাও যেন আনন্দে হাসিয়া উঠিত।···

আজও সেই আলো আছে, সেই ঘর আছে, চারুও ত' তেমনি আছে, শুধু নগেনই এখন আর তেমন নাই।

হায়, মানুষের কেন পরিবর্ত্তন হয়? পরিবর্ত্তন হয় ত', এত সহজে কেন? এত সহসা কেন?

চারু তার জবাব খুঁজিয়া পায় না।

সেলাইটা পড়িয়া থাকে।

ওই যে ডালিম গাছটা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, উহার উপর আসিয়া দু'টী পাখী বসিত। রোজ ছোট্ট দু'টী টুনী পাখী উহার ডালে টিন্-টিন্ করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। চারু রাঁধিতে রাঁধিতে দেখিত, আর ভাবিত, ওরা যেন আর টুনী পাখী নয়, একটী পাখী চারু আর একটী নগেন—সংসার-ডালে অমনি আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আনন্দ যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যাবেলা চারু নগেনকে টুনী পাখীর ইতিহাস বলিয়া দিয়াছিল।

নগেন হাসিয়া আর কূল পায় নাই, বলে, "পাগলী!"

চারু কথা বলে না, কিন্তু খুশী হয়।

পরদিন এক সময় সে দেখে, নগেনও নিবিষ্টমনে সেই পাখী-দুইটার দিকে চাহিয়া আছে। চারু হাসিয়া ওঠে, নগেনও হাসে।

চারুর মনে পড়ে, অতঃপর রোজ পাখী দু'টী আসিত, রোজ তাহারা দু'জনে খাবার দিত আর ঝগড়া করিত।

চারু বলিত, "ওইটা তুমি!"

নগেন সেই পাখীটাই দেখাইয়া বলিত, "উহুঁ! ওটা তুমি!"

"ইস্! ওটা তুমি-ই! দেখছ না, কেমন দুষ্টু!"

নগেন কৃত্রিম ক্রোধে বলিত, "কি, আমি দুষ্টু? আচ্ছা, নাম যখন কিনলামই, তখন……" সে দুই হাতে চারুকে আলিঙ্গন করে।

এম্নি রোজ।···নগেন ইচ্ছা করিয়া পাখী চিনিতে ভুল করিত, আর ঝগড়া করিত।

তারপর একদিন দুইটা পাখী না আসিয়া একটা আসিল। চারু কাঁদিয়া বলিল, "ও গো, চারু বেঁচে নেই……!"

নগেন চমকিয়া ওঠে—বলে, "বালাই!"

"না গো না, সত্যি, দেখে যাও তুমি—" সে ডালিম গাছটা দেখাইয়া দেয়।

সত্যই একটা পাখী নাই।···

চারু বালিকার মত কাঁদিয়া বলে, "চারু নেই, চারু নেই, মরে গেছে।"

নগেন তাহাকে বুকে টানিয়া লয়; তাহার শির চুম্বন করিয়া বলে, "এই যে চারু—"

কিন্তু চারু, সেদিন সারাদিন কাঁদিয়াছে। সেদিন সে রাঁধে নাই, খায় নাই, নগেন নিজে রাঁধিয়াছে, চারুকে সাধিয়াছে। সারা সময় তাহার নিকটে বসিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, "চারু, টুনু···"

রাত্রি গভীর হইয়াছে। ঘুমে চারুর চোখ ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। পাশের বাড়ীর দিদির কথাবার্ত্তাও বন্ধ হইয়াছে।

মেঝেতে আঁচল পাতিয়া চারু ঘুমাইয়া পড়ে।

ভোর রাত্রে নগেন ফিরিয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, সারারাত্রি যাত্রা করিয়া এক্ষণে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিদ্রিত পত্নীকে পা দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বলে—"ওঠ্, হারামজাদী ভাত দে···"

চারু ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসে। চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ভাত বাড়িয়া স্বামীর সামনে রাখিয়া দেয়।

নগেন ভাতে হাত দিয়াই চেঁচাইয়া ওঠে, "এঃ, একেবারে ঠাণ্ডা!"

চারু বলে, "রাত ত' কম হয় নি!"

"কি? মুখে মুখে তর্ক? হারামজাদী! চাই আমি গরম ভাত এক্ষুণি!"

চারুও রাগিয়া ওঠে, বলে, "ইস্, মাইনে করা বাঁদী কি-না, রাত তিনটেয় গরম ভাত রাঁধো!"

ক্রোধে নগেনের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। ডালের বাটিটা সজোরে ছুঁড়িয়া মারিয়া ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া যায়।

চারুর কপালটা-কাটিয়া গিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়ে, ভাবে, টুনী পাখীটা যেদিন মরিয়া গিয়াছিল, সেদিন সে রাঁধে নাই, খায় নাই, নগেন নিজে রাঁধিয়াছে, তাহাকে সাধিয়াছে, সারাক্ষণ তাহার কাছে কাছে থাকিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিয়াছে, "কেঁদ না চারু, কেদ না টুনু…"

আর একদিন।

দিদি ডাকে, "চারু!"

"কি দিদি?"

"আজ থিয়েটারে যাব, বাবু পাশ এনেছেন, যাবি চারু?"

চারু কোনোদিন থিয়েটার দেখে নাই। আনন্দে হাসিয়া ফেলে, বলে, "যাব দিদি।"

"আচ্ছা যা, কাজ-কর্ম্ম শীগ্‌গির সেরে নে!"

চারু চলিয়া আসে। চট করিয়া উনুনে আগুন দেয়। বাসন-পত্র মাজিয়া আনে। আজ আর সে নিজের জন্য রাঁধিবে না। তাহা হইলে দেরী হইয়া যাইবে। শুধু নগেনের উপযুক্ত ভাত রাঁধিয়া ঢাকা দিয়া চলিয়া যাইবে।

দিদি সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া ডাকে, "কি রে চারু, হোল তোর?"

"এই যাই দিদি।"

চারু হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দিদির দিকে চাহিয়া থাকে, বলে, "মুখে কি মেখেছ দিদি?"

"পাউডার।"

"কোথায় পেলে দিদি?"

তাহার অজ্ঞতায় দিদি হাসিয়া ফেলে, বলে, "পাব আবার কোথায়, নেকী? বাবু এনে দিয়েছেন।"

"আর চোখে?"

"অঞ্জন। বাবু এনেছেন।"

"আর রুমালে?"

"এসেন্স। ও রে বোকা, তাও বাবু এনেছেন, রোজই আনেন, প্রেম-উপহার…" দিদি মুচকিয়া হাসে।

"তোমায় খুব ভালবাসেন তিনি, না দিদি?"

"খু—ব!"

"তবে আবার পাউডার মাখো কেন?"

"সুন্দর দেখায়।"

"তাতে কি হয় দিদি?"

"তাতে আরও ভালবাসেন…এখন যাবি ত' চল।"

চারু দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলে, "না দিদি, আমি যাব না, তুমি যাও।"

দিদিরা চলিয়া গিয়াছে। চারু আসিয়া তাহার তোরঙ্গ খোলে। প্রথম জীবনের, প্রথম যৌবনের কোনো প্রেম-উপহারও কি তাহার বাক্সে নাই?

কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে খান-দুই চিঠি পাওয়া যায়। নগেন লিখিয়াছিল; চারু পড়ে, "প্রাণের টুনু…" আবার সেই টুনী-পাখীটার কথা।…

সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার চোখের সামনে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে বিগতদিনের সুখ-স্মৃতি মূর্ত্তি ধরিয়া নাচিতে থাকে। সারারাত্রি গল্প করিয়া তাহারা ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িত, সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিত, চারু চুপি চুপি পলাইয়া যাইত, নগেন টেরও পাইত না। তারপর একদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল, সে উঠিতেই চুলে টান পড়িল। নগেন জাগিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, আজ আর চারু ঠকাইতে পারে

নাই। সে যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নগেন তাহার খোপা খুলিয়া সেই চুলের গোছা নিজের গলায় জড়াইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ভোরে চারু উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাহারও গলায় টান লাগিয়াছে, চারু পলাইতে পারে নাই।

তোরঙ্গের মধ্যে একটা সেমিজ পাওয়া গিয়াছে। নগেনেরই দেওয়া উপহার। তাহার বর্ডারে লেখা আছে, 'এন-সি'—নগেন আর চারু।

একদিন নগেনও চারুকে উপহার দিয়াছে।

আবার তাহার চোখের সামনে সৃষ্টি দুলিতে থাকে, সেই প্রথম যৌবন…অগাধ প্রেম…নগেন আর চারু…' চারু আর নগেন…গ্রীষ্মের গল্প-মুখর বিনিদ্র রজনী…. চৈতি হাওয়া…ফুলের গন্ধ…পাখীর ডাক…ঝাউ গাছের শন শন শব্দ…বটগাছের ঝর-ঝরানি গান…সকাল-সন্ধ্যা অবিরাম আনন্দ… উদ্দাম প্রেম…পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না…আর থাকিয়া থাকিয়া বিরহী পাখীর মিনতিপূর্ণ ক্রন্দন…'বউ কথা কও'…'বউ কথা কও'…

তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ে। নগেন আসিয়াছে, বলে, "চারু, যাত্রা শুনতে যাবি?"

চারু মাথা নাড়িয়া বলে, "না।"

"চল্ না চারু, আমার পাঠ আছে, পবন-কুমারের পাঠ দেখবি 'খন।"

চারু তবু বলে, "না।"

নগেন ইতস্ততঃ করিয়া বলে, "চারু, একটা টাকা দিবি?"

টাকা, গহনা চাহিবারই ছল মাত্র। চারু তাহা জানে। আজও তাহার গায়ে প্রহারের দাগ খুঁজিলে পাওয়া যায়। যে দুই-একখানা গহনা ছিল, স্বামী তাহা দিয়া ক্লাবে নাম কিনিয়াছে। আজও আবার প্রয়োজন পড়িয়াছে।

আজ সামান্য গহনা লইয়া ঝগড়া করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না, ঘৃণা বোধ হইল। নিঃশব্দে হাতের একখানি চুড়ি খুলিয়া ফেলিয়া দিল।

নগেন চলিয়া গিয়াছে।

চারু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই—একটু হাসি, একটুখানি খুশী, সামান্য একবিন্দু করুণা, কৃতজ্ঞতা—কিছু না। প্রয়োজন শেষে সে চলিয়া গিয়াছে।

শূন্য উঠানটা খাঁ-খাঁ করে।

অনেক রাত্রে চারু টের পাইল, দিদি স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিয়াছে তারপর আরও ঘণ্টা খানেক সে তাহাদের গল্প-গুজবের শব্দ শুনিল। অবশেষে সব নিঝুম, নিস্তব্ধ…

হয়ত নগেন এখন পবন-কুমারের পাঠ বলিতেছে। রাবণ-বধ … দুর্ভাগিনী মন্দোদরী ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে…সীতার উদ্ধার হইয়াছে…অদূরে চিতার ধোঁয়ায় শত শত রাক্ষস বধূ সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।…

এমনি করিয়া দিন যায়।

সকাল হইতে সন্ধ্যা সুনির্দ্দিষ্ট কাজ। রাঁধার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রাঁধা। আর কোনও কাজ নাই। জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই। স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই—কিছু নাই।

জীবনটা একটা ফাঁকি?

স্বামী আসে কিংবা আসে না, তাহাতে কিছু যায় আসে না। যদি-বা কচিৎ আসে, দু'টী ভাত পাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়।

তারপর সারাদিনই চারুর অবসর।

যখন দশটা বাজে, চারু দোরের আড়ালে যাইয়া চুপি চুপি দাঁড়াইয়া থাকে। দিদির স্বামী এখন আপিসে যাইবে। দিদি সঙ্গে সঙ্গে দোর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসে। তাহার হাতে পানের খিলি, স্বামীর মুখে পুরিয়া দেয়, অতঃপর স্বামী যখন চলিয়া যায়, দিদি শূন্যমনে দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

চারু নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

তারপর যখন ছ'টা বাজে, আবার দিদি দোর

গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মুখে পাউডার, চোখে কাজল, ঠোঁটে পান, পায়ে আলতা।

স্বামীর সহিত চোখা-চোখী হইতেই সে হাসিয়া ওঠে।

চারু শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার স্বামীও একদিন তাহাকে ভালবাসিত, তাহার পায়ে কাঁটাটী বিঁধিলে, সে ব্যথা স্বামীও অনুভব করিত। সে-ও যাবার কালে দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিদায় দিত, আবার যখন ফিরিয়া আসিত, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইত।

কিন্তু তাহার অমন সাজ-সজ্জা ছিল না, মুখে পাউডার ছিল না, কাপড়ে আতর ছিল না, আলতা পরিত কি-না, তাহাও আর স্মরণ নাই···

চারু একদিন কাপড়-সেমিজ ভাল করিয়া কাচাইয়া তোরঙ্গে তুলিয়া রাখিল। সে মনে মনে এক সঙ্কল্প আঁটিয়াছে।

চারুর দিদি আজ স্বামীর সহিত বায়স্কোপে গিয়াছে। তাহাদের বাড়ী খালি, চারুর কাছে চাবি রাখিয়া গিয়াছে।

বাক্স হইতে বাহির করিয়া চারু ধোপা-বাড়ীর সেমিজ-কাপড় পরিল। তারপরে দিদির স্বামী যে ঘরে থাকে, চাবি দিয়া সেই ঘর খুলিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সে একবার নিজের মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

যাক্, আজ সে একটিবার দেখিবে, আজ পাউডার মাখিবে, আতর ছিটাইবে, আলতা পরিবে। তারপর যখন সাজিয়া-গুজিয়া দাঁড়াইবে, নগেন কি একবারও ফিরিয়া দাঁড়াইবে না? একবারও ফিরিয়া কি তাহার সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিবে না? সে দেখা যত ক্ষণিকের হউক, সে দৃষ্টি যতটুকু মৌন প্রশংসার হউক, তবু···তবু···

সে পাউডার মাখিতে থাকে। চুলটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া আতরের শিশি হাতে নিতেই আয়নার দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, শিশিটা হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

দিদির স্বামী বিলাসবাবু আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছে। বিলাসবাবু হাসিয়া বলে, "বাঃ····· ফাইন"

চারু সরিয়া যায়, সে চক্ষু বুজিয়া এই প্রকাণ্ড লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বিলাসবাবু আবার বলেন, "সুন্দর···"

সে চারুর হাত ধরিয়া ফেলে।

চারু আহত হইয়া সবলে হাত ছিনাইয়া লয়, বলে, "ছিঃ!"

"ভয় কি চারু? কেউ নেই, তোমার দিদি বাথরুমে কাপড় ছাড়ছে···"

চারু সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে নিজ মনে বারম্বার শিহরিয়া বলে, "ছিঃ, ছিঃ···"

নিজের ঘরে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। সৃষ্টিটা আবার দুলিতে থাকে, সব গুলাইয়া যায়, দিদির কথা মনে হয়, নিজের কথা মনে হয়, স্বামীর কথা মনে হয়।

সে স্থির করিল, আজ সে মরিবে। অদূরে ঐ-বর্ষার নদী কূলে-কূলে ভরিয়া গিয়াছে, উহারই তলদেশের সুনিবিড় অন্ধকারে সে তাহার স্বামী-প্রেম-বঞ্চিত-জীবনটার অশেষ দৈন্য, অশেষ লজ্জা লুক্কায়িত করিবে।

কেবল যাইবার আগে সে একবার দেখিয়া যাইবে, বলিবে, "এই দেহটায় তোমারই অধিকার ছিল, তুমি ফিরিয়াও চাহিলে না, পর-পুরুষে তাহা কামনা করিল।" জিজ্ঞাসা করিবে, "এফদিন তুমি ভালবাসিয়াছিলে আজ সে প্রেম কোথায় গেল, কাহাকে দান করিলে?" বলিবে, "আজ যাবার কালে কি তোমার কিছুই দিবার ছিল না, একটু প্রেম, একটু স্নেহ, কিছুই কি আর অবশিষ্ট নাই?" দেখিবে, মরণকালেও সে একবার আগের মত স্নেহভরে প্রেম-পরিপূর্ণকণ্ঠে ডাকে কি-না, "চারু! টুনু!" শুধু একবার, একটিবার। তারপর এই অসার জীবন সে

বিসর্জ্জন দিবে, নদীর ওই ঘোলা-জল—উহারই অতল-গর্ভে সে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল চারু উঠিল না, তেমনি বসিয়া রহিল। আজ আর সে রাঁধিবে না। নগেন আসিয়া তাহাকে বকিবে, হয়ত মারিবে, মারুক! তাই বা মন্দ কি? যে হাতে একদিন সে আলিঙ্গন করিয়াছে, আজ সেই হাতেই সে নির্ম্মমভাবেই প্রহার করুক, যে খোঁপায় একদিন সে স্বহস্তে ফুল পরাইয়া দিয়াছে, তাহা খুলিয়াই সে আজ অশেষ নির্য্যাতন করুক, যে-মুখে সে একদা প্রেম-গুঞ্জন শুনিয়াছে, তাহাতেই সে আজ তিরস্কার-বাণী শুনিয়া যাক্···

তারপরে যখন সে মরিবে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না। মা ধরিত্রী এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। শুধু নদীর জল বারেকের জন্য শিহরিয়া উঠিবে, তারপরে সংসার তেমনি চলিতে থাকিবে।

হয়ত আবার একদিন আর একটি নববধূ এই ঘরে এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেই উদ্দাম প্রেম, সেই অফুরন্ত স্নেহ, সেই সুনিবিড় অনুরাগ, সেই মোহ, সেই সব·····

আলো আর জ্যোৎস্নায় সামনের নদীর জল চিক্‌মিক করিবে, অশ্বত্থগাছে পাখীর কোলাহল থামিয়া যাইবে, রাত্রি গভীর হইবে, ঘুমে বধূর চোখ জড়াইয়া আসিবে, এমনি সময় হঠাৎ ভূতুমপাখী কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিবে, বধূর ঘুম টুটিবে, ভয়ে ভয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইবে।

ঝাউয়ের বনে শিস্ উঠিবে, ডালিম গাছে ফুল ফুটিবে, হয়ত আবার দুইটা টুনী পাখীও আসিবে, বসিবে, নাচিবে।

তারপর? তারপর আর সে ভাবিতে পারে না, পরের জীবন তাহার বড় দুঃখের, বড় দৈন্যের। সে অগাধ প্রেম কোথায় মিলাইল, সে স্বচ্ছন্দ জীবন কোথায় লুকাইল? স্বামীর পরিবর্ত্তনের সে কাহিনী যেমন দ্রুত, তেমনি সংক্ষিপ্ত, তাহাকে 'না' করিবার আর কোনো উপায় নাই।···

ভাবিতে ভাবিতে সে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। অবিশ্রান্ত অশ্রুজল ভেদ করিয়া দৃষ্টি তাহার ভবিষ্যতের অন্ধকারেও ডানা মেলে, সে দেখিতে পায়, নগেন আবার বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের জীবন আড়ম্বরপূর্ণ, কোলাহলময়, তাহার মত শূন্য নয়, ব্যর্থ নয়, রিক্ত নয়। তাহাতে প্রেম আছে, ভালবাসা আছে, স্নেহ আছে, পরস্পরকে পাইবার মধ্যে আনন্দ আছে। সে মাটিতে বার বার কপাল ঠুকিয়া বলে, "হে ঈশ্বর! তাই হোক্, তাই হোক্, যে আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিবে, সে যেন আমার মত দুঃখ না পায়, সে যেন আমার মত স্বামী-প্রেমে বঞ্চিত না হয়, তাহার জীবন ভরিয়া দাও, দু'হাত দিয়া ভরিয়া দাও, দিদির মত স্বামী-প্রেম নহে, আমি যেমন পাইয়াছিলাম, যেমন হারাইলাম, তাকে দাও! তাকে দাও!·····"



শতাব্দী পর

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কে-টি, সি-আই-ই

'অন্ত—অব্দ শতাব্দেবা'—হইবেই হইবে। আজ না হয় কাল, না হয় পরশু, না হয় শতবর্ষ পরে। আজ যেমন আসিয়াছে, কাল তেমনি আসিবে, পরশু আসিবে। এইরূপে আজ, কাল, পরশু করিয়া অব্দ অতীত হইবে। তারপর আসিবে অব্দ, আবার অব্দ। এইরূপে একের পর এক করিয়া শতাব্দও আসিবে।

'জন্মনা জায়তে মৃত্যুঃ' শুধু এই কথার সঙ্গেই 'অন্ত, অব্দ শতাব্দেবা' কথার প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শুধু তাহা নয়—অন্য প্রসঙ্গেও একথা বলা যায়। অব্দের পর অব্দ আসে, আসিবে—যাহারা থাকিবে তাহারা এই চক্র-বিবর্ত্তন দেখিবে, হয়ত, ঘটনা পরম্পরা শতাব্দও দেখিবে।

শুধু আজ-কাল নয় বহুদিন, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানব এই অব্দ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় ঘটনার পরিমাণ অব্দ ধরিয়া হওয়া অসুবিধা, শতাব্দী ধরিয়াই হয়। ছোট-খাট কথা, খুঁটি-নাটির কথা পরিমাণের জন্য শতাব্দ নির্দ্ধারণ প্রয়োজন হয় না—'আখবরী' গজ-কাটীর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হইলেই বা তাহা মানে কে, গণে কে? যার যত মনের পরিমাণ সেই পরিমাণই তার পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তুর পরিমাণ; আজকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে যে বিষম বিপ্লব-ঝঞ্ঝাবাত সদৃশ যে ভীষণ নর্ত্তনের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মাপ-কাটী প্রাচীনের হাতে ত' নাই-ই, আধুনিকের হস্তে তাহা ধৃত হওয়াও সম্ভব নয়। (Sir James Jean) স্যর জেমস্ জীন এবাউন নগরে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় যে প্রাকৃতিক লোম-হর্ষণ ব্যাপারের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহার পরিমাণে অব্দ শতাব্দ কেন শত মুহূর্ত্তই যথেষ্ট হইবে। সাধারণ সভায় প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় সে বিবৃতি দূরে যাক, ধারণাই অসম্ভব। সাধারণ গজ-কাটীর পরিমাণে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা করেন এবং করিবেন—কবি রবীন্দ্রের পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উৎসব, তাঁহার জয়ন্তী উৎসব, তাই দেখাদেখি নলিনী পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশৎ বর্ষ প্রবেশের উৎসব, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের, প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসুর, রায়-বাহাদুর জলধর সেনের, বরোদার গায়কোয়াড়ের ষাট বৎসর রাজ্যাভিষেকের উৎসব, মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর নাটি-সেন সাহেবের অধিকতর বয়ঃপ্রাপ্তির উপলক্ষে জয়-জয়ন্তী পর্য্যায় যথেষ্ট চলিতেছে, আরও চলিবে — বন্যা ছুটিলে সহজে থামে না।

অন্য প্রকারের এবং প্রকরণের জয়ন্তীর অভাব নাই। রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিক তিরোধান-তিথি-পূজা হইয়াছে—তদুপলক্ষে নির্ম্মম প্রত্ন-তাত্ত্বিক-হস্তে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শত-বার্ষিকী জন্মতিথির পূজাও হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের উচ্চশিক্ষার পথ-প্রদর্শয়িতা 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' বিদ্যালয়ের শত বার্ষিক জন্মোৎসব তদানীন্তন বাঙ্গলার লাট স্যর ষ্ট্যানলি জ্যাক্‌সন মহোদয়ের শাসন-কালে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সেই কথা স্মরণ করিয়া পুণ্য জন্মাষ্টমীর দিনে সেমিনারীর সভাপতিরূপে সেমিনারীর চিহ্ন — নিদর্শন (symbol)-স্বরূপ অক্ষয় বট রোপণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এবার বড় আকারের জয়ন্তী-পূজা হইবে—কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শত-বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া। বাঙ্গলা দেশের লোক-শিক্ষা এবং লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান-স্থাপন-ক্ষেত্রে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শত-বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন। সে স্মৃতি-পূজার হোতা, ঋত্বিক, উদ্গাতা এবং পুরোহিতবর্গ আহূত হইয়াছেন, কর্ম্মের জন্য বৃত হইয়াছেন, সমবেত হইয়াছেন। ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শ-সভা স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে এই স্মরণ-যোগ্য দিনের স্মরণ স্মরণ-যোগ্য ভাবে হয় তৎসম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না এবং হইতে পারিবে না, রাজা-প্রজা মিলিয়া, ধনী-নির্ধন মিলিয়া লোকহিত-কামী মাত্রেই উৎসব সাফল্যের উপকরণ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত। এই সাধু ও বরেণ্য চেষ্টা ভগবৎ-কৃপায় জয়যুক্ত হউক এবং এই উৎসব-যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া বৃহত্তর লোকহিত চেষ্টার মহীরুহের বীজ রোপিত হউক। আর্ত্তত্রাণ-চেষ্টা এদেশে নূতন নয়, বহু প্রাচীন। যে অপূর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ভারতের সাধনার অন্যতর শ্রেষ্ঠ উপকরণ ও উপাদান তাহারই মূলসূত্রগুলি আরব-পারস্যের পথে গ্রীস ও রোমের মারফৎ তমসাচ্ছন্ন য়ুরোপের মধ্য-যুগ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। এখন সেই বিকীর্ণ জ্যোতিঃ ভারতে আবার ফিরিয়া ভারতীয় নিদান ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে ধিক্কার দিবার চেষ্টাও করিতেছে। সর্ব্ব বিষয়েই এখন যুগ-পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মানুসারে 'চক্রপরিবর্ত্তন' অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখ না করিয়া, অতীতের জন্য বৃথা না কাঁদিয়া, ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করিবার কামনায় ভারতবর্ষে ইংরাজী প্রণালীতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রচলনের ইতিহাসের আলোচনা অসাময়িক ও অপ্রয়োজনীয় হইবে না।

যে সংস্কৃত শিক্ষা ও শিক্ষালয় এখন অনাদরের না হউক উপেক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই কেন্দ্র এবং উপলক্ষ্য করিয়া এদেশের নব-প্রচলিত এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। তারপর মাদ্রাসা বিদ্যালয়েও ইহা আংশিক প্রচলন হয়, প্রাচীন পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রয়োজন অল্পবিস্তর পরিমাণে সেই সময় অনুভূত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার সাহায্যেই সেই প্রয়োজন সাধিত হইত। সভ্য সমাজের আদিম যুগের উপযোগী প্রায়োগিক চিকিৎসার ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল না। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গেই দেশীয় ভাষায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-তত্ত্বেরও অল্পবিস্তর আলোচনা হইত। যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পার্লামেণ্টের এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য সমগ্র বৃটিশ অধিকারভুক্ত ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে? এখানে একটু রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক্। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের পথ বন্ধ হয়। সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষা-সাহায্যে যেখানে শুধু আয়ুর্ব্বেদীয় নয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও শিক্ষার আয়োজন হইত, শত বর্ষ ধরিয়া সেখানে চিকিৎসা-শাস্ত্র-শিক্ষা সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য হয় নাই। এই শতবর্ষে এলোপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্র-শিক্ষা চরম না হউক পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই শতবর্ষে মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের পর ধীরে ধীরে আরও কত চিকিৎসায়তন ও আরোগ্য-নিকেতন উদ্ভূত হইয়াছে। নানা শাখা-সম্বলিত মেয়ো হাসপাতাল জন্মিয়াছে, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল জন্মিয়াছে, দুইটী মাড়োয়ারী হাসপাতাল জন্মিয়াছে, কারমাইকেল কলেজ হাসপাতাল জন্মিয়াছে, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল, ন্যাশান্যাল স্কুল হাসপাতাল জন্মিয়াছে, কলিকাতা মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, হাওড়া হাসপাতাল জন্মিয়াছে, সহরের ও সহরতলীতে এবং মফঃস্বলে ছোট-বড় অনেক স্কুল ও হাসপাতাল জন্মিয়াছে, State Faculty of Medicine জন্মিয়াছে — যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াছে হাকিমী এবং ইয়ুনানী বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল; জন্মিয়াছে একাধিক এবং সুপরিচালিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় এবং জন্মিয়াছে কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতাল।

কিন্তু যে সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র এবং উপলক্ষ্য করিয়া ১৮২২ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশীয় এবং বিদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আলোচনা এবং শিক্ষা হইত এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৬টী রোগীর শয্যার (bed)

ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ছিলেন অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপ্যাল। সেই সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে অধ্যক্ষ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পুনরায় আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার যেন প্রচলন হয়। স্বর্গীয় বরেণ্য কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় ছিলেন জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতৃদেবের বহু স্নেহাস্পদ বন্ধু, তাঁহার উৎসাহ এবং উত্তেজনা ছিল এই চেষ্টার মূলে। আমার সতীর্থ বিহারীলাল সেনগুপ্ত (পরে কবিরাজ) এবং অন্যান্য বৈদ্য ও অবৈদ্য-ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যয়নের প্রার্থী ছিলেন। সে চেষ্টা কিন্তু বিফল হয়। বহুকাল পরে যখন সরকার বাহাদুরের আমন্ত্রণে আমার সংস্কৃত-শিক্ষা-সংস্করণ সভার সভাপতিত্বের গৌরব এবং সৌভাগ্য ঘটে তখনও এই চেষ্টার সূচনা পুনরায় হয় এবং সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন হয়। রহস্যের এবং আশার বিষয় এই যে, আগামী বৎসরে (১৯৩৫) মেডিকেল কলেজ স্থাপনের শত-বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইবে, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতালের প্রসারণের আয়োজন হইবে। সেই ১৯৩৫ সালে হইবে সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পঠন-পাঠনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এই রহস্যের মধ্যে ভগবানের গুহ্য ইঙ্গিত উপলব্ধি না করিয়া থাকা যায় না। কেবল শাস্ত্র-পাঠ হইবে না প্রায়োগিক শিক্ষার ভিত্তিতে এই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থারও আয়োজন হইবে। এই বৎসরই রাজ-রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনাধিরোহণের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব অর্থাৎ এই রজত জুবিলী এবং শত-বার্ষিকী উৎসব দেশের এবং সমাজের মঙ্গল নিদান হউক। এই উৎসব উপলক্ষে মনে রাখিতে হইবে যে, রোগ-চিকিৎসা ও আর্ত্ত-সেবার ব্যবস্থা দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত অপ্রচুর। আজ অমর কবির অমর গাথায় উল্লিখিত সপ্ত-কোটী-কণ্ঠ বাঙ্গলায় নাই সত্য। দৈবদুর্ব্বিপাকে বিধাতার অভিশম্পাতে সেই সপ্ত-কোটী আজ পঞ্চ-কোটীতে পরিণত। সরকারী নিয়মানুসারে যে চিকিৎসা-প্রণালীর সমাদর এবং আইন-সঙ্গত প্রচলন সেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার চরম ছাড়-পত্রধারী মেডিকেল গ্রাজুয়েট এ পর্য্যন্ত হইয়াছে মাত্র চার হাজার। ইঁহার মধ্যে কতজন বাঁচিয়া আছেন, কতজন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং দেশ-দেশান্তরে চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহার সংখ্যা-পরিমাণ নাই। নিম্নতর ছাড়-পত্রধারী আরও কয়েক হাজার হইয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ মোট আট হাজারের অধিক নয়। পাঁচ-কোটী নরনারী ও শিশুর নানাবিধ এবং ক্রম-বর্দ্ধমান জটিল রোগের চিকিৎসার ভার আইন-সঙ্গত নিয়মের আট হাজার চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত। যাঁহারা কবিরাজি হাকিমি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে চিকিৎসা বলিয়াই মানেন না, হাতুড়েগিরি বলিয়া উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা এবং নির্য্যাতন সমর্থন করেন তাঁহারা এই অনুপাত পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্মিত এবং চিন্তিত হইবেন। এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া দরিদ্র-দেশে লোকহিতকর এবং লোকের অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা প্রণালীর প্রসার ও চিকিৎসক সংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে এই উৎসবের সাফল্য ও সার্থকতা হইবে।

আর্ত্তত্রাণ আশ্রম এবং হাসপাতালের সংখ্যা-সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। নানা চিকিৎসা প্রণালী-অনুমত যে হাসপাতালের কথা উপরে উল্লিখিত হইল তাহাও প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নিতান্ত অপ্রচুর এবং উপস্থিত হাসপাতালগুলিতে যে আয়োজন এবং ব্যবস্থা আছে তাহাও নিতান্ত অপ্রচুর। বহুদিন কারমাইকেল কলেজ হাসপাতাল, ভগবান দাস বগলার মাড়োয়ারী হাসপাতাল, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের হাসপাতাল, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ হাসপাতাল এবং রেফিউজ হাসপাতালের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বলে আমি উচ্চকণ্ঠে এবং অকুতোভয়ে এই কথাই বলিতেছি। পূর্ব্বে লোকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে

যাইবার বিরুদ্ধে যে দৃঢ়-সংস্কার ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়েরই ধনী, নির্ধন, অভিজাত এবং অন্ত্যজ—স্ত্রী-পুরুষ কাহারও এখন হাসপাতালে যাইতে দ্বিধা নাই বরং হাসপাতালে প্রবেশাধিকারের জন্য মারামারি পড়িয়া যায়। লোকে টাকা-পয়সা দিতে স্বীকার করিয়াও সে অধিকার খোঁজে, কারণ লোকের অর্থবল কমিয়া আসিতেছে। গৃহে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা অতি অল্প লোকেই করিতে পারে এবং লোকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, হাসপাতালে মরিতে যাইতে হয় না — বরং শাস্ত্রীয় মতে যতদূর সম্ভব সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বেকার মেডিকেল কলেজ এবং বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজে আশ্‌মান জমিনের তফাৎ। মেডিকেল কলেজে পিতৃ-প্রদর্শিত পথে পাঠের ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণ ছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শব-ব্যবচ্ছেদ ও মিউজিয়ামের আকার প্রকার দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হয়। ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া ঘড়িওয়ালা প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বারে একনিঃশ্বাসে পৌঁছিলাম। ভ্রাতা সুরেশপ্রসাদ ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাহা আমি পারিলাম না, তিনি জোর করিয়া বরণ করিলেন, এবং ফলে হইলেন ভারত-বরেণ্য অস্ত্র-চিকিৎসক লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এবং এম্‌-ডি। বেঙ্গল এম্‌বুলেন্স-এর, বেঙ্গল ডবল কোম্পানী, বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কোর প্রভৃতি বাঙ্গলার সামরিক কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ হইলেন ও আরও হইলেন সহযোগিগণ-সাহায্যে বেলগাছিয়া কারমাইকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ব্বাধিকারী বংশের সুরেশপ্রসাদ তৃতীয় পুরুষের ছাত্র। তাহার পূর্ব্বে কৃতী ছাত্র ছিলেন বৃগেড সার্জ্জেন এবং নেভেল সার্জ্জেন পূজ্যপাদ পিতৃদেব রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, তাঁহার খুল্লতাত মেডিকেল কলেজের পুরাতন ভার্ণাকুলার ডিপার্টমেণ্টের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পৌত্র নিখিলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মেডিকেল কলেজের সর্ব্বাধিকারী বংশের চতুর্থ পুরুষের ছাত্র। সুরেশপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্যপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ সহোদর সুশীলপ্রসাদ এবং খুল্লতাত নরেন্দ্রকুমার বহুকাল মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিলেন — খুল্লতাত-পুত্র শচীন্দ্রপ্রসাদ ও তৎপুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র তথাকার কৃতী ছাত্র। দৈবঘটনায় সুরেশের পুত্র কনক-চন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিমানচন্দ্র মেডিকেল কলেজে প্রবেশ না করিয়া কারমাইকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। উভয় কলেজের সঙ্গেই বংশের বন্ধন অচ্ছেদ্য, চারি পুরুষ ধারাবাহিকভাবে যে বংশের বংশধরগণ ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃতী ছাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সহিত যাহাকে 'রক্তের টান' বলে তাহা জন্মিয়াছে। অতএব এই শত বার্ষিকী উৎসবের সার্থকতা তাহাদের নিতান্ত কাম্য। এই অনুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া এই উৎসবের সাফল্যের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা আমার স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য।

সরকারী ব্যবস্থায় এবং কলিকাতার জন-সাধারণ-সভায় স্থিরীকৃত মন্তব্য অনুসারে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় গৃহ-নির্ম্মাণ-কল্পে প্রায় তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিতে হইবে। কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে, আর এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ হওয়া বিশেষ কষ্টকর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইচ্ছা করিলে দেশ বিদেশে ছড়ান মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রগণই এই টাকা অল্প দিনের মধ্যেই তুলিয়া দিতে পারেন। চারহাজার ছাত্র গড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেই এই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। এ দাবী অন্যায় নয়, কোনও কৃতী ছাত্রই এ দাবী অস্বীকার করিতে পারিবেন না এবং করিবেন না। সে-দিন বঙ্গবাসী কলেজের একজন পূর্ব্বতন ছাত্র তাঁহার নিজের পদোন্নতির উপলক্ষ্যে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর নিকট এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া মাতৃ-ঋণ পরিশোধের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ দেশের

স্কুল কলেজের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের হল-নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্বতন তিনজন ছাত্র লর্ড কার্মাইকেলের শাসন সময়ে তিন হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর সাতানব্বই হাজার টাকার ব্যবস্থা না হওয়াতে প্রেসিডেন্সি কলেজের হল এখনও অনির্ম্মিত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নানা বিভাগে নানা উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং সে বিষয়ে জনসাধারণ যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

অপূর্ণ কার্য্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য বহু ব্যয়ে অনেক জমিও ক্রয় করা হইয়াছে। এই শতবার্ষিকী উৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে নব-গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে তাহা নির্ম্মিত হইলে সরকারী তহবিল অর্থাৎ সাধারণ প্রজার তহবিল হইতে বার্ষিক ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। অতএব প্রয়োজনীয় বাকী এক লক্ষ টাকার সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইলে হাসপাতালের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রতিকারের জন্য এবং বাহিরের রোগী চিকিৎসার জন্য (Casualty Ward and Out-door Department) সুব্যবস্থার দারুণ অভাব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। সেই অভাব মোচন প্রয়াসে শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে এই প্রশংসিত প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র চিকিৎসক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের সাহায্য সনির্ব্বন্ধে প্রার্থনা করা হইতেছে।

ইহাতে শুধু উৎসবের সার্থকতা হইবে তাহাই নহে, সর্ব্বসাধারণের প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা বলিয়া তাহাদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এইটুকু করিলেই এ বিষয়ে সাধারণের কর্ত্তব্য পালন শেষ হইবে না। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ভাবুক মাত্রেরই প্রতীতি হইবে যে, দেশে আর্ত্ত-ত্রাণ ও আর্ত্ত-সেবার ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রচুর। আরও প্রতীতি হইবে যে, এই সেবার সম্যক্ অনুষ্ঠানের জন্য শুধু এলোপ্যাথিক প্রণালী নয়, কবিরাজী, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর পরিপুষ্টি ও পোষকতা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাপক্ষকে বদ্ধপরিকর হইয়া সে কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হইতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ উৎসবেরই উদ্দেশ্য যে, উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক্ উন্নতির চেষ্টা হয়। এ ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য নিতান্ত পরিস্ফুট, শুধু প্রস্তাবিত গৃহ-নির্ম্মাণ করিলেই সমগ্র সাধারণ কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। পারিপার্শ্বিক উন্নতিরও প্রয়োজন এবং নানা বিষয়ে পুষ্টি ও প্রসারেরও সম্যক্ প্রয়োজন।

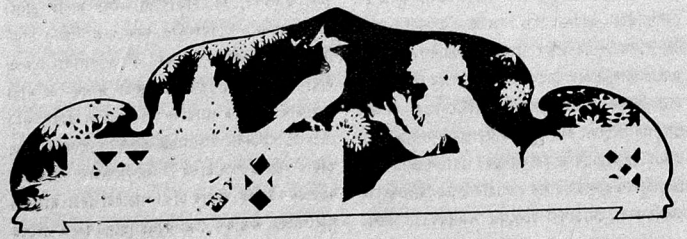

সর্ব্বাণী

শ্রীঘরী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৬

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান রাত্রি; মনে হইতেছিল, সমস্ত নৈশ প্রকৃতির গায়ের উপর কে যেন একখানা মোটা চাদর ঢাকিয়া দিয়াছে। আকাশে হয়ত একটু জ্যোৎস্না আছে, নক্ষত্রেও চিরদিনের মত দীপ্তির অভাব নাই, কিন্তু অল্প অল্প মেঘের সমাবেশে সেখানেও পৃথিবীর মতই আচ্ছন্ন অবস্থা, যেন সব থাকিয়াও কিছু নাই—ম্লান, শ্রীহীন, ছায়াচ্ছন্ন।

সর্ব্বাণী সারারাত ঘুমাইতে পারিল না। যতই ভাবিবে না বলিয়া স্থির করে, ততই যেন ঘুরিয়া-ফিরিয়া আজকের পাওয়া সেই চিঠি দু'খানার কথাই তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খায়—"ইহার কাছে আমার যেন একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়াই আমি অনুভব করি।"—এই কথাগুলা তার কানের তারের মধ্যে যেন মৃদু রবে বাজিয়া উঠিতে থাকে। সত্যই কি তাই আছে? দায়িত্ব যদি তার কাছে উহার সত্যই থাকে, তবে সর্ব্বাণীরও কি তাঁহার কাছে কোন দায়িত্বই নাই? সর্ব্বাণী মনে মনে হঠাৎ এক সময় যেন কতকটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সত্যই কি তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা দায়িত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল? সত্যই কি এ কথা ঠিক? সর্ব্বাণী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, শুইয়া শুইয়া আর যেন ভাবা যায় না। কে যেন তার বুকটাকে চাপিয়া ধরিতেছে। তার বুকটা যেন ভারি হইয়া উঠিল। হয়ত এ কথাটা নিছক মিথ্যা নয়, হয়ত এর ভিতর খানিকটা সত্যও আছে। অন্ততঃ দেশাচার ও শাস্ত্রাচার এই কথাটাই বলিবে। এ দেশে এক সময় বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহিতা হিসাবেই ধরা হইত। কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বাগদত্তা কন্যার বাগদত্ত-পতি-বিয়োগে তাহাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, তবে সাধারণভাবে বাগদত্তারা পঞ্চ-আপদ ঘটিলে অন্যত্র পরিণীতা হইতে পারিতেন। সর্ব্বাণী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তার ব্যাপারটা কিন্তু সেদিক দিয়াই যায় নাই, তার বাগদত্ত-পতি, নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত ইত্যাদি কিছুই নহেন—এ অবস্থায় তাদের মধ্যে হয়ত একটা দায়িত্ব থাকিয়াই গিয়াছে। অবশ্য এটা সর্ব্বাণীর দিক দিয়াই, কারণ এই বিবাহের বাধা সে-ই সৃষ্টি করিয়াছিল। তার বাগদত্ত-বেচারীর ইহাতে কোনই অপরাধ ছিল না, সেই হেতু দায়িত্ব তার দিক্ হইতে না থাকারই কথা, তথাপি যে তিনি এখনও নিজেকে তার কাছে এমন করিয়া আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, এর ভিতরে সত্যই একটা অস্বাভাবিক ও অনন্যসাধারণ চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এমন তো কই সে আর কখন শোনে নাই?

সর্ব্বাণী তার গায়ে-জড়ানো রাগ্‌খানা খুলিয়া ফেলিয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। তবে কি, সে ইহারই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া লইবে? তবে কি—

গভীর সংশয়াকুলচিত্তে সে নিজের অন্তরের অভ্যন্তরে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। না, আর হয় না। সেই অজানা, অদেখা বাগ্‌দত্তার জন্য কোনই সঞ্চয় তো কই তার অন্তরের অন্তস্তলেও উঁকি দিয়া দেখিতে

পাইল না? বরঞ্চ এত বড় লজ্জার ও গ্লানির কথা মুখে তো নহেই, মনের ভিতরও যেন তার স্থান না পায়। ভগবান তার মনটাকে এই দুর্ব্বলতার পাপ হইতে মুক্ত করুন! এ কি তার এতদিনকার গর্ব্বের প্রতিশোধ? নাঃ, এটাকে সে দুঃস্বপ্নের মতই ভুলিয়া যাইবে।

সে আর্ত্তভাবে চোখ বুজিল। এ কি, এত দিনের এই চির-শুভ্র-চিত্ত-শতদলে আজ সহসা এই অতর্কিত ভাবে এ কার মূর্ত্তি এমন অনধিকারে ফুটিয়া উঠিতে চায়? ধিক্! ধিক্ সর্ব্বাণীর এমন দুর্ব্বল মনকে! না না, এ কখন হইতেই পারে না। জোর করিয়া সর্ব্বাণী তার এ অনধিকার প্রবেশকে বাধা দিয়া ফিরাইবে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জী তার ভগ্নিপতি, ডালির বর, ব্যস্—এই পর্য্যন্ত! তার নিস্পৃহ ভোগ-লালসা-শূন্য সংযত-জীবনে সে কোন দিনই বাহিরের দুর্দ্দৈব ডাকিয়া আনিবে না, বরং তার চেয়ে সেই প্রত্যাখ্যাত বাগদত্তকেই মনে মনে স্বামীর আসনে বসাইয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় বহির্সংসারের অন্য সমস্ত আকর্ষণকে দূরে সরাইয়া দিয়া আদর্শ সতীর মতই জীবনের দিনগুলা কাটাইয়া দিবে। ডালির হাসিমুখে যেন এতটুকু ছায়াপাত না হয়। কিন্তু হায়, কাহাকে সে স্মরণ করিবে? সে তো তাঁকে একবার চোখের দেখাও দেখে নাই! তা হোক, নাই বা দেখিল! ঠাকুর-দেবতাদের কি দেখা যায়? সেই রকম একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া লইলেই চলিবে।

অবসাদ-ক্লান্ত দেহ বিছানায় লুটাইয়া দিয়া সে গায়ের উপর গরম চাদরটা টানিয়া দিল, তার পর নীরব-স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে কোন্ সময় অদূরাগত কেনালের অশ্রান্ত জল-কল্লোলের সমতান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

১৭

শীত খুব জোর করিয়াছে। মেঘ ও বৃষ্টি যেন সৃষ্টিটাকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত। চারিদিক ঘেরিয়া কুয়াশার জাল, আকাশে চাঁদ ওঠে কি-না ভাল করিয়া জানাও যায় না, তারার মালার তো দেখাও নাই, আর সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেখার লোকই বা কই? ঘরে ঘরে দোর-জানালা বন্ধ; পর্দ্দা টানা; অনেকেরই ঘরের মধ্যের চিমনিতে, যাদের তেমন ব্যবস্থা নাই তাদের মাটির 'বর্সিতে' আগুন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

সুরঞ্জনের দুর্ব্বল স্বাস্থ্য এতটা শীতের প্রতাপ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। এত যত্ন, এত সাবধান, অথচ কোন্ সময় একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া যায়, সর্দ্দি করে, কাশি ও হাঁচি হয়, সর্ব্বাণী ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে। তার মনের ভিতরটায় কে জানে কেনই সর্ব্বদা একটা 'হারাই-হারাই'-ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। বাপকে ছাড়িয়া সে আজ-কাল আর বেশিক্ষণ নীচেও নামে না, পিসির ও বাপের পীড়া-পীড়িতে যদিও বা নামে, একটুক্ষণ না যাইতেই উপরে উঠিয়া যায়, ছলে ছুতায় বাপের কাছে কাছেই ঘোরে ফেরে। কে যেন তার ভয়ার্ত্ত মনের ভিতর উঁকি দিয়া দিয়া বলিয়া যায়, আর খুব বেশিদিন নয়! অসম্বরণীয় মর্ম্মন্তুদ্ আবেগে তার বুকের মধ্যের রুদ্ধ রোদন গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, অসহ্য ব্যথায় তার বুকটা যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। এই বাবা যদি তার না থাকেন, তবে এত বড় একটা বিশাল বিশ্বের বুকে সে একা একা থাকিবে কি লইয়া? এ-কথা তার ভাবিতেও প্রবৃত্তি হয় না, আবার না ভাবিয়াও যেন উপায় নাই, কে যেন তাকে জোর করিয়াই ভাবায়। ভাবিতে গেলে তার মাথা ঘুরিয়া যায়, চোখে সে চারি দিক অন্ধকার দেখে, আবার জোর করিয়াই নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিয়া মনকে শক্ত করিয়া লয়, ভাঙ্গিয়া-পড়া চিত্তকে আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়া বুঝাইয়া বলে—এমন কি কখন হয়? আমার মা, ভাই, বোন—কেউ নাই। বাবা কি কখন এত শীঘ্র যেতে পারেন? কক্ষণো না! গভীর আশ্বাসে ও অপরিসীম সান্ত্বনার সুখে মন-প্রাণ ভরিয়া

উঠে। সর্ব্বাণীর অনেক সময় মনে হইত, বাপকে লইয়া সে না হয় দেশে ফিরিয়া যাইবে, সেখানে এতটা শীত তো নাই; কিন্তু সুরঞ্জনের সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি হয়তো মনে মনে কি স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, মুখে কিছুই অবশ্য বলেন নাই; কিন্তু ভাবে জানা যাইত যে, এখানেই তিনি এখনো থাকিতে চান। হয়তো নিজের শরীরের অবস্থা বুঝিয়াই একমাত্র অসহায়া কন্যাকে তার পৃথিবীর এই অবশিষ্ট আত্মীয়ের নিকট হইতে অপসৃত করিতে তাঁর মায়া সরিতেছিল না। মেয়ে ব্যাকুল হইয়া যখনই অনুযোগ তুলিত যে, এখানকার শীত সইছে না, দেশে যাওয়া যাক। তখনই স্নিগ্ধহাস্যে তাহাকে শান্ত করিতে চাহিয়া স্বভাবসিদ্ধ মৃদুকণ্ঠেই উত্তর দিতেন, "এ তোমার ভ্রম! হয়তো দেশে গেলে আরও বেশী ভেঙ্গে পড়বো, কেন ভয় করচ? এখানে তো বেশ আছি।"

সর্ব্বাণী বুঝিত পিসিমার সঙ্গ ছাড়িয়া আবার নিজেদের সেই নিরালা নির্জ্জনবাসে ফিরিয়া যাইতে বাবা তার ভয় পাইতেছেন। তা সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তারও কি দেরাদুনের এই আনন্দ-পূর্ণ সংসারটী ছাড়িয়া নিজেদের সেই ভূতাহত প'ড়ো বাড়ীটার নিরানন্দ জীবনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেই কোন আগ্রহ ছিল? কিন্তু তার নিজের কোনো ব্যক্তিত্বকেই তো সে কোনোক্রমে প্রশ্রয় দিতে চাহে না, তার বাপ যেমন করিয়াই হোক, ভাল থাকিলেই হইল।

এখনই 'টাল-মাটালে'র মধ্যে শীত কাটিয়া বসন্তকাল আসিয়া গেল। গোলাপ-লতার আপ্রান্ত কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিল, লুকট্ গাছে কমলা রংয়ের ফলের থোলোগুলি পথচারীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 'ইউক্যালিপ্টাসে'র সরলোন্নত দেহ পুরাতন ত্বক্‌গুলাকে জীর্ণবস্ত্রের মতই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া নূতন ত্বকে দেহ শোভাবর্দ্ধিত করিয়া তুলিল, চারিদিক হইতে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল।

এ-দিকে উৎসবের সাড়া শুধু বাহিরেই নয় গোলাপ-সুন্দরীর বাড়ীতেও তাহারই একটা অনুকৃতি চলিতেছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জী ডালিকে বিবাহ করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। যদিও কাজের জন্য তিনি এ তিন মাস ধরিয়াই দেরাদুনে অনুপস্থিত, কিন্তু তার জন্য এ-বাড়ীতে আসন্ন প্রায় বিবাহোৎসবের আয়োজন কিছু কম পড়িতেছিল না। বিবাহ এখান হইতেই হইবে। বরের বাপ একলাই দেশ হইতে বিবাহের সময় আসিবেন এবং বিবাহান্তে বর-কনেকে দেশে লইয়া গিয়া বৌ-ভাত সমাধা করিবেন। বিবাহের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে গিয়া সুকুমার মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাছে ভীষণ তাড়া খাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বর-কনের জোড়-শাড়ী এবং কনের দু'গাছি শাঁখা ভিন্ন আর যদি কোন কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি বিবাহ সভা হইতে উঠিয়া যাইবেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া সুকুমার স্বীকৃতি দিয়াছে যে, সে ইহার একটুও ব্যতিক্রম কোন মতেই ঘটিতে দিবে না। অবশ্য মেয়ের বিবাহে খরচ না করিতে পারিলে মেয়ের পক্ষ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া এতটা বাড়াবাড়িও কিন্তু পছন্দ করা যায় না। সাধ্যমত নিজের মেয়েটিকে সকলেই ধন-রত্ন-সমন্বিতা করিয়াই সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক থাকে, সাধ্যাতীত পীড়নটাকেই এড়াইতে চায়। গোলাপসুন্দরীর এই এক মেয়ে, তিনি দুঃখিত হইলেন, নিজেই একদিন ছেলেটিকে ডাকাইয়া কথাটা তুলিলেন। বলিলেন, তুমি তো চাইছ না, আমার যদি সাধ্য থাকে আমি কেন দোব না? বিশেষ দেশে তো তোমার পাঁচজন আছে, তাঁরাই বা কি বলবেন?

ভবিষ্যৎ জামাতা দৃঢ় করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, উত্তর করিলেন, "আমি সুকুমারকে যা বলবার ছিল বলেছি।"

বিরক্ত হইলেও গোলাপসুন্দরী আর কোন আপত্তি তুলিতে ভরসা করিলেন না। বেশী নিংড়াইলে লেবু

তিক্ত হইয়া যায়, সেই প্রবাদ কথাটাই হয়ত তাঁর মনে পড়িয়া গেল।

তারপর সুকুমার সর্ব্বাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই প্রকার বন্দোবস্ত করিল, বিবাহের দিন ডালি শাড়ী ও শাঁখা পরিয়াই ক'নে সাজিবে, তারপর বিবাহ হইয়া গেলে বৌ-ভাতের জন্য যখন সে শ্বশুর-বাড়ী যাইবে, সুকুমারকে তো সঙ্গে যাইতেই হইবে, সে গহনাপত্র লইয়া গিয়া বৌ-ভাতের দিনে 'বৌ-দেখানি' বলিয়া বোনকে পরাইয়া দিলে জামাই-এর তো আর ফেরৎ দেওয়ার হাত থাকিবে না!

অনেক খুঁৎ খুঁৎ করিয়া অবশেষে গোলাপসুন্দরী নিরুপায়ে ইহাতেই সম্মত হইলেন। তবে এ দিকে খরচ কম হইবে বলিয়া বিবাহের দিন লোক খাওয়ানোর ও অন্যান্য আয়োজনের একটু বিশেষ-ভাবেই ব্যবস্থা সুকুমার করিতে ইচ্ছুক হইল। তাই এক দিকে শীতের জড়তা কাটিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে বিবাহোৎসবের সূচনা দেখা দিয়া সকলকেই একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিল। এমন কি, সুরঞ্জনের নিরানন্দ চিত্তেও যেন এই শুভ-কার্য্যের আনন্দোচ্ছলতার একটুখানি উচ্ছ্বাসও লাগিয়া গেল। স্বভাবতঃ মৃদুভাষী ও সর্ব্ব-নির্লিপ্ত মাতুল প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে ডালিকে কাছে ডাকিয়া সুগভীর স্নেহভরে তাঁর মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বাণী বলিয়া উঠিল, "ওকে তো আইবড়-ভাত দেবার উপায় নেই, বৌ-ভাতেই না হয় হোল,—আমরা কিন্তু একস্যুট মুক্তোর গহনা আর খুব ভাল একটা বেনারসী সাড়ী দোব, কেমন বাবা?"

মৃদু-স্মিত হাস্যে সুরঞ্জন উত্তর দিলেন, "বেশ তো মা, তাই দিও।"

তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসকে তিনি ভিতরে ভিতরে দমন করিয়া লইলেন। হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল, ক'খানা সামান্য গহনার জন্যই আজ তাঁর মেয়ের এই দুরবস্থা!

১৮

দুরন্ত শীতের কনকনে হাওয়ায় হাড়-কাঁপানো, কুয়াশা-ভরা কঠিন দিনগুলা কাটিয়া চৈত্র-শেষের বাসন্তী দিন দেখা দিয়াছে। পুঞ্জীকৃত অশ্রু-বাষ্পের মত সমুদয় কুয়াশার জাল ছাড়াইয়া দীপ্ত সুবর্ণচ্ছটায় চারিদিক সুপ্রসন্ন ও স্মিত হইয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ মন্দ-মধুর হাওয়া অজস্র প্রস্ফুট গোলাপের সৌরভে গভীর ভারাক্রান্ত। গাঢ় ঘন কমলা রংয়ের লুকট্ ফল গুচ্ছে গুচ্ছে গাছগুলাকে যেন আলোক-স্তম্ভের মতই সর্ব্বলোকলোচনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মেয়ে-পুরুষ প্রতি সন্ধ্যায় ছায়া-মধুর পুষ্পগন্ধামোদিত প্রশস্ত রাজপথে ইচ্ছাসুখে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, আমোদ-আলাপের গুঞ্জনে, তরল কলহাস্যে পথিপার্শ্বস্থ গৃহবাসিগণ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

বিবাহের দিন নিকটতর হইয়া আসিতেছিল, সকলেই আনন্দে মগ্ন; কিন্তু ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সর্ব্বাণীর ভিতর ভিতর কি যেন একটা পরিবর্ত্তন ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে যতই সে অগ্রাহ্য করিতে যায়, ততই যেন সে তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়া তাহার 'পরে নিজের অধিকার বিস্তৃত করিয়া তুলিতে থাকে। তার এই বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল অদ্ভুত জটিল জীবনেরই কয়েকটা বৎসর ধরিয়া যেখানটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তারপর আর যে সেখানকার 'হলবাঁধা জলস্রোতকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তার এই জীবন-তরী উজান বাহিয়া কোন্ নির্দ্দিষ্ট নদীপথে বাহির হইয়া পড়িবে—এ যেন সে কল্পনাও করিতে পারিতেছিল না। এই সেদিন পর্য্যন্ত সে জানিত, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে মন তার নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছে—এমন কি সে পুরাণেরই একটা পুরাতন শ্লোককে মনে মনে আওড়াইয়া এ বিষয়ে নিজের মনকে বেশ একটা শক্ত নজির দিয়া রাখিয়াছিল—"সুখস্য-দুঃখস্য ন কোঽপিদাতা" ইত্যাদি—

কিন্তু কেন ইদানীং একটা এই মন-গড়া অযাচিত

দুঃখের নেশা মনকে পাইয়া বসিতেছে, তা সে জানে না। কিসের জন্য এই দুঃখ-বোধ তার মধ্যে দেখা দিল? নিজের উপর তার এই দুঃখ-ক্লান্ত মনটা যেন নিদারুণ বিতৃষ্ণায় বিরূপ হইয়া উঠিল। না, ছিঃ, কিসের এ দুর্ব্বলতা! যে বাপের মুখ চাহিয়া তাঁর সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই, আজ কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজের সুখ খুঁজিতে বসিল। মরুময় জীবনের একপ্রান্তে স্বপ্নজাল-মণ্ডিত স্বর্গোদ্যানের মতই অপুষ্ট লতা-গুল্ম-পত্র-পুষ্প সমাচ্ছন্ন হরিৎ শ্রী-র যে সমাবেশ দেখা দিয়াছিল নির্ম্মম রুক্ষনেত্রের জলন্ত ভ্রূকুটি দিয়া সে তাদের ভাল করিতে চাহিল, একান্ত বিতৃষ্ণ অবহেলায় ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইল। না — ডালির বর তার ছোট ভগ্নিপতি মাত্র, তার 'পরে এই যে মনোভাব, এ শুধু স্নেহ কখনও প্রেম নয়। তার মন কি এতই দুর্ব্বল, নিশ্চয়ই না। এমন সময় ডালি কোথা হইতে দুর্দ্দান্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া তার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, আবদার-ভরা, আদর-গলানো অভিমানের সুরে কহিল —

"বাবা রে বাবা! যে দিকে যাবো কেবলই শিল্প-চর্চ্চা হচ্ছে! আমি যে এর ভিতর কোথায় যাই, ভেবেই পাই না!"

বাস্তবিকই ডালির বিবাহের জন্য বরের জুতা-আসন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যকীয় শিল্প-জাত দ্রব্য লইয়া সর্ব্বাণীরা পিসি-ভাইঝিতে লাগিয়া রহিয়াছে, এখনও তাদের বসিবার ঘরের একটা কৌচের উপর ডুবিয়া বসিয়া সর্ব্বাণী একটা কার্পেটের আসনের ঘর কালো পশম দিয়া ভরাইতেছিল, মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল — "তুমিও এর ভেতর ঢুকে পড়ো বাইরে থাকুচো বলেই না মুস্কিল!"

ডালি ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "ইস্, আমার বয়ে গেছে, আমার ভারি গরজ কি-না!"

সর্ব্বাণীর সূচের পশম ফুরাইয়াছিল, নূতন পশম পরাইতে পরাইতে ঘাড় না তুলিয়াই উত্তর করিল, "তোর না তো গরজটা কার, শুনি? আমরা যে দয়া ক'রে দিচ্চি ব'লেই না, না হ'লে হাতে সুতো বেঁধেই না তোকে এইসব তৈরী করতে লেগে যেতে হতো, না?"

ডালি ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "আহা গো! তা আর নয়! কেন এইসব বরকে না পরালে বুঝি বিয়ে আইন-সিদ্ধ হয় না? না, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? হ্যাঁ সবুদি! তুমি বুঝি তোমার বরের জন্যে নিজেই সব ক'রেছিলে? নিশ্চয় ক'রেছিলে, না হ'লে আমায় বলছো কেন?"

সর্ব্বাণীর সূচে সুতা পরানো হইয়া গিয়াছিল, সে অর্দ্ধসমাপ্ত আসনখানার উপর পশমের টোপ তুলিতে তুলিতে হাসিয়া কহিল, "দূর! আমার আবার বর কে?"

ডালিও হাসিয়া কহিল, "কেন, সেই আধখানা বর, যার জন্যে আজও উদাসিনী হ'য়ে রয়েছ, সেই! আবার কে?"

সর্ব্বাণী এবার হাসিল না, বরং দেখিতে দেখিতে তার প্রফুল্ল-স্মিত-মুখ ঈষৎ ম্লান হইয়া আসিল, চাঁদের উপর একখণ্ড হাল্কা পাতলা মেঘ আসিয়া পড়িলে যেমন দেখায়, তার সহাস্য সুন্দর মুখখানাকে তেমনই দেখাইল।

কি একটা অজ্ঞাত গোপন মনোবৃত্তির আবেগে বুকটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের ভারে ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সেই আকস্মিক জাগিয়া-ওঠা মানসিক দুর্ব্বলতাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুখের উপর একটা সচেষ্ট হাসির আভাস টানিয়া আনিয়া সে সহজভাবেই উত্তর দিল, "তবেই দেখ, আমি ও-সব করি নি ব'লেই না, আধখানা বরের কনে হয়ে র'য়ে গেলাম। মহা-ভারত অশুদ্ধ হয়-না-হয় দেখচো তো?"

ফস্ করিয়া সর্ব্বাণীর হাত হইতে কার্পেটের টুকরাটা টানিয়া লইয়া ডালি ব্যগ্রতা দেখাইয়া বলিয়া ফেলিল, "না, বাপু! তা হ'লে আমি এক্ষুণি দু'চার ফোঁড়ও অন্ততঃ বুনে দিচ্চি, তোমার মতন আধখানা-বরে আমার চলবে না, আমার পুরোপুরি সবটাই চাই।"

আবারও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সর্ব্বাণীর বুক ঠেলিয়া

থলার গোড়া পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিল। একান্ত বিমনা-ভাবেই সে যেন কলের মতই উচ্চারণ করিয়া গেল, "সবটাই তোকে দিলুম।"

ডালি কথাটা বলিয়া ফেলিয়া নিজের লজ্জায় নিজেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সর্ব্বাণীর কথার এই অসঙ্গতি তার কানে ঠেকিল না, ঠেকিলে নিশ্চয়ই সে হাসিয়া উঠিয়া কোনো-না-কোনো একটা বেফাঁস প্রশ্ন করিয়া বসিত, তাহাতে সংশয় নাই। হয়তো বলিয়া বসিত, "এটাও কি তোমার দখলে এসে গেছিল না-কি?

(ক্রমশঃ)

জীবনের তাঁত

শ্রীসুকোমল বসু

জীবনের তাঁত বুনে চলিয়াছে ময়ূরপঙ্খী সাড়ী
আধেক উজ্জ্বল—আধেক আঁধার ভারী।
সুখ-দুঃখের টানা-পড়েনেতে ভাই
আটকিয়ে গেছে আমাদের পরমাই!
আশার লম্বা মোটা সুতোগুলি পাক্ খেয়ে খেয়ে এসে
ছিঁড়ে সরু হ'য়ে মাকুর বুকেতে মেশে।
আকাঙ্ক্ষা যত জট্ বেঁধে যায়—ছিঁড়ে দিতে হয় তাই
নাগাল পাওয়া ও পরিমিত সুতো—তার বেশী কাজ নাই!
জন্ম-মৃত্যু দু'ধারে আঁচল—তারই বুকে চলে খেলা
প্রাণ ধারণের মেলা!

জীবনের তাঁত আমাদেরই হাতে চলিছে ভীষণ জোরে
মাকুর লাট্টু বন্ বন্ ক'রে ঘোরে।
খোল্তাই রং ভাঁজে ভাঁজে যবে চক্ মক্ ক'রে ওঠে
আমাদের হৃদি-সরোবরে ফুল ফোটে
মরা কালো রং যবে দেয় ফের উঁকি—
নিরাশায় ভাই আমরাই পড়ি ঝুঁকি'!
ময়ূরপঙ্খী সাড়ীর আঁচলে টানা-পড়েনের মত
আঁধারে হৃদয় ম'রে যায় ফের আলোতে সমুন্নত!
মেকী ধারণা যা ছোট হ'য়ে যায় ঠাসা-বুনানীর চাপে
লম্বা-আশার সুতো ছিঁড়ে যায় সম্ভাবনার মাপে।
ময়ূরপঙ্খী সাড়ীর মতই আলো-আঁধারের খেলা
জীবনের হাটে—এই নিয়ে চলে মেলা!
সুখ-দুঃখের টানা-পড়েনেতে ভাই
আট্কিয়ে গেছে আমাদের পরমাই!

কালিম্পঙ ও সিক্কিমে কয়েক দিন

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তিস্তা-ব্রিজ হইতে কালিম্পঙের রাস্তায় অর্দ্ধমাইল আন্দাজ গিয়া বাঁ দিকে গ্যাঙ্টকের রাস্তা। 'অটোমোবাইল এসোসিয়েসনে'র সৌজন্যে রাস্তা ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই—ঠিক মোড়েই উপরেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বিপজ্জনক রাস্তায় সতর্ক করিবার সাইন-বোর্ডও দেওয়া আছে। যাইতে বহুদূর পর্য্যন্ত 'ত্রিশূল মার্কা' পোষ্ট দেখিলাম—গ্যাঙ্টকের ১০।১৫ মাইল আগে হইতে আর দেখিলাম না—বোধ হয় এসোসিয়েসনের লোক গ্যাঙ্টক্ পর্য্যন্ত পৌছায় নাই। রাস্তা অপরিসর, মাত্র একখানি মোটর যাইতে পারে—৫০০।৭০০ গজ দূরে দূরে রাস্তা একটু চওড়া করিয়া দুইখানি গাড়ি একত্রে যাওয়ার স্থান রাখা হইয়াছে। 'ষ্টিয়ারিং'-এ বসিলে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দেখা আর চলে না। রাস্তা বরাবর সিঙ্টাম্ (সিক্কিম্রাজ্য) পর্য্যন্ত তিস্তার ধারে ধারে গিয়াছে। উপরে রাস্তা—৫০০।৭০০ ফুট নীচে তিস্তার ভীষণ গর্জ্জন, গাড়ীর চাকা ২।১ ফুট স্থানচ্যুত হইলেই একেবারে নদীগর্ভে! প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ভাগ্য 'ড্রাইভারে'র হয় না। তবে ৪।৫ মাইল পরে পরেই গাড়ী দাঁড় করাইয়া, হয় ইঞ্জিনের জল ঠাণ্ডা করা, নয় ব্রেকব্যাণ্ডে জল ঢালার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং তাহার ফাঁকে ফাঁকেও প্রকৃতির নৈসর্গিক শোভা দেখিবারও সুযোগ ঘটিতেছিল। রাস্তার ধারে শালবন দেখিয়া মনে হয় শিকারের স্থান। কয়েক মাইল দূরেই তারখোলা ফরেষ্ট বাংলো। সেখানে খবর পাইলাম, দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনর ও কালিম্পঙের সবডিভিসনাল অফিসার প্রমুখাৎ সাহেব-সুবারা এখানে মাঝে মাঝে শিকারের তল্লাসে আসিয়া থাকেন।

রংপো ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা। সেখানে রংনি নদী উত্তর-পূর্ব্ব হইতে আসিয়া তিস্তার সহিত মিশিয়াছে, নদীটি দুই রাজ্যের সীমানায় প্রবাহিত। রংনি নদীর উপর রোপ-ব্রিজ, গাড়ী চলিলে ব্রিজটি দুলিতে থাকে। নদীর ধারেই ব্রিটিশ থানা। গুর্খা দারোগা

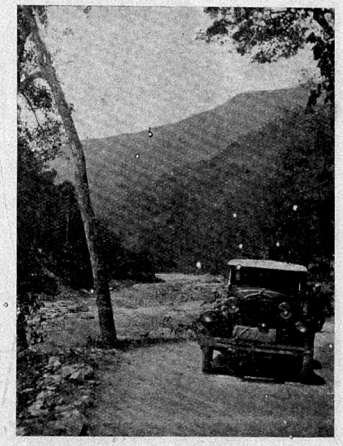

তিস্তা নদীর ধারে রাস্তা

ও গুর্খা সিপাহীরা আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রফুল্ল মজুমদার বন্দুকটি এইখানে 'ডিপজিট' রাখিয়া একখানি রসিদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ সিক্কিম্ রাজ্যে বন্দুক লইয়া যাইবার পাশ আমাদের ছিল না। বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গদের সিক্কিম্ রাজ্যে যাইতে হইলে পাশ থাকা দরকার।

ভারতীয় 'কালা-আদমির' পক্ষে সে নিয়ম নাই শুনিয়া মনে একটু আনন্দ হইল। দেখিলাম কয়েক জন রংনি নদীতে মাছ ধরিতেছে—খবর পাইলাম যে এ-স্থানে মহাশোল মাছ ধরিবার জন্য অনেকের শুভাগমন হয়।

ব্রিজ পার হইয়া সিক্কিম-রাজ্যে পৌছিলাম। শুনিয়াছিলাম এখানে না-কি সিক্কিম্-পুলিস গাড়ী এবং জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করে—উদ্দেশ্য 'চুঙ্গি' আদায় করা। সিক্কিম্ রাজ্যের প্রথা একটু নূতন রকমের। ব্যবসায় করিবার অধিকার নিলামে ডাকিয়া এক একজনকে দেওয়া হয়। একজন সিগারেট বিক্রয়ের



মহারাজার উদ্যানে বসিবার স্থান — সিক্কিম্

অধিকার নিলামে ডাকিয়া লইয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কেহ সিক্কিম্ রাজ্যে সিগারেট আমদানী করিতে পারিবেন না। অবশ্য বিক্রয় করিবার দাম রাজার তরফ্ হইতে ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। কাঁপড়, জামা, জুতা, টোটা-বারুদ ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষের জন্য এই প্রথা। সীতারামবাবুর ট্যাক্সি গাড়ীতে একজন খাঁ-সাহেব ছিলেন। আলাপে জানিলাম, তিনি সিক্কিমের যাবতীয় চামড়ার ঠিকা লইয়াছেন এবং তাহারই তদারকে গ্যাঙ্‌টক্ যাইতেছেন। যে কোন কারণেই হউক আমাদের গাড়ীতে পুলিস আসিল না, খানাতল্লাসীও করিল না। রংপো পোষ্ট অফিসে, বাঙ্গালী মাষ্টারবাবু ও বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। রংপোতে বহু বেহারী আস্তানা গাড়িয়াছেন, আমরা ডোমিসাইলড্, স্বনাম-ধন্য কেদারবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে 'ধেমো-শালিক'। তাঁহারা সকলেই সুখে আছেন। একখানি নূতন ডজ্ গাড়ী তাল-তোবড়া অবস্থায় দেখিয়া মনে আতঙ্ক হইল, শুনিলাম ড্রাইভারের একটু পান দোষ ছিল। কমলালেবুর প্রচুর আমদানী দেখিলাম, পাইকারও অনেক—সবই চালান হইয়া যায়। রাস্তায় যাইবার সময় কমলালেবুর বাগান এবং ২।১টা গাছে লেবু ফলিয়া থাকিতেও দেখিলাম। বহু কুলি দলে দলে কমলালেবুর ঝাঁকা লইয়া নীচে নামিতেছে। বহু চেষ্টাতেও কমলালেবু কিনিতে পারিলাম না। রংপো হইতে রাস্তা বরাবর চড়াই, সময়ে সময়ে সেকেণ্ড-গিয়ারও ফেল করে। তিস্তার ধারে ধারে 'সাঁকো খোলা' পার হইয়া সিংটাম পৌছিলাম।

সিংটাম একটি ছোট ব্যবসায়ের স্থান। এখানেও কয়েকটি বেহারীর দোকান দেখিলাম। জল হাওয়া এখানকার বড় খারাপ। মশার উৎপাতও না-কি খুব বেশী। এখান হইতে দার্জ্জিলিং পদব্রজে যাওয়ার একটি রাস্তা আছে। পাছে মশা কামড়ায়, এই ভয়ে সেখান হইতে শীঘ্রই রওনা হওয়া গেল। এবার তিস্তা ছাড়িয়া অন্য নদীর ধারে ধারে চলিলাম, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ নদীটিকেও না-কি রংনি বলে। শ্যামভঙ্ পর্য্যন্ত নদীর ধারে ধারে রাস্তা, পথে ছোট একটি টানেল (Tunnel)—দেখিয়া কালকা-সিমলার রাস্তা মনে পড়িল। শ্যামভঙ্ হইতে গ্যাঙ্‌টক্ রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও পরিসর, রাস্তার উন্নতি-কল্পে চেষ্টারও ব্যবস্থা দেখিলাম।

সিক্কিম্ রাজ্যের ভিতরের রাস্তা হইলেও ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। কারণ এই রাস্তাটি একেবারে তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে। গ্যাঙ্‌টক্ পৌছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল বাজারের উপর পৌছিতেই অনেক লোক গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বুঝিলাম বাঙ্গালীদের আগমন কদাচ কখনও হয়। ডাকবাংলা আগেই অন্য কোন ভদ্রলোক রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাজারের সকলে মিলিয়া আমাদের বাসোপযোগী একটি বাড়ী দেখিতে ব্যস্ত হইলেন। দু'টি বাঙ্গালী মুসলমান দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিয়া আনন্দ পাইলাম। তাঁহাদের নিকট খবর পাইলাম যে, বাজারের নীচেই স্কুল মাষ্টার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসা — সেইখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হইল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, বাহ্যিক শক্ত আবরণের ভিতরে মাষ্টার মহাশয়ের প্রাণ আছে এবং তাহার সাড়াও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

গ্যাঙ্‌টক্—সুন্দর পরিপাটি সহর, রাস্তাগুলি পরিষ্কার, একটা পরিচ্ছন্নতার আভাষ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিক্কিম্ রাজ্য আয়তন বা রাজস্বে ছোট হইলেও রাজ-নৈতিক হিসাবে বেশ important। ৬।৭ লক্ষ টাকা রাজ্যের আয়—সমস্ত টাউনটিতে ইলেক্‌ট্রিক আলো, স্থানীয় পাহাড়ী লোক ছাড়া অন্য কাহারও নিজস্ব বাড়ী নাই। যে কয়খানি ভাল বা বাসোপযোগী বাড়ী আছে সমস্তই রাজার। প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে ছোট বাজার এবং সেই রাস্তার উপর সপ্তাহে ২ দিন করিয়া হাট বসে। সকালে চা খাওয়ার পর সহর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। মহারাজার নাম স্যর্ টাসি নাম গয়াল—মহারাজার প্রাসাদে আসিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট আমাদের 'কার্ড' দিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি রেণক্ কাজি — সমাদরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন, শুনিলাম পালি-ভাষার বহু পুরাতন গ্রন্থ এখানে বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিতে রক্ষিত আছে এবং সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে অনেক শিক্ষিত লোক এখানে শুভাগমন করিয়া থাকেন। প্রাইভেট সেক্রেটারি, মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা সেখান হইতে চিফ্ জজ রূপনারায়ণবাবুর বাড়ী আসিলাম। এককালে তিনি আমাদের সতীর্থ ছিলেন—ডেরাইসমাইল খাঁ সহরে ওকালতি করিতেন। তাঁহার নিকট আচার-ব্যবহার, আইন-সম্বন্ধীয় ব্যাপার জ্ঞাত হইলাম। সেখানে কোন পাণ্ডুলিপি আইন নাই। রাজ্যটি ৬৮টি এলাকায় বিভক্ত।

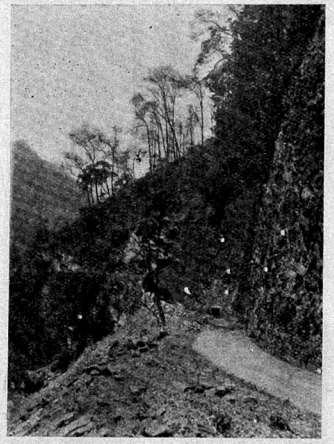

গ্যাঙ্‌টকের পথে 'টানেল্'

প্রত্যেক এলাকা ১ জনের সহিত নির্দ্ধারিত ক'রে ১৫ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া আছে। ইজারাদারগণ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে জজের কাজ করেন। তাঁহাদের আপিল চিফ্ জজের নিকট হয় — চূড়ান্ত আপিল মহারাজার নিকট হইয়া থাকে। এলাকাদার জজগণ ৪ ভাগে বিভক্ত। ফার্ষ্ট ক্লাস জজদের ১ মাস পর্য্যন্ত কয়েদ দিবার অধিকার আছে, বাকীগুলির কেবল

জরিমানা করিবার ক্ষমতা আছে। জরিমানার টাকা অর্দ্ধেক রাজার খাজনা-খানায় আসে, বাকী অর্দ্ধেক এলাকাদারদের প্রাপ্য। এই অদূরদর্শী প্রথার বিরুদ্ধে আমরা সকলেই মত প্রকাশ করিলাম—চিফ্ জজও ইহার পক্ষপাতী নন জানাইলেন। রাজ্যের ব্যাঙ্কার (Banker) একটি মাড়োয়ারী 'ফার্ম' সরকারী রাজস্ব ঐ ব্যাঙ্কের মারফতে আদায় হয় ও খরচ-পত্রও ব্যাঙ্ক হইতে হইয়া থাকে। রাজকীয়

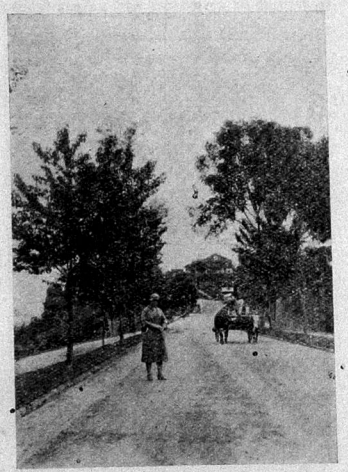

মহারাজার প্রাসাদ ও ডাক্ বাংলো যাইবার পথ

কার্য্যের জন্য সেক্রেটারিয়েট আছে। Mr. C. E. Dudley স্থানীয় 'টাসি নাম গয়াল' হাই ইংলিশ স্কুলের হেড মাষ্টার এবং মহারাজার জেনারেল সেক্রেটারি। মহারাজার আরও দুইটি সেক্রেটারি আছেন, একটি রায় সাহেব রেণক্ কাজি অপরটি গ্যালসন্ কাজি, রাজ্য-সম্বন্ধীয় কাজ-কর্ম্ম এই সেক্রেটারি ত্রয় মহারাজার নির্দ্দেশ অনুসারে করিয়া থাকেন। বিচার-কার্য্য চিফ্ জজের এলাকা, তাঁহার ফাঁসি পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা আছে, তবে তাঁহার capital punishment-এ আস্থা নাই। চল্লিশ জন কয়েদী রাখিবার মত জেল আছে। Warder এবং জেলের অফিসাররা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। আমরা যেদিন গ্যাঙটক্ পৌছিলাম, সেদিন চারিটি কয়েদি জেল হইতে পলাইয়াছিল। স্কুলের Boy Scouts তিনটিকে গ্রেপ্তার করে। চতুর্থটির সন্ধান তখনো মিলে নাই। Jailor আনন্দ সহকারে জেলের ভিতর-বাহির আমাদিগকে দেখাইলেন। ব্যবস্থা ভালই দেখিলাম, কয়েদীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর আছে। পূর্ণিয়া জেলে নন্-অফিসিয়াল ভিজিটরের কাজ বহুদিন করিয়াছি। কয়েদীদের প্রতি জেলার এবং ওয়ার্ডারদের সহৃদয়তা দেখিয়া বেশ আনন্দ হইল।

বৈকালে রেণক্ কাজি স্বয়ং আসিয়া খবর দিয়া গেলেন যে, মহারাজার সহিত পরদিন সকাল আটটার সময় সাক্ষাৎ হইবে। ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী বেশে মহারাজার নিকট যাই। কিন্তু রমেশবাবুর ইচ্ছানুসারে ইংরাজী পোষাক পরিয়াই যাইতে হইল। মহারাজার সম্মানের জন্য 'খাদা' (Scarf) উপঢৌকন দিবার প্রথা শুনিলাম। পাঁচ টাকা মূল্যে দুইখানি 'খাদা' লইয়া রাজ-দর্শনে গেলাম। যাইয়া শুনিলাম মহারাণী 'গুম্বা' (Monastery)-র কাজে ব্যস্ত। আমাদেরই ভুল হইয়াছিল, পূর্ব্বে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলি নাই যে, আমরা মহারাণীর সহিতও সাক্ষাৎ-অভিলাষী। মহারাজাকে একখানি 'খাদা' উপহার দিলাম। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভূমিকম্পে আমাদের দেশে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শুনিয়া মহারাজা বিশেষ দুঃখিত হইলেন। সিক্কিম রাজ্যেরও বহু 'গুম্বা' (Monastery) ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ কথাও জানাইলেন। প্রাসাদটি ছোট, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। ফুল বাগানটি সুশোভন এবং সুরক্ষিত। প্রাসাদের পশ্চাতেই 'গুম্বা'। মহারাণী সেইখানেই কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন — ভূমিকম্পে 'গুম্বা'টি নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি 'গুম্বা'র প্রত্যেক অংশ যত্নসহকারে দেখাইলেন। নীচেই সেক্রেটারিয়েট এবং দরবার-হল। মহারাজা এখানে এলাকাদারদের লইয়া দরবার করিয়া থাকেন। প্রাসাদের সামনে চওড়া রাস্তা — ডাকবাংলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ডাকবাংলার পাশেই 'হোয়াইট্ হল' ক্লাব। ক্লাবে টেনিস্, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা আছে। সরকার মহাশয় ও তরফদার মহাশয় (স্কুল মাষ্টার) ক্লাবের মেম্বর—রমেশবাবুর সে বালাই নাই। তাঁহাদের ও চিফ্ জজের আগ্রহে রোজই বৈকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাবে সময়টা মন্দ কাটিত না। মনে গর্ব্ব ছিল যে, পূর্ণিয়া ষ্টেশন ক্লাব (লেখকই তাহার সেক্রেটারি) মফঃস্বলের ক্লাবের মধ্যে অদ্বিতীয়। পাহাড়ীদের ক্লাব দেখিয়া গর্ব্বে একটু আঘাত লাগিল। ভূতপূর্ব্ব Political Agent 'হোয়াইট্' সাহেবের স্মৃতি-কল্পে চাঁদা করিয়া ক্লাব-ঘরটি তৈয়ারী হইয়াছে। এখানকার পাহাড়ীরা দুই ভাগে বিভক্ত—তিব্বতী এবং ভুটিয়া। মহারাজা তিব্বতী আভিজাত্য গৌরব কড়ায়-গণ্ডায় বজায় রাখিয়া থাকেন। ভুটিয়ারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এক-কালীন একাধিক বিবাহ প্রচলিত আছে। এক সংসারের ৪।৫ ভাই মিলিয়া একটি স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিবাহের কোন নিয়ম বা প্রথা নাই। চিফ্ জজের নিকট শুনিলাম যে, অনেক সময় বিবাহিতা স্ত্রী কি-না নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে এবং ইদানীন্তন এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে স্ত্রীলোকটির নিকট বাড়ী, ঘর, বাক্স, পেটরা ইত্যাদির চাবি আছে কি-না খোঁজ লইয়া থাকেন এবং যদি থাকে তবে তাহা বিবাহের স্বপক্ষে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। আইন-ব্যবসায়ী হইয়া আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা চলে না, তবে যদি কেহ বলেন যে, বহু আইনের দেশে বাস করিয়া নাগ-পাশের বন্ধন অনুভব করিতে হয়, তাঁহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। দশ আজ্ঞার (Ten Commandments) পরিবর্ত্তে ১০।২০ হাজার আইনও (Acts) আমাদের দেশে শান্তি আনিতে সক্ষম হইতেছে না।

এখানেও Tuberculosis-এর হাঙ্গামা দেখিলাম। সাধারণ দরিদ্র লোক ভাল খাদ্য পায় না, কিন্তু চা এবং সিগারেটের চলন খুব বেশী। Scottish Mission-এর মেম সাহেব তাঁহার কার্য্য সে দেশেও করিতেছেন, একটি মেয়েদের স্কুলও স্থাপন করিয়াছেন। শব-সৎকারের প্রথা অদ্ভুত। শব-বাহকেরা সৎকারের পর ধরাশায়ী না হওয়া পর্য্যন্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। নেপাল, ভূটান, তিব্বত এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে থাকার জন্য সিক্কিমের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। Mr. Williamson, I. C. S. এখানকার Political Agent। তাঁহার বাড়ী এবং চতুর্দ্দিকের সীমানা একটি পাহাড়-চূড়ার সমস্ত অংশ লইয়া। তাঁহার চারিদিকে কাঁটা তার দিয়া ঘেরা। মাঝে মাঝে "Trespassers will be prosecuted" সাইন বোর্ড দেওয়া আছে। মহারাজার প্রাসাদে এসব কিছুরই হাঙ্গামা নাই।

এখান হইতে তিব্বত সীমানা পর্য্যন্ত যাওয়ার বেশ সুবিধা আছে। গ্যাঙটক্ হইতে 'কাপুনাঙ্' ১০মাইল। সেখানে ডাকবাংলা আছে আবার ১০মাইল পরে 'চাঙ্গু'তেও ডাকবাংলা আছে। 'চাঙ্গু' হইতে তিব্বতের সমতলভূমি (Tibetan Plateau) দেখিতে পাওয়া যায়। পদব্রজে কিম্বা ঘোড়া ভিন্ন 'চাঙ্গু' যাওয়ার আর কোন উপায় নাই। 'চাঙ্গুর' নিকটে 'নাথুলা' পাস পার হইয়া তিব্বত যাইতে হয়।

ডানপিটে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

যে সময়ে আমাদের গল্পের সুরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট লাচ্চাদার রাবড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

বাংলা ১২৮৭-৮৮ সালের কথা।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, সহরের বসতি আরও খিঞ্জি ছিল, তেলের আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল সহরের অবস্থা, গাড়ী-ঘোড়া ছিল কম। বুড়ুয়া মঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নতুন ধরণের ভিক্টোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। একা ও স্প্রিং-বিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, সহরের বাহিরে উটের গাড়ী চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্ত্তীর খুব নাম ও প্রসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়ীটা ছিল একটা হোটেল-খানা। চাকুরি-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়-স্বজন ও স্ব-গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়ীতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাওয়া নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ী ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হয়তো সহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া, ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ী ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরোদিন এই রকম চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভ্যাস করিত। কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টক্‌টকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ়তা, বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদমায়সি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন সখের থিয়েটারের ধুম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পৌঁছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দোলনের প্রতিভূ ও প্রাণ-স্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই ষ্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা-মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় সুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলা-প্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ-মহল্লার রামজীবনবাবুও গবর্ণমেণ্ট পেন্‌সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাসপাতালে

কম্পাউণ্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল, যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি দু'তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল, সামান্য বেতনের কম্পাউণ্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্রাক্‌টিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জ্জন করিল, বিশেষ করিয়া অস্ত্র চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ্ চোখ, সাহস, সতর্কতা, প্রকৃতিস্থতা, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এ সবগুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ী নদীয়া জেলা মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা সহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলাদেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল যে, মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাতে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই পারে না, কারণ সে গিয়াছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে — দশ-বারো বছর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে, বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ী করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নামজাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্রাক্‌টিস্ করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সে তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না?

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়াই গেল নেপালে। গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটী লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া সেখানে টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটী ফুরাইলে আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছাড়ানো সহজ? চন্দ্রগিরি, উদয়গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ সে দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বছর পূর্ব্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্-বি পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজ-কালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিকটবর্ত্তী নরহরিহরপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাকরা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সার্টিফিকেট আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্‌টিস্ জমাইয়া ফেলিল। সে

উপরোক্ত হাতুড়েদলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিয়া আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইল না, বা রোগীর বাড়ী আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ীর একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্‌পেন্‌সারিও ছিল না—রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ীর সামনে বটতলায়, তাহাদের ঘসিবার স্থানের পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ীর সামনে বটতলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনে-রাতে স্নানাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়ীতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ হাঁফাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়ীতে গড়ে তিন-চারটা সার্জ্জিক্যাল্ কেস্ লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, "এত রুগী এ-দেশে ছিল কোথায় এতদিন হে?" গত বিশ বৎসরের মধ্যে যাদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিষ-পত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল। কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকান ঘরের সন্ধান করিতে লাগিল। যাদু স্যাকরার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু'পাঁচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব্ব-সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র।

২

সতীশের দু'টি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটির হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল। নিজের বাড়ীতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাকরাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষণ্ণমুখে বলিল, তাই তো মুখুয্যে ম'শায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্‌থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কি-না?

যাদুরাম প্রাণপণে ক'দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না। তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল—আপন মনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ। নয় তো অন্য সবদিকে কোনো অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজ-কর্ম্ম, স্বামী-পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোনো ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ বন্ধ রাখিয়া এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ব্ববঙ্গে শ্বশুরবাড়ী গিয়া রহিল কিছুদিন, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে, এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামনগরের হাইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল।

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমন ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটীর নাম বিনয়, সে আই-এস্-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবুদ্ধি। ইতিমধ্যেই নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

এসব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো-

ষোল বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো-ষোল বৎসরের জীবন নিতান্ত একঘেয়ে—রোগী-দেখা, খাওয়া, ঘুমানো—ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প-গুজব, সংসারের বাজার-হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একঘেয়ে, এক রকম জীবন-ধারা, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই, নতুনতর অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন আর আনন্দ নাই, এ কথা এক-আধবার তাহার মনে যে না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবার সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়ীতে আরামে সে ভিন্‌গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে। মাঠের ধারে ধারে ঘুঘু পাখীর ডাকে কিম্বা বিলের গভীর জলে বাগ্‌দী ছেলেকে ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে—সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে···রাম রাম সাহ হালুইকরের দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটী থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে···একবার সে, রামজীবনবাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু—তিনজনে জঙ্গম-বাড়ীর বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল!···

নেপালে একবার কর্ণেল খড়গ সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি—আর একটা মোড়কে পাঁচটী টাকা। সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল—টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চটতে পারেন।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চ'টে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি নেবেন? নিন—আমি এখুনি ইস্তাফা দিতে রাজি আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর নিজে আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি তো যাওয়া দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।···

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকেদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—কিন্তু সে শুধু বাহাদুরী লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জারি করিবার জন্য। এবার কিন্তু সে সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চির-কালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া এ গ্রামে যে কয়টী সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয় স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ায় অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী—ও পাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—এঁরা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাকরার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি, গত দশ বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া

পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়েস, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদুরাম নিজে সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধুলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দুই-দুইটা ছেলে মারা গেল—ওই টুকু বংশের মধ্যে শিব-রাত্রির সল্‌তে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউণ্ডারীতে ভর্ত্তি ক'রে নেবেন আপনার ডাক্তার-খানায়—বছর তিনেক দেখে-শুনে শিখলে তবুও অন্ত চাষা-গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ত্রুটী করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তাহার শ্রাদ্ধের খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহারও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ছোটছেলের কলেজের খরচ, বড়ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠিল না-কি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে হাতকে আর গুটানো গেল না — বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কতদিন লাগে?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর—বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা? এ অঞ্চলে এম্‌-বি পাশ করা ডাক্তার ক'টা আছে? কখনো যে সব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতে হইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ীর চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িকে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো-টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

৩

বিনয় এম্‌-বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্‌-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পাইয়া সুদূর মেসোপোটেমিয়ায় গিয়াছে। সেদিন না-কি ছোটখাটো একটী খণ্ড যুদ্ধে আরবদের গুলী বিনয়ের কানের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এম্‌নি হয়? বিনয় পত্রে এ ঘটনাটী বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভূষণ দাঁ-এর পুরানো আড্ডাটী আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভূষণ মরিয়া গিয়াছে—তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্ব্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে দেশের খবর পায়, তারই সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইম মিনিষ্টারের বাড়ীর সাম্‌নের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেচি। মেসিন্ গান? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল···আমাদের কাছে ও সব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু'-চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া

সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ী নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রী লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরণের বে-মেরামতী পুরানো বাড়ীতে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ীর পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটি হইবে ছেলের বসিবার ঘর, এইটি নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপোটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আসা বন্ধ হইয়া গেল। দু'দশ দিন করিয়া মাসখানেক কোনো খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্র-বধূকে নানা মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে।

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল, তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্ব্বল কথা শুনিল না — চোখে জল দেখা তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম। মুখুয্যে বাড়ীর তেঁতুল-তলার সামনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ীর উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে—এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সাহেবী-পোষাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।···বিনয়।···

মুখুয্যে গিন্নী স্নানান্তে শিব-পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, পূজা ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুণ যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যুবকেরা সকলে বলিল, আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়-দা, বেশ যা হোক্—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্ব্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ীর উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরিলুট দিল।

৪

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল — তারপরে সে মহকুমায় গিয়া বসিয়াছে। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তারের কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিত স্ব-গ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পসার কমিয়া গেল, সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্ব্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেচেন। অত বড় ডাক্তার, আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ওঁদের কাছে কি আমরা —

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে। গণেশ-মহল্লায় সে ডানপিটে সতীশ—ঠাসা বন্দুকের এক ঘাওড়ে অসিঘাটের ওপারের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল, মনে আছে, বুড়ুয়া মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়া ডুব সাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজ্‌রা —

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্ত্তা' বলিতে সুরু করিয়াছে, এটা সে লক্ষ্য করিল; বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এতদিন বাড়ীতেই বসিয়াছিল —এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে। বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে — পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয় করিত, লোক-সজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্র-বধূরা গ্রামের বাড়ীতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়ীতে রাখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন সর্ব্বদা দেখাশুনা করিত, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। একমাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন' মাইল পথ আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকেও যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না। প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে সতীশ ঘোর অর্থকষ্টে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটী দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্র লইয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের বিশেষ কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠানে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।...

—কে?

—আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুসি হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আয়, পটল! আয় আয়, —

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাক নাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চোদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন কেমন করে সর্ব্বদা — কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না। অপ্রত্যাশিত ভাবে নাতিকে আসিতে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

—তোর বাবার খবর কি রে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল— সেই একই রকম, দাদা। বরং আরও বেড়েচে।

পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কসিতে দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দু'জনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল—বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, এক ঘরে একা দিনরাত শুইয়া থাকে, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, কাজকর্ম্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল—এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করি। কিন্তু এখন আর কেউ আমায় ডাকবে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্-বি। ওদিকে তো বিনয় রয়েচে, অমল রয়েচে, শ্যামবাবু — সবাই এম্-বি। আমাকে আর কে ডাকবে?

দিব্যেন্দু বলে—ভেবো না দাদা। আমি পাশ ক'রে যখন চাকরি করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে—আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস্, পটল। কতকাল দেখিনি—এই গুন্‌বি ভবে, আমরা কি করতাম সেখানে?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুর দাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুসি করিবার জন্য বলিল — বল না, দাদা! চন্দ্রগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুর-দাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া চন্দ্রগিরি, রত্নগিরি, রক্সৌলের যে পশুপতিনাথ-মেলার দৃশ্য— এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখায় ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল।

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই ছাখ্, একেবারে নেই—স্যাণ্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুণ, সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েচে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুল্‌বে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম্ম একেবারেই নাই—এ ধরণের অলস জীবন সে যাপন করে নাই কখনো—আপন মনে বসিলেই সেই সব কথাই মনে আসে।

গাঙুলি বাড়ীর আন্নাকালী দুটী কচি শসা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বলিল — গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা ব'ললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়োয় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ উজ্জ্বল চোখে আন্নাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে? মটর-ডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে, মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে, অমন উপার্জ্জন-ক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই — তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়ীতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

আন্নাকালী চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে— উপরি উপরি চারটী কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যাটীর ওই নাম রাখিয়াছিল, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুল্‌বো না জ্যাঠাবাবু। মেয়ে-মানুষে অমন রাঁধ্‌তে পারে না।

সতীশ খুসি হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, আন্না?

আন্নাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে আরাদ্ধর দিন? তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ। ওরই জন্যে তো কোথায় যেতে পারি নে আন্না। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধু-বান্ধব—তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে, সেই জন্যেই তো আছি আটকে। নইলে আমার আবার ভাবনা? এই গুন্‌বি, কাশীতে আমরা কি করতাম?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। আন্নাও এসব গল্প ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে

হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দু'জনের কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ আন্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল — জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে!—

—ধর্, ধর্, মা, ধর্—নিয়ে আয়। নাঃ, জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বৈকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল — এসো জ্যাঠাইমা, কোথায় যাচ্ছ, এসো—

—একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ; তা ইয়ে আন্না, কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস্ এখন।

১

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন এক মহকুমার টাউনের উপর তিনজন এম্-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ীতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ হইলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া যে অবহেলা করে তা নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ীর মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্য্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে!

বিনয় বলিল—থাক্ বাবা, থাক্, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তস্বরে বলিল—উঃ, ঘেমে একেবারে—দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন? তোমার গাড়ী কোথায়?

—গাড়ী আছে, ইঞ্জিন্ খারাপ হয়ে গেছে, মেরামতের জন্য একমুঠা টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায়? কাজেই গাড়ী গ্যারেজে পড়ে।

—পটল কোথায়?

—কল্‌কাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনার যে কি করি? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিন মাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দু'মাস পাঠাতে পারি নি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জায়গায় খরচ বিনয় তো আর চালাইতে পারে না। দেশের বাড়ী, টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায়!

বিশেষ কিছুরই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দু'টী টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দু'টী প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবারে দত্তিঘাটা থেকে ডাক এসেছিল, কিছু পেয়েচি। তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগ্‌বে আবার?

গ্রামের একটী ছেলে রেলে কাজ করিত, ছুটী লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—স্যাখো

উমাপদ, ভাবচি কি জানো? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়ীতে রেখে আমি কাশী চ'লে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চল্‌বে। নইলে এদিকে সবই তো শুন্‌লে—বিনয় বড় মুস্কিলে পড়েচে, রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই—এই বাজারে দু'টো সংসার চালানো কি সোজা কথা রে, বাবা? আমরা চ'লে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়,···তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্ত্তি, আহা, কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি?

উমাপদ আবাল্য এ সব গল্পের সঙ্গে পরিচিত, সে বলিল— পাগল হয়েচেন? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছে ভাবচেন? সে সব কি—

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই? আমাদের সে ডানপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্ত্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে—হেঁ-হেঁ হঠাৎ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা—শুনবে তবে?

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী ষ্টেশনে দুপুর বেলা নামিল। স্ত্রীকে মেহেরপুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ীর চাবিটা আন্নাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছামিছি তাহাকে বিব্রত করা?

কাশীতে নামিয়া সতীশ মনে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী! এত দিন কি করিয়া ভুলিয়াছিল সে! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়া-গাঁয়ে জীবনের ত্রিশটী বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ বছর আগেকার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল? এ কাশীকে তো সে চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবনবাবুর মেজোছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটীতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশ-দা, তোমার চেহারা তো এখনো বেশ আছে! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, আমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি — মানে, অম্বলের অসুখে আমার — এতদিন ছিলে কোথায়?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপ্লাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে—তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুর-বাড়ী বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেখানেই আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখের হাসিমাখা, কত অজানা তরুণমুখ—গান···আনন্দের উচ্ছ্বাস···দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। দিব্যেন্দু বলিয়াছিল — দাদা, আমি চাকুরি করলে তোমার ভাবনা থাকবে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, ঐই সন্ধ্যাবেলা যেন প্রত্যেক

বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চান্ন বছর আগেকার নিজে?

আন্নাকালীর মুখ মনে পড়িল—যখন গরুর গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

নাঃ, সে ডানপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তার সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কতরাত পর্য্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আন্নাকালীর জন্য কাশীর কোটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুসি হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিতপাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, গিয়া দাম পাঠাইবে। ভাল পট···বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল—তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমার এখানে আর ক'দিন থাক্‌বো? তুমি একটা বাজার সরকারি গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায়। অভাবে রাঁধুনি গিরিতেও রাজি আছি। খুব ভাল রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না। ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দুর কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধক দিতে হইবে, ছিঃ—

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

আজও আমার হয় নি সারা
তোমার পূজা মোর দেউলে।

হেলায় হেলায় গেল বেলা
নিঠুর তুমি রইলে ভুলে।
আকাশ ধরা আলোক হারা,
তিমির ঘন স্বপন ভরা,
গন্ধহারা বরণ-মালা
সন্ধ্যা বেলায় শুক্‌নো ফুলে।

মনোহরণ বেশে,
দাঁড়াও যদি বন্ধু আমার
কভু পথের শেষে—

বন্দনা গান হবে গাওয়া
পূর্ণ হবে চাওয়া পাওয়া
দিনের শেষে শেষ আরতির
প্রদীপ খানি ধরব তুলে।



কাফীতোড়ী—দাদ্‌রা

রাঙ্গা পদে কে দিল মা এত জবা ফুল,
রাঙ্গা জবা হার মেনেছে, তোমার চরণ দু'টি সকল রঙ্গের মূল।
তোমার অরূপ রাশি, প্রকাশিছে অমর জ্যোতিঃ,
ত্রিভুবন জন তব গুণ গানে, হয়েছে আকুল॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর-সরস্বতী

রা	মা পা দা	পা র্সা ণা	দা পা দা	ম্পা মজ্ঞা রা	জ্ঞা মা মা	পা -1	ণা
রা	ঙ্গা প দে	কে ০ দি	ল মা ০	এ ত ০ ০	০ জ বা	ফু ল্	রা

ণা	ধা মা	পা দা র্সণা	দা পা -1	1 1	1	1 পা দা	ম্পা মা -1	
ঙ্গা	জ বা	হা র্ মে	নে ছে ০	০ ০	০	০ তো মার্	চ র ণ্	

জ্ঞা রা -1	সা রা মজ্ঞা	1 মা মা	পা -1	
ফু টি ০	স ক ০	ল্ রঙ্গের্	মূ ল্	

মা	পা ণ্দা ণা	র্সা র্সা নর্সা	র্সা র্সা -1	1 1 পা	দা ণা র্সা		
তো	মা র অ	রূ প ০ ০	রা শি ০	০ ০ প্র	কা শি ছে		

র্সা র্রা ণা	দা পা -1	(1 1)	পা জ্ঞা জ্ঞা	র্রা র্সা র্রা	ণা র্সা ণা		
অ ম র	জ্যো তি ০	০ ০	ত্রি ভু ব	ন জ ন	ত ব গু		

দা পা পা	1 1 মজ্ঞা	মা পা পা	পদা ণর্সা র্সণা	দপা মজ্ঞা রসা	ণ্সা -1		
ণ গা নে	০ ০ হ	য়ে ছে আ	কু ০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ল		

তান

১। ণ্‌সা রমা পদা | ণর্সা র্জ্ঞা র্রর্সা | ণদা পমা পদা | ণর্সা ণদা পমা |
অ ০ ০ ০০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০০ | ০ ০ ০ ০ ০ |
১
জ্ঞরা সা |
০ ০ ০

১ ১
২। র্জ্ঞা র্রর্সা র্রর্সা | ণর্সা ণদা পমা | পদা ণর্সা র্জ্ঞা | র্রর্সা ণদা পমা |
১
জ্ঞরা সা |
০ ০ ০

১ ১
৩। ণ্‌সা রমা পণা | দা পা -1 | 11 মপদা | মপা মজ্ঞা -1 |
অ ০ ০ ০০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ |
১ ১ ১
সরা -1 -1 | জ্ঞা সা -1 | ণ্‌সা রমা পণা | মা -1 -1 |
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০০ ০০ | ০ ০ ০ |
১ ১
পা ধা ণা | র্সা র্সণা দপা | মজ্ঞা রসা |
০ ০ ০ | ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ |

অন্তরার তান

১ ১ ১
৪। মা | পা দা ণা | সা র্সা নর্সা | র্সা র্সা -1 | ণদা পদা ণর্সা |
তো | মা র অ | রূ প ০০ | রা শি ০ | ই ০ ০ ০০ |
১ ১
111 | পদা ণর্সা র্জ্ঞা | জ্ঞরা র্সণা দপা | দা মা মা |
০০০ | ০ ০ ০০ ০০ | ০ ০ ০০ ০০ | ০ ০ তো |
১
পা ণদা ণা | র্সা র্সা নর্সা | র্সা র্সা -1 | ইত্যাদি সমস্তটি
মা ব্র অ | রূ প ০০ | রা শি ০ | গাইতে হইবে।



['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

বিশ্বকোষ—(২য় সংস্করণ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৯নং বিশ্বকোষ লেন হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা মূল্য—৷৷০ আনা।

'বিশ্বকোষ' দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ছাপা, ছবি, কাগজ উৎকৃষ্ট। অতি কঠিন বিষয়ও লেখার গুণে সহজ বোধ হইয়াছে। জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, নগেন্দ্রনাথের কৃতী পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথের তত্ত্বাবধানেই বিশ্বকোষের প্রকাশ-কার্য্য এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে ও সমস্ত বিষয় এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতেছে। সঙ্কলন-সৌষ্ঠবও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা বিশ্বকোষের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। ভরসা করি বড়দিনের পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ দেখিতে পাইব। এই সুন্দর বিরাট অভিধানখানি বাঙ্গালার তথা আমাদের গৌরবের ও গর্ব্বের বস্তু। সুতরাং ইহার কোন এক খণ্ড পাইতে বিলম্ব হইলে অধীর হইয়া উঠি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বকোষের সাফল্য কামনা করিতেছি।

সোনার কাঠি—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণীন্দ্রলাল শব্দ-শিল্পী। শব্দ চয়নে ও সুন্দর সুসম্বদ্ধ বাক্য গঠনে তাঁর মত সুনিপুণ শিল্পী আধুনিক লেখকদের মধ্যে বেশী নেই। এ বইখানিতে ছেলেদের জন্য লেখা দশটী গল্প আছে—প্রথম গল্প 'সন্দেশের দেশে' অনেকদিন আগে 'প্রবাসী'তে বার হ'য়েছিল। মণীন্দ্রলালের মিষ্টি হাতের ও কল্পনার পরিচয় এ গল্পটীর ছত্রে ছত্রে। কয়েকটী গল্প হান্‌স্ এণ্ডারসনের গল্পের ভাব অবলম্বনে লেখা। বইখানির কাগজ ও ছাপা ভাল। যাদের জন্যে এ বই লেখা—তারা প'ড়ে অত্যন্ত খুসি হবে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদপটখানি সুদৃশ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস্—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল বুক সোসাইটি—১৮৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—চারি আনা।

একটি ছোট গল্প—৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাজপুতানা হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে 8-Down Express-এ নায়ক শ্যামলকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর প্রেম-চর্চ্চা। গল্পাংশের মধ্যে সম্ভাব্যতা এত অল্প যে, গল্প পড়িবার spell সহজেই ভাঙিয়া যায়।

লেখক খুব তাড়াতাড়ি গল্পটি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—তাই ভাষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। যথা, 'মুখটাকে মানুষের করবার জন্যে'—অর্থবোধ হয় না। 'মুখটাকে মানুষের মুখের মত করবার জন্যে'—বলা লেখকের উদ্দেশ্য। 'দুয়েকটি বিদেশী মেয়েই বা না-কোন্ সে দেখেছে' (২৩ পৃঃ)—আমরা বলি না। বলি, 'দু-একটি বিদেশী মেয়েই বা কোন্ না সে দেখেছে।' 'ভাজায়-ডাল্‌নায়, মাছে-মাংসে একেবারে একটা পর্ব্বত প্রমাণ' (২৪ পৃঃ)

বলি না—বলি, 'ভাজায়-ভাল্‌নায়, মাছে-মাংসে একেবারে পর্ব্বত প্রমাণ।' 'আগুন গেছে সর্ব্বাঙ্গীণ নিভে' (৩১ পৃঃ)—over smart ভাষা—'সর্ব্বাঙ্গের আগুন নিভে গেছে' বলিলেই সুষ্ঠু হয়।

কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না—কথাগুলি হয়ত পূর্ব্ববঙ্গে চলিত আছে। যথা—কান্নিক মেরে, (২২ পৃঃ), ধারে-পারে, (২৬ পৃঃ) সিজিল-মিছিল (৩৬ পৃঃ), বেমোড়ে (৫০ পৃঃ)।

মুদ্রাকর প্রমাদ বহু—দুই একটি হাস্যকর। 'নাসা-রন্ধ্রে'র বদলে 'নামারন্ধ্র' এবং 'নাসারন্ধ্র' (১৬ পৃঃ), 'খুরজা' (Khurja Junction) স্থলে 'খুজরা'! (২২ পৃঃ)।

Mail হইল 'মেইল্', কিন্তু Train কেন 'ট্রেইণ্' নয়? (৩ পৃঃ) wait হইল 'ওয়েইট' (৪৮ পৃঃ) কিন্তু Suitcase 'স্যুটকেইস্' কেন? (৫০ পৃঃ)।

লেখক সুপরিচিত সাহিত্যিকার। তজ্জন্যই এত কথা বলিতে হইল।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মাটির মেয়ে—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। প্রকাশক—সিটি লাইব্রেরী, ৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানিতে লেখক নায়ক-নায়িকার পথ বড় চমৎকারভাবে খোলসা ক'রে দিয়েছেন। দেবেন মুদীর দোকান করে এবং অনিলের বাড়ীতে থাকে। সকাল থেকে প্রায় সমস্ত দিনই থাকে মুদীর দোকানে এবং দেবেনের সুন্দরী তরুণী স্ত্রী মনোরমা ওরফে পটল থাকে বাসাতে—যে বাসাতে মেডিকেল কলেজের তরুণ সুশ্রী ছাত্র অনিল থাকে একা, এবং যার বাপ নেই, মা নেই, ভাই বোন নেই,—একটা বুড়ী পিসী, মাসীও নেই। এই হোল data—এখন আরম্ভ করুন। এই data থেকে আরম্ভ করলে কোথায় না পৌঁছনো যেতে পারে! অলমতি বিস্তরেণ।

পটলের চরিত্র বেশ কৌতূহল জাগায় পাঠকের মনে।

অত্যন্ত খেলো ও সস্তা-ধরণের রস সকলেই গ্রহণ করতে পারে। এও তেমনি। এ ধরণের উপন্যাস রচনার সার্থকতা কি বোঝা যায় না। গ্রন্থকারের ভাষাটা বেশ ঝর্‌ঝরে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাকী ও সুরা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীবরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃক পূরবী সাহিত্য-পরিষদ, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। দাম—ছয় আনা।

কবিতার বই। ভোগের, যৌবনের আর উন্মাদনার কবিতা—অতি আধুনিকতার সুরে ভরা। যাঁহারা অতি আধুনিকতার ভাবধারাকে পছন্দ করেন, এ বই তাঁহাদের ভালো লাগিবে, যাঁহারা বিপরীত-পন্থী, রুচি আহত হইবার দরুণ তাঁহাদের একেবারেই ভালো লাগিবে না। অক্ষর গণিয়া যে ছন্দ রচনা, সে নীতি এ বইয়ে সব জায়গায় অনুসৃত হয় নাই এবং অনেক কবিতায় প্রাদেশিকতাও আছে যথেষ্ট পরিমাণ। এ সকল ছাড়িয়া দিলে অনেক জায়গায় কাব্য ও ভাবুকতার খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় অতি-আধুনিকতার মোহ অতিক্রম করিতে পারিলে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই নবীন অতিথির দ্বারা স্থায়ী কিছু হইতে পারে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তুমি আর আমি—শ্রীসুধীর মিত্র প্রণীত দাম—আট আনা। প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিতার বই—আটাশটি সনেটের প্রায় সব ক'টিই ছন্দে, 'রসে, ভাষায় চমৎকার হয়েছে। সব ক'টিই নতুন সুরে গাঁথা প্রেমের কবিতা, 'তুমি আর আমি'র একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। সনেট্‌গুলি সব কবি-প্রিয়াকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। তিনি সত্যিকারের নারী

—রক্ত-মাংসে গড়া নারী হওয়াই সম্ভব, কিন্তু অতদূরও হ'তে পারেন, কারণ কবির কথায় তিনি—"কবির অন্তরলক্ষ্মী তুমি সে ছলনা।"

কিন্তু অতদূর তিনি ন'ন, কবির সঙ্গে তার মিলন হয়েছে বহু বার এবং বিচ্ছেদও হয়েছে প্রতি বার। তাই তিনি না-পাওয়া, অথচ সেই ক্ষণিকের মিলনকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্যে লিখেছেন—"তুমি আর আমি"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অঞ্জলি—শচীন সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম্, লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

অঞ্জলি উপন্যাস এবং অতি-আধুনিক যুগের যে সাহিত্য সেই সাহিত্যের উপন্যাস, অর্থাৎ এ গ্রন্থের নর-নারী সকলেই শিক্ষিত, তারা পরস্পরের সহিত মেলামেশায় বাহ্য-বিচার রাখে না, তারা ভালোবাসে একজনকে এবং বিয়ে করে আর একজনকে। তা ছাড়া তাদের দেহ তাদের মনকে চালায়, না তাদের মন চালায় তাদের দেহকে সে কথাটাও জোর ক'রে বলা কঠিন।

কিন্তু তা হোক্, তবু উপন্যাসখানি নানাদিক দিয়েই উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। গ্রন্থের ভাষার ভিতর আছে একটা অনাড়ম্বর স্বচ্ছতা এবং চরিত্রগুলির ভিতরে আছে মানসিক দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত। এই স্বচ্ছতা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয়ই এনে দিয়েছে গ্রন্থখানিতে একটি চমৎকার রস-মাধুর্য্য। পাত্র-পাত্রীগুলির ভিতর এই যে ঘাত-প্রতিঘাত—এ ঘাত-প্রতিঘাত emotion ও intellect-এর। এদের মনে আছে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি, কিন্তু দেহ সুয়ে পড়েছে emotion-এর উদ্দামতার কাছে। সুতরাং সংঘর্ষ অপরিহার্য্য। এই সংঘর্ষে যে সব চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে তা যে পাঠকের মন স্পর্শ করবে তাতে আর বিচিত্র কি?

অতি আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, উপন্যাসেও তাঁরা পরিবেশন করতে চান নিছক intellectualism-এর বুকনি, অর্থাৎ এমন কতকগুলি ধার করা জিনিষ, যা তাঁরা নিজেরাও হয়তো হজম করতে পারেন নি। আর তারই ফলে তাঁদের উপন্যাসও হ'য়ে ওঠে কতকগুলো শুষ্ক তর্কের বোঝা মাত্র। তর্কের দ্বারা 'হাঁ'-কে 'না' করার ভিতরে বুদ্ধির খেলা আছে এবং হয়তো খানিকটে তৃপ্তিও আছে। কিন্তু সে তৃপ্তি কতকটা জ্যামিতির জটিল সমস্যা (problem) নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো ব্যাপার। তাতে বুদ্ধির তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। হৃদয়ের খুশী অন্য রকমের জিনিস। কাব্যের রস ও জ্যামিতির জট খোলার রস—এক রকমের জিনিস নয়।

অঞ্জলির গ্রন্থকার উপন্যাসের এই গোড়াকার কথাটা ভোলেন নি ব'লেই তাঁর এই গ্রন্থখানিতে intellectual নর-নারীর ভিতরেও emotion-কেই তিনি দিয়েছেন প্রাধান্য। তা না হ'লে অঞ্জলির মরবার জন্য কৃচ্ছ-সাধনা করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, বিজয়ের বিলাতে পালাবার কোনো হেতু ছিল না এবং সুবীর যার emotion-এর ধার সবচেয়ে কম ধারবার কথা, তারও কারাবরণ করবার কারণ ছিল না। তাঁর এই গ্রন্থে ছাঁকা intellectual type শুধু রাবেয়া। কিন্তু তাকে intellectual type না বলে criminal type বলাই ঠিক। আর সেই জন্যই তার চরিত্রেও একটা আকর্ষণ এসে গেছে, হয়তো গ্রন্থকারের অজ্ঞাতসারেই।

এখানে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার আর একটামাত্র কথা শুধু বলবার আছে এবং সে কথাটা অবান্তর কথা। যতটা মনে পড়ে, সম্ভবত শচীন বাবু তাঁর প্রবাসের পত্রেই বলেছিলেন—বাংলাদেশের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, তার সমাজ-ব্যবস্থায় নর-নারী বন্ধুভাবে মিশবার সুযোগ পায় না—মিশলেই সেটা ধ'রে নেয় লোকে যৌন-সম্বন্ধের ব্যাপার।

এটা যে দুর্ভাগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের হাত শচীন বাবুও এড়াতে পারে নি তাঁর এই গ্রন্থে। অনেকগুলো নর-নারীকে তিনি টেনে

এনেছিলেন বন্ধুত্বের একটা গণ্ডির ভিতরে। কিন্তু তাদের সকলের সম্বন্ধই শেষের দিকে বন্ধুত্বের কোঠা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটা যে তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার তা নয়। যে complex নর-নারীর সম্বন্ধের ভিতর এই জটিলতা এনে দিয়েছে, তাঁর মনও নিজের অজ্ঞাতসারেই জের টেনে চলেছে সেই complex-এর। সুতরাং ব্যাপারটা শুধু সামাজিক দুর্ভাগ্য নয়, তার চেয়েও ঢের জটিল জিনিস—একথা মনে কর্‌বারও হয়তো কারণ আছে।

কিন্তু আগেই বলেছি গ্রন্থের সঙ্গে সে কথার কোনো সম্বন্ধ নেই। শুধু সম্বন্ধ যে নেই তা নয়, এই complexই এ যুগের উপন্যাসের বনিয়াদ, সুতরাং জোর করে যদি এর হাত থেকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে মুক্তি দিতে চেষ্টা কর্‌তেন তবে তাই হ'তো অস্বাভাবিক, তা তাঁর গ্রন্থের সৌন্দর্য্যেরও হানি কর্‌ত।

উপন্যাস বল্‌তে যে একটা ঘটনা-বহুল বিচিত্র কাহিনীর ছবি আমাদের মনে হয়, সে রকমের কোনো কাহিনী নেই এ গ্রন্থে, কিন্তু যে কাহিনী হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের ধারা ঝরিয়ে যায়, সে কাহিনীর আমেজ পাওয়া যায় এর অনেক জায়গায়। অর্থাৎ গল্পের দিক দিয়ে নয়, রসের দিক দিয়ে এখানি যে একখানি ভালো উপন্যাস হ'য়ে উঠেছে তাতে ভুল নেই।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ফরাসী-বিপ্লব — শ্রীযুক্ত রেজাউল করিম, বি-এ প্রণীত। কলিকাতা 'বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস্' হইতে প্রকাশিত। 'মহামায়া প্রেসে' মুদ্রিত। মূল্য—এক টাকা।

সভ্যতার সংঘর্ষে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পুরাতন ভাবধারায় যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার ফল ব্যর্থ রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমাজে প্রকাশ পায় 'রিনেসঁ', 'রিফরমেশন্' ও 'ফরাসী বিপ্লবে'। বিশ্ব-নিখিলে সাম্য, মৈত্রী ও ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মানুষকে সকল বশ্যতা কাটাইয়া তার জন্মগত অধিকার দিবার প্রয়াস প্রথম প্রকাশ পায় এই ফরাসী-বিপ্লবের ব্যাপারে। এ বিপ্লব একদিনের গুপ্তমন্ত্রের ফলে ঘটে নাই—মানুষের উপর মানুষের উৎপীড়ন বহুশতাধিক বৎসরে যে নির্ম্মম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—যে উৎপীড়নে মানুষের মন desperate হইয়া পড়ে—অভিজাত-তন্ত্রের স্বার্থ-বিলাসের দৌরাত্ম্যে সাধারণ-সমাজ বিলোপের পথে চলিয়াছিল—চারিদিককার সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল! নৈসর্গিক ক্ষেত্রে এমনি বিরোধ-সামঞ্জস্যে ভূগর্ভে যে দারুণ চাঞ্চল্য পুঞ্জিত হয় এবং যে চাঞ্চল্যের ফলে ভূকম্প ঘটে — তেমনিভাবেই এ বিরোধ ফরাসী-সাধারণ-জনের চিত্তে পুঞ্জিত হইয়া বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিপ্লবে কতখানি পীড়ন, কতখানি মুক্তি-সাধনা, একদিকে কতখানি স্বার্থ অপরদিকে কতখানি মনুষ্যত্ব—রেজাউল করিম সাহেবের রচিত গ্রন্থখানি পড়িলে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের নিপুণ সমাবেশ—এবং সে তথ্যের সরল প্রাঞ্জল বর্ণনা সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। বইখানির ছাপা-কাগজ পরিষ্কার, বহিরবয়ব মনোরম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তাইত!—(ছোটদের গল্পের বই)—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৫৪-৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীবসুদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—চার আনা।

শিশুদের নিকট গল্প বলিবার ভঙ্গি গ্রন্থকারের আছে—তার পরিচয় এই বইখানির মধ্যে পাওয়া যায়। শিশুরা যে এই বইয়ের গল্পগুলি পড়িয়া আনন্দ ও তৃপ্তি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গল্পের চিত্রগুলিও সুন্দর হইয়াছে। একখানি দ্বি-বর্ণ চিত্র বইখানির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে।

বইখানির প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন গ্রন্থকার নিজে।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। বইখানির ভিতর-বাহিরের সৌন্দর্য্যের তুলনায়, ইহার মূল্য অল্পই বলিতে হইবে।

শ্রীবিনয় দত্ত।



বন্যার রুদ্র লীলা

বন্যার রুদ্র লীলা এবার ভারতবর্ষের বহুস্থানে দেখা দিয়েছে। এত বেশী স্থান নিয়ে এত ভয়ঙ্কর রকমের বন্যা ভারতবর্ষে আর কখনো হয়েছে কি না সন্দেহ। বাংলা, বিহার, আসাম—তিনটি প্রদেশই এবার বন্যার প্রকোপে বিপন্ন। বাংলায় রাজসাহী, নদীয়া, মুরসিদাবাদ ও মালদহের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। বহু গ্রাম জলমগ্ন, স্ত্রী-পুরুষের দাঁড়ানোর স্থান নেই, শতশত নর-নারী অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণ্‌ছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য অর্থ,- আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র —সমস্ত জিনিষেরই এখন অজস্র প্রয়োজন। প্রত্যেকবারেই এ-গুলো এসেছেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সহৃদয়, পরদুঃখ-কাতর লোকদের কাছ থেকে। কিন্তু এ বারের বিপদ হ'য়েছে এই যে, সাহায্য তেমন পাওয়া যাচ্ছে না কোনোস্থান থেকেই। সেবা-সমিতি অনেক স্থানেই গড়ে' উঠেছে, সাহায্যও চাচ্ছেন তাঁরা সকলের কাছেই। কিন্তু জন-সাধারণের ভিতরে বিশেষ জাগছে না সাহায্য করবার সাড়া।

এ সাড়া না জাগবার কারণ হয়ত দেশের অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা। তা ছাড়া উপর্য্যুপরি কতকগুলো দুর্ঘটনার চাপেও হয়ত মানুষের মন খানিকটে এ-সব সম্পর্কে নিঃসাড় হ'য়ে গেছে। কিন্তু তা হ'লেও বিপদ এত বড় যে, সমস্ত আর্থিক দুরবস্থা ও নিঃসাড়তাকে অতিক্রম করেই সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হবার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। দেশের এতগুলো লোককে মৃত্যুর মুখ হতে বাঁচাবার জন্যই আজ আবশ্যক হ'য়েছে যার যা সাধ্য তার সেই রকমের দান করবার। আমরা সকলের দৃষ্টি এই মহাবিপদের দিকে আকর্ষণ করছি। এত বড় বিপদের সময়েও যদি দেশের লোক দেশের লোকের সম্বন্ধে উদাসীন হ'য়ে থাকে, তবে তার মত দুর্ভাগ্য আর হ'তেই পারে না।

পরলোকে অতুলপ্রসাদ

গত ২৬শে আগুষ্ট অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌ সহরে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ৬৩ বৎসর। অতুলপ্রসাদের নাম ছোট-বড়, নর-নারী নির্ব্বিশেষে প্রায় সব বাঙ্গালীর কাছেই পরিচিত। বাংলা গানে তিনি এমন কতকগুলি সুর সংযোগ করেছিলেন—যা যেমন নতুন তেমনি মধুর। এই গানের ভিতর দিয়েই তিনি পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলেন সব বাঙালীর কাছে। কিন্তু সঙ্গীতের এই অসাধারণ পারদর্শিতাই তাঁর প্রতিভার একমাত্র বিকাশ ক্ষেত্র ছিল না। শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য, আইন—নানা দিক দিয়ে অতুলপ্রসাদের প্রতিভা অনন্যসাধারণতার কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ 'বারের' একজন বড় আইনজীবী ছিলেন। আইনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠাও ছিল প্রচুর। আর সেই জন্যই বাঙালী হ'য়েও তিনিই ছিলেন 'আউধ-বার এসোসিয়েসনের' প্রেসিডেণ্ট। শিক্ষার দিক দিয়েও তাঁর স্থান ও প্রতিপত্তি লক্ষ্ণৌ সহরে সামান্য ছিল না। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণের জন্যও তাঁকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু নানা কারণে

তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ ছিলেন উদার-পন্থী। 'ন্যাসন্যাল লিবারেল ফেডারেশনের' সভাপতির পদেও একবার তাঁকে বরণ করা হয়।

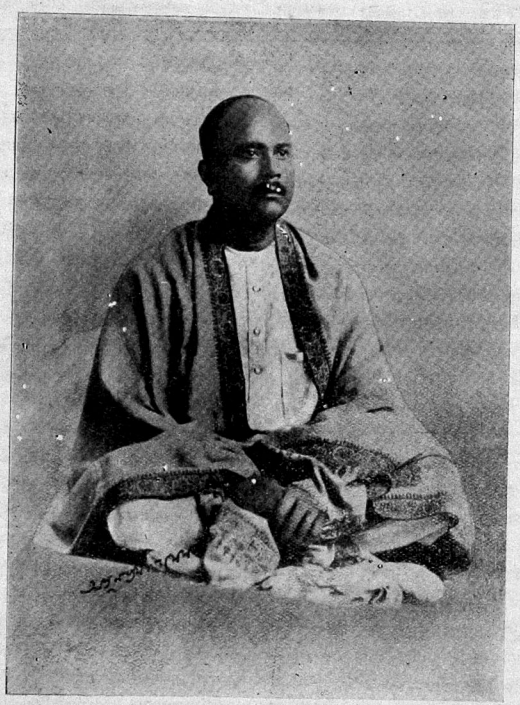

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন

সাহিত্যের দিক দিয়েও অতুলপ্রসাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

"উঠগো ভারত-লক্ষ্মী উঠ আদি জগত-জন-পূজ্য"

প্রভৃতি তাঁর কতকগুলি গান চিরদিনই বাংলা ভাষার অলঙ্কার হয়ে থাকবে। উত্তর ভারতের মাসিক পত্র 'উত্তরা' তাঁরই আগ্রহে এবং সম্পাদনায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে তাঁরই চেষ্টা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার যে একটা বড় ক্ষতি হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলার বাইরে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা আজ নেই বললেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। প্রায় সব প্রদেশ হ'তেই বাঙালীকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা চলেছে। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাঁরা বাংলার বাইরেও বাঙালীর সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিলেন—অতুলপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সুতরাং অতুলপ্রসাদের বিয়োগে বাংলার সাহিত্যেরই শুধু ক্ষতি হ'লো না, তাঁর মৃত্যুতে বিদেশে বাংলার প্রতিষ্ঠারও হানি হ'লো এবং সে হানিও উপেক্ষার যোগ্য নয়।

অতুলপ্রসাদকে গত বৎসর আমরা শেষবার যখন দেখি তখনও জরার প্রভাব আমরা তাঁর ভিতরে দেখতে পাইনি। হাস্যময়, স্ফূর্ত্তিময় চেহারা—যে চেহারা যৌবনের সঙ্গেও বেমানান হয় না। মৃত্যু অপরিহার্য্য, তা সকলের কাছেই আসবে, কিন্তু অতুলপ্রসাদের কাছে সে এসেছে অত্যন্ত অসময়ে—একান্ত আকস্মিক ভাবেই। এই আকস্মিকতার দুঃখই এই চিরবিদায়ের ব্যথাকে এত বেশী তীব্র করে তুলেছে বাঙালীর কাছে। আমরা অতুলপ্রসাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

নারী-ধর্ষণ

নারী-ধর্ষণের সংখ্যা বাংলায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির কথা নিয়ে এবং এ-ব্যাপারে আমাদের ও কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার কথা নিয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার আলোচনা করেছি। সম্প্রতি ঢাকায় বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর স্যর জন উডহেড পুলিসদের পুরস্কার-বিতরণ সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার ভিতর দিয়েও এর গুরুত্বটা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন—"যে বিশেষ অপরাধের কথাটা গতবৎসর স্যর জন এণ্ডারসন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন তা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ। বিষয়টা এখনও উদ্বেগের কারণ হ'য়ে আছে। আমি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে ১৯৩৩ সালেও এই অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে।...পুলিশ এমন অনেক কিছুই করতে পারেন যাতে এই ঘৃণিত দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হ'তে পারে। আমার সন্দেহ নেই যে আপনারা এ-সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু তা' হ'লেও এ সম্পর্কে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে এখনও ঢের উন্নতির অবকাশ রয়েছে। এ-ব্যাপার বাংলার গুরুতর কলঙ্কে পরিণত হ'তে চলেছে। সুতরাং আমি আশা করি যে সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারীই এ কলঙ্ক দূর করবার জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করবেন।"

নারী-ধর্ষণের এই ব্যাপারটি নিয়ে আন্দোলন ও আলোচনা যে কম হচ্ছে তা নয়। কেবল আন্দোলন ও আলোচনায় এ কলঙ্ক দূর করা যদি সম্ভব হ'ত তবে এতদিন তা নিঃশেষে দূর হ'য়ে যেত। তা যখন হয়নি তখন এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন আরো কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনের। সে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে একমাত্র পুলিশ কর্ম্মচারী এবং বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীরাই। পুলিশ যদি তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘটনার তদন্ত করেন, কেবল অপরাধীকে নয়, অপরাধীকে যারা সাহায্য করে তাদের সকলকেও আইনের হাতে সমর্পণ করবার ব্যবস্থা করেন এবং অপরাধীর দণ্ড যদি এ-রকমের হয় যে, তাতে অপরাধটা সম্বন্ধেই একটা ভীতির সৃষ্টি হয়, তবে অপরাধের বহর যে স্বাভাবিক নিয়মেই ক'মে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

এই ধরণের অপরাধে যারা অপরাধী তাদের বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে কিনা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের ভিতর তাই নিয়ে চলছে আলোচনা। বেত্র দণ্ডের ভিতর খানিকটা বর্ব্বরতা আছে, সুতরাং সবক্ষেত্রে তার সমর্থন করা চলে না। কিন্তু এসব অপরাধ যেরূপ বর্ব্বর তাতে তার প্রতিকারের জন্য যদি খানিকটা বর্ব্বরতার আশ্রয় নেওয়া হয়, তবে তাও সমর্থনের অযোগ্য হবে বলে আমাদের মনে হয় না। তা ছাড়া লোকের মনে এ অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলার উপাদান আছে শুধু এই বেত্রদণ্ডের ভিতরেই যা কারাদণ্ডে নেই। চোখের উপরে যদি অপরাধীকে

বেত্রদণ্ডে জর্জ্জরিত হ'তে দেখে, তবে যারা এ ধরণের অপরাধ করতে চায়, অপরাধ করবার আগে বার কয়েক দণ্ডের গুরুত্বের কথাও তারা ভেবে নেবে। অনেক দুর্দ্দান্ত পশুকেও সায়েস্তা করা হয়েছে বেত্রাঘাতের দ্বারা—এ উদাহরণ পশু নিয়ে যারা নাড়া চাড়া করেন তাঁরা জানেন।

কিন্তু এ সম্বন্ধে দায়িত্ব কেবল গবর্ণমেণ্টেরই যে আছে তা নয়, আমাদের নিজেদের দায়িত্বও কম নয়। আমরা নিজেরা যদি সমাজের এই গ্লানির সম্বন্ধে সচেতন ও অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠি তবে পুলিশের কাছ থেকেও তা আশা করতে পারিনে। সমাজ যে এ-সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতনতার পরিচয় দেয় নি, তা বলাই বাহুল্য।

শব্দ-বিজ্ঞান সম্মিলনে বাঙালী অধ্যাপক

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক 'ফনেটিক' সম্মিলনের অধিবেশন হবে। এই সম্মিলনে যোগদানের জন্য ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনীত হ'য়েছেন। ভাষা-বিজ্ঞানে ডক্টর সুনীতিকুমার প্রগাঢ় পণ্ডিত। আমাদের ভরসা আছে 'ফনেটিক' কন্‌ফারেন্সে তিনি যে জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবেন তা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

পরলোকে স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ

গত ২৪শে ভাদ্র স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ পরলোকে গমন করেছেন। চারুচন্দ্র বাংলার কৃতী সন্তানদের অন্যতম। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, কয়েকবার অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিচারে নিরপেক্ষতা এবং দূরদর্শিতা তাঁর জজিয়তির সমরটাকে গৌরবময় করেছে। দেশের প্রতি তাঁর একটা গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল। দেশের সেবা তিনি অনেক রকমে ক'রে গেছেন। তবে সে সেবার ভিতরে অযথা উচ্ছ্বাস ছিল না। বাইরে তা প্রকাশ করবার লোভও তিনি সযত্নে ক'রে গেছেন আশ্চর্য্য রকমের সংযমের দ্বারা। স্যর চারুচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। হাইকোর্টের জজিয়তি ত্যাগের পর তাঁকে শাসন-পরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় তিনি সে পদ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ৬০ বৎসর হয়েছিল। রাজকার্য্য হ'তে অবসর নেওয়ার পর দেশের নানা



স্বর্গীয় স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ

রকমের কল্যাণের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন—দেশ তাঁর কাছ থেকে এই জিনিসটাই আশা করছিল। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সেই আশাটাই ব্যর্থ হ'য়ে গেল। পরিণত বুদ্ধি ও গভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন কাজ করবার সময়, তখনই বাংলার জ্যোতিষ্ক যাঁরা তাঁরা খসে পড়েন। এ দুর্ভাগ্য বাংলার সহজ দুর্ভাগ্য নয়। আমরা চারুচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার ঊর্দ্ধগতি কামনা করি। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনাও জ্ঞাপন করছি।

জাপানের হরিজন-প্রীতি

ইয়োকোহামার ব্যবসায়ীরা ৩৮৯২ টাকা সংগ্রহ ক'রে মহাত্মাজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন হরিজনের কাজে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে ব্যয় করবার অনুরোধ জানিয়ে। অর্থের দিক দিয়ে অঙ্কটা খুব বড় নয়, কিন্তু এই দানের ভিতরে হরিজনদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার যে পরিচয় আছে তার দাম ঢের—তা উপেক্ষার যোগ্য নয়।

সর্প-দংশনের চিকিৎসার পুরস্কার

সর্প-দংশনের ভাল ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ইউরোপে, আমেরিকায় তবু সর্প-দংশনের ঔষধ তৈয়ারীর চেষ্টা চলেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ঔষধের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ ওঝার মন্ত্র। অনেক সময় তাতে আশ্চর্য্য রকমের সুফল দেখা যায় বটে, কিন্তু তার উপরে বিশ্বাস ও নির্ভর করা কঠিন। কারণ বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বোম্বাই-এর হাফ্‌কিন ইন্‌ষ্টিটিউট সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরীর চেষ্টা করছেন বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে। তাঁরা এই সব মন্ত্র-তন্ত্রের উপরে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন—ও শুধু বুজরুকি। কেবল তাই নয় তাঁরা ওঝাদের রীতিমত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেছেন ১০ হাজার টাকার একটা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে। বানরকে সর্প-দষ্ট ক'রে তাঁরা ওঝাদের দেবেন আরোগ্য করতে। মন্ত্রের দ্বারা যদি কোনো ওঝা তাকে আরোগ্য করতে পারে, তবে তাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যে শক্তি খাঁটি বলে প্রমাণ না হ'বে এ যুগের লোক তার উপরে কখনো আস্থা স্থাপন করতে পারবে না। সম্প্রতি আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটিতে ডাঃ গৌরিশঙ্কর নামে একজন ওঝা মন্ত্র-শক্তির দ্বারা সর্পাঘাতের চিকিৎসার জন্য চাকুরী প্রার্থী হয়েছিলেন। মাহিয়ানা চেয়েছিলেন মাসিক ৪০৲ টাকা মাত্র। কিন্তু আমেদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি রাজি হ'ন নি। ডাক্তার গৌরীশঙ্কর বা তাঁর মত যাঁরা সর্প-মন্ত্র-বিশারদ তাঁরা হাফ্‌কিন ইন্‌ষ্টিটিউটের এই ১০ হাজার টাকা পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন। জয়ী হ'তে পারলে অর্থের দিক দিয়ে তাঁদের লাভ ত আছেই, তা' ছাড়া একটা প্রাচীন পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে ফেলে যাচাই ক'রে নেবার সুবিধেও হবে তাতে। বৎসরে ৫০।৬০ হাজার লোক ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে মারা যায়। সুতরাং এর একটা বিজ্ঞান-সম্মত প্রতিকার-পদ্ধতির আবিষ্কার যে আবশ্যক তা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষার্থিণী ভারত-মহিলার বিলাত-গমন

কুমারী সরলা দেশাই বি-এ, কুমারী বিদ্যা নেহেরু বি-এ, শ্রীমতী মন্দাকিনী ত্রিলোকেকর এম্-এ, প্রমুখ কয়েকটি মহিলা উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাচ্ছেন। এঁরা সকলেই কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এঁদের কারো উদ্দেশ্য সংবাদপত্র সেবা সম্পর্কে ডিপ্লোমা লাভ করা, কারো বা উদ্দেশ্য শিক্ষা-সম্পর্কে ডিপ্লোমা লাভ। আমরা এঁদের সকলেরই পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি। বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে এনে, ভারতের উপযোগী ক'রে যদি তাঁরা তা' দেশের ভিতর পরিবেশন করতে পারেন, তবে তাতে দেশেরও উপকার হবে, তাঁদের শিক্ষাও সার্থক হবে।

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী

১৮৩৫ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ১৯৩৫ সালে তার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই শতবার্ষিকীটি বিশেষ ভাবে পালন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি একটি সভা হ'য়ে গেছে। স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকীর সত্যিকারের উৎসব হচ্ছে—মেডিক্যাল কলেজের এমন কোনো একটা উন্নতি করা, যা দেশের লোকের চিকিৎসা-সম্পর্কে বড় রকমের কোনো সমস্যার সমাধান করবে। সেই ধরণেরই একটা প্রস্তাবও করা হ'য়েছে। প্রস্তাব হয়েছে—এই উপলক্ষ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য একান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম-যুক্ত একটি ওয়ার্ড বা বিভাগ গ'ড়ে তোলা হবে। তা'তে ৪০টি রোগীর স্থান থাকবে। প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু এ-প্রস্তাবকে বাস্তবরূপ দান করতে হ'লে অর্থের প্রয়োজন। চিকিৎসাগারটি গ'ড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে ২,৬৭,০০০৲ টাকার, এবং এর খরচ চালাতে দরকার হবে বৎসরে ২৫,০০০৲ টাকার। গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক খরচের এই ২৫,০০০৲ টাকা দিতে রাজি আছেন যদি সৌধ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি বাবদ যে ২,৬৭,০০০৲ টাকার আবশ্যক হবে তা জন-সাধারণের চাঁদার টাকা হ'তে সংগ্রহ করা যায়।

মেডিক্যাল কলেজের অতীত ইতিহাসের দিকে যদি তাকানো যায় তবে এই টাকা সংগ্রহ খুব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। মেডিক্যাল কলেজের বহু অংশই সাধারণের দানের অর্থে তৈরী হয়েছে। যে জমির উপর মেডিক্যাল কলেজের প্রধান সৌধটি অবস্থিত সে জমি দান করেছিলেন ৺মতিলাল শীল। ৺চুণীলাল শীল, শ্যামাচরণ লাহা প্রমুখ দানবীরদের দানের অর্থে গড়ে উঠেছে চুণীলাল শীল ডিস্পেন্সারী, ইডেন হাসপাতাল, শ্যামাচরণ লাহা চক্ষু-চিকিৎসালয়। একটি ছাত্রী-নিবাস গ'ড়ে তোলার জন্য কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দান করেছিলেন দেড় লক্ষ টাকা। দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিংহ হাসপাতালের উন্নতির জন্য একবার ৯০ হাজার টাকা দান করেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মিসেস মোজেল এজরা, শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, বলদেব দাস বিরলা, রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ অনেকের দানের অর্থেই মেডিক্যাল কলেজের এই এত বড় দেহটা গ'ড়ে উঠেছে। সুতরাং চেষ্টা করলে এই ২,৬৭,০০০৲ টাকা তুলতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে ব'লেও আমাদের মনে হয় না। বস্তুতঃ আমাদের এ-ধারণার ভিতর যে ভুল নেই গোড়াতেই তার নিশানাও দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই লক্ষাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। কাশিম বাজারের কুমার কমলারঞ্জন রায় ৫০ হাজার টাকা, রায় বাহাদুর মুকুন্দলাল তাপুরিয়া ২০ হাজার টাকা, স্যর হরিশঙ্কর পাল এবং তাঁর ভ্রাতা মিঃ হরিমোহন পাল ২০ হাজার টাকা, মিঃ জওলা প্রসাদ ভর্ত্তিয়া ১৫ হাজার টাকা, কর্ণেল ডব্লিউ, এম, ক্রাডক ১ হাজার টাকা, ডক্টর বিমলা চরণ লাহা ১ হাজার টাকা এবং মিঃ জে, সি, শীল ১ শত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাদ বাকি টাকাও পেতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।

যে ওয়ার্ডটি গ'ড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রয়োজন যে খুবই তাতে সন্দেহ নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজের যে ঘরগুলো ব্যবহৃত হয় তাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির কোনো ছাপই নেই। কোনো রকমে তাতে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়—এই মাত্র। কিন্তু কলিকাতার মত এত বড় সহরের Emergency Ward যে ঢের বেশী উন্নত ধরণের হওয়া সঙ্গত তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমরা আশা করি, দান-বীরদের দানের দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সহজেই সংগৃহীত হবে এবং মেডিক্যাল কলেজের শত বার্ষিকী উৎসব এই প্রস্তাবিত ওয়ার্ডটির প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়েই নিষ্পন্ন হবে।

Blank page (s)